eliminate the rats is being made only now after the latest scandal, presumably because it has attracted public attention. Admittedly the operation is difficult, especially because there is a danger of the child patients themselves being exposed to any rat poison used. But it is not impossible to devise adequate safeguards; methods other than chemical poisoning can also be employed. Little seems to have been attempted until now.

The West Bengal Government may disown responsibility, saying that it took over the hospital only recently. But conditions in most other Calcutta hospitals are only marginally better. There is no ready answer to the basic problem of inadequate facilities in a large hospital, protected by their unions which in turn have powerful political patrons. Apparently, even senior hospital staff dare not discipline them. Not surprisingly, one feature of this arrangement is a chain of corruption. Funds are misused; drugs and other supplies are stolen. There are even reports of criminal gangs operating from hospital premises. Hospital authorities are either apathetic or helpless; and the State Government seems to wake up only when there is public agitation over a scandal. It will not do merely to insist on better hospital administration; the hospital authorities need to be assured of full Government support in the drastic measures that the situation calls for.

JILTED MARIANNE

FRANCE has reason to be piqued at the latest setback in Britain's never very enthusiastic support for an underwater tunnel linking the two countries. The project's cost, estimated at an astronomical £2,000 million and quite likely to escalate further by the time it is completed, may appear to rationalize Whitehall's reservations; but the decision to withdraw can hardly have been uninfluenced by those national prejudices expressed in the bluntly offensive British claim that "wogs begin at Calais". A hesitant membership of the European Common Market has done little to demolish pride and insularity. On the contrary, even those people in Britain who recognized that the country's only hope of remaining in the first league lay in a closer economic and political association with the Continent deeply resented such innovations as an European standard time or second class coaches on railway trains. Designed to bring about Common Market uniformity, the changes were seen as likely from 1066, may have been strengthened by Napoleon's fleet of flat-bottomed barges at Buologne or the more recent eviction from Dunquerque. Such irrelevant fears would find no place in the outlook of a country which viewed the future with confidence; but this hardly applies to a Britain which continues to savour nostalgically its memories of the Raj. It is of a piece with this complex that though the Channel tunnel project was mooted nearly a century ago, it was not seriously taken up until 1963 when the final disappearance of overseas dominion obliged London reluctantly to agree to a marriage of convenience with its immediate neighbour. But practical necessity cannot overnight wish away a way of thought that is reflected not only in such stock jokes as the newspaper headline "Channel Frozen: Continent Isolated" but also in a vast array of phrases which pay the French the backhanded compliment of attributing any number of objectionable practices to them. What may be

3/13

---

who usually sta
nev when the
from Moscow.

The consensu
gence analysts
—nine months
nev, who has ju
68th birthday-
most healthy and
ber of the politi
of his age, he
more likely to
in the nature o
ministration, and
seat warm for
Brezhnev's own
the younger ma

SPURNIN
O

SIR,—Your
Spots"
rightly points ou
towards Israel
that we have fa
vantage of the
gress by that
particular refere
tion, desert re
small-scale indus

May I cite a
which Israel's g
us in the past
without even a
ciation? Dr Wei
1947 to send th
India—one on
second on soil c
a third on coop
I conveyed the o
who at first sho
later told me th
get Maulana Aza

When I was a
University Gra
(1962-68), I was
Israeli Consul i
ther India woul
send the Vice
three agricultura
guests of the Isr
so that they mig
selves the kind
research being d
cultural Researc
Tel-Aviv. I was
UGC Chairman
ment was not
the invitation
was dropped.

A Jewish fa

business to study national psychology attribute this withdrawal to geography, an obsessive preoccupation with an imperial past, and to traditional suspicions of the Normandy coast which. dating

à l'anglaise". Even more significant was the once popular French description of a creditor as "un Anglais": a not inaccurate reflection surely on Britain's commercial transactions throughout the world.

olives and
him to th
Agricultu
cuss deta
Rajasthan
ture ent
lister
ed

Teams:
INDIA—M. A.
M. Engin

can also

her husband
an at Cal-
regrets she
individually.

Mrs. Maisie
nk all rela-
eir messages
al tributes.

those responsible. But responsible for what? Better attention by the staff on duty might have prevented the rats from devouring more than they did. But surely those who were negligent on the night

But things could be substantially improved even within these limitations. Neither the patient load nor pressure of work can explain the insanitary conditions in and around most hospital wards, or the

the
vious

3/131

14

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/131

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

৩/১৩১

সদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

শ্রী আনন্দময়ী আশ্রম লাইব্রেরীতে—
সাদরে উপহার।

১৮/৬/৭৫

শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরী

PRESENTED

LIBRARY
No. 3/131
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-২৯ ॥ কলিকাতা-৯

SADGURU SRI SRI BIJOYKRISHNA

By Sri Tarini Charan Chaudhuri

প্রথম প্রকাশ : ঝুলন-পূর্ণিমা
২৯ শ্রাবণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ
১৪ আগস্ট, ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দ

কপিরাইট : গ্রন্থকার

পরিবেশক
জিজ্ঞাসা
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা : শ্রীমতী সুরীতি চৌধুরী
১৭০/৩, লেক গার্ডেনস,
কলিকাতা-৪৫

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৫৪

উৎসর্গ

যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রেরণায় ও উৎসাহে এই গ্রন্থ-প্রণয়ন আমার মত অভাজনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, সেই দীনতা ও করুণার কল্যাণ-বিগ্রহ শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী মহারাজের শ্রীকর-কমলে "সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ" গ্রন্থখানি উৎসর্গ করে কৃতার্থ হলাম।

দীন—
শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরী।

ঝুলন-পূর্ণিমা,
২৯ শ্রাবণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।
১৭০/৩, লেক গার্ডেন্‌স, কলিকাতা-৪৫

LIBRARY
No. [illegible]
3/131

PRESENTED

মঙ্গলাচরণম্

জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদর-শরীরিণে।
কমণ্ডলুনিষঙ্গায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥[১]

জটাধারী-দণ্ডধারী-কমণ্ডলুধারী স্থূলকায় ব্রহ্ম হতে অভিন্ন সদ্‌গুরুকে প্রণাম করি।

ওঁ স্বর্ণাভ জটাজূট-পরিশোভিতম্ স্বর্ণাভ-শ্মশ্রু-ধারিণম্।
কৃতং জটয়া চূড়কম্ ফণিভূষণম্ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত বেণীকং বা,
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রম্ শ্রীমন্‌মহাদেবং বা শ্রীবৃন্দাবন-বিলাসিনীং বা,
কলৌ পতিত-বন্ধুম্ পতিত-প্রেমদাতারং দণ্ড-কমণ্ডলুহস্তম্,
গৈরিক-কৌপীন-বহির্বাস-বাসসম্ কণ্ঠে দোলিতম্ সপ্তলহরী-মাল্যম্,
নখাগ্রাৎ কেশাগ্রপর্য্যন্তম্ সুমধুরম্,
মধুর-হাসং মধুর-ভাষং ব্যবহারেণ চ মধুরম্,
মধুরং মধুরম্ পরিপূর্ণমানন্দম্ সদ্‌গুরুম্ তং নমাম্যহম্।[২]

যিনি সুবর্ণের ন্যায় আভাযুক্ত জটা ও শ্মশ্রু দ্বারা পরিশোভিত, যাঁর জটা কখন বা চূড়ার ন্যায় বা শিবের শিরোপরি সর্পের ন্যায় মাথায় থাকে, কখন বা পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত, যাঁকে দর্শন করে কখন বা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের ন্যায় কখন বা মহাদেবের ন্যায় মনে হয়, এই কলিকালে যিনি পতিত-জনের বন্ধু ও প্রেমদাতা-স্বরূপ, যাঁর হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু, কটিদেশে গৈরিক কৌপীন ও বহির্বাস এবং কণ্ঠে সপ্ত-লহরী মালা শোভা পায়, যাঁর নখাগ্র থেকে কেশাগ্র অবধি সুমধুর এবং যাঁর আচার-ব্যবহার বাক্যালাপ, হাস্য-পরিহাস সকলই মধুক্ষরণ করে, সেই পরিপূর্ণ আনন্দময় ও মধুময় সদ্‌গুরুকে প্রণাম করি।

প্রেমভক্তি-প্রদাতারম্ আনন্দানন্দ-বর্দ্ধনম্।
স্বর্ণময়ী সুতং বন্দে যোগমায়া-মনোহরম্॥
বিজয়-বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দ-বর্দ্ধিনীম্।
সদানন্দময়ীম্ সাধ্বীং যোগমায়াং নমাম্যহম্॥

জয়তু বিজয়কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ অদ্বৈত-বংশ-তিলকঃ যোগমায়া-বল্লভঃ।
বঙ্গে শান্তিপুরে জন্ম, ক্ষেত্রে যস্য সমাধিঃ, সদ্‌গুরো! ত্বামহং বন্দে ত্রাহি শরণাগতম্॥

ওঁ হরিঃ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

---

[১] ভীষ্ম-কর্তৃক সদ্‌গুরু প্রণাম—মহাভারত।

[২] গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় (পণ্ডিত মহাশয়)-রচিত।

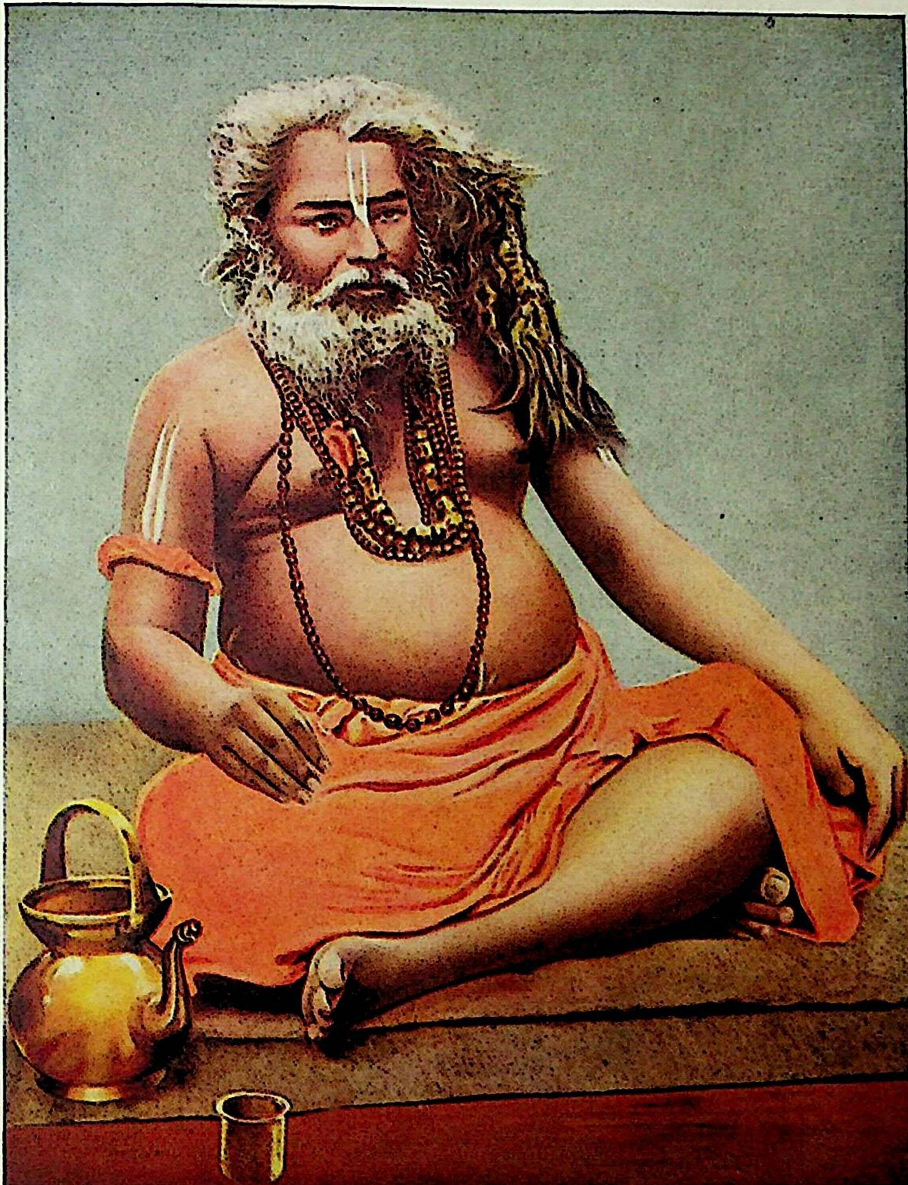

সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

LIBRARY
N
i Shri ......

[illegible] 3/131
PRESENTED by Sri Akhoy Bhattacharya
LIBRARY
No. [illegible]
Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS 3/131

সূচীপত্র

আদিপর্ব—শান্তিপুরের বৈষ্ণবসমাজে—
(১২৪৮-১২৬৮ বঙ্গাব্দ)

বিষয় পত্রাঙ্ক

নিবেদন ... ... [৭]
শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ, শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব-পূর্বকথা ১
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব ও শৈশবের কথা ৮
বিদ্যারম্ভ ও বাল্যকথা ১৪
চতুষ্পাঠীতে পাঠ ও উপনয়ন ২১
সত্যানুরাগ ও দলের নেতৃত্ব ২৬
জীবন-নদীর ওপারে ৩০
দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৩৩
সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ ও বিবাহ ৩৬
ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত (১২৩৫-১২৬৭) ৩৮
ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি ৪৫
ব্রাহ্মমন্দিরে যাতায়াত ৪৮
ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষালাভ ৫১

মধ্যপর্ব—ব্রাহ্মসমাজে সাতাশ বছর—
(১২৬৮-১২৯৪ বঙ্গাব্দ)

কেশব সেনের সঙ্গে পরিচয় ৫৫
উপাচার্য পদে বৃত ৬১
দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতানৈক্য : আদর্শে সংঘাত ৬৭
ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত : আদি ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ৭২
ভগবানদাস বাবাজী ও চৈতন্যদাস বাবাজী ৭৯
ব্রাহ্মসমাজে কীর্তন-প্রসঙ্গ ৮৫
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে অন্তর্বিরোধ ও সংহতি ৮৮
হৃদরোগের আক্রমণ ৯৬
বাগ-আঁচড়ায় ইঙ্গিতপূর্ণ স্বপ্ন ১০৯
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ১২৪
ধর্মজীবনে গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা ১৪০
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার-পথে সদ্গুরু-অন্বেষণ ১৪৫
গুরুলাভ ১৬১
তীর্থভ্রমণ ও প্রচার ১৭২
ভগবদ্-দর্শন লাভ ১৮২
সদ্গুরুপদে অধিষ্ঠিত ১৯৩

বিষয় পত্রাঙ্ক

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ২০৭
পুনরায় ঢাকায়, পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ২১৭
সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর ২৪৫

অন্তপর্ব—সার্বভৌম ধর্মের আশ্রয়ে॥ দিব্যলীলা
(১২৯৪-১৩০৬ বঙ্গাব্দ)

গেণ্ডেরিয়া আশ্রমের সূচনা ২৫৫
গেণ্ডেরিয়ায় আশ্রম-সঞ্চার ২৬৪
আশ্রমে প্রথম ধূলট ও পরিণয়োৎসব ২৭৮
শ্যামসুন্দর দর্শন, শান্তিপুরে নবদম্পতি;
পরে কলিকাতায় অবস্থান ২৮৮
কাশী ও ফয়জাবাদ হয়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা ২৯৫
শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান ৩০২
যোগমায়া দেবীর শ্রীবৃন্দাবনে গমন ৩১৩
বনপরিক্রমা ও যোগমায়া দেবীর ব্রজধামপ্রাপ্তি ৩২৬
গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে শ্রীশ্রীনামব্রহ্মের মন্দির প্রতিষ্ঠা ৩৪০
শ্যামবাজারে তেমাথার মোড়ে বাড়ী ভাড়া ৩৫১
গেণ্ডেরিয়ায় আম্রবৃক্ষ ও গোস্বামীপ্রভুর শ্রীদেহ থেকে
মধুনিঃসরণ ৩৬৬
গোস্বামীপ্রভুর সাধনবৈশিষ্ট্য ৩৭৯
স্বর্ণময়ী দেবীর তিরোধান ও শেষকৃত্য ৩৯১
রাখালবাবুর গৃহে অবস্থান ও প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যোগদান ৪০৪
কুম্ভমেলায় সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ ৪১৮
নবদ্বীপে দোল-পূর্ণিমা উদ্‌যাপন, পরে শান্তিপুর হয়ে
কলিকাতায় ৪৩২
সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে অবস্থান ও শ্রীবৃন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন ৪৪৬
ঢাকায় গোস্বামীপ্রভুর তৃতীয় ধূলট উৎসব ৪৬৮
কলিকাতায় হ্যারিসন রোডে অবস্থান ৪৭৮
শ্রীক্ষেত্রে গমন ৪৯৪
শ্রীক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্থানাদি দর্শন ও বানর-নিধন-রদ ৫০২
শ্রীপুরুষোত্তমধামে গোস্বামীপ্রভুর দানলীলা ৫১৮
মহাপ্রয়াণ না মহামিলন ৫৩৮
গোস্বামীপ্রভুর অপ্রকট কৃপালীলা ৫৪৯

সংযোজন

জটীয়াবাবার সমাধি-আশ্রম ৫৬২
মৌন অবস্থায় লিখা খাতা হতে গোস্বামীপ্রভুর
বাণী-সংকলন ৫৬৩

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

সবিনয় নিবেদন,

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে একদিন আমার গুরুদেব আমাকে গোস্বামীপ্রভুর একখানা জীবনী লিখতে বলেন। তাঁর এই আদেশের কথা ভেবে আমি অবাক হই। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। সাহিত্য পড়তে ভালবাসি সত্য, কিন্তু জীবনী-গ্রন্থ প্রণয়ন করা আমার পক্ষে কি করে সম্ভব? আমার মনে ভয় ও সংশয়। গুরুদেবের ইচ্ছার মহিমা তখনও জানি না; ভাবি কথার কথা। দু-তিন বছর কেটে যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্তলীলায় পড়ি—

আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি তার পার।
জীব হইয়া কেবা সম্যক পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি, তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥

অনন্তের অন্ত মহাজনেরাও পান না। গোস্বামীপ্রভু অনন্ত, অসীম। অশেষ তাঁর জীবনবেদ। গোস্বামীপ্রভুর জীবনী আমার পক্ষে লিখা এক দুরূহ ব্যাপার। গুরুজীর অনুজ্ঞা। আমার যোগ্যতা নেই, জ্ঞান নেই। শ্রীশ্রীগুরু কৃপাই সার।

১৩৬১ সালে এক ছুটির দিনে অদৃশ্য এক শক্তির প্রভাবে লিখতে শুরু করি। লেখা চলে অবিরল। মনন নেই, চিন্তন নেই। কর্মজীবন তখনও পুরোপুরি। দিনের বেলা সময়ের অভাব। রাত্রে বসে বসে লিখি। ১৩৬২ সালে শ্রীশ্রীগুরুদেব একদিন আমাকে বলেন, 'গোস্বামীপ্রভুর শিষ্যেরা এখনও অনেকে দেহে আছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ভাল।' শ্রীবৃন্দাবনে ধীর-সমীর-কুঞ্জের দ্বারিকানাথ রায় মহাশয়ের কাছে ঐদিনই চিঠি লিখি। একটি ঘটনা উল্লেখ করে তার সত্যতা নিরূপণ করতে চাই। কয়েকদিন বাদেই তাঁর কাছ থেকে উত্তর এল। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার প্রভুর জীবনী লিখিতেছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রভুর ইচ্ছা হইলে, তিনিই কৃপা করিয়া তাঁহার জীবন-কথা আপনার কাছে ধরিবেন। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; দিন দিন আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইতেছে।'

১৩৬৩ সালে গুরুদেব শ্রীবৃন্দাবনে। বড়দিনের সময় তাঁর কাছ থেকে এক তারবার্তা আসে, অবিলম্বে যেন আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাই। ব্রজধামে পৌঁছার পরদিনই তিনি আমাকে দ্বারিকাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আদেশ করেন। বেলা সাড়ে এগারটায় ধীর-সমীর-কুঞ্জে গিয়ে বাইরে থেকে দেখি, এক সৌম্যমূর্তি শ্যামকান্তি স্থূলদেহ-বৃদ্ধ প্রসাদ পাচ্ছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কাকে চাই?' আমি বলি, 'দ্বারিকানাথ রায় মহাশয়কে প্রণাম করতে এসেছি।' তিনি বলেন, 'আমি তো প্রসাদ পাচ্ছি। আপনি বসুন। আপনার নাম?' আমি বলি, 'নাম বললে চিনবেন না।' এ-কথা বলেই বারান্দায় তক্তপোষে বসি। তিনিও খনিকবাদে মুখ ধুয়ে পাশে এসে বসেন। তাঁকে প্রণাম করতেই পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। আমার নাম বলতেই তিনি মৃদু হেসে বলেন, 'চিনতে পারব না?

এই দেখুন আপনার চিঠি।' নির্বাক বিস্ময়ে দেখি, তক্তপোষের উপর কাঠের একটি হাত-বাক্স আর তার উপর আমার বছরখানেক পূর্বে লিখা পোস্ট-কার্ডখানা। তিনি বলেন, 'গত রাত্রে পুরান সব চিঠি ছিঁড়ে ফেলছিলাম; আপনার চিঠিখানা আর ছিঁড়ি নি। জানতে বড় ইচ্ছা হল, প্রভুর জীবনী কতদূর হয়েছে; আর আজই প্রভু আপনাকে এখানে এনে হাজির করেছেন। পাণ্ডুলিপি এনেছেন কি?' আমি তাঁকে বলি, 'গোপীনাথবাগে উঠেছি; ওখানে পাণ্ডুলিপি রয়েছে।' শুনে তিনি বলেন, 'কাছেই তো, পাঁচ-সাত মিনিটের পথ; একবারটি গিয়ে নিয়ে আসুন না!' বেলা একটায় পাণ্ডুলিপি এনে বেছে বেছে পড়তে শুরু করি। বৃদ্ধের দুই চোখে অবিরল ধারা ঝরে। মধ্যে মধ্যে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। 'আপনি'র ব্যবধান ঘুচে গিয়ে কখন যে 'তুমি' হয়ে গিয়েছি, খেয়াল নেই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। বার বার তিনি বলতে থাকেন, 'আজ আমার সুনিদ্রা হবে।' সর্বশেষে শ্রীপুরুষোত্তমধামে গোস্বামীপ্রভুর দানলীলা পড়ি। পাঠ শেষ হলে আত্মস্থ হয়ে তিনি বলেন, 'গোসাঁই তাঁর আপনজন এখানে নিয়ে এসেছেন।' আমাকে বললেন, 'বাবা, আমার হাত ধরে একটু উঠাও তো।' পাশের ঘর থেকে লাল শালু কাপড় দিয়ে বাঁধা একটি গাঁটরী নিয়ে এসে বলেন, 'চল্লিশ বছর ধরে যখের ধনের মত যা আগলিয়ে রেখেছিলাম, তা তুমি নাও।'

কলিকাতা ফিরে আসার এক সপ্তাহ পর দ্বারিকাবাবুর ভক্ত শ্রীপরমানন্দ দাশের চিঠি পাই। তিনি ধীর-সমীর-কুঞ্জে থাকতেন। তিনি লিখেছিলেন, আমার শ্রীবৃন্দাবন ছাড়ার সংগে সংগেই দ্বারিকাবাবুর ব্রজধামপ্রাপ্তি ঘটে। আমার দুঃখ দ্বারিকাবাবু এই গ্রন্থখানা দেখে যেতে পারলেন না।

১৩৬৪ সালে গুরুদেবের সংগে শ্রীক্ষেত্রে যাই। জটীয়াবাবার সমাধি-আশ্রমবাসিনী প্রভুর শিষ্যা লীলা দেবী (বেণীমাধব দে-র বিধবা স্ত্রী) কথায় কথায় আমাকে বলেন, 'সত্যকুমার গুহঠাকুরতার স্ত্রী যোগমায়া গুহঠাকুরতা আশ্রমেই আছেন। তাঁর লিখা আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে রয়েছে; কাউকে কখন তিনি পড়তে দেন না।' গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে পরদিনই আমার গুরুভ্রাতা শ্রীরঞ্জিত মালাকারকে নিয়ে বেলা নটা নাগাদ আশ্রমে যাই। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ মৈত্র মহাশয়ের সংগে দেখা করে তাঁকে বলি, 'প্রভুর একখানা জীবনীগ্রন্থ লিখার চেষ্টা করছি। "শ্রীপুরুষোত্তমে গোস্বামীপ্রভুর দানলীলা" অধ্যায়টি প্রভুর শিষ্যেরা যাঁরা আশ্রমে আছেন তাঁদের পড়ে শোনাতে চাই।' চার-পাঁচজন একত্র হলেন। মৈত্র মহাশয়কে অনুরোধ করে বলি, 'এখানে সত্যকুমারবাবুর স্ত্রীকে ডেকে আনলে হয় না?' মৈত্র মহাশয় বলেন, 'তিনি চোখেও ভাল দেখেন না, কানেও ভাল শোনেন না।' তথাপি তিনি তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। তাঁর বয়স তখন প্রায় নব্বই। স্থূলকায়া, ঋজু দেহ, গৌরবর্ণা, শুভ্র কেশ, অপরূপ মুখশ্রী। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর চরণ ধূলি নেই। তারপর চেঁচিয়ে আমার বক্তব্য বলি। তিনি বলেন, 'গোসাঁইর কথা শুনতে কার না সাধ হয় কিন্তু আমি যে বাবা কানে ভাল শুনি না। তা গোসাঁইর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি শোনাতেও পারেন।' শুরু হল পাঠ। প্রায় এক ঘণ্টা লাগল। যোগমায়া দেবীই প্রথম বলে উঠেন, 'বাবা, ঠাকুরের কৃপায় সব শুনেছি। যা লিখেছ সবই সত্য যেন নিজের চোখে দেখে লিখেছ।' তাঁর কুটীর পর্যন্ত সংগে সংগে যাই। তারপর বলি, 'মা, শুনেছি আপনার লেখা একখানি আত্মজীবনী আছে। একবার দেখতে দেবেন কি? কত ঘটনা হয়ত এতে আছে যা অন্য গ্রন্থে

নেই!' তিনি বলেন, 'বাবা, আমি লেখাপড়া শিখি নি। আমার দুঃখের কাহিনী লিখে রেখেছি নিজের জন্য। তাছাড়া আমার হাতের লেখা ভাল না। তুমি পড়তে পারবে না। তবে তুমি যখন দেখতে চাও, আগামী দিন এস। আমি বের করে রাখব।' ঐদিনই শ্রীযুক্ত জগদানন্দ মৈত্র মহাশয় আশ্রমে প্রসাদ পেতে বলেছিলেন। যোগমায়া দেবীর সঙ্গে আমার কথাবার্তার মর্ম তাঁকে বলায় তিনি বলেন, 'আগামী দিনও আপনারা এখানে প্রসাদ পাবেন।' প্রভুর শিষ্য প্রখ্যাত স্বদেশ-কর্মী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র নিত্যরঞ্জনবাবু ও দেবরঞ্জনবাবু ঐ সময় সমাধি-আশ্রমে থাকতেন। তাঁরা উভয়েই গোসাঁইর শিষ্য। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবার লেখা মার "জীবন-চিত্র" পড়েছেন কি?' আমি বলি, 'গ্রন্থ দু-খণ্ড চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারি নি।' দুখানা বই আমার হাতে তাঁরা দিয়ে বলেন, 'এখনই দেখে নিন, আমরা নিত্য পাঠ করি।' ঘণ্টাখানেক চোখ বুলাতেই প্রসাদ পাবার আহ্বান আসে। বই ফিরিয়ে দেই।

পরদিন বেলা নটা নাগাদ আশ্রমে পৌঁছেই যোগমায়া দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি একখানা বাঁধান খাতা আমাকে দেন। কিন্তু প্রসাদ পাবার পূর্ব পর্যন্ত কয়েক পাতা পড়াও সম্ভব হয় না। ঐদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে আমাদের কলিকাতা ফেরার কথা। প্রসাদ পেয়ে খাতাখানা ফিরিয়ে দিতে গেলাম। তাঁকে বলি, 'পড়া হয়ে উঠল না; আজই আবার কলিকাতা ফিরে যাচ্ছি।' তিনি সস্নেহে বললেন, 'আমার হাতের লেখা খারাপ। পড়তে সময় লাগবে বই কি!' তারপর একটু থেমে বললেন, 'বাবা, খাতাখানা তুমি নিয়ে যাও। কবে যে গোসাঁই থেকে ডাক আসে! তুমি নিলে গোসাঁইর কাজেই লাগবে।' তাঁকে প্রণাম করে খাতাখানা হাতে নিয়ে নিত্যবাবুদের ঘরে যেতেই ওঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বৌদি কি খাতা আপনাকে দিয়ে দিলেন?' খাতাখানা ওঁদের দেখাই। ওঁরা উভয়েই তখন বলেন, 'আমরা বহু চেষ্টা করেও পূর্বে খাতাখানি দেখতে পাই নি। আর শুধু আমরা কেন, আর কেউ পান নি।' দুই ভাই চুপি চুপি কি পরামর্শ করেন, তারপর আমাকে বলেন, 'মার জীবনী-গ্রন্থ দুখণ্ডও নিয়ে যান, আপনার নোট নেওয়া হলে পাঠিয়ে দেবেন।' ছ-সাত মাস পরে বই দুখানা ওঁদের কাছে ফেরৎ পাঠাই। যোগমায়া দেবীর খাতাও কপি করে উদ্ধার করাই। মূল খাতাখানা তাঁর কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেই। আমার দুঃখ ওঁরা কেউ এখন দেহে নেই।

কলিকাতা ফেরার পর মহেশচন্দ্র দে সরকার-প্রণীত 'বিজয়-ভাগবত', প্রথম খণ্ড নামে একখানা গ্রন্থ এক ভক্ত কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাত থেকে কিনে এনে দেন। এতে বহু ঘটনার সমাবেশ। গ্রন্থ প্রকাশকের দিল্লীর ঠিকানায় গ্রন্থকারকে একখানা চিঠি লিখি। ছ-সাত মাস কেটে যায়। হঠাৎ একদিন সেই চিঠির উত্তর আসে। মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয় টিটাগড় থেকে লিখেন, 'আপনার চিঠিখানা নানা জায়গা ঘুরে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। আমার বয়স আশির উপর। বাইরে যাতায়াত সম্ভব নয়; রাত্রে আবার চোখে দেখি না। একদিন এখানে এলে খুশি হব। তখন কথাবার্তা হবে।'

পরের রবিবার যিনি বইখানা দিয়েছিলেন তাঁকে এবং আমার গুরুভ্রাতা শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মিত্রকে নিয়ে যাই টিটাগড়। বেলা তিনটায় তাঁর বাড়ী পৌঁছি। শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শীর্ণদেহ দীর্ঘকায় এক ঋষির যেন তপোবন। আমাদের সঙ্গে যেন কতকালের পরিচয়! তাঁর মুখে গোসাঁই-প্রসঙ্গ শুনলাম। কত আদর-

আপ্যায়ন। ফিরতে ফিরতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল। তাঁর নাতিকে দিয়ে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেবেন বললেন আর মধ্যে মধ্যে তাঁর ওখানে যেতে অনুরোধ জানালেন। তারপরও সাত-আট বছর দেহে ছিলেন। বেশ কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎও হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে প্রভুর জীবনের অনেক ঘটনা জেনেছি ও বহু তথ্য পেয়েছি। তিনিও এই গ্রন্থখানি দেখে যেতে পারেন নি বলে আমার দুঃখ রইল।

১৩২৪ সালে মনোহরপুকুর রোডে প্রভুর শিষ্য রায় বাহাদুর হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাগানবাড়ীতে গোস্বামীপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। তখন থেকে গোসাঁইর শিষ্য-প্রশিষ্যদের ওখানে কলিকাতার মিলন-স্থান। হেমেন্দ্রবাবুর দুই আত্মজ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় গোস্বামীপ্রভুর প্রসঙ্গ পেলে মেতে উঠেন। মহেন্দ্রবাবুর স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। গোসাঁইর অনেক শিষ্যদের সঙ্গে তাঁরা আন্তরিকভাবে মিশেছেন। মহেন্দ্রবাবুর কাছে অনেক নূতন কথা শুনেছি। আমার আবাল্যবন্ধু ও সতীর্থ শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বহুবার মনোহরপুকুরে গিয়ে আলোচনা করেছি। শ্যামসুন্দরের বর্তমান সেবায়েত প্রভুপাদ শান্তিসখা গোস্বামী মহাশয়কেও ওখানে অনেক দিন এই আলোচনায় পেয়েছি। মহেন্দ্রবাবুর ও প্রভুপাদ শান্তিসখা গোস্বামী মহাশয়ের পরিবেশিত তথ্যে গ্রন্থখানি বহু প্রামাণ্য ঘটনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। গোসাঁই তাঁদের মঙ্গল করুন।

প্রভু দেহে ছিলেন সাতান্ন বছর দশমাস তিন দিন (১২৪৮-১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। ১২৬৮ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে পান তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা। ১২৯০ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর কাছে যোগসাধন পেলেও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন ১২৯৩ সালে এবং ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠে যান আলাদা গৃহে ১২৯৪ সালে। সুতরাং বলা যেতে পারে, প্রভুর প্রথম উনিশ বছর কাটে শান্তিপুরের বারেন্দ্র-গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে, তারপর সাতাশ বছর ব্রাহ্মসমাজে। প্রথম উনিশ বছর—আদিপর্ব এবং পরবর্তী সাতাশ বছর মধ্যপর্বে তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অদ্ভুত তপস্যাপূত জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। ১২৯৪ থেকে ১৩০৬ অবধি দিব্যলীলার ঘটনাবলী গ্রন্থের অন্তপর্বে বর্ণিত হয়েছে।

প্রভুর জীবনী প্রণয়নের প্রচেষ্টা এক দুরূহ প্রয়াস। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ" প্রথম খণ্ডের নিবেদনে বলেছেন, 'ঠাকুরের সঙ্গে তের-চৌদ্দ বৎসর থাকিয়া তাঁহার যে সকল ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহার জীবন-চরিত লেখা বা সেই বিষয়ে চেষ্টা করাও নিতান্ত অসম্ভব মনে হয়। আমার সরল বিশ্বাস তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী হইতে পারে না। আমার ইহা পরিষ্কার ধারণা যে, ঠাকুরের জীবনে এমন কতকগুলি সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য এবং বোধগম্য ঘটনা নানাস্থানে নানা অবস্থায় সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচরে সংঘটিত হইয়াছে যে, তাহা তিনি তাঁহার নিত্যসঙ্গী-শিষ্যগণের নিকটেও প্রকাশ করিতে অবসর পান নাই; আবার কখনও কোনও ঘটনা কথাপ্রসঙ্গে অপরের নিকটও প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং, এ সকল জানিয়া শুনিয়া তাঁহার একখানি স্থূল-জীবনী প্রকাশ করিতে যাওয়া আমার পক্ষে কতদূর দুঃসাহসের কার্য, সকলেই বুঝিবেন। এ সকল কারণে আমার এ প্রকার পরিষ্কার ধারণা, ঠাকুরের কথা যতই লিখি না কেন, তাহা দ্বারা তাঁহার সম্যক পরিচয় প্রদান অসম্ভব।'

প্রভুর জীবনের ঘটনা যেটুকু জানা গিয়েছে, তাও ধারাবাহিকভাবে সাজান

কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। প্রধান অন্তরায় বহু ঘটনার তারিখ ও সময় সঠিক খুঁজে পাওয়া যায় নি। প্রভুর বিবাহের সন, মাস জানা থাকলেও তারিখটি অজ্ঞাত। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেও ভগবানকে লাভ করার জন্য নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, তা তিনি নিজেই বলেছেন। অথচ কখন কোন্ সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তার কোন সময়পঞ্জী নেই। এমন কি, ১২৯০ সালের ভাদ্র মাসের কোন্ তারিখে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিকট সাধন পেয়েছিলেন তারও উল্লেখ কোথাও নেই।

গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রভুর বাল্য ও পৌগণ্ডলীলা এবং রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম থেকে শুরু করে আদি সমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজের উৎপত্তি ও প্রণালীর কথা মোটামুটি বলা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য গ্রন্থকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রভুর জীবনের শেষ বার বছর অনন্য সাধারণ। অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটেছে প্রায় প্রতিদিন। এ-সব ঘটনা যা জানতে পেরেছি, সবই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। অলৌকিক বাদ দিলে লোকোত্তর পুরুষকে বুঝা যায় না। অলৌকিকে যিনি বিশ্বাস করেন না, তিনি অধ্যাত্মরাজ্য বিষয়ে অনধিকারী।

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় আমার কোন কৃতিত্ব নেই। যখন যে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ প্রয়োজন, তা অনুসন্ধানের পূর্বে আমার বিস্ময় উৎপন্ন করে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে ব্রজভাবসিদ্ধ শ্রীশ্রীময়ূরমুকুট বাবার শিষ্য শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ দত্তরায় মহাশয় একদিন আমার বাসস্থানে এসে তিনখানা বাঁধান পুস্তক দিয়ে বলেন, 'আপনার কাছে বইগুলি রেখে দিন। প্রভুর জীবনী লেখার সময় আপনার কাজে লাগবে।' বঙ্কুবিহারী কর-প্রণীত 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ' ও নবকুমার বাগচী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীবিজয়কথামৃত' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—এই তিনখানা পুস্তক তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, প্রভুর জীবনী-গ্রন্থ রচনায় যা আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। দত্তরায় মহাশয়ের নিকট আমি এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীমৎ কিরণচাঁদ দরবেশজীর সন্ন্যাসী-শিষ্য শ্রীমৎ প্রণবানন্দ সরস্বতী একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'মন্দির' পত্রিকার প্রথম চার বছরের সংখ্যাগুলি আমার আবাসস্থানে এনে দিয়ে যান। ওই সব থেকেও এই গ্রন্থে বহু ঘটনা উদ্ধৃত করেছি। স্বামীজীর নিকট তজ্জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এভাবে আরও বহু গ্রন্থ আমার কাছে এসেছে যা এই গ্রন্থ সম্পাদনে অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে সাহায্য করেছে। এক অদৃশ্য শক্তিই এ-সব ব্যবস্থা করেছেন তা আমি পদে পদে হৃদয়ঙ্গম করেছি।

কবি নবীন সেনের 'আমার জীবনী' ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'ও ঐভাবে আমার কাছে এসেছিল। গ্রন্থের পাদটীকায় মহর্ষির আত্মজীবনীর উল্লেখ করা হয়েছে শুধু 'আত্মজীবনী' বলে। মধ্যপর্বে লাহোর আনারকলি ব্রাহ্মসমাজের ঘটনাটির উল্লেখ পাদটীকায় ভুলে করা হয় নি। 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থে রাভি নদীতে আত্মবিসর্জনের প্রচেষ্টা উপলক্ষ করে ফকির সাহেবের উপদেশের উল্লেখ নেই। কিন্তু বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়-প্রণীত 'লাইফ অফ বিজয়কৃষ্ণ' গ্রন্থে রয়েছে, যা থেকে স্বভাবতই মনে হয় পাল মহাশয়ের গ্রন্থে বর্ণিত প্রসঙ্গই যুক্তিসঙ্গত।

আমার সহধর্মিণী মূলগ্রন্থ প্রণয়নের সময় পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে আমাকে

বিশেষ সাহায্য করেছেন। আমার আত্মজা অধ্যাপিকা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী চৌধুরী, এম.এ., পি-এইচ.ডি., আত্মজ শ্রীমান পিনাকী ও শ্রীমান পার্থসারথি এই গ্রন্থ-প্রকাশনে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এই গ্রন্থ সম্পাদনে আমার পুত্রবধূ শ্রীমতী সুনন্দা ও আত্মজা শ্রীমতী পদ্মার অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করে আমি নিজেই অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমার ছ-বছর বয়সের পৌত্র শ্রীমান রাজর্ষিও আমার কাছে প্রভুর গল্প শুনে জীবনীর জন্য অধীর হয়ে পড়েছে। ভগবান গোস্বামীপ্রভু তাদের কল্যাণ করুন।

ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালীন গোস্বামী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত তিনখানা চিঠি, শ্রীবৃন্দাবন থেকে লিখা মাঠাকরুণের দুখানা চিঠি ও এলাহাবাদ কুম্ভমেলা থেকে লেখা দাদা-গোসাঁইর একখানা চিঠি জনৈক ভক্তের নিকট থেকে ফটোগ্রাফ নেবার জন্য পেয়েছি। তিনি তাঁর নাম প্রকাশ করতে চান না। আমার অনুজসম শ্রীমান মানস চৌধুরী (রাসবিহারী এভিনিউতে অবস্থিত 'কলোরমা স্টুডিও'র স্বত্বাধিকারী) চিঠিগুলির আলোকচিত্র নিয়েছেন এবং ৭২/১, কলেজ স্ট্রীটস্থ ভারত ফটো টাইপ স্টুডিওর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অজিতমোহন গুপ্ত মহাশয়ের নিপুণ প্রচেষ্টায় তা গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। প্রভু তাঁদের মঙ্গল করুন। আমার গুরুভ্রাতা শ্রীঅন্নদাকুমার বিশ্বাস শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও প্রায় প্রত্যহই 'জিজ্ঞাসা'র কলেজ রো-র অফিস থেকে প্রুফ আদান-প্রদান ব্যাপারে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন, তাতে বড় সুবিধা হয়েছে। গোস্বামীপ্রভু তাঁদের সকলের উপর কৃপা করুন।

এই গ্রন্থ-প্রকাশনে 'জিজ্ঞাসা'র অবদানের কথা মনে করে আমি অভিভূত হয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা, কর্মকুশলতা ও সততা সকলের অনুকরণীয়। 'জিজ্ঞাসা'-গোষ্ঠী গ্রন্থখানাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গোস্বামীপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, দিন দিন 'জিজ্ঞাসা'র শ্রীবৃদ্ধি হউক। প্রভু যেন এই প্রতিষ্ঠানের সকলের কল্যাণ করেন!

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রীযুক্ত বাদল বসু মহাশয়ের অবদানও কম নয়। এই প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-সংকটের মধ্যেও যেভাবে তিনি এই গ্রন্থের মুদ্রণ সম্পন্ন করেছেন, তা তাঁর নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতাই প্রমাণ করেছে। আমি তাঁর কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ। প্রভুর চরণে প্রার্থনা, তিনি সকলের কল্যাণ করুন।

প্রচ্ছদপট আমার গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী মহাশয় স্বহস্তে এঁকে দিয়েছেন। তাঁর কথা আর কি বলব? এই গ্রন্থের মূলেই তিনি।

"গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্"।

বিনীত—
শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরী।

ঝুলন-পূর্ণিমা
২৯ শ্রাবণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।
১৭০/৩, লেক গার্ডেন্স, কলিকাতা-৪৫

মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবী

আদিপর্ব

শান্তিপুর বৈষ্ণবসমাজে
১২৪৮—১২৬৮ বঙ্গাব্দ
(১৮৪১—১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ)

LIBRARY
No.............
Shri Shri [illegible] [illegible]mayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

LIBRARY
No..........
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ, শ্রীমদ্‌ অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব-পূর্বকথা

বৈষ্ণব-সমাজের এক অবিস্মরণীয় নাম মাধবেন্দ্র পুরী। তিনি মাধবাচার্য সম্প্রদায়ের এক প্রধান পুরুষ। গোলোকের অপ্রাকৃত সম্পদ—প্রেমভক্তির বীজ তিনি মর্ত্যে বপন করেছেন। প্রেমের ঠাকুরের আকর্ষণে মাধবেন্দ্র হলেন ঘর-ছাড়া। শ্রীহট্টের অখ্যাত স্বগ্রাম পুনির্পাট ছেড়ে মাধবেন্দ্র যাত্রা করলেন অমৃতের সন্ধানে। কমলাক্ষ মিশ্র (ভবিষ্যৎ জীবনে শ্রীমদ্‌ অদ্বৈতাচার্য) তীর্থ-পর্যটনের সময় দাক্ষিণাত্যে মাধবাচার্য স্থানে উপনীত হলে তাঁকে দেখে পুরী-গোসাঁই মুগ্ধ হন. কমলাক্ষ লোকের ধর্মহীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি বলেন, 'পরব্রহ্মের আবির্ভাব ব্যতীত এর প্রতিকার সম্ভব নয়।' পুরী-মহারাজ কমলাক্ষকে 'অনন্ত-সংহিতা' দেখান। তাতে আছে, 'নন্দসুত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হবেন।' যাতে জগতে অচিরে তিনি আবির্ভূত হন, সেই চিন্তা ও চেষ্টার এক প্রবল প্রেরণা আসে কমলাক্ষের অন্তরে। কমলাক্ষ মিশ্র তীর্থ-পর্যটনান্তে শ্রীবৃন্দাবনে মদনগোপালের স্বপ্নাদেশে নিকুঞ্জবনে রক্ষিত বিশাখা-চিত্রিত মদনগোপালের সিদ্ধ-চিত্রপট নিয়ে শান্তিপুরে উপনীত হন এবং এই চিত্রপট বাসগৃহের দেওয়ালে টানিয়ে রাখেন।

অতঃপর মাধবেন্দ্র পুরী শান্তিপুরে এসে কমলাক্ষকে দীক্ষাপ্রদান করেন এবং রাধারানীর পট অঙ্কিত করিয়ে যুগলবিগ্রহ মদনগোপালের চিত্রপট তাঁকে সেবা-পূজার আদেশ করেন। কমলাক্ষ তাঁর সেবাপরাধের শঙ্কার কথা অকপটে গুরুর কাছে ব্যক্ত করেন। সদ্যদীক্ষিত শিষ্যের কথা শুনে মাধবেন্দ্র পুরী বলেন, 'তোমার চোদ্দ-পুরুষ অবধি প্রেমের ঠাকুর কোন অপরাধ নেবেন না।'[১] কমলাক্ষ তখন বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন, 'আশীর্বাদ করুন, তারপর যেন নির্বংশ হই।' শিষ্যের অচিন্ত্য ভাগবত প্রেম ও আন্তরিকতায় অতিশয় প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে, পুরী-গোসাঁই তাঁকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর প্রতি পরম অনুকম্পা প্রকাশ করেন।[২]

অদ্বৈতপ্রভুর পৌত্র (বলরাম পুত্র) দেবকীনন্দন শ্যামসুন্দরের যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রভু পৌত্রের এই প্রতিষ্ঠা-উৎসবে নিজে পৌরোহিত্য করেন।

অদ্বৈতাচার্যের পিতা কুবের আচার্য এবং মাতা লাভা দেবী। অদ্বৈতের জন্ম হয় মাঘী শুক্লা-সপ্তমীতে ৮৪১ বঙ্গাব্দে (১৪৩৫ খ্রী অঃ)। কুবের আচার্য মহাশয় নৃসিংহ মিশ্র ওরফে নরসিংহ নাড়িয়ালের প্রপৌত্র। নৃসিংহ মিশ্র বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যের পুত্র। দক্ষিণ ভারতে বিজাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যানগরের প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য স্বামী সায়নাচার্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দক্ষিণ ভারত থেকে পূর্বাঞ্চলে এসে নৃসিংহ মিশ্র শ্রীহট্ট জিলার সুনামগঞ্জ মহকুমার ছয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত লাউড়ের 'নবগ্রামে' বসবাস করেন।

কুবের আচার্য লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। সেদিন ছিল দীপান্বিতা, রাজবাড়ীতে বিরাট উৎসব। দেশের ভদ্র-নীচ, ধনী-নির্ধন এসে

---

[১] ঈশান নাগর-প্রণীত 'অদ্বৈতপ্রকাশ', ২য় সং, পৃ ২৯, ৩১-৩২, ৪৩-৪৫।

[২] প্রভুপাদ শান্তিসখা গোস্বামী মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত।

সমবেত হয়েছে পূজা-মণ্ডপে—নানাপ্রকার নৃত্য-গীত-বাদ্যে উৎসবস্থল মুখর। কমলাক্ষ এসে বসলেন আসরে, কিন্তু কালী-প্রতিমাকে প্রণাম করলেন না। রাজা দিব্যসিংহ এতে ব্যথিত ও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কমলাক্ষ, এ তোমার কেমন ব্যবহার!' কমলাক্ষ তখন উত্তর দিলেন, 'পরব্রহ্ম আমার সাধ্য, আর কেউ নন।'

চিত্ত একনিষ্ঠ না হলে, নানাভাব মনকে আশ্রয় করলে মন বিক্ষিপ্ত হয়, সিদ্ধিলাভে বিঘ্ন ঘটে। তাই তাঁর উপাস্য ব্রহ্মৈব্য কেবলম্। কমলাক্ষের অন্তরে আর একটি নিগূঢ় কারণও ছিল, যেজন্য তিনি প্রতিমাকে প্রণাম করেন নি। তিনি ছিলেন সদাশিবের অবতার। এই আত্মতত্ত্ব তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। শাস্ত্রবিহিত যোগ্য অধিকারীর পূজায় প্রতিমা এখন আর মৃন্ময়ী নন, চিন্ময়ী। দেবী কখনও সদাশিবের প্রণাম নেবেন না। দেবী যদি অন্তর্ধান হন, পূজা অসমাপ্ত থাকবে; এতে রাজা ও রাজ্যের হবে অমঙ্গল। কিন্তু পিতা কুবের আচার্য যখন রাজপক্ষ অবলম্বন করে আদ্যাশক্তির মহিমা কীর্তন করে তাঁকে ঐ মূর্তি প্রণাম করতে বললেন, তখন সর্বারাধ্য মহাগুরু পিতার মর্যাদা রক্ষার্থে দেবীকে তিনি প্রণাম করলেন। সেই সময়ে ঘটল অতি আশ্চর্য এক অঘটন, হঠাৎ প্রতিমার অঙ্গ গেল ফেটে—তা থেকে অবিশ্রান্ত রুধিরস্রাব হতে লাগল। প্রতিমা চৈতন্যময়ী, কেমন রে তাঁর প্রভুর প্রণাম তিনি নেবেন, তিনি অন্তর্হিতা হলেন। এই দৃশ্য দেখে রাজা, কুবের আচার্য, মন্ত্রীবর্গ এবং উপস্থিত সকলেই স্তব্ধ, বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। এর কয়েকদিন পরে লাউড় আক্রান্ত হল—ধ্বংস হল রাজপ্রাসাদ, রাজ্য, হল প্রচুর রক্তপাত। রাজা দিব্যসিংহ, কুবের আচার্য, কমলাক্ষ ও আরো অনেকে চলে গেলেন সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পীঠ—নদীয়ার শান্তিপুরে। কমলাক্ষের তখন বয়স বারো।

বাঙলা তখন অরাজকতায়, উচ্ছৃঙ্খলতায় ও ধর্মের ব্যভিচারে উৎপীড়িত। অদ্বৈতাচার্য দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য ভগবানকে পৃথিবীতে অবতরণ করানর সাধনায় রত হন। অদ্বৈতাচার্যের বয়স যখন বায়ান্ন তাঁরই হুঙ্কারে ভগবান প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ৮৯৩ বঙ্গাব্দে (১৪৮৭ খ্রীঃ অঃ) নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হন। সেদিন ছিল দোলপূর্ণিমা: ২৩ ফাল্গুন, শনিবার উনতিরিশ দণ্ড সন্ধ্যা সময়ে সিংহলগ্নে হয় তাঁর উদয়। কিছুক্ষণ পরে রাত আট দণ্ডে আরম্ভ হয় চন্দ্রগ্রহণ। হরিনাম গানে, কীর্তনে মুখর হয়ে উঠে শ্রীধাম নবদ্বীপ। প্রেমের দেবতার পুণ্য আবির্ভাবে নদীয়া-শান্তিপুর কীর্তনে, প্রেমে ডুবু-ডুবু। সেই তরঙ্গে সর্বদিক প্লাবিত। আনন্দের হাট ভক্তদের ঘরে-ঘরে।

এত তপস্যা করে চোখের জল ফেলে অদ্বৈতাচার্য যাঁকে আনলেন মর্ত্যের আঙিনায়, সেই প্রাণের দেবতা মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক নবদ্বীপ ত্যাগ করে চললেন শ্রীবৃন্দাবন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে। কিন্তু সেখানে তিনি রইলেন মাত্র দশ দিন। সকলের আকুল অনুনয় ও অশ্রুজল উপেক্ষা করে প্রেমের ঠাকুর এবার চললেন নীলাচলের পথে। বিরহীচিন্তায় ক্লিষ্ট ও ক্ষুব্ধ অদ্বৈতপ্রভু তখন মহাপ্রভুকে দিলেন অভিসম্পাত, 'তুমি সন্ন্যাস নিলে কি হবে? তোমার আশা পূর্ণ হবে না, তোমার আসা সফল হবে না। এবার তোমার কার্য শেষ হবে না। আবার আসতে হবে তোমাকে। দশ দিন তুমি আমাদের ঘরে ছিলে; এই স্মৃতি ও আনন্দ নিয়ে দশ জন্ম পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকব। কিন্তু আমার দশম পুরুষে আবার তোমাকে জন্ম নিতে হবে।'

'মোর বংশে পুনরায় জন্মিতে রহল দায়
এবাহি না হবে কার্যশেষ।
না পুরিবে মন আশা, সফল হবে না আসা
হোক না হে সন্ন্যাসীর বেশ।
দশদিন মোর ঘরে কাটাইয়া এহিবারে
দশজন্ম ইথে হবে বাঁচা,
দশম পুরুষে মোর জনমিতে হবে তোর
সত্য সত্য এহি বাক্য সাঁচা॥'

—অদ্বৈত-অভিশাপ

অদ্বৈতাচার্যের তিরোধানের পর তাঁর বংশাবতংসেরা শান্তিপুরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েন। আচার্যপৌত্র দেবকীনন্দন থেকে যান পৈতৃক ভদ্রাসনে। শ্রীমন্দির-সংলগ্ন বাস্তুভিটার চারপাশে ছিল আতাবন,—যার থেকে নাম হয় "আতাবুনিয়া গোঁসাই"।

ব্রতনিষ্ঠ ভাগবত প্রভুপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামী ওরফে আনন্দচন্দ্র গোস্বামী অদ্বৈত প্রভুর অধস্তন নবম পুরুষ—উন্নত উজ্জ্বল প্রেম-ভক্তির জীবন-বিগ্রহ। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর ভক্তিশাস্ত্রে। শাস্ত্রের জটিল বিষয়ের সমাধান এমন প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি করতেন যে নিতান্ত নিরক্ষরও তাঁর ব্যাখ্যা সম্যক অনুধাবন করতে পারত। কত সাধারণ মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে ধন্য হয়েছে। একবার নাটোরাধিপতির সভায় তাঁর ভৃত্য মাধবদাস, পণ্ডিতসমাজের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। আনন্দকিশোর শ্রীমদ্‌ ভাগবত পাঠের জন্য নাটোর গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতির সময় শ্রবণাদ্বাদশীর বিচার নিয়ে পণ্ডিতসভায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়। মাধবদাস তখন উঠে সবিনয়ে এই বিষয়ে তাঁর কর্তা প্রভু আনন্দকিশোরের সিদ্ধান্তটি নিবেদন করেন। সিদ্ধান্ত শুনে পণ্ডিতসমাজ সন্তুষ্ট হন। বিতর্কের হয় অবসান। কিছুক্ষণ পরে আনন্দকিশোর এসে যা বিধান দেন, তা মাধবদাসের উক্তির সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে যায়। এতে নাটোরের মহারাজা খুশি হয়ে তাঁর গায়ের শালখানা মাধবদাসকে পরিয়ে দেন।

ভক্তিগ্রন্থ পাঠের সময় আনন্দকিশোরের অঙ্গে প্রকাশ পেত অষ্টসাত্ত্বিক বিকার। প্রেমাশ্রুধারায় গণ্ড ভেসে গ্রন্থ হত সিক্ত। কখনও রোমকূপ থেকে উদ্গত শোণিত-বিন্দুতে উত্তরীয় হয়ে উঠত রাঙা। কখনও বা হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন—'রাধাশ্যাম', 'রাধাপ্যারী', 'গৌরহরি' ইত্যাদি বলে। আচার্য হয়ে তিনি ঘরে ঘরে ঘুরেছেন। কিন্তু কোনও দুঃখে, কোনও অভাবে তিনি কখনও অযাচকবৃত্তি ত্যাগ করেন নি। শ্রদ্ধাভরে স্বেচ্ছায় যিনি যা দিতেন—সাদরে তা গ্রহণ করতেন। আর নিঃসম্বল শিষ্যদের হাতে তুলে দিতেন যখন যা সম্ভব। অন্ধ-আতুর দীনদুঃখী কেউ হত না বিমুখ। বিষয়-আশয়ের ভাবনা-চিন্তা তাঁকে স্পর্শ করত না। তিনি তরুর মত সহিষ্ণু হয়ে সুখে-দুঃখে ঈশ্বরে নির্ভর করে থাকতেন। শান্তিপুর-বাসীরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ঋষি গোঁসাই'। যখন যেখানে যেতেন তাঁর গলায় একটি ঝোলায় থাকতেন "দামোদর"—শালগ্রামশিলা। আজও শ্যামসুন্দরের সঙ্গে সেই শালগ্রামের হয় নিত্যপূজা।

আনন্দকিশোরের মধ্যে ছিল সর্বত্যাগী যোগীজনদুর্লভ যোগৈশ্বর্য। একবার তিনি ময়মনসিংহ 'শালিয়া' গ্রামে গেছেন শিষ্য দামোদর ঘোষের গৃহে। জন্মাষ্টমীর

পারণের দিন প্রভুর প্রসাদ পাবেন বলে ঐ গ্রামেরই শতাধিক শিষ্য অনাহূত এসে হাজির হন। গৃহস্বামী ব্যস্ত হয়ে রান্না চড়াবার ব্যবস্থা করতে যান। আনন্দকিশোর তাঁকে নিবৃত্ত করে বলেন, 'ব্যস্ত হয়ো না। ভোগ যা লেগেছে তাতেই শ্যামসুন্দর ব্যবস্থা করবেন।' শিষ্যের মনের সংশয় কাটে না; বলেন, 'এতে তো "কর-প্রসাদ"ই হবে না! জ্ঞাতিদের কাছে কি শেষে নাজেহাল হতে হবে?'—আনন্দকিশোর চুপ করে থাকেন। তাঁর নির্দেশে প্রসাদবিতরণ হয়; সকলে আকণ্ঠ ভোজন করে ওঠেন। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু প্রসাদ উদ্বৃত্ত থেকে যায়।

আর একবার ময়মনসিংহের কলাবাঁধা গ্রামে দোলপূর্ণিমার দিন শিষ্যগৃহে আনন্দকিশোর ভাগবত পাঠে তন্ময়। জনৈক ভক্ত এসে খানিকটা আবির তাঁর সামনে রেখে প্রণাম করে বলেন, 'কৃপা করে এই আবিরটুকু শ্রীমূর্তিকে দিলে বড়ো আনন্দ পাব।' তখনও আবির পড়ে নি ভগবানের শ্রীঅঙ্গে। আনন্দকিশোর সবটা আবিরই ছিটিয়ে দেন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের উপর। ভক্তটির মুখ কাল হয়ে যায়। প্রভুর চোখ এড়ায় না। তিনি তাঁকে ইসারা করেন বিগ্রহকে গিয়ে প্রণাম করতে। বিমুগ্ধচিত্তে ভক্তটি দেখেন বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে তাঁরই দেওয়া আবির শোভা পাচ্ছে।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে আনন্দকিশোর অনুদয়ে করতেন গঙ্গা স্নান। সারাদিন কেটে যায় তাঁর পূজা-পাঠে, ধ্যান-জপে। তিনি ছিলেন শুচিতার জীবন্ত মূর্তি; এমন কি মূত্রত্যাগের পরেও করতেন অবগাহন স্নান। ভোগরান্নার লাকড়ি পর্যন্ত ধুয়ে নিতেন গঙ্গাজলে। লোকে তাঁকে আদর করে বলত—'খড়ি-ধোয়া গোঁসাই।' তাঁর চলার পথে গোবরছিটা দিতে হত পূর্ব থেকে। একাহারী ছিলেন তিনি। সন্ধ্যার পূর্বে জননীর চরণামৃত পান করতেন, যতদিন তাঁর মা জীবিত ছিলেন।

আনন্দকিশোর নিজের হাতে করতেন ভোগ রান্না। শ্রীমন্দির থেকে তিনি শ্রীমতীকে নিয়ে আসেন প্রথম পাকশালে,—তারপর শ্যামসুন্দরকে। ভোগ প্রদানকালে শ্রীমতীকে শ্যামসুন্দরের ডানপাশে বসান—শ্রীমতী যেন ভোগ পরিবেশন করবেন এমনি ভাব। আনন্দকিশোর ওখানে করেন ভোগ নিবেদন। যথাসময়ে যুগল বিগ্রহকে রেখে আসেন বেদীর আসনে। আজ অবধি শ্যামসুন্দরের ভোগের এই রীতি।[১] প্রভুপাদ আনন্দকিশোর দারপরিগ্রহ করেছিলেন তিনবার। দ্বিতীয়বার নিঃসন্তান মৃতদার হয়ে বলেন, 'আর নয়—এ তো উদ্‌বাহ নয়, যেন উদ্বন্ধন।' বয়সও তখন তাঁর পঞ্চাশের উপর কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় অন্য প্রকার।

বয়োজ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাতপুত্র নিঃসন্তান প্রভুপাদ গোপীমাধব গোস্বামী শরীর রসস্থ বোধ করায় পূর্ব দিন অন্নাহার করেন নাই। ঐ দিন আহারে বসবেন এমন সময় কবিরাজ গৌর সেন মহাশয় এসে তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে বলেন—'ভাল দেখছি না, অবিলম্বে ওঁকে তীরস্থ করুন।' পরিবারের সব যেন আকাশ থেকে পড়লেন! এ কি করে সম্ভব? গৌর সেনের কথা তো ঠেলে ফেলা যায় না। জীবনমৃত্যু নিয়ে তো তিনি পরিহাস করতে পারেন না! তখনই গঙ্গাযাত্রার আয়োজন হল। দোলা এল—বাহক এল। কীর্তনীয়ারা এলেন খোল-করতাল নিয়ে। প্রভুপাদ গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয় মহাযাত্রার পূর্বে শশা খেতে খেতে দোলায় উঠে বসেন। অন্তর্জলির জন্য তিনি চলেছেন গঙ্গায়। পূর্ণ জ্ঞান, আসন্ন মৃত্যুর

---

[১] প্রভুপাদ শ্রীশান্তিসখা গোস্বামী-প্রমুখাৎ শ্রুত।

কোনও লক্ষণই নেই। পথে তাঁর নির্দেশে কৃষ্ণময় ময়রার দোকানের সামনে দোলা নামান হয়। তিনি পরিতৃপ্তির সঙ্গে পেটভরে রসগোল্লা খেলেন। বাহকেরা গঙ্গাপথে ফের চলতে শুরু করলে পথচারীরা রঙ্গ করে মন্তব্য করেন, 'প্রভু যেন বিবাহবাসরে চলেছেন'। অন্যান্য জ্ঞাতিদের সঙ্গে প্রভুপাদ আনন্দকিশোরও জাহ্নবীতীরে চলেছেন। গোপীমাধব গঙ্গাতীরে পৌঁছে তাকে অনুনয় করে বলেন, 'ঋষি ভাইটি আমার, তুই আবার বিয়ে করিস। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এবার তোর দুটি ছেলে হবে। ছোটটিকে দত্তক দিস আমার সহধর্মিণী কৃষ্ণমণিকে।'

গঙ্গাতীরে ঘটা করে অন্তর্জলি করতে এসেছেন মাধব গোস্বামী। কোনও দুশ্চিন্তা নেই, দুর্ভাবনা বিষাদ নেই—যেন নদীর এপার থেকে ওপারে যাত্রা করছেন মাত্র। দূর হয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টির মোহাবরণ।

মৃত্যুপথযাত্রী বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সনির্বন্ধ অনুরোধ ও আকুতি! কী করেন—আনন্দকিশোর! সম্মতি দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই (১২৪৩ সালের শেষ ভাগে) দেহরক্ষা করলেন গোপীমাধব গোস্বামী। কিছুদিন পর এক পুণ্যলগ্নে শিকারপুর-সংলগ্ন দহকুল গ্রামের গৌরীপ্রসাদ বাগচি জোয়ারদারের কন্যা স্বর্ণময়ীর সঙ্গে আনন্দকিশোরের বিবাহের কথাবার্তা পাকা হয়। অনুমান ১২৪৪ সালের বৈশাখে তিনি তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন।

স্বতন্ত্র ছাঁচে গড়া বধূ এলেন গোঁসাই-পরিবারে। অনন্যসাধারণ ভক্তি ও প্রেম; আপনপর ভেদ নেই; সুখ-দুঃখে নির্বিকার। সর্বজীবে দয়া আর শিষ্টমধুর ব্যবহার। আশ্চর্য চারিত্রিক মাধুর্য তিনি এনেছিলেন যেন অঙ্গীকার করে। সম্ভ্রান্ত বংশের দুহিতা। পিতৃকুলের সম্ভ্রম ও ভাগবত পতির গৌরব সম্বন্ধে সর্বদা ছিলেন সজাগ। পিতৃগৃহের সচ্ছলতা ছিল না পতিগৃহে। তা হোক, তথাপি লোকের মুখে হাসি ফোটাতে তিনি সদা-সচেষ্ট, অপরের সৌভাগ্যে হৃষ্টস্বভাব,—সর্বভূতে দয়া-দাক্ষিণ্যময়ী। দীনদুঃখীর প্রতি তাঁর করুণা ও আতিথেয়তা পৌরাণিক যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর চরিত্র ছিল অভিনব। স্বপাক রান্নার অবসানে তিনজন বিষয়বিরক্ত বৈষ্ণব রামদাস, কৃষ্ণদাস ও মাধবদাসের প্রসাদ পাওয়ার পর আনন্দকিশোর পথে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন অভুক্ত কেউ আছেন কিনা,—পরে নিজে প্রসাদ পেতেন। অন্নদানে স্বর্ণময়ীও ছিলেন অকৃপণ। কোন সঙ্কীর্ণতা, বিষয়বুদ্ধি তাঁর অন্তরকে কখনও সংকুচিত করতে পারে নি। শান্তিপুরের মতিগঞ্জবাজারে যে সব দুঃখিনী তাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে শাকসব্জী বেচতে নিয়ে যেত—স্বর্ণময়ী তাদের ফেরার পথে সমাদর করে প্রায়ই ডেকে এনে দিতেন শ্যামসুন্দরের ভোগের প্রসাদ। তাঁদের দুঃখের কথা শুনে সমবেদনায় তিনি কেঁদে ফেলতেন। যার যা অভাব, তিনি যথাসাধ্য পূরণ করার চেষ্টা করতেন; যদিও আটদশজনের অতিরিক্ত রান্না তিনি রোজই করেন—এক একদিন তা-ও এভাবে সব শেষ হয়ে যায়। ঘরে কিছু থাকে না। নিজেকে তখন অনাহারে কাটাতে হয়। তিনি বলতেন, 'যারা শুধু নিজের উদর পূরণের ব্যবস্থা করে—শিয়াল কুকুরের সঙ্গে তাদের কী তফাৎ!' কখনও কখনও তিনি স্বভাব-কৃপণদের আমন্ত্রণ করে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাতেন। তিনি বলতেন, 'আহা! ওরা কৃপার পাত্র, নিজেদের যথেষ্ট থাকতেও মহাপ্রাণকে কষ্ট দেয়।'

ভোগনিবেদনের পর স্বর্ণময়ী পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গকেও আহার দিতেন, পিঁপড়ের জন্য ছড়িয়ে দিতেন ভাত। অশরীরী আত্মার উদ্দেশ্যে ওদের তৃপ্তি ও

মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতেন প্রসাদান্ন। পরিচারিকার পুত্রকেও অপত্যস্নেহে তিনি সমদৃষ্টিতে পরিচর্যা করতেন। ছেলেটির নাম ছিল রামলাল—জাতিতে তন্তুবায়। স্বর্ণময়ী দেবী তাকেও আপন ছেলেদের মত করে একখানা পিঁড়ে, একখানা থালা, একটি গ্লাস ও একটি ঘটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। দাসীপুত্র বলে কেউ কখনও তাকে অবজ্ঞা করলে তিনি বেদনাতুর হয়ে বলতেন, 'আহা! সকলেই কৃষ্ণের জীব।'

একদিন আপন ছেলেদের সঙ্গে একসারিতে রামলালকে খেতে দেন দেখে তাঁর মা সভয়ে স্বর্ণময়ীকে বলেন, 'মা, প্রভু-সন্তানদের সঙ্গে ওকে একই পংক্তিতে খেতে দিয়েছেন—লোকে আমাকে যা-তা বলবে।' তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন, 'তুই কি আমার ছেলেদের সর্বনাশ করবি?' সর্বাবস্থায় অম্লান ছিল তাঁর সমদৃষ্টি।

একবার এক লাকড়ি-বিক্রেতার সঙ্গে ছেলেকে দরাদরি করতে দেখে তিনি বলেন, 'গরীব লোককে দু'চার আনা পয়সা কম দিয়ে তোরা কি বড়লোক হবি? ও যা চায়, তা-ই দে। ওদের কিছু বেশী দিতে হয়—নইলে পরিবার পাল্‌বে কি করে?'

স্বর্ণময়ী দেবী নিজে কখনও দরাদরি করতেন না। যে যা মূল্য চাইত অনেক সময় তার চেয়ে অতিরিক্তও দিতেন। প্রকৃত দরদী মন অন্যের অভাব বুঝতে পারে। দয়ার সংস্পর্শ অভাবীদের জীবনকে ধুয়ে করেছে সুন্দর। নগদ টাকা-কড়ি হাতে না থাকলে প্রয়োজনীয় ঘটি, বাটি, থালি বিলিয়ে দিতে তিনি দ্বিধা করতেন না। ভাসুর-পুত্র হরিমোহনের জন্ম হলে ধোপা, নাপিত, বাদককে শাড়ী, ধুতি, বাসন—হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই দিয়ে বিদায় করেন। পরে নিজেদের ব্যবহারের জন্য বাজার থেকে ওসব কিনে আনতে হয়েছে আবার।

এইভাবে দান করা সত্ত্বেও অযাচক আনন্দকিশোরের সংসারে কখনও অভাব-বোধ ছিল না। ভক্তের সংসার ভগবান চালান। পিত্রালয়ে গিয়ে একবার স্বর্ণময়ী দেবী শুনতে পান—অসচ্ছল সংসারে একমাত্র উপার্জনশীল রামচন্দ্র ভাদুড়ীর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের বড় অর্থকষ্ট। তিনি নিজে তাঁর গৃহে গিয়ে অর্থ সাহায্য করেন এবং প্রতি মাসে দু'টাকা করে পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এবং সেই থেকে প্রতি মাসে দু'টাকা করে দিয়ে যান। দু'টাকার তখন অনেক মূল্য ছিল, একালের হিসাবে প্রায় একশত টাকা। ছোট গৃহস্থ পরিবারের এতে শাকান্নের ব্যবস্থা হত। স্বর্ণময়ী দেবী পরে এই পরিবার প্রতিপালনের বিকল্প ব্যবস্থা করে দেন।

শান্তিপুরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায় এক উন্মাদিনী। ছেলেরা তার পেছন নেয় জানতে পেরে স্বর্ণময়ী নিয়ে আসেন তাঁকে গোঁসাইবাড়ী, নিজের হাতে তার মাথায় মাখিয়ে দেন কুশভরে তেল, কলসীর জল ঢেলে তাকে করান স্নান। অভাগিনীর বহুদিনের জ্বালা জুড়ায়; সুস্থ হয়ে সে বলে, 'তুমি আমায় জুড়িয়ে দিলে, মা। এমনটিতো আর কেউ করে নি।' ছেলের শোকে তার মাথা খারাপ হয়েছিল; স্বর্ণময়ী ওকে সস্নেহে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'ছেলে কি তোর? ভগবান তাঁর জিনিস তোর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। তাঁর বস্তু তিনি ফিরিয়ে নিয়েছেন।' সুস্থ হবার পর স্বর্ণময়ী মেয়েটিকে তার বাড়ী পাঠিয়ে দেন।

স্বর্ণময়ী দেবীর হৃদয় ছিল আকাশের মত উদার। এক শীতের সন্ধ্যায় তিনি গিয়েছিলেন কালীঘাট—কালী দর্শনে। চোখে পড়ে একটি যুবতী মেয়ে খোলার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে। কালী দর্শন করে ফেরার সময়ও তাকে ঐ

অবস্থায় দেখে তিনি মেয়েটির হাতে তুলে দেন—যা তাঁর কাছে ছিল। সস্নেহে তিনি বলেন, 'বাছা আর দাঁড়িয়ো না। ঘরে গিয়ে শোও।' পরে নাতি জগদ্বন্ধু গোস্বামীর কথায় খেয়াল হল যে শান্তিপুরে ফিরে যাবার রেল ভাড়া পর্যন্ত হাতে নেই! নাতি শুধায়, 'ঠাকুরমা, এখন বাড়ী ফিরি কি করে?' স্বর্ণময়ী দেবী বললেন, 'না যেতে পারিস, যাবি না! ভেবে কি হবে? মানুষের নিশ্বাসের স্থিরতা নেই; এই আছি, এই নেই।' জগদ্বন্ধু গোঁসাই তখন ধার করে পাথেয়ের ব্যবস্থা করেন।

অগ্নিদাহের ফলে এক কুলত্যাগিনী যুবতী হয় গৃহহারা। স্বর্ণময়ীর প্রাণ কেঁদে ওঠে। আপন গৃহে তাকে তিনি আশ্রয় দেন—দীক্ষা দেন।

বিদ্যাশক্তি স্বর্ণময়ী দেবীর অন্তর ছিল স্নেহরসসিঞ্চিত। তাঁর পক্ষপাতশূন্য সন্তান-বাৎসল্য, পবিত্র পরসেবা তাঁর হৃদয়দুয়ার দিয়েছিল খুলে, তাঁর আত্মায় অবতরণ করেছিল অপ্রাকৃত বিভূতি—দূরশ্রুতি, অন্তর্দৃষ্টি, শুভাশুভ জ্ঞান। বিদেশে আঘাত পেয়ে বা রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছেলে 'মা' বলে ডাকলে সুদূর শান্তিপুরে বসেও তিনি তা শুনতে পেতেন। অপরের মনের কথাও তিনি বুঝতে পারতেন। ইন্দ্রিয়াতীত অনেক ঘটনা প্রকাশ পেত তাঁর কাছে। ছোট ছেলেকে তিনি শ্রীক্ষেত্রে যেতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন, ছেলে পুরী গেলে আর ফিরবে না। তাঁর জীবিতকালে ছেলে তাই শ্রীক্ষেত্রে যান নি।

স্বর্ণময়ী দেবীর কথাবার্তা কখন বা অসংলগ্নবোধ হত। আবার এক-একবার তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেত উন্মাদের লক্ষণ। স্বর্ণময়ী দেবীর পিতা গৌরীপ্রসাদের বহুদিন সন্তান-সন্ততি হয় নি। এক পীর তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে বলেন, 'তোর ছেলেপিলে হবে, কিন্তু পয়লাটি আমাকে দিতে হবে—রাজী?' বাৎসল্য কী তা তাঁর জানা নেই। ভাবেন—হোক আগে ছেলেমেয়ে। মাসে মাসে অর্থ দিলেই হবে। ছেলেপিলে দিয়ে ফকির সাহেব কী করবেন। স্বর্ণময়ী প্রথম সন্তান—বেণীপ্রসাদ দ্বিতীয়।

স্বর্ণময়ীর জন্মের পর ফকিরের সঙ্গে দেখা করে ওই সংবাদ জানিয়ে বলেন তিনি, 'বাবা, মেয়েকে ভিক্ষা দিন। মাসে মাসে আপনাকে মাসহারা দেব—যদি দয়া করে ফরমাস করেন।' সম্মত হয়ে ফকির বলেন, 'তাই দিস, কথার খেলাপ করিস না।'

গৌরীপ্রসাদের অবস্থা-বিপর্যয়ে ফকিরের মাসহারা বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে স্বর্ণময়ীর উপর ভর হতো সেই সিদ্ধ ফকিরের। ফকিরের আবেশ হলে তাঁর শান্ত-শিষ্ট স্বভাব উগ্র হয়ে উঠত। আচার-ব্যবহার-চালচলনে তখন তিনি যেন আর এক মানুষ। এক অবোধ্য ভাষায় বিড় বিড় করে কী বলেন বোঝা যায় না। চলাফেরা একেবারে উন্মাদবৎ। একবার এ অবস্থায় কাঠুরিয়ারা তাঁকে দেখতে পায় বনগ্রামের পাশে এক গভীর অরণ্যে, সুপ্ত শার্দুলের গায়ে হেলান দিয়ে বসে তাকে আদর করছেন নির্ভয়ে—যেন মহামহেশ্বরী।

পরিণয়ের দু-তিন মাসের মধ্যেই স্বর্ণময়ী হন সন্তানসম্ভবা। ১২৪৪ সালের চৈত্র মাসে আনন্দকিশোর গোস্বামী ও স্বর্ণময়ী দেবীর প্রথম পুত্র ব্রজগোপালের জন্ম হয়। সূতিকা-ষষ্ঠী পূজার দিন স্নানের ঘাট থেকে ফিরে এসে স্বর্ণময়ী একেবারে ঘোর উন্মাদ। হরিষে বিষাদ! আনন্দকিশোর শ্যামসুন্দরকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে বলেন, 'ঠাকুর তোমার লীলা বোঝা ভার!'

উন্মাদ সহধর্মিণী ও নবজাত শিশুকে নিয়ে কী সে বিড়ম্বনা! আনন্দকিশোর

সঙ্কল্প করেছিলেন মনে মনে, ব্রজগোপালের জন্মের পর অন্নপ্রাশন সমাধা করে জগন্নাথ দর্শনে শ্রীক্ষেত্রে যাবেন। একি দৈবের পরিহাস। একমাস দু'মাস করে ছ'-মাস কাটে। কার্তিক মাসে স্বর্ণময়ী দেবী প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হয়ে ওঠেন। ধুমধাম করে হয় ব্রজগোপালের অন্নপ্রাশন। স্বর্ণময়ী দেবীর অনুমতি নিয়ে ১২৪৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আনন্দকিশোর শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করেন—শুভদিন দেখে। ব্রজগোপালের বয়স তখন আট মাস।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব ও শৈশবের কথা

কণ্ঠে 'দামোদর' শালগ্রাম শিলা; শান্তিপুর থেকে দণ্ডি দিতে দিতে চলেছেন আনন্দকিশোর—সঙ্গে পিসি ও পরিচারক। একের হাতে গঙ্গাজল পাত্র; অপরের পিঠে ক'খানা কম্বল, একান্ত প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র ও তৈজসপত্র, হাতে গোবর-জলের ঘটি—ছিটিয়ে চলে আগে আগে 'দণ্ডি' দেবার পথ ধরে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি সাষ্টাঙ্গ দিয়ে চলেন নিষ্ঠাবান ভাগবত প্রভুপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামী। মাথার উপর রোদ—পরিশ্রান্ত হলে, গাছের ছায়া পেলে বিশ্রাম করেন। আঁধার হবার পূর্বে ব্রাহ্মণগৃহে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হয়। প্রভুপাদ শ্যামসুন্দরের উদ্দেশ্যে স্বপাক ভোগ নিবেদন করে তিনজনই প্রসাদ পান। হেমন্ত, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ একে একে ঘুরে আসে। আনন্দকিশোরের মনোবল যেন দিন দিন বেড়ে যায়। বন্ধুর পথ—সর্বাঙ্গ হয় ক্ষত-বিক্ষত; বুকে ঘা হয়ে যায়, পিসি কাঁথা জড়িয়ে দেন, তথাপি তিনি নিরস্ত হন না। ১২৪৭ সালের বৈশাখে একদিন তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দেখতে পান। জগমোহনে পৌঁছে জগদ্বন্ধুর দিকে তাকাতেই দেখেন শ্রীবিগ্রহ থেকে এক দিব্যজ্যোতি তাঁর অন্তস্তলে প্রবেশ করল। রাত্রে স্বপ্নে দেখেন—জগন্নাথদেব তাঁকে বলছেন, 'তোর ছেলে হয়ে আমি আসছি।' পরিবারের পাণ্ডা 'খুঁটিয়ারা' ওঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। রান্নার প্রয়োজন নেই, মহাপ্রসাদ পান। আনন্দকিশোর স্থির করেছিলেন, 'আর ফিরে গিয়ে কি হবে?' পিসিকেও মনের কথা জানিয়েছিলেন, 'এই ধাম ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাই না। রথের এখনও দু'মাস বাকী; রথ দেখে তোমরা কলকাতা হয়ে ফিরে যাবে।'

কিন্তু স্বপ্নে জগন্নাথদেবের আশ্বাসবাণী পেয়ে একদিনও আর বিলম্ব করতে ইচ্ছা হয় না। উল্টোরথ পর্যন্ত জগন্নাথ-ক্ষেত্রে কাটিয়ে প্রভুপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় সঙ্গীদের নিয়ে শ্যামসুন্দরের স্থানে ফিরে আসেন শান্তিপুরে—ঝুলনের পূর্বে। স্বর্ণময়ীকে তিনি সবিস্তারে স্বপ্নের কথা জ্ঞাপন করেন। স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভাঙতেই দ্বন্দ্ব এসেছিল মনে—'এ কি স্বপ্ন? দেবস্বপ্ন তো অলীক হতে পারে না! তা হলে কি পুরুষোত্তমই আসছেন এবার অদ্বৈতবংশে আমাদের ছেলে হয়ে!'

অচিরে স্বর্ণময়ী দেবীর মধ্যে প্রকাশ পায় গর্ভলক্ষণ—দিন দিন উছলে পড়ে অপরূপ রূপলাবণ্য। সঙ্গিনীরা ঠাট্টা-তামাসা করে মন্তব্য করে, 'আ মরি! তোমার হল কি!' স্বর্ণময়ীর নিজেরও চমক লাগে; সূর্যরশ্মিতে দেখেন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীমতীর ভুবনমোহন যুগল রূপ। আচমকা কখনও বা চোখে পড়ে—বিরাট এক পুরুষ শুয়ে আছেন তাঁরই পাশে; ভয়ে ভয়ে তিনি স্বামীকে শুধান এর তাৎপর্য।

অভয় দেন আনন্দকিশোর, আর ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে কী ঘটে থাকে শাস্ত্র থেকে তার উল্লেখ করেন। শ্যামসুন্দরের রাস দেখে ফিরবার পথে স্বর্ণময়ী স্পষ্ট দেখতে পান তাঁর আঁচল ধরে টানছে এক জ্যোতির্ময় শিশু।

আসন্নপ্রসবা কন্যাকে গৌরীপ্রসাদ বাগচি জোয়ারদার মহাশয় যথাসময়ে স্বগৃহে নিয়ে যান। গৌরীপ্রসাদ ছিলেন উদারচেতা ও পরোপকারী। তাঁর মত দাতা ঐ অঞ্চলে বিরল। নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন তিনি। অবস্থা সচ্ছল, কিন্তু বিপন্নের সাহায্যে তাঁর সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। তথাপি পরিচিত এক ব্যক্তির অনুরোধ এড়াতে না পেরে এই অবস্থায়ও তিনি তার জামিন হয়েছিলেন; কিন্তু মামলার দিন লোকটি আদালতে হাজির না হয়ে ফেরার হয়। ঋণশোধের শমন আসে গৌরীপ্রসাদের উপর। তিনি অক্ষম হলে ক্রোকী পরোয়ানা বের হয়।

এদিকে স্বর্ণময়ীর সন্তান প্রসবের শুভলগ্নটি ঘনিয়ে আসে। আদালতের হুকুমনামা নিয়ে ক্রোক আসে গৌরীপ্রসাদের গৃহে সূর্যোদয়ের সময়। বিব্রত ও আড়ষ্ট হয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে স্বর্ণময়ী গিয়ে আশ্রয় নেন ডোবার পাশে—পিটুলি গাছের নিচে, কচু বনে। ডিক্রীজারীতে অবরুদ্ধ গৃহের এক বিচিত্র পরিবেশে সূর্যোদয়ের পরক্ষণে—সোমবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১২৪৮ সালে (২রা আগস্ট, ১৮৪১ খৃঃ) কর্কট লগ্নে, ঝুলন-পূর্ণিমা তিথিতে মাতুলালয় শিকারপুরে বিজয়কৃষ্ণ আবির্ভূত হন। চন্দ্র তখন মকররাশিতে। স্বর্ণময়ীর খোঁজ পড়লে বাড়ীর মেয়েরা দেখেন এঁদো পুকুর-পারে তিনি বসে আছেন, আর তাঁর কোল আলো করে আছে ফুটফুটে এক ছেলে। স-প্রসূতি সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে প্রতিবেশীগৃহে আশ্রয় নেন তাঁরা; তারপর অবরোধ কাটলে চলে যান ক'দিন পূর্বে নির্মিত সূতিকাগারে। নবজাতকের সেক-তাপ না পড়ায়, সর্দি কফের হয় বাড়াবাড়ি। কবিরাজ এসে শিশুকে মুসাব্বরের তৈরী এক ঔষধ খেতে দেন, আর বুকে দিতে দেন আফিমের এক মালিশ। বার বার তিনি সাবধান করেন—মালিশের ঔষধ বিষ, মুখে গেলে সর্বনাশ। ভুল করে মা তা-ই দিলেন ছেলের মুখে। শিশুর শরীর নীল হয়ে ওঠে, বুঝি জীবনদীপ যায় নিবে! আতঙ্কে, উদ্বেগে জোয়ারদার বাড়ীতে কথাটি ফোটে না কারও মুখে। হঠাৎ অঘটন ঘটে। ঔষধ সব বমি করে ফেলে ঐ একরতি শিশু। কফ-সর্দিও তার সঙ্গে বেরিয়ে আসে। আর কোনও উপসর্গ নেই। দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে যায়। চাঁদের কলার মত শিশু বাড়ে মাতুলালয়ে। স্বর্ণময়ী দেবীও তখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ভয়ে ভয়ে ছিলেন সব—এবার না তিনি আবার পাগল হন।

ছ'মাসের শিশুকে নিয়ে স্বর্ণময়ী আসেন শান্তিপুরে। শ্যামসুন্দরের মন্দির-চত্বরে শিশুকে ভূমিতে রেখে ঘরে বরণ করা হয়। উল্লসিত হন প্রভুপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামী দ্বিতীয় পুত্রের লক্ষণাদি নিরীক্ষণ করে। মনে জাগে নীলাচলের কথা। স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে সেই দিব্যজ্যোতি আর জগন্নাথদেবের আশ্বাসবাণী। আনন্দাশ্রুতে ভাসে তাঁর বুক। অষ্টম মাসে সমারোহ করে শিশুর অন্নারম্ভ ও নামকরণ উৎসব সম্পন্ন হয়।

মনের ভাব গোপন করতে না পেরে আনন্দকিশোর ছেলের কোষ্ঠী বিচার করে আপনজনের কাছে বলেন, 'প্রেম ভক্তির বন্যায় ও সারা দেশ ভাসাবে'। রাশিচক্র বিচার করে নাম রাখেন 'বিজয়কৃষ্ণ' আর 'দিগ্‌বিজয়'। অন্নপ্রাশনের সময় শিশুর সামনে রাখা হয় শ্যামসুন্দরের ভোগের থালা, রঙ-বেরঙের খেলনা, চক্‌চকে গিনি,

শ্রীমদ্ভাগবত আর ক'খানা গ্রন্থ। ভাগবতখানা শিশু আঁকড়ে ধরে। বুঝতে দ্বিধা থাকে না পিতার, ভাগবত এসেছেন স্বয়ং। ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান এই তিনে যে নিত্যলীলা। গৌরসুন্দরের নামকরণ উৎসবেও ঘটেছিল অনুরূপ।

সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত ১।৩।৫৪

কুটুম্ব বাড়ী গেছেন স্বর্ণময়ী। বিবাহ-বাড়ীতে লোকের কোলাহল ও কর্মব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে ডাকাতেরা নিয়ে যায় ঘুমন্ত শিশুকে সন্তর্পণে নিকটবর্তী গভীর বনে শক্তি পূজার অঙ্গনে, দেবীর প্রীতি-মানসে নরবলির উদ্দেশ্যে। শিশুর ঘাড় লক্ষ্য করে খাঁড়া ওঠাতেই ভীমকায় এক উন্মাদ আসে ছুটে। দা' কেড়ে নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে সে বলে, 'তোদের রক্ত নেবার আজ মার সাধ।' রুদ্রের আচম্‌কা প্রকাশে ডাকাতেরা প্রাণ নিয়ে ছুটে পালায়। উৎসবমুখর গৃহে যায় ভৈরব বিজয়কে কোলে নিয়ে, ধমকায় সে জননী স্বর্ণময়ীকে। ছেলেকে মায়ের কাছে দিয়ে নিমেষে হয় অদৃশ্য। খোঁজাখুঁজি করেও আর মেলে না তার উদ্দেশ।

আনন্দকিশোর ছেলেকে কত রকম সোনার জিনিস গড়িয়ে দেন—বালা, বাজু, কটিশোভা, কণ্ঠভূষণ ও মাথায় সোনার নিমগোটা, পায়ে নূপুর; তাকে এ সব অলঙ্কার পরিয়ে রাখতেন প্রায় সময়। একদিন এই সব অলঙ্কারের লোভে বিজয়কে কোলে নিয়ে যায় এক অজ্ঞাতকুলশীল। মহামায়ার এমনি খেলা যে, এ-পথ ও-পথ ঘুরিয়ে সে নিয়ে আসে পথ ভুল করে ফের গোঁসাইপাড়ায়। পিতাকে দেখে শিশু গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর কোলে। গৌরসুন্দরের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল অলঙ্কারের লোভে শৈশবে তাঁকেও করেছিল অপহরণ।

শাস্ত্রে আছে ভগবানের নর-লীলায় দেবতারা তাঁর শ্রীদেহে অবস্থান করে আপদ-বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করে থাকেন।

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু দ্বারা করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।১২

শিশুকে কোলে নেবার জন্য কী কাড়াকাড়ি! একবার একজন কোলে নিলে সহজে নামাতে চান না, এমনি এক বিচিত্র আকর্ষণ। শিশুর মুখে হাসি ফোটাতে সবাই তৎপর। আঙিনায় যখন হামাগুড়ি দেয় তখন 'গোপালজী কি জয়' বলে সকলে করতালি দেন। শিশু যখন কাঁদে—স্বর্ণময়ী দেবী বলতেন, 'শ্যামসুন্দরের চাতালে নিয়ে যাও, শান্ত হয়ে যাবে'। হ'তও তাই। সজাগ দৃষ্টি না রাখলে হামাগুড়ি দিয়ে সে শ্যামসুন্দরকে ধরতে যায়, সকাল-সন্ধ্যায় তুলসীতলায় গড়াগড়ি দেয়।

বিজয়ের বয়স যখন দু' বছর ন' মাস আর ব্রজগোপালের পাঁচ বছর একমাস, তখন তাঁদের পিতৃবিয়োগ ঘটে। রংপুরের আমলাগাছিতে জমিদার-শিষ্য মুকুন্দনারায়ণ চৌধুরীর গৃহে ১২৫১ সালে বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠের সময় হল তাঁর ভাবসমাধি। আর সম্বিৎ ফিরে এল না। আনন্দকিশোর চির-আনন্দময়ের সঙ্গে হলেন মিলিত। এ সময় বয়স তাঁর আনুমানিক সাতান্ন। ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে বয়সের ব্যবধান দু' বছর চার মাস।

ছেলে দুটিকে নিয়ে স্বর্ণময়ী গেছেন পিত্রালয়ে ক'দিন থাকবেন বলে। ছোট

ছেলেকে নিয়ে গেছেন 'হাওলা'র ঘাটে স্নান করাতে। স্নান করে উঠে দেখেন—ছেলে নেই, বাড়ীও যায় নি। খবর রটে শিকারপুরে জোয়ারদার মহাশয়ের ছোট নাতিটি দীঘিতে ডুবে গেছে। প্রতিবেশীরা বলাবলি করে, 'ফকিরকে কি ফাঁকি দেবার জো আছে?' লোক ছুটে নীলকুঠি, জেলে নিয়ে আসেন গৌরীপ্রসাদ। শেষ চেষ্টা; বেঁচে থাকবে ভরসা নেই। জাল ফেলতেই মাছের সঙ্গে ওঠে শিশু, মুখে দিব্য প্রফুল্লতা; যেন লুকোচুরি খেলায় সে এতক্ষণ জলে লুকিয়ে ছিল, এখন বেরিয়ে এল। একটুও জল যায় নি পেটে। ছেলেকে কোলে নিয়ে স্বর্ণময়ী শ্যামসুন্দরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন বারবার। তাঁর শান্তিপুর যাত্রা হয় ত্বরান্বিত।

জন্ম, সংস্কার ও শিক্ষা—সবই অনুকূল। পূর্বপুরুষের ভক্তিপূত শোণিত-প্রবাহ, হরিভক্তিপরায়ণ গুরুমহাশয়দের চরিত্রবল, গৃহে শ্যামসুন্দরের নিত্য-সেবা, জননীর নিষ্ঠা, পরিবারের সত্যভাষণ, শান্তিপুরের পুণ্যপ্রভাব বিজয়কে গড়ে তুলে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। জ্ঞান হবার পর থেকেই গৃহদেবতার প্রতি তাঁর অমোঘ আকর্ষণ—অকৃত্রিম স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি ও দরদ! কথা ফোটার সঙ্গে তার আধো-আধো কথা শুনতে কী আগ্রহ! মাকে বলে, 'মা, ছিমতী কেন আমার ডানে বসে ভোগ থিক করে দেন না? না না আমায় দিতে হবে।' তার বায়না থামে না। অন্য প্রসঙ্গ আনেন মা, বলেন, 'জানিস্, তোর বাবা নিজের হাতে ভোগ রাঁধতেন?'

সে বলে তখন, 'আমিও ভোগ রাঁধব। আমাকে যেমন তুমি ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াও শামসুনকেও ওরকম খাওয়াবো।'

মা বলেন, 'আগে তো বড় হ'। এখন রাঁধতে গেলে গা-হাত পুড়ে যাবে যে! আর দুধ খাওয়াতে চাস্, তা আগে জন্মাষ্টমী তো আসুক।' প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চান মা। জন্মাষ্টমীর ঢের দেরী, ততদিনে শিশু ভুলে যাবে।

বিচিত্র ঢংয়ের লুকোচুরি খেলা। মন্দিরের চাতাল থেকে কচি হাতে আপন চোখ ঢেকে বিগ্রহকে উদ্দেশ্য করে বালক বিজয় বলে, 'শামসুন-কু-উ'; তারপর ছোটা-ছুটির ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক করে শ্যামসুন্দরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'ছিঃ ছিঃ আবার হেরে গেলে!'

মন্দিরের ভিতর যেতে তার মানা। এতে উষ্মা যত গিয়ে পড়ে শ্যামসুন্দরের উপর। বাধানিষেধের মূলে তো খেলার সাথী ঐ বিগ্রহরূপী ঠাকুরই! নিয়ম-মাসের ঊষায় মঙ্গল-আরতি দর্শন করে ঘরে ফিরে দেখেন মা, বিজয় নেই শয্যায়। খোঁজ করে গিয়ে দেখেন ঠাকুর-দালানের বারান্দায় শিকের দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্রীবিগ্রহকে লক্ষ্য করে সে বলছে, 'আমার ভাটা চুরি করে পালিয়ে গেলে যে! দরজাটা একবার খোলই না! দুজনে মিলে খেলি!' মুহূর্তে চোখ-মুখের চেহারা যায় বদলে। শপথ করার ভঙ্গিতে বলে, 'এর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি আজ খাবই না।'

পূজারী এসে মন্দিরের দরজা খুলে বেদীর উপর ভাটা পেয়ে অবাক হয়ে ভাবেন—বিজয় নিশ্চয়ই শিকের ফাঁকে হাত গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে। তিনি তা বিজয়ের হাতে ফিরিয়ে দেন। বিজয়ের তবু রাগ পড়ে না। সাধ্য-সাধনা করেও বেয়াড়া ছেলেকে সেদিন খাওয়ান যায় না কিছু। অনুরোধ, উপরোধ, মিনতি, চোখ-রাঙ্গানি সবই হয় ব্যর্থ। অভুক্ত শিশুর আহার রাত্রে শয়নঘরের মেঝেতে থাকে ঢাকা।

নিঝুম রাতে ছেলের কণ্ঠস্বরে স্বর্ণময়ীর ঘুম ভাঙ্গে। বিমূঢ় হয়ে তিনি শয্যা থেকে দেখেন বিজয় খেতে বসে কাকে যেন লক্ষ্য করে বলে, 'আমার কাছে ঘাট

মানলে, তাই খেতে বসেছি। আচ্ছা ভাই, আমি না হয় তোমার উপর আড়ি করে কিছু খাই নি—তুমি কেন খেলে না? এস, দুজনে এখন একসঙ্গে খাই।'

আহারান্তে শিশু বিজয় হাতমুখ ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। পূজারী স্বপ্ন দেখেন ঐ রাত্রে, শ্যামসুন্দর সেদিন ভোগ নেন নি। সকালে এসে স্বর্ণময়ী দেবীকে তিনি জানান সেই কথা। স্বর্ণময়ী ছেলেকে শুধান, 'কার সঙ্গে কাল রাতে খাবার সময় কথা বলছিলি?' কিছুই মনে নেই ওর। ভোগ রান্নার ব্যবস্থা হয় তড়িঘড়ি।

সাড়ে তিন বছরের বিজয়। বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে সে ছাদের উপর উঠে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে, বাহ্যজ্ঞান তার লোপ হয়। পরিবারের লোকের ডাকাডাকিতে সম্বিৎ ফিরে এলে সে বলে, 'বাবা আমায় চাঁদের দেশে নিয়ে যান। তাঁর কোলে আমাকে বসিয়ে কত নদী, পাহাড়, কী সুন্দর ফুলের বাগান দেখালেন!' তারপর বাবা আবার বললেন, “অদ্বৈতবংশে একজন বড় বৈষ্ণব সাধু হবেন; হবি তুই সেই সাধু?” সায় দিয়ে আমি পিতাকে বলেছি, বাবা, আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি হব সেই সাধু।'

মঙ্গলকামনার্থে বিজয়কে শ্যামসুন্দরের চরণামৃত ও শঙ্খের জল পান করান হয়। আনন্দকিশোরের কল্যাণার্থে চারজন ব্রাহ্মণকে পরিতৃপ্তি সহকারে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ ভোজন করান হয়। সমারোহে তাঁর সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ হয়। তখন থেকেই পেয়ে বসে বিজয়ের সাধু হবার ঝোঁক।

একরতি শিশু—মাথায় সরু সরু জটা। আদর করে সবাই ডাকেন—'জটে গোঁসাই'। 'জটে কোথায় রে?' বাড়ীময় খোঁজ খোঁজ রব। হদিস মিলে ঝোপের আড়ালে—বেলতলায়, পদ্মাসনে আসীন বালযোগী, পলকহীন দৃষ্টি, যেন পাথরের মূর্তি—মহাভাবে বিভোর।

আজন্ম সত্যপ্রতিষ্ঠ, গোঁসাইবাড়ীর চলন্ত বালগোপাল। কৌতুক করে মেয়েরা বলেন, 'গোপাল, একবারটি তেঁতুল ঝুলাও দিকিনি'। ও মাথা নাড়ে, ওঠে হাসির রোল। সন্ন্যাসীর বেশ তার ভাল লাগে। কাপড় চিড়ে তাকে ডোর-কৌপীনের মত পরান হয়। অস্ফুট আধো আধো কথা; তখনই বাক্‌সিদ্ধ। কত রকম সব জিজ্ঞাসা—'এবার ওর কী হবে—ছেলে না মেয়ে?' 'পরীক্ষায় পাশ না ফেল?' 'মামলায় হার না জিৎ?' জবাব দেয় সে চটপট—যা-বলে তা-ই ফলে, কখনও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

বড়দের দেখাদেখি ঘটি ভরে জল নিয়ে তুলসী গাছ স্নান করাতে গিয়ে ঘটি নিয়ে বালক বিজয় মাটিতে পড়ে যেত। তথাপি চেষ্টার বিরাম নেই। পরিবারের লোকেরা তার হাত ধরে ঘটি তুলে জল সিঞ্চন না করা পর্যন্ত উৎসাহের নেই অন্ত।

শ্যামসুন্দরের সেবায় মায়ের বড় প্রীতি! ক্ষীরের নাড়ু বানিয়ে তিনি শিকায় রাখেন হাঁড়িতে তুলে—শ্যামসুন্দরের ভোগে দেবেন বলে। ঘরে যখন আর কেউ নেই, চুপিচুপি জলচৌকির উপর জলচৌকি রেখে হাঁড়িতে হাত দিতেই টাল সামলাতে না পেরে বিজয় পড়ে যায় নীচে; চিবুকের খানিকটা তার বেশ কেটে যায়।

জন্মাষ্টমীর পরদিন সবার অলক্ষ্যে এক বাটি দুধ আর ঝিনুক নিয়ে চুপিচুপি মন্দিরে গিয়ে সে হাজির। শ্রীবিগ্রহকে রগড় করে সে বলে, 'শামসুন, তোমার বয়স তো মাত্র একদিন। ক্ষীরের নাড়ু তোমার সইবে না'। আসন থেকে সন্তর্পণে নামিয়ে শ্রীমূর্তিকে বাঁ হাতে ধরে এক ঝিনুক দুধ সে ডান হাতে ঢেলে দেয় শ্রীবিগ্রহের মুখে। গড়িয়ে পড়তেই শাসায়, 'খাও বলছি, নয় ভাল হবে না, মজা টের পাবে'। এই ঘটনা জানাজানি হলে বিগ্রহের সংস্কার হয়।

ফুলদোলে শ্রীবিগ্রহের পুষ্পসজ্জা দেখে শিশু মাকে গিয়ে বলে, 'শামসুনই বুঝি তোমার সব, আমি কেউ নই!' দামাল ছেলের কথা শুনে মা হাসেন; শ্রীমূর্তির গলা থেকে একগাছি মালা নিয়ে তিনি পরিয়ে দেন তাকে। প্রবোধ দিয়ে বলেন মা, 'শ্যামসুন্দর আর তুই কি আলাদা?' বুঝেও যেন বুঝেন না মা; গোল না পাকালে জমাট হয় না লীলা। অথচ সারল্যের প্রতিমূর্তি স্বর্ণময়ী দেবী সকলকে কতবার যে বলেছেন বিজয়ের আবির্ভাবের কথা। তিনি বলতেন, 'বিজয়ের জন্ম স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ দ্বারা যেরূপ হয়, সেরূপে হয় নি। কর্তা গোঁসাই দণ্ডি দিতে দিতে পুরী গেলেন। এমনভাবে আর কেউ কখনও গিয়েছে? ফিরে এসে মনের দ্বারা আমার ভিতর তাকে রেখেছিলেন। বিজয় স্বয়ং জগন্নাথ।'

একদিন এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এসে অতিথি হলেন গৃহে। সন্ন্যাসী অতিথির শালগ্রাম পূজা দোলা দেয় শিশু বিজয়ের মনে। বিজয় মিনতি করে বলে, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর, তোমার শিলাটি আমায় দাও না! আমিও ফুল, চন্দন দিয়ে পূজা করব।' পাথরের নুড়ি দিয়ে তাকে ভুলিয়ে বিদায় নেন অতিথি। শালগ্রামে ফুল, চন্দন দিতে গিয়ে সন্ন্যাসীর মানস-চোখে ভেসে ওঠে শিশু বিজয়ের মুখখানা। দেশবিদেশ পর্যটন করে বছর না ঘুরতে দুর্বার এক আকর্ষণে সন্ন্যাসী ফের আসেন শান্তিপুরে। শিশুভোলানো নুড়িটি দেখে তখন তিনি আঁৎকে ওঠেন। সন্ন্যাসীর নিত্য পূজার শালগ্রামটি যেমন ছিল তেমনই আছে; আর বিজয়কে দেওয়া সেই নুড়ির গায়ে শঙ্খ, চক্র, গদা-পদ্মের স্পষ্ট ছাপ! স্বর্ণময়ী দেবীকে অভিবাদন করে তিনি বলেন, 'মা যশোমতী, কানাই যে মা, তোমার ঘরে! স্বর্ণময়ীকে তিনি দেখান সেই প্রাণবন্ত নুড়ি। ভয়ে ভয়ে তখন জননী সন্ন্যাসীকে ফিরিয়ে দেন তাঁর দেওয়া সেই শিলা; নইলে জীবন্ত দেবতা নিয়ে ছেলে কখন কি বিপদে পড়ে! দেবসেবার শিশু কি জানে? সেবাপরাধে দেবতার যদি অভিশাপ লাগে! এদিকে শিলার অভাবে শিশু দু'দিন জল পর্যন্ত স্পর্শ করে না।

১২৫৩ সালের ঝুলন-পূর্ণিমার সময় বিজয়ের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়। স্বর্ণময়ী বিজয়কে দত্তক দিয়ে স্বামীর প্রতিশ্রুতি পালন করেন। জমিদার উমেশচন্দ্র রায় ওরফে মতিবাবু, বড় গোস্বামীবাড়ীর সেবাইত এবং পণ্ডিত কানাইলাল গোস্বামীর উপস্থিতিতে যথাশাস্ত্র যাগযজ্ঞ ও দলিল সম্পাদন করে গোপীমাধব গোস্বামীর সহধর্মিণী কৃষ্ণমণি দেবী বিজয়কৃষ্ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। বিজয়ের কাছে এই ব্যাপারটা মনে হয় ভারী খাপছাড়া। মা-ই তো মা। জ্যাঠাইমাকে কেউ কি কখনও মা ডাকে নাকি? মার সঙ্গে না ঘুমিয়ে জ্যাঠাইমার সঙ্গেই বা সে ঘুমুবে কেন? কৃষ্ণমণিকে সে ডাকে "মা-জননী"। তাঁর সঙ্গে সে থাকতে নারাজ। স্বর্ণময়ী বলেন, ও-রকম ব্যবস্থা না করলে তাঁর বাবা স্বর্গেও শান্তি পাবেন না। তিনি-ই এ ব্যবস্থা করে গেছেন। কৃষ্ণমণি কিন্তু ভুল বুঝেন স্বর্ণময়ীকে। তিনি ভাবেন মার প্ররোচনায়ই বিজয় সহজ হচ্ছে না। স্বর্ণময়ীকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে মতিবাবুকে চিঠি লেখেন কৃষ্ণমণি দেবী, দত্তকে তাঁর আর প্রয়োজন নেই। তিনি বিজয়ের উপর সর্বস্বত্ব ত্যাগ করেছেন। পরিণামে হিতে হল বিপরীত। স্বর্ণময়ী দেবী বিজয়কে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। বিজয়ের কী আনন্দ! কৃষ্ণমণির রাগও জল হতে কতক্ষণ? তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে ক'দিন যেতেই জায়ের কাছে ত্রুটি স্বীকার করেন। মনোমালিন্য মুছে যায়। উপনয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিজয়কে স্বর্ণময়ীর কাছে রেখে কৃষ্ণমণি শিষ্যালয়ে যান। এই সময় স্বর্ণময়ীরও শিষ্যালয়ে যাবার

প্রয়োজন। বিজয়কে শিকারপুর পাঠিয়ে ব্রজগোপালকে নিয়ে তিনি বের হন। এদিকে কৃষ্ণমণি দেবী শান্তিপুর ফিরে এসে উপনয়নের দিন স্থির করে বিজয়কে শান্তিপুর পাঠাবার জন্যে শিকারপুরে খবর পাঠান। কিন্তু কৃষ্ণমণি দেবী হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। এই খবরটি পর্যন্ত শিকারপুরে জানান হয় না। বিজয়ের এক জ্ঞাতি ভ্রাতাকে দিয়ে কৃষ্ণমণি দেবীর শেষকৃত্য করান হয়। উপনয়নের নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে বিজয় এসে দেখে 'মা জননী'র শ্রাদ্ধের আয়োজন হচ্ছে। বিজয়ের ঐ জ্ঞাতি ভ্রাতার পক্ষ থেকে বলা হয় কৃষ্ণমণি দেবী নিজেই বিজয়ের 'দত্তক' অধিকার নাকচ করেছেন। নজির হিসাবে মতিবাবুকে লেখা কৃষ্ণমণি দেবীর চিঠির উল্লেখ করা হয়। কৃষ্ণমণির ধনসম্পত্তি ঐভাবে বেহাত হয়। শ্রাদ্ধের পর ফিরে এসে এত সব কান্ডকারখানার কথা শুনে স্বর্ণময়ী দেবীর একবারে আক্কেল গুড়ুম। এই আকস্মিক দেহান্তে ঘটে বিজয়ের 'মা' ও 'মা জননী'কে নিয়ে বিরূপতার ইতি।

ব্রজগোপাল ও বিজয়কে নিয়ে কিছুদিনের জন্য স্বর্ণময়ী আবার ফিরে যান পিত্রালয়ে। শিকারপুরের গ্রাম্য পাঠশালায় শুরু হয় ওদের প্রথম পাঠ।

বিদ্যারম্ভ ও বাল্যকথা

বয়সে বড় হলেও পূর্বে ব্রজগোপালের হাতেখড়ি হয় নি। আনন্দকিশোরের দেহাবসানের পর স্বর্ণময়ী দেবীর উপর সংসারের সব ভার এসে পড়ে। অর্থসংস্থানের জন্য শিষ্যালয়েও প্রায়ই তাঁকে যেতে হত। সাত শ' ঘর শিষ্য। ছেলেরা ছোট বলে ওদেরও তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ওদের বিদ্যারম্ভে তাই দেরী হয়। দু' ভাইকে শিকারপুরে এক সঙ্গে ভর্তি করা হয় ১২৫৩ বঙ্গাব্দে।

দিন দিন বিজয়ের চপলতা বাড়ে। কিন্তু পাঠাভ্যাসের বেলায় সে যেন সুস্থির যোগী। তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী বিজয় গোড়া থেকেই পাঠশালায় সেরা ছাত্রের স্থান অধিকার করে বসে। আজকালের মত খেলাধুলার মাধ্যমে তখন শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। কিল, চাপড়, কানমলা, বেত, আরও নানারকম কঠোর শাসনে গুরুমহাশয়রা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁদের ভয়ে ছাত্রেরা বিভীষিকা দেখত। দুরন্ত বিজয় কিন্তু পাঠশালায় আর এক ছেলে। লেখাপড়ায় তার জুড়ি মেলা ভার। তদুপরি শিষ্টাচারেও সে অদ্বিতীয়। তাই, সে গুরুমহাশয়ের সুনজরে পড়ে। গুরুমহাশয় প্রসন্ন থাকায় এই হৃদয়হীন কঠোর শাসনের গন্ডিতে থেকেও তার গায়ে আঁচড়টি লাগে না। কিন্তু বেশী দিন স্বর্ণময়ী দেবীর ছেলেদের নিয়ে পিত্রালয়ে থাকা সম্ভব নয়। শ্যামসুন্দরের সেবা-পূজার ভার জ্ঞাতিদের উপর দিতে তাঁর মন মানে না।

শান্তিপুরে ফিরে এসে ওঁরা ভগবান সরকারের পাঠশালায় ভর্তি হন। ভগবান সরকার ছিলেন দীর্ঘকায়, কৃশ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। জাতিতে তিনি ছিলেন কায়স্থ। শ্যামচাঁদুনির প্রাঙ্গণে—গাছের ছায়ায়—মুক্তাকাশের নীচে—মাদুরে বসে ছেলেরা তাঁর কাছে পাঠাভ্যাস করত। ঝড়, বৃষ্টি এলে শ্যামচাঁদুনীর ছোট কোঠাঘরে ঠেলাঠেলি করে তারা আশ্রয় নিত। শিক্ষাদান থেকে শাসনে ছিলেন ভগবান গুরুমহাশয় অধিক সিদ্ধহস্ত। রাগ হলে ছেলেদের 'নাড়ু গোপাল' সাজিয়ে তিনি হাতে-পায়ে ইট দিয়ে দিতেন, কখন বা হাত-পা বেঁধে পিঁপড়ার গাদায় বসিয়ে দিতেন অবাধ্য ছাত্রকে। যখন রেগে যেতেন তখন 'গাডামাডা' এই শব্দটি তিনি ব্যবহার করতেন।

ছেলেরা তখন প্রমাদ গুনত এবং বলির পূর্বে ছাগশিশুর মতো আড়ষ্ট হয়ে পড়ত ভয়ে। তাঁর কঠোর শাসন থেকে ছাত্রেরা অব্যাহতি পায় নি। একমাত্র বিজয়ই ছিল এর ব্যতিক্রম।

মেধাবী ও শ্রুতিধর বিজয়ের উপর ভগবান সরকারের দৃষ্টি পড়ে প্রথম থেকে। বিজয়ও তাঁকে ভক্তি করে, ভালবাসে। মধ্যে মধ্যে সে তাঁকে আমন্ত্রণ করে গৃহে আনে। মা পরিবেশন করতেন শ্যামসুন্দরের ভোগের থালা আর বিজয়কে দিয়ে দেওয়াতেন শিষ্যদের দেওয়া ধুতি, চাদর।

স্বভাবে কঠোর হলেও ভগবান সরকারের মধ্যে ছিল স্নেহের ফল্গুপ্রবাহ। প্রকৃতপক্ষে ভগবান গুরুমহাশয় ছিলেন একজন গুপ্ত সাধক। ছেলেরা ক'জনে মিলে শীতকালে একদিন তাঁর কাছে আবদার করে বলে, 'আজ আমাদের কাঁঠাল খাওয়াতে হবে'। ভগবান গুরুমহাশয় সস্নেহে বলেন, 'এই অকালে, এ জিনিস আমি কোথায় পাব?' ছেলেরা নাছোরবান্দা। অগত্যা মোটা চাদরে গা ঢেকে তিনি আসন করে বসেন। একটি আস্ত গালা কাঁঠাল তিনি তুলে ধরেন ওদের হাতে। সুস্বাদু প্রতিটি কোষ। বিজয়ও এর ভাগ পায়।

ভগবান সরকার ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। ভগবদ্ভক্তি ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ। পরোপকারের জন্য তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ; ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে ছিল অচলা ভক্তি, আর ছিলেন তিনি নিরভিমান। ব্রাহ্মণগৃহে উৎসবে, অনাহূত হলেও তিনি উপস্থিত হয়ে উচ্ছিষ্ট সংস্কার করতেন; ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের ভোজনের পর তাঁদের প্রসাদ পেতেন। ভগবান সরকারের পাঠশালায় সমবয়সী সহপাঠীদের নিয়ে বিজয়ের দিনগুলি কাটে মহানন্দে। কলেরায় ক'টি শিশুর জীবনপ্রদীপ যায় নিবে। মুষড়ে পড়ে বিজয়। মনে মনে সে ভাবে—সবই আছে অথচ এরা কোথায় গেল! বার বার মনে আসে এই জিজ্ঞাসা। সেলেট, পুঁথি নিয়ে একাকী পাঠশালায় চলেছে বিজয়; চারদিক জনহীন। নিরালা বটগাছটির নীচে আসতেই কারা সমস্বরে বলে ওঠে, 'বিজয়, এই যে আমরা; এখানে আমরা সবাই আছি, তুমি ভেবো না'। মৃত সহচরদের কলকণ্ঠ! নির্জন, নিস্তব্ধ বনপথে অশরীরী বন্ধুদের কথা শুনে অভিভূত হয়ে পড়ল বিজয়। সেদিন স্কুলে পৌঁছতে হল দেরী। ভগবান পণ্ডিতকে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে খুলে বলল সব ঘটনা। পণ্ডিত মহাশয় বিজয়কে নিয়ে তখনই গেলেন ঐ বটগাছের নীচে। আর্তকণ্ঠে আবাহন করে ওদের বালক বিজয়; কিন্তু কোনও সাড়া নেই। এই নীরবতায় পণ্ডিত মহাশয়ের মনে আসবে সন্দেহ অবিশ্বাস; বিজয় হারাবে তাঁর আস্থা। এই চিন্তা বিজয়ের মনকে বড় শংকিত ও ব্যাকুল করে তুলল। মিনতি করে মৃত বন্ধুদের উদ্দেশে বলল বিজয়, 'ভাই সব, তোমরা এখন সাড়া দিচ্ছ না কেন? এই তো একটু আগে তোমরা এখানে ছিলে। গুরুমহাশয় ভাবছেন—আমি তাঁকে মিথ্যা বলেছি।' সমবেত কণ্ঠে তখন ওরা বলে ওঠে, 'গুরুমহাশয়, এই যে আমরা এখানে। বিজয় মিথ্যা বলে নি।' ভগবান সরকার হলেন এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় স্তব্ধ, বিমূঢ়। বিজয়কে কোলে করে তিনি ফিরে এলেন পাঠশালায়। সেদিন বিজয়ের কাছে ভগবান পণ্ডিত আত্মার অমরতা সম্বন্ধে লাভ করলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পরলোকের পর্দা গেল সরে। ছাত্র গুরুকে দিলেন পরাজ্ঞান।

১২৫৪ সালে ভগবান গুরুমহাশয় দেহ রাখেন। মৃত্যুর পূর্বদিন ছাত্রদের তিনি বলেন, 'আগামী দিন ভোরে তোরা সব গঙ্গায় নাইতে যাস। আমি দেহটি ছাড়ব।' গঙ্গার ঘাটে ঐ দিন শান্তিপুরের লোক ভেঙ্গে পড়ে। ভগবান সরকারের জয়ধ্বনিতে

যেন শঙ্কিত হয়ে ওঠে ভাগীরথী। স্নান-আহ্নিক সেরে তিনি করজোড়ে ছেলেদের বলেন, ‘বাপসকল, আমি কায়স্থ হয়েও কত সময় তোমাদের শাস্তি দিয়েছি। তোমরা অনেকেই ব্রাহ্মণসন্তান। এবার তোমাদের পা আমার মাথার উপর রাখ। আর দেরী করো না। ঐ দেখ—আমাকে নিয়ে যাবার জন্য রথ এসেছে।’ দাঁড়ানো অবস্থায়ই তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়, অথচ প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহটি একইভাবে খাড়া থাকে। ছাত্রেরা পিতৃজ্ঞানে সম্পাদন করে তাঁর শেষকৃত্য। ভগবান সরকারের মৃত্যুর পরই এই পাঠশালাটি উঠে যায়।

তাঁর পরলোকগমনের কিছুদিন পূর্বে মিঃ হেজেল নামে এক পাদ্রি সাহেব শান্তিপুরের এক ক্রোশ উত্তর-পূর্বে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে প্রখ্যাত-নামা বহু শিক্ষক ছিলেন। ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা—তিনটি বিভাগ ছিল এই স্কুলে। ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণ সংস্কৃত বিভাগে ভর্তি হন। এখানে প্রায় বার শ’ শিক্ষার্থী ছিল। এই বিদ্যায়তনে অধ্যয়নের সময় বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ গুপ্তের মধ্যে পরিচয় হয়। শান্তিপুর বেজপাড়ায় বৈদ্যবংশে অঘোরনাথের জন্ম। তিনিও বিজয়কৃষ্ণের জন্মবর্ষ ১২৪৮ সালেই জন্মেছিলেন। দিন দিন বিজয় ও অঘোরের প্রীতির বন্ধন প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। হেজেল সাহেব বিজয়ের শিষ্টাচার, স্মৃতিশক্তি ও সদ্‌গুণে হন মুগ্ধ। বাইবেল-পাঠে বিজয়ের আগ্রহও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখনও শান্তিপুরে রেলপথ হয় নি। পান্ডুয়া দিয়ে রেলগাড়ী চলা মাত্র শুরু হয়েছে। ছেলেদের ইচ্ছা হয়—সকলে মিলে একদিন গিয়ে রেলগাড়ী চড়ে বেড়ায়। বয়সে ছোট হলেও বালক বিজয়কৃষ্ণ অগ্রণী হয়ে হেজেল সাহেবকে ছাত্রদের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সাহেব ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিয়ে নিজে অর্থ ব্যয় করে পান্ডুয়া থেকে পরবর্তী স্টেশন পর্যন্ত রেলগাড়ীতে যাতায়াত করেন। কয়েক মাস এখানে অধ্যয়নের পর মিঃ বমেশ নামক আর একজন পাদ্রী শান্তিপুরে একটি স্কুল করতেই শান্তিপুরের ছেলেরা এখানে এসে ভর্তি হয়। ছাত্রাভাবে হেজেল সাহেবের স্কুলটি উঠে যায়। বমেশ সাহেবের নূতন বিদ্যালয়ে খ্রীস্টান ছেলেদের জন্য বিশেষ সুবিধা ছিল। এ সব কারণে এই স্কুলে আর ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণকে ভর্তি করা হয় নি। আর কোন স্কুলও তখন ছিল না শান্তিপুরে।

কুলুকুলু ধ্বনি করে নদী বয়ে যায়। ঘুটঘুটে রাতের আঁধার। জনমানবের চিহ্ন নাই। হেলেদুলে ডিঙিগ নৌকা চলে ছপ্‌ছপ্‌ছপাৎ। হু হু করে ভয়ার্ত হৃদয়। ব্রজ আর বিজয়কে নিয়ে মা চলেছেন রংপুর। নাম না জানা কি এক পাখী থেকে থেকে ডেকে ওঠে। ধরফর্‌ করে মায়ের বুক। চোখে পড়ে ক’খানা ছিপ। মশালের আলো দেখে আর হল্লা শুনে হিম হয়ে যায় রক্ত। তীরে এক গাছের গোড়ায় মাঝিরা নৌকা বাঁধে। পলকে ছিপের লোকেরা এসে ডিঙিগ করে চড়াও।

ভীমকায় একটি লোক হুকুম দেয় তারস্বরে, ‘চটপট সাবাড় করে সব সেরে নে।’ পৈশাচিক উল্লাসে ওরা লাফিয়ে ওঠে। অর্তকণ্ঠে বিজয় বলে উঠে, ‘কে? দুলাল-দা না?’ আৎকে ওঠে দস্যু সর্দার। বিজয়কে সে কোলে নিয়ে বলে, দা’ঠাকুর তোমরা!’ হুঙ্কার দিয়ে সে চেলাদের বলে, ‘খবরদার! হুঁস্‌ নে ও’দের! ফিরে যা তোরা ছিপে।’ স্বর্ণময়ী দেবীর পদধূলি মাথায় মেখে সে বলে, ‘মা, পথঘাট ভাল না’। লোকটি গোঁসাইদের রংপুর খামারের রায়ত; জাতিতে জেলে। শৈশবে বিজয়কে কোলে-পিঠে নিয়েছে। এক সাকরেদকে নাম ধরে ডেকে দুলাল সর্দার বলে, ‘তুই যা তো এ’দের নৌকায়। ডিঙিগর উপর কারও নজর পড়ে তো বলিস্‌—‘দুলাল

মোড়ল এঁদের কেনা গোলাম। ওঁদের গায়ে আঁচড়টি লাগে তো রক্ষা নেই।’

আর একবার স্বর্ণময়ী দেবী শান্তিপুর স্বগৃহে ফিরছেন; সঙ্গে ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণ। বেলায় বেলায় বাড়ী পোঁছার কথা, কিন্তু পথে দেরী হয়ে যায়; নেমে আসে সাঁঝের আঁধার। তখনও দু’ ঘণ্টার পথ বাকী। আচমকা তরী হয় স্থির—নদীর আড়াআড়ি চর। ঘুরে যেতে তিনদিনের পথ; আকাশপাতাল ভাবেন মা। এদিকে কার ইসারায় যেন নৌকা আপনাআপনি চলতে থাকে চরের উপর দিয়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গিয়ে পড়ে ভরা নদীতে। আরোহীরা ভয়ে আতঙ্কে জড়সড়। বিজয় দেখতে পায় অতিকায় একটি লোক নৌকাটি ঠেলে দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল!

ফুলের মত কোমল, চঞ্চল যেন বিদ্যুৎ—আঁখি নয় যেন পদ্মের কোরক; ললিত কণ্ঠ, সবল গঠন, কিন্তু সিংহকটি—চন্দ্রকলার মত বাড়ে বিজয়। গোষ্ঠলীলা যাত্রাভিনয়ে ব্রজগোপাল সাজে বলাই, আর বিজয় কানাই, আর আর ছেলেরা সুবল, সুদাম, ছিদাম। দর্শকেরও ভিড় জমে। হঠাৎ শুরু হয় ফিস্‌ফিসানি। আসর ভেঙ্গে যায়; বিজয় ছোটে কাছারি বাড়ী। শান্তিপুরের এক জমিদারের সেরেস্তা; জমিদার নয়, যেন দুঃশাসন—সাক্ষাৎ যম। খাজনা দিতে পারে নি একটি লোক, জমিদারের আদেশে তার উপর চলে জুলুম। মাটিতে ওকে ফেলে জমিদারের লোকেরা দেয় বাঁশডলা। যন্ত্রণায় সে হাত-পা ছোঁড়ে, মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত ওঠে; নারকীয় এই দৃশ্য দেখে যারা ওখানে ছিল তারা সবাই শিউরে ওঠে। কারও মুখে প্রতিবাদ নেই; কিন্তু বিজয়ের চোখেমুখে ছোটে আগুন। জমিদারবাবুর মুখোমুখি গিয়ে সে দাঁড়ায়। চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ে স্ফুলিঙ্গ! মেঘগম্ভীরনাদে জমিদারকে সে বলে, ‘তুমি ডাকাত, তুমি অমানুষ, তুমি রাক্ষস! লোকটি যে মরে গেল! কথা শেষ না হতেই এলিয়ে পড়ে বালক মাটির উপর। লোকটি তখনই রেহাই পায়। সাত বছরের বিজয়কে নিয়ে সবাই তখন ব্যতিব্যস্ত। জ্ঞান ফিরে এলে জমিদার তাকে বলেন, ‘জান না তো বেটারা হারামজাদার একশেষ! আর তোমার তো বাপু, সাহসের বলিহারি! আমাকে যা’ তা’ গালিগালাজ করলে; একটু ভয়ও হল না!’ দীপ্তকণ্ঠে বিজয় বলে, ‘ভয় করব কেন? তুমি যা তাই তো বলেছি। জান না—আমি গোঁসাইবাড়ীর ছেলে!’

পরবর্তী কালে বিজয়কৃষ্ণ এই জমিদার সম্বন্ধে বলেছিলেন, ‘এই ঘটনার ক’দিন পরই জমিদারবাবু একটি অসহায় ব্রাহ্মণ বিধবার গৃহে তাঁর যথাসর্বস্ব ক্রোক করালেন। বিধবাটি রান্না বসিয়েছিলেন। তিনি লাথি মেরে ভাতের হাঁড়িটি ফেলে দিলেন। পরে তাঁর উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করেন। বিধবাটি হতাশ হয়ে বলেন. “আমি নিতান্ত অসহায়! হায়! হায়! আমার উপর তুমি এমন ব্যবহার করলে! আমি আর কাকে বলব? আমার আর কে আছে? ভগবানকে বলছি, তিনিই এর বিচার করুন; যেমন যেমনটি আমাকে তুমি করলে ঠিক তেমন তেমনটি তোমার স্ত্রীরও ঘটবে।” আশ্চর্য এই যে, এ ঘটনার কিছুকাল পরই জমিদারবাবু একটি মামলায় সর্বস্বান্ত হলেন; তাঁর জেল হল। জেলে ভুগে ভুগে তিনি মারা গেলেন। একদিন তাঁর স্ত্রী হবিষ্যান্ন চাপিয়েছেন, প্রতিপক্ষের লোকেরা বাড়ীতে ঢুকে তখন তাঁর সব লুঠ করল। পিতলের হাঁড়িটি একজন লাথি মেরে উঠানে ফেলে দিয়ে পরে তা’ও নিয়ে গেল। নীচপ্রকৃতি ছোটলোকদের নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচারে ভুগে জমিদারের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী থেকে বের হয়ে গেলেন। কথায় বলে—“দুঃখে পড়ে হাড়িনী শাপে, এড়াতে পারে না বামুনের বাপে।” কথাটা বড়ই সত্যি। নিতান্ত

অধম অপদার্থ দুরাচার ব্যক্তিও যদি দারুণ ক্লেশ পেয়ে শাপ দেয়, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, উত্তম ধার্মিক ব্রাহ্মণও তার হাত এড়াতে পারেন না।'

রাধামাধব প্রামাণিকের ঠাকুরবাড়ীর উঠানে ছিল বদনচন্দ্র গুরুমহাশয়ের আখড়া। বিজয়েরা দু' ভাই এখানে এসে ভর্তি হন। তখন ১২৫৬ সাল। বদন মাস্টারের পাঠশালায় কথায় কথায় বেত। তৈয়ারী পড়া ছেলেরা ভুলে যায়, অনেক সময় মুখ দিয়ে কথাই বের হয় না ভয়ে। একটি বালককে তিনি রাম, দুই, তিন, চার বলে চার বেত দেন। সমস্ত ভীত, স্তব্ধ ছাত্রদের মধ্য থেকে বিজয় হঠাৎ বলে ওঠে, 'পণ্ডিতমহাশয়, রাম, হরি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ বলে নাম রাখলে বেশ হয়—ঠাকুর দেবতার নামও করা হয়।'

ছেলেরা সব ভয়ে ভয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে,—এবার বিজয়ের কপালে যেন কি লাঞ্ছনা, প্রহার আসে, কে জানে! কিন্তু জাঁদরেল বদন মাস্টার বিস্ময়বিমূঢ়। এ তাঁর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। নামের শক্তি তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করল। শান্ত, স্থির দৃষ্টি বিজয়ের, এই বয়সেই যেন সে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করতে শুরু করেছে—

আছে যত পাপরাশি—
নামতরঙ্গে যাবে ভাসি।

ছেলেবেলায় একদিন সায়াহ্নে আন্‌মনা হয়ে এক অজানা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয় বিজয়। লোকজন নেই; লোকবসতিরও চিহ্ন নেই। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে; ফেরার পথ সে হারিয়ে ফেলে। এমন সময় তারই বয়সী একটি বালক এসে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। দুজনে যখন লোকালয়ে এসে পৌঁছেছে তখন রাতের প্রথম প্রহর। হঠাৎ দেখা গেল বালকটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে! নিরুপায় হয়ে বিজয় মনে মনে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের স্মরণ নিয়েছিল। তাই তিনিই এসেছিলেন বালক-বেশে। বিজয় তার গৃহদেবতাকে স্মরণ করে মনে মনে প্রণাম করল।

বালক বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন প্রেম, ভক্তি ও বিনয়ের আধার, আবার দুষ্টের শিরোমণি। বয়সের সঙ্গে বাড়ে চপলতা। প্রায়ই সঙ্গীদের নিয়ে নির্ভয়ে গাছের ডালে উঠে খেলা করতেন। কখন বা সেখান থেকে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির উপর প্রস্রাব করে দিতেন, থুথু ফেলতেন। দলবদ্ধভাবে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ডুব দিয়ে লোকের পা ধরতেন। বিব্রত বোধ করলেও লোকেরা বিরূপ হত না। এমনই এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল বিজয়ের। তাঁর দৌরাত্ম্যে গৃহের সকলে থাকতেন উদ্বিগ্ন। খাদ্যদ্রব্য লুকিয়ে রাখা যেত না। শ্যামসুন্দরের জন্য আনা সন্দেশাদি ভোগ নিবেদনের পূর্বে প্রায়ই তিনি অগ্রভাগ নিয়ে নিতেন। আবার তা আনতে হত। কুকুর, বিড়াল, পাখী, পায়রা তাঁর ছিল বড় প্রিয়। যদিও গৃহে অনেক পায়রা ছিল, অপরের পায়রা উড়ে এলে তিনি ফিরিয়ে দিতে চাইতেন না। মা পায়রার দাম দিয়ে দিতেন—কেউ নিত, কেউ নিত না। একদিন এক মুসলমান গৃহস্থের ময়না তিনি চুপিচুপি বাড়ী নিয়ে আসেন। পাখীর মালিক এসে ডাকতেই ময়না 'চাচা' বলে ডেকে ওঠে। কী আর করেন? পোষা পাখীটি তিনি ফেরৎ দিয়ে দেন। গঙ্গা পূজার জন্য ধূপধুনা নৈবেদ্য নিয়ে মেয়েরা যায় গঙ্গায়, ছোঁ মেরে ভোগ-সামগ্রী নিয়ে উধাও হন বিজয়। প্রতিবেশী পীতাম্বর তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীর বাইরের অশ্বত্থ গাছ থেকে ছিট্‌কে পড়ে নীচে শরবিদ্ধ ঘুঘু পাখী। পাখীর ব্যথার ছোঁয়াচ লাগে বিজয়ের কোমল প্রাণে। কেঁদে কেঁদে বলে 'জয়গোপাল-দা, কে এমন নিষ্ঠুর খেলা খেল্‌ল, নিরীহ পাখীটির এ দশা ঘটাল!' কান্না শুনে তর্কবাগীশ মহাশয় ছুটে বের হন।

বিজয়কে বুকে নিয়ে বোঝান। এদিকে পান্তমাসী শিকারের খোঁজে এসে হতভম্ব; শপথ করে বার বার, 'এমন কাজ আর কখনও করব না, দা-ঠাকুর'।

প্রতিবেশী রামলাল তাঁতীকে দেখলেই বিজয় ক্ষেপাতেন। বুড়ো তাঁতী—দিন নাই, রাত নাই মাকু চালায়। সময়-অসময় নেই, দলবল নিয়ে তার আঙিনায় গিয়ে ছড়া কাটেন বিজয়—

তাঁতী তাঁত বুনতে মন,
দুটি কৃষ্ণ কথা শোন॥

বুড়ো কটমট করে তেড়ে আসে। ছেলেরা দেয় ছুট্। তাঁতী তার বন্ধুকে বলে একদিন, 'ঐ ছেলেগুলোর মত সুহৃদ আমার আর নেই। ওরা আমায় নাম শোনায়, আর আমার ধৈর্যশিক্ষা হয়। তিনি কত ভাবে যে কৃপা করেন!'

একজন নামডাকের কৃপণ ছিল শান্তিপুরে, সদ্ব্যয়বিমুখ, সংকীর্ণ মন। কৃপণের ধর্ম হয় না; সে বিরাট থেকে বহুদূরে বাস করে, কারো সঙ্গে হয় না তার প্রীতি ও ভালবাসার আদান-প্রদান। অভাব নেই অর্থের। শান্তিপুরের লোকেরা বলে, ওর নাম মুখে আনলে সেদিন আহার জোটে না। কিন্তু বিজয় তাঁর মনের দরজায় এমন কৌশলে আঘাত করলেন যে, ভেঙে গেল চিরদিনের কার্পণ্যের কঠিন অর্গল। দেবদ্বিজে একটু শ্রদ্ধা ছিল; সেই পুণ্যের পথে তার মনে মুক্তির আলো এসে পৌঁছল। একদিন ভোরে সেই লোকটি দরজা খুলে বের হয়েই দেখে তার দাওয়ায় একখানা কালী প্রতিমা! বুঝতে বাকী রইল না যে, এ বিজয়দের কারসাজি। বালকের ভিতর ভগবান বাস করেন, আর রুদ্রাণী কালী প্রতিমা—এই দুয়ের ভাবনায় তার মনে আসে ভাবান্তর। মানুষকে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু কে কুড়াবে দেবতার অভিশাপ? সংস্কারের কাছে স্বভাব হার মানে—পরশপাথরের স্পর্শে লোহা হয় সোনা। বিজয়ের মনের পবিত্রতার দিব্য তরঙ্গে লোকটির মনের অনুদার ভাব মুছে যায়—একটি পুণ্য প্রদীপের আলোয় যেমন করে অন্ধকার পালায়। ধুমধাম করে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কার্পণ্যের নেই লেশ। বিজয়দের উৎসাহের নেই অন্ত।

দুরন্তপনায় বিজয় ব্রজের কানাইর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাগড়ের গোয়ালিনীরা সন্ধ্যার পূর্বে ছানা নিয়ে আসে শান্তিপুরের ময়রার দোকানে। দলবল নিয়ে বিজয় গর্ত খুঁড়ে রাখে পথের মাঝে। শুক্‌নো ডাল গর্তের উপরে ফেলে ঘাসের চাপড়া আর মূল সমেত কচুবন উপড়ে সাজিয়ে রাখে তার উপর এমন নিখুঁতভাবে যেন পথের দুপাশে কচুবনের সারি। পসারিণীরা পথ চলতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেখানে; ছিট্‌কে পড়ে হাঁড়ি। ছোঁ মেরে কাজ হাসিল করে ছেলেরা, মুঠো মুঠো ছানা, ক্ষীর নিয়ে পালায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের জন্য বিজয়ের মন কেঁদে ওঠে। মার কাছে ওদের নিয়ে যায় বিজয়; বলে ওদের হয়ে, 'বড় গরীব এরা। পসরা সব পড়ে গেছে।' গোয়ালিনীদের দুঃখের কথা শুনে দয়াময়ী স্বর্ণময়ী দেবীর মন গলে যায়। চুকিয়ে দেন তিনি ক্ষীর ছানার দাম। খুশি হয়ে গোয়ালিনীরা বাড়ী চলে যায়, আর অকুণ্ঠচিত্তে বিজয়ের শুভ কামনা করে তারা।

সেকালে গ্রামে কথকতা হত। শান্তিপুরের এক ভক্ত-বাড়ীতে কথকতা হচ্ছে। রামায়ণী কথা শুনতে ছেলেবুড়ো—স্ত্রীপুরুষের ভিড়। তারণ গোঁসাইর কথকতায় শ্রোতারা মুগ্ধ। কথক মহাশয়ও একেবারে ডুবে গেছেন। আসরের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বিজয়ের উপর। বালকের গন্ডদ্বয় ভাসছে প্রেমাশ্রুধারায়।

এক গাছি মালা তার গলায় পরিয়ে দিয়ে কথক ঠাকুর বলেন, 'এর হৃদয় প্রেমের আধার।'

অজ্ঞাতপরিচয় এক মহাত্মা, চালচলন তার খাপছাড়া। শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মবিদ্‌ পুরুষের স্বভাব হয় উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, বালকবৎ। ইনি ছিলেন উন্মাদবৎ। শান্তিপুরবাসীরা তাঁর নাম দিয়েছিল শ্যামাক্ষেপা। লোকালয়ের বাইরে তিনি থাকতেন। আস্তানা বলে কিছু তাঁর ছিল না। পথে মাঠে ঘাটে, অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন ক্ষেপা। শান্তিপুরে অনেক বাড়ীতেই নিত্য দুপুরে ঠাকুরের ভোগ লাগে। শ্যামাক্ষেপা খেয়াল-খুশিমত উপস্থিত হতেন যে কোন গৃহে। যে গৃহেই যান, তাঁরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেন। কিন্তু প্রসাদ পেতে বসেই উঠে পড়েন অনেক সময়; বলেন, 'ভোগে আজ সুগন্ধের অভাব! ঠাকুর আজ অনাহারী। ফের গিয়ে ভোগ রাঁধ।' কী অনাচার হয়েছে, তাও বলে দিয়ে যান। মেয়েরা মরমে মরে যায়। কার বাড়ীতে কোন দিন হাজির হন—এই ভেবে সশঙ্ক থাকেন মেয়েরা আর খুব সাবধানে রাঁধেন ভোগের রান্না। শান্তিপুরের এক গোঁসাই শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে দেখেন জগমোহনে শ্যামাক্ষেপা দাঁড়িয়ে, অথচ শান্তিপুরে খবর করে জানেন ক্ষেপা ওখানেই তখন রয়েছেন। বালক বিজয়কে দেখে তাঁর ঘটে ভাবান্তর। ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেন আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলেন, 'কাল কুচকুচে, লাল টুকটুকে, সাদা ধব্‌ধবে আর এই হল্‌দে কিরে ভাই?' বারবার এই কথাগুলো বলে তড়িৎ বেগে চলে যান। গর্গ ঋষি বালক শ্রীকৃষ্ণকে দেখে নন্দ মহারাজকে বলেছিলেন—'শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।'

শুক্ল রক্ত পীত বর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৩।২৯-৩০

শ্যামাক্ষেপা ত্রিকালদর্শী। তাঁর সহজ সরল ভাষায় গর্গ ঋষির কথাগুলো বলে বিজয়কে করেন তিনি আদর আপ্যায়ন।

শ্যামসুন্দরের কি এক উৎসব। একজন বৈষ্ণব এসে প্রসাদ পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণদের পঙ্গত পড়ে নি, তাই তাঁকে বলা হয়, 'বসতে হবে একটু—বামুনদের তো আগে পঙ্গত পড়ুক।' বাবাজী চলে যান। কিন্তু কেউ সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। আট বছরের শিশু বিজয়ের মুখখানা কাল হয়ে ওঠে। একজন ক্ষুধার্ত বৈষ্ণব প্রসাদ পেলেন না এটা বিজয়ের কাছে অত্যন্ত অপরাধ মনে হল। অন্দরমহলে গিয়ে বিজয় বললেন, 'বাবাজী প্রসাদ না পেয়ে চলে যাচ্ছেন'। কিন্তু বালকের কথায় কর্ণপাত করেন না কেউ। অদ্ভুত দরদী, উদার বিজয়ের হৃদয়; অনুযোগের সুরে তিনি বলেন, 'ক্ষিধে পেয়েছে—প্রসাদ পাবেন, তাতে আবার আগে পরে কি?' তাঁর কথা বিকোয় না। দ্রুত ছুটে যান বিজয় বাবাজীর কাছে, তাঁর আখড়ার ঠিকানা জেনে নেন। ভোগ বেরিয়ে এলেই তিনি ছোটেন প্রসাদ নিয়ে দেড় মাইল দূরে বাবাজীর আখড়ায়। এরপর কত দিন যে দুপুরে খেতে বসে ঐ বাবাজীর জন্য বিজয়ের মন কেমন করে উঠেছে, আরো কত দিন যে প্রসাদ নিয়ে ছুটে গেছেন বিজয় বাবাজীর আখড়ায় রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে।

অদ্বৈত প্রভুর যোগ্য বংশধর! বলাবলি করে শান্তিপুরের লোক। অদ্বৈতাচার্য

আর ভক্ত হরিদাসের কথা উদিত হয় কারো মনে।

হরিদাস কহে—গোসাঞি করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।৩।২০৫

অদ্বৈতাচার্যের বাড়ী থেকে প্রত্যহ পারস যেত ভক্ত হরিদাসের গোফায়। পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করিয়েছিলেন তাঁকে। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, কিন্তু বৈষ্ণবজন তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রথাসিদ্ধ লোকধর্মের ঊর্ধ্বে পরাধর্ম—সম্পূর্ণ ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ হল বৈষ্ণবজন। সেজন্য ব্রাহ্মণভোজন অপেক্ষা বৈষ্ণবভোজন পবিত্র অনুষ্ঠান।

আচার্য কহেন, তুমি না করিও ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্র মত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করায় ভোজন॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।৩।২০৮-৯

এই ঘটনায় প্রথমে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা অদ্বৈতাচার্যের বিরুদ্ধাচরণ করেন। আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা অভুক্ত ফিরে যান। অদ্বৈত প্রভুও পরিজনবর্গের সঙ্গে নিরম্বু উপবাসী থাকেন। ব্রাহ্মণ শালগ্রাম পূজার অধিকারী; কিন্তু ব্রাহ্মণী নন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে কিন্তু বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী উভয়েরই শালগ্রাম পূজায় অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

অদ্বৈত প্রভু সর্বশাস্ত্র-নিষ্ণাত পণ্ডিত—নির্মল ধর্মপ্রাণ. সদাচারনিষ্ঠ। সত্যে যিনি অবিচল, শাস্ত্রে যাঁর সুদৃঢ় শ্রদ্ধা, যিনি শাস্ত্রমূর্তি—তিনি কি কখন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করতে পারেন? এই প্রশ্ন উদয় হল জ্ঞাতিদের মনে। পরস্পরের মধ্যে প্রচুর আলোচনার পর তাঁরা পরের দিন নিজেরাই গেলেন অদ্বৈত প্রভুর কাছে। প্রভুর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় তাঁদের অন্তরের সমস্ত দ্বিধা সংশয় দূর হল। নিজেরাই তখন সিধা চেয়ে নিলেন। কিন্তু অহংকার বড় অনমনীয়। নিজের ত্রুটি কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় না। কেহই নিজের আচরণের জন্য ত্রুটি স্বীকার করলেন না।

দৈবের কী বিচিত্র খেলা! প্রবল বৃষ্টি আর দমকা হাওয়ায় সেদিন শান্তিপুর আর আশেপাশের সর্বত্র—কোন গৃহেই রান্না সম্ভব হল না, আগুন নিবে যেতে লাগল বারবার। তখন খেয়াল হয় সবার, আচার্যের অপমানে বুঝি দৈব বিরূপ। ক্ষিধেয় কাতর হয়ে সবাই প্রভুর গৃহে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে পূর্ব দিনের বাসি প্রসাদ ভিক্ষা চান। অদ্বৈতাচার্য নিয়ে যান ওঁদের হরিদাসের কাছে। তাঁর আলিসায় আগুন জ্বলছিল, তাঁর কাছে জ্ঞাতিরা অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চান ও অগ্নি ভিক্ষা করেন। এরপর প্রকৃতির প্রসন্নরূপ দেখা গেল।

চতুষ্পাঠীতে পাঠ ও উপনয়ন

বদন মাস্টারের আখড়ায় বিজয়কৃষ্ণের বেশী দিন শিক্ষালাভ সম্ভব হয় নি। স্বর্ণময়ী দেবী কিছুদিনের জন্য শিকারপুর গেলেন, সঙ্গে ছেলে দুটি। ওখান থেকে ফিরে এসে বিজয়কৃষ্ণ গোবিন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের টোলে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করার পর কাব্য পাঠ করেন। মুগ্ধবোধ বইটির কাঠের মলাট ছিল এবং তা

শালু-বস্ত্রে আবৃত; মলাটের উপর গো-বৎস ও কৃষ্ণ-বলরামের ছবি। পাঠ শুরু হবার পূর্বে প্রত্যহ তন্ময় হয়ে বিজয় কৃষ্ণ-বলরামের ছবি দেখতেন। তাঁর দুচোখ বয়ে অবিরল ধারায় জল পড়ত। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বিজয়ের এই ভাবাবেগ লক্ষ্য করে বলতেন, 'এই বয়সেই এমন ভগবৎপ্রেম। পূর্ব জন্মে ও নিশ্চয়ই উচ্চস্তরের সাধক ছিল।' আবার কখনও সস্নেহে তিনি বলতেন, 'বিজয় এক ক্ষেপা ছেলে'। টোলের পাশে হরিনারায়ণ গোস্বামীর গৃহদেবতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-বিগ্রহ। পাঠ-বিরতির ফাঁকে বিজয় শ্রীমূর্তি দর্শন করতে গিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকান। অধ্যাপক তাঁকে বলেন, 'টোলে এসে রোজ রোজ কি আবার বিগ্রহদর্শন! পড়াশুনা আগে শেষ করে নে, তারপর যত পারিস ঠাকুরদেবতা নিয়ে থাকিস। ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ—এ কথাটি ভুলিস না।' শ্রীপঞ্চমীতে টোলে অঞ্জলি দিতে গিয়েও বিজয়ের হৃদয় আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে। তাঁর ভাবতরঙ্গ দেখে ভট্টাচার্য মহাশয় মন্তব্য করেন, 'এই কচি বয়সে অমনধারা যার ভাবভক্তি, সে অদ্বৈত প্রভুর বংশের গৌরব বাড়াবে বৈকি!' কেবল ভগবদ্ভক্তিই নয়, শৈশব থেকেই দয়া-মায়া তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল। টোলে যাবার পথে মা যে একটি করে পয়সা তাঁকে দিতেন জলখাবার কিনে খেতে, তা পথে রাধানাথ প্রামাণিক নামে এক দুঃখীকে তিনি রোজই দিয়ে দিতেন।

কি শিকারপুরে, কি শান্তিপুরে, কি ভগবান সরকারের পাঠশালায় বা হেজেল সাহেবের বিদ্যায়তনে, কি বদন মাস্টারের আখড়ায়, কি চতুষ্পাঠীতে, বিদ্যাশিক্ষায় বিজয় ছিলেন পুরোধা। এক বছরেরও কম সময়ে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করে তিনি নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মেধা, স্মৃতিশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ। দুরূহ পাঠ অনায়াসে তিনি করতেন আয়ত্ত। গোবিন্দ ভট্টাচার্যের টোলে পাঠ শেষ করে বিজয়কৃষ্ণ তাঁর জ্ঞাতি কাকা প্রভুপাদ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী তর্করত্ন মহাশয়ের কাছে প্রথমে সাংখ্য দর্শন ও পরে বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করেন। গভর্নমেণ্ট কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন মহাশয়কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাবিক্রয় ব্রাহ্মণের সার্থক বৃত্তি বোধ না হওয়ায় তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন নি, নিস্পৃহ কৃষ্ণগোপাল আজীবন শিক্ষাদান করে গেছেন।

১২৫৭ সালে শুভদিনে ন' বছর বয়সে, ষড়দর্শনবেত্তা পণ্ডিত প্রভুপাদ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ই বিজয়কৃষ্ণকে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করেন। মুণ্ডিতমস্তক বালক যজ্ঞোপবীত ও গৈরিক ধারণ করে বাল-ব্রহ্মচারী বেশে এগারো দিন দণ্ডগৃহে থেকে ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি শিক্ষা করেন। সদাচারী গুরুর আদেশে ও শিক্ষায় বিজয় যজ্ঞসূত্র ধারণ করেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠেন। প্রভাতে গঙ্গা স্নানের পর বিজয় যখন বৈদিক সঙ্গীত করতেন তখন মনে হত যেন ঋষির তপোবন থেকে সুমধুর সুরলহরী ভেসে আসছে।

উপনয়নের পরই জননীর নিকট হয় তাঁর কুলদীক্ষা। গুণমুগ্ধ বালক কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয়কেই স্বেচ্ছায় উপগুরু পদে বরণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পরই তিনি তাঁর চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। উপনয়নের পর নৈষ্ঠিক বাল-ব্রহ্মচারী ধারণ করেন কণ্ঠী, তিলক, শিখা; স্নানান্তে ফুল তুলে—তিনি নিজেই করেন শ্যামসুন্দরের সেবাপূজা। ধ্যান, জপ, কীর্তন, আরাধনা—সবদিক থেকেই হরিবলা। জীবে দয়া, আর ভক্ত-ভাগবতে ভক্তি, সদ্‌বংশে জন্ম, সৎসঙ্গ, সাধন—ধর্মজীবন লাভের সমস্ত মহৎ গুণের সমাবেশই হয়েছিল তাঁর মধ্যে।

এমন উত্তম আধারে শৈশব থেকেই ছিল অনন্য ঈশ্বরানুরাগ। বিগ্রহ সেবার আগ্রহও ছিল তাঁর অদম্য। উপনয়নের পর বাধা নিষেধ হয় অপসারিত। নিতান্ত সখ্যভাবে ঠাট্টা-তামাসা করেন তিনি শ্রীমূর্তিকে, বলেন, 'নিষ্কর্মা ঠাকুর নিজে কিছুই করবে না অথচ এটা চাই, ওটা চাই—সময়ের হেরফের হবার জো নাই'। দোল-পূর্ণিমায় সোনার বালা পরাতে শ্যামসুন্দরের হাতে লাগে আঁচড়, সমবেদনায় বিজয় গুমরে গুমরে কাঁদেন।

কুমারপাড়ায় রামলালের মা'র কলেরা। কেউ যায় না অনাথার কুঁড়ের চতুঃসীমানায়। বিজয়ের নেই সময়-অসময়। প্রাণঢালা সেবাযত্নে বৃদ্ধার পরমায়ু যায় বেড়ে। প্রতিবেশীরা বলাবলি করে, 'ছোঁড়ার না আছে ডরভয়, না আছে ঘেন্নাপিত্তি; অদ্বৈত প্রভুর বংশের ছেলে হয়ে শুদ্দুরের গু-মুত কাচে।' যাঁরা তাঁকে চেনেন, তাঁরা বলেন, 'বিজয়ের যে বসুধৈব কুটুম্বকম্।'

চৈত্র দ্বিপ্রহর। প্রখর সূর্যতাপে ফাটল ধরে মাঠে। পাখীরা ঝিমোয় কুলায়ে বসে, ঘর ছেড়ে সহজে বের হয় না কেউ। জলসত্রে জল দেবার লোক নেই। বিজয় পথচারীদের যোগান তৃষ্ণাবারি—শীতল অমৃত। ত্রিতাপের জ্বালা জুড়াতেই যে ওঁর আসা—এ তারই পূর্বাভাস।

বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে শ্যামচাঁদের মন্দির-প্রাঙ্গণের আটচালায় হত সাধু সমাগম, দূর-দূরান্তর থেকে আসতেন সাধু-সন্ন্যাসীরা রাস-পূর্ণিমায়; এই সাধুসঙ্গ ছিল বিজয়ের বিচিত্র আকর্ষণ। কোন কোন সাধু অজিন-আসনে বসে ধ্যানমগ্ন; কেউ বা অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে হোমাগ্নিতে আহুতি দিচ্ছেন। বিজয় মুগ্ধ হয়ে তাঁদের দেখতেন। বিজয়কে বাল-গোপালের মর্যাদা দিতেন সাধুরা। তাঁরা সস্নেহে তাঁকে পাশে বসিয়ে বালকের শুভ লক্ষণাদি নিরীক্ষণ করে মুগ্ধ হয়ে হিন্দি বা গুরুমুখীতে নিজেদের মধ্যে অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা করতেন। তাঁরা বলতেন, 'এ বালক অসাধারণ। ইনি নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষ।' তাঁরা বিজয়ের সর্বাঙ্গে বিভূতি মেখে দিতেন। তাঁরই কাপড় ভাঁজ করে কৌপীনের মত করে পরিয়ে দিতেন। এক রাত্রে তো ওঁদের কাছেই ওঁরা ওঁদের আসনে শুইয়ে রেখেছেন! এদিকে গৃহে খোঁজাখুঁজি, ছোটাছুটি চলছে।

বক্তারঘাটে অশোকবটের ছায়ায়, মনোরম পরিবেশে লছমন দাস বাবাজীর কুঞ্জ। তিনি ছিলেন ভারী সুকণ্ঠ। তাঁর ভজন আর সুরসংযোগে দোহাবলী-আবৃত্তি সেখানে সৃষ্টি করত এক অপূর্ব সুর-ঝংকার। শুনে কখনও বিজয় একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়তেন। বাবাজী বিজয়ের সঙ্গীদের বলতেন, 'একেই বলে মহাভাব। ওঁর হৃদয়ে বইছে মধুর রসের তরঙ্গ।' বিজয়ের বাল্য-সখা গোপালকিশোর গোস্বামী বলেছেন, 'বিজয় এই শান্তিপূর্ণ পবিত্র তপোবনে বসে ভক্তিভরে সুরে সুর মিলিয়ে গান ধরতেন। অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে তাঁর দেহে মুহুর্মুহুঃ কম্প হতে থাকত—ওরূপ কম্প কখনও দেখি নি। আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে বাবাজী আমাদের আশ্বস্ত করতেন।' নাম শোনাতে শোনাতে ফিরে আসত তাঁর সম্বিৎ। কিশোর আর প্রৌঢ়ের মধ্যে দিন দিন গড়ে ওঠে প্রেমপ্রীতির নিগড়। বাবাজী ছিলেন ওড়িষ্যার অধিবাসী। স্থানটি সাধন-ভজনের অনুকূল বলে এখানে তিনি আশ্রম করে ছিলেন বহুদিন; বাবাজী চমৎকার বাংলা বলতেন।

দোল-পূর্ণিমার দিন বিজয় সদলবলে যান বাবাজীর কুঞ্জে। বাবাজী খুশি হয়ে বলেন, 'এই যে মহাপুরুষ, এসেছ'! বাধা দিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে বিজয় বলেন, 'ও

বুঝেছি, আপনি চান না যে আমি আপনার কুঞ্জে আসি!' লছমনদাসজী সুললিত কণ্ঠে গান ধরেন—

লালা—একেলা পাইয়াছি হেথা।
পরাণ, পলাইয়া যাবে—কোথা?
আজ হোলি খেলবো গো শ্যাম, তোমার সনে।
একেলা পাইয়াছি বঁধু, তোমায় নিধু বনে॥
শুন ওহে বনমালী, আজ বুঝব তোমার নাগরালি।
কুম্‌কুম্‌ দেবো তোমার রাঙা চরণে॥

মাটির আঙিনায় নেমে আসে নিত্যবৃন্দাবনের পুণ্যধারা, উভয়ে ভাসেন প্রেমাশ্রু-ধারায়।

বিজয় একদিন কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে গঙ্গার অপর পাড়ে বৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহ দর্শনে যান। এই মন্দিরের চূড়া শান্তিপুরের স্নানের ঘাট থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। বৃন্দাবনচন্দ্রের লীলামাধুরী বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীমূর্তির সেবক বলেন, 'শান্তিপুরের এক ভক্ত ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করার সময় এই বিগ্রহ পেয়ে গৃহে এনে প্রতিষ্ঠা করে সেবাপূজা করতে থাকেন; কিন্তু শ্রীমূর্তি তাঁকে স্বপ্নে আদেশ করেন, "আমি গৃহস্থের গৃহে থাকি না। তুমি আমাকে গুপ্তিপাড়ায় সন্ন্যাসী সত্য-দেব সরস্বতীর নিকট রেখে এস—নইলে তুমি নির্বংশ হবে।" ভক্ত বলেন, "ঠাকুর, তুমি আমাকে কিসের ভয় দেখাও? আমার সব যাক, তোমাকে আমি ছাড়ব না।" ব্রাহ্মণ হলেন সর্বহারা। নিজেও একদিন চোখ বুজলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যা সেবাপূজা করেন। একদিন বৃন্দাবনচন্দ্র সত্যদেব সন্ন্যাসীকে স্বপ্নে নির্দেশ দেন তাঁকে গুপ্তিপাড়ায় নিয়ে যেতে। সন্ন্যাসী ভক্ত-কন্যার কাছে মূর্তি যাচ্ঞা করে নিয়ে যান।'

বিগ্রহকে দর্শন করে এবং তাঁর মাহাত্ম্য শুনে বিজয় সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেন। বহুক্ষণ নাম করার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে।

মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী অদ্বৈত প্রভুর জন্মতিথি। ঐ দিন শান্তিপুরে উৎসব। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি। ঐ দিন একচক্রায় উৎসব। আর মাঘীপূর্ণিমায় গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস। এই তিন প্রভুর তিন বিশেষ দিনের স্মরণোৎসব—'ধূলট'। শান্তিপুরে প্রতিপদ থেকে সপ্তমীর দিন পর্যন্ত উৎসব হয়; শেষ দিনে নগর-সংকীর্তন বের হয়, কীর্তনীয়ারা পরস্পরের গায়ে ধূলি ছুড়ে আনন্দ করেন। ধূলি বর্ষণ থেকে উৎসবের নাম ধূলট। শান্তিপুরে তখন খুব সমারোহে ধূলট হত। বিজয়ের খেয়াল হল, 'আমরা একমাস ধরে ধূলট করব'। যেমন ভাবা, তেমনই কাজ। পথে লোক চলাচল বন্ধ। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বর ঘোষালের কানে গেলে তিনি 'বালাহস্তী' পাঠান। কনেস্টবল পাহারাওয়ালাদের তখন বালাহস্তী বলা হত। ওদের উপর গোপন হুকুম ছিল হাকিমবাবুর, 'এরা সব ভদ্রসন্তান। এদের কারো গায়ে যেন আঁচড়টি না লাগে। দূর থেকে তাড়া করে কাজ হাসিল করবে।' ওদের তিন সপ্তাহব্যাপী চেষ্টায় ধূলট ভাঙে।

বিজয়ের অনুগামী ছিল শতাধিক বালক। বয়ঃকনিষ্ঠ হয়েও সাহস, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অধিকারী থাকায় স্বতঃসিদ্ধভাবেই যেন বিজয় নেতৃপদ দখল করে নিয়েছিলেন। বাল্যসহচরগণ বিজয়ের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। প্রাণ দিয়ে ওরা বিজয়কৃষ্ণকে ভালবাসত। বর্ষায় কাদার জন্য গঙ্গার ঘাটে চলা দুরূহ। বাল্য-

সখাদের নিয়ে কোদালি সংগ্রহ করে বিজয় নালা কেটে পথটিকে সাধ্যমত চলাচলের উপযোগী করে তুলতেন। জনকল্যাণের কাজে তাদের উদ্যম দেখে বয়োজ্যেষ্ঠেরা করতেন তাদের শুভকামনা।

বিজয়ের মধুময় চরিত্র আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলকেই একান্ত মুগ্ধ করে তুলেছিল। তাঁর চরিত্রে চাঞ্চল্য, দৌরাত্ম্য, দয়া, সরলতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি বহু বিচিত্র গুণের সমাবেশ তাঁকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। বিজয় সাথীদের নিয়ে দেবদেবী সেজে অভিনয়ও করতেন; বিজয়ের কণ্ঠস্বর মধুর বলে তিনি অভিনয়ে গান করতেন। যাত্রাগানে বিজয় আড়াল থেকে বক্তব্য বলে দিতেন। অটলবিহারী গোস্বামী ও রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ছেলেদের দলে বাজিয়ে ছিলেন। যাত্রাগান করার জন্য কেউ তাদের আমন্ত্রণ করতেন না। কারণ তাদের দৌরাত্ম্যের ভয় সকলেই করতেন। সুতরাং ওরা নিজেরাই আলো ও শতরঞ্চি ঘাড়ে করে রাত্রে প্রতিবেশীর গৃহে গিয়ে যাত্রাগান গাইতেন। বাল্যকালে বিজয়কৃষ্ণের দুরন্তপনা কারো চেয়ে কম ছিল না বরং ছিল বেশি—নইলে এমন দলের নেতাই বা কি করে হবেন?

ঐ সময় শান্তিপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার রায়বাবু ও চাটুয্যেবাবুর মধ্যে নীলক্ষেত নিয়ে প্রায়ই দাঙ্গা হত। ঐ দাঙ্গার অভিনয় করতে গিয়ে বিজয়ের ছুরির আঘাতে সংজ্ঞা হারায় এক কাঁসারী বালক। রক্ত দেখে ভয়ে ভয়ে আর সব ছেলেরা পালিয়ে যায়, নিজের পরিধেয় ছিঁড়ে বিজয়কৃষ্ণ জলধারা দিতে থাকেন বালকের ক্ষত স্থানে। বালকের মা খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখেন বিজয় অতি যত্নে ছেলেটির পরিচর্যা করছেন। পরদিন থেকে বিজয় প্রতিদিন আহত বালকের জন্য নিজে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ বয়ে নিয়ে যেতেন; খেলতে যান নি তিনি যতদিন না সেই বালক সুস্থ হয়ে উঠেছিল। এমনটি না হলে কি নেতা হওয়া যায়।

বিজয়ের সহপাঠী রামরক্ষিত মিত্র বলেছেন, 'পাড়ায় আমরা শতাধিক বালক ছিলাম। বিজয়ের বাটী, আন্না ঠাকুরাণীর বাগান, মধু ভট্টাচর্যের বাটীর প্রাঙ্গণ, সিংহদের বহির্ভাগ, শ্যামচাঁদুনীতলাতে আমাদের খেলার জায়গা ছিল। আমরা ঘোড়ানুটী, দাণ্ডাগুলি, নকেসা প্রভৃতি খেলতাম। পাড়ায় পাড়ায় 'হোল-বোল' গেয়ে বেড়াতাম। প্রচুর চাল, ডাল সংগ্রহ করে আমরা মহোৎসব করতাম।'

বিজয়কৃষ্ণের বাল্যসঙ্গী কৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামী মহাশয় বলেছেন, 'গ্রামের প্রান্তে গিয়ে আমরা প্রায়ই বনভোজন করতাম। ঘোড়ালের মাঠে—নির্ঝরের ধারে, দেবী রায়ের আমবাগানে আমাদের বনভোজনের স্থান ছিল। রান্নায় ব্রজগোপাল ও বিজয় সুপটু ছিল। রান্নার পর বিজয় আশেপাশের রাখাল ও কৃষক বালকদের ডেকে নিয়ে আসত। রথডাঙ্গার মুচির ছেলেমেয়েরা ও ভেড়ীপাড়ার বালকেরাও আমাদের আনন্দভোজনে এসে যোগ দিত। আহারান্তে আমরা তাদের নিয়ে খেলাধুলা করতাম। কখন বা গোষ্ঠলীলা হত। ব্রজগোপাল ও বিজয়, বলরাম ও কৃষ্ণ সেজে গোচারণ করতেন। আমার বেশ মনে আছে, বিজয় কোমল তৃণগুচ্ছ নিয়ে ধেনুদের আহার দিচ্ছেন। আমরা অঞ্চলে মুড়ি নিয়ে রাখাল বালকগণের সঙ্গে ধেনুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে যাচ্ছি, কখনও বা বিজয়ের কাঁধে উঠে চলেছি। হিংসা বিদ্বেষ আমাদের মনে ঠাঁই পেত না।'

রামযাদু নামে বিজয়ের এক সঙ্গী ছিল। তার মা ভিক্ষা করে জীবিকানির্বাহ করতেন। মা যেদিন রামযাদুকে ভিক্ষায় পাঠাতেন, বিজয়কৃষ্ণ সেদিন ঘর থেকে চাল নিয়ে তাকে দিতেন—সেদিন তার অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন হত না। এমনই

ছিল বিজয়ের সখাপ্রীতি! আর শুধু চাল কেন? মাঝে মাঝে তাকে কাপড়-জামাও দিতেন।

শান্তিপুরে গঙ্গাস্নানের মেলা। বিজয় গিয়েছেন সদলবলে মেলা দেখতে। চোখে পড়ে একজন স্ত্রীলোক অসহায়ভাবে কাঁদছে আর তার পাশে একটি ছেলে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে! ছেলেটির কলেরা হয়েছে। সহযাত্রীরা ওদের ফেলে চলে গেছে। ছেলেটিকে ছটফট করতে দেখে বিজয় কেঁদে ফেলেন। পালকির ব্যবস্থা করে তিনি ছেলেটিকে গোকুলচাঁদের নাটমন্দিরে নিয়ে ওঠান; ডাক্তার এনে দেখান, ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করেন। ছেলেটির মা ও বিজয়ের পরিচর্যায় ছেলেটি ভাল হয়ে ওঠে। বিজয়ের বাল্যসখা গোলোককিশোর গোস্বামী মহাশয় এই ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেছেন—'বিদায়কালে ছেলেটির মা বিজয়ের সর্বাঙ্গে তাঁর হাত বুলিয়ে দিয়ে শুভ-কামনা করেন। বিজয় সেই বালকের শীর্ণ দুর্বল হাত দুখানা ধরে কেঁদে ফেলে। আমরা সকলে হা করে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পরের জন্য যে এভাবে কাঁদে সে নিশ্চয়ই দেবতা। শতকাজে আমরা বিজয়ের করুণার পরিচয় পেয়েছি। বিজয়ের সংস্পর্শে অতি মলিন জীবনও পুণ্যময় হয়ে উঠেছে। জীবনপথের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে এখনও পুরানো দিনের সেই কথা ভুলি নাই।'

সত্যানুরাগ ও দলের নেতৃত্ব

শৈশব থেকেই বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন যেমনি সহজ সরল ভাবুক প্রকৃতির, ঠিক তেমনি ছিলেন নির্ভীক সত্যানুরাগী ও সংকল্পে দৃঢ়চেতা। নিতান্ত অল্প বয়স থেকেই তিনি নেতা ও প্রবর্তক; জনসেবায় তিনি ছিলেন এক অগ্রণী দরদী স্বেচ্ছা-সেবক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গুণগুলি সবই বাড়তে থাকে। চতুরতা, চঞ্চলতা, দুরন্তপনা বিকশিত হয় ধর্মপ্রবণতার অনুকূলে।

এগারো বছর তখনও পূর্ণ হয় নি। রংপুরে গিয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ শিষ্যদের গাঁয়, সদ্‌গোপ এক শিষ্যের কাছে। গোঁসাই কর্তারা এই শিষ্যের কাছে প্রণামী চেয়েছিলেন তিন শ' টাকা। অনাদায়ে তাঁরা করেছেন তাকে 'একঘরে'। বিজয়কৃষ্ণের কানে এ কথা উঠতেই তাকে তিনি ডেকে পাঠান ও বিনাসর্তে তাকে সমাজে তোলেন। সে লুটিয়ে পড়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে গুরুপুত্রের পায়ে, প্রণামী দেয় টাকার তোড়া, কোনও ওজর-আপত্তি শোনে না। খবর পেঁছে শান্তিপুরে; বিজয় ঐ শিষ্যকে সর্তহীনভাবে জাতে তুলেছেন। ওঁরা রেগে হন অগ্নিশর্মা। কেউ বা বলেন, 'সোনার চাঁদ ছেলে; কিন্তু এটা কি করে ফেলল?' আবার কেউ বা বলেন, 'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি'! বিজয় শান্তিপুর ফিরে এলে ওঁরা বলেন, 'আমা-দের মুখে তুমি কি করে কালি মেখে এলে? হাতের লক্ষ্মী কখনও এভাবে ঠেলে ফেলতে হয়?' ধীর অথচ বিনীত কণ্ঠে বিজয় বলেন, 'গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক তো আর জমিদার-প্রজার দেনা-পাওনার ব্যাপার নয়। ওদের নিবৃত্ত করার কত চেষ্টা করলুম তথাপি পাঁচ শ' টাকা প্রণামী দিয়েছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে!' টাকার তোড়া বিজয় ওঁদের হাতে তুলে দিলেন। ওঁদের আক্কেল-গুড়ুম। চোখ রাঙিয়ে যা পারেন নি ওঁরা, ওঁদেরই এই দুধের ছেলে গিয়ে নিয়ে এল অতগুলো টাকা! এ শুধু বিজয়কে দিয়েই সম্ভব!

ঘোড়া চড়ার সখ ছিল বিজয়কৃষ্ণের—সতীর্থদের সঙ্গে। সাধ মেটাতেন ওরা মাঠে পেতি ঘোড়া চড়ে। পেসা ধোপার উপর ভার ছিল ঘোড়া ধরে আনার। বিজয়দের বাড়ীর উত্তর-পূর্ব কোণে 'কুচুই বনে' ঘোড়া ধরে বেঁধে রাখা হত। শ্মশান থেকে শবের খাটিয়ার দড়ি এনে লাগাম বানাত পেসা। ছেলেরা সব যুক্তি করে মন্তব্য করে, 'আধমড়া ঘোড়া চড়া আর গাধার পিঠে সওয়ার হওয়া একই কথা। যদি হয় মালিপোতার জমিদার অম্বিকাবাবুর সেই তেজী ঘোড়াটি, তাহলেই বলতে পারা যায় "ঘোড়ায় চড়েছি"; আর হাকিমবাবুর ঘোড়া হলে তো কথাই নেই।' আস্তাবল থেকে উধাও হয় জমিদারবাবুর ঘোড়া। দুদিন বাদে সন্ধান মেলে গোঁসাইপাড়ায়। ওঁর সখের ঘোড়াটির খোঁজ পেয়ে জমিদারবাবু নিজে আসেন ঘোড়া নিতে। ঘোড়াটিকে লুকিয়ে রাখার কথা ছেলেরা অস্বীকার করে। পরে বিজয়কে পেয়ে অম্বিকাবাবু রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কী করে এখানে এল?' বালক নির্ভয়ে বলে আদ্যন্ত। মুগ্ধ হন জমিদারবাবু বিজয়কৃষ্ণের সৎ সাহস ও সত্যানুরাগ দেখে। স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'এই ঘোড়াটি আমি তোমার জন্য আলাদা করে রাখব। যখনই তোমার ঘোড়া চড়ার সাধ হবে, তুমি এসে নিয়ে যাবে। আমি জিন লাগিয়ে দিতে বলব।'

শান্তিপুর তখন মহকুমা-শহর ছিল। মহকুমা-হাকিম ছিলেন জাঁদরেল এক অফিসার। নাম ঈশ্বর ঘোষাল—মেজাজ ভারি কড়া। তাঁরও একটি তেজী ঘোড়া ছিল। বিজয়ের সখ হয়, ঈশ্বরবাবুর ঘোড়াটি চড়েন। যেমন ইচ্ছা, তেমনই ব্যবস্থা। সাঁঝের আঁধারে ছেলেরা আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে আসে। পরদিন সহিস আর চাপরাশি ঘোড়ার খোঁজে ছোটে মাঠে মাঠে। ওদের দেখে ছেলেরা সব পালায়। প্রসন্ন নামে একটি ছেলে লাগাম বাঁধছিল; সে কুয়ার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। বিজয় ছিলেন সওয়ার। নিয়ে যায় তাঁকে ওরা মনিবের কাছে। ধমক দিয়ে হাকিমবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি আমার ঘোড়া নিয়েছিলে?' বিজয় উত্তর করেন, 'হাঁ'। হাকিমবাবু আবার প্রশ্ন করেন, 'কেন নিয়েছিলে?' বিজয় বলেন, 'সবাই মিলে চড়ব বলে।' হাকিমবাবু এবার রেগে বলেন, 'জান, আমি কে?' বিজয় উত্তর দেন, 'হাঁ জানি, হাকিমবাবু।' এমন জবাব তিনি মোটেও আশা করেন নি। তাই, আরও উষ্মাভরে প্রশ্ন করলেন, 'না বলে নিলে কেন?' বিজয় আগের মতই ভয়লেশহীন পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'চাইলে, আপনি দিতেন কি?' বিস্মিত হলেন হাকিমবাবু। নরম হয়ে তাই বললেন, 'আমার ঘোড়া নিতে ভয় হল না?' নির্ভীক বিজয় স্থির কণ্ঠে উত্তর করলেন, 'না'। মুগ্ধ হলেন ঘোষাল মহাশয় কিশোরের সাহসিকতা, সরলতা ও সত্যপ্রিয়তায়। তাই, তিনি তাঁকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি? তুমি কার ছেলে?' উত্তর পেলেন, 'শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। পিতা স্বর্গীয় আনন্দকিশোর গোস্বামী; আমরা শ্যামসুন্দরের বাড়ীর।' কণ্ঠে স্নেহ ঢেলে হাকিমবাবু বিজয়কে বললেন, 'যখনই তোমার ঘোড়া চড়ার ইচ্ছা হবে, আমাকে এসে বল। সহিসকে আমি জিন গদি তখন জুড়ে দিতে বলব।' সত্য ও সরলতার শক্তি আশ্চর্য—সকলের মনেই তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে।

কালনায় ঝুলন দেখার সখ। বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গীদের নিয়ে এক সন্ধ্যায় ঘাটে যান। জেলেরা সারি সারি নৌকা বেঁধে রেখেছে, লোকজন নেই। একখানিতে উঠে বসেন বিজয় সহচরদের নিয়ে। তারপর নৌকার দড়ি খুলে দাঁড় ফেলেন। কালনায় পৌঁছার পরই আকাশে মেঘ জমে। আনন্দ করে সবাই মিলে ঝুলন উৎসব দেখতে থাকেন। কিন্তু এমন বৃষ্টি নামল—আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ে। ভোরে প্রকৃতি শান্ত

হল। সেই স্নিগ্ধ পরিবেশ দেখে বোঝা ভার যে কিছু সময় পূর্বেও চলেছিল নটরাজের প্রলয়নাচন। কিন্তু দিনের বেলায় নৌকা নিয়ে ফিরলে জেলেদের সঙ্গে হবে কথা কাটাকাটি। নৌকা ওখানে বেঁধে রেখে খেয়া-পথে ফিরতে হবে বলে বিজয় নির্দেশ দেন। কিন্তু ও হরি! খেয়ার পারানি পর্যন্ত যে সঙ্গে নেই। ওরা সংখ্যায়ও তো কম নয়। বিজয় গিয়ে খেয়া-মাঝিকে বলেন, 'ভাই, আমাদের পার করে দাও। আমাদের কাছে আজ কিছুই নেই। যদি রাজী না হও, তা হলে আমাদের বাড়ী ফেরা হয় না।' খেয়া-মাঝির মন গেল গলে। সে বলল, 'চল তাড়াতাড়ি'। বিজয় বাড়ী পৌঁছে মাকে সব খুলে বলেন। এদিকে ডিঙ্গি না পাওয়ায় জেলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বিজয় বলেন মাকে, 'নৌকার খবরটা এবার জেলেকে দিয়ে আসি, নইলে বড় দুশ্চিন্তা করবে। যদি আমাকে দেখে চেঁচামেচি করে, তা হলে গোটা দু' এক টাকা দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। মায়ের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে অবিলম্বে জেলেবাড়ী ছুটে যান বিজয়। সেখানে গিয়ে তাকে টাকা দেন, তারপর অকপটে সব তিনি খুলে বলেন। জেলে যেন হাতে স্বর্গ পায়।

বিজয়কৃষ্ণের বাল্যসঙ্গী গোলোকবিহারী গোস্বামী মহাশয় বলেছেন, 'বিজয়ের মধুর স্বভাব আমাদের আকৃষ্ট করেছিল। আমরা তাঁকে ভালবেসেছিলাম। তাঁর পাশে বসতে না পারলে অস্বস্তি বোধ হত। তাঁর ধীরতা, তাঁর স্নেহালাপ, তাঁর মধুর ভাব দেখে কেউ তাঁকে ভাল না বেসে পারত না। ধর্ম ছিল তাঁর হৃদয়ের ধন। আমরা চড়ক পূজা করতাম। যথারীতি আমাদের গাজন বসত। আমরা গৈরিক বসন পরে সন্ন্যাসী সাজতাম। বিজয় হতেন মূল সন্ন্যাসী। বিধিমত আমরা কাঁটা ভাঙতাম। শিয়ালকাঁটার গাছ বিছিয়ে গড়াগড়ি দিতাম। শ্মশান থেকে মড়ার মাথা এনে অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে তা নিয়ে খেলতাম। তারপর শিবপূজা হত। বিজয় নিজে মূর্তি গড়তেন। সে কি মনোহর মূর্তি! বাঁশের চড়ক বানিয়ে আমরা পাক খেতাম।'

জ্যৈষ্ঠের এক রাত্রে আগুন লাগে তাঁতীপাড়ায়। জটলা আর চেঁচামেচিই সার। তাঁতীরা সব কপাল চাপড়ায়। একখানি চালায় তখন আগুন, বিজয় তাঁর দলবল নিয়ে আসেন—ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁরা আগুন নেবান। বয়স তখন তের-চৌদ্দ। অগ্নি দেবকে কিঞ্চিৎ দিয়ে তন্তুবায়টি তার তাঁত নিয়ে রেহাই পায়। বিজয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় ও সাহসিকতায় সেদিন গোটা তাঁতীপাড়া রক্ষা পায়।

বর্ষায় বাওড়ের শুকনা খালও জলে টলমল, আর খড়ভাঙ্গা স্রোত। গ্রামান্তর থেকে ফেরার পথে বিজয়ের চোখে পড়ে একটি ছেলে স্রোতের পাকে তলিয়ে যাচ্ছে। নিজের জীবন তুচ্ছ করে বিজয়কৃষ্ণ জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছেলেটিকে তুলে আনেন পাড়ে; ভিড় জমে। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর ছেলেটির শ্বাস বইতেই বিজয় ধরেন বাড়ীর পথ।

কৈশোরের শেষ প্রান্তে পৌঁছার পরও বিজয়ের দেবচরিত্রে এতটুকু গ্লানি কেউ কখনও দেখে নি। 'থাক' নামে একটি যুবতীকে দয়াপরবশ হয়ে স্বর্ণময়ী দেবী পরিচারিকার কার্যে নিয়োগ করেছিলেন। টোল থেকে ফিরে এসে, মা বাড়ী না থাকলে বিজয়কৃষ্ণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন; মা এসে তাঁকে অন্দরে নিয়ে যেতেন। বন্ধুদের নৈতিক চরিত্রের হেরফের দেখলে, বিজয় কঠোর হয়ে উঠতেন। কার্তিক মাসের ভোরে সঙ্গীদের গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে বিজয় এক-একদিন দল বেঁধে সাঁতার কেটে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির লক্ষ্য করে গুপ্তিপাড়া চলে যেতেন। ফেরার সময় নৌকা ধরে

সাঁতার কেটে আসতেন।

বিজয়ের খ্যাতি শান্তিপুরে ও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বয়সে তরুণ হলেও প্রৌঢ়েরাও তাঁকে সমীহ করতেন। কোন পার্বণ উপলক্ষে গৃহে আমন্ত্রণ করে তাঁকে ভোজন করাতে পারলে খুশি হতেন তাঁরা। শান্তিপুরের কোনও শুভ অনুষ্ঠানে বিজয় উপস্থিত না হলে, উৎসব অপূর্ণ থেকে যায়, এরূপ ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

একবার অনাবৃষ্টির জন্য চারদিকে হাহাকার ওঠে। মাঠঘাট খাঁ খাঁ করে। বৃষ্টি প্রার্থনা করে লোকে মন্দিরে মন্দিরে মানত করে। তান্ত্রিক মতে পূজা হয়, কিন্তু ফল হয় না। তখন শান্তিপুরে বেজপাড়ায় রাজা রামকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠিত 'রাণীর শিব মন্দিরে' এক সন্ন্যাসী আসেন। লোকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, কি করলে দেবতার আক্রোশ যায়! তিনি বললেন, 'এই শিবকে মহাস্নান করালে বৃষ্টি হবে। পুণ্যাত্মাকে দিয়ে করাতে হবে।' কে পুণ্যাত্মা? স্থির হল, বিজয়কৃষ্ণ করাবেন। স্ত্রী-পুরুষ মিলে কলসী ভরে দুধ ও জল আনলেন। 'পুরুষ সূক্ত' আবৃত্তি করতে করতে বিজয় মহাদেবকে মহাস্নান করালেন। ঐ দিনই আকাশে ঘনঘটা করে খুব বৃষ্টি হল। সন্ন্যাসীর কথা ফল্‌ল। তখন 'রাণীর শিবের' নূতন নাম হয় 'জলেশ্বর শিব'।

কৈশোরেই স্বভাবের গুণে বিজয় হয়ে ওঠেন শান্তিপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার স্নেহপ্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র। এমন কি অভিশপ্ত অশরীরী আত্মারও ছিল বিজয়ের প্রতি প্রিয়জনোচিত প্রসন্নভাব। আশেপাশে কোথাও যাত্রাগান হলেই কিশোর বিজয় গিয়ে হাজির হতেন। সঙ্গীরা একটু রাত হলে পালা শেষ না হতেই ফিরে আসত। ঘুমে শরীর আসরে এলিয়ে পড়ে, তথাপি বিজয় উঠতেন না। ঘুম ভাঙলে তিনি অনেক দিনই দেখতে পেতেন আসর একবারে ফাঁকা; মনে মনে ভাবেন, 'কি করে যাই—এতটা পথ একাকী?' খড়ম পায়ে একটি লোক তখনই লণ্ঠন হাতে এসে হাজির হত; বলত, 'চল, বাড়ী চল'। আরও কতবার যখন বিজয় আসরে ঘুমিয়ে পড়েছেন, সে এসে তাঁকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছে। মা-ই তাকে পাঠিয়ে থাকেন নিশ্চয়। এদিকে মার মনেও প্রশ্ন জাগে 'সঙ্গী-সাথীরাই কি বিজয়কে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায়?' স্বর্ণময়ী দেবী একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কারা তোকে সঙ্গে নিয়ে আসে রে?' বিজয় বলেন, 'কারা আবার সঙ্গে নিয়ে আসবে? তুমি যাকে পাঠাও তার সঙ্গেই তো আসি।' মায়ের গা' কাঁটা দিয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই কোনও অশরীরীর কাজ। ছেলেকে বারবার সাবধান করে এভাবে যাত্রায় যেতে নিষেধ করে বলেন, 'আর কখনও যাত্রা শুনতে যেতে পাবি না। কোন্ দিন ঘাড় মট্‌কিয়ে দেবে! সারা শান্তিপুর জুড়ে ঝাড়ে-ঝোপে, পোড়ো বাড়ীতে ওরা আছে সব আস্তানা করে।' বিজয় মাকে প্রশ্ন করেন, 'ওদের মুক্তি হয় কি করলে, মা?' মা বলেন, 'কেউ যদি গয়ায় গিয়ে ওদের পিণ্ডি দেয়!'

ক'দিন বাদে এক নিশা রাতে বিজয় বাড়ী ফিরছেন আবার একলা। সেই চেনা মূর্তি আগের মতই সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে বিজয় খুশি হলেন। তার মুখের উপর চোখ রেখে বিজয় জিজ্ঞাসা করেন তাকে, 'তুমি কে?' উত্তর এল, 'তা' জেনে কি করবে? এখন বাড়ী চল।' বিজয় ক্ষান্ত হলেন না। তিনি বললেন, 'মা বলেন, এখানে-ওখানে সব অশরীরীরা রয়েছে; গয়ায় পিণ্ডি দিলে নাকি ওদের উদ্ধার হয়!' অশরীরী উত্তর দিল, 'হাঁ, ঠিকই বলেছেন। চল, ঐ পোড়ো বাড়ীটার উপর দিয়ে যাই, নইলে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হয়। গাছের উপর আবার সব

হনুমান রয়েছে। ডালপালা নাড়াতে শুরু করে নীচ দিয়ে কেউ গেলে! তা দেখে আবার ভয় পেয়ো না যেন।' ওরা দু'জন চলেন পরিত্যক্ত ভিটার উপর দিয়ে। স্বচ্ছন্দ, সাবলীল বিজয়ের চলন-ভঙ্গী। গাছের ডাল থেকে ভেসে আসে নাকিসুরে, 'ফাঁস্ করে দেব না কি সব?' সঙ্গী উপরের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলে, 'ছিঃ, ছিঃ, এখনও তোর শিক্ষা হল না!' বিজয়কৃষ্ণ অবাক, কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র নেই তাঁর প্রাণে।

এদিকে বিজয়ের পথপানে চেয়ে আছেন স্বর্ণময়ী দেবী। গভীর রাতে যখন বিজয় উঠানে এসে দাঁড়ালেন, মা স্বর্ণময়ী দেবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন; কিন্তু চোখে পড়ল, বিজয়ের অনুগামীটি অন্ধকারে তালগাছ বেয়ে উঠছে। একটু ভাল করে তাকাতেই ছায়ামূর্তিটিকে চিনতে দেরী হল না তাঁর। বিস্ময়ে তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে যাবার উপক্রম। বিজয় ঘরে একটু বিশ্রাম নেবার পর তিনি বললেন, 'তোর সঙ্গে যে এসেছিল তার নাম পুরন্দর; শ্যামসুন্দরের সেবাইত ছিল। বিগ্রহের জিনিসপত্তর একটি মেয়েমানুষকে দিয়ে দিত; আচার-বিচার ছিল না কিছু। নিবেদন করার পূর্বেই খেয়ে ফেলত ভোগের জিনিস। তা-ই বোধহয় তার এই দুর্গতি।' বিজয় চুপ করে ভাবেন পুরন্দরের কথা; কর্মফল কি অমোঘ, মৃত্যুর পরও তার হাত থেকে রেহাই নেই।

আর একদিনের কথা। বিজয় যান আর এক পাড়ায় জরুরী কি কাজে; ওখানকার কিশোরদের সঙ্গে বিজয়ের পাড়ার কিশোরদের রেষারেষি। সুযোগ পেয়ে ঘেরাও করে বিজয়কে ওরা। নিঃশব্দ ছায়া-সহচর পুরন্দরের অশরীরী আত্মা চোখে চোখে রাখে বিজয়কৃষ্ণকে। ওরই মায়াশক্তিতে মুহূর্তে ধূলোর ঝড় ওঠে। চারদিক অন্ধকার হয়ে পড়ে, বিজয়কৃষ্ণ আঁধারের ভিতর দিয়ে দ্রুত ফিরে আসেন আপন গৃহে অক্ষত দেহে। অদ্ভুত কৌশলে, ব্রহ্মদৈত্য পুরন্দর সেদিন বিজয়কৃষ্ণকে বিপদ-মুক্ত করেছিল। পরে বিজয়কৃষ্ণ গয়ায় গিয়ে পুরন্দরের উদ্ধারের জন্য বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দান করেছিলেন।

জীবন-নদীর ওপারে

নির্জন অন্ধকার রাত্রি। নিরালা পথে একাকী চলতে গা কেমন ছম্‌ছম্ করে, বুকের ভিতর দুরুদুরু করে অজানা শঙ্কায়। আদিকাল থেকে এক প্রশ্ন মানুষের মনে, 'কেউ কখনও ভূত দেখেছে?'

স্যার অলিভার লজ (Sir Oliver Lodge) ইংলণ্ডের নামজাদা বৈজ্ঞানিক; পরমাণু নিয়ে গবেষণা করে পদার্থবিজ্ঞানে পেয়েছিলেন তিনি বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁর পুত্র বিয়োগ হয়। শোকাতুর পিতা পুত্রের বিরহ-বেদনায় হন অভিভূত; তাঁর অনুসন্ধানী প্রতিভার যাত্রা শুরু হল মৃত্যুর পরপারে—অজানার সন্ধানে। প্রেতলোকের গবেষণায় তিনি করলেন আত্মনিয়োগ; মৃত পুত্রের সঙ্গে স্থাপিত হল যোগাযোগ। দিনের পর দিন চলে কথাবার্তা। Survival of man নাম দিয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন স্যার অলিভার। প্রেতলোক সম্পর্কে অনেক তথ্য এতে রয়েছে; আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা তিনি এতে লিখেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে দিয়েছিলেন তত্ত্বোপদেশ। —'জীবাত্মার নাই জন্ম-মৃত্যু। অনাদি কাল থেকে তিনি রয়েছেন। দেহ পঞ্চভূতে মিশে গেলেও, তিনি অক্ষয়, অজর, অমর।' জীবাত্মা থাকেন পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ আশ্রয় করে। স্থূলদেহের আড়ালে থাকে 'সূক্ষ্মদেহ'—বাসনার বৈদেহীরূপে, আর সূক্ষ্মদেহের অন্তরালে থাকে 'কারণ' দেহ—চৈতন্য আর জন্ম-জন্মান্তরের প্রাক্তন সংস্কারের আধার হয়ে। ক্ষিতি, অপ্, তেজস্, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ থেকে হয় সূক্ষ্মদেহের উদ্ভব। মৃতের যে প্রেতমূর্তি কখন কখন দৃষ্টি-পথে পড়ে তা এই সূক্ষ্ম শরীরের। সূক্ষ্মদেহ লোকচক্ষুর অন্তরালে—জলে-স্থলে, ব্যোমপথে অনায়াসে করে চলাফেরা। মৃত্যুর পরই সূক্ষ্মদেহী জীবাত্মাকে যমদূত নিয়ে যায় পিতৃলোকে। বছর ঘুরে এলে পিতৃপুরুষের নির্দেশে বিচার হয় পাপ-পুণ্যের। উদ্বেল বাসনার তাড়নায় স্থূলদেহ ধারনের ইচ্ছা প্রবল হলে, পিতৃপুরুষ জানিয়ে দেন কোথায় এবার জন্ম হবে। বিধির বিধানে 'সূক্ষ্ম' ও 'কারণ' দেহ এসে মেশে নবকলেবরে, আর নবতনুতে যুগপৎ অধিগত হয় প্রাক্তন অভিজ্ঞতা ও পূর্ব-পূর্ব জন্মের সংস্কার। জীবাত্মা করেন প্রতি জন্মে নব নব রূপে অধিষ্ঠান। ভগবান তাই অর্জুনকে বলেছিলেন, 'যেমন জীর্ণবাস পরিত্যাগ করে মানুষ নববস্ত্র পরিধান করে—তেমনই জীবাত্মা এক দেহ ছেড়ে আর একটিতে আশ্রয় নেয়।' দেহটি জীবাত্মার যেন প্রবাসগৃহ। অর্জুন প্রশ্ন করেন, 'বিপথগামী পথভ্রান্ত মোহমুগ্ধের কি দশা হয় দেহান্তে? বিচ্ছিন্ন মেঘের মত কি তার কর্মকুশলতা ও সাধনার হয় সমাধি?' ভগবান উত্তরে বলেন, 'পার্থ, ইহলোক বা পরলোকে এর কখনও বিনাশ হয় না। নবরূপ গ্রহণ করা মাত্র পূর্ব পূর্ব জন্মের বুদ্ধির সংযোগ ঘটে তার মধ্যে; আর প্রাক্তন অভ্যাস ও কর্মকুশলতা ফল্গুধারার ন্যায় কাজ করে তার মাঝে, নিয়ন্ত্রণ করে তার অজ্ঞাতসারে নবজন্মের কর্ম ও প্রচেষ্টা।'

সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের থাকে ক্ষুৎ-পিপাসা, শীতাতপ-বোধ। অন্নজলের সূক্ষ্মাংশে সূক্ষ্মদেহের হয় ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তি। বস্ত্রের সূক্ষ্মাংশে হয় আবরণ। ছত্র, চামর, তালবৃন্ত পাখায় হয় তৃপ্তি ও সুখ। শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য মৃতের জীবাত্মার তৃপ্তির ব্যবস্থা। তার উদ্দেশ্যে তখন যা উৎসর্গ করা হয় তার সূক্ষ্মাংশ গিয়ে পৌঁছে জীবাত্মার কাছে। অন্য দেহ আশ্রয় করে থাকলে পিতৃপুরুষের ভান্ডারে হয় জমা। আবার দেহ ধারনের পর অভাব ঘটলে উৎসর্গীকৃত দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশ লাগে গিয়ে তার ভোগে। পরলোকের ব্যাপার আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগোচর। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা তপস্যালব্ধ জ্ঞান দ্বারা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সকল জেনেছেন। তাঁরা দিব্যদৃষ্টিতে পরলোকতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে লোকশিক্ষার জন্যে এর সারগর্ভ বিষয়বস্তু শাস্ত্রে লিপিবন্ধ করেছেন।

প্রেত দৃষ্টি দ্বারা আহার করে। শ্রাদ্ধের দিনে শ্রাদ্ধবাড়ীর সব ভোজ্য ও পেয় হয় আহূত ও অন্যান্য প্রেতের দৃষ্টিদুষ্ট। এই হেতু ঐ দিন ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়দের ভোজন করাবার ব্যবস্থা না করে পরাহ্নে বা সময়ান্তরে করা শাস্ত্রীয় বিধি। যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে শ্রাদ্ধের দিন এসে খাদ্য গ্রহণ করেন, তাঁদের জানা নেই শ্রাদ্ধখাদ্য কি বিষময়বস্তু। প্রেতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে নানা রকম দোষ সংক্রামিত হয় তাঁদের মধ্যে, ভক্তির দিক শুকিয়ে যায়। বৎসরান্তে গয়াতে বিষ্ণুপদে পিন্ডদান করলে প্রেতের বাসনার ঘটে ক্ষয়, তাতে হয় তার সদ্গতি। 'কারণ' দেহ নিজে কিছু গ্রহণ করতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ যদি জীবাত্মার কল্যাণ-মানসে আহার করেন, তাতে হয়

'কারণ' দেহের তৃপ্তি। শ্রাদ্ধপাত্র ঘৃত পরমান্ন তজ্জন্য ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করা হয়। স্থূলদেহের পুষ্টি স্থূলাহারে—সূক্ষ্মদেহের পুষ্টি দৃষ্টিভোজনে, আর 'কারণ' দেহের পুষ্টি শুভ ইচ্ছায়। গয়ায় পিণ্ডিতে হয় সূক্ষ্মদেহের কল্যাণ আর ব্রহ্মবিদ্ ও মহাত্মাদের শুভদৃষ্টি ও কল্যাণকামনায় হয় 'কারণ' দেহের সদ্‌গতি।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অবসানে নিহত বীরগণের পরিবারে হাহাকার, শোকানলের তীব্র দহনজ্বালা। প্রাণকান্ত কুলবর্গের চকিত-দর্শন-মানসে ও'রা নেন পরাশর-আত্মজের শরণ। শোকার্ত কুরু-পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ করেন জাহ্নবী কূলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ভাগীরথীর পূত সলিলে অবগাহন করে তিনি প্রেতদের আবাহন করেন। ব্যাসমুনির তপঃপ্রভায় তরঙ্গিনীর তরঙ্গে দেখা যায় আলোড়ন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যু, দুর্যোধন, দুঃশাসন—উভয়পক্ষের নিহত বীরগণ উঠে আসেন। যে বেশে মৃত্যু বরণ করেছিলেন প্রত্যেকেরই ঐ বেশ; পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব লেশমাত্র আর নেই। বেদব্যাসের পুণ্য প্রভাবে জীবিতেরা আর সূক্ষ্মদেহীরা মিলিত হন। রাত্রিপ্রভাতে প্রবাহিনীর প্রবাহে মিলিয়ে যান বিদেহীগণ। বৈশম্পায়নের মুখে প্রেতের কথা শুনে মহারাজ জনমেজয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'অশরীরীগণ কি করে আবার এলেন?' বৈশম্পায়ন বলেন, 'মৃত্যুর পরও জীবের প্রাণ আর মহাভৌতিক দেহ অটুট থাকে। কর্মক্ষয় না হওয়া অবধি ঐ রূপটি বজায় থাকে। যে দেহ পরিগ্রহ করে কর্মভোগ করতে হয়—প্রাণ আর মহাভৌতিক দেহ ঐ নূতন কলেবরের সঙ্গে এক হয়ে যায়।'[১] সূক্ষ্মদেহের অনায়াসে চলাফেরা সম্ভব বলে প্রেতেরা অনেক খবরাখবর জানে যা স্থূলদেহীর জানা সম্ভব নয়। সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহী জীবাত্মার পূর্ব পূর্ব জন্মের শুভাশুভ কর্মের কথা স্মরণ থাকে। তারা কৃত-কর্মের অনুশোচনা করে। গর্ভাবস্থায় শপথ করে বার বার, 'এবার ভূমিষ্ঠ হয়ে করব পবিত্র, সুন্দর তাপসের মত জীবনযাপন। সহস্রযোনি করেছি ভ্রমণ; কত না অমেধ্য বস্তু করেছি ভোজন। কত ঘৃণ্য পরিবেশে বাস, অবাঞ্ছিত বিলাসবিভ্রমে ব্যয়িত হয়েছে জীবন; ইষ্ট ভুলে মোহবশে করেছি শুধু অনিত্যের সেবা। আহার, নিদ্রা, মৈথুনই ছিল জীবনের অবলম্বন। এবার যোনিমুক্ত হলে, মহেশ্বর পদে নেব একান্ত শরণ।'

> পূর্ব্বযোনি সহস্রানি দৃষ্টা চৈব ততো ময়া।
> আহারাবিবিধাভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাস্তনাঃ॥
> জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মশ্চৈব পুনঃ পুনঃ।
> যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতম্ কর্ম্ম শুভাশুভম্॥
> একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভাগিনঃ।
> যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎপ্রপদ্যে মহেশ্বরম্।
> যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎপ্রপদ্যে মহেশ্বরম্।
> অশুভক্ষয়কর্তারম্ ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥[২]

জন্মাবার সঙ্গেই দৈবী মায়ায় পূর্ব স্মৃতির বিলয় ঘটে; আবার মায়াক্রান্ত হয় মন। সংসারের অনিত্য চক্রে আবর্তিত হতে থাকে জীবন। কদাচিৎ দৃষ্ট হয় এর ব্যতিক্রম।

---

[১] মহাভারত—আশ্রমিক পর্ব, ৩২

[২] গর্ভোপনিষদ্

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

বিজয়কৃষ্ণের বয়স তখন মাত্র ষোল; কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে তিনি বেদান্ত-দর্শনের ছাত্র। দুর্নীতির কবল থেকে শান্তিপুরকে মুক্ত করার জন্য তেজস্বী তরুণ সহচরদের নিয়ে বিজয় গড়ে তোলেন এক সংঘ। গঙ্গার একই ঘাটে স্নান করেন স্ত্রী-পুরুষ। সিক্তবসনাদের প্রতি অসংযত, নির্লজ্জ, কামলোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা। ওদের ঔদ্ধত্য বাড়ে দিন দিন। অনেক সময় প্রকাশ্যে অশোভন মন্তব্য করতে ওরা দ্বিধা করে না। কোনও প্রতিবাদ নেই, প্রতিকার নেই, ভদ্রঘরের মেয়েদের ওসব হয়ে গেছে গা-সহা। এই সব অসভ্য আচরণ বিজয়ের মনকে করে দারুণ বিক্ষুব্ধ। দুর্জয় তেজে বিজয়কৃষ্ণ এর প্রতিকারে অগ্রণী হন। তরুণসংঘের সতীর্থদের নিয়ে বাড়ী-বাড়ী গিয়ে তিনি প্রৌঢ়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওঁরা সর্বান্তঃকরণে করেন তাঁকে সমর্থন। প্রতি গৃহে ব্যবস্থা হয় স্নানের সময় 'পাবনাই শাড়ি' পরার জন্য। মেয়েদের মাঝে এক অংশ হন বিরূপা। তাঁরা মন্তব্য করেন, 'ও রকম চট পরে কি নাওয়া যায়? ইঁচড়ে পাকা ছেলে-ছোকরার দল! তোদের কেন বাপু এ নিয়ে মাথাব্যথা?' কয়েকজন হীনচরিত্র ব্যক্তি তরুণদের মারধর করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা বিজয়দের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্য উঠে-পড়ে লাগেন। মেয়েদের ঘাট আলাদা হয় এবং যাতে স্ত্রী-পুরুষ একই ঘাটে না যান, ওদিকে তরুণেরা কড়া নজর রাখে। সরকারী মহল থেকে এই ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়। এমন কি, হাকিমবাবু ঘাটে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেন।

আর্ত, অসহায়, উৎপীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তরুণসংঘের সভ্যেরা; মহামারীর বিভীষিকা আর আর্তনাদের মধ্যে ওঁরা নির্ভীক সৈনিক। নিজেদের স্বার্থ বলি দিয়ে তাঁরা জীবন করেন পণ। অনুরোধ-উপরোধে কাজ হাসিল না হলে চলে রুদ্রের শাসন।

শান্তিপুরে ঐ সময় নীতির বালাই ছিল না। প্রকাশ্যে চলত সুরাপান, ব্যভিচার—অসংযত ভোগবিলাস। কুলবধূরাও গোপনে করতেন সুরারস আস্বাদন। সঙ্গীদের নিয়ে রুখে দাঁড়ান বিজয়কৃষ্ণ। প্রহরখানেক রাত—ঝিমিয়ে পড়েছে পথঘাট, এমন অসময়ে শুঁড়ির দোকান থেকে বের হল ভদ্রঘরের এক পরিচারিকা, কেমন যেন ভীত কুণ্ঠিত ভাব। বিজয় সামনে এসে প্রশ্ন করেন, 'কে গা? হাতে ওটা কি?' সে যেন ভূত দেখল; আম্‌তা-আম্‌তা করে অস্ফুট স্বরে বলল, 'কি করি, গোঁসাইবাবা? পেটের দায়ে হুকুম তামিল করি। বাবু বাড়ী নেই। গিন্নিমা তার সখীদের নিয়ে আসর জমাবেন।' অন্ধকারে বাবুদের বাড়ীর গাছে ওঠেন বিজয়। অস্পষ্ট আলোতে দেখেন পরিচারিকার কথা যথার্থ। অন্দরমহলের বারান্দায় মেয়েদের মজলিস বসেছে। গৃহস্বামী ফিরে এলে, গোপনে তাঁকে বিজয় সব জানান; হৈ-চৈ করতে বারণ করেন। বাবুটি গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে বলেন, 'আজই একবার বাইরে যেতে হবে; রাত্রে ফিরব না।' বিজয়ের কথামত রাত্রে বাড়ীর পাশের একটি উঁচু গাছে উঠে তিনি নিজে বাড়ীর ভিতরের সব নিরীক্ষণ করেন। দেখেন তিনি, তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য মেয়েরা মশগুল পানরসে। দুঃখে, ক্ষোভে তিনি দ্রুত গাছ থেকে নেমে সবার সামনে এসে দাঁড়ালেন; কঠিন, কঠোর মূর্তি। স্বামীকে হঠাৎ ফিরতে দেখে স্ত্রী হতবাক্! হাতে-নাতে ধরা পড়ে, পায়ে ধরে তাঁর স্ত্রী মিনতি করে বলেন, 'এবারটি আমায় ক্ষমা

করুন, আর কখনও এসব স্পর্শ করব না, দিব্যি করে বলছি।' এতেই বিজয় ক্ষান্ত হন না; 'লালপানির' দোকানে গিয়ে বিজয় খোঁজ নেন, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঘরণীরা কে কে মদ ব্যবহার করেন। জনপঁচিশ স্ত্রীলোকের নাম পাওয়া গেল। দোকানের মালিক প্রতিশ্রুতি দেন, আর কখনও ওদের লোকের কাছে মদ বিক্রি করবেন না। আন্তরিক সৎ উদ্যম কখনও ব্যর্থ হয় না। নিতান্ত দুরাচারের মনেও এর প্রভাব পড়ে।

বিজয়ের দুই সহচর প্রেম-প্রীতি নিয়ে করে বড়াই। একজন বলে, 'আমার বেলায় বিজয়ের কাছে সাত খুন মাপ, আমি ওর বন্ধু।' অপর জন বলে, 'যা দিকিনি ওঁর কাছে মুখে এক ফোঁটা মদ মেখে।' বিজয় ছিলেন খাঁটি সত্যসেবী। রক্তের বন্ধন, বন্ধুত্ব, ব্যবহারিক সৌজন্য কিছুই তাঁকে সত্য থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি। সত্যের জন্য কোনও ত্যাগ, কোনও দুঃখবরণে তাঁর দ্বিধা ছিল না। একদিন যথার্থই ঠোঁটে মদ মেখে সেই বন্ধুটি এলে, সরষের মধ্যে ভূত দেখেন বিজয়। ঠাস করে তার গালে এক চাটি মেরে তিনি বলেন, 'তোর মুখ দেখতে নেই। এখান থেকে চলে যা'। দিনের পর দিন চলে যায়। ওর সঙ্গে কথাটি বলেন না বিজয়। দুঃখে আর ক্ষোভে নিখোঁজ হয় সে। বিজয়ের মন মাঝে মাঝে ওর কথা ভেবে উদাস হয়ে ওঠে; কিন্তু চুপ করে থাকেন তিনি। বছর কুড়ি পরে শান্তিপুরে আসেন এক সন্ন্যাসী। গোঁসাইবাড়ি এসে তিনি বিজয়কৃষ্ণের খোঁজ করেন; শ্যামসুন্দরের চাতালে তিনি অপেক্ষা করেন। বিজয়ের মনে হয় মুখখানা বড় চেনাচেনা। আগন্তুক বলেন, 'ভাই বিজয়, তোমার শাসনেই আমি পথের সন্ধান পেয়েছি। তুমিই আমার গুরু'। সেই দিন আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে চোখের জলে ভাসেন কৈশোরের দুই বন্ধু।

যদু পাল নামে তাঁর এক সহচর বিগড়ে গিয়ে কিছু নীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছিল। একদিন ঘাটে বাঁধা এক ডিঙ্গিতে সে বসে আছে আনমনা, চকিতে বিজয় দলবলসহ নৌকাতে উঠে তা বেয়ে নিয়ে যান মাঝগঙ্গায়। তারপর বিপথগামী সঙ্গীকে খুব তেজের সঙ্গে বলেন, 'কুকর্ম ছাড়, নইলে আর নিস্তার নেই, এখনই তোমার হাত-পা বেঁধে ফেলে দেব জলে।' ভয়ে যদু জড়সড় হয়ে ভাবে, 'এদের কাছে কিছুই অসাধ্য নয়।' বিনীত হয়ে, হাতে-পায়ে ধরে সে বলে, 'আর কখনও অমন কর্ম করব না। এবারটি রেহাই দাও।' যদু পাল সেদিন ভবিষ্যতে কখনও নীতিবিরুদ্ধ কাজ করবে না বলে যে শপথ নিয়েছিল, তা সে আজীবন রক্ষা করেছে।

একদিন এক আত্মীয়া কুলবধূ এসে বিজয়কে বলেন তাঁর করুণ কাহিনী। তিনি বলেন যে, সব থাকতেও তিনি অনাথা। বাড়ীতেই অবিদ্যা নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছেন তাঁর স্বামী। ঘোর কলি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নেই প্রেম-প্রীতির মধুর সম্পর্ক। দেহপসারিণীর মোহে স্বামী দিশেহারা।

ঘরকা বহুরি পিরিত না পাওয়ে, চিত চোরাবে দাসী।
ধন্যরে কলি যুগ তেরি তামাসা, দুঃখ লাগে আর হাসি॥[১]

মাঝরাতে বিজয় তাঁর দলবল নিয়ে ঐ আত্মীয়ের গৃহ করেন চড়াও। রাতারাতি উধাও হয় সুখের পায়রা। এই ঘটনার পরে আত্মীয়টির জীবনে আসে শুভ পরিবর্তন। বয়সে বড় হলেই মানুষ বড় হয় না। মানুষ বড় হয়, তার আত্মিক বলে।

বিজয়দের সংঘের কথা বলতে গিয়ে বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাপক বনমালী ভট্টাচার্য

---

১. সন্ত তুলসীদাসের দোঁহা

মহাশয় বলেছেন, 'দরিদ্রের নিরন্ন কুটিরে, রোগীর রোগশয্যায়, করুণাপূর্ণ হৃদয়ে অন্ন ও পথ্যদানে তারা করেছিল আত্মনিয়োগ। দেশে কলেরা-বসন্ত-মহামারীতে গৃহে গৃহে যখন মর্মভেদী হাহাকার উঠত, আত্মীয়স্বজন আতঙ্কিত হয়ে রোগীকে আর্তনাদের মাঝে দৈবের হাতে দিতেন ছেড়ে, বিজয় সেখানে সঙ্গীদের নিয়ে পীড়িতের শুশ্রূষা ও মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গুরু দায়িত্ব নিতেন অনলসভাবে।'

সতের বছর বয়সে আচার্য কৃষ্ণগোপালের চতুষ্পাঠীর অধ্যয়ন সাঙ্গ হয়। অধ্যাপক মহাশয় বলেছেন, 'বিজয়ের অদ্ভুত মেধা। সে সাংখ্য পড়ে বেদান্ত পড়েছিল। অল্প আয়াসে সে যে শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যে প্রবেশ করত, তা' তার মুখশ্রীতে ফুটে উঠত। ব্রহ্মজ্ঞান সে যে উপলব্ধি করছে, তা বুঝতে পেলাম তার মুখ দেখেই। মুখই মানব-হৃদয়ের দর্পণ। হৃদয়ের ভাব মুখেই প্রতিফলিত হয়। হরিবোলা বিজয় ব্রহ্ম-রসাস্বাদনে আত্মনিয়োগ করল।'

বিজয়কৃষ্ণের ইচ্ছা হয় কাশী গিয়ে তিনি বেদান্ত আরও অধ্যয়ন করেন। ১২৬৫ সালে এই উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেন কাশী; একশ টাকা সম্বল, তখন রেলপথ হয় নি। লোকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পদযাত্রা করত। বিজয়কৃষ্ণ চলেছেন শ্যামসুন্দরকে স্মরণ করে একাকী। উদয়াস্ত দ্রুত পদক্ষেপে জনপথ ধরে চলে তিনি প্রদোষে আশ্রয় নেন এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে। এভাবে চলতে চলতে পাটনার কাছাকাছি এক দেবালয়ে বাঙালি পুরোহিত দেখে ওখানে বিশ্রাম করে তিনি আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন; সন্ধ্যার তখনও সামান্য দেরি। পূজারী তাঁকে বলেন, 'দিনকাল ভাল নয়; পথে ছদ্মবেশী খুনে ডাকাতের অভাব নেই। এখানে আজ রাত্রি বাস করে ভোরে ফের বারাণসীর পথ ধরবেন।' আন্তরিকতায় ভরপুর এই আমন্ত্রণ বিজয় সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করেন। রাত্রে আহারান্তে অতিথির কাছে এসে বসেন পূজারী। বিজয়কে বলেন, 'আমার বাড়ী মেদিনীপুর। বিদেশ-বিভূঁয়ে বাংলা কথা শুনতে কী যে ভাল লাগে! আপনার বাড়ী কোথায়, পরিচয়ই বা কি?' বিজয় জানান, তাঁর বাড়ি শান্তিপুর, নাম শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং পিতার নাম স্বর্গীয় আনন্দকিশোর গোস্বামী। তখন নাটকীয় এক দৃশ্যের ঘটে অবতারণা। বিকৃত কণ্ঠে এক ধ্বনি করে বিজয়কৃষ্ণের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েন পূজারী। তাঁকে বলেন, 'প্রভো, আপনি আমার গুরুপুত্র। মহাপাতকী আমি। ঘুমন্ত অতিথিকে খুন করে তাঁর সর্বস্ব আত্মসাৎ করাই আমার উপজীবিকা। গুরুশক্তির মহিমায় আজ আপনি এখানে এসেছেন পাতকী উদ্ধার করতে। আমার বিনীত প্রার্থনা, আপনি বারাণসী যাবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। এ সব অঞ্চলে আমার ন্যায় আরও অনেক পাপিষ্ঠ রয়েছে।'

বিজয়কৃষ্ণ সব শুনে মনে মনে বলেন, 'শ্যামসুন্দর! তোমার কৃপার শেষ নাই।' তিনি স্থির করেন শান্তিপুরই ফিরে যাবেন। সেবায়েতকেও তিনি জানান, বারাণসী আর যাবেন না। খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে পূজারী গুরুপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রভো, আমার কি গতি হবে? এবার আমার একটা বিহিত করুন।' তাঁর কাতরতা দেখে বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেন, 'আপনার মধ্যে যখন পাপবোধ এসেছে, তখন আর ভাবনা নেই। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অনুতাপ-অনলে পাপ দগ্ধ হয়ে যায়। পাপের ধন কোন সৎ কাজে লাগে না; আর এতে দুঃখই আসে। সর্বদা ধর্মপথে থাকবেন, ধর্মচিন্তা করবেন। স্মরণ রাখবেন জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আর মনে রাখবেন—ঈশ্বর সর্বত্র রয়েছেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি-

মান। তা হলেই পাপ আর কাছে আসতে পারবে না।' তাঁর উপদেশ শুনে পূজারী বলেন, 'আমি আপনার পা ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি, অনাহারে মৃত্যুবরণ করব তাও শ্রেয়ঃ, তথাপি আর কখনও পরস্ব হরণ করব না।'

সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ ও বিবাহ

শান্তিপুরে ফিরে বিজয়কৃষ্ণ মাকে সব ঘটনা বলেন। সমূহ বিপদের মুখ থেকে পুত্রকে ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞতায় স্বর্ণময়ী দেবী শ্যামসুন্দরের বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করেন। বন্ধু অঘোরনাথ গুপ্ত এসে দেখা করেন বিজয়কৃষ্ণর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'কাশী যাও নাই, ভালই হয়েছে, চল আমরা দুই জনে কলিকাতা গিয়ে ভর্তি হই সংস্কৃত কলেজে।' স্বর্ণময়ী দেবীও তাতে সায় দেন। ১২৬৫ সালেই দুই বন্ধু কলিকাতা এসে ভর্তি হলেন সংস্কৃত কলেজে। অঘোরনাথ ওঠেন এক আত্মীয়ের গৃহে, চেতলায়; আর বিজয়কৃষ্ণ জেঠাত ভগিনপতি কিশোরীলাল মৈত্রের মাতুলালয় সাঁতরাগাছি থেকে অধ্যয়ন শুরু করেন। সাত মাইল পথ হেঁটে তাঁকে রোদ-বাদলায় করতে হত কলেজ। গঙ্গার উপর তখনও সেতু হয় নি; আসার ও ফেরার পথে নদী পার হতেন খেয়া দিয়ে। অধ্যয়নে অনুরাগ ও ঐকান্তিকতা তাঁর পথক্লান্তি করত অপনোদন। কিন্তু শরীরে তা সইবে কেন? রক্তবমি হল। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বলেন, 'এতো হাঁটাহাঁটি সইবে না; যদি বাঁচতে চাও, এটা বন্ধ কর।' এরপর বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় চলে আসেন।

বেদান্ত বিভাগের ছাত্র বিজয়কৃষ্ণ। এখানেও তাঁর প্রতিভার প্রকাশ অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু বেদান্তের তর্কমীমাংসা তাঁর অন্তরে সংশয়ের ঢেউ তোলে। তাঁর স্বতঃই মনে হয়, জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নেই। 'সোঽহং' তত্ত্ব তাঁর ধর্মের ভিত্তি ও সংস্কারের মূলে নাড়া দেয়। তিনি ভাবেন, 'ব্রহ্মের সঙ্গে আমি যদি অভিন্নই হই, তাহলে পূজা ও উপাসনার কিই-বা প্রয়োজন?' শ্যামসুন্দরের প্রতি তাই তিনি আস্থা হারান; পূর্বপুরুষের ধর্মে আসে অনাস্থা। শুষ্ক তত্ত্বজ্ঞান তাঁর ভক্তিস্রোতকে স্তব্ধ করে দেয়।

বিজয়কৃষ্ণের বয়স তখন সবেমাত্র সতের পূর্ণ হয়েছে। শিকারপুরের দহকুল গ্রামের স্বর্গীয় রামচন্দ্র ভাদুড়ীর কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের বিয়ের কথা হয়। কনের বয়স তখন ছয়। ১২৫৯ সালের ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাদ্বাদশীতে যোগমায়ার জন্ম। ভাদুড়ী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে তাঁর সহধর্মিণী মুক্তকেশী দেবী কন্যা দুটিকে নিয়ে পড়েছিলেন অকূল পাথারে। দয়াপরবশ হয়ে স্বর্ণময়ী ওঁদের জন্য মাসহারা ব্যবস্থা করেছিলেন। তদুপরি জোয়ারদার বাড়ী থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েও এই দুঃখী পরিবারের ভাবনা-চিন্তার শেষ ছিল না। এবার পিত্রালয়ে গিয়ে করুণার বিগ্রহ স্বর্ণময়ী দেবী এই দুঃস্থ পরিবারের দুঃখমোচনের এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। 'বড় মেয়েটি ভারী সুলক্ষণা; নামটিও বেশ! না হোক ফর্সা; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তো বটে। আমার বিজয়ের সঙ্গে মানাবে ভাল।' সম্বন্ধের কথা শুনে মুক্তকেশী দেবী হন অভিভূত। এ যে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া! বিয়ের কথা স্বর্ণময়ী পাকাপাকি করে ফেলেন। মুক্তকেশী দেবীর বুক দুরুদুরু করে। ভয়ে ভয়ে তিনি ভাবেন, 'আমার পোড়া

কপালে কি এ সম্ভব!' মা-ই ছেলের অভিভাবিকা। ছেলের আবার মতামত কি? পাকা কথা দিয়ে স্বর্ণময়ী দেবী পণ্ডিত ডেকে অবিলম্বে স্থির করে ফেলেন বিয়ের দিনক্ষণ। মুক্তকেশী দেবী ভেবে কূল-কিনারা পান না, কি করে এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে উদ্বাহ-উৎসব! রিক্ত হস্তে এতবড় কাজে কি অগ্রসর হওয়া সম্ভব? অভয় দেন স্বর্ণময়ী দেবী ভাবী বৈবাহিকাকে। মাতৃভক্ত বিজয়কৃষ্ণ মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন না। বয়সে নবীন হলেও বিজয়কৃষ্ণের অজানা নয় বিবাহের গূঢ় তাৎপর্য। আত্মসুখ ও ভোগলিপ্সার ছাড়পত্র এটি নয়। বিবাহ হরপার্বতী-মিলন; স্ত্রী লক্ষ্মী—স্বামী লক্ষ্মীকান্ত। পরিবারের প্রয়োজনে, কুলের কল্যাণে, গার্হস্থ্য-ধর্মপালনে বিবাহের সার্থকতা। 'বিবাহ বন্ধন,/প্রেমে তাই হয়/ মোহমুক্তির কারণ।'[১]

ঈশ্বর বাঁধন পড়িয়ে খোলেন চিরদিনের বাঁধন.
বিবাহ এক মহৎ বন্ধন,—একটি বন্ধন সৃষ্টি করে
অনেক বন্ধন—বহু বন্ধনে চলে বন্ধনমুক্তির সাধন॥[২]

এই অপরিণত বয়সেই বিজয়কৃষ্ণ কর্মকুশল, আকাঙ্ক্ষামুক্ত ও উদাসীন। আঠারো বছরে পা দিতেই এক শুভলগ্নে অনাড়ম্বর পরিণয়-উৎসব সম্পন্ন হল দহকুল গ্রামে। জাঁকজমক নেই, লোক-সমাগম নেই। দরিদ্র পরিবার অসুবিধায় পড়বে, এই ভেবে স্বর্ণময়ী দেবী তাঁর পিত্রালয়ের পুরোহিত দিয়ে মাঙ্গলিক কার্য ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। শান্তিপুর থেকে গেলেন বর বিজয়কৃষ্ণ, অগ্রজ ব্রজগোপাল, অভিভাবক কৃষ্ণময় গোস্বামী ও একটি পরিচারক। বিবাহবাসরে উপস্থিত ছিলেন জোয়ারদার বাড়ীর একান্ত আপনজন—স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন। বড়দের কথায় যোগমায়া নেচে নেচে মালা দেন বিজয়কৃষ্ণের গলায়। শান্তিপুর যাত্রার সময় যোগমায়ার কান্না থামে না। ব্রজগোপাল তাকে বুঝিয়ে বলেন, 'দ্বিরাগমনে এসে তোমার মাকেও সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।' কনে বায়না ধরে, মাকে ছাড়া সে যাবে না। অগত্যা কৃষ্ণময় গোস্বামী মুক্তকেশী দেবীর মত মাথায় অবগুণ্ঠন দিয়ে শিবিকার পেছনে আসেন। তাঁর গায়ের রঙ ছিল মুক্তকেশী দেবীর মত। যোগমায়া ভাবেন মা-ই আসছেন। গৃহদেবতার সম্মুখে নবদম্পতিকে বরণ করেন স্বর্ণময়ী দেবী। ধুমধাম করে হয় ফুলশয্যা। কেউ বলেন যেন হরগৌরী, আবার কেউ বলেন, যেন যুগলরূপ। আমলাগাছি থেকে জয়তারা চৌধুরী এসেছিলেন গুরুপাটে। তিনি স্বর্ণময়ী দেবীর ও সস্ত্রীক ব্রজগোপালের চরণ পূজা করেন। নবদম্পতিরও চরণ বন্দনা করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে বিজয়কৃষ্ণ অসম্মতি জানান। ব্রজগোপাল নানাভাবে বোঝাবার পর তিনি সম্মতি দেন। জয়তারা দেবীর ভক্তির আতিশয্যে বিজয়কৃষ্ণের মনে নানা জিজ্ঞাসা আসে, যদিও বেদান্তবাদ তাঁর হৃদয়কে নীরস করে দিয়েছিল। দ্বিরাগমনে গিয়ে বিজয়কৃষ্ণ নিয়ে এলেন স্বর্ণময়ী দেবীর ইচ্ছায় মুক্তকেশী দেবী, তাঁর জননী ও ছোট মেয়েকে। শান্তিপুরে এসে তাঁরা স্বর্ণময়ী দেবীর পরিবারভুক্ত হলেন। এজন্য পরিহাস করে কেউ কেউ বলতেন, 'বিজয় বিয়ে করে তিন তিনটি জীবন্ত যৌতুক পেয়েছে।'

বালিকা বধূর আজগুবি আবদার সকৌতুকে সহ্য করেন বিজয়কৃষ্ণ। ব্রজ-

---

১. শ্রীমদ্ স্বামী পরমানন্দ-প্রণীত 'অক্ষর' কাব্যগ্রন্থ

২. ঐ

গোপালের গলা ধরে পুতুল খেলার বায়না ধরেন যোগমায়া। বিজয়কৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে তখন বলেন, 'দাদা, এক কাজ করলে হয় না? ছোটটিকে কণ্ঠের কবচ করে ফেলুন।' দুই বোনই যখন-তখন ব্রজগোপালের ঘাড়ে ওঠেন, নানা আবদার করেন। একদিন একজন ব্রজগোপালকে দেখিয়ে কৌতুক করে বলেন, 'যোগমায়া, ও তোর ভাসুর যে রে, ঘোমটা দে।' বালিকা বধূ নাতিদীর্ঘ শাড়িখানা দিয়ে মাথা ঢাকেন, অথচ এদিকে নিরাবরণ। ওঠে হাসির রোল। স্বর্ণময়ী যোগমায়াকে বলে দেন কাকে কি বলে ডাকতে হবে। ফাঁপরে পড়েন যোগমায়া। বিজয়কৃষ্ণকে কি বলে ডাকতে হবে, তাতো স্বর্ণময়ী বলে দেন নি। স্বামীকে গিয়ে বালিকা বধূ জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাকে আমি কি বলে ডাকব?' বিজয়কৃষ্ণ বলেন, 'কেন? আর্যপুত্র বলে ডাকবে।'

ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত

১২৩৫-১২৬৭

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার কথা; সাংস্কৃতিক ও ধর্ম-আন্দোলনের যুগ। ১২২৪ সালে (১৮১৭ খ্রীঃ অঃ), হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ১২৩৩ সালে হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ওখানে শিক্ষক হয়ে এলেন। তিনি ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। ছাত্রগণ তাঁর অনুগত হয়ে ওঠে। হিন্দু কলেজ হয়ে ওঠে এক বৈপ্লবিক শিক্ষায়তন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি তরুণ ছাত্রেরা হয়ে ওঠেন সুকবি, সুবক্তা, কৃতী ডিরোজিওর অনুরক্ত। হিন্দু কলেজের ধর্মহীন শিক্ষায় মর্মাহত হয়ে রাজা রামমোহন রায় ১২৩৪ সালে (১৮২৭ খ্রীঃ অঃ) Anglo Hindu School স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র রমাপ্রসাদ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শ্যামাচরণ দে, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই স্কুলের প্রথম 'Batch'এর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন নয় বছর।

মিশনারীদের কথার মারপ্যাচ, খ্রীস্টধর্ম-গ্রহীতার প্রতি রাজানুগ্রহ, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় নবানুরাগ ও অন্ধ অনুকরণ—সব কিছু মিলে প্রমাণ করতে চায় যে, 'হিন্দুধর্ম অসার' আর হিন্দু শাস্ত্র ও ঐ শাস্ত্রসঙ্গত সদাচার বলতে যা বুঝায়, তা শুধুই কুসংস্কারের নামান্তর। ডিরোজিওর অসাধারণ প্রভাবে আর মিশনারী ডাফ সাহেবের মর্মস্পর্শী বাগ্মিতায় আকৃষ্ট হয়ে ছাত্রসমাজ ম্লেচ্ছাচারের বন্যায় গা ভাসিয়ে দেয়। মেকলে (Macaulay) সাহেবের দায়িত্বহীন উক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে নব্য শিক্ষিতেরা মেনে নেন যে হিন্দু শাস্ত্র মিথ্যা, আমাদের সাহিত্য, শিল্প, কাব্য ইত্যাদি নিতান্ত তুচ্ছ। ধর্মান্তরের হিড়িক পড়ে। এই সংকট সময়ে কী করে ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রক্ষা করা যায়? চিন্তাশীল স্বদেশপ্রেমিকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে এর প্রতিকারকল্পে উপায় উদ্ভাবনে নানা পরামর্শ ও আলোচনা আরম্ভ করেন। শেষে এই সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌঁছেন, একমাত্র যুক্তিবাদের অবতারণায় এর প্রতিরোধ সম্ভব। শাস্ত্র-বাক্যের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা হল প্রকৃত সমাধান; কিন্তু শাস্ত্রের তত্ত্ব গুহায় নিহিত রত্নের মত; একে তত্ত্ববিদ্ পুরুষরাই শুধু উদ্ধার করতে পারেন। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্বদেশপ্রেমিক ও প্রতিভাবান। তিনি

ছিলেন একাধারে সুপণ্ডিত, শাস্ত্রপারদর্শী ও সমাজ-সংস্কারক, ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপযুক্ত ধারক ও বাহক—এক কথায় 'ভারতপথিক'। গোঁড়াপন্থীরা ছিলেন ওঁর উপর বিরূপভাবাপন্ন। সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথাগুলি আইনের মাধ্যমে রদ করায়, অনেকেই রাজার প্রতি ছিলেন অপ্রসন্ন। গোঁড়ারা ছিলেন প্রবল প্রতিপক্ষ।

শাস্ত্রজ্ঞ স্মার্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একদিন ভোরে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুষ্পোদ্যানে নিত্যপূজার ফুল না পেয়ে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের নির্দেশে রাজা রামমোহনের বাগানে যান পুষ্পচয়নে। মালি বাধা দিলে তিনি বলেন তাকে, 'তুমি যথার্থই বিধর্মীর উপযোগী কর্মী।' রাজা রামমোহন তখন বাগানে পায়চারি করছিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উক্তি তাঁর কানে যেতেই, তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বলেন, 'কি ঠাকুর? এত উষ্মা কেন? শাস্ত্রের নজির দেখিয়ে আপনি বলুন দেখি আমি কি করে বিধর্মী! আপনি যদি তা প্রমাণ করতে পারেন, তা' হলে আমি আপনার অনুগামী হয়ে চলব। আর আপনি যদি আপনার এই ধারণা প্রমাণে ব্যর্থ হন, তা' হলে কথা দিন, আপনি আমার অনুগত হয়ে চলবেন।' বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলেন, 'হাঁ, কথা দিচ্ছি।' বেলা দ্বিপ্রহর অবধি দুই শাস্ত্রকুশলীর মধ্যে চলে শাস্ত্রানুগ আলোচনা। মীমাংসায় পৌঁছে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রাজাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বলেন, 'আমারই ভুল। আজ থেকে আমি আপনার আনুগত্য স্বীকার করলাম।'[১]

পাশ্চাত্য সভ্যতায় যা শুভ ও কল্যাণকর এবং যা ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়, ভারতীয়রা তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করুক, রাজার ছিল এটি আন্তরিক অভিপ্রায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন রাজার গুণমুগ্ধ সুহৃদ। রামমোহন জোড়াসাঁকো এলে পূজা শেষ করেই তিনি উঠে পড়তেন, জপ করতেন পরে। অথচ ইংলণ্ডে Duchess of Sutherland দ্বারকানাথের সঙ্গে দেখা করতে এলে, তিনি জপ শেষ না করে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন নি। দ্বারকানাথ ছিলেন শুদ্ধাচারী হিন্দু, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব পরিবারের যাবতীয় সদাচার ছিল তাঁর গৃহে। তিনি কখনও অখাদ্য খান নি। মদ স্পর্শ করেন নি; তথাপি ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশায় নিজেকে অশুচি মনে করে স্বগৃহেও পূজামণ্ডপের বাইরে দাঁড়িয়ে পূজা দেখতেন। বাড়ীতে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' লেগেই ছিল। তিনি সহধর্মিণীর সঙ্গে পর্যন্ত একাসনে বসে তাঁর ধর্মবিশ্বাস কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নি। বাহির-বাড়ীতে আলাদা গৃহ নির্মাণ করিয়ে নিজে সেখানেই বাস করতেন।

রাজা রামমোহন রায়ের উপর পড়ে খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তর থেকে জাতিকে বাঁচাবার গুরুদায়িত্ব। ১২৩৫ সালের ভাদ্র মাসের এক বুধবারে (২০ অগস্ট ১৮২৮ খ্রীঃ) রাজা রামমোহন রায় 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' প্রসারের উদ্দেশ্যে এক ধর্মসংস্থার উদ্বোধন করেন। বেদের জটিল কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে, জ্ঞানকাণ্ডকে ভিত্তি করে ব্রহ্মবাদকে তিনি আশ্রয় করেন। শঙ্করের জ্ঞানবাদ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ও রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে তিনি প্রাচীন ঋষিদের ভাবধারা এতে অক্ষুণ্ণ রাখেন। রাজা রামমোহন রায় উপলব্ধি করেছিলেন, বেদ অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয়। তাই তিনি জ্ঞানকাণ্ডের কোন অংশ পরিহার বা পরি-

---

[১] আত্মজীবনী ৪র্থ সং, পৃ, ২৯১

বর্তন করেন নি। এখানেই রাজার বৈশিষ্ট্য বা কৃতিত্ব। এই ধর্মমণ্ডলীর নাম দিলেন তিনি 'ব্রাহ্ম-সমাজ'![১] বেদ পাঠ ও শ্রবণের অধিকার শুধু ব্রাহ্মণের। রাজার নব-প্রবর্তিত সমাজে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁরই নির্দেশে সমাজগৃহের পাশের একটি ঘরে সন্ধ্যার পূর্বে অব্রাহ্মণের অনুপস্থিতিতে বেদ ও উপনিষদ পাঠ হত[২], আর সূর্যাস্তের পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও উৎসবানন্দ গোস্বামী সমাজগৃহের বেদীতে বসে উপনিষদ ও বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা শোনাতেন। পাঠান্তে সমবেত-কণ্ঠে প্রতিজ্ঞাপত্র উচ্চারিত হত। ভক্তিমূলক সংগীতের পর উপাসনা-সভা ভাঙত। প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা ছিল, 'প্রতিদিন শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক দশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করব।' বুধবার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ঐ দিনটি সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্ধারিত হয়। সমাজের নিজ গৃহে প্রবেশের দিন—শনিবার ১১ মাঘ, ১২৩৬ সাল। মাঘোৎসবের উদ্ভব তখন থেকে। রাজা রামমোহনের প্রবর্তিত ধর্মে যাঁরা সক্রিয় অংশ নিলেন পূজাপার্বণ ব্যাপারে সনাতনীদের সঙ্গে তাঁদের কোন বিরোধ ছিল না। তাঁরা হিন্দুসমাজের অনুগত ছিলেন। স্মৃতির অনুশাসন মেনে চলতেন। সমাজে তাঁরা করেন ব্রহ্মোপাসনা আর নিজেদের গৃহে জাঁকজমক করে করতেন দোল-দুর্গোৎসব। রাজা নিমন্ত্রিত হয়ে নিজে উপস্থিত থাকতেন না। পুত্র রাধাপ্রসাদকে তিনি পাঠাতেন। দুর্গোৎসবে রাজাকে নিমন্ত্রণ করতে দ্বারকানাথ জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথকে পাঠান। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন এগারো-বারো। রাজা তাঁকে সবিস্ময়ে বলেন, 'আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল।'[৩]

১২৩৭ সালে রাজা ইংলণ্ডে যান। এর পূর্বেই রাজার এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল (Anglo Hindu School) উঠে যায়। দেবেন্দ্রনাথকে রাজাই হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়ে যান। ডিরোজিও তখন আর ঐ কলেজে ছিলেন না। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপর ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ে পুরোপুরি। দ্বারকানাথ ব্রাহ্মসমাজকে মাসিক আশি টাকা করে অর্থ সাহায্য করতেন। ১২৪০ সালে ব্রিস্টল নগরে রাজা রামমোহন পরলোকগমন করেন। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন পনের। তাঁর উপর ছিল রাজার অসাধারণ প্রভাব। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'যদিও রাজার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। যা আমাকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। আমার উপর তাঁর নিগূঢ় প্রভাব ছিল। তাঁর মুখে কী এক আকর্ষণ ছিল যা আমি আর কারও মুখে দেখি নাই।'

শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের কাছে পেয়েছিলেন অকৃত্রিম বাৎসল্য। রাজার 'ব্রহ্মবাদ' তাঁর মনে কৈশোরেই করেছিল গভীর রেখাপাত। হিন্দু কলেজে যাতায়াতের সময় ঠনঠনিয়ায় সিদ্ধেশ্বরী কালীকে তিনি রোজই প্রণাম করতেন। ঐ সময় একদিন সন্ধ্যারাতে, নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখে 'ঈশ্বর অনন্ত অসীম' এই ভাবের উদয় হয় তাঁর মনে। তিনি তখন সঙ্কল্প করেন, 'কোন পৌত্তলিক পূজায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ

---

[১] ১৮২৮ খৃস্টাব্দের ২০ অগস্ট, ৬ ভাদ্র, বুধবার। আত্মজীবনী ৪র্থ সং, পৃ ৩২

[২] আত্মজীবনী ৪র্থ সং, পৃ ৩০৪

[৩] ঐ ঐ পৃ ১৯

করব না। কোন প্রতিমা পূজা করব না।' সেদিন যদিও তাঁর মধ্যে এক উদার ধর্মবোধই ক্রিয়া করেছিল, কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতীক-উপাসনার মূলতত্ত্ব না জানার, তাঁর এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছিল। হিন্দুশাস্ত্রে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' একেশ্বরবাদের কথাই আছে। প্রতিমায় 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'-স্বরূপ বিশ্বরূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা হয়। কালী-কৃষ্ণ-শিব-দুর্গা সমস্তই অভিন্ন; যিনি ভেদদৃষ্টিতে দেখেন, তাঁকে শাস্ত্রে মূঢ় বলা হয়েছে।

১২৪৭ সালে বাইশ বছর বয়সে নিমতলাঘাটে দেবেন্দ্রনাথের পিতামহীর অন্তর্জলির সময় সংকীর্তনের ধ্বনি—'এমন দিন কি হবে। হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে।' দেবেন্দ্রনাথের কানে এলে এক উদাস আনন্দে তিনি আত্মহারা হয়ে ওঠেন। ঈশ্বর লাভের জন্য তখন থেকে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজি, পার্সি ও সংস্কৃত শিখেছিলেন। তাঁর মেধা ছিল অসাধারণ। হাফেজের কবিতা তিনি অনেক সময় আবৃত্তি করতেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে তিনি উপনিষদ পড়েন। তাঁর ভক্তিবিগলিত ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ মূলপাঠ কণ্ঠস্থ করতেন। উপনিষদের বিষয়বস্তুকে তিনি ভাবতেন তাঁরই অন্তরবীণার ঝঙ্কার। উপনিষদ-বেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের সঙ্কল্প নিয়ে ১২৪৭ সালে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করলেন। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের ঘটে বিপর্যয়। নয় বছর ধরে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, রাজার প্রবর্তিত ধর্মকে কোনও রকমে টিঁকিয়ে রাখেন। ১২৪৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ সমাজে গিয়ে রাজার ধর্মের পরিণতি দেখে বিচলিত হন। কি করে এর প্রাণসঞ্চার সম্ভব? এ নিয়ে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা করেন। রাজার 'অর্পণ-নামায়' (Trust Deed) উপাসনার কথা ছিল, কিন্তু প্রচারের কোন উল্লেখ ছিল না। তীক্ষ্ণধী দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারের ভার নেয়। দেবেন্দ্রনাথ কুড়ি জন বন্ধুকে নিয়ে ৭ পৌষ, ১২৪৯ সালে অমাবস্যা তিথিতে বারবেলায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা রামমোহনের ধর্ম গ্রহণ করেন।[১] দেবেন্দ্রনাথ বিনীতভাবে আচার্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে উদ্দেশ করে বলেন, 'অদ্য এই শুভক্ষণে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম-ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সকলে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি। যাহাতে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন।' দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বৎসর ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

সমাজের ভার নিয়েই দেবেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে অব্রাহ্মণ-শ্রোতার উপস্থিতিতেও বেদ পাঠের ব্যবস্থা করেন।[২] দেবেন্দ্রনাথের ব্যবস্থা থাকলেও শূদ্রের সাক্ষাতে বেদ পাঠ করতে প্রস্তুত, এমন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া দুষ্কর হল। ১২৫২ সালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মৃত্যু হলে দেবেন্দ্রনাথ স্থির করেন, গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা সকলের পক্ষে উপযোগী নয়। তিনি নিজে উপনিষদ ও শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে সংস্কৃত ও

---

[১] আত্মজীবনী ৪র্থ সং, পৃ ৪০—৪৫

[২] ঐ ঐ পৃ ৪১, ৩০৫

অনূদিত বাংলায় ব্রহ্মোপাসনার প্রণালী সংকলন করে তা ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তন করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্রেরও পরিবর্তন করেন। প্রতিজ্ঞাপত্রের কাঠামো দাঁড়ায়—'প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।' দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনার জন্য এইরূপ একটি প্রশস্ত উপাসনা-প্রণালী সংকলিত করেন। তাহার প্রথম দুইটি বাক্য—

১. সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
২. আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি।

এই দুইটি মহাবাক্য প্রতি ব্রাহ্মের একাকী নির্জনে বসিয়া ব্রহ্মে আত্মা সমাধান করবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করলেও, দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকে আরও তিনটি শ্লোক যোগ করেন। তার বঙ্গানুবাদ—

৩. তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।
৪. ইঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।
৫. ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ, বায়ু এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

উপাসনান্তে মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের স্তোত্র পাঠ করবাব জন্য দেবেন্দ্রনাথ আপন ইচ্ছামত পরিবর্তন করে মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে যে স্তোত্রটি পাঠের জন্য নির্ধারণ করেন তার বঙ্গানুবাদ—

তুমি সৎ-স্বরূপ ও জগতের কারণ, এবং জ্ঞান-স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য, ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল, ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণীগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চ পদ-সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ, হইতেও শ্রেষ্ঠ, এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমবা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতে সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসার-সাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

দেবেন্দ্রনাথের অস্থি-মজ্জায় ছিল রক্ষণশীল প্রকৃতি! ব্রহ্মোপাসনায় গায়ত্রী মন্ত্র তুলে দিলেও তিনি নিজে তা জপ করতেন। একথা তিনিই স্বীকার করেছেন আত্মজীবনীতে, 'পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায়-শিরায়'। এ সব সত্ত্বেও আপন উপলব্ধি ও প্রত্যয়বোধে দেবেন্দ্রনাথ মনে করেন, ধর্মজীবন সাধনার পথে মূর্তিপূজার কোনও প্রয়োজন নেই। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মবাদী মূর্তিপূজা তাঁর কাছে অবাস্তব। 'সৃষ্টিকর্তা অবয়বশূন্য। তিনি কালীঘাটের বিগ্রহ নন, আবার ঠাকুরবাড়ীর শালগ্রাম শিলাও নন।' দেবেন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন মূর্তিপূজার বিরোধী। রামমোহনের মত শাস্ত্র-অধ্যয়ন ও শাস্ত্রজ্ঞান দেবেন্দ্রনাথের ছিল না। উপনিষদের অসমগ্র পাঠ এবং বিশেষ করে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট কেবলমাত্র ব্রহ্মবিষয়ক মন্ত্রগুলিই অধ্যয়নের ফলে তাঁর প্রতীতি হয়েছিল যে, 'উপনিষদ আদ্যন্ত ব্রহ্মভাবাপন্ন'। ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম-প্রভাবে 'বেদ অভ্রান্ত

ও অপৌরুষেয়' বলে তাঁর মনে সায় দেয় নি। ১২৫৩ সালে বিলাতে দ্বারকানাথের মৃত্যু হলে গঙ্গাতীরে কুশপুত্তলিকা দাহ করে দেবেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ—তিন ভ্রাতাই অশৌচ পালন করেন ও হবিষ্যান্ন আহার করেন। শ্রাদ্ধের দিন যথারীতি শ্রাদ্ধ হয়, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন ব্রাহ্মকে নিয়ে ঘরে বসে কঠোপনিষদ পাঠ করেন।

উপনিষদে দেবেন্দ্রনাথ যখন এমন সব মন্ত্র পেলেন, যা ব্রহ্মপ্রতিপাদক নয়, তখন রামমোহনের দেওয়া নাম 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' তাঁর কাছে খাপছাড়া মনে হয়। তাই তিনি রাজার প্রবর্তিত ধর্মের নাম পরিবর্তন করে 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম দেন।[১] বেদে তেত্রিশজন দেবতা রয়েছেন; এঁরা যে পরব্রহ্মেরই বিভূতি, ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র, এই সত্য যথার্থ উপলব্ধি না করে দেবেন্দ্রনাথ ১২৫৫ সালে ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেদ পাঠের পৌত্তলিক ব্যাখ্যার বিধি তুলে দেন। রামমোহনের অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের কথা তিনি একবারটি ভেবেও দেখলেন না। এতে রাজার প্রবর্তিত সত্যধর্মের শক্তির উৎস থেকে তিনি সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।

একদিন অনুপ্রাণিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের মন্ত্রগুলি একটির পর একটি করে তিন ঘণ্টা ধরে আবৃত্তি করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ঐ সব আবৃত্তি লিপিবদ্ধ করেন। দেবেন্দ্রনাথের তখন বয়স বত্রিশ বছর। ১২৫৬ সালে 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম দিয়ে তা ছাপা হয়। তখন থেকে ব্রাহ্মসমাজে বেদ পাঠের পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ পাঠ করা হয়।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়ই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করতে পারি'। দেবেন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত আমাদের বিবেচনায়, বিভ্রান্তিকর। অপূর্ণ মানুষের বিবেক ও আত্মপ্রত্যয় ভ্রমাত্মক। বিবেক সংস্কারের অধীন। যার যেরূপ সংস্কার, তার বিবেকও তদনুরূপ। খ্রীস্টান ও বৈষ্ণবের বিবেকের উপলব্ধি এক নয়। একমাত্র ব্রহ্মে নিত্যযুক্ত মহাযোগীর হৃদয়ই বিশুদ্ধ এবং তাঁরই নির্দেশ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যের মধ্যে যদি গরমিল হয়, তাহলে শাস্ত্রবাক্যই গ্রাহ্য। কেননা, কোনও কারণে ব্রহ্মবিদের জ্ঞানে অপূর্ণতা থাকতে পারে, কিন্তু অপৌরুষেয় শাস্ত্রে কোনও ভ্রান্তি নেই। ব্রাহ্মেরা বলে থাকেন, 'সকল শাস্ত্রগ্রন্থই ভ্রম-প্রমাদযুক্ত, যেহেতু এসবই মনুষ্য-প্রণীত'। কিন্তু বেদ মনুষ্য-প্রণীত নয়। বেদ অপৌরুষেয়, ভগবদ্‌বাক্য। চিত্ত সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত, মলিনতামুক্ত না হলে, শাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না। শাস্ত্রবাক্য সত্য ও অভ্রান্ত। ধর্মের ভিত্তি শাস্ত্র, আপ্তবাক্য ও ঋষিবাক্য। বেদ হিন্দুধর্মের ভিত্তি।

রাজা রামমোহন-প্রবর্তিত সত্যধর্মের ভিত্তি ছিল বেদের জ্ঞানকাণ্ড। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের কিছু শ্লোক, যা তাঁর মনঃপূত হয়েছিল কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করেন; এতে সত্যকে আংশিকভাবেই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শাস্ত্রবাক্য আংশিক সত্য নয়, সত্যের কখনও খণ্ডিত রূপ হয় না। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ সংকলনের সময়, দেবেন্দ্রনাথ নিত্যযুক্ত হন নি। সজীব ধর্মতরু থেকে নীতিকুসুম চয়ন করে ব্রাহ্মধর্ম-পুষ্পস্তবক তিনি বিরচন করলেও এবং তা আপাত-মনোমুগ্ধকর হলেও, এতে

---

[১] আত্মজীবনী ৪র্থ সং, পৃ ৩১৭

জীবনের স্পন্দন নেই। আপ্তবাক্যমূলক ধর্মশাস্ত্রের উপর ভিত্তি না থাকলে যে কোন ধর্মই প্রাণহীন ও নিষ্পন্দ। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ না থাকলে উপাসনা 'প্রণালী-সম্মত' হলেও তা ভস্মে ঘি ঢালার সামিল।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থখানি উপনিষদ-গ্রন্থমালা থেকে সংগৃহীত ভক্ত-হৃদয়স্পর্শী এক অপূর্ব সংকলন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে কোন ধর্মসংস্থার মূল গ্রন্থ হিসাবে এর মান 'ছিন্নমূল তরু-সদৃশ'। এই গ্রন্থ প্রকাশে ও প্রচারে সমাজের প্রভূত নৈতিক উন্নতি ঘটেছে সত্য, কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বনে ব্রহ্মদর্শন হয়, তা এতে নেই। শাস্ত্রের অনুগত না হলে, পুরোপুরি শাস্ত্র না মানলে ও সদ্‌গুরুর কৃপা না পেলে ব্রহ্মলাভ হয় না। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে'। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীশ্রীভগবান বলেছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন সঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌॥

—যিনি শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করে, নিজের অভিপ্রায় অনুসারে চলেন, তাঁর সিদ্ধিলাভ হয় না। তিনি সুখও পান না এবং তাঁর পরাগতিও লাভ হয় না।

১২৫৭ সালে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় রমাপ্রসাদ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। এরপর দেবেন্দ্রনাথ পারিবারিক পূজাপদ্ধতি নূতন ছাঁচে ঢালতে চাইলেন। ১২৫৮ সালে তাঁর গৃহে জগদ্ধাত্রী পূজা উঠে যায়। কিন্তু অনুজেরা দুর্গা পূজা বন্ধ করতে রাজী হন না। এতে ক্ষুব্ধ হন দেবেন্দ্রনাথ; সেই থেকে শারদীয়া পূজার পূর্বে প্রতি বছর তিনি ভ্রমণে বের হতেন। কোনবার যেতেন হিমালয়, কোনবার অন্যত্র। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মৃত্যুর পরও ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণ আচার্যই ছিলেন। ১২৬৭ সালে শ্রাবণ মাসে দেবেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসে ভাষণ দেন।

ধনীর দুলাল দেবেন্দ্রনাথ প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হলেও আদর্শবাদী উদার ও উদাসীন ছিলেন। তাঁর ধর্মপিপাসা ছিল প্রবল, তাঁর ভক্তি ছিল অসাধারণ। বেদান্তদর্শনে শঙ্করভাষ্যের মীমাংসা, 'জীব ও ব্রহ্ম সমপর্যায়ভুক্ত'। এতে দেবেন্দ্রনাথের মন ভরে না। তিনি বলেছেন, আমরা চাই ব্রহ্মকে উপাসনা করতে। যদি উপাস্য ও উপাসক এক হয়ে যান, তবে কে কাকে উপাসনা করবে?

সেকালের ব্রাহ্মরা ছিলেন আদর্শবাদী, চালচলন তাঁদের সাদাসিধে, ছিল না বেশবিন্যাসের পারিপাট্য। আমিষ আহার বারণ, ধূমপানও নিষেধ, মদ্যপানের কথা তো ওঠেই না। কি কথায়, কি কাজে, ব্রাহ্মেরা কপটাচার এড়িয়ে চলতেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি কাহিনী বলা চলে—একজন ব্রাহ্ম ছিলেন হিসাব-রক্ষক। উপরওয়ালার প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, হিসাব বোধহয় ঠিকই আছে। প্রশ্নকর্তা বলেন, 'বোধহয় কি? ঠিক কিনা তাই বলুন'। হিসাব-রক্ষক এবার উত্তর দেন, 'হাঁ, প্রায় ঠিক'। উপরওয়ালা নিরুপায় হয়েই বলেন, 'বোধহয়, প্রায় এগুলো বাদ দিয়ে বলুন'। এবার তিনি জবাব পেলেন, 'হাঁ, খুব সম্ভব ঠিক'।

যদিও মূলত খ্রীস্ট-ধর্মান্তর প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল তাহলেও, আরও নানা কারণে ভারতীয়েরা ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১২৬৫ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের অবসান হয়, দেশাত্মবোধের ঘটে উজ্জীবন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ আসে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারণের ও বিধবাবিবাহ আন্দোলনের। নব্যশিক্ষিত যুব-সমাজের সম্মুখে আসে যুক্তিবাদের আদর্শ, যা সত্য তা জীবনে

প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র, প্রতিমাপূজা অর্থহীন, জাতিভেদ যুক্তিহীন ও অশোভন, উপবীত-ধারণ কুসংস্কার-বন্ধন। তাঁরা দলে দলে এসে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন।

ধর্মজিজ্ঞাসা ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি

১২৬৫ সালে বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ ও শিবনাথ সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তখনও বিজয়কৃষ্ণের স্বাভাবিক নিষ্ঠা ও ভক্তি অবিচলিত। কণ্ঠে তুলসীমালা, কপালে তিলক ও মাথায় শিখার জন্য তাঁকে সহ্য করতে হত কত লাঞ্ছনা। যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বিজয়, অঘোর, শিবনাথ, উমেশ আর আমি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সময় ঘোর নাস্তিকতার মধ্যে "ভাগবত" বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনতাম। বিজয় ছিলেন আমাদের নেতা। বিরূপ সমালোচনা বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে রেখাপাত করে নি। কিন্তু বেদান্তের "সোঽহংবাদ" তাঁকে তাঁর শান্তির স্নিগ্ধভূমি থেকে উৎখাত করে দেয়।' 'আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়' নামক গ্রন্থে পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ লিখেছেন, 'যে হিন্দুশাস্ত্র ধর্মের সংরক্ষক, সেই হিন্দুশাস্ত্রই আমার আন্তরিক কুসংস্কারের উন্মূলক হইল। হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমি ঘোর বৈদান্তিক হইয়া উঠিলাম। তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্ম—এই সত্য বিশ্বাস করিতাম। উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না। এই সঙ্কট সময়ে বিজয়কৃষ্ণের কুলপুরোহিত নসিরাম শিরোমণি মহাশয়ের দুইটি ছেলে—রামময় ও কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এই দুই সহোদর ছিলেন বিজয়কৃষ্ণের সমবয়সী ও আশৈশব অন্তরঙ্গ বন্ধু। বাল্যাবধি দুই ভাই-ই স্বধর্মে বড় নিষ্ঠাবান ছিলেন। এঁদের ধর্মান্তরে বিজয়কৃষ্ণের মনে আসে নানা জিজ্ঞাসা আর বাহ্য অনুষ্ঠানে অনাস্থা। মন তাঁর দুলে ওঠে সংশয়-তরঙ্গে। তাঁরও মনে পড়ে সংস্কার-আন্দোলনের ছাপ।

অন্তর্মুখী সাধনার কথা সাধারণের মধ্যে তখনও জানাজানি হয় নি। বাইরের আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে লোকে ধর্ম বলে মেনে নিত। বেদের ক্রিয়াকাণ্ডেরই তখনও প্রভাব; সাধনার মূল লক্ষ্য যে দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি—এ-তত্ত্ব জানতেন মুষ্টিমেয় লোক। রাজা রামমোহনের সময় হতে ব্রহ্মসঙ্গীতের মাধ্যমে শোনা যায় এই আত্মশুদ্ধির কথা—

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।
বিবেক ও বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে॥

চির সরল সত্যান্বেষী বিজয়কৃষ্ণ তাঁর কি করা উচিত আর কিই-বা অনুচিত এই ভেবে পান না কুলকিনারা। শ্যামসুন্দরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস হারিয়ে তিনি জীবন্মৃত হয়ে পড়েন। তাঁর অবস্থা তখন 'দোদেল বান্দা কল্‌মা চোর/না পায় বেহেস্ত, না পায় গোর'। এই সময়ে ঘটে এক ঘটনা। বিজয়কৃষ্ণের কুলবৃত্তি গুরুগিরি। স্বামীর দেহান্তে স্বর্ণময়ীকে যেতে হত শিষ্যালয়ে। তখন ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণ বড় হয়েছেন—ও'দের উপর এসে পড়ে এই ভার। রংপুর ও বগুড়া যাবার জন্য প্রস্তুত হন বিজয়কৃষ্ণ। উভয় জিলায় ও'দের শত শত শিষ্য। প্রথম যান সাতসিমলায়—হারাধন নন্দীর গৃহে। প্রৌঢ়া মহিলা গোবিন্দময়ী দাসী বিজয়কৃষ্ণের চরণ পূজা করে বলেন, 'আমি ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। আপনি কৃপা

করে আমাকে উদ্ধার করুন'। তারপর উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করেন—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বিজয়কৃষ্ণের ঘটে ভাবান্তর। তিনি আত্মবিশ্লেষণ করেন আপন মনে। জিজ্ঞাসা আসে, নিজে অন্ধ হয়ে অপরকে আমি কি করে আলোর সন্ধান দেব? আমি কিভাবে উদ্ধার পাব তার নেই ঠিক-ঠিকানা, অপরকে কি করে করব পরিত্রাণ? এতো কপটাচার বই কিছু নয়। এতে যে গুরু-শিষ্য উভয়েরই অকল্যাণ হয়!

অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে সরে।
সজ্ঞানে করে পাপ সঙ্গে সঙ্গে ফেরে॥

মনস্থির করে ফেলেন বিজয়কৃষ্ণ, 'উপোস করে মরি সেও ভাল. তথাপি গুরুবৃত্তি আর নয়'। স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের জন্য মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবেন বলে তিনি স্থির করলেন। এতে পরোপকারও হবে, পরিবারের ভরণ-পোষণও হবে। এই সিদ্ধান্তে আসার কয়েকদিন পর, বিজয়কৃষ্ণ গোপীনাথপুরের খামারে যাচ্ছিলেন; পথে হঠাৎ তিনি দৈববাণী শোনেন, 'বিজয়, পরলোক চিন্তা কর'। কোথা থেকে এল এই আদেশ? নিকটে কোনও লোক নেই, জন নেই; অথচ তাঁরই আর্ত-আত্মার প্রতিধ্বনি তিনি শুনতে পেলেন শূন্য আকাশে! কে তাঁকে জীবিকা-সংস্থানের সহজ ও নিশ্চিত পন্থা পরিত্যাগ করে অকূল-পাথারে ঝাঁপ দিতে অমন করে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন? সেই রাত্রে বিজয়কৃষ্ণের জ্বর আসে। অজ্ঞাত ভয়-ভাবনায় তাঁর বুক দুরুদুরু করে। বহুক্ষণ ছট্‌ফট্ করে কাটান বিজয়কৃষ্ণ। এক অচিন্ত্য পরলোক-চিন্তা তাঁকে অভিভূত করে তুলল। এরপর তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। একটা মস্ত বড় শূন্যতাবোধের হাত থেকে তিনি উদ্ধার পান।

আকস্মিক যোগাযোগ হয় বগুড়ায় বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে নিষ্ঠাবান তিন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের। তাঁরা হলেন—কিশোরীনাথ রায়, গোবিন্দচন্দ্র পাঁড়ে ও হারাধন বর্মণ। বাড়ী ওঁদের শিবাবাটী গাঁয়; একেবারে মাটির মানুষ। বিজয়কৃষ্ণ মুগ্ধ হন ওঁদের চরিত্র-মাধুর্যে। ব্রাহ্মদের সম্পর্কে বিরূপ এক ভ্রান্ত ধারণা দানা বেঁধেছিল বিজয়কৃষ্ণের মনে, এই সব মত-পথের অনুবর্তীরা মদ খায়, অখাদ্য-কুখাদ্য খায়; ব্রহ্মোপাসনার সময় তবলা বাজায়। এরকম ধারণায় একটি কারণ ছিল। ধর্মান্তরের যখন হিড়িক পড়েছিল, তখন কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় গজায় নানা পরগাছা সংঘ; ওরা না ব্রাহ্ম, না খ্রীস্টান—যথেচ্ছাচারী, সুরাপায়ী। নানা ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল ওদের বৈশিষ্ট্য, আর ওরা নিজেদের ব্রাহ্ম বলে দিত পরিচয়। বগুড়ার এই তিন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে বিজয়কৃষ্ণ মুগ্ধ হন। ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝতে পারেন যে, তাঁর ধারণা অমূলক। যুবক বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে আলাপে তাঁদের অন্তরও তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। ইনি আবার অদ্বৈতপ্রভুর বংশধর শান্তিপুরের গোস্বামী-সন্তান। ওঁরা তাঁকে বারবার অনুরোধ করেন, একবারটি যেন তিনি কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজে অবশ্যই যান। তিনিও যাবেন বলে ওঁদের কথা দেন।

কলিকাতা ফেরার পথে বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে এলেন; মার কাছে ব্যক্ত করলেন মনের কথা অকপটে। মা কত বোঝান; মায়ের যুক্তিও অকাট্য। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই বংশপরম্পরায় গুরুবৃত্তি করেছেন। তাঁরা কি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না? অশাস্ত্রীয় হলে এ পথ কি কখনও তাঁরা মাড়াতেন, ব: এভাবে কখনও জীবিকা-নির্বাহ করতেন! কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ তাঁর সঙ্কল্পে অটল। কী আর করেন মা! অগত্যা

তিনি সম্মতি দেন। কিন্তু সংসার চলবে কি করে? মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার কথা তোলেন বিজয়কৃষ্ণ। রাজী হন জননী স্বর্ণময়ী দেবী। কলিকাতা ফিরে তাঁকে পড়তে হয় দৈবদুর্বিপাকে। বিজয়কৃষ্ণেরই এক সহচর, তাঁর তোরঙ্গ ভেঙ্গে টাকা-পয়সা যা ছিল তা নিয়ে হয় উধাও। বড় সহর, বড় নির্দয়—কারও কথা কেউ ভাবে না। কি ছোট, কি বড়—স্বার্থভরা সবার অন্তর। 'ফেল কড়ি মাখ তেল'। এমন দিন যায়, যখন বিজয়ের আহারও জোটে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন আর সংস্কৃত কলেজে নেই। বিজয়কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর গৃহে থাকার অনুমতি চান। বহু নিরুপায় মেধাবী ছেলেকে তিনি তাঁর আবাসে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকটি ছেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি এমন অশিষ্ট আচরণ করে যে তিনি স্থির করেন, কোনও ছাত্রকে তিনি আর গৃহে রাখবেন না। এ-কথার উপর তো আর কিছু বলা চলে না।

বগুড়ার ভদ্রলোকেরা কথায় কথায় বলেছিলেন, 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দিলদরিয়া মানুষ; বিষয়-আশয় বহু, এদিকে আবার স্বভাব-বিবাগী'। আবেদনপত্র লিখে, বিজয়কৃষ্ণ একদিন নিজে যান জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ীতে। চিঠিখানা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে দেবেন্দ্রনাথ তখনই টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন। বিমুখ হলেও বিরূপতার লক্ষণ নেই যুবক বিজয়কৃষ্ণের চোখেমুখে। বরং যুক্তি দিয়ে বিজয়কৃষ্ণ সমর্থন করেন দেবেন্দ্রনাথের এই অশোভন আচরণ—'কত লোক না জানি কতভাবে এঁকে প্রবঞ্চনা করেছে। আর আমার দুরবস্থার কথা হয়ত তিনি ধারণা করতে পারেন নি। তাঁর ঐ সময়ের দুর্ভোগের কথা বলতে গিয়ে বিজয়কৃষ্ণ বলেছেন, 'দিবা-রাত্রি উপবাস, রাত্রিতে কলেজের বারান্দায় শয়ন। দিনের বেলায় গোলদীঘির জল ও কাদা খেয়ে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম। বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে অবস্থান, পাছে বন্ধুত্বের হয় অপমান। চার দিনের দিন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবা, তোমার বুঝি কিছু খাওয়া হয় নি; মুখখানি শুকিয়ে আছে'। একটি সিকি তাঁর হাতে দিয়ে তিনি বলেন, 'কিছু কিনে খেয়ো'। ভগবানেরই করুণা ভেবে বিজয়কৃষ্ণ সিকিটি সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেন। ময়রার দোকানের দিকে যেতে দেখা হয়ে যায়, সেই বন্ধুটির সঙ্গে। দুঃখে লজ্জায় তিনি পাশ কাটিয়ে যেতে চান। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে ধরে ফেলেন। তিনি সঙ্কুচিত, লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে বলেন, 'জুয়া খেলে সব খুইয়েছি। তোমাকেও পথে বসিয়েছি'। বিজয়কৃষ্ণ দরদভরা কণ্ঠে বলেন, 'ও সব কথায় কাজ কি? মুখখানা বড় শুকনো দেখাচ্ছে। কিছু খাওনি বুঝি! এইমাত্র এক ভদ্রলোক চার আনা পয়সা দিয়ে গেলেন। চল দুইজনে মিলে কিছু কিনে খাই।' দুঃখে পড়েও না আছে ক্ষোভ, না আছে উষ্মা। যে তাঁকে দুর্গতি ও লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে নামিয়েছে তার সঙ্গেও করেন কি প্রীতিমাখা সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার!

ঠন্‌ঠনিয়ার কাছে একটি ঘর ভাড়া করে বিজয়কৃষ্ণ উঠে যান ওখানে দুইজনে মিলে। যে গৃহে তিনি ঘর নিলেন, সেখানেই বসতো মদ্যপানের আসর। গৃহস্বামী নিজে পাঁড়-মাতাল। নতুন ভাড়াটিয়াকে দলে টানার কত না চলে ফিকির-ফন্দি। ওদের বাড়াবাড়ি দেখে একদিন হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন বিজয়কৃষ্ণ, 'ছি ছি, শান্তিপুরের অদ্বৈতপ্রভুর বংশে জন্মে সুরাপান করব?' সুরাপান সম্বন্ধে হিন্দুধর্মের বড় সুন্দর অনুশাসন। স্মৃতির বিধান, 'মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যম্'—মদ কাউকে দিতে মানা, খেতে মানা এবং কারও থেকে নিতেও মানা। সংসারে কে আর মদ খায়, সবাইকে মদে

খায়। সমস্ত শুভবুদ্ধি পায় লোপ। ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় আত্মা। বিজয়কৃষ্ণ 'মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যম্‌' নীতিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোনও প্রলোভনই তাঁকে টলাতে পারে না।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৪২ সালে (১৮৩৫ খ্রীঃ)। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে হত শিক্ষা। চিকিৎসকের তখন বড় অভাব। আর পল্লী-অঞ্চলে তো কথাই নেই। চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট ১২৫৯ সালে মেডিক্যাল কলেজে তিন বছরের পাঠ্য একটি বাংলা-বিভাগ খুলেন। ১২৬৭ সালে বিজয়কৃষ্ণ বাংলা-বিভাগে ভর্তি হন। তখন বাংলা-বিভাগের তিন শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা প্রায় তিনশত। ডাক্তার চিবার্স ছিলেন ঐ সময় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ। প্রখর স্মৃতিশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হেতু বিজয়কৃষ্ণ অধ্যাপকদের মুখে শিক্ষণীয় বিষয়ের বক্তৃতা শুনে সংগে সংগে আয়ত্ত করে সহপাঠীদের নিকট যথাযথ পুনরাবৃত্তি করতেন এবং যারা অনুসরণে অক্ষম হত, তাদের তিনি সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। এতে কৃতী ছাত্র হিসাবে ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলীর দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করেন। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নের সময়ও বেদান্তদর্শনের প্রভাব থেকে তিনি অব্যাহতি পান নি। জন্মগত সংস্কার তাঁর—পূজা, অর্চনা, উপাসনা। উপনয়নের পর থেকে তিনি নিত্য করতেন গায়ত্রীমন্ত্র জপ। ভক্তির ফল্গুধারা তাঁর শিরায়-শিরায়, অস্থিমজ্জায়। 'জীব' ও 'ব্রহ্ম' এক—তত্ত্বকথায় কি করে তাঁর মন ভরে? বিজয়কৃষ্ণের অন্তর বলে, ব্রহ্ম চিরকালই উপাস্য। জীব চিরদিন তাঁর পূজা করবে, উপাসনা করবে। 'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস'। পূজা-উপাসনা ছেড়ে তাই তিনি অন্তর্দাহে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিলেন এবং মনের শান্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেন।

ব্রাহ্মমন্দিরে যাতায়াত

বিজয়কৃষ্ণ আজন্ম সত্যপ্রতিষ্ঠ। কোনও অবস্থায় কখনও তিনি সত্যের অপলাপ বা বিকৃতি ঘটান নি। ঐ সময়ের একটি সামান্য ঘটনা হতে তাঁর সত্যনিষ্ঠার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাপকাঠির আভাস মিলে। শান্তিপুরে অভয়চরণ বাগচি নামে এক ডাক্তার ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর আদালতে জনৈক গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা দায়ের করেন; বিপক্ষ বিজয়কৃষ্ণকে সাক্ষ্য মানেন। সাক্ষ্য দেবার পূর্বে আইনের প্রথা অনুযায়ী 'প্রতিজ্ঞা'র বয়ান পাঠ করে শপথ করার রীতি আছে। তখন বয়ানটি ছিল, 'আমি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে বলছি—আমি সত্য বই অসত্য বলব না; যা সত্য তাই বলব।' উনিশ বছর বয়সের সাক্ষী বিজয়কৃষ্ণ আদালতের কাঠগড়ায় উঠে বয়ানের মুসাবিদা দেখে হাকিমবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'আমি তো আজ অবধি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি নি। সুতরাং এই বয়ান পাঠ করে প্রতিজ্ঞা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' মুগ্ধ হন বিচারক! সত্যিই তো বয়ানেই গলদ। অথচ তা কারও নজরে পড়ে নি। বাদীপক্ষের উকিল তখন হাকিমের কাছে প্রার্থনা করেন, 'এই সাক্ষীকে বাতিল করা হক'। বিবাদীপক্ষই বা তা মেনে নেবেন কেন? বিচারক উপায় উদ্ভাবনে অক্ষম হয়ে বলেন, 'আদালতে নিরীশ্বরবাদীদেরও সাক্ষ্য গ্রহণের নজির আছে। ওভাবেই এই সাক্ষীর

সাক্ষ্য নেওয়া হক।' বিজয়কৃষ্ণ বিচারককে বলেন, 'তা হয় না; আমি তো নাস্তিক নই। ঈশ্বর বর্সত্র রয়েছেন, তা আমি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করি; কিন্তু আমি যেমন এখানে আপনাদের সকলকে দেখতে পাচ্ছি, ঈবরকে তো ওইভাবে দেখতে পাচ্ছি না; তাহলে তাঁকে প্রত্যক্ষ করে বলছি—একথা কি করে হলফ করে বলি?'

হাকিমবাবু তখন বিজয়কৃষ্ণকে সসম্ভ্রমে বলেন, 'আপনি শুধু বলুন, "আমি যা বলছি তা সত্য" তাহলেই হবে।' তখন ওভাবেই তাঁর সাক্ষ্য গৃহীত হয়।

বগুড়ার তিন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের পূত চরিত্র ও ব্রহ্মের প্রতি গাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগ বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে করেছিল গভীর রেখাপাত। তাঁরা বিজয়কৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'ব্রহ্মোপাসনা ও ঈশ্বর-আরাধনা ভিন্ন শান্তি মিলে না। ভগবদ্‌ভক্তি ছাড়া ত্রিতাপের জ্বালা জুড়ায় না।' যুবক বিজয়কৃষ্ণের অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করে তাঁরা ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল তাঁদের হৃদয়। তাঁদের মনে হয়েছিল, দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এলে এবং তাঁর উপদেশ শুনলে ও তাঁর সঙ্গ করলে বিজয়কৃষ্ণের বিশেষ কল্যাণ হবে আর ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁর আজগুবি ধারণাও ঘুচবে। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় এসে ব্রাহ্মসমাজে যাবার জন্য বারবার তাঁরা তাঁকে অনুনয় করেছিলেন।

কলিকাতায় ফিরে নানা বিড়ম্বনায় পড়ে বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। পরস্পর তিনি শুনেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথও হিমালয়ভ্রমণে গিয়েছেন। বছর প্রায় ঘুরে আসে। ১২৬৮ সালে একদিন বিজয়কৃষ্ণের মনে হয়, তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা। সপ্তাহখানেক পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরেছেন—এ খবরও তিনি পেলেন। বগুড়ার ভদ্রলোকেরা বলে দিয়েছিলেন প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা হয়। ঐ দিনটিও ছিল বুধবার। কালক্ষেপ না করে ঐ দিন সন্ধ্যায়ই বিজয়কৃষ্ণ যান সমাজমন্দিরে।

ভাবগম্ভীর পরিবেশ। হৃদয়স্পর্শী স্তোত্র-আবৃত্তি, তাল-লয়-নিবন্ধ ভক্তিসঙ্গীত, সমবেত কণ্ঠে ব্রহ্মোপাসনা বিজয়কৃষ্ণের প্রাণে করে অমৃতসিঞ্চন। ঐ দিন আচার্য দেবেন্দ্রনাথ 'পাপীর দুর্দশা ও ঈশ্বরের করুণা' বিষয়ে এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। অবগাহন করেন বিজয়কৃষ্ণ ভক্তির পীযূষধারায়। এতদিন উপাস্যের আরাধনা করেন নি—এ কথা মনে উদয় হতেই তিনি আকুল হয়ে অশ্রুমোচন করেন। ব্রাহ্মসমাজকে তাঁর স্বর্গ বলে মনে হয়।

ঘরে ফিরে প্রার্থনা করেন বিজয়কৃষ্ণ, 'দয়াময়, প্রভো! ধর্ম-বিষয়ে আমি অর্বাচীন। আমার ন্যায় দুর্ভাগা কেউ আছে কিনা আমি জানি না। পূর্বে ইষ্টপূজায় অপার আনন্দ পেতাম! কিন্তু এখন হৃদয় যেন শুকিয়ে গেছে। প্রাণে কেবল হাহাকার! তুমি অনাথের নাথ, তোমার শরণ নিলাম। আমাকে কৃপা কর। তোমা বিনে আমার আর গতি নাই।' প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিত্তের সংশয় হয় দূর। সমুদায় অশান্তি চলে যায়। মনে মনে তিনি বলেন, 'শান্তি লাভের এমন সহজ পথ রয়েছে, অথচ এতদিন কত না অশান্তি ভোগ করেছি'। ঐ রাত্রেই দেবেন্দ্রনাথকে ধর্মজীবনে মনে মনে গুরু বলে সারা অন্তর দিয়ে তিনি বরণ করেন। 'ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্।' যা মনকে সুন্দর করে তা-ই ধর্ম। যা জীবনকে ধারণ করে তাই ধর্ম। যিনি যা কর্তব্য বলে বিশ্বাস করেন, সত্য বলে মেনে নেন তা-ই ধর্ম। নীতিবোধ ছাড়া সমাজ-জীবন হয় উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু দেশ-কাল-রুচিভেদে এক দেশের যা নীতি অপর দেশের তা নয়। নীতি আর ধর্ম এক

না হলেও নীতির অনুশীলন থেকে আসে আত্মজিজ্ঞাসা; ধর্মের তখনই হয় অঙ্কুর-উদ্গম।

সপ্তাহের দিনগুলি যেন বিজয়কৃষ্ণের কাটে না, বুধবারের প্রতীক্ষায় উন্মুখ। বাল্যসখা অঘোরনাথ যৌবনেও অকপট সুহৃদ, চরিত্রমাধুর্যে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট। বিজয়কৃষ্ণ বন্ধুকে ডাকতেন ‘সাধু অঘোরনাথ’ বলে। যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘অঘোরের হৃদয় ছিল যেন গলিত সুবর্ণ আর বিজয়ের শোধিত সুবর্ণ’। চেতলায় গিয়ে বিজয়কৃষ্ণ অঘোরনাথকে বলে আসেন যে, পরের বুধবার ওঁরা এক সঙ্গে ব্রাহ্মমন্দিরে যাবেন। ভারতের লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মবিদ্যায় রস-সঞ্চারের জন্যই যেন নিষ্ঠাবান, নীতিপরায়ণ, সত্যান্বেষী, অদ্বৈতকুলতিলক বিজয়কৃষ্ণ ঝোঁকেন ব্রাহ্মসমাজের দিকে। অক্ষয় অমোঘ অদম্য তাঁর বীর্য। বন্ধুদের নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় যান বিজয়কৃষ্ণ প্রতি বুধবার। ব্যাকুলতা নিয়ে প্রত্যহ প্রার্থনা করেন গৃহে। তাতে প্রাণে আসে প্রেরণা ও বল। সরলতা, নিষ্ঠা আর ব্রহ্মোপলব্ধির ব্যাকুলতা ছিল তাঁর আত্মার গভীরে। বিশ্বাসের ছিল দৃঢ়তা। মনে-প্রাণে জেনেছিলেন পরমেশ্বর অনন্ত মঙ্গলময়, তিনি করুণার আধার; অন্তরে ও বাহিরে তাঁর স্বতঃপ্রকাশ। তাঁরই ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান। বিনীত হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে একান্তভাবে সরল মনে নিজের দুঃখ-দৈন্যের কথা তাঁকে জানালে কল্যাণের সব ব্যবস্থা তিনিই করেন। চিত্ত স্থির করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে, তার অনুমোদনসাপেক্ষ কার্যে তিনি প্রেরণা যোগান। দিবারাত্রি পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে বাস আর তাঁর প্রিয়কার্য সম্পাদনই ব্রাহ্ম-জীবনের লক্ষ্য বলে বিজয়কৃষ্ণের মনে হয়।

দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তিনি নিয়মিত করে চলেন প্রাত্যহিক উপাসনা। জিজ্ঞাসু হয়ে কাতর প্রাণে তিনি প্রার্থনা করতেন, এতে অন্তরের দিব্য আলোয় সংশয়ের হত নিরসন। যেদিন যে সত্য উপলব্ধি করতেন তা লিখে রাখতেন—যা পরে ‘ধর্ম-শিক্ষা’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়।

বগুড়ার ভদ্রলোকদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে ওঠে। তাঁরাই তো তাঁকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁরা তাঁর প্রকৃত ধর্মবন্ধু। বয়সের তারতম্যে কী আসে-যায়! বিজয়কৃষ্ণ সবে তখন কুড়িতে পা দিয়েছেন। এর মধ্যে কলেজ ছুটি হয়। এই সুযোগের তিনি সদ্ব্যবহার করেন, নিজে বগুড়ায় গিয়ে সহৃদয় ভক্তদের করেন তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। তাঁরা এই ধর্মার্থী যুবকের অপূর্ব ভাববৈচিত্র্য লক্ষ্য করে মুগ্ধ হন। ব্রহ্মোপাসনা নিয়ে অন্তরঙ্গ আলোচনার সময় তাঁরা বলেন, ‘ব্রাহ্মধর্মেও নৈষ্ঠিক দীক্ষার প্রয়োজন’। তাতে ধর্মের হয় স্ফুরণ। স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় অনেক। ব্রাহ্মধর্মের বৈশিষ্ট্য কোথায়, তা নানা আলোচনায় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন তাঁরা। বগুড়া থেকে বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুর যান। অবসরযাপনের অফুরন্ত সময়; লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ত তিনি করেন ধ্যানধারণা, আর নিয়মিতভাবে শুরু করেন ডাক্তারি পড়াশুনা। এই বাড়াবাড়ি বালিকাবধূর ভাল লাগে না। বাড়ী এসে আবার এত কি পড়া! যোগমায়া খোলা বই-এর উপর শুয়ে পড়ে বলেন, ‘আর পড়তে হবে না। আমার সঙ্গে খেলবেন আসুন।’ বিজয়কৃষ্ণ মৃদু হাসেন। তাঁকে বলেন, ‘তোমার বোনটিকে নিয়ে দাদার সঙ্গে গিয়ে খেলা কর। আমার এখন সময় নেই।’ যোগমায়া আর এক ফাঁকে এসে দুখানা কচি হাত দিয়ে স্বামীর চোখ ঢেকে জিজ্ঞাসা

করেন, 'বলুন দিকিনি, আমি কে?' বিজয়কৃষ্ণ আর কী করেন? মার কাছে গিয়ে তিনি বলেন একটা বিহিত করতে। স্বর্ণময়ী দেবী এসে, খানিকটা হেসে বালিকা-বধূকে সস্নেহে নিয়ে যান পড়ার ঘর থেকে।

বাইরের ঘরে বসে বিজয়কৃষ্ণ একদিন প্রতিবেশী কয়েকজন যুবকের সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে করতে বলেন, 'পরমেশ্বর সকল মানুষকেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকলের মাতাপিতা। কাজেই নরনারী মাত্রই ভাইবোন। ঈশ্বর সকলের অন্তরে বাস করেন। তিনি কাহাকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন না; সুতরাং মানুষকে ঘৃণা বা অমর্যাদা করলে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা হয়। ইহা মহাপাপ। জাতিভেদ স্বীকার করলে ঈশ্বরকে পিতা বলে স্বীকার করা হয় না। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, খ্রীস্টান সকলেই পরম পিতার সন্তান।' একটি দশ-এগারো বছরের বালক ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বিজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে, 'জাতিভেদই যদি অস্বীকার করেন তাহলে আপনার গলায় পৈতে রেখেছেন কেন?' তার কথায় সায় দেন বিজয়কৃষ্ণ। বলেন তাকে, 'তুমি ঠিকই বলেছ; আমার খেয়ালই ছিল না।' তখনই তিনি উপবীত খুলে ফেলেন। ঐ বালকটিই তখন অন্তঃপুরে ছুটে গিয়ে স্বর্ণময়ী দেবীকে এই দুঃসংবাদটি দেয়। তিনি দিশেহারা হয়ে বাইরের ঘরে ছুটে গিয়ে ছেলেকে পৈতে পরার জন্য জিদ করেন। বিজয়কৃষ্ণের এ যেন এক জীবনমরণ-সমস্যা! একদিকে মায়ের করুণ আর্তনাদ—আত্মাহুতির ভীতি প্রদর্শন, অপরদিকে সত্যপালনে শিথিলতার জন্য বিবেক-দংশন! নিরুপায় হয়ে তিনি যন্ত্রচালিতের মত উপবীত পরে মাকে তাঁর সর্বনাশা সঙ্কল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। এই ঘটনায় তাঁর শান্তির বড় ব্যাঘাত হয়। 'ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়' গ্রন্থে বিজয়কৃষ্ণ লিখেছেন, 'উপবীত ত্যাগ না করাতে আমার মনে অত্যন্ত অশান্তি হইতে লাগিল। লোকে বলে, "পৈতেয় কি গায়ে কামড়ায়?" বাস্তবিক ইহা কাল ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিদিন আমাকে দংশন করিতে লাগিল। উপবীত রাখা অসত্য ব্যবহার। অসত্য ব্যবহার করিলে ঈশ্বর দর্শন হইবে না এই ভয়ে আমার প্রাণ অস্থির হইত।' শান্তিপুর থেকে মেডিক্যাল কলেজ খোলার কয়েক দিন আগে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় ফিরে গেলেন। দীক্ষার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষালাভ

বেদান্ত পড়ে বিজয়কৃষ্ণের পায়ের নীচের মাটি যেন সরে যায়! গ্রন্থে একেশ্বরবাদের কথা পড়েও সংশয় যায় না। শ্যামসুন্দরের উপর আস্থা হারিয়ে আপন অস্তিত্বে হন সন্দিহান। দৈব যেন সময় বুঝে তাঁর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হন। এই সংকটকালেই তাঁর এক শিষ্যা ভবরোগ থেকে তাঁকে উদ্ধার কবার আত্মিক আকুতি জানান। কয়েক দিন যেতে না যেতে তাঁকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত হয় দৈববাণী! এসব মিলে তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে ফেলে! 'ধর্মতত্ত্বের' কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে ঐ সময়ের তাঁর মনস্তত্ত্বের খানিকটা আঁচ করা সম্ভব। 'পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে প্রীতির উদয় হয় না। প্রীতি না হইলে প্রিয়কার্য সাধন করা যায় না। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার হৃদয় পাষাণময়; তাহা কর্তৃক কোন পাপই অকৃত থাকে না।

ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের সমুদয় কার্য সম্পাদন করিবে। কি বিদ্যাধ্যয়ন, কি পরিবার প্রতিপালন, কি অর্থোপার্জন সমুদায় কার্য ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া সম্পন্ন করিবে।'

ঈশ্বরলাভই ছিল বিজয়কৃষ্ণের জীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বরকে লাভ করার উদ্দেশ্যে তাঁর আজন্ম সংস্কার বা বহুদিনের অভ্যাসকে তিনি মুহূর্তে অতিক্রম করতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন নি। সত্যের প্রতি ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা! 'ধর্মতত্ত্বে'ই আছে, 'সদা সত্য কথা কহিবে। প্রাণান্তেও মিথ্যা কহিবে না। পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা কহা অনুচিত। একটি মিথ্যা কথা বলিলে যদি রাজ্য লাভ হয়, তাহাও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিবে। একটি মিথ্যা না বলিলে যদি সহস্র সহস্র লোক খড়্গহস্ত হয়, তাহাতেও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সত্যের জন্য প্রাণদান করিবে; তথাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। যাহা মুখে কহিবে, কার্যেও তাহা করিবে। বাক্য ও কার্য একপ্রকার না হইলে 'কপটাচার' বলা হয়।'

এই সকল উদ্ধৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই বোঝা যায়—ঈশ্বরলাভই তাঁর জীবনের মূল এবং একমাত্র লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁর পক্ষে কোন কিছুই দুরূহ বা অসম্ভব ছিল না। তাঁর বাক্য ও কার্যে বিন্দুমাত্র অসংগতি ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে বিজয়কৃষ্ণ আঁধারের মধ্যে আলোকের সন্ধান পেলেন। প্রার্থনার সুফল যেন তাঁর অন্তরে শান্তিবারি সিঞ্চন করে। দেবেন্দ্রনাথকে 'সোঽহংবাদ' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন তিনি অন্তরঙ্গভাবে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন, 'উপাস্য আর উপাসক যদি এক হয়ে যান, তবে কে কাকে উপাসনা করবে? আর যদি উপাসনাই না করতে পারলাম, তবে ব্রহ্মানন্দই বা কি? আর ব্রহ্মোপাসনাও হয় অর্থহীন।' বেদান্ত বিজয়কৃষ্ণকে নীরস ও শুষ্ক করে ফেলেছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর তৃষ্ণার মুখে ভক্তিবারি পরিবেশন করলেন আর বিজয়কৃষ্ণ তা সুধাসম আকণ্ঠ পান করলেন।

ব্রাহ্মসমাজের পরিবেশ প্রথম দিনেই বিজয়কৃষ্ণকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি জেনেছিলেন সকল ধর্মের মূলেই ভগবান। ভগবানই তাঁর লক্ষ্য হওয়ায়, সকল ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। ব্রাহ্মসমাজকে তাঁর মনে হল—পরিমার্জিত ও আদর্শবাদীর সংস্থা। দেবেন্দ্রনাথকে প্রথম যেদিন সমাজগৃহে তিনি ভাষণ দিতে দেখেন, ঐ দিন থেকেই তাঁকে ভাল লেগেছিল। বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে দেবেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার আসনে বসেছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাপ্রার্থী হয়েও তিনি জ্ঞানীর মত ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে আচার্য দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর হয় হৃদ্যতা ও সম্প্রীতি। তিন বন্ধু একদিন দেবেন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা যাচ্ঞা করেন। ১২৬৮ (১৮৬১ খৃীঃ) বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ ও গুরুচরণ মহলানবিশের আনুষ্ঠানিকভাবে আচার্য দেবেন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা হয়। বিজয়কৃষ্ণকে আলাদাভাবে উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, 'প্রত্যহ অভুক্ত অবস্থায় গায়ত্রী মন্ত্র সাধন করবে।'

মধ্যপর্ব

ব্রাহ্মসমাজে সাতাশ বছর
১২৬৮ হইতে ১২৯৪ বঙ্গাব্দ
১৮৬১ হইতে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ

অদ্বৈত-বংশতিলক সত্যসন্ধ, নীতিপরায়ণ বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কারমুক্ত হন। মালা, তিলক ও শিখা—নির্দ্বিধায় পরিহার করতে তাঁর ক্ষণমাত্র সময়েরও প্রয়োজন হয় নি। দেবেন্দ্রনাথের মুখে সেই যে প্রথম দিন প্রার্থনার মহিমার কথা শুনেছিলেন, ঐ দিনটি থেকেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত-মঙ্গল পরমেশ্বরের কাছে মনের মলিনতা দূর করার জন্য তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করেন এবং প্রতি পদক্ষেপে করেন আত্মবিশ্লেষণ। তাঁর কাছে তিনি আরও শুনেছিলেন, কোন কাজ করা সমীচীন কিনা, তাও প্রার্থনার মাধ্যমে জেনে নিতে হয়। প্রার্থনায় প্রেরণা পেলে, অন্তর আনন্দে সাড়া দিলে তাঁর অনুমোদন আছে বুঝতে হবে; কোনও বিষয়ে দ্বিধা এলে সেই কাজ না করাই শ্রেয়। পরমেশ্বর অন্তর্যামী ও সর্বব্যাপী। তিনি অন্তরে ও বাহিরে আছেন, একথা সব সময় স্মরণ রাখতে হয়। সব কাজই তাঁর সাক্ষাতে হচ্ছে, এই ভাবটি সব সময় অটুট রাখতে হয়। দেবেন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, প্রার্থনাই পরমেশ্বরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রধান অবলম্বন। উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে গুরুর কোন প্রয়োজন নেই। দিবস-যামিনী পরমেশ্বরের সহবাস ও তৎপ্রিয় কার্যসাধনই ব্রাহ্ম-জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু উপবীতধারণ নিয়ে যত সমস্যা। দেবেন্দ্রনাথ উপবীত রেখেছেন, অথচ রামতনু লাহিড়ী তো উপবীত ত্যাগ করেছেন!

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম হয়ে উপবীত ধারণ কি সমীচীন? বিজয়কৃষ্ণের সর্বাঙ্গে যেন কালকূট-দংশন জ্বালা! জাতিভেদ অস্বীকার করে উপবীত রাখা কপটাচার বই কি! অসত্য আচরণে তো ভগবান দূরে সরে যান! সংশয়ে তাঁর মন হয় অস্থির। মনের উদ্বেগ আর চেপে রাখতে না পেরে দেবেন্দ্রনাথকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন বিজয়কৃষ্ণ, 'উপবীত ধারণ করা কি উচিত?' দেবেন্দ্রনাথ বললেন, 'হাঁ! না করলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ আমি নিজেও উপবীত রেখেছি।' বিজয়কৃষ্ণ আবার প্রশ্ন করেন, 'আমিষ আহার কি সমীচীন?' দেবেন্দ্রনাথ উত্তর দেন, 'হাঁ। মাছ মাংস না খেলে শরীর ভাল থাকে না।' দেবেন্দ্রনাথের এই উত্তর মনঃপূত হয় না বিজয়-কৃষ্ণের।

ঐ সময় মেডিক্যাল কলেজের পূর্ববাংলার ছাত্রেরা মিলে 'হিতসঞ্চারিণী সভা' নাম দিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। বিজয়কৃষ্ণ ঐ সমিতির সভ্য হন। একদিন ওখানে আলোচনা-চক্রে স্থির হয় 'সত্য বলে যা প্রতীত হবে, প্রাণপণে তা কার্যে পরিণত করতে হবে। সত্য জেনেও তা প্রতিপালন না করা কপটাচার ও মহাপাপ।' ১২৬৯ সালের যে-দিন ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, ঐ দিনই বিজয়কৃষ্ণ উপবীত ত্যাগ করে সংবাদটি অবিলম্বে মাকে লিখে জানান। পূর্বে জননীর ক্লেশ-উপশমের জন্য পরিত্যক্ত উপবীত পুনরায় গ্রহণ করে তিনি অশান্তির অনলে দগ্ধ হচ্ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঐ দিনটি থেকে জীবন্মৃত হয়ে ছিলেন। তাঁর একান্ত দুর্ভাগ্য যে এখন তিনি মায়ের দুঃখের কারণ হলেন; কিন্তু তিনি যা সত্য বলে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তা উপেক্ষা করে বেঁচে থাকা তাঁর পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। আজ তিনি নব-জন্ম লাভ করেছেন। মা যেন তাঁর অধম সন্তানকে ক্ষমা করেন।

একুশ বছরের তরুণ ব্রাহ্ম যুবকের এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপে সমাজে তুমুল আন্দোলন হয়। সপক্ষে-বিপক্ষে ওঠে কত রকম বাগবিতণ্ডা, কত রকমের উক্তি।

কেউ বলেন, 'সাবাস বাহাদুর! জাতিভেদ মান্‌ছ না, তা হলে কেনই বা বর্ণাশ্রমের নিশানা রাখছ?' 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বিজয়কৃষ্ণের সুখ্যাতি করে তাঁর কাগজে প্রবন্ধ লেখেন। অন্যদিকে আবার কেউ কেউ বলেন, 'হুজুগ সৃষ্টি করে বাহবা পাবার প্রয়াস! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! সূর্যের চেয়েও বেশি বালির উত্তাপ! আচার্য দেবেন্দ্রনাথও উপবীত পরেন।' বাক্য ও কার্যের মধ্যে সংহতি রক্ষার জন্যই বিজয়কৃষ্ণ উপবীত ছেড়েছিলেন; প্রশস্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অবচেতন মনেও ছিল না। নিন্দাস্তুতির অপেক্ষা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। যিনি মালা-তিলক-শিখা ধারণের জন্য সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সময়ও গড্ডলিকা প্রবাহের মুখে সহপাঠীদের হাসিঠাট্টার ইন্ধন জোগাতেন, স্বল্পকালের ব্যবধানে তিনিই উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম হয়ে নব্যদলের হলেন পুরোধা। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রভাব এই পরিবর্তনের হেতু নয়, ইংরেজি শিক্ষার সংক্রামক অভিমানের উত্তেজনাও নয়। নবযুগের নতুন জ্ঞানচেতনায় কুসংস্কারের মূল উচ্ছেদ করে ধর্মের আলোক-রশ্মিতে বাক্য ও কর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করার ন্যায়সংগত যুক্তিই বিজয়কৃষ্ণের এই পথ অবলম্বনের প্রধান উৎস। স্বাভাবিক ধর্মানুরাগ ও বিবেকদীপ্ত যুক্তিই তাঁকে সংস্কারপাশমুক্ত করেছিল। মজ্জাগত সংস্কারকে অনায়াসে অতিক্রম করতে তাঁর মানসিক অগ্রগতিই প্রধান সহায় হয়েছিল। 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' মন্ত্র তাঁকে সত্য পথের নির্ভীক পথিক করে তুলেছিল। মানসিক এই অগ্রগতির জন্য অন্তরঙ্গদের সঙ্গে কখনও কখনও বা ঘটত তাঁর মতানৈক্য; কিন্তু এতে বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে তাঁদের কারও প্রতি কখনও হয় নি সৌজন্যবোধের তারতম্য। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আদর্শ নিয়ে মতান্তর ঘটলেও, হয় নি কখনও মনান্তর। তাঁর প্রতি বিজয়কৃষ্ণের শ্রদ্ধাভক্তি ছিল আজীবন অমলিন, অটুট ও অক্ষুণ্ণ। কুসংস্কারমুক্ত বিজয়কৃষ্ণ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'তিনি মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালেই ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি তিনু চাটুয্যের বাড়ী থাকিতেন। একদিন একজন আসিয়া বলিলেন, "ওরে বিজয় গোঁসাই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে, চল তাঁকে দেখতে যাই।" আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যা হইলে বিদ্রূপকারী বন্ধুগণের সকলেই ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু আমি তথায় রহিলাম। বিজয়বাবু আমার পরম বন্ধু, তিনি আমাকে আগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে আমরা দুই বন্ধুতে যখন আহার করিতে বসিলাম, তখন ভোজন-পাত্র দেখিয়া আমি একেবারে অবাক হইলাম। উহা আর কিছুই নয়,—মেটে সানুক। আমি বলিলাম, "ও বিজয় এ কি? এ যে মেটে সানুক।" তিনি বলিলেন, "যাও যাও, কাঁসাতে আর মাটিতে প্রভেদ কি?" ইহার পর একজন ঝিকে ভাত নিয়া আসিতে দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "এ কি? বামনের জাত্ মার্‌লে?" তিনি বলিলেন, "ও কি? জাতটাত্ আবার কি? ও সব কিছু নয়। এখনও তোমার কুসংস্কার গেল না?" যাহা হউক আহারাদি ত কোনরূপে শেষ হইল; কিন্তু সমুদয় রাত্রি আমার শরীর ঘিন ঘিন করিতে লাগিল। ভাল ঘুম হইল না।'

উপবীত ত্যাগই করুন আর সকল সংস্কারমুক্তই হন, বিজয়কৃষ্ণ কখনও গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা বন্ধ করেন নি।

লোকের ধর্মচেতনার বিকাশ স্তিমিত দেখে বিজয়কৃষ্ণের প্রাণে ওঠে হাহাকার। উপনয়নের সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'অহং জগদ্মঙ্গলায় ভবামি'। এই

শপথ তাঁর শিশু মনেও বিশেষ দাগ কেটেছিল এবং শৈশব হতেই জনকল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তখন থেকেই চারদিকে নীচতা, হীনতা, সংকীর্ণতা, ভগবদ্‌বিরূপতা লক্ষ্য করে তিনি কত যে চোখের জল ফেলেছেন! বাৎসল্যে যেমন সন্তানের জন্য মাতৃস্তন উছলে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হয়, পাপীতাপীর জন্য তাঁর করুণাও তেমনই বইত অমৃতধারায়। নরনারীর প্রতি অকৃত্রিম শুভেচ্ছায়, তাদেরই কল্যাণে ধর্ম প্রচারের অনলস সাধনা ছিল তাঁর। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে পরমেশ্বরবিষয়ক যে সব উপদেশ ও বাণী তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল ঐ সব কল্যাণকর কথাগুলি লোকের সম্মুখে তুলে ধরায় তাঁর কী আগ্রহ! অপরাহ্ণে প্রেসিডেন্সী কলেজের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্মের নীতিমূলক বক্তব্যগুলি বলতেন; পথচারীদের প্রাণে তা সুধা বর্ষণ করত। তাঁর ভক্তিরস-সিঞ্চিত বক্তৃতা শুনতে চার-পাঁচ শত শ্রোতা জমে পথঘাট অবরুদ্ধ করে ফেলত। মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে তারা এই তরুণ সাধুর মুখে ভাগবতী কথা শুনত। বিজয়কৃষ্ণের প্রচারের উৎস ছিল ভগবৎ-কৃপাসিন্ধু; তাই তাঁর ভাষণ হত প্রাণস্পর্শী।

উপবীত ত্যাগ করার কয়েক দিন পর বিজয়কৃষ্ণ পূর্ববাংলার একটি যুবকের অনুরোধে ‘সঙ্গত-সভার’ বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দেন এবং ঐ সভার কার্যবিবরণী জেনে খুব অভিভূত হন। ১২৬৭ সালে কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহ, উদ্যোগ ও পৌরোহিত্যে গড়ে ওঠে এই সাংস্কৃতিক সমিতি; এর উদ্দেশ্য জীবনগঠন। শিখদের সঙ্গত-সভার অনুকরণে নামটি দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্গত-সভার লক্ষ্য ছিল বিবেক ও ধর্মবুদ্ধি-প্রণোদিত মীমাংসা ও সিদ্ধান্তগুলি এই সভার সভ্যদিগের পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে রূপায়িত করা। ঐ দিনের বার্ষিক সম্মিলনে ‘ব্রাহ্মধর্ম অনুষ্ঠান’ নাম দিয়ে সঙ্গত-সভা থেকে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এতে ছিল অনেক অমূল্য নির্দেশ—‘উপনয়নের সময় উপবীত গ্রহণ করিবে না। যে কর্ম উচিত বলিয়া বোধ হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিবে, সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিবে, সকল ত্যাগ স্বীকার করিবে, কোন যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বোধ করিবে না। যে ব্যক্তি একপ্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকার দেখায়, সেই আত্মাপহারী চোর কর্তৃক কি পাপ না কৃত হয়? কেবল বাহ্য পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মধর্ম যে নিষেধ করিতেছেন, এমত নহে; ইহা পরিত্যাগ করা সহজ, আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা অতীব ভয়ানক। বিষয়সুখাভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তিসকলের শরণাগত-অনুগত দাস হইয়া তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা বলে। স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া।’ এই সকল নীতি উপদেশ পড়ে বিজয়কৃষ্ণ খুব মুগ্ধ হন। এসব যেন তাঁরই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। এই দিনই কেশব সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কেশববাবু বিজয়কৃষ্ণকে সঙ্গত-সভার সভ্য করে নেন। এই দিন থেকেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। লোকচক্ষুর অন্তরালে গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে সখ্য ও প্রীতির মৈত্রীভাব। বিজয়কৃষ্ণ লিখেছেন, ‘সঙ্গতেই অধিকাংশ ব্রাহ্ম ভ্রাতার সহিত পরিচিত হই।...... সঙ্গত এবং ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়াই মনে হইত, আবার কখন সঙ্গতে গমন করিব, সমাজে গমন করিব, ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হইব। তখন আমি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদের নিকট অপরিচিত ছিলাম। এজন্য তাঁহাদের বাটীতে ব্রাহ্মধর্মানুসারে কোন অনুষ্ঠান হইলে তাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেন না। কিন্তু আমাকে

নিমন্ত্রণ করেন নাই বলিয়া আমি অভিমান করিয়া বাসায় থাকিতে পারিতাম না। সেখানে গমন করিলে ব্রহ্ম নাম শ্রবণ করিব, ভ্রাতাদের সহিত সম্মিলিত হইব, এই ভাবিয়া সর্বত্রই গমন করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতাম। ধর্মজীবনের এই বাল্যব্যবহার জীবনে না থাকিলে অভিমানে মন সর্বদাই কুণ্ঠিত থাকে। ভ্রাতাদিগের সহিত সরল ব্যবহার করা যায় না।'[১]

সঙ্গত-সভা বাস্তবিকই ছিল এক অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠান। আত্মোন্নতির জন্য এমন ব্যাকুলতা, কর্তব্যসাধনে এরূপ জীবনপণ দৃঢ়তা ও সত্যানুসরণে নৈষ্ঠিক একাগ্রতা সচরাচর চোখে পড়ে না। আলোচনায় কত দিন যে রাত্রি প্রভাত হয়ে যেত, কারও সে খেয়াল থাকত না; এমনই তন্ময় হয়ে নিঃস্বার্থ ও কল্যাণকর জীবন-অন্বেষণের গূঢ় বিষয়ে তাঁরা ডুবে যেতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, 'বিজয়বাবু ও আমি কত সময় একত্র ধর্মালোচনা ও ধ্যানধারণায় যাপন করিয়াছি। অনেক সময় আলোচনা এমন জমাট হইয়া উঠিত যে আমরা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতাম। অনেক সময় আলোচনান্তে আমরা গভীর ধ্যানে বসিতাম এবং প্রাতঃকালে তোপ পড়িলে, তবে আমাদের ধ্যান ভঙ্গ হইত। কখন কখন আলোচনান্তে আমরা গৃহে গমনের জন্য রাস্তায় বাহির হইতাম এবং রাস্তায় লাইটপোস্টের নিকট দাঁড়াইয়া কথা বলিতে বলিতে পূর্বাকাশে ঊষার কিরণরেখা দেখা দিত ও পাখির কলধ্বনি শুনা যাইত।'[২]

মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা সমাপ্তির মুখে। ফাইন্যাল ডিপ্লোমা পরীক্ষার কয়েক মাস বাকী। ঔষধ চুরির অপবাদে বাংলা বিভাগের একটি ছাত্রকে অধ্যক্ষ চিবার্স পুলিশের হেফাজতে দেন, আর জাত তুলে বাঙালিদের করেন গালি-গালাজ। বাংলা বিভাগের ছেলেরা বলাবলি করে যে, অভিযোগটি একেবারে অলীক। বিজয়কৃষ্ণের কানে কথাটি যেতেই তিনি নিজে খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হন যে, ছেলেটি নির্দোষ। এতে কলেজ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলা বিভাগের ছাত্রদের বিরোধ বাধে। এ নিয়ে পরীক্ষার ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে বেশীর ভাগ ছেলেই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও গা মাখেন না। কিন্তু ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থ প্রতিবাদে বিজয়কৃষ্ণ বেঁকে বসেন। তিনি কলেজের ক্লাস বর্জনের জন্য ছেলেদের নিকট আবেদন জানান। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলা বিভাগের ছেলেরা ১২৬৯ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর ধর্মঘট করে। যারা প্রথমে যোগ দেয় নি, গোলদীঘিতে বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতা শুনে তারাও ক্রমে সাড়া দেয় এবং ধর্মঘটে যোগদান করে। ভারতে ছাত্র-ধর্মঘটের ইতিহাসে বিজয়কৃষ্ণই পথিকৃৎ। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মেডিক্যাল কলেজ-কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারের কথা তাঁকে যথাযথ জ্ঞাপন করেন। বিজয়কৃষ্ণের ন্যায়ানুরাগ, তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মনিষ্ঠায় মুগ্ধ হন বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই ঘটনার মাধ্যমে বিজয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠেন। ঈশ্বরচন্দ্র ছোটলাট বীডন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মেডিক্যাল কলেজ-কর্তৃপক্ষের অশোভনীয় আচরণের কথা তাঁকে জানান। ছাত্রটি নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়। ছাত্রদের কাছে

---

১. শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রণীত 'ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়'

২. বঙ্কবিহারী কর-প্রণীত 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত', পৃ ৪৩

চিবার্স সাহেবকে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়। ছেলেরা সব ফিরে যায় কলেজে; কিন্তু গেলেন না বিজয়কৃষ্ণ। ধর্মঘটের ব্যাপারে তাঁর নেতৃত্বের মধ্যে কোন স্বার্থবুদ্ধি ছিল না। একটি নিরপরাধ ছাত্র দণ্ডিত হতে চলেছে, তার প্রতিকারের জন্যই তাঁর এই প্রয়াস। নিষ্কাম কর্ম ছিল বিজয়কৃষ্ণের স্বভাবসিদ্ধ। 'উপাধি ব্যাধি'—এই হেতু হয়ত ডাক্তারি শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রায় সম্পন্ন করেও তিনি শেষ মুহূর্তে মেডিক্যাল কলেজ ত্যাগ করলেন। ইতিপূর্বে উপাধি লাভের আগেই বিজয়কৃষ্ণ শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেছিলেন। এবারও আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদেব সকল অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে বিজয়কৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ছাড়লেন। মেডিক্যাল কলেজ ছাড়ার কয়েক দিন পরেই কলেজ স্কোয়ারে একদিন বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে অধ্যপক ডাঃ তামিজ খাঁর দেখা হয়। তিনি বলেন 'গোঁসাই, ভগবান তোমার প্রতি খুবই প্রসন্ন, তাই তুমি কলেজ ছেড়েছ। নইলে তোমাকে বিপদে পড়তে হত। তুমি গোলযোগের নেতা ছিলে বলে তোমাকে জব্দ করার চক্রান্ত হচ্ছিল।'

এই ঘটনার কিছুদিন পর মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগ সংস্কারের রিপোর্ট দেবার ভার পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর। তিনি এ বিষয়ে পরিকল্পনা চেয়ে পাঠান বিজয়কৃষ্ণের কাছে। তাঁরই খসড়া ভিত্তি করে রিপোর্ট দেন ঈশ্বরচন্দ্র। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলা বিভাগকে মেডিক্যাল কলেজ থেকে আলাদা করে ক্যাম্বেল স্কুল স্থাপন করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ঐ স্কুলটিকেই কলেজের মর্যাদা দিয়ে নাম রাখা হয়েছে 'নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ'। মেডিক্যাল কলেজের নামের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের নাম যুক্ত হলে উক্ত কলেজটি গৌরবযুক্ত হত। একটি ঐতিহাসিক ঘটনাও স্বীকৃতি লাভ করত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই দুই অসমবয়সীর মধ্যে হৃদ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তরুণ বন্ধুকে ঈশ্বরচন্দ্র স্নেহ করেন, শ্রদ্ধা করেন—তাঁর কথার গুরুত্ব স্বীকার করে যথোচিত অনুমোদন করতে দ্বিধা করেন না। একদিন বিজয়কৃষ্ণের মুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনে ঈশ্বরচন্দ্র প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন। অন্তরঙ্গ বিজয়কৃষ্ণ তা লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেন, 'লোকের কিন্তু আপনার সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আপনার "বোধোদয়" গ্রন্থে বোধ উদয়ের প্রধান অবলম্বন "পরমেশ্বর" বিষয়ে কোন নিবন্ধ না থাকায় তারা ধরে নিয়েছে, আপনি নাস্তিক বলেই সকল কারণের যিনি কারণ, যিনি ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় করেন তাঁর সম্পর্কে আপনার এই অস্বাভাবিক নীরবতা।' ধর্মপ্রাণ যুবকের কথায় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ত্রুটি স্বীকার করে বলেন, 'বাস্তবিকই আমার ভুল হয়েছে। পরের সংস্করণে আমি এর যথোচিত ব্যবস্থা করব।' যেমন বলা তেমন কাজ। বোধোদয়ের পরবর্তী সংস্করণে তিনি 'ঈশ্বর' নাম দিয়ে একটি নূতন পাঠ সংযোগ করেন।

উপবীত-ত্যাগ প্রসঙ্গে মাকে চিঠি দিয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ। এদিকে চিঠি পড়ে স্বর্ণময়ী দেবী দুঃখে-শোকে ভেঙ্গে পড়েন। তাঁর করুণ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে ওঠে। এইদিনই শান্তিপুরের বাড়ীতে এক শান্তমূর্তি সন্ন্যাসী এসে স্বর্ণময়ী দেবীকে প্রবোধ দেন, 'কেঁদ না মা, ভেব না। তোমার ঐ ছেলে অনন্যসাধারণ। তিনি দেশের ও দশের কল্যাণ করবেন। তোমার বংশ উজ্জ্বল করবেন।'

উপবীত ত্যাগ করে যেদিন প্রথম শান্তিপুর এলেন বিজয়কৃষ্ণ, সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যা সবে উত্তীর্ণ হয়েছে। নির্মল জ্যোৎস্নায় প্রকৃতির সে

এক পবিত্র রূপ। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আবাহন। বিজয়কৃষ্ণ বাইরে থেকে ডাকেন, 'মা'। স্বর্ণময়ী ছুটে গিয়ে ছেলের হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসেন। দুঃসহ বেদনায় কেঁদে-কেঁদে তিনি হন আকুল। বিজয়ের পায়ে মা মাথা খোঁড়েন। অন্তর্দাহে মাতৃভক্ত তনয় সম্বিৎ হারান। জ্ঞান ফিরে এলে শ্রদ্ধাভরে মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেন, 'ক্ষমা কর মা তোমার এ অধম সন্তানকে। আমার মরণ হক সেও বরং ভাল, তবু পৈতে পরতে আমাকে বলো না।' মা পড়েন উভয় সংকটে—একদিকে বাৎসল্য, অপরদিকে সমাজের ভ্রূকুটি। বাৎসল্যের হয় জয়. কিন্তু সমাজ তো আর মা নয়। স্বর্ণময়ী দেবী স্নেহ ঢেলে বিজয়কৃষ্ণকে বলেন 'তোর আর পৈতে নিতে হবে না। যেমন আছিস, ওরকমই থাক। আমি মনে করব, তোর পৈতেই হয় নি।'

সহোদর দাদা সমাজের ভয়ে সভা আহ্বান করে জ্ঞাতিদের সামনে অনুজকে পরিত্যাগ করেন; হলফ করে বলেন, 'যে পিতৃপুরুষদের চিরাচরিত ধারার করে অসম্মান, শ্যামসুন্দরের করে অমর্যাদা, অদ্বৈতপ্রভুর মুখে কালি মাখে, তাঁর সঙ্গে আবার কিসের সম্পর্ক?' জ্ঞাতি-কুটুম্বদের কি আর দোষ? কিশোরীলাল মৈত্র শুধু ব্যতিক্রম। তিনি বলেন, 'নরকে যেতে হয় সেও ভাল. তবু বিজয়কে আমি ছাড়ব না। তাঁর সঙ্গে আমি আছি।' কিশোরীবাবুর শান্তিপুরের পাট ওঠে; পরিবার নিয়ে তিনি পথে দাঁড়ান, তথাপি তাঁর কথার খেলাপ হয় না। সমাজপতিরা বলাবলি করেন 'বিজয়কে দেশ থেকে না তাড়াতে পারলে ছেলেরা সব বিগড়ে যাবে।' বিজয়কৃষ্ণ কম যান না। তিনি বলেন, 'দেখি, শ্যামসুন্দরেব স্থানে ব্রাহ্মমন্দির করা সম্ভব কিনা'। বিজয়কৃষ্ণ বিনীতভাবে বড়দের বলেন, 'আপনাদের আশীর্বাদে এখানে বাস করে যদি শান্তিপুরের এতটুকু কল্যাণও করতে পারি তাতেই আমার জীবন ধন্য হবে'। দেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি উঠে পড়ে লাগেন। বিজয়কৃষ্ণের উপর চলে জুলুম, অশালীন ব্যবহার, সংঘবদ্ধ কদাচার। পথে বের হলে তাঁর জোটে গালাগাল, নিষ্ঠীবন, অশুচি জল আর ইঁট-পাটকেল। গোঁয়াররা তাঁর গায়-মাথায় দেয় চিটেগুড় ঢেলে। জ্যান্ত বোলতা ধরে বসিয়ে দেয় তাঁর উপর। কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত সব কান্ড-কারখানা তিনি কিন্তু নির্বিকার। এসব কদর্য কাজে অনেক ব্রহ্মবাদীরও সায় থাকে; তাঁরা বিজয়ের উপবীত-ত্যাগে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। অপমান ও লাঞ্ছনার শেষ নেই। বিজয়কৃষ্ণও বেপরোয়া; নেই কোনও ভয়ডরের লেশ। যেখানেই সংকীর্তন সেখানেই তিনি গিয়ে হাজির হন, খবরটি কানে এলেই হল। দরদীরা বারণ করেন—অনাহূত হয়ে সংকীর্তনে যাওয়ার প্রয়োজনটা কি? তিনি তাঁদের বলেন, 'যেখানেই ভগবানেব নামগান হয়, সেখানে সবারই যাবার অধিকার। আমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখতে নেই।'

জ্ঞাতিগৃহে নামযজ্ঞ। গোস্বামীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বিজয়কৃষ্ণ গিয়ে বসেন মুক্ত আকাশের নীচে। ছাদ থেকে ছোড়া হয় ছেঁড়া জুতার মালা বিজয়কৃষ্ণের শিরোদেশ লক্ষ্য করে। প্রাচীরে তা ব্যাহত হয়ে গিয়ে পড়ে গৃহস্বামীর গলায়। আর একদিন তিনি নামানন্দে ভাবাবিষ্ট হয়েছেন—অশ্রু, কম্পন ও পুলকের বিকাশ হয় তাঁর মধ্যে। অরসিক এক গোস্বামী সন্তান মনে করেন ইনি আসরের বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন। তাই তাঁকে জোর করেই বার করে দেন আসর থেকে। এতে ফল হল উল্‌টো, আসর আর জমাট বাঁধল না।

নগরকীর্তনে যোগ দিয়ে একদিন ভাবাবেশে বিজয়কৃষ্ণ সম্বিৎ হারিয়ে পথে পড়ে যান। কয়েকজন দুষ্টপ্রকৃতির যুবক বিজয়কৃষ্ণের 'ভাবকলি' পরখ করে

দেখবার জন্য পথের পাশে এক কামারের দোকান থেকে জ্বলন্ত লোহার টুকরো সাঁড়াশি দিয়ে ধরে এনে তাঁর পিঠে চেপে ধরে। এতেও বিজয়কৃষ্ণের এতটুকু ভাবান্তর নেই। না হল অঙ্গ-সংকোচন, না হল কোন বেদনাব্যঞ্জক বাক্যস্ফুরণ! কিন্তু ভাবান্তর হল যুবকদের। শেষটায় তাদের কৃতকর্মের জন্য নিজেরাই ধিক্কার দিতে থাকে নিজেদের। বিরুদ্ধবাদীরা ক্রমশ বিজয়কৃষ্ণের সত্য-নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হতে লাগল। বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম-জীবনের প্রভাবে, তাঁর অকপটতায়, তাঁর অকৃত্রিমতায় শান্তিপুরবাসীদের মন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। ফলে অচিরে শান্তিপুরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পরিবেশ অনুকূল হয়; কিন্তু যাঁরা সেখানে কেষ্ট-বিষ্টু, বিজয়কৃষ্ণ তখনও তাঁদের চোখের কাঁটা। এসব সত্ত্বেও বছর না ঘুরতেই ওখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হল।

উপাচার্যপদে বৃত

বাংলা ১২৬৯ সালের শেষের দিকে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতা ফিরে আসেন; সঙ্গে স্ত্রী, শাশুড়ী এবং ভগ্নীপতি কিশোরীবাবু, ভগ্নী শ্রীমতী দেবী ও তাঁদের পাঁচটি ছেলেমেয়ে। মির্জাপুর স্ট্রীটে তিনি এক কামারের খোলার ঘর ভাড়া নেন। মাসে এক টাকা ভাড়া। যোগমায়া দেবীর বয়স তখন সবেমাত্র দশ। গোঁড়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা, বধূ ও মাতা শ্রীমতী দেবী এজন্য গোড়ার দিকে নূতন উপাসনা-ধারায় তাঁর অন্তরের সাড়া পেতেন না। মাসখানেক পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দেবার পর তাঁর মনে আসে প্রেরণা। তখন থেকে আহ্নিকের পরিবর্তে ব্রহ্মোপাসনা না করে তিনি জল পর্যন্ত স্পর্শ করতেন না। এই সময়ে মৈত্র পরিবারের বড় অভাব-অনটনে কেটেছে। কিন্তু দুঃখের দিনেও মৈত্র মহাশয় নিজের আদর্শ থেকে সরে দাঁড়ান নি। বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে ছিল তাঁর অটুট শ্রদ্ধা। কিশোরীবাবুর নিষ্ঠা-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিজয়কৃষ্ণ মন্তব্য করেছেন, 'পৌত্তলিক মতে পুত্রের বিবাহ দিলে মৈত্র মহাশয় সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন। সত্যের অনুরোধে সেই অর্থ তৃণবৎ তিনি পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম রাজ্যের ইহা অতি রমণীয় দৃশ্য। ইঁহাদিগের কষ্ট দেখিয়া আমার নিজের যন্ত্রণা যৎসামান্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।' সেই খোলার বাড়ীতেই কিছুদিন থাকার পর উভয় পরিবার পটলডাঙ্গার একটি বাড়ীতে উঠে যান।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিজয়কৃষ্ণের আর এক অন্তরঙ্গ সুহৃদ। পটলডাঙ্গার বাড়ীতে তিনি যোগমায়া দেবীর শিক্ষার ভার নেন। এই ব্যবস্থা কিশোরীবাবুর ভাল লাগে না। তিনি একদিন বিজয়কৃষ্ণকে একান্তে বলেন, 'নগেনবাবু একা নির্জনে তোমার স্ত্রীর অধ্যাপনার কাজ করেন, ইহা দৃষ্টিকটু এবং ঠিকও নয়। নগেনবাবু যুবক এবং তোমার স্ত্রী নাবালিকা। আমার মনে হয় পড়াশুনা বন্ধ করে দেওয়া ভাল।' তাঁর মন্তব্য শুনে বিজয়কৃষ্ণ ব্যথিত হন। তিনি তাঁকে ধীর ও শান্তভাবে বলেন, 'নগেনবাবুকে আপনি জানেন না। তিনি বড় সৎ লোক। তাছাড়া, শুধু নগেনবাবু কেন, আমার বন্ধুদের আমার বাসস্থানে অবারিত দ্বার। এরূপ অবস্থায় একই গৃহে আমাদের বাস করা ঠিক নয়।' এই অকপট মত বিনিময়ে উভয়ের কেউ-ই একে অন্যের প্রতি কোন রকম বিরূপ ভাব পোষণ করেন নি। অতঃপর অনতি-

বিলম্বে বিজয়কৃষ্ণ রাধানাথ মল্লিক লেনের একটি দোতলা বাড়ীতে উঠে যান।

একদিন নগেনবাবু কথায় কথায় বিজয়কৃষ্ণকে বলেন, 'আপনি আপনার সহধর্মিণীকে সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য প্রতিপদে এত যে উপদেশ দেন, এতে তাঁর মনে বিপরীত ক্রিয়া হইতে পারে, তিনি অকারণ আপনাকে ভুল বুঝিতে পারেন।' বিজয়কৃষ্ণ নগেনবাবুর কথায় নীরব রইলেন। দিন কয়েক বাদে একদিন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি বিজয়বাবুর এমন কি করিলেন যে, তিনি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে একেবারে পঞ্চমুখ?' নগেনবাবু ভেবে পান না এর কুলকিনারা; তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যোগমায়া দেবী সম্পর্কে তিনি বিজয়কৃষ্ণকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাতেই তিনি এত কৃতজ্ঞ। অপরিসীম ছিল তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ।

বিজয়কৃষ্ণ একদিন সঙ্গত-সভায় গিয়ে শোনেন, যশোহর জেলায় বাগ-আঁচড়ায় অনেক পরিবার ব্রাহ্ম হতে চান, কিন্তু যোগ্য প্রচারকের বড় অভাব। বিজয়কৃষ্ণ নিজ থেকেই একাজে এগিয়ে আসেন। অথচ তখনও তাঁর নাম রয়েছে মেডিক্যাল কলেজে এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ফাইন্যাল পরীক্ষা শুরু হবার কথা। পরীক্ষা দিয়ে পাশ না করলে পরিবার-প্রতিপালন কি করে করবেন তিনি? সুহৃদগণ তাই বারণ করলেন এ-সময় বাইরে যেতে। বিজয়কৃষ্ণ তাঁদের অভয় দিয়ে বলেন, 'যিনি মরুভূমিতে তৃণগুল্ম রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর নীর মধ্যে প্রাণীপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি কখনও দুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন না।'

প্রচারক হতে হলে অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন। রীতিমত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে বিজয়কৃষ্ণকে। অদ্বৈত-সন্তান বিজয়কৃষ্ণ; বংশধারায় রয়েছে ধর্ম-প্রচারের অনুশীলন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভয় তিনি পাবেন কেন? কেশববাবুর পরামর্শ ও নির্দেশ মত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সমস্ত সংখ্যাগুলি পড়ে সকল তথ্যাদি অবগত হন তিনি এবং অন্যান্য বিষয়াদিও দুই মাসের মধ্যেই আয়ত্ত করে নেন। অতঃপর কেশববাবু তাঁকে পাঠান শ্রীরামপুরে। প্রধান আচার্য দেবেন্দ্রনাথ তখন সেখানে ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণকে পেয়ে বড়ই খুশী হন তিনি। বাংলা ১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে বিজয়কৃষ্ণকে প্রচারকের পদে ব্রতী করে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে অনেক উপদেশ দেন দেবেন্দ্রনাথ। প্রচারকার্যে মাসিক বৃত্তির কথাও তুললেন দেবেন্দ্রনাথ, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের এ বিষয়ে বিশেষ অমত। ধর্মাচরণে ব্রতী হয়ে কোন প্রকার বৃত্তি গ্রহণ করবেন না বিযয়কৃষ্ণ। সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরে পরিপূর্ণ নির্ভরতা নিয়েই এপথ অবলম্বন করেছেন তিনি। মুগ্ধ, পুলকিত প্রধান আচার্য নবীন প্রচারকের সত্যনিষ্ঠা ও পরমেশ্বরে অটল নির্ভরতা দেখে। এ সংসারে বিষয়ের প্রয়োজন বেঁচে থাকার জন্য, যিনি তাও ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে চান, তাঁকে আর কি বলবেন দেবেন্দ্রনাথ!

প্রচারক-পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রথমেই কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের ভার পড়ে বিজয়কৃষ্ণের উপর। এ সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ লিখেছেন, '......এই গুরুভার প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে ইহা সাধন করিতে সক্ষম হইব, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। যখন স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন হতাশ হইয়া পড়ি। যখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি, তখন অতুল সাহসে পূর্ণ হইয়া উঠি। আমি এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া স্থির নিশ্চয় করিলাম যে "ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করাই ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের একমাত্র

উপায়”। আমি এই প্রকৃত উপায়টি অবলম্বন করিয়া মহৎ কার্যে প্রবৃত্ত হওতঃ প্রথমতঃ কলিকাতার নিকটবর্তী ব্রাহ্মসমাজগুলিতে গমনাগমন করিতে লাগিলাম।’

‘ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থের লেখক বিজয়কৃষ্ণের এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন, ‘প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি প্রচারকের অতি উচ্চতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অগ্নিময় উৎসাহ, পবিত্র জীবন, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাশক্তিতে অনেক লোকের মনকে পরিবর্তিত করিয়াছে। তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি সংসারের সমুদয় উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মপ্রচারকার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।’

বাংলা ১২৭০ সালের পৌষ মাসে বাগ-আঁচড়া যাওয়া স্থির হয় বিজয়কৃষ্ণের। বাগ-আঁচড়া যশোহর জেলার অন্তর্গত। কলিকাতা থেকে মাত্র ৩৫ ক্রোশ দূরে; কিন্তু যাতায়াতের বড় অসুবিধা। বিজয়কৃষ্ণ লিখেছেন, ‘......বাষ্পীয় শকটযোগে চাকদহ অবতরণপূর্বক পদব্রজে গমন করতঃ সেই স্থানের পূর্বোত্তর আট ক্রোশ অন্তর গোপালনগর হইতে গমন আরম্ভ করিয়া প্রায় দুইটার সময় বাগ-আঁচড়ায় উপস্থিত হই। যদিও পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম, কিন্তু অত্রত্য মল্লিক পরিবারের সরলতা ও ধর্মলাভ করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়া আমার সমুদয় শ্রান্তি দূর হইয়া গেল। আমি দেখিলাম মল্লিক পরিবারস্থ প্রায় সকল লোকই ব্রাহ্মধর্মের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ব্রাহ্মধর্মের বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ। অনন্তর আহারান্তে “ঈশ্বরের করুণা” বিষয়ে কিছু বলাতে, সকলেরই অন্তর দ্রব হইতে লাগিল। পরদিন হইতে ব্রাহ্মধর্মের মত সকল তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলাম। অনন্তর তাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের মহান ভাব অবগত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে যথারীতি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাইতে আরম্ভ করিলাম। আমি সেখানে নয় দিবস ছিলাম; ইহার মধ্যে তেইশটি পরিবার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ এককালে পরিত্যাগ করিলেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই নির্ধন, কিন্তু ইঁহাদের ধর্মবল, সম্রাট হইতেও অধিক হইয়া উঠিল। ইঁহারা প্রায় সকলেই লেখাপড়া জানেন না; তথাপি প্রীতি, ভক্তি, কৃতজ্ঞতাতে ইঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। যাঁহারা ভূরি-ভূরি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, যাঁহাদের অর্থের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না, তাঁহারা একবার ঐ বিদ্যাবুদ্ধিহীন নিঃস্ব লোকদিগের ধর্মবল প্রত্যক্ষ করিয়া শিক্ষা করুন যে, ব্রাহ্মধর্ম কেবল ধনী ও পণ্ডিতের জন্য নহে; ইহা পৃথিবীস্থ সমুদয় মনুষ্যগণের চিরসম্পত্তি। অনন্তর সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম।’

বিজয়কৃষ্ণ বাগ-আঁচড়ায় একরাত্রে একটি বিচিত্র স্বপ্ন দেখেন। ঐ অঞ্চলের কালী মল্লিক নামে একটি লোক স্বপ্নে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁর হাতে ছড়ি ও সঙ্গে একটি কুকুর। লোকটি বলছেন, ‘দেহে থাকাকালীন সপরিবারে ব্রাহ্ম হয়েছিলাম; মৃত্যুর পূর্বে একটি উইল করে আমার স্ত্রীকে বিষয়-সম্পত্তি দিই—সর্ত ছিল তিনি স্বধর্মে থাকবেন আর ব্রাহ্মমতে আমার শ্রাদ্ধাদি করবেন। যদি তা না করেন, আমার ব্রাহ্ম ভাগিনেয় সম্পত্তি ভোগ করবে এবং সেই শ্রাদ্ধাদি করার অধিকারী হবে। আজ অবধি কেহই আমার শ্রাদ্ধাদি করে নি। আমি বড় কষ্টে আছি, আপনি একটি বিহিত করুন।’ পরদিন কয়েকজনকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলায় তাঁরা

বিস্মিত হয়ে বলেন স্বপ্নটি যথার্থ। কালী মল্লিকের ভাগিনেয় এসে বিজয়কৃষ্ণকে শ্রাদ্ধের কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং তিনিই ব্রাহ্মমতে পারলৌকিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন। ভাগিনেয় শ্রাদ্ধের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেন, কাঙ্গালীদের অর্থ দান করা হয়। শ্রাদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, উদ্যানের একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের বড় একটি ডাল আচমকা ভেঙ্গে পড়ে। তখন ঝড় ছিল না, বৃষ্টি ছিল না। বাগ-আঁচড়ায় কয়েক দিন থেকে ওখানকার অধিবাসীদের তিনি আপন করে ফেলেছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে এতগুলি লোককে দীক্ষিত করে তাঁর দায়িত্ব যেন বেড়ে গেল। যাতায়াতের অসুবিধা সত্ত্বেও অবসর ও সুযোগ পেলেই তিনি ওখানে যেতেন। বাগ-আঁচড়ার এক অধিবাসী 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি পত্রে বিজয়কৃষ্ণের এই স্নেহদৃষ্টি সম্পর্কে লিখেছেন, 'এই ক্ষুদ্র পল্লীবাসী জনমণ্ডলীকে জ্ঞানে, ধর্মে, সামাজিকতায়, শিক্ষায় সর্বপ্রকারে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি পিতৃসম ক্লেশ ও আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ঐকান্তিক প্রাণে আমাদের জন্য খাটিয়াছিলেন, তাহা যদি আমরা কোনও দিন ভুলি তবে আমাদের মনুষ্যত্বের হানি হইবে। তিনি যে সাধুতার, নিষ্ঠার, ভক্তির, ঈশ্বরপরায়ণতাব মূল্যবান দৃষ্টান্তসকল পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছেন তাহা যদি আমরা কুড়াইয়া লইয়া অঞ্চলে বাঁধিতে পারিতাম তবে বোধ হয় এতদিনে আমরা চরিত্রে ধনী হইয়া উঠিতাম।' ১২৭১ সালে বাগ-আঁচড়ায় গিয়ে ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে অন্তরঙ্গ আলোচনার সময় 'জাতিভেদ ও উপবীত' নিয়ে কথা ওঠে। নব্যদীক্ষিত প্রাণনাথ মল্লিক জিজ্ঞাসা করেন. 'যদি উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ হয়, তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবু উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদীর কার্য করেন কেন? তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে উপবীত রাখা উচিত মনে করিবে।' সত্যান্বেষী বিজয়কৃষ্ণ। কথাটি তাঁর মনের গভীরে দাগ কেটে বসল। সত্যিই তো কথা ও আচরণ একরকম হবে না কেন? ব্রাহ্মসমাজে এমন অসত্য আচরণ থাকা উচিত হবে না। মন স্থির করে ফেলেন বিজয়কৃষ্ণ, অসত্যকে তিনি আর প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নন। ব্রাহ্মসমাজের এই কুরীতি অচিরেই সংশোধন-মানসে আচার্য কেশবচন্দ্রকে এ বিষয়ে তাঁর মতামত পরিষ্কার করে এক পত্র লেখেন, '......যদি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্যগণ উপবীতধারী হন, তবে আমি অসত্যের আলয় বলিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিব।' কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে সব কথা জ্ঞাপন করলে তিনি বিজয়কৃষ্ণ ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত করে সমস্যার সমাধান করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রচারকার্য-শেষে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতা ফিরে এলে কেশবচন্দ্র প্রধান আচার্য-মহাশয়ের মনোগত ইচ্ছা তাঁকে জানান। বিজয়কৃষ্ণ এই গুরুদায়িত্বভার গ্রহণে আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের আন্তরিক আবেদনে উপাচার্যের পদ গ্রহণে সম্মত হন।

১২৭১ সালে ৬ ভাদ্র দেবেন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে তেইশ বছরের যুবক বিজয়কৃষ্ণকে উপাচার্যপদে অভিষিক্ত করে বলেন, 'সৌম্য, তুমি অদ্য ঈশ্বর-প্রসাদে উপাচার্যপদে অভিষিক্ত হইলে। তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্তব্যজ্ঞান উপার্জনে সর্বদা যত্নশীল থাকিবে; এবং সর্বসাধারণের মধ্যে তাহা বিতরণ করিবে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনে ও গৃহধর্মযাজনে নিরলস হইবে। নিয়ত ধর্মানুষ্ঠানে পবিত্র হইয়া পবিত্র স্বরূপের সহবাসে আনন্দ উপভোগ করিবে, এবং সদুপদেশ ও সাধু চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরের পথে সকলের মনকে আকর্ষণ করিবে।

গুরুজনকে ভক্তি করিবে, বন্ধুদিগকে সমাদর করিবে ও সকলকে যথোপযুক্ত সম্মান দিবে। স্বাধীন হইয়া বিনয়ী হইবে। পরের অত্যুক্তিসকল সহ্য করিবে, কাহারও প্রতি দ্বেষ করিবে না। অন্যে যদি তোমার প্রতি অসাধু ব্যবহার করে, তুমি সাধুভাব অবলম্বন করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবে। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবে না, কিন্তু সর্বদা সাধুই থাকিবে। সম্পদে-বিপদে, স্তুতি-নিন্দাতে, মান-অপমানে অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, অভিপ্রায় মহান হউক, ধর্ম নিঃস্বার্থ হউক, হৃদয় পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুময় হউক; তোমার চক্ষু ভদ্র রূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্র কথা শ্রবণ করুক। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি, হরি ওঁ।'

দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়স্পর্শী প্রতিটি উপদেশ, বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রে সার্থক রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। স্বাধীন হয়ে কিভাবে বিনয়ী হতে হয়, নিঃস্বার্থ হয়ে কিভাবে ধর্মসাধন করতে হয় তা স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গেও বিজয়কৃষ্ণের বিনীত, সুসংযত অথচ নির্ভীক আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। উপাচার্যপদে বৃত হবার কয়েকদিন পর দৌহিত্রের নামকরণ উৎসবে আচার্যের কাজ করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে পাঠান বৈবাহিকের স্বাক্ষরযুক্ত স্বহস্তলিখিত আমন্ত্রণপত্র, একখানি গরদের ধুতি ও একটি সোনার আংটি। জিনিসগুলি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেও আচার্যের কাজ করার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে সম্মতি জানান বিজয়কৃষ্ণ। দেবেন্দ্রনাথ বিজয়কৃষ্ণের এই আচরণে দুঃখ প্রকাশ করলে তিনি দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হয়ে নিঃস্বার্থ ধর্মাচরণ করার পথে আপন মনের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন। তীক্ষ্ণধী দেবেন্দ্রনাথ চিনতে পারলেন ধর্মার্থী বিজয়কৃষ্ণকে, সমাদর করে পাশে বসিয়ে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রশ্নে নানা কথায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। প্রায়ই তিনি ডেকে পাঠাতেন বিজয়কৃষ্ণকে। বিজয়কৃষ্ণ যেন তাঁর পরম ইষ্টজন। এমনি একদিন আলাপ-আলোচনা করছেন দেবেন্দ্রনাথ। হঠাৎ কি ভেবে বলে ফেললেন, 'আমি যেখানে যাইতে বলিব সেখানেই যাইতে হইবে।' এই কথা শুনে বিস্মিত হয়ে ভাবেন বিজয়কৃষ্ণ, 'যে জীবন ঈশ্বরচরণে অর্পণ করিয়াছি, সে জীবনে কিরূপে মনুষ্যের দাসত্ব করিব?' সবিনয়ে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া প্রচারক্ষেত্রে গমনাগমন না করিলে জগতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হইবে না। স্বাধীনভাবে প্রচার করিতে দিন। প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রভুত্ব প্রবেশ না করে।' বিজয়কৃষ্ণের কথা শুনে বড়ই লজ্জিত হয়ে পড়লেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি তো এমন কথা বলতে চান নি। সলজ্জভাবেই বললেন, 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সকল স্থানে গমন করিতে পারি না। এজন্য যেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা হয় সেখানে যদি তুমি গমন কর, তাহা হইলে আমার মনে বিশেষ আনন্দ হয়।' সানন্দে সম্মতি জানালেন বিজয়কৃষ্ণ। ধর্মপ্রচারের প্রশ্নে কোন দ্বিধা নেই বিজয়কৃষ্ণের। বিদায়ের সময় সস্নেহে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন দেবেন্দ্রনাথ, 'স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার কর, বীজ বপন কর, ঈশ্বরকৃপাতে সুফল উৎপন্ন হইবে। ফলের জন্য চিন্তা করিও না, ফলদাতা ঈশ্বর তোমার সহায় থাকুন।'

এই সময়কার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে 'ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় বিজয়কৃষ্ণ লিখেছেন, 'আমি ব্রাহ্মধর্মের একজন অধম প্রচারক। আমি নামের বা গৌরবের জন্য প্রচারব্রত গ্রহণ করি নাই। আমার আত্মার গভীর স্থানে কি একটি আশ্চর্য শক্তি আছে। এ শক্তি আমার নহে। ইহা আমার যত্নসাপেক্ষ নহে, ইহার উপর আমার কোন প্রভুত্ব

নাই। আমার ইচ্ছার সঙ্গেও ইহার কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এই শক্তি আমাকে অন্ধের ন্যায় পরিচালনা করে।...ইহাই আমাকে প্রচারক নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।...আমার বিশ্বাস এই শক্তির আদেশ ঈশ্বরের বাক্য, ইহা প্রচারকের জীবন, ইহাই ভয় বিপদের সম্বল, নিরাশার ঔষধ, প্রার্থনার ইন্ধন। ইহা ব্যতীত, আমি অন্ধ অপেক্ষাও অসহায় হইয়া যাই, মুমূর্ষু অপেক্ষাও নির্জীব হইয়া যাই।'

বিজয়কৃষ্ণের জ্বলন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস, তীব্র বৈরাগ্য; বাক্যে ও কার্যে অকপট সংহতি ও অপূর্ব স্বার্থত্যাগে মুগ্ধ হয়ে নব্যশিক্ষিত যুবকেরা দলে দলে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে। তাঁদের মধ্যে দেখা যায় গভীর ধর্মজিজ্ঞাসা। এদিকে প্রাচীন আর নবীন ব্রাহ্মদের মধ্যে দিন দিন বিভেদ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ ঘটে। উপবীত ধারণ ও অসবর্ণ বিয়ে নিয়ে শুরু হয় রেষারেষি। বিজয়কৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে কিশোরীলাল মৈত্রের কন্যা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে হয় প্রসন্নকুমার সেনের অসবর্ণ বিবাহ। নব্য-দলের প্ররোচনায় উপবীতধারী উপাচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে অপসারণ ও উপবীতত্যাগী যুবা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে উপাচার্য পদে নিয়োগ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলনে প্রাচীনেরা প্রমাদ গণেন। তাঁরা দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মসমাজের পূর্বরীতি-বিরোধী এই কার্যের সমালোচনা করেন। তাঁদের ধারণা ছেলে-ছোকরাদের আবদারে নতি স্বীকার করলে সব কিছুতেই ওঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পরিণামে সমাজে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। সমাজের এই অবস্থা-বিপর্যয়ে সনাতনধর্মের ছায়াতলে ফিরে যাওয়া ছাড়া তাঁদের আর অন্য পথ নেই। বিজয়কৃষ্ণের ভাগিনেয়ীর অসবর্ণ বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ আরও বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনিও নবীনদের এতটা বাড়াবাড়ি সমর্থন করতে পারছেন না। এঁদের যুক্তি অকাট্য, কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রয়োগ এত তরান্বিত হলে হয়ত সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতাই দেখা দেবে বেশি করে। নবীনদের এই বৈপ্লবিক কর্মধারার সঙ্গে তিনি কিছুতেই একমত হতে পারছেন না। তাঁরও যেন মনে হচ্ছে এঁরাও একধরনের সমাজ-বিপ্লবী দল! প্রাচীন সংস্কারের মূল উৎপাটনই এঁদের লক্ষ্য! দেবেন্দ্রনাথের কল্পিত ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ যেন ধূলিসাৎ হতে চলেছে! এই নব্যদলের সঙ্গে হাত মিলালে ধর্মসাধন সম্ভব হবে না। তাছাড়া, প্রাচীনদল সমাজ ছেড়ে গেলে তিনি দাঁড়াবেন কোথায়? দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের এই পরিণতির কথা যেন আর ভাবতেই পারেন না। তিনি স্থির করে ফেললেন নব্যদলকে আর কখনও প্রশ্রয় দেবেন না। যদি তাঁরা আলাদা হয়েও যায়, তাহলেও নয়। প্রাচীনপন্থীদের অভয় দিয়ে তিনি তাঁর মনের কথা জানিয়ে দিলেন।

এই সময় ২০শে আশ্বিন, বুধবার (১২৭১) এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে বহুলোক প্রাণ হারায়; বহু বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে পড়ে, উড়ে যায়। ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরও খুব বিধ্বস্ত হয়। এই চরম দুর্যোগের মধ্যেও সমাজমন্দিরে উপস্থিত হন বিজয়কৃষ্ণ। পথ আর পথ নাই, বিপর্যয়ের ফলে বিক্ষিপ্ত জঞ্জালরাশি ও মৃত জীবজন্তুর শবদেহে পরিপূর্ণ। হ্যালিডে স্ট্রীটে প্রায় গলাজল। এই গলাজল পেরিয়ে, অনেক দুরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে মন্দিরে পেঁৗছেন তিনি অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায়। ধর্মসাধনায় নিবেদিত দেহ-মন-প্রাণ বিজয়কৃষ্ণের, কর্তব্যনিষ্ঠায় অবিচল ও নির্ভীক। সমাজমন্দিরে পেঁৗছেই একজন পরিচারকের হাতে চিঠি দিয়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে জ্ঞাপন করেন মন্দিরের শোচনীয় অবস্থার কথা। দেবেন্দ্রনাথ এ চিঠির উত্তরে লিখে পাঠান, '......আজ প্রকৃতির মধ্যে যে ভীষণ ব্যাপার হইতেছে, তুমি তাহাতে

পরমেশ্বরের লীলা দর্শন কর।'

এই অবস্থার মধ্যেই বিজয়কৃষ্ণ উপাসনায় বসেন। অনেকটা সময় কেটে যায়। উপাসনা-শেষে বাড়ী ফিরে আসার জন্য পথে নেমেছেন, এমন সময় দেখেন কেশবচন্দ্র একটা পাল্কী থেকে নেমে মন্দিরের দিকে আসছেন। উভয়ে উভয়ের দিকে কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন, সমাজমন্দিরের এমন নিদারুণ অবস্থা, এ যে অকল্পনীয়! উভয়েই খুব বিমর্ষ, উভয়েই খুব ভাবিত। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সূচনা করে পরমেশ্বর তাঁদের কোন পথে চালিয়ে নিতে চাইছেন? তিনিই সকল মঙ্গলামঙ্গলের নিয়ন্তা; তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, বলে নীরবতা ভঙ্গ করলেন বিজয়কৃষ্ণ। তারপর দুইজনে মিলে আবার উপাসনায় বসবেন বলে ভগ্নপ্রায় সমাজমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতানৈক্য ঃ আদর্শে সংঘাত

ঝড়ে ব্রাহ্মমন্দিরের এমনই ক্ষতি হয় যে, মেরামত না করে ওখানে উপাসনা করা সম্ভব হয় না। তাই সমাজমন্দিরের সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বুধবারের সাপ্তাহিক উপাসনা দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর গৃহে হবে বলে স্থির হয়। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে প্রথম সম্মিলনের দিন (২৭শে আশ্বিন, বুধবার, ১২৭১) পূর্বাহ্নে দেবেন্দ্রনাথ বিজয়কৃষ্ণকে বলেন, 'অন্নদাবাবু পীড়িত আছেন, তিনি আসিতে পারিবেন না, অতএব তুমি ও পাকড়াশী মহাশয় অদ্য বেদীর কার্য কর।' কেশববাবুকেও তিনি এই ব্যবস্থার কথা চিঠি লিখে জানান। পাকড়াশী মহাশয় ছিলেন উপবীতধারী। কেশবচন্দ্র এবং বিজয়কৃষ্ণ এতে ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা বুঝতে পারেন, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রাচীন দলের সঙ্গে একমত হয়েছেন। সন্ধ্যায় যথাসময়ে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে পৌঁছে দরজার বাইরে থেকে বিজয়কৃষ্ণ দেখতে পান, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী বেদীর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বিজয়কৃষ্ণ তখন ভিতরে প্রবেশ না করে প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ করে উপবীতধারী আচার্যের উপাসনায় যোগ না দিতে আগন্তুকদের অনুরোধ করেন। অবশেষে তিনি ও কেশববাবু নব্যপন্থীদের নিয়ে এক বন্ধুগৃহে সমবেত হয়ে উপাসনা সম্পন্ন করেন। পরে দেবেন্দ্রনাথকে এই নীতি-বিরুদ্ধ আদেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। নব্যদল বুধবার ছাড়া অন্য একদিন দেবেন্দ্রনাথের গৃহে উপাসনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেও দেবেন্দ্রনাথ তাতে অসম্মত হন। ফলে উভয় দলের একত্র কাজ করা কঠিন হয়ে ওঠে। আপনজনের ক্ষুব্ধতা ও বিরোধিতায় নব্যদলের অনেক নবীন ব্রাহ্ম প্রায় রিক্ত হস্তে পরিবার নিয়ে খোলার ঘরে কোন রকমে মাথা গুঁজে ছিলেন। এখন তাঁদের অবস্থা চরমে ওঠে। এর উপর প্রাচীনপন্থীরা তাঁদের বাক্যবাণে জর্জরিত করতে থাকেন। ঈশ্বর-ভরসা করে অম্লান বদনে তাঁরা সবই সহ্য করেন। এই অবস্থায়ও তাঁদের মুখমন্ডলে উদ্দীপনার দীপ্তি। কেশববাবু এবং বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন নব্যদলের অগ্রণী। তাঁরা উভয়েই অনুভব করেন, দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজে একত্র টিকে থাকা দায়। কিন্তু তখনই আলাদা হবার সময়টি অনুকূল নয়। ব্যক্তিগতভাবে বিজয়কৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন; কিন্তু ইদানীং আদর্শ নিয়ে পদে পদে তাঁর সঙ্গে মতের অমিল হওয়া সত্ত্বেও তাড়াহুড়ো না করে সর্বদিকে

গুছিয়ে ধীরে-সুস্থে শান্তিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া যুক্তিসংগত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। কেশববাবুও এতে সায় দেন। সহযোগীদের নিয়ে তিনি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে বাংলা ১২৭১ সালের কার্ত্তিক মাসেই স্বতন্ত্র এক প্রচার-বিভাগ গঠন করেন, এবং সংগে সংগে 'ধর্মতত্ত্ব' নাম দিয়ে এক মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তীক্ষ্ণধী দেবেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন আসন্ন, কিন্তু তিনি নিরুপায়। তাঁর পক্ষে উভয়-সংকট। তিনি ভাল করেই জানতেন ব্রাহ্মধর্মের এই দুই প্রাণসঞ্চারী ধারা সরে গেলে তাঁর সমাজের অবস্থা হবে নিস্তরংগ নদীর ন্যায়। নব্য-দলের সাপ্তাহিক মিলন-স্থান হয় বিজয়কৃষ্ণের আবাসে; তারপরে কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে। এই সময় স্থির হয় প্রচার-বিভাগ হতে সারা ভারতে অবিলম্বে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার আরম্ভ করা হবে। বিজয়কৃষ্ণের উপর এই ভার অর্পিত হয়।

একদিকে সাতশত ঘর শিষ্য পরিত্যাগ করেন বিজয়কৃষ্ণ, অন্যদিকে তিনি নিজেই করেন ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে প্রচারকের ভাতার বিরোধিতা। ভগবানের কাজে আবার মাসহারা কি? তাহলে আর তাঁর উপর নির্ভর করা হল না। নিজের তো কথাই নেই, পরিবারের সামান্যতম সুখ-সুবিধার দিকে দৃকপাত না করে তিনি প্রচারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

রাধানাথ মল্লিক লেনের বাসগৃহটি হয়ে উঠে নবীনপন্থীদের তীর্থক্ষেত্র। দোতলার একটি ঘরে থাকতেন মেয়েরা। আর নিচে এবং উপরের বাকী সব ঘরে ছেলেরা। যদুনাথ চক্রবর্তী ও অঘোরনাথ গুপ্ত ঐ বাড়ীতেই থাকতেন। বাইরে থেকে ব্রাহ্ম বন্ধুরা এলে এখানেই হত তাঁদের ব্যবস্থা। আহার-বিহারের কিছুই ঠিক ছিল না। জোটে ভাল, না জোটে তো কোন অভিযোগ নেই,—না অনুশোচনা, না কোন বিরূপ ভাবনা। একেবারে আকাশ-বৃত্তি! কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু এবং আরও কয়েকজন ব্রাহ্ম স্বেচ্ছায় যা চাঁদা দিতেন, তা দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি হত। বিজয়কৃষ্ণের পরিবারের জন্য আলাদা করে কেউ কিছু দিতে চাইলে তা গ্রহণ না করে প্রচার-ফান্ডে দেবার জন্য অনুরোধ করা হত। এ অবস্থায় অনেক দিনই স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই অনাহারে কাটাতে হয়েছে। বিজয়কৃষ্ণ বলতেন, 'যেদিন ভগবানের উপর নির্ভর করি, সেদিন আহারের কোন অভাব নাই, আর যেদিন নিজে কর্তা সাজি, সেইদিনই যত গোলমাল।' সর্বাবস্থায় তৃপ্ত বিজয়কৃষ্ণ—যিনি জীবন দিয়েছেন, তিনিই আহারের ব্যবস্থাও করবেন. এমনি তাঁর মনের ভাব। উঠানের কাঁটানটে-শাক দিয়ে ব্যঞ্জন, আর দোপাটি ফুলের বড়া—এও তাঁর কাছে রাজভোগ। ডালের অভাবে চালে হলুদ মিশিয়ে খিচুড়ি বা শুধু নুন-ভাত, সেও অমৃত। একদিন নুন নেই, কাঁচা তেঁতুল সিদ্ধ দিয়ে বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ দুইজনে ছয়জনের বরাদ্দ ভাত খেয়ে ফেলেছিলেন। একথা শুনে বিস্মিত এক বন্ধুকে বিজয়কৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ব্যঞ্জনাদি কি আহারের পরিমাপ ঠিক করে? ক্ষুধাই আহারের প্রধান উপকরণ। ক্ষুধার সময় সবই অমৃত বোধ হয়।' নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও মাঝে মাঝে আহারের সংগী হতেন। তিনি বলতেন, 'বিজয়বাবুর গৃহে তেঁতুলগোলা ভাতও সুস্বাদু।' রাত্রে দেড় পয়সার মুড়িতে বিজয়কৃষ্ণের পরিবারের আহার মনে হত যেন বিলাস-ভোজন। এমন অনেক দিন গিয়েছে—ঘরে কেবল চাল আছে, ডাল বা অন্য কিছুই নেই; প্রচারকেরা উপাসনায় বের হবার সময় বলে গেলেন, সেসব তাঁরা নিয়ে আসবেন। উপাসনায় বসে তাঁরা ভগবৎ-প্রসংগে ডুবে গেলেন। গভীর রাত্রে ঘরে ফিরে দেখেন, অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত দেহে মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। অঘোরনাথ কাউকে আর বিরক্ত

না করে চুপিচুপি গোলদীঘি থেকে কলসী ঘাড়ে করে জল এনে কোনপ্রকারে কিছু চাল সিদ্ধ করে নিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সহিত সকলের আহারের ব্যবস্থা করে ফেলতেন। এরকম অবস্থা একদিনের নয়, মাঝে মাঝেই এমন হত। এক-একদিন রান্না হতে ভোর হয়ে যেত, কিন্তু তাতে কি যায় আসে? শ্রীভগবানে সমর্পিত দেহমন, সকলেই মহানন্দে এই অবস্থা মেনে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বিজয়কৃষ্ণের আবাসের পরিজনদের বৈরাগ্য সাধনসাপেক্ষ ছিল না—এর স্বতঃবিকাশ ঘটেছিল। এই অভাব-অনটনের মধ্যেও বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন স্থির, ধীর। তিনি ভাবতেন, এও ভগবানের করুণারই একটি রূপ; এরই ভেতর দিয়ে সেই চিরমঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁর পরিবারের প্রতিটি মানুষকে বৈরাগ্য, সংযম, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিচ্ছেন। ভোজন অপেক্ষা ভজন, বাইরের সাজ অপেক্ষা সদাচার, দৈহিক-সুখ অপেক্ষা আত্মিক-উৎকর্ষ শ্রেয়। এই চিরন্তন সত্যটি এই গৃহবাসী সকলেই কায়মনোবাক্যে উপলব্ধি করেছিলেন। মনের গতি জলের ন্যায় নিম্নমুখী। সংসারের বেশীর ভাগ মানুষ তুচ্ছ সুখ-সুবিধার জন্য সত্য, ন্যায় ও ধর্মকে প্রলোভনের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে তাঁদের জীবনে অশান্তি ডেকে আনে, আর বলে 'শান্তি কোথায়'? মন শান্ত না হলে শান্তি হয় না। এই অভাবের মধ্যেও বিজয়কৃষ্ণের প্রাণে শান্তি ছিল, বৈষয়িক কোনও অভাববোধ ছিল না। ঐ সময় ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া তাঁর আর কোনও বাসনা ছিল না। বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন সাধারণের ব্যতিক্রম, তাঁর মনের গতি ছিল ঊর্ধ্বমুখী—যেন উজানযমুনা।

নব্যদলের এক সভায় স্থির হয়, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রয়োজন। ঘরের বাইরে গাউন ও বুট জুতা এবং গৃহে সায়া পরিধান, স্ত্রীলোকের শোভন পরিচ্ছদ বলে গণ্য হয়। অর্থের অভাবে যোগমায়া দেবীর একপ্রস্থ অলঙ্কার বেচতে হয় এই অভিনব পোষাক কিনতে। বিদ্রূপ ও কৌতুকের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ স্ত্রীকে এই বেশ পরিয়ে একবার নিয়ে যান শান্তিপুর। মেয়েরা হাসাহাসি করে ডাকাডাকি করেন, 'বিজয়ের মেমবৌ দেখে যা।' লোক-লজ্জার ভয়ে বিজয়কৃষ্ণ কোন সিদ্ধান্ত থেকে কখনও বিরত হন নি। আবার যখন বুঝেছেন কোন কিছু অসমীচীন, তা সংশোধন করে নিতে মুহূর্তও বিলম্ব করেন নি। বংশ-পরম্পরায় জীবিকার্জনের সচ্ছল বৃত্তি অন্তর্মুখী দিব্য-প্রেরণার তাগিদে পরিত্যাগ করে তিনি অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ স্বাধীন জীবনযাপন অঙ্গীকার করেন, ভগবানের করুণা আশ্রয় করে 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্' বলে প্রচারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ব্রজসুন্দর মিত্র ছিলেন কুমিল্লায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ব্রাহ্মদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর ঢাকার আরমানিটোলার বাড়ীর একতলা বিনা ভাড়ায় তিনি ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের জন্য দিয়েছিলেন এবং বিদ্যালয়ে মাসে ত্রিশ টাকা আর্থিক সাহায্যও করতেন। দোতলার হলঘরে ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা ছিল। সাক্ষাৎকারের পূর্ব থেকেই প্রৌঢ় ব্রজসুন্দরবাবুর সম্পর্কে যুবক আচার্য বিজয়কৃষ্ণের ছিল শ্রদ্ধাশীল মনোভাব। ১২৭১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ববঙ্গ-প্রচার-অভিযানে বের হয়ে মিত্রমহাশয়ের সনির্বন্ধ আমন্ত্রণে বিজয়কৃষ্ণ আর অঘোরনাথ ওঠেন তাঁর আরমানিটোলার বাড়ীতে। ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজে ব্রতী হন অঘোরনাথ, আর বিজয়কৃষ্ণ ব্রতী হন প্রচারের কাজে। অপরিসীম তাঁদের নিষ্ঠা ও উদ্যম; আহার, নিদ্রা, বিশ্রামের ছিল না সময়। প্রচারের নাই বিরাম, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-

পাতন। পূর্ববাংলায় বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কথা তখনকার 'তত্ত্বকৌমুদী'তে লেখা আছে, 'জ্বলন্ত প্রাণ লইয়া, ভগবৎ কৃপা সহায় করিয়া বিজয়কৃষ্ণ প্রচারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বর্ষার তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত গিরি-তরঙ্গিনী যেমন প্রবল বেগে উভয় কূল ভাসাইয়া লইয়া যায়, মহোৎসাহে সমুচ্ছ্বসিত-প্রাণ বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্ম নামে সেইরূপ দেশ-দেশান্তর ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন। প্রভেদ এই—গিরিনদী উভয়-কূলের চিরসঞ্চিত আবর্জনারাশি ধৌত করিতে যাইয়া আপনি মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ দেশের পাপ কুসংস্কার দূর করিতে যাইয়া স্বয়ং নির্মল হইতে নির্মলতর হইতে লাগিলেন।...তাঁহার উৎসাহপূর্ণ, প্রেমোদ্দীপ্ত, একত্বময় জীবন্ত-প্রাণের মহাপ্রচার দর্শন করিয়া লোকে মুগ্ধ হইল; তাঁহার অনলবর্ষী, মর্মস্পর্শী, অমৃতোপম মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া সকলের প্রাণ জাগ্রত ও মন শীতল হইল।...... বিজয়কৃষ্ণ প্রচারক্ষেত্রে নামিলেন। প্রকৃত স্বর্গদূতের ন্যায়, প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় নামিলেন। "যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ;/ছাড়ি যাব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান।" যেমন কথা তেমন কাজ। দেহ-মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্ মহামন্ত্র সার করিয়া প্রভুর চরণে আত্মবিসর্জন করিয়া প্রভুর মহাকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভুর কার্যে তাঁহার অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিবার অবসর রহিল না। তিনি আপনার শরীরের দিকেও দৃকপাত করিলেন না। পরিজনের অসুবিধা সুখ-স্বচ্ছন্দতার পানেও চাহিলেন না; এবং নিন্দা-প্রশংসার মুখাপেক্ষাও করিলেন না। অবিচলিত উৎসাহে, অটল অধ্যবসায়ে, পূর্ণপ্রাণে প্রভুর কার্যে অবতীর্ণ হইলেন; তাঁহার গতি অবারিত এবং বাণী অপরাঙ্মুখী হইল।'

পূর্ববাংলায় বিজয়কৃষ্ণের এই প্রচার-অভিযানের পূর্বে যাঁরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা শুধু নামেই ছিলেন ব্রাহ্ম। সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিলেও তাঁদের জীবনগঠনের ছিল না কোন চেষ্টা। এই সব দেখেশুনে বিজয়কৃষ্ণ হন মর্মাহত। তাঁর বক্তৃতার উদ্দীপনা শ্রোতাদের অন্তরে আনে ধর্মাচরণে আর্তি। বহু কৃতবিদ্য যুবক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন; ব্যবহারজীবী আনন্দ রায়ের দাদা গোবিন্দ রায় উপবীত ত্যাগ করেন। হিন্দু সমাজের নেতা কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ও বিজয়কৃষ্ণের অনুগত হয়ে ব্রাহ্মসমাজে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করেন। বিজয়কৃষ্ণের নেতৃত্বে কয়েকটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। শঙ্কিত হয়ে ওঠেন সনাতনপন্থীরা। ফলে, 'হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'র উদ্ভব হয়।

ঢাকা থেকে বিজয়কৃষ্ণ কুমিল্লায় যান। যাতায়াতের আর কোনও ব্যবস্থা যেখানে নেই, সেখানে তিনি হেঁটেই চলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। নদী-নালা পার হন খেয়ায় বা জেলে-নৌকায়। আলিয়ারগঞ্জ থেকে হেঁটে কুমিল্লা পৌঁছেন বেলা একটায়। বেলা চারটায় ব্রজসুন্দরবাবু বিজয়কৃষ্ণকে তাঁরই গৃহের বারান্দায় বসে থাকতে দেখে তাঁর পরিচয় পেয়ে নিজেকে মনে করেন অপরাধী। তিন ঘণ্টা ধরে অতিথি বসে আছেন অভুক্ত। খোঁজখবরটি পর্যন্ত কেউ নেয় নি। ব্রজসুন্দরবাবু বার বার তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে অকপট বন্ধুত্ব। কুমিল্লায় ব্রাহ্মদের মধ্যে ছিল প্রেরণার অভাব। বিজয়কৃষ্ণের উপস্থিতিতে যেন মরা নদীতে জোয়ার আসে। ব্রাহ্মদের মধ্যে দেখা যায় প্রাণের স্পন্দন। কুমিল্লা গিয়েই বিজয়কৃষ্ণ নিরস্ত হন নি। আশেপাশের ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, নামেমাত্র অনেক ব্রাহ্ম রয়েছেন, যাঁদের পৌত্তলিকতার সঙ্গে বিশেষ সংশ্রব; এমনকি বিজয়কৃষ্ণ উপবীতত্যাগী বলে তাঁরা তাঁকে স্বগৃহে স্থান দিতেও

কুণ্ঠাবোধ করতেন। কিন্তু আশ্চর্য, সামান্য কয়েক দিনের ব্যবধানেই তাঁর ঈশ্বরপ্রীতির উদ্দীপনায় ও উপাসনায় সেই অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়।

গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে ব্রহ্মনাম প্রচার করতে থাকেন বিজয়কৃষ্ণ। তিন মাস সময়ে তিনি যেন অঘটন ঘটান। বিজয়কৃষ্ণের তীব্র বৈরাগ্য, অসাধারণ অধ্যবসায়, অকপট স্বার্থত্যাগ ও ধর্মানুরাগে আকৃষ্ট হয়ে পূর্ববাংলার জনসাধারণ দলে দলে করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। যিনি তাঁর সংস্পর্শে আসেন তিনিই এই নিষ্ঠাবান সাধু প্রচারকের ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ হন। সনাতনীরা এই যুবকের ঐশ্বরিক শক্তিতে সন্ত্রস্ত হন। তাঁর 'দিগ্বিজয়' নাম যেন সার্থক হয়। বিজয়কৃষ্ণের আশাতিরিক্ত কৃতকার্যের কথা জানতে পেরে উল্লসিত হয়ে কলিকাতা থেকে কেশবচন্দ্র এক চিঠিতে তাঁকে অভিনন্দন জানান। কেশবচন্দ্র লেখেন—

জয় জগদীশ

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার,

জয় জয়, বিজয়ের জয়! তুমি যে জয়-পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছ তাহা এখান হইতেই দেখিতেছি। তোমার উৎসাহের তরঙ্গ এখানে আসিয়া আমার মনকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর যে জ্বলন্ত অগ্নি রাখিয়াছেন তদ্দ্বারা তুমি যে ভ্রম ও কুসংস্কার একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে তাহা আর আশ্চর্য কি? আবার বলি, জয় জয়! ব্রাহ্মধর্মের মহিমা এতদিন সত্যপরায়ণ প্রচারকের অভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন সেই মহিমা প্রকাশিত হইতেছে। আর আমাদের ভয় কি? ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নামকীর্তন কর; বৈরাগী হইয়া সংসারকে পদানত কর। উৎসাহের দ্বারা সকলকে জাগ্রত কর। প্রীতিসূত্রে সকলকে বন্ধ কর। এবং দেশ-বিদেশ জয় করিয়া আমাদের রাজ্য বিস্তৃত কর; এবং তোমার সঙ্গতের দরিদ্র ভ্রাতাদিগকে সম্রাট অপেক্ষা ধনবান কর। আমরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি। তুমি যত প্রচার করিবে, ততই আমাদের ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে। ভাল, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এত স্বার্থপর কেন? তুমি কি একা সমুদয় সুখ ভোগ করিবে? ঢাকাতে যে সকল অমূল্য রত্ন ঢাকা ছিল তাহা কি কেবল আপনি গ্রহণ করিবে? আমাকে কি একবারও ডাকিতে নাই? নিতান্ত দরিদ্র ভাবে পড়িয়া আছি। তোমার উৎসবে কি আমাকে অংশী হইতে দিবে না? আমার কি ঢাকা যাইবার কোন সুবিধা নাই? তুমি না পথ দেখাইয়া দিলে আমার অগ্রসর হইবার যো নাই।

অভিন্নহৃদয়,
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

কলিকাতা, কলুটোলা
২৪শে মাঘ, ১২৭১ বঙ্গাব্দ।

বিজয়কৃষ্ণকে ঢাকার ব্রাহ্মেরা আচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বারবার অনুরোধ করেন। এবার ঢাকা অবস্থানকালে কয়েক দিন তিনি চিকিৎসাও শুরু করেছিলেন, কিন্তু এদিকে যথেষ্ট মনঃসংযোগ সম্ভব হয় নি। ব্রাহ্মসমাজ তাঁর সংসারের ব্যয়নির্বাহের জন্য সামান্য অর্থ সাহায্য করতেন। ব্রজসুন্দর মিত্রও প্রচারক-পরিবারের দুরবস্থার কথা শুনে একদিনে সাতশ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন প্রচার-ভাণ্ডারের জন্য। প্রচার নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ এমন মেতে উঠেছিলেন যে তাঁর শরীরের দিকে কোনও লক্ষ্য ছিল না। বিশ্রাম নেই, নাওয়া-খাওয়া নেই। শরীরে তা সইবে কেন? অঘোরনাথকে ঢাকায় রেখে বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুর যাত্রা করেন ১২৭২ সালের শ্রাবণের শেষের দিকে।

শান্তিপুরে পৌঁছে বিজয়কৃষ্ণের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। সংসারের অচল অবস্থা। দৈনন্দিন আহারই জোটে না, ঔষধপথ্যের কি কথা? এই অবস্থা জানতে পেরে ব্রজসুন্দরবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অর্থসাহায্য পাঠান এবং পরে আরও অর্থ পাঠাবেন বলে লেখেন। নানা অসুবিধার মধ্যেও ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। তিনি সঙ্কোচ প্রকাশ করে ব্রজসুন্দর মিত্রকে লেখেন, '...এই জীর্ণ রোগে যদি আমাকে শীঘ্র নাশ করে তথাপি পরকালে আপনার মধুময় স্নেহ লাভ করিব। ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পরকালে পুনর্বার সম্মিলন হইবে। ...আপনি আমাকে যে অমূল্য স্নেহরত্ন দান করিয়াছেন তদ্ভিন্ন আমি অন্য দানের অভিলাষী নহি। আপনার অর্থ আমাকে চিরকাল সুখী করিবে না, কিন্তু আপনার স্নেহ দ্বারা চিরকাল সুখ ভোগ করিব। আপনার পত্র পাইলে এবং আপনাকে পত্র লিখিতে পারিলে আমার যে আনন্দ হয়, অর্থের সহিত তাহার বিনিময় হয় না। আমি যদি আমার পাষাণহৃদয়কে ঈশ্বরপ্রেমে বিগলিত করিতে পারি এবং বন্ধুদিগের অমূল্য স্নেহরত্ন উপভোগ করি, তাহা হইলে দারিদ্র্য-যন্ত্রণা আমার নিকটেও আসিবে না। তখন ছিন্নবস্ত্র পট্টবস্ত্র বোধ হইবে, তৃণশূন্য পর্ণকুটীরও রাজপ্রাসাদকে তিরস্কার করিবে' বলিতে কি, এই অবস্থাই এ অধমের প্রার্থনীয়। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনার দয়া অনাথদিগকে মাতার ন্যায় পালন করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা।' (১২ই ভাদ্র, ১২৭২)

ব্রাহ্মসমাজ থেকে যে সামান্য অর্থ পেতেন তাও গ্রহণ না করাই তিনি সমীচীন মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ব্রজসুন্দরবাবুকে আর এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি কাহারও অর্থসাহায্য না লইয়া জীবনযাত্রানির্বাহপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে অভিলাষ করিয়াছি। এজন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে মাসিক যে সাহায্য পাইতাম তাহাও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ধর্মের কার্য করিয়া অর্থ গ্রহণ করা কর্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। ধর্মের জন্য যদি অন্নাভাবে শুষ্ক হইয়া মরিতে হয়, তজ্জন্য কি ধর্মপথ পরিত্যাগ করিতে হইবে? কখনই নয়। যদিও আমি ধনহীন দরিদ্র, কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁহার উদার সদাব্রতে কেহই উপবাসী থাকে না। আমি মনে করিয়াছি যে কোন স্থানে কৃষিকার্য করিব, এবং সেখানে ডাক্তারি চিকিৎসা করিব, কোন মনুষ্যের অধীনতায় থাকিতে পারিব না, কারণ সময়ে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য ভ্রমণ করিতে হইবে।' (১৫ই ভাদ্র, ১২৭২)

বয়সে নবীন হলেও ব্রজসুন্দরবাবু বিজয়কৃষ্ণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ব্রজসুন্দরবাবুর একটি চিঠির উত্তরে বিজয়কৃষ্ণ লেখেন, 'ব্রাহ্মধর্ম আমার জীবন। যেখানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের অসুবিধা হইবে, সেখানে আমার থাকা হইবে না।... চিকিৎসা দ্বারা ধনী ও মান্য হওয়া আমার কিছুমাত্র উদ্দেশ্য নহে, কোনরূপ কষ্টে পরিবার ভরণপোষণপূর্বক প্রাণসম ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য।' (৩০শে ভাদ্র, ১২৭২)

শান্তিপুরের লোকের কাছে অজানা নেই বিজয়কৃষ্ণের ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, সততা ও সংগঠন-ক্ষমতার কথা। সামগ্রিক কল্যাণের কথা ভেবে শান্তিপুরের করদাতারা পৌর-সংসদের নির্বাচনে তাঁকে উপ-প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করেন। এই নিয়োগের পর বিজয়কৃষ্ণ একদিন ভোরে দেখেন, পৌর-প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মী তাঁর গৃহ-

সংলগ্ন পথঘাট-সংস্কারে লেগে গেছে। বিজয়কৃষ্ণ কুণ্ঠিতভাবে তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে তোমাদের এ-কাজ করতে বলেছে? তারা বলে অফিসের বাবুরা। বিজয়কৃষ্ণ সবই বুঝতে পারলেন। তিনি তাদের অন্যত্র যেখানে বেশী আবর্জনা জমে আছে সেখানকার আবর্জনা পরিষ্কার করতে বলে তাদের বিদায় করে দেন। পদাধিকারের অপব্যবহার করা বিজয়কৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব নয়।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পরই একটি গোপন বাসনা জেগেছিল বিজয়কৃষ্ণের মনে, এমন দিন কবে আসবে যেদিন ঠাকুরদালানে শ্যামসুন্দরকে সরিয়ে সেখানে ব্রহ্মোপাসনা করবেন তিনি ব্রাহ্ম বন্ধুদের নিয়ে। এমন উপেক্ষা সত্ত্বেও শ্যামসুন্দর সরে থাকেন নি বিজয়কৃষ্ণের কাছ থেকে। বিজয়কৃষ্ণ উপাসনায় বসেছেন, শ্যামসুন্দর এসে দাঁড়ান তাঁর মুখোমুখি। স্বপ্ন নয়, এ যে সত্যি সত্যিই শ্যামসুন্দর বলছেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ কর'। বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে বলেন, 'তা হয় না শ্যামসুন্দর, আমি যে ব্রহ্মজ্ঞানী। ও সব আমার বলতে মানা।' শ্যামসুন্দর মধুর হেসে চলে যান। আর একদিন দুপুরবেলা বিজয়কৃষ্ণ বিশ্রাম করছেন, এমন সময় শ্যামসুন্দর এসে বলেন, 'জানিস্, আজ আমার ভোগে জল দেয় নি ওরা!' বিজয়কৃষ্ণ তখনই খুড়িমাকে গিয়ে বলেন, 'তোমাদের শ্যামসুন্দর এইমাত্র বলে গেলেন, আজ ভোগের সময় তাঁকে জল দেওয়া হয় নি।' খুড়িমা হেসে বিজয়কৃষ্ণকে বললেন, 'হাঁ, শ্যামসুন্দর আর কাউকে পেলেন না, ব্রহ্মজ্ঞানীকে সালিশী ধরেছেন!' 'একটু খোঁজ নিয়েই দেখ না?' বললেন বিজয়কৃষ্ণ। পূজারী সেদিন সত্যি সত্যিই ভুলে জল দেন নি শ্যামসুন্দরের ভোগের সময়। এমনি, আবার একদিন শ্যামসুন্দর বিজয়কৃষ্ণের কাছে প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'আমার বাঁশি নেই, তুই একটা বাঁশি আমাকে এনে দে না'। বিজয়কৃষ্ণ হেসে বললেন, 'আমি তোমায় মানি না ঠাকুর, যাঁরা মানেন তাঁদের কেন বল না তুমি?' শ্যামসুন্দর ছাড়েন না। অগত্যা বাধ্য হয়েই তাঁকে বাঁশি বানিয়ে দিতে হয়। আর একদিন শ্যামসুন্দর বলেন, 'আমার চূড়া নেই, চূড়া এনে দে।' রূপার চূড়া গড়িয়ে দেন বিজয়কৃষ্ণ। মন ওঠে না শ্যামসুন্দরের, বলেন, 'এ চূড়া পরব না—সোনার চূড়া চাই'। বিজয়কৃষ্ণ বলেন, 'আমি ভিখারী, সোনার চূড়া পাব কোথায়?' শ্যামসুন্দর বলেন, কেন, রাঙা ঠাকুরুণের ঝাঁপির মধ্যে টাকা আছে না? তাকে গিয়ে বল।' বিজয়কৃষ্ণ খুড়িমাকে একথা বলতেই তিনি কেঁদে ফেলে বলেন, 'শ্যামসুন্দর আমাকেও স্বপ্নের মধ্যে বলে গেছেন, চূড়া গড়ে দেবার জন্য যেন আমি তোর হাতে টাকা দিই।' সাতষট্টিটি টাকা বিজয়কৃষ্ণের হাতে তুলে দিয়ে তিনি বলেন, 'এই টাকাটা গোপনে রেখেছিলাম, কেউ জানত না এর খোঁজ-খবর।' রূপার চূড়া সোনার পাতি দিয়ে মুড়ে আনেন বিজয়কৃষ্ণ। শ্যামসুন্দর তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'চূড়া পরে কেমন সেজেছি মন্দিরে এসে একবার দেখবি না?' বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'আমি ব্রাহ্ম, আমার ওসব দেখতে নেই।' ঠাকুর হেসে বলেন, 'হলিই বা ব্রাহ্ম, তাতে কি হয়েছে? দেখতে কোন দোষ নেই। আর আমিই তো তোকে ব্রাহ্ম করেছি।' মন্দিরে গিয়ে শ্রীবিগ্রহের অপরূপ শোভা দেখে বিজয়কৃষ্ণ হন মুগ্ধ। ১২৭২ সালের আশ্বিন মাসে সুস্থ হয়ে বিজয়কৃষ্ণ ফিরে আসেন কলিকাতায়।

৩০ আশ্বিন, ১২৭২ সালে কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ একত্র বের হলেন পূর্ববঙ্গ সফরে। কুষ্ঠিয়া, ফরিদপুর হয়ে তাঁরা ঢাকা পৌঁছেন ১৯ কার্ত্তিক। ঢাকার ব্রাহ্মেরা তাঁদের অভ্যর্থনা করে উঠান জীবন দাশের গৃহে। কয়েক দিন ওখানে থেকে সকলেই ব্রজসুন্দরবাবুর গৃহে আসেন। ঢাকার লোকের উৎসাহের অন্ত নেই। মাসাবধিকাল ধরে চলে নিত্য বক্তৃতা, উপাসনা ও প্রার্থনা। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ, লালবাগ

সমাজ আর বাংলাবাজার সমাজ—তিন জায়গাতেই বিজয়কৃষ্ণ করেন আচার্যের কাজ। কেশববাবুর উপর ছিল বক্তৃতার ভার। চার-পাঁচশত শ্রোতা হত এক এক দিন।

১১ অগ্রহায়ণ, ১২৭২ কেশবচন্দ্র আর অঘোরনাথ যান ময়মনসিংহ। ব্রজসুন্দর-বাবুকে লেখেন বিজয়কৃষ্ণ, '...আমি আপনার প্রশস্ত ভবনে একাকী রহিলাম। কিন্তু একাকী নহি, যাঁহার সহিত কোনকালে বিচ্ছেদ হইবে না, সেই চিরজীবন-সখাই আমার সঙ্গী। এইক্ষণে ঢাকার যে প্রকার দুরবস্থা, এ অবস্থায় কিছুকাল ঢাকায় অবস্থিতি করা নিতান্ত কর্তব্য বোধ হইতেছে। আমি সেইজন্যই ঢাকায় রহিলাম। আপনি পুনঃ পুনঃ কুমিল্লায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, কর্তব্যের অনুরোধে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। তজ্জন্য আমার ঔদ্ধত্য বা অপরাধ মার্জনা করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিবেন। আপনার উপরই আমার যত আবদার।'

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সঙ্গে তিনি চিকিৎসাকার্যে ব্রতী হন। আট আনার অধিক 'ভিজিট' নিতেন না। যে অপারক তার কাছ থেকে নিতেন না কিছুই। ডাক্তার হিসাবে অল্প দিনেই তাঁর অপ্রত্যাশিত পসার হয়। বিশ্রামের ফুরসুৎ থাকে না। ঘামে জামা কাপড় ভিজে যেত। নবকুমার বাগচি মহাশয় বিজয়কৃষ্ণের এমন অবস্থা দেখে বলে-ছিলেন, 'এখন থেকে যারা আপনাকে দূরে রোগী দেখতে নিতে চাইবে, তাদের গাড়ী নিয়ে আসতে বলব।'

বিজয়কৃষ্ণ ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে নিজের পদযুগল দেখিয়ে বলেন, 'যে কয়-দিন পারে, এই ঘোড়া দুইটি খাটুক।' এত অর্থাগম হতে থাকে, যা তাঁর কাছে মনে হত প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এতটা ভাল বোধ করেন না বিজয়কৃষ্ণ : রোগীদের সুবিধার জন্য বলেন, 'নিজেদের একটি ডিস্‌পেন্সারি থাকলে রোগী ন্যায্য মূল্যে ঔষধ পেত।' বিজয়কৃষ্ণের এই মন্তব্যে নবকুমারবাবু এই উদ্দেশ্যে হাজার টাকা দিতে চান, কিন্তু তাঁকে তিনি প্রতিনিবৃত্ত করে বলেন, 'প্রচারের কাজে কখন কোথায় থাকি, তার নেই ঠিকঠিকানা। আপনাকে তখন ডাক্তারের পেছনে ছুটতে হবে।' বিজয়কৃষ্ণের সুচিকিৎসায় আর সৌজন্যপূর্ণ অমায়িক আচরণে সারা ঢাকা শহরে চিকিৎসক হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের পিতা স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মরদেহে ছিলেন না। পরলোকে থেকেও বিজয়কৃষ্ণের প্রতি ছিল তাঁর এক অমোঘ আকর্ষণ। তিনি স্বপ্নের ভিতর দিয়ে বিজয়কৃষ্ণকে কোন রোগীর কি রোগ, আর কি ঔষধই বা দিতে হবে, সেই নির্দেশ দিতেন। এজন্য বিজয়কৃষ্ণ বালিশের নিচে কাগজ, পেন্সিল, মোমবাতি ও দিয়াশালাই রেখে ঘুমুতেন। ঘুম ভাঙতেই যথাযথ সব লিখে ফেলতেন। কত দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে কত লোকই না রক্ষা পেল বিজয়কৃষ্ণের চিকিৎসায়। রোগীর সংখ্যা যত বাড়ে, প্রচারের কাজে ঘটে তত ব্যাঘাত। একরাত্রে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে বলেছেন, 'গোঁসাই, দেহ নিরাময় করলেই হবে না, যাতে ভবরোগের চিকিৎসা হয় তা-ই কর।' তারপর দিনই তিনি ছেড়ে দিলেন চিকিৎসা-ব্রত। ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে তিনি চিঠি লিখলেন, '...আমি ভিখারীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ব্যবসায় করা আমার কার্য নহে। আমি পুনর্বার ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলাম। বোধ হয় অল্প দিন মধ্যেই আপনার গৃহ শূন্য থাকিবে। ব্রাহ্ম ভ্রাতারা আমাকে সাহায্য করেন ভালই, না করেন তাহাও ভাল। ঈশ্বরের চরণে শরীর মন বহুদিন অবধি বিক্রয় করিয়াছি।

তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। অন্তর্যামী ঈশ্বর আমাকে স্নেহের সহিত সাহায্য করিবেন। ব্রাহ্মধর্মের জয় হউক। আমার শোণিত ব্রাহ্মধর্মকে পোষণ করুক।' (১২ পৌষ, ১২৭২)

১২ই পৌষই বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা থেকে প্রচারের উদ্দেশ্যে বরিশাল যাত্রা করেন। উকিল দুর্গামোহন দাশের সাদর আহ্বানে তাঁর গৃহে অবস্থান করেন। শত শত লোক তাঁর বক্তৃতা ও উপাসনায় যোগদান করেন। বরিশাল থেকে বিজয়কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরবাবুকে চিঠি লেখেন, '...বরিশাল আসিয়া দুর্গামোহনবাবুর বাসায় অবস্থিতি করিতেছি। দুর্গামোহনবাবু আমাদের প্রধান বল। ঈশ্বর ইঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। দুর্গামোহনবাবুর স্ত্রী অত্যন্ত সরলা। ইঁহার কোন কুসংস্কার নাই। আমাদের সঙ্গে ইনি সমস্বরে উপাসনা করেন। বরিশালে একটি ইষ্টক-নির্মিত ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ উৎসাহী, এখানে ব্রাহ্মধর্মের জীবন্ত ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। বরিশাল হইতে কুমিল্লা যাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছি; ...আমার শরীরের এক এক বিন্দু রক্ত ব্রাহ্মধর্মকে পোষণ করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা।' (১৮ পৌষ, ১২৭২)

বরিশালে পনের দিন থেকে তিনি নানাস্থানে বক্তৃতা ও উপাসনা করেন। প্রতিটি স্থানেই প্রচুর জনসমাগম হয়। সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়, সাড়া জাগে মানুষের মনে জীবনের সত্য উপলব্ধির জন্য। ধর্মজীবন-সাধনার জন্য এমন উদাত্ত প্রাণস্পর্শী আহ্বান তারা তো এমন করে আর শোনেন নি কখনও। উৎসাহিত হয়ে পড়েন বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ মানুষের ধর্মসাধনার পথে এমন আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখে। আবার তেমনি দুঃখ ও বেদনায় ভরে ওঠে তাঁর মন এই আর্ত মানুষগুলির নৈতিক দুরবস্থা দেখে। মানুষের এ কি নিদারুণ দৈন্য-অবস্থা! কদাচার, কুসংস্কার আর মিথ্যার আবরণে আচ্ছন্ন এই মানুষগুলির জন্য বিজয়কৃষ্ণের মন কেঁদে ওঠে, আকুল প্রার্থনা করেন করুণাময়ের করুণা ভিক্ষা করে এদের উত্তরণের জন্য। ব্যথাক্লিষ্ট হৃদয়ে একদিন গভীর নিশীথে নদীতে আত্মবিসর্জন করতে উদ্যত হয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ। কি আছে প্রয়োজন এ ছার জীবনে যদি মানুষকেই সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত না করতে পারি! এমন সময় দৈববাণী শোনেন, 'আত্মহত্যা কব না। সময়ে সব ঠিক হবে।' ফিরে দাঁড়ান বিজয়কৃষ্ণ, প্রণতি জানান পরম কল্যাণময়ের পূত উদ্দেশ্যে।

এমনি করেই বরিশাল থেকে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা—হেঁটে চলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, গঞ্জে, নগরে, উপনগরে। শুধু প্রচার, ধর্মপ্রচার। আহার নেই, বিশ্রাম নেই, নেই জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম চিন্তা। কেবলই এক লক্ষ্য—সত্যধর্মপ্রচার। আজ এখানে, কাল সেখানে বিজয়কৃষ্ণ ছুটে চলেছেন দুর্বার গতিতে। যেখানেই গেছেন, সেখানে মাতিয়ে তুলেছেন ধনী-নির্ধন, যুবা-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সকলকে সকলের মনেই দাগ কেটে চলেছেন মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধে তার আপন কর্তব্য, আপন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য। কোন বাধাই তিনি বাধাস্বরূপ মনে করেন নি। নদী-নালা, দুর্গম গিরিপ্রান্তর, নির্জন শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যপথ অতিক্রম করে চলেছেন নির্ভয়ে একাকী। নদীপথে নৌকার সাহায্য পেয়েছেন ভাল, নয়ত সাঁতরে পার হয়ে চলেছেন বিজয়কৃষ্ণ। ভয় তিনি পাবেন কেন? বিপদবারণ ভগবান যে তাঁর সহায়! অনেকবার নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ, কিন্তু প্রতিবারই অতীব আশ্চর্যজনকভাবে বিপদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছেন পরমেশ্বরের অপার কৃপায়। একবার নদীপথে যাবার সময় প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়েন। নৌকার মাঝিরা জীবনের

আশা ছেড়ে দেয়; 'আল্লা' 'আল্লা' বলে পরমাশ্রয় পরমেশ্বরকে স্মরণ করতে থাকে। মাঝিদের মনের সরল ভক্তিভাবের আকর্ষণে বিজয়কৃষ্ণ ভগবৎ চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েন। বিপদ কেটে যায়, তারও অনেক পরে মাঝিদের 'আল্লা'র নাম-স্তুতিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান বিজয়কৃষ্ণ। (৫ মাঘ, ১২৭২)

নোয়াখালি থেকে চট্টগ্রামে রওনা হলেন পদব্রজে। ভ্রূক্ষেপ নেই পথকষ্টে। একদিন যাত্রাপথে রাত্রে কোন চটির সন্ধান না পেয়ে এক দোকানে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করেন বিজয়কৃষ্ণ। দোকানী অসম্মত হয়। অজ্ঞাতকুলশীলকে স্থান দেওয়া বিপজ্জনক মনে ভাবে। মাঘ মাসের হাড়কাঁপান শীত; কি আর করবেন বিজয়কৃষ্ণ? এক গাছতলায় আশ্রয় নেন। শীতবস্ত্র নেই বললেই চলে। বুকের মধ্যে অসম্ভব যন্ত্রণাবোধ করেন বিজয়কৃষ্ণ, সম্বিত হারান। এই সময়ে কোথা থেকে এক পাগল এসে বাঁশ, কাঠ ও পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বেলে সেঁক দিতে থাকেন বিজয়কৃষ্ণকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্বিত ফিরে পান তিনি। দোকানীকে অসম্ভব গালাগালি করে দোকানেই বিজয়কৃষ্ণের রাত্রি-বাসের ব্যবস্থা করে কোথায় যে মুহূর্তে সরে পড়েন পাগল, তা কেউ আর টের পায় না! দোকানীও এই পাগলকে ইতিপূর্বে আর কোন দিন দেখে নি।

এই পরিক্রমা-পথে বিজয়কৃষ্ণ চট্টগ্রাম পাহাড়, চন্দ্রনাথ পাহাড় এবং রঘুনন্দন পাহাড় দর্শন করেন; লবণাখ্যকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, গুরুধ্বনিকুণ্ড, সহস্রধারা প্রস্রবণ ও জলপ্রপাত দেখে মুগ্ধ হন। পথের শোভা বর্ণনা করে তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' লিখেছেন, '...এই সমস্ত চিত্ত-চমৎকারিণী শোভা দর্শন করিতে করিতে আমার নীচ মনও ঈশ্বরের দিকে উন্নত হইতে লাগিল। দগ্ধ মৃত্তিকার নির্জীব শুষ্ক শোভাপেক্ষা এই সকল জীবন্ত শোভা যে কি অনির্বচনীয় গভীর আনন্দভাবে পরিপূর্ণ, বাক্য তাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে।' সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একদিন সীতাকুণ্ডের কাছে এক পাহাড়ের ধারে বসে বিশ্রাম করার সময় নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। এমন সময় এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেন তিনি। সেই স্বপ্নটি তিনি লিখে রেখেছিলেন, '...যে সমস্ত বৃহৎকায় নক্ষত্রমণ্ডল, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার সম্মুখে ঘোরবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে তাহার পশ্চাদ্দেশে এক মহান পুরুষকে দেখিলাম। কিন্তু এই দৃশ্য আমি অধিকবার দেখিতে পাইলাম না। আমি সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কে? পরিচয় দাও!" তিনি বলিলেন, "আমি পুরুষ, আর যাহা দেখিতেছ ইহা প্রকৃতি।" প্রাচীন গ্রন্থে পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা কথা পাঠ করিয়াছিলাম। এই ব্যাপারে আমার হৃদয়ের এক দ্বার উন্মুক্ত হইল। ঈশ্বরের সম্বন্ধে পুরুষ ও প্রকৃতি কি? পুরুষ সত্তামাত্র। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইহাই পুরুষ। এই পুরুষের মহিমা বর্ণনাতেই উপনিষদ ও শ্রুতি পূর্ণ।'

চট্টগ্রামে পৌঁছে বিজয়কৃষ্ণ যাত্রামোহন সেনগুপ্তের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে শহরে হৈ-চৈ পড়ে। ব্রাহ্মসমাজে তাঁর উপাসনা ও বক্তৃতা হয়। 'মনুষ্যের কর্তব্য এবং ধর্মই মনুষ্যের জীবন' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অন্নদাচরণ খাস্তগীরের অনুরোধে বিজয়কৃষ্ণ যান পটিয়ায়। ফেরার পথে তিনি চট্টগ্রামে 'ব্রাহ্মধর্ম', 'পরকাল' 'ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে শত বছর পূর্বে 'ব্রহ্ম' নামের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে কলিকাতা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত তিনি পদব্রজে যাতায়াত করেছেন। ধর্মের জন্য তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। ১৬ মাঘ ১২৭২, তিনি চট্টগ্রাম থেকে আবার

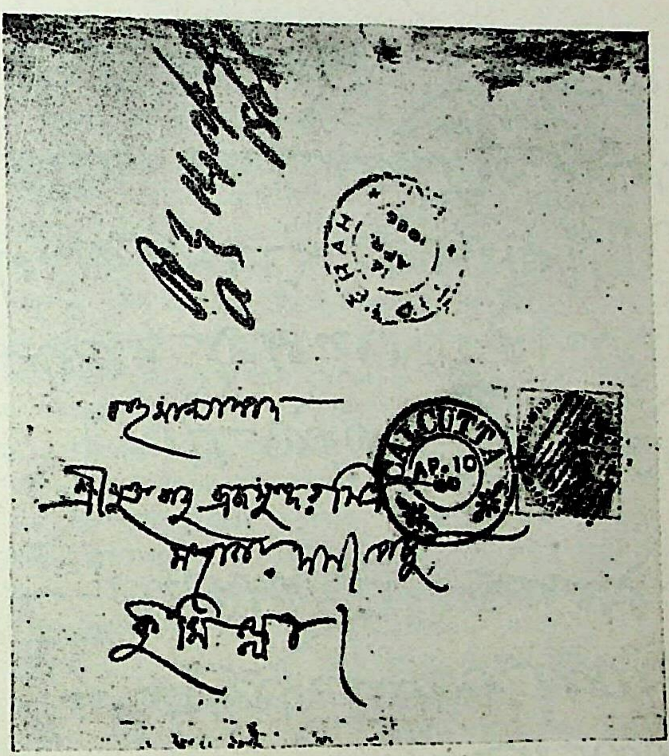

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র

কুমিল্লা

CALCUTTA
AP 10

খামের প্রতিলিপি

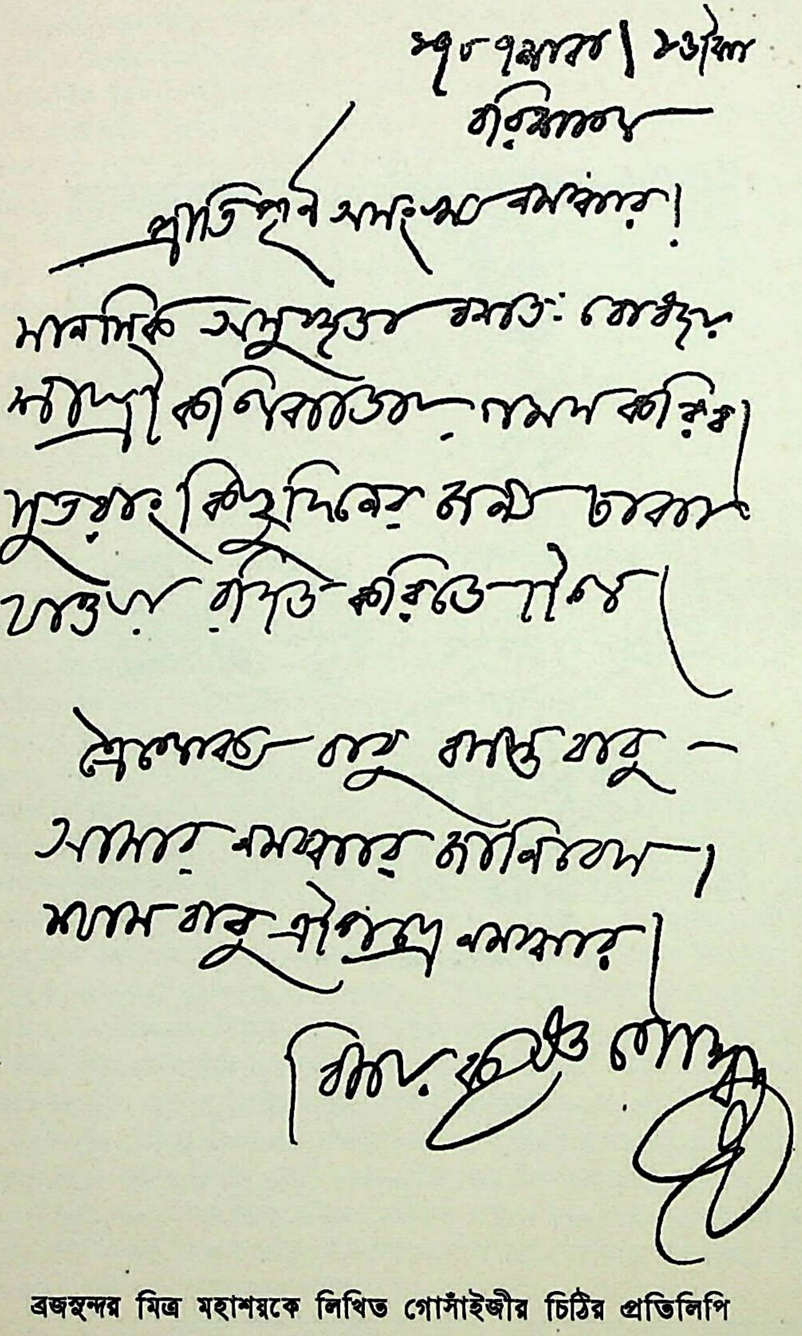

[illegible] শ্রাবণ | ২৩শে
বরিশাল

প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন নমস্কার।

মানসিক অসুস্থতা বশতঃ [illegible] শীঘ্রই কলিকাতায় গমন করিব। সুতরাং কিছুদিনের জন্য [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible]।

শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু — আমার নমস্কার জানাইবেন। শ্যাম বাবু প্রভৃতিকে নমস্কার।

শ্রী: [illegible] গোস্বামী

ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে লিখিত গোসাঁইজীর চিঠির প্রতিলিপি

পায়ে হেঁটে কুমিল্লা যাত্রা করেন। তাঁকে পেয়ে ব্রজসুন্দরবাবু আনন্দে অধীর হয়ে পড়েন। বিজয়কৃষ্ণের আগমনে শহরে কি উৎসাহ, উদ্দীপনা! বক্তৃতায় ও উপাসনায় কি আগ্রহ! কুমিল্লায় পনের দিন থেকে ফাল্গুন মাসে (১২৭২) যান ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সেখানে চার-পাঁচ দিন থেকে ফিরে যান বরিশাল। দুর্গামোহনবাবু ও স্থানীয় ব্রাহ্মদের চেষ্টায় ও বিজয়কৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় কয়েকটি বিধবা যুবতী ও একটি হীনচরিত্র বালিকার বিবাহ হয়। এই সময় বিজয়কৃষ্ণ 'স্ত্রী স্বাধীনতা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি এই সম্পর্কে বলেছিলেন, '...ঈশ্বরের অধীন হওয়া—ধর্মের অধীন হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা। সমাজ-ভয়ে সত্যপালনে বিরত থাকাই প্রকৃত অধীনতা। আন্তরিক রিপুদিগকে বশীভূত করিয়া পবিত্র থাকাই যথার্থ স্বাধীনতা। পুরুষের সহিত প্রকাশ্যরূপে আলাপ করা, প্রকাশ্য পথে পদব্রজে, অথবা অনাবৃত স্থানে বিচরণ করা, পুরুষদিগের সভায় উপস্থিত হইয়া স্বাধীনতা প্রদর্শন করা, ইহার একটিও স্বাধীনতার লক্ষণ বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, আমাদের দেশের নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ সর্বত্র বিচরণ করে, সর্বদা পুরুষমণ্ডলীতে অবস্থিতি করে; তজ্জন্য তাহাদিগকে স্বাধীন বলা যায় না।' বিজয়কৃষ্ণের প্রাণস্পর্শী ভাষণে লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী সপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ কবেন। আরও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারও ব্রাহ্ম হন। রাখালবাবু ও তাঁর ভাই বিহারীবাবু উপবীত ত্যাগ করেন। এজন্য বরিশালে হৈ-চৈ পড়ে। এই প্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ লিখেছেন, '...এবার পূর্ববাঙ্গালায় ব্রাহ্মদিগের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এ সংগ্রামে তাঁহাদের নিরস্ত্র থাকা উচিত নয়। প্রেম, ক্ষমা, সত্যপ্রিয়তা এই তিনটি অব্যর্থ অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সর্বদা চেষ্টা করা কর্তব্য। শত্রুকেও ভ্রাতৃভাবে অকৃত্রিম প্রেম করিতে হইবে, অন্যে প্রহার করিলেও হৃদয়ের সহিত ক্ষমা করিতে হইবে, সহস্র সহস্র লোক খড়্গহস্ত হইলেও শরীর পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া সত্যপ্রিয়তাকে রক্ষা করতঃ ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে; তবেই সংগ্রামে জয়লাভ হইবে।'

এবার বরিশাল আসার পর সামান্য সময়ের জন্যও বিশ্রাম করতে পারেন নি বিজয়কৃষ্ণ। অত্যধিক পরিশ্রমে এমনিতেই শরীরটা অনেকদিন থেকেই খারাপ যাচ্ছিল, তার মধ্যে আবার নিত্যনূতন কাজের চাপে দুদণ্ড সুস্থির হয়ে বসবার উপায় ছিল না তাঁর। কুমিল্লা থেকে এসেছেন প্রায় পনের দিন, অথচ তখনও চিঠি দিতে পারেন নি ব্রজসুন্দরবাবুকে। বিজয়কৃষ্ণের স্বাস্থ্যের কথা মনে করে বার বার অনুরোধ করে বলে দিয়েছেন ব্রজসুন্দরবাবু, বরিশাল পৌঁছেই যেন বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর কুশলবার্তা জানিয়ে দেন। আশ্চর্য মানুষ এই ব্রজসুন্দরবাবু! মাতৃস্নেহের সঞ্চিত সুধাভাণ্ড হৃদয়ে নিয়ে বসে আছেন তিনি তাপিতজনকে স্নেহ-সুধা বিতরণ করবার জন্য। অনন্য এই মানুষটিকে বড় ভাল লাগে বিজয়কৃষ্ণের, তাই তো তিনি তাঁর মনের দুয়ার খুলে দিয়েছেন এই মানুষটির কাছে। বিজয়কৃষ্ণ তাঁর মনের অবস্থা জানিয়ে চিঠি দেন ব্রজসুন্দরবাবুকে, 'প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার! মানসিক অসুস্থতাবশতঃ বোধ হয় শীঘ্রই কলিকাতায় গমন করিব। সুতরাং কিছুদিনের জন্য ঢাকা যাওয়া রহিত করিতে হইল। ত্রৈলোক্যবাবু, বসন্তবাবু আমার নমস্কার জানিবেন। শ্যামবাবু এই পত্রে নমস্কার।' (১৬ ফাল্গুন ১২৭২/১৭৮৭ শক বরিশাল)।

১২৭২ সালের চৈত্র মাসেই তিনি বরিশাল থেকে কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতায় আসার কয়েকদিন পরে আবার একখানি চিঠি বিজয়কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরবাবুকে

লেখেন, 'প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—আপনার পরিবারে উপাসনা কার্য সুপ্রণালীতে হইতেছে, এবং আপনার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, এ সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনার পরিবারের দৃষ্টান্তে এবং অর্থের সদ্ব্যবহারে বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল হউক, আপনার নিকট বঙ্গদেশ অনেক প্রত্যাশা করিতেছে। বন্ধুদিগের মধ্যে আপনি ভিন্ন কেহই আমাদের উৎসাহ বর্ধন করিতেছেন না। এজন্য আমরাও আপনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিতেছি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আপনার সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এক্ষণ পদ্মাতে বড় ঝড়-তুফান, এজন্য কেহ পরিবার লইয়া ঢাকায় যাইতে সক্ষম হইতেছেন না। যাহা হয় জানিতেই পারিবেন।' (২৯ চৈত্র ১২৭২/১৭৮৭ শক কলিকাতা)।

পত্রখানি ব্রজসুন্দরবাবু পান নববর্ষের প্রথম দিন। শুভদিনে বিজয়কৃষ্ণের শুভ-কামনা বহন করে এনেছে পত্রখানি, তাই এটি পরম সন্তোষের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রজসুন্দরবাবুর নিকট।

প্রবল উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে ব্রতী ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। আর্থিক অসচ্ছলতা তখন চরমে। ব্রজসুন্দরবাবুর কাছে লেখা চিঠিতে তা প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছেন, '...পয়সার অনটন বশতঃ আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। এবার বেয়ারিং লিখিতে হইল। আমার স্ত্রীর শরীর অসুস্থ আছে। রীতিমত ঔষধ, পথ্য দিলে শীঘ্র সুস্থ হইতে পারিতেন। ব্রাহ্মধর্মের মঙ্গলের জন্য এইরূপে শরীর নাশও ঈশ্বরের আশীর্বাদ। কেবল আমার নহে, প্রত্যেক প্রচারকের পরিবারেরই এইরূপ দুর্দশা। মরুক সকলে শুষ্ককণ্ঠায় অনাহারে রোগবিকারে, কেবল ঈশ্বরের জন্যই প্রাণত্যাগ করুক; তবু যেন কেহ ব্রাহ্মধর্মের জয় ঘোষণা করিতে বিরত না হন, এই আমার আন্তরিক বাসনা।' (৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৩, কলিকাতা)

বিজয়কৃষ্ণের এই সময় চরম অর্থাভাব। অনুগামী গুণমুগ্ধ সুহৃদগণ তাঁর পরিবার ও পরিজনদের উপজীবিকার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। অঘোরনাথ, মহেন্দ্রনাথ বসু ও যদুনাথ চক্রবর্তীও দানের উপর নির্ভর করতেন এবং তাঁরা বিজয়কৃষ্ণের পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমন বিরূপ পরিবেশেও বিজয়কৃষ্ণের ঈশ্বর-অনুরাগ বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি। ধর্মোৎসাহে পার্থিব দুর্ভাবনা তাঁকে স্পর্শ করত না। কোন কোন দিন দিনে আহার জোটে না; এরূপ অবস্থায়ও দায়িত্ব পালনে তাঁর ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। 'ধর্মতত্ত্বে' প্রবন্ধ লেখা, ব্রাহ্মিকাদের শিক্ষাদান, বক্তৃতা উপাসনা কোন কিছুতেই সামান্য ত্রুটি নেই। প্রচারকগণের মধ্যে দিবারাত্রি চলে সৎপ্রসঙ্গ ও সদালাপ। ধর্মের প্রদীপ-শিখা দিবারাত্রি প্রজ্বলিত থাকে। এরূপ আর্থিক অনটনের মধ্যেও বিজয়কৃষ্ণের জ্বলন্ত ধর্মভাব দেখে উৎসাহিত হয়ে আরও কয়েকজন উপার্জনশীল যুবক জীবিকার্জনের পেশায় ইস্তফা দিয়ে প্রচারব্রত গ্রহণ করেন।

এদিকে পূর্ববাংলায় বিজয়কৃষ্ণের প্রচারের ফলে ব্রাহ্মধর্মের অভাবনীয় প্রসার হয়। সেখানকার বহু বিধবা-বিবাহ ও উপবীত-ত্যাগের বার্তা কলিকাতায় এসে পৌঁছে। প্রাচীন দলের উদ্বেগ দিন দিন বাড়ে। আর জোড়াতালি দিয়ে একত্র থাকা অর্থহীন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু ভাঙ্গন আর রোধ করা গেল না। ১২৭৩ সালের ২৪ কার্ত্তিক 'ব্রাহ্মসমাজ' দুইটি প্রতিষ্ঠানে বিচ্ছিন্ন হল। নব্যদল করলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-এর গোড়াপত্তন। বিজয়কৃষ্ণের বয়স তখন মাত্র পঁচিশ। দেবেন্দ্রনাথ যথার্থ মহীরুহের

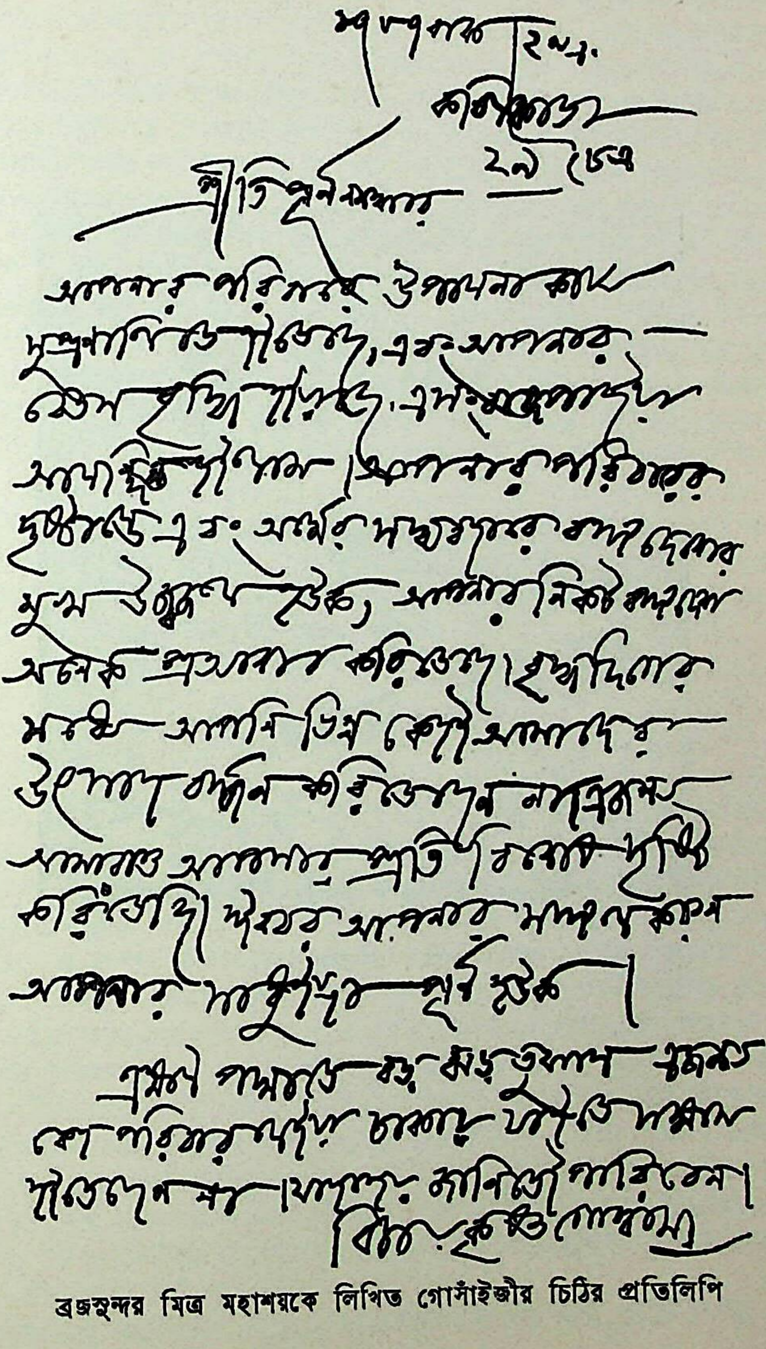

[illegible] | ২৮[illegible]

[illegible]

২৭ চৈত্র

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার

আপনার পরিবারে উপাসনার কার্য্য
সুশৃঙ্খলিত হইতেছে, এবং আপনার
[illegible] বৃদ্ধি পাইতেছে. এই সংবাদ পাইয়া
আপ্যায়িত হইলাম। আপনার পরিবারের
দৃষ্টান্তে এবং অর্থের সাহায্যের [illegible] দেশের
মুখ উজ্জ্বল হইল, আপনার নিকট [illegible]
অনেক প্রত্যাশা করিতেছে। ইহাদিগের
মধ্যে আপনি ভিন্ন কেহ আমাদের
উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন না [illegible]
আমরাও আপনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি
করিতেছি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন
আপনার সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

এক্ষণে [illegible] বড় বড় [illegible] হইতেছে
[illegible] পরিবার [illegible] [illegible] যাইতে [illegible]
হইতেছেন না। যাহাহউক জানিতে পারিবেন।
বিঃ কৃষ্ণ গোস্বামী

ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে লিখিত গোসাঁইজীর চিঠির প্রতিলিপি

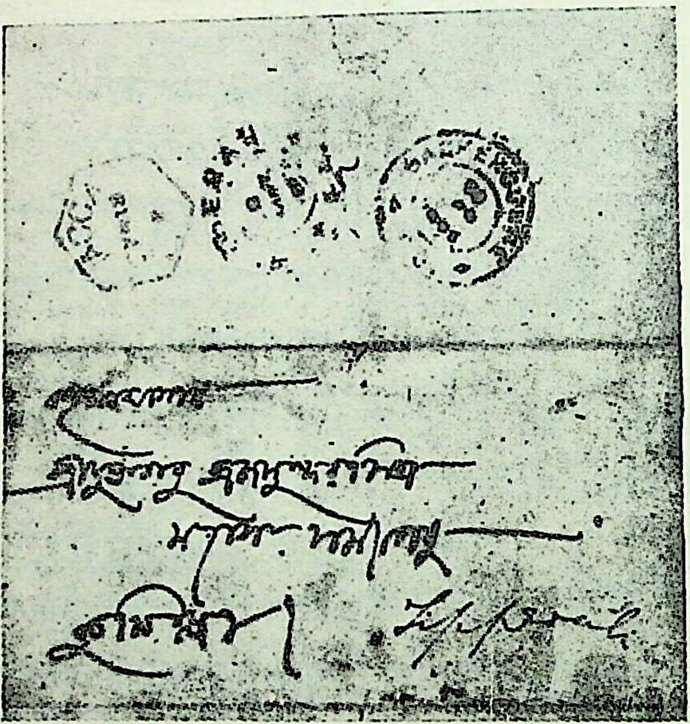

খামের প্রতিলিপি

মত এ ভাঙন প্রত্যক্ষ করলেন অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে, গ্রহণ করলেন বিধির বিধানকে আপন আদর্শ ও সংযমনিষ্ঠায় পরিশীলিত পথ অবলম্বন করে। আদি ‘আদি ব্রাহ্মসমাজ’রূপেই থেকে গেল। বিষয়-আশয় আদিসমাজের হাতেই রয়ে গেল। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টি হিসেবে সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত দায়িত্বভার কেশবচন্দ্রের হাত থেকে নিয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের হাতে অর্পণ করলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ নিযুক্ত হলেন আদিসমাজের সম্পাদক এবং তাঁর সহকারী হলেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

দেবেন্দ্রনাথের শাস্ত্রানুশীলন সীমিত হলেও অনুভূতি ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ়। আপন অনুভূতি ও প্রত্যয়সিদ্ধ পথে চলতে তিনি কখনই বিরত হন নি। রামমোহনের বিস্তৃত শাস্ত্রানুশীলন-প্রসূত সংবেদনশীল চিন্তাধারার সঙ্গে সব সময় যে দেবেন্দ্রনাথ একমত হয়েছেন এমন নয়, বরং বিরাট পরিবর্তন এনেছেন তিনি ব্রাহ্মসমাজের ধর্মতত্ত্ব, আচার ও আচরণের মধ্যে। উপাসনাপদ্ধতিতেও এনেছেন রূপান্তর। রামমোহনের প্রবর্তিত বেদপাঠ-ব্যবস্থা রহিত হয়েছে; সেখানে পঠিতব্য গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হয়েছে ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থের প্রথম ‘স্বাধ্যায়’ অধ্যায়।[১] ভারত-আত্মার বাঙ্ময়বাণী কতটা তিনি ধারণ করতে পেরেছিলেন, তা শুধু ইতিহাসই বিচার করতে পারবে।

অন্যদিকে সমস্ত বিষয়আশয়-রহিত হয়ে সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে মুক্ত রাজপথে এসে দাঁড়ালেন নব্যদল শুধুমাত্র স্বধর্মসাধনে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, দুর্জয় মনোবল এবং অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে। এই নব্যদলের মূল প্রাণ ও বিবেকবাণী হলেন বিজয়কৃষ্ণ আর পুরোধা ও জীবনবাণী হলেন কেশবচন্দ্র।

ভগবানদাস বাবাজী ও চৈতন্যদাস বাবাজী

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কেশবচন্দ্র হলেও বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন প্রাণস্বরূপ। বিজয়কৃষ্ণের উপর পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে প্রচারের ভার পড়ে। মাঘ মাসে (১২৭৩) অঘোরনাথ ও যদুনাথসহ সপরিবারে বরিশাল যান বিজয়কৃষ্ণ। দুর্গামোহনবাবুর গৃহেই তিনি ওঠেন। অদম্য উৎসাহে দাশ মহাশয় প্রচারকদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁদের সেবাযত্নে তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকে। ভৃত্যদের কোন রকম উপেক্ষা চোখে পড়লে তিনি স্বহস্তে তাঁদের সেবা করতে অগ্রসর হতেন। এতে পরিচারকেরা আরও হুঁশিয়ার হয়। বিজয়কৃষ্ণের আগমনে রাখালবাবুর গৃহের সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ব্রাহ্মধর্ম মতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিজয়কৃষ্ণের শীতবস্ত্র নেই—আদালত থেকে ফেরার পথে দুর্গামোহনবাবু কিনে আনেন দামী একখানা শাল। কয়েক দিন ব্যবহারও তিনি করেন। একদিন প্রচারে বের হয়ে একটি লোককে শীতে কাঁপতে দেখে তার গায়ে তিনি পরিয়ে দেন শালখানা। দাশ মহাশয়ের কানে যেতেই তিনি কম দামের মোটা পাবনা-ই চাদর কিনে আনেন; উদ্দেশ্য, বিলিয়ে দিলেও ফের যোগাতে বেগ পেতে হবে না। এরকম কয়েকখানা চাদরই তাঁকে কিনতে হয়েছিল।

বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, যদুনাথ বরিশালের ব্রাহ্মদের নিয়ে হেঁটে হেঁটে গ্রাম

---

১. আত্মজীবনী, ৪র্থ সং, পৃ ১৪১

থেকে গ্রামান্তরে করেন প্রচারের কাজ। কি রকম আন্তরিকতার সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেছেন, এই বিবরণী থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।—

‘প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিন আট দশ ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন, মধ্যাহ্ন-রবিতাপে মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ হইয়াছে, গাত্রে ঘর্ম ছুটিতেছে অথচ দুস্তর প্রান্তর, অলঙ্ঘ্য গিরি, পর্বত, নদী, কানন অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে অবিশ্রান্ত বেগে চলিতেছেন। উদরে অন্ন নাই, মস্তকে আতপত্র নাই, চরণে ছিন্ন পাদুকা, অঙ্গে মলিন বসন হাঁটুর উপর উঠিয়াছে, আর ঊর্ধ্বশ্বাসে চলিয়াছেন। কিন্তু কোথায় যাইতেছেন? এ হেন যৌবনকালে, সংসারের সুখ-বিলাস লজ্জাসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া এত কষ্ট করিয়া কেন পথ হাঁটিতেছেন? দুর্নিবার অন্নচিন্তায় অধীর হইয়া কি দেশে দেশে এইরূপে ঘুরিতেছেন? না, তাহা নহে। অথচ বেতনভুক বিষয়ীর বিষয়কর্ম অপেক্ষা তাঁহার এ কার্যে অধিক অনুরাগ। কাহারও অধীন নহেন, এক কপর্দক কাহারও নিকট প্রত্যাশা করেন না, অথচ দাস্যকার্যে একান্ত নিরলস। তবে কিসের জন্য এত আগ্রহ, ব্যাকুলতা? এইজন্য যে ভারতের সীমা হইতে সীমান্তরবাসী নরনারীকে স্বর্গের শুভ সমাচার শুনাইয়া তাহাদিগকে সুখী করিবেন, জগতে সত্যের জয় ঘোষণা করিবেন। সংসারের চতুর্দিকের অবস্থার সঙ্গে যখন ইহা মিলাইয়া দেখা যায়, তখন সংসারে স্বর্গের আভাস অনুভব হয়।’[১]

এইভাবে প্রায় মাসাবধিকাল প্রচার করে তাঁরা ফিরে আসেন কলিকাতায়। কয়েক দিন পরই (ফাল্গুন, ১২৭৩) আনন্দচন্দ্র নন্দী ও কৈলাসচন্দ্র নন্দীর বিনীত আমন্ত্রণে বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে যান কালীকচ্ছ। বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেনও সঙ্গে যান। নন্দী-পরিবার বর্ধিষ্ণু ও সম্ভ্রান্ত। এই নন্দী-পরিবারের দেওয়ান রামদয়াল মুন্সীর বিধবা পত্নী ব্রাহ্মধর্ম-বিরোধী ছিলেন। প্রত্যুষে ব্রহ্মোপাসনার আসর বসে দেওয়ান বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে। উপাসনা শুরু হতেই মা কৌশল করে কৈলাস নন্দীকে অন্দরে ডেকে এনে দোতলার একটি ঘরে তাঁকে বসতে বলে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দেন। দেওয়ান মহাশয়ের পত্নী তখন গ্রামবাসীদিগকে সমাগত ব্রাহ্মদের নির্যাতন করার আদেশ দেন। বিরূপ এই পরিবেশের মধ্যেও বাজতে থাকে ‘ব্রহ্ম’ নামের জয়ডঙ্কা। গ্রামবাসীরা যায় ক্ষেপে, আমন্ত্রিত ব্রাহ্মদের প্রতি শুরু করে অসৌজন্যপূর্ণ আচরণ। কেউ ঢিল ছুঁড়ে, কেউ কেউ উপাসকগণের কর্ণমর্দন করে। একটি দুর্ধর্ষ ব্যক্তি বিজয়কৃষ্ণকেও আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, এ সবের মধ্যেও তিনি নির্বিকার চিত্তে উপাসনার কাজ করে যান। এদিকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ কৈলাসবাবু চীৎকার করে তাঁর মাকে বলছেন, ‘মা, তুমি যদি আমাকে জীবিত দেখতে চাও, তাহলে তালা খুলে দাও। গণ্যমান্য অতিথিদের আমন্ত্রণ করে এনে অপমান করার চেয়ে আমার মৃত্যুও বরং শ্রেয়। শীঘ্রই আমায় মুক্ত করে দাও, নইলে আমি গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরব।’ মা সভয়ে দরজা খুলে দেন। প্রবল আবেগে উন্মত্তবৎ ‘জয় ব্রহ্ম, জয় ব্রহ্ম’ বলে উৎসবমণ্ডপে তিনি ছুটে যান। আনন্দবাবুও এসে যোগ দেন। স্বর্গীয় আনন্দে সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। গ্রামবাসিগণ তাদের কৃত অপরাধের জন্য বারবার ক্ষমা চান। গোঁসাইজীর প্রাণস্পর্শী উপাসনায় নন্দী-পরিবার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এ-সময়ে বিজয়কৃষ্ণের উপদেশ ছিল, ‘...পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব ত্যাগ

---

১. সাধু অঘোরনাথের জীবনী

কর, একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা কর, জাতিভেদ পরিহারপূর্বক মনুষ্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন কর, নিয়ত প্রার্থনা কর, সৎকার্য কর, সকল প্রকার পাপ, হীনতা পরিহার কর।'

ফাল্গুনের (১২৭৩) শেষদিকে বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে কলিকাতায় ফিরে এলেন। এসে দেখেন আবহাওয়া বড় বিষাক্ত। চার মাস হয়ে গেছে—মূল ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হয়ে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' ও 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের' উদ্ভব হয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রাচীনেরা নবীনদের বিরুদ্ধে অনেক অলীক কুৎসা রটনা করেছেন। সমাজ বিচ্ছিন্ন হবার অব্যবহিত পূর্বে কেশবচন্দ্র 'যীশুখ্রীস্ট—ইউরোপ ও এশিয়া' এবং 'গ্রেট মেন' নামে দুইটি উদার ভাষণ দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতার জের টেনে আদি সমাজের ব্রাহ্মগণ কেশববাবুকে খ্রীস্টান বলে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অথচ ভাষণ দুইটির অন্তর্নিহিত বাণী যথার্থ হৃদয়ঙ্গম না করে তাঁরা যে অলীক অভিযোগ উত্থাপন করছেন, এজন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের তরুণ ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এর পশ্চাতে অবশ্য নবীন ব্রাহ্মগণের উপবীতত্যাগ-প্রসঙ্গ এবং তাঁদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ-বিবাহ বেশি ক্রিয়া করেছিল।

যে ব্রাহ্মসমাজকে স্বর্গ মনে করে এবং ব্রাহ্মদের দেবতাজ্ঞানে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তার এই পরিণতি দেখে তিনি খুব মর্মাহত হন। মিথ্যা অপবাদ এবং বাদ-প্রতিবাদে মনকে অচিরে বিক্ষিপ্ত ও অসহিষ্ণু করে তুলতে পারে ভেবে তিনি নিজেকে বিরোধ থেকে দূরে রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ধর্মসাধনার পথে মানুষের এই বিদ্বেষ-বুদ্ধি বিজয়কৃষ্ণ কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। ঈশ্বরানুভূতি বড় কথা নয়, বড় কথা এই সত্য নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা;—বিজয়কৃষ্ণ তারই উপাসক। ঈশ্বর আছেন একথা অনেকেই বলেন, কিন্তু জীবনে এবং নিজের সংসারে যদি সেই সত্য তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট না হন, তবে সে কথা বলার কি মূল্য আছে? বিজয়কৃষ্ণ এমন জীবনের কথা কল্পনাও করতে পারেন না। এ সব কারণেই তিনি খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং অচিরেই কলিকাতা ত্যাগ করার জন্য মন স্থির করে ফেলেন।

বাংলা ১২৭৩ সালের ফাল্গুনের শেষের দিকেই সংশয়ের বেদনা নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ ফিরে যান শান্তিপুরে। উদার শান্ত প্রকৃতি তাঁর হৃদয়-ক্ষতে দেয় মাধুর্যের প্রলেপ। চাঁদের আলোয় গঙ্গার শোভা দেখে ডুবে যান তিনি ঈশ্বর-চিন্তায়। প্রকৃতি অনাদি আনন্দের উৎস; তার অফুরন্ত মাধুর্যের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণের মন খোঁজে অশেষ শান্তি ও মুক্তি। ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে তাঁর অন্তরে আপনা থেকে প্রার্থনা আসে, 'দয়াময়, তুমি তোমার কল্যাণ-হস্তে প্রকৃতিকেও সৃষ্টি করেছ, আমাকেও সৃষ্টি করেছ—প্রকৃতির শোভা একইভাবে অমলিন রয়েছে, কিন্তু আমার হৃদয়ের শোভা কেন এত মলিন হল?' মনের এই অবস্থায় ১২৭৩ সালের চৈত্র মাসে একদিন ভক্ত বৈষ্ণব হরিমোহন প্রামাণিকের সঙ্গে হয় তাঁর সাক্ষাৎ। তাঁর দীনহীন বিনীতভাব ও কথাবার্তায় অভিভূত হয়ে বিজয়কৃষ্ণ বলেন, 'আপনাকে দেখে মনে হয় যেন আপনি যথাযথ "শান্তিপুরে" আছেন, কিন্তু আমি সংশয়ে জ্বলে-পুড়ে মরছি।' বিজয়কৃষ্ণকে উৎসাহ দিয়ে প্রামাণিক মহাশয় বলেন, 'সংশয়ের বেদনা তখনই হয়, যখন ঈশ্বর কৃপা করে চৈতন্যের দ্বার খুলে দেন। প্রভো, আপনি কৃষ্ণদাস কবিরাজ-রচিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" পাঠ করুন, আনন্দ পাবেন।' একখানা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সংগ্রহ করলেন বিজয়কৃষ্ণ। দুরূহ পাঠ হৃদয়ঙ্গম করা খুব সহজ নয়। নিষ্ঠার সঙ্গে

গ্রন্থখানা অনেকবার তিনি পড়েন, তবু আশা মিটে না। কবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধ রচনা, ভক্তিরসামৃতধারা। সেই রসধারার পুণ্য পীযূষে অবগাহন করতে থাকেন বিজয়কৃষ্ণ।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে ভগবন্! আমি ধন, মান, সুন্দরী, পাণ্ডিত্য—এসব কিছুই চাই না। জন্মে জন্মে যেন তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

গৌরসুন্দরের এই প্রেম-মধুর আত্মনিবেদনে বিজয়কৃষ্ণের জীবনের মোড় যায় ঘুরে। বিস্মৃতির অতল থেকে উদ্‌ঘাটিত হয় সেই লীলারহস্য ; অহৈতুকী ভক্তির সন্ধানে হন তিনি অন্তর্মুখী।

প্রামাণিক মহাশয়ের প্রস্তাবে একদিন তিনি তাঁর সঙ্গে কালনায় যান বৈষ্ণব মহাত্মা ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে। পঁচিশ বছরের যুবক বিজয়কৃষ্ণের বেশভূষা ব্রাহ্মপ্রচারকের। বিজয়কৃষ্ণের পরিচয় পেয়ে বাবাজী মহারাজ নিজে আসন পেতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন তাঁকে। তিনি পিপাসার্ত জেনে ভগবানদাস বাবাজী নিজের ব্যবহারের কমণ্ডলুটি এগিয়ে দেন তাঁর দিকে। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, 'বাবাজী, আমি যার তার হাতে খাই, জাতটাত মানি না, আমি ব্রাহ্ম—অন্য একটি পাত্রে আমাকে জল দিন।'

ভগবানদাস বাবাজী বলেন, 'সে কি প্রভো! জাত-কুল থাকতে কি আর ভক্তি লাভ হয়? ব্রহ্মজ্ঞানই তো ধর্মের মূল। আপনি এই জলপাত্র থেকেই সেবন করুন।' অগত্যা বিজয়কৃষ্ণ জল পান করে কমণ্ডলুটি মাটিতে রাখতেই বাবাজী নিজেও ঐ কমণ্ডলু থেকে জল পান করেন। ভগবানদাসজীর এই অদ্ভুত আচরণে একজন আগন্তুক সবিস্ময়ে বলেন, 'এ কি করলেন, ইনি যে ব্রাহ্মসমাজে আছেন। আচার-বিচার মানেন না। উপবীত পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন।' বাবাজী উত্তর করেন, 'আমার অদ্বৈতেরও তো উপবীত ছিল না। এঁরও উপবীত নেই। আর ব্রাহ্মসমাজেও ইনি যে আচার্য।' আগন্তুক ভদ্রলোক মন্তব্য করেন, 'দেখতে তো পাচ্ছেন, আচার্যের কেমনতর বেশ—জামা, জুতা, ধুতি-চাদর।' শ্লেষোক্তি শুনে বাবাজীর চোখ সজল হয়ে ওঠে। অসহায় শিশুর ন্যায় তিনি কেঁদে বলেন, 'আহা প্রভুকে পরিপাটি করে সাজান এ তো আমাদেরই কর্তব্য। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য তা আমরা পারলুম না। প্রয়োজন মত তিনি নিজে সব সংগ্রহ করে নিচ্ছেন, তা দেখেও যে একটু আনন্দ করব তাও আমাদের ভাগ্যে নেই।' এই বলে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে আকুল হন। একথার তাৎপর্য আগন্তুক কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করলেন তা বোঝা গেল না, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের মনে কথাটা দাগ কেটে বসল। বিজয়কৃষ্ণ ভগবানদাসজীর আশ্রমেই প্রথম দেখেন 'নাম-ব্রহ্মের পট'।

বৈশাখ মাসে (১৩৭৪) শান্তিপুরের নীলকমল দেব বিজয়কৃষ্ণকে নিয়ে যান নবদ্বীপে চৈতন্যদাস বাবাজীর কাছে। বাবাজী পরম বৈষ্ণব নিষ্কিঞ্চন ভাব। বিড়াল, কুকুরকে পর্যন্ত ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন, এক প্রেমময় দীনতার মূর্তি। তাঁর এই ভাব বিজয়কৃষ্ণের বড় ভাল লাগে। বিনীতভাবে বাবাজীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবাজী, ভক্তি কিসে হয়?' প্রশ্ন শুনে বৈষ্ণব মহাত্মার ঘটে ভাবান্তর। হুঙ্কার দিয়ে তিনি বলেন, 'কি বলছ প্রভু? তুমি কি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছ? স্বয়ং ভক্তির ভাণ্ডারী হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ "ভক্তি কিসে হয়"! ছলনা কর

না প্রভো! তা তুমি এখন যে ভাবেই চল না কেন, কণ্ঠে তোমার তুলসীর মালা, ললাটে তিলক, শিরে জটাভার আর হাতে শ্রীমদ্ভাগবত আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

বাবাজীর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। শিখাটি খাড়া হয়ে ওঠে। সমাধি ভাঙে তিন ঘণ্টা পরে। বিজয়কৃষ্ণ সতৃষ্ণ নয়নে বাবাজীকে দেখেন। বিজয়কৃষ্ণের বারবার অনুরোধে সিদ্ধ চৈতন্যদাসজী বলেন, 'প্রেম-ভক্তি লাভের উপায় দীনহীন অকিঞ্চন ভাব। অন্তরে বিন্দুমাত্র অভিমান, অহঙ্কার থাকতে ভক্তি লাভ হতে পারে না। জলস্রোত যেমন ঊর্ধ্বগামী হয় না, ভক্তিও সেইরূপ অহঙ্কারীর হৃদয়ে প্রকাশ পায় না।' অতঃপর একটি পাত্রে বিজয়কৃষ্ণকে প্রসাদ পরিবেষণ করেন চৈতন্যদাস বাবাজী। বিজয়কৃষ্ণ শ্রদ্ধার সহিত প্রসাদ গ্রহণ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় ভুক্তাবশিষ্ট চৈতন্যদাস বাবাজী আপন মুখে তুলে দিচ্ছেন দেখে তিনি বাধা দিয়ে বলেন, 'এ কী করছেন'? মৃদু হেসে বলেন বাবাজী, 'হলেই বা তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী, তোমার প্রসাদ আমি পাবই। তুমি যে আমার প্রভুর সন্তান।' আশ্চর্য হন বিজয়কৃষ্ণ বাবাজীর ব্যবহারে। ভক্তির এ যে মূর্তিমান প্রকাশ!

চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন করে শান্তিপুর ফেরার পথে বাঁশবেড়েতে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে বিজয়কৃষ্ণ রাত্রি-যাপন করেন। তিনি নগেন্দ্রবাবুকে বলেন, 'বাবাজীর মুখে ভক্তি-উপদেশ শুনে আর তাঁর অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারের বিকাশ স্বচক্ষে দেখে কৃতার্থ হয়েছি।' ভগবানদাস বাবাজী ও চৈতন্যদাস বাবাজী, এই উভয় মহাজনের দীনতা ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মভাব লক্ষ্য করে মুগ্ধ হন বিজয়কৃষ্ণ। তাঁর অন্তরে গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগে দীনতা ও ভক্তি লাভের জন্য। শান্তিপুর ফিরে এসে মন হয় শান্ত। কলিকাতা থেকে ঔষধপত্র আনিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন বিজয়কৃষ্ণ। স্বপ্নে মাঝে মাঝে পেতেন অলৌকিকভাবে ঔষধের ব্যবস্থা। একদিন এক রোগিণীর রোগ নির্ণয় করতে হিমসিম খান। ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়কৃষ্ণকে স্বপ্নের মধ্যেই এই রোগিণীর জন্য মারাত্মক বিষ ব্যবস্থার নির্দেশ দেন। ভগবানের নাম করে এই ঔষধই রোগিণীকে খেতে দেন বিজয়কৃষ্ণ। অচিরে রোগিণী সুস্থ হয়ে ওঠে। চারদিকে বেশ পসার ছড়িয়ে পড়ে বিজয়কৃষ্ণের। নদীর ওপার গুপ্তিপাড়া থেকেও রোগের চিকিৎসার জন্য তাঁর ডাক আসে। গুপ্তিপাড়ার এক মরণাপন্ন রোগীকে দেখে একদিনের ঔষধ দিয়ে পরের দিন আবার ঔষধ নেবার জন্য বলে আসেন বিজয়কৃষ্ণ। কিন্তু সেদিন এমনই দুর্যোগ যে নদী পার হওয়া খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল; অথচ এইদিনই ঔষধ না পড়লে ঐ রোগীর জীবনমরণ-সমস্যা এসে দাঁড়াবে। কি করেন? ঔষধ নিয়ে নিজেই রওনা হন ঝড়বৃষ্টির মধ্যে। গঙ্গাঘাটে একটিও নৌকা নাই। মাথায় ঔষধ রেখে পাগড়ি বাঁধেন, তারপর সাঁতরিয়ে নদী পার হয়ে রোগীর বাড়ী উপস্থিত হন এবং রোগীকে সময়মত ঔষধ খাওয়ান। এমনই ছিল তাঁর রোগীর জন্য দরদ ও দায়িত্ববোধ।

এই সময়ে একদিন মহাভারতে পাঠ করেন জরৎকারু ঋষির আখ্যান। অকৃতদার জরৎকারু ঋষির একদিন চোখে পড়ে, কয়েকটি ইঁদুর সামান্য উঁচু জায়গায় লাফিয়ে উঠতে গিয়ে বারবার ছিটকে পড়ছে। দয়াপরবশ হয়ে জরৎকারু ঋষি ইঁদুরদের জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা এমন হীনবল হলে কি করে? এই তুচ্ছ খাড়াইটুকুও অতিক্রম করতে পার না?' ইঁদুরগণ প্রত্যুত্তরে ঋষিকে বলে, 'তোমার জন্যই আমাদের এই দুরবস্থা ঘটেছে। আমরা তোমার পিতৃপুরুষ। আমাদের পিণ্ড লোপ পেয়েছে বলেই আমরা হীনবীর্য হয়ে এরূপ দুর্দশায় পড়েছি। তুমি বিয়ে করে পুত্রোৎপাদন

কর তাহলে আমরা উদ্ধার পাই।' বিজয়কৃষ্ণের গার্হস্থ্যজীবনে এই আখ্যায়িকাটি একটি নূতন দিগন্তের দ্বার খুলে দেয় তাঁর সামনে। এই ঘটনার পর থেকে বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য পালনের শাস্ত্রীয় অনুশাসন তিনি মেনে চলেছেন অক্ষরে অক্ষরে। জীবনের ধর্মকেও তিনি তাই অগ্রাহ্য করেন নি। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন, তবে সবই ছিল ঈশ্বরমুখীন। গৃহকেও তিনি দেবালয়ের শুচিতায় পরিচালিত করতেন।

শান্তিপুর থাকাকালীন তিনি প্রতিদিন বিকালে গঙ্গার ধারে এসে বসতেন। পতিতপাবনী গঙ্গার বারিধারার সঙ্গে তাঁর ইষ্ট-চিন্তাধারাও এগিয়ে চলত অসীমের সন্ধানে; ডুবে যেতেন পরম কারুণিক পরমেশ্বরের ধ্যানে। সূর্যাস্তে গঙ্গার শোভা আরও নিবিড়ভাবে বিজয়কৃষ্ণের মনকে আকর্ষণ করত। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, '...রজতময় বালুকারাশির উপর চন্দ্রমার শুভ্রজ্যোতি নিপতিত হইলে কি আশ্চর্য শোভা হয়, তাহা না দেখিলে অনুভব করা যায় না। উপরে ঐ অপূর্ব শোভা, নীচে আবার নির্মল-সলিলা গঙ্গানদী ধীর বেগে মৃদু মৃদু কল্লোলধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে। সেই নির্মল তরঙ্গমালায় চন্দ্রমা শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে।' প্রায় প্রতিদিনই তন্ময় হয়ে এই স্বর্গীয় শোভার সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে পড়তেন। একদিন পূর্ণিমা রাত্রে বিজয়কৃষ্ণ এমনি তন্ময় হয়ে গঙ্গার ধারে বসে আছেন, প্রহরের পর প্রহর পার হয়ে গেছে, তবুও খেয়াল নেই যে নিশা অবসানপ্রায়। ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি যেন অনুভব করলেন জগজ্জননীর শুভস্পর্শ, শুনলেন কল্যাণময়ী বাণী, 'ভক্তি ও প্রেম বিনা ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ নাই, কিন্তু মানুষ তুচ্ছভাব লইয়া মানুষকে ঘৃণা করিতেছে।' পুলকিত হন বিজয়কৃষ্ণ; জগজ্জননীর নির্দেশ যে তাঁরই অন্তরের কথা! তিনি অচিরেই কলিকাতা গিয়ে বন্ধুদের কাছে এই সত্য উদ্‌ঘাটন করবেন।

এদিকে বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুর চলে যাওয়ায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার সর্বময় দায়িত্ব কেশবচন্দ্রের উপর পড়ে। কেশবচন্দ্র ভালভাবেই জানেন বিজয়কৃষ্ণের মানসিক অবস্থা। কলিকাতায় ধর্মসাধনের পক্ষে বিরূপ আবহাওয়া দেখেই শান্তিকামী বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুর গিয়ে ব্রহ্মোপাসনায় রত আছেন। এই তিক্ত আবহাওয়া প্রশমিত হলেই বিজয়কৃষ্ণ অচিরে কলিকাতা চলে আসবেন। বিজয়কৃষ্ণের প্রতি অগাধ বিশ্বাস কেশবচন্দ্রের। তিনি ব্রাহ্মবন্ধুগণকে উপদেশস্থলে প্রায়ই বিজয়কৃষ্ণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার কথা বলতেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণ যেন কোন অবস্থাতেই আদি সমাজের কারও প্রতি অসৌজন্যমূলক ব্যবহার না করেন, তাঁরা যেন অন্যায় ও প্ররোচনা সত্ত্বেও নীরব থেকে ব্রহ্মোপাসনায় মনঃসংযোগ করেন। কেশবচন্দ্রের এই উদার প্রেরণা ও আন্তরিক আবেদনে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অনুবর্তীরা অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যথেষ্ট সংযম ও ধর্মসাধনার পথে নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন। তাঁরা সমস্ত মান-অপমানের কথা ভুলে গেলেন। সপ্তাহে একদিন তাঁরা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর উপদেশ শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ধর্মজীবন-সাধনার পথে দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা, তাঁর সুমধুর প্রাণবন্ত উপদেশ যে তাঁদের জীবন-সাধনার পথে অমূল্য বাণী বহন করে! তাঁরা প্রথম দিনই মহর্ষিকে ব্রহ্মদর্শন সম্পর্কে তাঁর আপন উপলব্ধির কথা বলতে অনুরোধ করেন। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' শুধু তো কথার কথা নয়; সাধনার স্তরে অনেক উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হলেই এই মহান সত্যের উপলব্ধি হতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের আশা নবীন ব্রাহ্মগণ যেন এমন উন্নত অবস্থার অধিকারী হন। তাই তাঁদের মনে

ব্রহ্ম সম্পর্কে অনুরাগ সৃষ্টিমানসে একটু বিস্ময়ের সুরেই বললেন, 'কি! তোমরা ব্রহ্মদর্শন কর নাই? ব্রহ্মদর্শন না করিয়া ব্রাহ্ম হইলে কিরূপে?' নবীন ব্রাহ্মগণ নিজেদের দৈন্য স্বীকার করলেন, ধর্মসাধন-প্রসঙ্গে নিজেরা যে আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করবেন সে প্রতিশ্রুতিও তাঁরা দেবেন্দ্রনাথকে দিয়ে এলেন। প্রতিশ্রুতি কাজেও প্রতিফলিত হল। নিবিড়ভাবে সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য মনে-প্রাণে ধ্যান ও উপাসনা শুরু করলেন নবীন ব্রাহ্মগণ। তাঁদের উপলব্ধি করতে হবে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের স্বরূপ। এই মহান তত্ত্ব যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান ও উপাসনায় ব্রতী হলেন। দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে এই ধর্মার্থী যুবকদের আধ্যাত্মিক পিপাসা দিন দিন বেড়ে গেল। একদিন মহর্ষিদেব বললেন, 'তোমাদিগকে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, ঈশ্বর দর্শন না হইলে পানভোজন করিবে না।' ফলে অনেকে সারাদিন উপবাসী থেকে প্রার্থনা ও আরাধনায় দিন যাপন আরম্ভ করলেন। এই যাতায়াতের ফলে আদি সমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মবন্ধুগণের মধ্যে আবার সরস ভাবের উদয় হতে থাকল। নবীনেরা আদি সমাজের অনুবর্তীদের অগ্রজের প্রাপ্য সম্মান দেখাতে শুরু করলেন। ১২৭৪ সালের ভাদ্র মাসে কলিকাতা ফিরে নব্যদলকে সাধনভজনে উন্মুখ দেখে বিজয়কৃষ্ণের মন তৃপ্তিতে ভরে যায়; অন্তরঙ্গ ব্রাহ্মবন্ধুগণকে তিনি একদিন তাঁর শান্তিপুর-জীবনের প্রেম-ভক্তির পরমানুভূতির কথাটিও জানান।

ব্রাহ্মসমাজে কীর্তন-প্রসঙ্গ

বিজয়কৃষ্ণের অগ্রজ ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয় ছিলেন ভাবে ভোলা, নামে পাগল এক আনন্দময় পুরুষ। উভয়ের মধ্যে আন্তরিক স্নেহপ্রীতি ও ভালবাসা ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ়। অনুজকে এই সরল প্রকৃতির মানুষটি একটু সমীহ করেই চলতেন। অনুজ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়ে উপবীত ত্যাগ করার সময় তিনি সমাজভয়ে প্রকাশ্যে সাময়িক রূঢ় ব্যবহার করলেও তাঁর অন্তরের গভীরে স্নেহপ্রীতির ফল্গুধারা নিত্য বহমান ছিল। উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য ধর্ম ও শাস্ত্র-প্রচার। যুক্তি, বিচার ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে বিদগ্ধ-সমাজে বিজয়কৃষ্ণ আধ্যাত্মিকতায় এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। আর ব্রজগোপাল সাধারণ মানুষের মধ্যে সংকীর্তন ও কথকতার মাধ্যমে করেন ধর্মভাবের সঞ্চার। ব্রজগোপাল ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক। শান্তিপুরের তারণ গোঁসাইর কাছে তিনি নিয়েছিলেন কথকতার পাঠ। শেষ রাত্রে তাঁর ঊষাকীর্তনে শান্তিপুরবাসীরা মুগ্ধ হতেন। কেশববাবু তাঁর কীর্তন শোনায় জন্য দুই-তিনবার শান্তিপুর যান। তাঁর ভক্তিরস-সমৃদ্ধ কথকতা, আর তাল-লয়-সমন্বিত সুমধুর সঙ্গীত শ্রোতাদের অভিভূত করত। তিনি যেখানেই কথকতা করতেন সেখানে আনন্দের হাট বসত। কথকতা সমাপ্তির মুখে প্রতিটি আসরই হরিনামে হয়ে উঠত 'শ্রীবাস-অঙ্গন'।

শান্তিপুর থেকে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় ফিরে আসার কয়েক দিন পরই ব্রজগোপাল গোস্বামীও কলিকাতা আসেন এবং বিজয়কৃষ্ণের বাসগৃহেই ওঠেন। একদিন দাদার সুললিত কণ্ঠে এই সংকীর্তনটি শুনে তাঁর প্রগাঢ় ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়—

কানু, পরশমণি আমার।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দর্শন।
বদনের ভূষণ আমার সে রূপ গান,
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন।
ভূষণের কি আর বাকী আছে?
আমি কৃষ্ণচন্দ্র হার পরেছি গলে।

বিজয়কৃষ্ণ মনে করেন, ব্রাহ্মসমাজে কীর্তন প্রচলিত হলে, ব্রাহ্মদের ধর্মজীবনে ভক্তিভাবের স্ফুরণ হবে। কেশববাবুর কাছে তিনি প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র এ বিষয়ে বিজয়কৃষ্ণকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। উভয়ে একদিন উল্টাডাঙ্গার মনোহরদাস বাবাজীকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কীর্তন গাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। ১২৭৪ সনের ২৩ আশ্বিন এই সমাজে সংকীর্তন প্রবর্তিত হয়। মনোহরদাস বাবাজী গাইলেন—

প্রেম পরশমণি শ্রীশচীনন্দন,
বিলাইছেন প্রেমসুধা হেরি দীনহীনজন।

অপূর্ব রসসঞ্চার হয় ব্রাহ্মদের মধ্যে। শচীসুত-প্রবর্তিত কলির কলুষহারী সর্বমঙ্গলপ্রদ সংকীর্তন শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত হল। কলিকাতা-সমাজের অনুকরণে খোলকরতাল-সংযোগে কীর্তনের প্রচলন হল বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে। দেবেন্দ্রনাথও আদি ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্তন প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মসমাজের উপযোগী করে দুইখানা কীর্তন গান রচনা করেন বিজয়কৃষ্ণ—

১. পাপে মলিন মোরা চল সবে ভাই, পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা ভকতবৎসল, উদ্ধারেন পাপীজনে দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসার-পাথারে, পতিত দেখিয়া দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর না আর ভুলিয়ে মায়ায়, ত্বরিত লইগে চল, তাঁর পদাশ্রয় রে।

২. পতিতপাবন ভকতজীবন অখিলতারণ বলরে সবাই।
বলরে বলরে বলরে সবাই যাঁরে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে।
যাঁরে ডাকলে পাপী তরে যাবে, ওরে এমন নাম আর পাবি না রে।

১২৭৪ সালের ৯ অগ্রহায়ণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে। বিজয়কৃষ্ণের মনে হয় তিনি যেন স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে বসে পরব্রহ্মের অর্চনায় বৃত হয়েছেন। এই সময় তিনি একটি গান রচনা করেন—

এতদিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ-রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নববেশে দিনমণি॥
দেখে পাপেতে কাতর, সর্বজনে জর জর।
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি॥
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর পরাক্রমে।
ঊর্ধ্বদিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি,
জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি॥

এইবার মাঘোৎসবে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ প্রথম নগ্নপদে নগর-সংকীর্তনে বের হন—

'তোরা আয়রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।' ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল-বিরচিত এই গানটি গেয়ে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ নগর-সংকীর্তন করেন। উৎসবে অনেকেরই মনের পরিবর্তন হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজে কীর্তন-প্রবর্তনে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে 'নেড়ার দল' বলে বিদ্রূপ করতেন। এই উৎসবে তাঁরও মনের পরিবর্তন হয়। তিনি লিখেছেন, 'আমি এতদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে নেড়ার দল মনে করিয়া উহা হইতে দূরে থাকিতাম। এইবারের উৎসবে ও কীর্তনে আমার পরিবর্তন হইল। আমার ন্যায় আরও অনেক ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হইলেন। উৎসবের সময় একদিন কলুটোলায় কেশববাবুর বাড়ীতে যাই, বিজয়বাবু আমাকে দেখিয়া আমার গলা ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তারপর উপাসনা হইল, তাঁহার আলিঙ্গনে আমি তথাকার উপাসনায় রহিলাম এবং তদবধি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত ছিলাম। বিজয়বাবু তাঁহার প্রেমালিঙ্গনে আমাকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত করিয়া লইলেন।'

কীর্তনানন্দে ব্রাহ্মসমাজের সর্বত্র ভক্তির তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল। বিজয়কৃষ্ণ এই সময়ে আর একটি সঙ্গীত রচনা করেন—

প্রভু দয়াল, সাধু মুখে আমি শুনেছি,
অকূল পাথারে পড়ে ডাক্‌তেছি।
আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও হে কেশে ধরি,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি।
তুমি করিয়ে অধম তারণ, নাম ধর পতিতপাবন,
তা ত অধমজনা হতে জেনেছি।
করিতে পাপী উদ্ধার, হয়েছ প্রকাশ এবার,
মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর?
প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা কি এমন হয়,
আমি পাপার্ণবেতে ডুবে রয়েছি।

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশী-রচিত গানটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী; এর প্রচার হয় ঘরে-ঘরে। সর্বজনের নিকট এই গানটি বিশেষভাবে হয় সমাদৃত।—

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হইয়ে মগন ভুলিছ আপন জনে?
সত্য-পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্বস্ব শোষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী, শম দম দুইজনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথ ভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ সে পান্থনিবাসিগণে;

যদি দেখ পথ ভয়ের আকার, প্রাণপণে দিয়ো দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে।

এদিকে কলিকাতায় খবর আসে, ময়মনসিংহে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ১২৭২ সালে কেশববাবু ব্রাহ্মধর্মের যে প্রাণ-সঞ্চার করেছিলেন, তা যেন দিন দিন স্তিমিত হয়ে আসছে। ১২৭৪ সালে কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের পর বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে ঢাকায় গিয়ে ব্রজসুন্দরবাবুর আরমানিটোলার বাড়ীতে ওঠেন। ঢাকায়ও মাঘোৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। উৎসব সমাপনান্তে নবকুমার বাগচি মহাশয়ের উপর পত্নী ও শাশুড়ীর দেখাশোনার ভার দিয়ে বিজয়কৃষ্ণ ময়মনসিংহ যান। বিজয়কৃষ্ণের গুণমুগ্ধ মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বালিয়াটির জমিদার ব্রজেন্দ্র রায়চৌধুরীর ম্যানেজার মহেশচন্দ্র বিশ্বাস খাজাঞ্চি নবকুমারবাবুকে বলে রেখেছিলেন, প্রয়োজন হলে গোঁসাইজীর সংসার-খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা ক্যাশ থেকে তিনি নিতে পারেন। এর অধিক প্রয়োজন হলে অনুমতি নিতে হবে। বিজয়কৃষ্ণ বা যোগমায়া দেবী বা অপর কাহারও এসব জানা ছিল না। কখনও কখনও এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করলেও নবকুমারবাবু তা পরিশোধ করে দিতেন সময় ও সুযোগ মত।

ময়মনসিংহ পৌঁছে বিজয়কৃষ্ণ প্রায় তিন সপ্তাহে ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’ ‘উপাসনা’, ‘পবিত্রতা’, ‘পৌত্তলিকতা’ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এতে যেন মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করে, ব্রাহ্মদের যেন পুনর্জীবন হয়। ঢাকায় ফিরে এসে ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্তনের প্রেরণা জোগান। কেহ কেহ কীর্তনের বিরোধিতা করেন। তা সত্ত্বেও সমাজে দিন দিন সংকীর্তনের প্রসার বেড়ে চলে। ১২৭৫ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত প্রায় সাত মাস বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় থাকেন। এ সময় তিনি চিকিৎসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।

বিজয়কৃষ্ণের প্রথম সন্তানের জন্ম হয় ঢাকায় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের গৃহে। কন্যারত্ন লাভ করে পিতা প্রীত হন। আদর করে নাম রাখেন সন্তোষিণী। ব্রজসুন্দরবাবু ঢাকায় বদলি হয়ে এলে বিজয়কৃষ্ণ পাতলা খাঁর গলিতে একটি বাসা ভাড়া করে ওখানে উঠে যান। ভাদ্র মাসে (১২৭৫) কেশববাবু খবর পাঠান, বিজয়কৃষ্ণ অবিলম্বে যেন কলিকাতা পৌঁছেন। পরিবার ঢাকায় রেখে তিনি কলিকাতা রওনা হন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে অন্তর্বিরোধ ও সংহতি

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমশ প্রসারিত হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমবর্ধমান ধর্মার্থী জীবনজিজ্ঞাসুদের নিয়ে সমাজের শাখা-প্রশাখা সংগঠিত হচ্ছে। ধর্মজীবন-সাধনার ক্ষেত্রে যেন মরা গাঙ্গে নূতন করে জোয়ার এসেছে। ধর্মপ্রচার চলছে নানাদিকে, এবার পশ্চিমে। প্রথম মুঙ্গের, পরে এলাহাবাদ। কেশবচন্দ্র সপরিবারে যাবেন, সঙ্গে যাবেন প্রতাপ মজুমদার, যদুনাথ চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন ব্রাহ্মভ্রাতা। বিজয়কৃষ্ণকেও এই পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করবার জন্য কেশবচন্দ্র সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন। তিনিও সম্মত হয়েছেন। ১২৭৫ সালের আশ্বিনের মাঝামাঝি তাঁরা সদলবলে মুঙ্গের যাত্রা করবেন।

সমাজের অনুবর্তীদের মধ্যে ধর্মতত্ত্বের বিশুদ্ধ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে

জ্ঞানোপলব্ধির পথে এসেছে ভক্তির তরঙ্গ। বিজয়কৃষ্ণের কাছে এ নূতন কিছু নয়, তাঁর ভাবগঙ্গায় নূতন জোয়ার এসেছে মাত্র। কেশবচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি, ভক্তিভাব তাঁর সহজাত। পরবর্তীকালে ব্রহ্মবাদী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হলেও ভক্তিভাব তাঁর কোনদিনই ম্লান হয় নি, বরং কালে তা আরও বর্ধিত হয়েছে, ধীর, স্থির ও গভীর; ভাবসমৃদ্ধ তাঁর চিত্তে প্রস্ফুটিত হয়েছে প্রেম ও ভক্তির যুগ্মকমল। ভক্তির রসসাগরে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি সকলকে। চলেছে সংকীর্তন। কীর্তনানন্দে ডুবে 'জীবে দয়া নামে রুচি' মহিমার স্বাদ গ্রহণ করছেন নবীন ব্রাহ্মগণ। 'জগতে ব্রাহ্মধর্মের জয়' ঘোষিত হয়েছে। এবার ভাবগঙ্গার ভগীরথ তাঁরা চলেছেন বাংলার বাইরে।

মুঙ্গেরে অভাবিত সম্বর্ধনা পেলেন তাঁরা। এখানকার ভক্তগণের বেশির ভাগই ছিলেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন। কেশবচন্দ্রের প্রাণবন্ত বক্তৃতা এবং ভাবমদির উপাসনায় উদ্বেলিত হয়ে অনেক বৈষ্ণবভাবাপন্ন ভক্ত তাঁকে নানাভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে থাকেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানভক্তির মানদণ্ড এসে দাঁড়াল বৈষ্ণবীয় ভক্ত ও ভক্তির সরল সীমারেখায়। ব্রহ্মনিষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ মনে আঘাত পান এতে।

অতঃপর এলাহাবাদ। এখানেও কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা ও উপাসনা সকলকে মাতিয়ে তুলল; উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নেই, সবার মনই শ্রদ্ধা ও ভক্তি রসে আপ্লুত, সবাই আনন্দে আত্মহারা। এখানেও অনেকে আনন্দে অধীর হয়ে ভক্ত ও ভগবানে মিলিয়ে ফেললেন, ব্যাকুল হৃদয়ে কেশবচন্দ্রের পদযুগল ধরে কাঁদতে থাকলেন।

ভক্তির এই আতিশয্য ও বাহ্যপ্রকাশ স্বভাবতই অনেকের ভাল লাগে নি, ভাল বোধ করেন নি বিজয়কৃষ্ণও। এ যে ভ্রান্ত পথে চলেছে জীবনের পরমাশ্রিত ব্রহ্মসাধনা। এর উপর আবার সেই দিনই রাত্রে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মুখে অব্রাহ্মজনোচিত উক্তি শুনে বিজয়কৃষ্ণ খুবই অস্বস্তিবোধ করেন। সত্যের উপাসক তিনি, জীবনে ভাবের ঘরে অ-ভাব ঢুকতে দেন নি কোনদিনই।

সত্য যেখানে উপেক্ষিত, শক্তির যেখানে অপপ্রয়োগ, নীতির যেখানে লাঞ্ছনা, সেখানে স্থান-কাল-পাত্র বিচার না করে তার প্রতিবাদ করাই বিজয়কৃষ্ণের স্বভাব। স্বার্থহানি, প্রভাবনাশ, বন্ধুবিচ্ছেদ কোন কিছুই তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। এক্ষেত্রেও তাই হল। কেশববাবুকে তিনি সংগোপনে চিঠি দিলেন, 'শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপবাবু গত রজনীতে উৎসবের পর বলিয়াছেন যে, আপনার চরণ আশ্রয় না করিলে মনুষ্যের পরিত্রাণ নাই। ইহা ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধ কথা। প্রতাপবাবু প্রকারান্তরে মনুষ্যপূজা প্রচার করিয়াছেন। আমি ব্রাহ্মধর্মে শিক্ষা করিয়াছি অনন্ত করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহ মনুষ্যের পরিত্রাতা নাই। ঈশ্বর করুণা করিতে অক্ষম হইয়া মনুষ্যের প্রতি পরিত্রাণের ভার দেন নাই। মনুষ্যকে পরিত্রাতা বলা যদি এখনকার মত হয়, তবে আমি বাধ্য হইয়া আপনাদিগের সমাজে যোগ দিতে অক্ষম হইব।' (সোমবার, ২৭ আশ্বিন, ১২৭৫/প্রয়াগ)

কেশবচন্দ্র সংগোপনে তাঁকে লিখে জানান, 'একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত মনুষ্যের পরিত্রাতা নাই, যিনি ইহা বিশ্বাস করেন তিনি-ই ব্রাহ্ম। মনুষ্যকে পরিত্রাতা বলিলে কুসংস্কার হয়, ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধ কার্য হয়। আমি যদি কখন আমাকে পরিত্রাতা বলিয়া থাকি তবে আমাকে উৎপীড়ন কর, পরের কথার জন্য আমি দায়ী নহি। ভক্তির অপব্যবহারে পৌত্তলিকতা হয়, সত্যের অপব্যবহারে নাস্তিকতা

হয়। অতএব সত্যময়ী ভক্তি মধ্যপথ, ইহার বাঁয়ে পৌত্তলিকতা, দক্ষিণে নাস্তিকতা। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কতকগুলি পৌত্তলিক হইতেছেন, কতকগুলি নাস্তিক হইতেছেন। মধ্যপথ বোধ হয় কেহই অবলম্বন করেন নাই। মধ্যপথে না আসিলে প্রকৃত শান্তি নাই।' বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের মনের অবস্থা জানতে পেরে অনেকটা স্বস্তিবোধ করলেন, কিন্তু ঠিক নিরুদ্বিগ্ন হতে পারলেন না ব্রাহ্মভ্রাতাগণের চালচলন ও গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকার্য নিয়মিতই চলছে, বরং একটু জোরের সঙ্গেই চলছে। এলাহাবাদ খ্রীস্টান মিশনারীগণের একটি শক্ত ঘাঁটি। ব্রাহ্মপ্রচারকগণের অসামান্য জনপ্রিয়তায় মিশনারীগণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। এতদিন সরকারী আনুকূল্যে রাজকীয় ধর্মপ্রচারকার্যে তেমন বাধা তাঁরা কোথাও বড় একটা পান নি, ভাবতেও পারেন নি যে এমন অবস্থা দাঁড়াবে। তাঁরা দেখেছেন, দেশীয় ধর্মসম্প্রদায়গুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বসাধারণের মনে যথার্থ চেতনা ও জীবনজিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন নি; অথচ এই নবীন সম্প্রদায় অল্পদিনের মধ্যেই একটি বলিষ্ঠ চেতনা ও আন্তরিক ধর্মপ্রাণতা জাগিয়ে তুলেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের আমল থেকেই চলেছে এর প্রস্তুতি, এখন এই সম্প্রসারিত ব্রাহ্মধর্মের প্রচার-আন্দোলন একটা বিরাট দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের কাছে। বাঙালি-অবাঙালি শিক্ষিত সমাজ থেকে এখন আর কেউ বড় একটা খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করছেন না; তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংস্কারমুক্ত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করছেন। এ অবস্থা বিনা বাধায় স্বীকার করে নিলে ভারতে খ্রীস্টান ধর্মপ্রচার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তাঁরা, তাই তার উপযুক্ত সমাধানের প্রশ্নে স্বদেশ থেকে নামকরা সমস্ত পণ্ডিত মিশনারীগণকে ভারতে ধর্মপ্রচারকার্যে পাঠাতে শুরু করেছিলেন। এলাহাবাদে ব্রাহ্মপ্রচারকগণের অবস্থান-সময়ে একজন বিশিষ্ট খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারক বিলেত থেকে বোম্বে এসে পৌঁছেন। স্থানীয় মিশনারীগণ এই সংবাদ পেয়ে তাঁকে জরুরী বার্তা পাঠিয়ে এলাহাবাদ নিয়ে আসেন। বড় আশা, এখানেই যদি ব্রাহ্মধর্মের এই অন্যতম প্রবক্তাগণকে ধর্মবিষয়ক তর্কযুদ্ধে কোন প্রকারে কোণঠাসা করে দিতে পারেন, তাহলে সমগ্র ভারতে খ্রীস্টানদের জয়যাত্রা অনেকটা সহজ ও সরল হতে পারবে।

একদিন সত্যিই এই খ্রীস্টান মিশনারী পণ্ডিত ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকগণের আবাসে এসে উপস্থিত হলেন। প্রচারকগণ সবেমাত্র উপাসনা শেষ করে উঠেছেন; বিজয়কৃষ্ণ তখনও আসনে উপবিষ্ট, চক্ষু নিমীলিত। উপাসনার প্রভাব তখনও তাঁর কাটে নি, তখনও অনেকটা ধ্যানমগ্ন ভাব রয়েছে। আগন্তুক মিশনারী পণ্ডিত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বিজয়কৃষ্ণের দিকে। কেশবচন্দ্র একটু এগিয়ে এলে মিশনারী পণ্ডিত তাঁকে বললেন, 'আমি মনেপ্রাণে জানি ও বিশ্বাস করি যীশু খ্রীস্ট ভিন্ন জগতের উপাস্য আর কেহ নেই। এ নিয়ে আমি উপাসনারত ভদ্রলোকের ধ্যানভঙ্গ হলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।' বিজয়কৃষ্ণ একটু পরে চোখ মেলে তাকালে কেশববাবু তাঁকে সাহেবের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। বিজয়কৃষ্ণ আগন্তুককে অভিবাদন করে তাঁর পাশে গিয়ে বসেন। তিনি বাংলা বুঝেন বলায় বিজয়কৃষ্ণ বিনীতভাবে তাঁকে বলেন, 'আপনার সঙ্গে আলোচনার পূর্বে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন—১. ধর্ম কাহাকে বলে? ২. ধর্মের উৎপত্তিস্থান কোথায়? ৩. আত্মা কাহাকে বলে এবং তার স্বরূপ কি? ৪. সত্য কি বস্তু এবং সত্য কাহাকে বলে? ৫. মায়া কি বস্তু এবং মায়া

কাহাকে বলে? ৬. অসত্য কি এবং পাপ কি?' ধার্মিক ও উদারমনা পাদ্রীসাহেব অকপটে স্বীকার করেন যে, যীশু এবং বাইবেলের বাইরে তাঁর কিছু জানা নেই। এসব প্রশ্ন আর কেহ তাঁকে কখনও করেন নি। কেশববাবু তখন পাদ্রী সাহেবকে বলেন, 'সাহেব, এ দেশের নাম ভারতবর্ষ। এ দেশ থেকে ধর্ম ও সভ্যতা গ্রীস হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তোমাদের ইউরোপে। যীশুরও জন্ম আমাদের এশিয়ায়। তাঁকেও আমরা শ্রদ্ধা-ভক্তি করি। এখানে যদি খ্রীস্টধর্ম প্রচার করাই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ভারতীয় আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহেও তোমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকা প্রয়োজন।' এসব কথাবার্তার কিছুদিন পরই সাহেব তাঁর স্বদেশে ফিরে যান।

কার্তিক মাসে (১২৭৫) ব্রাহ্ম প্রচারকেরা কলিকাতার পথে আবার আসেন মুঙ্গের। ভক্তি-প্রকাশ আর বিনয়-প্রকাশের আবার দেখা যায় বাড়াবাড়ি; ভক্তপদরজ নিয়ে কাড়াকাড়ি। কেশববাবু এসব দেখেও দেখেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'কারও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা আমি সমীচীন মনে করি না।' কলিকাতা পৌঁছে বিজয়কৃষ্ণ আর যদুনাথ চক্রবর্তী 'ডেইলী নিউজ' আর 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় ঐ ঘটনার যথাযথ বিবৃতি প্রকাশ করেন। বাগ্‌বিতণ্ডায় আবহাওয়া হয়ে ওঠে বেশ উত্তপ্ত। আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে সমালোচনার কদর্থ হয়।

বিরূপ পরিবেশ থেকে দূরে থাকার জন্য বিজয়কৃষ্ণ ফিরে যান শান্তিপুর। চিকিৎসাকর্মে করেন আত্মনিয়োগ। নবকুমার বাগচি গোঁসাইজীর পরিবার নিয়ে আসেন শান্তিপুর।

এখানে শ্যামসুন্দরের মন্দির থেকে উধাও হল একদিন রাত্রে রাধারাণীর মুকুট। কিন্তু ভয় ও সংস্কারবশে প্রাঙ্গণের ঝোপের আড়ালে চোর মুকুটটি রেখে যায়। বাড়ীময় হারানো মুকুট নিয়ে হৈ-চৈ হয়। বিজয়কৃষ্ণ তখন ব্রহ্মনামে ডুবে আছেন। রাধারাণী তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়ে মুকুটের সন্ধান তাঁকে বলে যান। ঝোপের মধ্যে খুঁজতেই মুকুট পাওয়া যায়।

কেশবচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা) ঢাকার ব্রাহ্মদের অনুরোধে শান্তিপুর গিয়ে বিজয়কৃষ্ণকে কলিকাতা এসে প্রচারের ভার নেবার জন্য অনুরোধ করেন। বিজয়কৃষ্ণ নীরব থাকেন। এই সময় একদিন শ্যামসুন্দর প্রকট হয়ে বিজয়কৃষ্ণকে বলেন, 'তুই শান্তিপুর ছেড়ে যা; ঘর থেকে তোকে বের করলুম, আবার ফিরে এলি কেন?' এরপর কয়েকদিন যেতে না যেতে আসে কেশববাবুর চিঠি। বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতা ফিরে যান। কলিকাতা পৌঁছেই (১২৭৬ সালের ১৬ আষাঢ়ের ধর্মতত্ত্বে) বিজয়কৃষ্ণ অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য একখানি পত্র প্রকাশ করেন—

'ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি কয়েকজন ব্রাহ্মভ্রাতার ভক্তিপ্রকাশে আতিশয্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া, তন্নিবারণের জন্য আমি বিগত কার্তিক মাসে উহা সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে এই ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে মহা আন্দোলন হইতেছে;..............অবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বৃদ্ধি হইতেছে।............অতএব ইহার অনিষ্ট ফল নিবারণের জন্য আমার এ সময় চেষ্টা পাওয়া কর্তব্য।.........ঈশ্বর করুন যেন এই পত্র দ্বারা সকলের সন্দেহ দূর হয় এবং সকলের মধ্যে সত্য ও সদ্ভাব বিস্তার হয়।

আমি পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে উল্লিখিত ভ্রাতারা যে প্রণালীতে ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহা আমার বিবেচনায় দূষণীয় ও অনিষ্টকর।.........এইরূপ বাহ্যিক ব্যবহার মনুষ্যের প্রতি যতই অল্প হয় ততই ভাল।.................

ভক্তিভাজন কেশববাবুর প্রতি আমি কখনই দোষারোপ করি নাই। অপর ভ্রাতারা তাঁহাকে সম্মানার্থ যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনি তজ্জন্য দায়ী নহেন।......বরং ইহা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহা অনেকবার বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে তৎকালে ঐরূপ সম্মান প্রকাশে নিষেধ করেন নাই, তাঁহার কেবল এইটুকু ত্রুটি আমি দেখিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত বর্তমান আন্দোলনে তাঁহার অণুমাত্র অপরাধ নাই, ইহা আমি নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি।

এক্ষণে আমার শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা যদুনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বর্তমান আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হউন।... তাঁহারা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করেন না তখন তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করা অন্যায়। এতকাল যাঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া আমরা আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছি, তাঁহাদিগের সরল সত্য বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগকে নির্যাতন করা অকৃতজ্ঞের কার্য সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভক্তিভাজন কেশববাবুকে যে প্রণালীতে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীতে তাঁহারা অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতাকেও যথাপরিমাণে সম্মান করেন। ইহাদ্বারা তাঁহাদিগের মত সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় না। কারণ সাধুভক্তদিগকে শ্রদ্ধা করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ কার্য। অতএব আসুন পুনর্বার পূর্বের ন্যায় একপরিবারে মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন এবং বিস্তার পূর্বক পরস্পরে অমূল্য ভ্রাতৃসৌহার্দ্য সম্ভোগ করি।.........' (১৫ আষাঢ়, ১২৭৬)

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন, 'বিজয়বাবু যেদিন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন ঐ দিনই গিয়া কেশববাবুর সহিত মিলিত হইলেন এবং ত্রুটি স্বীকার করিলেন। ভ্রম বুঝিবা মাত্র ত্রুটি স্বীকার করিতে আমরা তাঁহার ন্যায় আর কাহাকেও দেখি নাই।' এই প্রসঙ্গেই কলিকাতার ঠাকুরদাস সেন মহাশয় 'মুঙ্গেরের আন্দোলন বিষয়ক পুস্তকে' লিখেছেন, 'কেহ কেহ এইমাত্র বলিতে পারেন তিনি (গোস্বামী মহাশয়) অধীর ও চঞ্চল হইয়া এমন কার্যে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহাদিগের ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টি নিম্নদিকেই ধাবিত হয়। তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের সরল উচ্চভাব গ্রহণে অসমর্থ। তিনি সত্যপ্রিয়। সত্যের অনুরোধে তিনি নিজের মান-মর্যাদার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। সাত আট মাস পূর্বে তিনি যাহা সত্য বোধ করিয়াছিলেন, তখন সেই মত কার্যই করিয়াছিলেন। এক্ষণে অনুসন্ধান দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি হইল, তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রচার করিলেন। লোকে আমাকে কি বলিবে, এই নীচভাব তাঁহার উন্নত মনকে সত্য প্রচারে বাধা দিতে পারিল না। এমন লোক জগতে কয়জন আছেন? মান-মর্যাদাই লোকের সর্বস্ব, কোট্ বজায় রাখা লোকের স্বভাবসিদ্ধ। এই উভয়কেই যিনি তুচ্ছ করিতে পারেন, তিনি যে কেমন লোক, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই জানেন।' অতঃপর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

৭ ভাদ্র, ১২৭৬ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব হয়। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণবিহারী সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় প্রভৃতি একুশজন কৃতবিদ্য যুবক নৈষ্ঠিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ঐ দিনের জীবন্ত উপাসনায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মনে আবার নূতন করে আশার সঞ্চার হয়। সকলেই আনন্দে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মগণ বিশেষ করে কেশববাবু গোঁসাইজীকে ধরেন, তিনি যেন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের কার্যভার গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি রাজী হন না, কারণ ব্রাহ্মসমাজে দলাদলির ভাব থাকলে তাঁর পক্ষে আচার্যের কার্য করা সম্ভব নয়। সকলেই তাঁকে আশ্বাস দেন। তখন তিনি সম্মত হন। এই সময় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক হয়ে যায়। বিজয়কৃষ্ণ ভাদ্র মাসেই (১২৭৬) সপরিবারে ঢাকা গিয়ে আচার্যের কার্যভার গ্রহণ করেন। নবকুমারবাবু পাতলা খাঁ গলির পূর্বের বাড়ীটিই খালি পেয়ে গোঁসাইজীর জন্য ভাড়া করে রেখেছিলেন।

গোঁসাইজী আচার্য হয়ে আসায় ঢাকার ব্রাহ্মদের উৎসাহ ধরে না। ঢাকাতে তখন প্রবীণ ব্রাহ্মের সংখ্যাই বেশী। নব্যদলে বেশীর ভাগ ছাত্র ও যুবক। প্রাচীনেরা বিজয়কৃষ্ণের উপাসনায় এবং বক্তৃতায় বিশেষ মুগ্ধ হলেও তাঁরা সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি বলে কতকগুলি ব্যাপারে তাঁর পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের প্রতি ছাত্র ও যুবকদের ছিল সর্বৈব সমর্থন। অগ্রহায়ণ মাসে (১২৭৬) পূর্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে সমারোহ করে মন্দির-প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হয়। কলিকাতা থেকে কেশববাবু, কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মেরা এই উপলক্ষে ঢাকায় এসে ব্রজসুন্দরবাবুর গৃহে ওঠেন। উৎসবের দিন আরমানিটোলার বাড়ী থেকে তাঁরা খোল-করতাল নিয়ে নগর-সংকীর্তন করে ব্রাহ্ম-মন্দিরে যান। 'তোরা আয়রে ভাই এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম', সংকীর্তনে শহর মাতিয়ে যখন সকলে সমাজ-প্রাঙ্গণে পৌঁছেন, তখন সেই স্বতঃস্ফূর্ত মহোৎসব দেখার জন্য ঢাকা শহর যেন ভেঙ্গে পড়ে। প্রাচীন ব্রাহ্মেরা এই দিনের অনুষ্ঠান দেখে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন সংকীর্তনের মহিমা, বলতে থাকেন, 'ধরাতলে স্বর্গধাম অবতীর্ণ'। এইদিনই কেশববাবুর নিকট প্রায় চল্লিশজন শিক্ষিত যুবক প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অম্বিকাচরণ সেন, রজনীকান্ত ঘোষ, বরদানাথ হালদার, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কালীনারায়ণ রায়, আনন্দচন্দ্র নন্দী ও জালালউদ্দিন মিঞা। গোঁসাইজীর ব্যক্তিগত জীবন ও আচরণে মুগ্ধ হয়েই তাঁরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

তাঁরা সকলে বিজয়কৃষ্ণের ধর্মজীবন দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গোঁসাইজীর প্রাণবন্ত উপাসনা তাঁদের অন্তরে সঞ্চারিত করেছিল মহান আশা ও উদ্দীপনা। তাঁর তখনকার উপদেশ ছিল, 'অসত্য পরিত্যাগ কর, কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সত্যের শরণাপন্ন হও, তবেই সত্যের সাক্ষাৎকার সম্ভব হইবে। মুখে যাহা বল এবং মনে যাহা বিশ্বাস কর, কার্যে তাহা প্রদর্শন কর; তবেই প্রকৃত জীবন লাভ হইবে।' কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা নিজের জীবনে যে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, তা তিনি কখনই অপরকে আচরণ করতে বলতেন না। বিজয়কৃষ্ণের জীবনই ছিল তাঁর বাণী।

তিনি তাঁর চিন্তাধারা মাঝে মাঝে নিবন্ধাকারে 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশ করতেন। 'ভক্তিভাব' সম্পর্কে একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, '......ভক্তি ধর্মের প্রাণ, ভক্তি ধর্মের জীবন, জীবের শান্তি, ভক্তি পাপীর গতি। ভক্তিশূন্য ধর্ম জীবনে স্থান পায় না। সাধনা ভিন্ন মুখের কথায় ভক্তি লাভ হয় না। হৃদয় শুষ্ক হইল বলিয়া চীৎকার করিবে অথচ যত্নপূর্বক সাধনা করিবে না, তাহা হইলে তোমার কপট চীৎকার লোকের বিরক্তিকর হইবে। যে প্রকার সাধনা দ্বারা প্রাচীন ভক্তগণ চিরশান্তি লাভ

করিয়াছেন, এক্ষণ তাহাই আলোচিত হইতেছে।

প্রথম বিনয় : হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অভিমান থাকিতে ভক্তির মুখ দেখিতে পাইবে না। দ্বিতীয় সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা : জীবনে সুখ হইলেও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবে, দুঃখ হইলেও তাঁহারই প্রশংসা করিবে। কারণ তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য সুখ-দুঃখের বিধান করেন। মনুষ্যের সহস্র অপরাধ দেখিয়াও ক্ষমাশীল হইবে, পরের অপকার না করিয়া উপকার করিবে।

বিনয়, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা সাধন দ্বারা মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ বর্ধিত হইবে। যে ব্যক্তি মনুষ্যকে প্রীতি করে না, সে ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে সক্ষম হয় না। যে ধর্মে কেবল মতামত লইয়া দলাদলি, সেই ধর্মে ভক্তি মাত্র নাই। মনুষ্যকে প্রীতি করাই প্রথম প্রকার সাধনের উদ্দেশ্য। সাধনা দ্বারা যেমন বিনীত হইতে হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন ব্রহ্মসাধন করিতে হইবে।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং সখ্যং দাস্যমাত্মনিবেদনম্॥

এই নবাঙ্গ সাধন ভক্তিলাভের প্রধান উপায়। ঈশ্বরের নাম যেখানে আলোচিত হইবে, কীর্তিত হইবে, সেখানে গমন করিয়া শ্রবণ করিতে হইবে। ভাল লাগিতেছে না, ভাষার পরিপাট্য নাই, বলিবার শৃঙ্খলা নাই, সঙ্গীতের সুর ভাল নহে ইহা বলিয়া নাম শ্রবণ পরিত্যাগ করিও না। হৃদয়-বন্ধুর কথা শুনিয়া কি হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে না? যাহাতে পিতার দয়াল নামের মধুরতা হৃদয় উপভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। বিশ্বাসপূর্ণ মনে তাঁহার নাম-কীর্তন করিতে হইবে। তাঁহার নাম গান করিলে, স্মরণ করিলে, হৃদয় পুলকিত হয় পবিত্র হয়।

ব্রাহ্মধর্ম শুষ্ক ধর্ম নহে ভক্তিই ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ। এই ভক্তির হিল্লোল উত্থিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিবে। 'কর সাধন ব্রহ্মের চরণ, যাতে পাবে নিত্য শান্তিনিকেতন।'

এই সময়ই কয়েকজন ব্রাহ্মভ্রাতাসহ গোঁসাইজী প্রচারের কাজে কুমিল্লা গিয়েছিলেন। এক রাত্রে কোন বন্ধুর গৃহে উপাসনা ও নাম-সংকীর্তনের আয়োজন হয়। বিরূপভাবাপন্ন প্রায় একশত লোক ব্রাহ্মভক্তগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ঐ গৃহের চারদিকে একত্রিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য এই ব্রাহ্মদের কুমিল্লা থেকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিতে হবে। ভিতরে উত্তাল কীর্তন চলছে, 'দয়াময় নাম বল রসনা অবিশ্রাম'। কীর্তনের ভক্তিরস আস্বাদনে বাইরের লোকের হৃদয়ও গলে যায়। ব্রাহ্মদের আর তাড়ান হয় না। অনুতপ্ত হয়ে তারা স্ব-স্ব গৃহে ফিরে যায়।

১২৭৬ সালের অগ্রহায়ণের শেষের দিকে গোঁসাইজী প্রচারের কাজে ময়মনসিংহ যান। অনেকেই তাঁর মুখে কীর্তন শুনে আকৃষ্ট হন। তিনি নিজেও উৎসাহীদের কীর্তন শেখাতেন। ব্রহ্মজ্ঞানীরা খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন করবেন, এই খবর পেয়ে সমাজগৃহে আর লোক ধরে না। বিজয়কৃষ্ণের অগ্নিময়ী বক্তৃতা, প্রাণস্পর্শী উপাসনা আর ভক্তিরসসিঞ্চিত কীর্তন শুনে সকলে মুগ্ধ। লোকের মুখে মুখে তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বিজয়কৃষ্ণ শুধু কীর্তনানন্দে সকলকে মাতিয়ে তুলতেন তাই নয়, তিনি নিজেও ভাবে বিভোর হয়ে পড়তেন। এই অবস্থায় তিনি কয়েকটি সঙ্গীত রচনাও করেছিলেন। তার একটি গান—

সকল শূন্যময় হেরি, না হেরিয়ে বিভু নয়নে।
আমার হৃদয় শুকায়ে গেল হে (এ)।

শুনেছি সাধুসদনে, চায় যে তাঁরে,
তাঁহারে দেখিতে পায় নিজ অন্তরে।
আমি ডাকিতে পারি না মোহে, পাইব কেমনে।
পড়েছি অগাধ কূপে, না দেখি উপায়,
বিনা সেই করুণাসিন্ধু প্রভু দয়াময়;
তাঁর নামের গুণে পাপী তরে, শুনেছি শ্রবণে।

ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলা ও আসামে বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মনাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। চিকিৎসাবৃত্তিতে নিশ্চিত অর্থাগম, নির্ঝঞ্ঝাট গার্হস্থ্য জীবন, অপত্যস্নেহ, কিছুই তাঁকে তাঁর আরব্ধ কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে নি। এই নিঃস্বার্থ জনকল্যাণের অভিযানে কতবার যে তিনি জীবনসংশয় ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তথাপি প্রচারকার্যে উৎসাহ-উদ্যমের বিরতি হয় নি, ভাটা পড়ে নি। 'অনাথের দৈব সখা' এই প্রবাদ বচনে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে মা ভৈঃ বলে তিনি প্রচারে বের হতেন। একবার ডিঙ্গি নৌকা করে ময়মনসিংহ জেলায় কাগমারি যাবার পথে তিনি নদীতে ঝড়-তুফানের মধ্যে পড়েন। ডিঙ্গি ডুবে যায়। মাঝিমাল্লা কে কোথায় ভেসে যায়। দৈবক্রমে ডিঙ্গির মাস্তুলটি হাতের নাগালের কাছে পান বিজয়কৃষ্ণ। তাই ধরে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে থাকেন তিনি। মনে হয় যেন ডিঙ্গিটি ডুবে গেলেও এগিয়ে চলেছে। এই সময়েই সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেন বিজয়কৃষ্ণ। জ্ঞান ফেরার পর দেখেন জেলেরা তাঁকে আগুন দিয়ে সেঁকছে। একটু সুস্থ হয়ে উঠলে জেলেরা বলে, 'ঝড়ের সময় ডিঙ্গিখানি চড়ার কাছে ডুবতে দেখি। ঝড় থামলে পর চড়ায় ডিঙ্গিসহ আপনাকে দেখতে পাই। ডিঙ্গির মাস্তুল আপনার হাতে ধরা রয়েছে। ভগবানের দয়া। তাঁরই কৃপায় এ-যাত্রায় আপনি জীবন ফিরে পেয়েছেন, তিনি আপনাকে ডিঙ্গিসহ চড়ায় এনে রেখে গেছেন। জলে ডুবেছিলেন আপনি, অথচ এক ফোঁটা জলও আপনার পেটে যায় নি। ভগবানের কৃপায় সবই সম্ভব।'

আর একবার ময়মনসিংহ থেকে বিজয়কৃষ্ণ শেরপুর চলেছেন। হাঁটাপথে চলেছেন, একজন পথপ্রদর্শকও সঙ্গে আছেন। গ্রামের পথ, মাঝে মাঝেই জলাভূমি আবার অরণ্যপথও। এবার এই পথেই তিনি এক বন্য-মহিষের কবলে পড়েন। নদীর ধার বেয়ে বালুর চড়ায় কাশবন। দূরের কিছুই নজরে আসে না। এরই মধ্যে মানুষের পায়েহাঁটা পথে চলেছেন বিজয়কৃষ্ণ। হঠাৎ দূরে যেন মনে হল কোন বিরাটকায় জন্তু কাশবনের শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে ছুটে আসছে তাঁদের দিকে। বিরাট বন্য-মহিষ শিং বাগিয়ে দ্রুতগতিতে আসছে দেখে প্রমাদ গণলেন মনে। ব্রহ্মই বিপদবারণ, অগতির গতি। 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্'। তিনিই স্মরণ মননের একমাত্র অবলম্বন বিজয়কৃষ্ণের। কোথা থেকে কি হল, হঠাৎ এক অবিশ্বাস্য ঘূর্ণিঝড় উঠল। পথপ্রদর্শক ও বিজয়কৃষ্ণ উভয়েই ছিটকে পড়লেন এক মাটির গহ্বরে। কুমোরদের খোঁড়া মাটির গহ্বরে আশ্রয় পেলেন পরমাশ্রয়ের অপার কৃপায়। বন্য-মহিষ ক্ষিপ্ত হয়ে দ্বিগুণ বেগে চলে গেল নিবিড় বনের দিকে, তারই চলার পথের ফাঁকে দেখলেন বিজয়কৃষ্ণ, একটি পলায়মান হরিণকে একটি প্রকাণ্ডকায় বাঘ লাফিয়ে ধরতে উদ্যত হয়েছে। বেলাও পড়ে এসেছে প্রায়। ভগবৎ কৃপায় দুটি বন্যজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে খানিকটা আত্মস্থ হয়ে তড়িৎ গতিতে এগিয়ে চললেন যাত্রাপথের দিকে। বেলা থাকতেই তাঁরা গোয়ালাদের বাথানে পৌঁছে গেলেন। গোয়ালাদের প্রদত্ত আহার্য ও

পানীয় দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন দুজনে; তারপর তাদেরই সাহায্যে নিকটবর্তী একটি গ্রামে গিয়ে সেই রাত্রের জন্য আশ্রয় পেলেন তাঁরা।

এমনি আর একবার ঢাকা থেকে স্টীমারে বিজয়কৃষ্ণ শিবসাগর রওনা হয়েছেন। আহার্য বস্তু সঙ্গে কিছু নেই; সম্বল যা ছিল, তাও হারিয়ে ফেলেছেন। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন না বিজয়কৃষ্ণ। আহার্য গ্রহণ ভগবানের অভিপ্রেত নয়, নইলে সঙ্গের সম্বল হারাবেন কেন? অভুক্ত অবস্থাতেই পাঁচ-ছয়দিন কেটে গেল। শরীর দুর্বল হয়ে পড়লেও মানসিক প্রশান্তি হারান নি তিনি। স্টীমারটি একটি ঘাটে নোঙর করেছে। বিজয়কৃষ্ণ আস্তে আস্তে স্টীমার থেকে নেমে নদীর ঘাটে স্নান করলেন, তারপর নদীর পার থেকে কিছুটা পলিমাটি ও জল পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করে নিলেন। সহযাত্রীদের অনেকেই বিজয়কৃষ্ণের এই আচরণ লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরা অনুযোগ তুললেন। কিন্তু সবার মনের অনুযোগই তিনি তাঁর প্রাণভোলান প্রশান্ত হাসিতে উড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত বিনীত ও কৃতজ্ঞচিত্তে ভগবানের বিধানকে মেনে নেবার কথা বললেন। নিজের দৈন্য স্বীকার করে বিজয়কৃষ্ণ তাঁদের বোঝালেন, ভগবানই আমাদের সবার একমাত্র নির্ভরস্থল। আমরা এখানে কারও প্রতি কেউ নির্ভর করে একদণ্ডও চলতে পারি নে, যদি তিনি না আমাদের চালনা করেন। তাঁরই প্রচারকার্য আমি আমার জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছি। আপনারা আমায় আশীর্বাদ করুন, যেন আমি আমার আরব্ধ ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে পারি।

হৃদরোগের আক্রমণ

গোস্বামী মহাশয় ঢাকা থেকে কলিকাতা আসেন একাকী, মাঘোৎসবের বেশ কিছুদিন আগেই। উৎসবের পর পূর্ব ব্যবস্থামত তিনি বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব অভিমুখে রওনা হন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকার্যে।

ঢাকা থেকে আসার সময় বিজয়কৃষ্ণ নবকুমারবাবুকে অনুরোধ করে আসেন, তিনি যেন তাঁর পরিবারের সকলকে রাণাঘাটের নিকটবর্তী কালাইঘাটার নীলকমল দেবের গৃহে পৌঁছিয়ে দেন। তখনও গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেল লাইন হয় নি। কুষ্ঠিয়া থেকে কলিকাতার গাড়ী ধরতে হত। একখানা নৌকা ভাড়া করে নবকুমার বাগচি ও কামিনী গুপ্ত মহাশয় গোঁসাইজীর পরিবারের সকলকে নিয়ে ঢাকা থেকে রওনা হন। গোঁসাইজীর পরিবারের সকলের চলে যাবার কথা শুনে ব্রজসুন্দরবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের পাথেয় বাবদ কিছু টাকা নবকুমারবাবুর হাতে দিয়ে দেন। পথের নানা বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে তাঁদের কুষ্ঠিয়া পৌঁছতে এগার দিন লেগে যায়। তারপর ট্রেনে রাণাঘাট। রাণাঘাট নেমে তাঁরা গোঁসাইজীর বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামশঙ্কর সেনের গৃহে উঠেন। সেখানে একবেলা বিশ্রামের পর নৌকা করে নীলকমলবাবুর নীলকুঠিস্থ বাসগৃহে তাঁদের পৌঁছিয়ে দিয়ে নবকুমারবাবু ও কামিনীবাবু ঢাকায় ফিরে যান।

এদিকে বিজয়কৃষ্ণ মুঙ্গেরে এসে অবস্থান করছেন তাঁর আত্মীয় আনন্দ লাহিড়ীর গৃহে। এখানে 'ব্রাহ্মধর্মের উদারতা' সম্বন্ধে তিনি এক বক্তৃতা করেন। কয়েকদিন মুঙ্গেরে থেকে তিনি মজঃফরপুর যান। ঐখানেও কয়েকটি বক্তৃতা করেন।

একদিন সভার শেষে বিজয়কৃষ্ণকে এক ভদ্রলোক তাঁর গৃহে আহারের আমন্ত্রণ করেন। বিজয়কৃষ্ণ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যথাসময়ে পরের দিন ঐ গৃহে উপস্থিত হলে ভদ্রলোকের সহধর্মিণী তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করেন তিনি তাঁকে চিনতে পেরেছেন কিনা? গোঁসাইজী উত্তর দেন, 'পূর্বে কোথায়ও দেখেছি বলে তো স্মরণ হয় না'। ভদ্রমহিলা বলেন, 'আমার পিত্রালয় শান্তিপুর'। তথাপি তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন না। পরে যখন মহিলাটি বলেন, 'আমার বহুদিনের ব্যাধি যখন কেউ নিরাময় করতে পারেন নি, তখন আপনার নিপুণ চিকিৎসাতেই আমি জীবন ফিরে পাই'। এবার বিজয়কৃষ্ণের সব কথা মনে পড়েছে—স্বপ্নে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই মারাত্মক বিষ দেওয়া প্রেস্‌ক্রিপসনের কথা। সে কথা তিনি ভুলে যান নি, তবে ভুলে গিয়েছিলেন রোগিণীকে। বিজয়কৃষ্ণ কখনও মেয়েদের মুখের দিকে তাকাতেন না। এজন্য তাঁদের চেনা বড় মুস্কিল হত। একবার তো তাঁর এক নিকট-আত্মীয়াকেই তিনি চিনতে না পারায় তাঁকে খুব অনুযোগ শুনতে হয়েছিল।

কাশীতে ডা. লোকনাথ মৈত্রের আমন্ত্রণে তাঁর গৃহে ওঠেন বিজয়কৃষ্ণ। বিজয়কৃষ্ণের উপস্থিতিতে তাঁদের অনেক অসুবিধা হতে পারে মনে করে তিনি মৈত্র মহাশয়কে বলেন, 'দেখুন, আমার সময়ের কোন ঠিকঠিকানা নেই। হয়ত সারাদিন বাইরে বাইরে কাটবে, লোকজন এসে আপনাদের বিরক্ত করবে। এতে আপনাদের খুব অসুবিধা হবে।' তথাপি মৈত্র মহাশয় তাঁকে অন্যত্র যেতে দেন না। আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দেন।

সকালের দিকে বের হয়ে গোঁসাইজী প্রায়ই যেতেন ত্রৈলঙ্গস্বামীর কাছে। প্রথমদিকে কয়েকদিন ত্রৈলঙ্গস্বামী এই নবাগত বাঙালী যুবককে নানাভাবে পরীক্ষা করতেন। গায়ে কখনও কুকুরের বিষ্ঠা, কখনও ময়লা, কখনও বা কাদা মেখে বসে থাকতেন। কাছে গেলে চারদিকে ছড়িয়ে দিতেন। কিন্তু পরে বিজয়কৃষ্ণকে তিনি কাছে ডেকে বসাতেন; আদর করতেন।

অন্ধ্র প্রদেশের ভিজিয়ানায় হোলিয়া গ্রামে দ্বাদশ ব্রাহ্মণের সেবা ও শিব আরাধনার ফলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নরসিংহ রাও ও বিদ্যাবতীর অধিক বয়সে এক পুত্রসন্তান লাভ হয়। শিশুর নাম রাখা হয় শিবরাম। তিনি চিরকুমার। ৫২ বছর বয়সে মাতার মৃত্যু হলে সেই যে শ্মশানে যান আর ফেরেন না। ওখানেই গুরুলাভ হয়। ২৭৮ বছর তিনি মরদেহে ছিলেন; তারপর ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। চলন্ত বিশ্বেশ্বর নামে তিনি কাশীতে খ্যাত ছিলেন। তৈলঙ্গ প্রদেশের সাধু বলে তাঁর নাম হয় ত্রৈলঙ্গস্বামী।

একটু বেলা হতেই স্বামীজী গোঁসাইজীকে ইসারা করে জিজ্ঞাসা করতেন, ক্ষুধা লেগেছে কিনা। ইঙ্গিত মাত্র চার-পাঁচজন ভক্ত গিয়ে খাবার নিয়ে আসতেন। এক একদিন খাবারের পরিমাণ এত বেশী হত যে তাঁর পক্ষে খাওয়া সম্ভব হত না। স্বামীজী তখন নিজের মুখ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতেন, তা হলে তিনিও খাবেন। তাঁর আহারের কোন নির্দিষ্ট সময়, মাত্রা বা পরিমাপ ছিল না। ভক্তেরা খাবার এনে তাঁর মুখের সামনে ধরলেই তিনি মুখব্যাদান করতেন আর তাঁরা তাঁকে খাইয়ে দিতেন। আকণ্ঠ গলাধঃকরণের পর তিনি উদ্গীরণ করে সব ফেলে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন মথুরাবাবুকে নিয়ে কাশী গিয়েছিলেন, তখন স্বামীজীকে আধমণ ক্ষীর খাইয়েছিলেন। অসাধারণ যোগশক্তির প্রভাবে যে কোনো পরিমাণ খাদ্যবস্তু তিনি অনায়াসে জীর্ণ করতে পারতেন। বিজয়কৃষ্ণ তাঁর জন্য মাঝে মাঝে খাবার নিয়ে

যেতেন। একদিন বিজয়কৃষ্ণ নিজের অংশটুকু আলাদা করে বাকীটা স্বামীজীকে নিবেদন করেন। এতে ত্রৈলঙ্গস্বামী খুশি হয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, তুমি খাঁটি সাধু'। যাঁরা খাঁটি সাধু তাঁদের কোনো কুণ্ঠা বা লৌকিকতার মিথ্যা আবরণ থাকে না।

এক এক সময়ও স্বামীজী অসিঘাটে ভুস্ করে ডুব দিতেন আর উঠতেন গিয়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে। গঙ্গার রেখা ধরে ছুটে বিজয়কৃষ্ণ তাঁর অনুসরণ করতেন। একদিন ত্রৈলঙ্গস্বামী গঙ্গাঘাট থেকে উঠে এক কালীমন্দিরে প্রবেশ করেন এবং প্রস্রাব করে দেবীমূর্তি ও শিবলিঙ্গের উপর ছিটিয়ে দেন। বিজয়কৃষ্ণ এ দৃশ্য দেখে হতবুদ্ধি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ সব কি করছেন?' মাটিতে আঙুল দিয়ে সংস্কৃত হরফে লিখেছেন, "গঙ্গোদকম্"। বিজয়কৃষ্ণ বলেন, 'এতে কি হবে?' উত্তর দিলেন ত্রৈলঙ্গস্বামী, 'পূজা'। বিজয়কৃষ্ণ প্রশ্ন করেন, 'কিন্তু পূজার দক্ষিণা?' উত্তর আসে, 'যমালয়'। এই ঘটনার সময় বিগ্রহের সামনে আর কেউ ছিলেন না। পূজারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে স্বামীজীর এই অদ্ভুত আচরণের কথা গোঁসাইজী তাঁকে বলেন। তিনি শুনে মন্তব্য করেন, 'বাবা চলন্ত বিশ্বেশ্বর। তাঁর প্রস্রাব গঙ্গোদক বই কি!'

মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে এক দক্ষিণদেশীয় রাজবাটীর পাশ দিয়ে যাবার সময় রাজা নিজে এসে সানুনয় আহ্বান করে স্বামীজীকে অন্তঃপুরে নিয়ে যান। বিজয়কৃষ্ণের প্রতি অর্থপূর্ণ ভঙ্গিমায় অনুসরণ করতে বললেও তিনি ভিতরে যান না, বাইরে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। রাজা তাঁকে পট্টবাস পরিয়ে সোনার অলঙ্কার ও মুকুট দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বাইরে আসামাত্র গুণ্ডারা সব খুলে নেয়; স্বামীজী নির্বিকার। বিজয়কৃষ্ণকে ইঙ্গিতে তিনি বুঝালেন, 'আমি যেই সেই'। গোঁসাইজী উত্তরে বলেন, 'দুনিয়াদারী লোক কিন্তু কামিনীকাঞ্চন পেলেই খুশি।'

ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রসঙ্গে গোঁসাইজী পরবর্তী এক সময় বলেছিলেন, 'রাত্রিতে অনেক সময় তৈলঙ্গস্বামীর নিকট থাকতাম। তিনি আমাকে নানাপ্রকার অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য দেখাতেন। একদিন বললাম, আপনি আমাকে এত দেখাচ্ছেন—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। দয়া করে আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন বিশ্বাস হয়।' তিনি আমাকে স্নান করে আসতে বলেন। রাত্রি তখন একটা। ভয়ানক শীত। আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। তিনি অমনি আমার ঘাড়টি ধরে আলগা করে তুলে নিয়ে ঝুপ করে গঙ্গায় চুবিয়ে দিলেন; তারপর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বিশ্বাস বন্ যায়'। এ সময়ই স্বামীজী গোঁসাইজীকে দীক্ষা দানের কথা বলায় গোঁসাইজী বলেন, 'আমি ব্রাহ্ম। আমার আর দীক্ষার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া, আপনার কাছে আমি আবার কি দীক্ষা নেব? আপনি শিব পূজা করেন অথচ কালী ও শিবের গায় প্রস্রাব করেন।' স্বামীজী বলেন, 'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।' আবার ইসারা করেন দীক্ষা দেবেন বলে। তিনি তখন নিরুপায় হয়ে বলেন, 'মন্ত্র আমি পেয়েছি।' স্বামীজী জিজ্ঞাসা করেন, 'কে দিয়েছে?' বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'মা'। স্বামীজী বলেন, 'আমিও দেব।' গোঁসাইজী সম্মত হন না। তখন বেড়াল যেমন ইঁদুর ধরে, তেমনই তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'তোমাকে মন্ত্র দেবার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে; যদিও আমি তোমার গুরু নই। তোমার গুরু নির্দিষ্ট রয়েছেন, তিনি সময়ে তোমাকে যথাযথ দীক্ষা দিবেন।' তিনটি মন্ত্র তিনি দেন। প্রথমটি যা গোঁসাইজী কুলপ্রথানুযায়ী মায়ের কাছে পেয়েছিলেন—রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনার মন্ত্র। দ্বিতীয়টি দেহশুদ্ধির। সব সময় এই মন্ত্রটি জপতে বলে দেন। আর তৃতীয়টি আপৎকালের রক্ষা—

মন্ত্র। একমাত্র প্রয়োজনের সময়ই জপ করবার কথা বলেছেন।

কাশী থেকে মথুরা হয়ে শ্রীবৃন্দাবন উপনীত হন বিজয়কৃষ্ণ। এখানে বৈষ্ণবদের অনুরোধে 'চৈতন্য ও পবিত্রতা' সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে বর্ণনা করেন শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা। ব্রাহ্ম সহযোগীরা উদ্বেগ বোধ করেন। বক্তৃতার শেষে একজন ব্রাহ্মভক্ত তাঁকে অনুযোগ করে বলেন, 'আপনি ব্রাহ্মধর্মের আনুকূল্যে বলতে গিয়ে এ কি বললেন?' গোঁসাইজী শিশুর মত সরল মনে তাঁকে বোঝালেন 'আমি ত কল্পনা করে কিছু বলি নি। স্থান-মাহাত্ম্যে যে দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল তাই বলেছি মাত্র।' সর্বত্রই বক্তৃতা ও উপাসনায় সকলকে মুগ্ধ করে তোলেন বিজয়কৃষ্ণ। সর্বত্রই ব্রাহ্মধর্মের জয়পতাকা উড়িয়ে চলেছেন তিনি, কিন্তু তারই মধ্যে যেন মাঝে মাঝে কেমন করে অরূপ থেকে রূপ এসে যায়, যেমনটি এসে গেল এই শ্রীবৃন্দাবনে। এরপর শ্রীবৃন্দাবন থেকে তিনি আগ্রা যান। এখানে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। বিজয়কৃষ্ণ নিজেই 'ধর্মতত্ত্বে' তা প্রকাশ করেছেন।—

'তাজ দর্শনান্তে এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করি। বোধ হইল আমি তাজের প্রাঙ্গণস্থ উদ্যানে গিয়াছে। উদ্যানের পুষ্পবৃক্ষগুলি পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত হইল। সেই অপূর্ব রূপলাবণ্য দর্শনে তাঁহাদিগকে দেবকন্যা মনে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জন্য এই পবিত্র স্থানে আসিয়াছ?" এবং আমি দেখিলাম, তাঁহারা একবার বৃক্ষ আবার স্ত্রীমূর্তি ধারণ করিতেছেন। আমি তাঁহাদের এইরূপ বেশ-পরিবর্তনে বিমুগ্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিলাম এবং পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি আপনাদের নিকট একটি উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছি, ঈশ্বর সর্বব্যাপী তাহা কিরূপে বুঝিব?" তাঁহারা বলিলেন, "তুমি আজও ঈশ্বর বিষয়ে অনভিজ্ঞ? যাঁহার রাজ্যে বাস কর, যাঁহার দয়া ভিন্ন একদণ্ড বাঁচ না, তাঁহার বিষয়ে কোন্ প্রাণে সংশয় করিতেছ?" "আমি একজন ঘোর মূর্খ, কিছুই জানি না; আপনারা উপদেশ দিয়া আমাকে সুখী করুন।" তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আমাদের মত সুন্দরী কোথায়ও দেখিয়াছ?" উত্তর—"না, স্বপ্নেও দেখি নাই।" "একমাত্র ঈশ্বরই আমাদিগকে এত সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। তাঁহার সৌন্দর্যের আভা আমাদের শরীর দিয়া বহির্গত হইতেছে বলিয়া আমাদের এমন শোভা-সৌন্দর্য হইয়াছে। তাঁহার অধিষ্ঠান ভিন্ন কিছুই সুন্দর হইতে পারে না। ইহার গূঢ় অর্থ যদি বুঝিয়া থাক, তবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরকে পরম সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইবে।" ইহা বলিয়া স্ত্রীলোকগুলি বৃক্ষরূপ ধারণ করিল। অপরদিকে চাহিয়া দেখি, শুভ্রশ্মশ্রুধারী কতিপয় বৃদ্ধ কহিতেছেন, "যে ঈশ্বরকে সুন্দর বলিয়া জানিলে, তাঁহাকে প্রাণ বলিয়া জান। কেবল তিনি আমাদের প্রাণরূপে আছেন বলিয়া আমরা এতদূর সারবান হইয়াছি।" ইহা বলিতে বলিতে কেহ কেহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষরূপ ধারণ করিলেন। এই সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি এই স্বপ্নটি দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। পূর্বে যাহা শূন্যমাত্র জ্ঞান হইত, এখন তাহা দয়াময় ঈশ্বরের পবিত্র আবির্ভাবে পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।'

আগ্রা থেকে বিজয়কৃষ্ণ লাহোর যান। আনারকলি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। এখানেও বক্তৃতা ও উপাসনা বেশ জমাট বেঁধে ওঠে। সকলের মনই আনন্দে আপ্লুত, কিন্তু এরই মধ্যে একদিনের একটি ঘটনায় বিজয়কৃষ্ণ খুবই ভাবিত হয়ে পড়েন। তিনি স্বপ্নে একটি মেয়েকে দেখে খুব মুগ্ধ হন এবং বেশ খানিকটা

মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এজন্য। গভীর রাত্রে উপাসনায় বসে এই মনোবিকারের কথা স্মরণ হতেই আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন এবং দারুণ অনুতাপানলে তিনি দগ্ধ হতে থাকেন। এই অবস্থায়ই একটি সঙ্গীত রচনা করেন তিনি। এতে তাঁর মনের ভাবটি ফুটে উঠেছে—

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়?
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়?
শুনি তব নামের গুণে তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে যে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তর যদি দয়াল নামে,
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয়।

অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আকুল প্রাণে গানটি কয়েকবার গাইবার পর তিনি নিজেকে প্রচারকের অনুপযোগী মনে করেন, আত্মহত্যা করে জীবনবিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত হন। সেই গভীর রাত্রে এই উদ্দেশ্যে রাবী নদীর তীরে এক নির্জন স্থানে উপনীত হন। পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা এক ভারী প্রস্তরখণ্ড কণ্ঠ-সংলগ্ন করে নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলে কে একজন বলিষ্ঠ হস্তে তাঁকে ধরে ফেলে বলেন, 'ই এ বাচ্চা, শরীর ছোড়নেসে পাপ প্রবৃত্তি নষ্ট হোগা নেহি। তু ধৈরয ধর্। তেরা ভালা হোগা। যব্ পাপ ছুটেগা, তু কুছ নেহি জানোগে। আভি বহুত্ রোজ দের্ হ্যায়। খোদা সব কাম্‌কা বখৎ ঠিক কর রাখা। বাতাস্‌সে ধূর উড়্‌তা, ওভি খোদাকা মর্জিসে হোতা হ্যায়। দুনিয়ামে খোদাকা খেল দেখ্।' বিজয়কৃষ্ণ ফিরে দেখেন এক বৃদ্ধ ফকির। তিনি বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি করে আমার দুরবস্থা ও অভিসন্ধির কথা জানলেন?' তিনি বললেন, 'ম্যায় ভজন কর্ রহা থা; ইৎনেমে এক দৈববাণী হুয়ি কি এক মহাত্‌মা আত্‌ম হত্যা কর রহে হে, উন্‌কো বাঁচাও'। বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে বলেন, 'দেখুন, আমার মন কলুষিত। এই অশুচি জীবনধারণ করে কি হবে?' ফকির সাহেব হেসে বলেন, 'ইস্ অপবিত্র জীবন্‌কো লে কর আগ্‌লে জীবন মে কেয়া ফল পাও গে? ভগবান্ কা গুণ্‌গান্ গাহ। ওহি তুম্‌হে পবিত্র করেঙ্গে। জীবন পবিত্র করকে আগ্‌লে জীবনমে প্রবেশ করনা। তুম আপনেকো অপবিত্র সমঝ রহে হো, লেকিন ইয়ে নেহি মালুম হ্যায় তুম্ কেতনে সুন্দর হো! সাধন পথ্ পর অগ্রসর হোনে পর তুম্‌হরা পাশ আয়নে কি মাফিক আত্‌ম অনুভূতিকা তব্ অনুভব্ হো জায়েগা। রোজ নিদ্ জানেকা পহ্‌লে ভগবান্‌কা মাতৃরূপ ইয়াদ্ কর্‌না। ইয়াদ্ কর্ যব্ তন্‌ময় হো যাওগে তব্ নিদ্ আপনি আ জায়্‌গী। ইস্ প্রকার কর্‌নেসে কুচ্‌ভি বিড়ম্বনা তুম্‌কো নেহি হোগী।' এভাবে উপদেশ দিয়ে ফকির সাহেব চলে গেলেন। বিজয়কৃষ্ণও হাল্‌কা বোধ করেন। তিনি তাঁর আবাসে ফিরে যান। সাধন লাভের বহুদিন পর হরিদ্বারে এই ফকির সাহেবের সঙ্গে গোঁসাইজীর আবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর উচ্চাবস্থা দেখে ফকির সাহেবের আনন্দ আর ধরে না। তখন তিনি তাঁকে বলেন, 'আব্ তুম্‌নে কিস্ প্রকারহি অবস্থাকো প্রাপ্‌ত কিয়া হো। অগর্ আত্‌ম হত্যা কর্‌নেসে তু ক্যায়া

ফয়দা হোতা?'

জননী মতিচ্ছন্ন হয়ে শান্তিপুর থেকে কোথায় চলে গিয়েছেন, এই নিরুদ্দেশ বার্তা নিয়ে টেলিগ্রাম আসে লাহোর ব্রাহ্মসমাজে। বিজয়কৃষ্ণ ঐ দিনই ট্রেন ধরে যথাসময়ে রাণাঘাট পৌঁছেন। গৃহে ফিরে খবর নিয়ে মার সন্ধানে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে করেন ছোটাছুটি। রাণাঘাটে পথচারীর মুখে মুখে প্রচার হয় এক অদ্ভুত কাহিনী। বিজয়কৃষ্ণের কানে আসে একদিন সেই বিচিত্র সংবাদ--বনগ্রামের কাঠুরিয়ারা দেখেছে একজন স্ত্রীলোক গভীর বনে বাঘের গায়ে মাথা রেখে দিব্যি শুয়ে থাকেন, বাঘটা যেন ওঁর পোষা কুকুর। বিজয়কৃষ্ণ বনগ্রাম গিয়ে ঐ কাঠুরিয়াদের সন্ধান করেন। ওদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে গভীর বনে প্রবেশ করেন বিজয়কৃষ্ণ। গাছের আড়াল থেকে তিনি দেখেন তাঁর মা বাঘের সঙ্গে কত কি আবদার করছেন! বাঘকে এক সময় বলেন, 'তুই এখন শুয়ে থাক্। আমি আস্‌ছি তোর খাবার নিয়ে।' বন থেকে বের হতেই বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে প্রণাম করেন। তিনি সবিস্ময়ে বলেন, তুই কে—রে? বিজয়কৃষ্ণ উত্তর দেন, 'আপনার দাস'। তিনি বলেন, 'দাস কি রে? মুখে বললেই দাস হয়! তোকে বড্ড চেনা চেনা মনে হচ্ছে।' বিজয়কৃষ্ণ সসম্ভ্রমে বলেন, 'আপনার তো কিছু অজানা নেই। আপনি কেন চিনবেন না?' স্বর্ণময়ী দেবী বলেন, 'তা নয়; কোথায় যেন তোকে দেখেছি।' ছেলে মাকে বারবার প্রণাম করেন। সম্বিৎ ফিরে আসে। গায়ের চাদরখানা মাকে পরতে দেন। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'এতদিন তুই কোথায় ছিলি—বিজয়?' মায়ের মাথায় তেল মাখিয়ে সযত্নে তাঁকে বিজয়কৃষ্ণ স্নান করান। নূতন ধুতি পরিয়ে দিয়ে আহ্নিক করতে বলেন। অপারগ দেখে তাঁরই দেওয়া যুগলমন্ত্র তাঁর কানে মুখ রেখে অস্ফুট স্বরে তিনি উচ্চারণ করেন। স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে, দুই গাল বেয়ে ধারা বয়। মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান শান্তিপুর। ওখানে মার সঙ্গে কয়েকদিন থেকে তিনি মুঙ্গেরে যান। আনন্দচন্দ্র লাহিড়ীর গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে গোঁসাইজীর পরিবারের লোকেরা কলাইঘাটা থেকে এসে সকলে সমবেত হন। এখানেই জ্বর-বিকারে আত্মজা সন্তোষিণীর হয় দেহাবসান। আদরের দুলালীর আকস্মিক তিরোধানে বিজয়কৃষ্ণ শোকে দিশেহারা হয়ে পড়েন। এবারও উদ্ভ্রান্ত হয়ে কণ্ঠহারিণীর ঘাটে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় এক মহাপুরুষ তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। "শোকোপহার" নাম দিয়ে এ সময়ে তিনি একখানি কবিতা পুস্তক রচনা করেন। প্রায়ই বলতেন, 'শোকে আমার হৃদয় যেন ঝাঁঝ্‌রার ন্যায় শতছিদ্র হয়ে গিয়েছে।'

এর কিছুদিন পরে কুষ্টিয়া ও কুমারখালির ব্রাহ্মবন্ধুদের একান্ত আগ্রহাতিশয্যে বিজয়কৃষ্ণ মুঙ্গের থেকে সরাসরি সেখানে যান সপরিবারে সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগদান করবার জন্য। কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় ফিরে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে তাঁদের ফরাসগঞ্জের বাড়ীতে ওঠেন। কয়েকদিন ঐ গৃহে থেকে তিনি পাতলা খাঁর গলিতে বাসা ভাড়া করে উঠে যান। এই সময় কয়েকজন উৎসাহী যুবক তাঁর সঙ্গে থাকতেন। ফরিদপুরের জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভুবনমোহন সেনও ঐ যুবকদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে বলেছেন, 'গোস্বামী মহাশয় যে আমাদিগকে কি ভালবাসতেন, তা কথায় প্রকাশ করা যায় না। প্রেমের যাদুকঠিতে তিনি আমাদের মত যুবকদেরও একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন।'

বিজয়কৃষ্ণ যুবকদলের ছিলেন অবিসংবাদী নেতা। প্রাচীন দলেরও ছিল তাঁর

প্রতি অসংশনীয় অনুরাগ। তাঁর ঈশ্বরপ্রেম, চরিত্রবল যুবক-বৃদ্ধ সকলের উপরই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু এখানেও হঠাৎ নবীন ব্রাহ্ম ও প্রাচীন ব্রাহ্মদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। যাঁরা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করেন বা ঐরূপ উৎসবে উপস্থিত থাকেন, তাঁরা আচার্যপদে নিযুক্ত হবার উপযোগী নন—এই ছিল বিজয়কৃষ্ণ-প্রমুখ যুবকদলের সিদ্ধান্ত; কিন্তু প্রাচীনদের মত ছিল অন্য রকম। উপবীতধারী বা উপবীতত্যাগী আচার্য নিয়ে তাঁদের কোন আপত্তি ছিল না। সমাজগৃহে খোল-করতালের ব্যবহার আবার প্রাচীনদের অভিপ্রেত ছিল না। যুবকগণ ছিলেন খোল-করতাল নিয়ে সংকীর্তনের পক্ষপাতী। এই দুই বিষয়ের মীমাংসার জন্য প্রকাশ্য সভায় বাদানুবাদ হলে প্রাচীনেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে স্থির করেন যে, পৌত্তলিকতার সঙ্গে সংশিলষ্ট ব্যক্তির আচার্যপদে বহাল হবার কোনো বাধানিষেধ থাকবে না। বিজয়কৃষ্ণ যা অন্যায় মনে করতেন, তার সঙ্গে কোনরকমেই আপোষ করে চলতেন না। প্রাচীনেরা ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন সভাপতি এবং গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে ধরেন, যাতে তিনি গোঁসাইজীকে অনুরোধ করেন আচার্যপদে স্থির থাকতে। গোস্বামী মহাশয়ের প্রকৃতি ছিল বজ্রের চেয়ে কঠোর আবার ফুলের চেয়েও কোমল। তাঁকে ধরে রাখার সব চেষ্টা বিফল হল। বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে ইস্তফা দিলেন। ১২৭৭ সালের ভাদ্র মাসে তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে আলাদা হয়ে সচিপান্দরিপা লেনের দেওয়ান সাহেবের হাবেলিতে তাঁদের নিয়মিত উপাসনার ব্যবস্থা করেন তিনি। মহাসমারোহে এখানে তরুণ দলের উৎসব হয়। এখানেই কয়েকজন শিক্ষিত যুবককে বিজয়কৃষ্ণ আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা দেন। গোস্বামী মহাশয় আচার্যপদ থেকে সরে এলে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে আচার্যপদে নিয়োগ করেন। গোস্বামী মহাশয় পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও প্রাচীন ব্রাহ্মোরা ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে সাদরে আহ্বান করতেন। ১২৭৭ সালের ২১ ভাদ্র তিনি ‘পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ’ এবং ২৩ ভাদ্র ‘পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ’ বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন।

এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঢাকা এসে কিছুদিন বোটেই অবস্থান করছিলেন। পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজে তিনি একদিন উপাসনা করলেন। তিনি কলিকাতা ফিরে গেলে পাকড়াশী মহাশয় ঢাকা আসেন এবং কিছুদিন পরে কলিকাতা ফিরে যান। ইতিমধ্যে প্রাচীনদলের সঙ্গে নব্যদলের মিটমাট হয়ে যায়। নূতন উপাচার্য হলেন বঙ্গচন্দ্র দেব। মন্দিরের মধ্যে খোল-করতাল বাজিয়ে উপাসনা করা নিষেধ হলেও মন্দিরের বাইরে যেকোনো স্থানে খোল-করতালসহযোগে উপাসনা নিষেধ থাকবে না—এই ছিল মীমাংসার সূত্র।

১২৭৭ সালের কার্তিক মাসে কেশবচন্দ্র ইংলন্ড থেকে কলিকাতায় ফিরে এসে ‘ভারত সংস্কার সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। লৌকিক, সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক উন্নতি ও কল্যাণকর কার্য সম্পাদনই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণকে সপরিবারে কলিকাতা এসে তাঁর আরব্ধ কর্মে সহযোগিতার আমন্ত্রণ জানান। যোগমায়া দেবী তখন সন্তানসম্ভবা এবং আসন্নপ্রসবা। তাই কেশবচন্দ্রকে তিনি জানান—দুই-তিন মাসের মধ্যেই ঢাকার বাসা ছেড়ে দিয়ে তিনি যাচ্ছেন। ২৯ অগ্রহায়ণ (১২৭৭), সোমবার শুক্লাদশমী তিথিতে তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্রের কল্যাণার্থে পাতলা খাঁ গলির গৃহে তিনি মঙ্গল-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা

করেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁর নবজাত শিশুর নামকরণ করেন 'যোগজীবন'।

কিছুদিনের মধ্যেই বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা থেকে সপরিবারে কলিকাতা এসে 'ভারত সংস্কার সভা'-য় যোগ দেন। এতে পাঁচটি বিভাগ ছিল—১. শ্রমজীবীদের শিক্ষা, ২. স্ত্রীজাতির উন্নতি, ৩. সুলভ সাহিত্য প্রচার, ৪. সুরাপান নিবারণ, ৫. দাতব্য। নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মেরা এক বা একাধিক বিষয়ের ভার নিয়ে এই নব-পরিকল্পনাকে রূপায়ণ করতে এগিয়ে আসেন। বিজয়কৃষ্ণের উপর পড়ে দাতব্য ও স্ত্রীশিক্ষার দায়িত্ব। অঘোরনাথ গুপ্ত ও শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর সহকারী।

কেশববাবুর উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় আদিসমাজের প্রবীণদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও 'ব্রাহ্মবিবাহ আইন—১৮৭১', 'সিভিল ম্যারেজ এক্ট' নামে পাশ হয়। গভর্ণমেণ্ট ১২৭৮ সালেই এই আইন পাশ করেন। এতে পাত্রের নিম্নতম বয়সের সীমানা ছিল আঠারো আর কনের পনেরো। দেবেন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্টকে চিঠি লিখে 'ব্রাহ্মবিবাহ বিধি'-র বিরোধিতা করেছিলেন। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে জটিলতা ও সমস্যা উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দেবে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন।

'ব্রাহ্মবিবাহ বিধি' আইনের মর্যাদা পায় কি না পায়—এ নিয়ে বিজয়কৃষ্ণের কোনও ঔৎসুক্য ছিল না। তাঁর মত ছিল এই যে, 'রানী আমাদের ব্রাহ্মধর্ম স্বীকার করেন কি না করেন তাতে কিছু এসে যায় না; পৃথিবীর আইন-আদালত-বিধি অপেক্ষা ঈশ্বর-প্রণোদিত বিবেকবিধি শ্রেষ্ঠ।'

আইনের মর্যাদা পাবার পর কেশববাবু ব্রহ্মমন্দিরের বেদী থেকে ঘোষণা করেন, 'সিভিল বিবাহ বিধি কেবল রাজবিধি নয়—ঈশ্বরের আদেশেই তা বিধিবদ্ধ হয়েছে; এজন্য একে ঈশ্বরের বিধি বলে গ্রহণ করতে হবে।'

নবগঠিত ভারত সংস্কার-সভায় অচিরে নানারকম উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও কয়েকজন ব্রাহ্ম ক্ষুব্ধ হয়ে এক আন্দোলন শুরু করেন। ধর্মের কথা উচ্চারণ করলে, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হলেই ধর্ম লাভ হয় না। সব রকমের সংস্থাতেই বিচিত্র মনোবৃত্তির লোক দেখা যায়। ধর্মসংস্থায়ও এর ব্যতিক্রম হয় না। ভারত সংস্কার-সভার কয়েকজন ব্রাহ্ম অভিযোগ এনে বলেন যে, ব্রাহ্মিকাদের পর্দার আড়াল থেকে উপাসনা করা প্রগতিবিরুদ্ধ এবং তা স্ত্রী-স্বাধীনতার পরিপন্থী। অভিযোগকারিগণ অপর এক স্থানে সমবেত হয়ে স্ত্রী-পুরুষ একত্র হয়ে উপাসনা করলেন। দেবেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় তাঁরা রাজনারায়ণ বসুকে উপাচার্য পদে বরণ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ এই সময় 'ধর্মতত্ত্বে' এক প্রবন্ধ লেখেন—'প্রচারকগণ স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী নহেন। তাঁহারা বলেন, স্বাধীনতা অন্তরে; স্বাধীনতা বাহিরে নাই। মন জ্ঞানধর্মে সমুন্নত না হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। অতএব স্ত্রীজাতিকে প্রথমে জ্ঞানধর্মে উন্নত করিতে হইবে। জ্ঞানধর্মের উন্নতি দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধি বলবতী হইলে, বিবেক প্রস্ফুটিত হইলেই স্ত্রীজাতি স্বাধীনভাবে সকল কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন। জ্ঞানধর্মের উন্নতি না হইলে, মন নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, স্বাধীনভাবে ধর্মভাবে কোন কার্য করিতে পারে না। বিলাসিতাকে স্বাধীনতা বলিয়া গণ্য করা যায় না। অতএব স্ত্রীজাতি যাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। কিন্তু স্বাধীনতার নাম লইয়া স্ত্রীজাতিকে স্বেচ্ছাচারিণী করা উচিত নহে।'

এই সময় কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে, বেহালায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া

জ্বর দেখা দেয়। ভারত সংস্কার-সভার পক্ষ থেকে বিজয়কৃষ্ণের নেতৃত্বে বেহালায় একটি সাময়িক মেডিক্যাল ইউনিট পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। বিজয়কৃষ্ণ কান্তিচন্দ্র মিত্র ও ডা. দুকড়ি ঘোষকে নিয়ে সপ্তাহে দুদিন বেহালা যেতেন ঔষধপত্র নিয়ে। রাত্রি প্রভাত না হতে গোস্বামী মহাশয় স্নানাদি সেরে উপাসনান্তে সামান্য জলযোগ করে চার পাঁচ মাইল হেঁটে বেহালা যেতেন। সারাদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে রোগী দেখে অপরাহ্ণে ফিরে এসে আহার করেই শিক্ষায়তনে মেয়েদের পড়াতেন। রাত্রে সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখতেন। এর উপর ছিল রাত্রি জেগে ধর্মালোচনা, অধ্যয়ন ও ধ্যান-ধারণা—বিশ্রামের অবকাশ আদৌ ছিল না। এই কঠোর পরিশ্রম শরীরেই বা সইবে কেন? নিষ্কাম কর্মপ্রেরণার সঙ্গে দেহের সংহতিতে ছেদ পড়ে। বুকের মধ্যে তিনি মাঝে মাঝেই অসহ্য বেদনা বোধ করেন এবং প্রায়ই সংজ্ঞা হারান। একদিন আর মূর্ছা সহজে ভাঙে না। জীবনের সব লক্ষণও স্তব্ধ। ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীরের অক্লান্ত চেষ্টায় জ্ঞান ফিরে আসে। হৃদ্‌রোগ এই মূর্ছার হেতু বলে নিরূপিত হয়। তথাপি কাজের বিরাম নেই। একটু সুস্থ বোধ করলেই আবার অমানুষিক পরিশ্রম। স্বাস্থ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রায়ই তিনি বুকে বেদনা বোধ করেন, এজন্য কেশবচন্দ্র তাঁর সঙ্গে সব সময় থাকার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করেন। এই সময় এক রাত্রে বিজয়কৃষ্ণ স্বপ্ন দেখেন জগন্নাথঘাটে এক সাধু এসেছেন, তাঁর কাছে হৃদ্‌রোগের ঔষধ আছে। তিনি যেন ঐ ঔষধ এনে সেবন করেন। প্রথমে স্বপ্নের গুরুত্ব দেন নি গোস্বামী মহাশয়, কিন্তু কয়েকদিন পর আবার একই স্বপ্ন দেখে জগন্নাথঘাট গিয়ে স্বপ্নদৃষ্ট সাধুকে চাক্ষুষ দেখে তিনি বিস্মিত হন এবং সাধু-প্রদত্ত ঔষধ সেবন করেন।

গোঁসাইজী পরবর্তীকালে নিজে এ সম্পর্কে বলেছেন—'এ সময়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের একটি বাসায় আমি থাকতাম, হার্টডিজিজ্‌ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। বেদনা হওয়া মাত্রই মূর্ছিত হয়ে পড়তাম। এক মিনিট পূর্বেও বুঝতে পারতাম না। কখন কোথায় কি অবস্থায় পড়ি, কি মরি—এই আশংকায় আমার দেহ রক্ষার জন্য একজন দারওয়ান নিযুক্ত হয়েছিল। কোথাও বার হতে পারতাম না বলে মনে বড়ই আক্ষেপ হত। একদিন শেষ রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম, জগন্নাথঘাটে অনেক সাধু এসে রয়েছেন; তাঁদের মাঝে একজন গায়ে ভস্ম, মাথায় জটা, একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে ধুনি জ্বেলে বসে আছেন। গঙ্গাতীরে জগন্নাথঘাটে গিয়ে দেখি সেই সাধুই ধুনি জ্বেলে বসে আছেন। আমাকে দেখে খুব স্নেহের সঙ্গে বললেন, 'বৈঠ বাচ্চা, বৈঠ; দাওয়াই লেও তো?' এই বলে তিনি একটি কৌটা থেকে অতি সামান্য পরিমাণে একটু ভস্ম আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এহি খা লেও। হমারা পাশ দাওয়াই অউর হ্যায় নেহি, রহ্‌নেসে বেমার একদম ছুট্‌ যাতে। ক রোজ এহি লেকে বুকমে আচ্ছা করকে মালিশ করো।' কয়েকদিন ঐ ভস্ম গায়েও মাখলাম। আমার অনেক ব্রাহ্ম বন্ধু আমাকে এজন্য ঠাট্টা করতেন কুসংস্কারী বলে। আমার কিন্তু মূর্ছা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এই ঘটনার পর থেকে সাধুদের প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা এল। পথেঘাটে সাধুবেশে কাউকে দেখলেই আমি ভক্তি করে নমস্কার করতাম; ভাল-মন্দ কিছুই বিচার করতাম না। মনে করতাম কার ভিতর কি আছে, তা তো আমি জানি না। নমস্কার করায় আর দোষ কি? যদি ভাগ্যক্রমে এই নমস্কার কোন মহাপুরুষকে হয়ে পড়ে, তাহলে বিশেষ কল্যাণও তো হতে পারে।'

এই ঔষধ ব্যবহারের পর যথার্থই তাঁর উপকার হল; কিন্তু ব্যাধির মূল

উৎপাটিত হল না। হৃদ্‌রোগ তাঁর আজীবন সঙ্গী হয়ে রইল। রোগের উপশমের জন্য তাঁকে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ চিবার্স সাহেবের শরণাপন্ন হতে হল। পরীক্ষা করে তিনি তাঁকে মরফিয়া সেবনের ব্যবস্থা করে সুদীর্ঘ এক ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। এতে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ব্যারামের তীব্রতা কিরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি পাবে এবং তদনুসারে মরফিয়ার মাত্রার কিরূপ তারতম্য হবে, তা সুস্পষ্ট উল্লেখ করে মৃত্যুর বছর পর্যন্ত নির্ণয় করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গোঁসাইজী এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'মৃত্যুর সময়টি ছাড়া চিবার্স সাহেবের ব্যবস্থাপত্র অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে।' ঐ ব্যবস্থানুযায়ী হৃদ্‌পিণ্ডের বেদনা উপশমের জন্য তিনি নিয়মিতভাবে মরফিয়া সেবন করতেন। গুরুচরণ মহলানবিশ বিনামূল্যে তাঁর ডিস্‌পেনসারী থেকে এই মরফিয়া দিয়ে যেতেন।

বিদ্বেষভাবাপন্ন কয়েকজন ব্রাহ্ম পরবর্তীকালে তাঁর সাধনলব্ধ অবস্থাকে মরফিয়ার প্রতিক্রিয়া বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গেই নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, মরফিয়া সেবনের দরুণ তাঁর মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের কোন ব্যাতিক্রম ঘটে কিনা? তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'না। মরফিয়া আমার হৃদ্‌পিণ্ডের উপরই কাজ করে। এতে বেদনার উপশম হয়। অপর কোন অনিষ্ট করে না।'

ধর্মপরিবার সংগঠনের উদ্দেশ্যে ভারত সংস্কার সভার আর একটি অবদান 'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা। এ ব্যাপারে বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন কেশবচন্দ্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। ১২৭৭ সালের ফাল্গুন মাসে বেলঘরিয়ার এক উদ্যানবাটীতে হয় এর সূচনা। কিছুদিন পর ভারত আশ্রম কাঁকুড়গাছিতে স্থানান্তরিত হয় এবং তারপর ১৩, মির্জাপুর স্ট্রীটে চলে আসে। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে এই আশ্রমে যোগদান করেন। তাঁর পরিবারে ছিলেন সহধর্মিণী যোগমায়া দেবী, শ্বশ্রূমাতা মুক্তকেশী দেবী ও শিশুপুত্র যোগজীবন। ধর্মপরিবার সংগঠন কেবল কথার কথা নয়। এর যথার্থ রূপায়ণের সংকল্প নিয়ে তাঁরা আশ্রমে এসে যুক্ত হয়েছিলেন এবং এই সংযুক্ত সকল ব্রাহ্ম পরিবারই এক পরিবেশে একত্র বসবাস করে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করতেন। স্বার্থহীন সেবা, ধর্মানুষ্ঠান, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম একত্রে একভাবে সম্পন্ন করার পথে সুমহান ব্যক্তিগত ধর্মজীবন গঠন করাই ছিল এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রাতে ভিতরের দিকের পুকুরে মেয়েরা ও বাইরের পুকুরে পুরুষগণ একত্র মিলিত হয়ে স্নান করতেন, তারপর জলযোগের পর উপাসনা ঘরে সকলে সমবেত হতেন। উপাসনার পর স্ত্রী-পুরুষ আলাদা নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হয়ে আহার করে স্ব-স্ব কার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। অপরাহ্ণ সৎ প্রসঙ্গে কেটে যেত। অকৃত্রিম উৎসাহ, উদ্দীপনার মধ্যে আশ্রমবাসীদের এই দিনগুলি কাটতে লাগল।

কাঁকুড়গাছির উদ্যানে অবস্থানকালে আশ্রমবাসীরা ঘোর অভাবে পড়েন। আহার্য দ্রব্য একই স্থান থেকে পরিবারে-পরিবারে পরিবেষিত হত। তিন দিন প্রায় অনাহারী থাকতে হয়েছে, এমন সময়ও গিয়েছে। শিশুদের পথ্যের সংস্থান কোনভাবে হলেও, প্রাপ্তবয়স্কদের কিছু জোটে নি। এই অবস্থায়ও কোনদিন উপাসনা ও সৎ প্রসঙ্গের বিরাম হয় নি।

ভারত আশ্রমে এসে যোগমায়া দেবী স্ত্রী-বিদ্যালয়ের ছাত্রী হলেন। একদিন কেশবচন্দ্র তাঁকে 'হিংসা' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্ন শুনে তিনি একেবারে

স্তব্ধ। হিংসার কোন সংস্কার তাঁর মনে ছিল না। সলজ্জভাবে তিনি কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হিংসা কে? সে কোথায় থাকে?' কেশবচন্দ্র কৌতুক বোধ করে হেসে ওঠেন। অতঃপর 'হিংসা' শব্দের অর্থ যোগমায়া দেবীকে বোঝাতে চেষ্টা করলে অঘোরনাথ কেশবচন্দ্রকে বাধা দেন এবং নিরস্ত করেন। যোগমায়া দেবীর হিংসা সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। যোগমায়া দেবীকে নিয়ে আর একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল। একদিন বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বল তো ব্রহ্মের স্বরূপ কি?' উত্তরে যোগমায়া দেবী বলেন, 'নিরাকার'। নিরাকার অর্থে তিনি কি বোঝেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'শালগ্রামের ন্যায় গোলাকার'। যোগমায়া দেবী খুব হাসির কারণ হয়েছিলেন সেদিন সন্দেহ নেই, তবে তাঁর উত্তরে ভগবান সম্পর্কে তাঁর আজন্ম সংস্কারই প্রকাশ পেয়েছিল।

জনহিতকর সব রকম প্রচেষ্টায় গোস্বামী মহাশয়ের অকুণ্ঠ উৎসাহ ছিল। 'সুলভ সমাচারের' পরিচালনাতেও তিনি কেশবচন্দ্রকে সাহায্য করতেন। মদ্যপান নিবারণ উদ্দেশ্যে যে সমিতি হয়েছিল, তাতেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এই সমিতির অনেক নবীন সভ্য গোপনে মদ খেতেন। বিজয়কৃষ্ণ 'সুলভ সমাচারে' এদের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই বিষয়ে কেশবচন্দ্র সুলভ সমাচারের পক্ষে একটি মধ্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তিনি সুলভ সমাচারের সংগেও সংশ্রব ত্যাগ করেন।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার পথে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সেখানে জড় হন। মতপথের সমতা না থাকার দরুণ, সৃষ্টি হয় নানাপ্রকার গোলমাল। এখানেও ভারত আশ্রমের বাইরের ব্রাহ্মদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব কলহ ও বিবাদ দেখা দেয়। এজন্য গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মগণের কল্যাণের নিমিত্ত প্রত্যেক ব্রাহ্মভক্তকে অবশ্য পালনীয় দশটি উপদেশ পালন করতে বলেন—

১. প্রতিদিন অন্যূন তিনবার পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে। অভ্যস্ত কতকগুলি বাক্য বলিয়া, উপাসনা শেষ না করিয়া, জীবন্তভাবে উপাসনা করিতে হইবে; উপাসনার সংগে সংগে ব্রহ্মসাধন আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথম বাহ্য জগতের শোভা-সৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বরের শোভা-সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে হইবে। এমনই অভ্যাস করিতে হইবে যে, বাহ্য সৌন্দর্যে ঈশ্বরের শোভা না দেখিলে সকল সুন্দর পদার্থকেই শূন্য বোধ হইবে; যেখানে প্রকৃতি স্বাভাবিক শোভায় পরিপূর্ণ, সেখানে ঐ প্রকার সাধন করা কর্তব্য। এই সাধন অভ্যস্ত হইলে সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে সকল স্থানেই উপলব্ধি করা যাইবে। পাপ করিতে আর সাহস থাকিবে না। এই সাধন বিশেষরূপে আরম্ভ হইলে মন আর উহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে না। তখন মনে হইবে যে, চক্ষু যদি অন্ধ হয়, তবে প্রকৃতির সৌন্দর্যে তাঁহাকে কিরূপে দর্শন করিবে? অতএব দয়াময় নামের মধ্যে তাঁহাকে সাধন করিতে হইবে। নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইলে নাম-সাধন সার্থক হইবে। নাম-সাধন করিতে করিতে নাম আর তিনি অভিন্ন হইবেন; তখন নামকে গুটিকতক অক্ষর বলিয়া বোধ হইবে না, নামের ভাবের মধ্যে পূর্ণব্রহ্মকে দর্শন করিয়া প্রাণমন শীতল হইবে। নাম-সাধন হইলে অন্তরে পিতার সহিত যোগসাধন করিতে বিশেষ ব্যাকুলতা হইবে। অন্তরে দয়াময় পিতা প্রকাশিত হইবেন, হৃদয় অনিমেষ লোচনে তাঁহার সৌন্দর্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবে। এই যোগসাধনই পরলোকের একমাত্র সম্বল। এই ত্রিবিধ-সাধন দ্বারা বিনীত হইয়া দীনহীনভাবে পিতার চরণে পড়িয়া থাকিলে নিন্দা-

প্রশংসায় সাধকের মন বিচলিত হয় না; সুতরাং তাঁহার নিকট বিবাদ-বিসম্বাদ অসম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্রাহ্ম এরূপ সাধন আরম্ভ না করিলে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইবে না। সাধন না করিলে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

২. কেহ বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কার্য করিতে পারিবেন না। মনে যাহা সত্য জানিবেন, কার্যে তাহা পরিণত করিবেন। সহস্র ক্ষতি হইলেও কপট আচরণ করিতে পারিবেন না।

৩. কেহ ভ্রাতার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

৪. সুরাসক্তি, মাদক সেবন, কোন প্রকার মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, ব্যভিচার, পর নিন্দা, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি পাপাচরণ করিলে, তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে।

৫. ব্রাহ্ম যেমন ঘৃণার সহিত পাপ কার্য পরিত্যাগ করিবেন, তেমনই শ্রদ্ধার সহিত সৎ কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন। পাপ করা যেমন অধর্ম, কর্তব্য প্রতিপালন না করা সেইরূপ অধর্ম।

৬. কাহারও দোষ দেখিলে, তাহার দুর্বলতা দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে এবং গোপনে তাহাকে সংশোধন করিবে। ভ্রাতার দোষ লইয়া উপহাস করিবে না।

৭. যেমন নির্জনে উপাসনা করিবে, তেমনই নিয়মিতরূপে সামাজিক উপাসনা করিবে।

৮. স্বীয় দুর্বলতাকে সমর্থন না করিয়া বিনীতভাবে দুর্বলতাকে স্বীকার করিবে।

৯. কেহ ঈশ্বরের নাম লইয়া উপহাস করিলে, কর্ণে হস্ত দিয়া তাহার কথাকে অগ্রাহ্য করিবে।

১০. ঈশ্বর, পরলোক, প্রার্থনা, পাপপুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তি, অনন্ত উন্নতি ইত্যাদি ব্রাহ্মধর্মের মূলধর্মে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

এই দশটি নিয়ম-বিধি পালন সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'এই দশটি নিয়ম ব্রাহ্মসমাজে শাসনরূপে না থাকিলে ব্রাহ্মগণ সদ্ভাব ও শান্তি ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। ব্রাহ্মদিগের বর্তমান জীবন ধর্মহীন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাধন আরম্ভ না হইলে প্রকৃত ধর্ম ব্রাহ্মসমাজে সংস্থাপিত হইবে না, ব্রাহ্মগণ যে সময়টুকু বিবাদ করিয়া অতিবাহিত করেন, সে সময়টুকু দিয়া সাধন করিলে জীবনের প্রকৃত মঙ্গল সংসাধিত হয়। সমস্ত অশান্তি নিবারণের একমাত্র উপায় ব্রহ্মসাধন। ব্রাহ্মগণ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মসাধন করিয়া শান্তি লাভ করুন, এই আমার বিশেষ নিবেদন।'

এই সময় 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় এক ব্যক্তি ব্রাহ্মপ্রচারকদিগকে মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অনুদার বলে এক পত্র প্রকাশ করেন। সম্পাদক মহাশয়ও এই পত্র সমর্থন করে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন। 'ধর্মতত্ত্ব'-সম্পাদক এর প্রতিবাদ করেন। বিজয়কৃষ্ণ 'মিররের' মন্তব্যের উত্তরে প্রচারক-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ১২৭৯ সালের আষাঢ় মাসের 'ধর্মতত্ত্বে' এক নিবন্ধ লেখেন—

'সাধারণ লোকে প্রচারকদিগকে মূর্খ বলিয়া গালি দিতেছে, তাহার প্রতিবাদ করাতে প্রচারকের ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে। প্রচারকদিগকে গালি দিউক বা প্রহার করুক, তাঁহারা অম্লানবদনে সহ্য করিবেন। যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য

দয়াময় পিতার নিকট সরল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রচারকগণ কখনই আপনার ইচ্ছাতে কি আপনার বলে ধর্মপ্রচার করেন না। দয়াময় পিতা দৃঢ়রূপে আদেশ করিলে এবং উপযুক্ত বল বিধান করিলে তাঁহারা বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে চতুর্দিকে ভ্রমণ করেন। কোনও মানুষকে পাপ করিতে দেখিলে অশ্রুপাত করিয়া প্রার্থনা করেন। বাস্তবিক মহামারী পীড়িত ও দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে দেখিলে যেরূপ দয়া হয়, ধর্মহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ দয়া হয়। সেই স্বর্গীয় দয়া হৃদয়ে প্রকাশ হইলে মূর্খ কৃষক, জ্ঞানহীন বালক কিংবা অবলা নারী ব্যাকুল হৃদয়ে ধর্মপ্রচার না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। প্রচারকগণ এইরূপ ব্যাকুল হৃদয়ে অস্থির হইয়া ‘দয়াময়’ নাম ঘোষণা করেন। তাহাতে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ‘দয়াময়’ নামের গুণে, সত্যের অসীম পরাক্রমে জগতে ধর্ম প্রচারিত হয়। মনুষ্যের সাধ্য কি তাহা জগতে প্রচার করিতে পারে?

‘কতিপয় ব্রাহ্ম প্রচারকদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। প্রচারকগণ যাঁহাদের জন্য দিবানিশি অশ্রুপাত করিয়াছেন, এখন তাঁহারা উপযুক্ত হইয়া যদি প্রচারদিগকে নির্যাতন করেন তথাপি প্রচারকগণ প্রাণান্তেও তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন না। কারণ ভ্রাতাদের ক্রোধে ও উদ্ধতভাবে যদি স্বর্গীয় সম্বন্ধ তিরোহিত হয়, তাহা অপেক্ষা অবিশ্বাসের কার্য আর কিছুই নাই।

‘সাধন-ভজন না থাকিলেই মনুষ্য ঘোর সংসারী হইয়া পড়ে। সাধনা দ্বারা মন বিনীত হয়, সর্বদা দীনহীন অকিঞ্চন হইয়া ঈশ্বর চরণ পূজা করিতে অভিলাষ হয়। ভ্রাতা-ভগিনীদের পদানত থাকিতে ইচ্ছা করে। সাধনহীন মন অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া সকলকেই আঘাত করে, অকৃতজ্ঞ হইয়া উপকারী ব্যক্তিকে গালি বর্ষণ করে।

‘ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকগণ দেবতা নহেন, তাঁহারা মনুষ্য; মনুষ্য দোষগুণ মিশ্রিত। এমন অনেক ব্রাহ্ম আছেন, যাঁহারা প্রচারকদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রচারকগণ তাঁহাদিগকে ভক্তি করিয়া থাকেন। অতএব প্রচারকদিগের দোষ থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। প্রচারকদিগের যদি দোষ দেখেন, তবে দয়াপূর্বক ক্ষমা করুন। যাঁহাদিগের দোষ দেখিবেন, সদ্‌ভাবে তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের দোষ প্রকাশ করিয়া সংশোধন করুন।

‘শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক ভ্রাতৃগণ আপনাদের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, একবার দেখুন ব্রাহ্মসমাজে সাধন না থাকাতে ব্রাহ্মগণ শুষ্ক হইয়া কি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অনেকের শুষ্কতা এতদূর বর্ধিত হইয়াছে যে, তাঁহারা উপাসনা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেকে উপাসনা লইয়া উপহাস করিতেছেন। ঈশ্বরের আদেশ, বিশ্বাস, করুণা এই সকল মুক্তিপ্রদ সত্যে অবিশ্বাস করিয়া বিদ্রূপ করিতেছেন। ঈশ্বর দর্শনকে কল্পনা মনে করিয়া সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা অনন্তকালের একমাত্র অবলম্বন, সেই উপাসনা, আদেশ, করুণা দর্শন প্রভৃতির প্রতি যাঁহারা অবিশ্বাস করিলেন, তাঁহাদের অসহায় শোচনীয় জীবন স্মরণ করিতেও হৃদয় ব্যথিত হয়। ব্রাহ্মদিগের পরিণাম যদি এইরূপ অবিশ্বাসে পরিণত হয়, তবে জগতের লোক কোন্ সাহসে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে?

‘এখন যাহাতে ব্রাহ্মগণ সাধন-ভজন করিয়া বিনীত হন, পরিত্রাণার্থী হন, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করুন। লোকে গালি দিউক কি প্রহার করুক, অম্লান বদনে তাহা সহ্য করুন। যদি আপনারা বিরক্ত হন, অভিমানী হন, তবে নিশ্চয়ই আপনাদেরও পতন হইবে। দয়াময়ের চরণে আপনারা জীবন বিক্রয় করিয়াছেন, সে জীবনে পিতার

সন্তানদিগের সম্পূর্ণ অধিকার। সুতরাং ভ্রাতা-ভগিনীগণ যাহা বলিবেন, তাহা সত্য হইলে শিরোধার্য করিতে হইবে। প্রতিবাদের ভাব আমাদের মনে যেন স্থান না পায়।

‘আপনারা প্রচারকার্যে প্রবৃত্ত না থাকিলে দয়াময় পিতা স্বর্গের অমূল্য সম্পত্তি আপনাদিগকে প্রদান করিবেন না, বরং যাহা দিয়াছেন তাহাও কাড়িয়া লইবেন। সেই স্বর্গীয় রত্ন অন্তরে না থাকিলে মন শুষ্ক হয়, ভ্রাতার প্রতি বিশ্বাস থাকে না, নির্জনে ভ্রাতার নিন্দা করিলে সুখ হয়, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি থাকে না, উপাসনা পর্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়ে। উপাসনা সাধন না থাকিলে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ নাস্তিক হইবে, কেহ পৌত্তলিক হইবে। কারণ উপাসনায় শান্তি না পাইলে কি লইয়া ব্রাহ্মসমাজে অবস্থিতি করিবে। পরিশ্রম না করিলে পিতার নিকট কেহ এক কপর্দকও পাইবেন না। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ, আসুন আমরা ব্রহ্মসাধনে প্রাণমন উৎসর্গ করি। সকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ তিরোহিত হইয়া শান্তি রাজ্য সংস্থাপিত হইবে।’

অবাক হতে হয়, এই সারগর্ভ উপদেশ যখন বিজয়কৃষ্ণ দেন ও নিবন্ধ রচনা করেন, তখন তিনি মাত্র একত্রিশ বছরের যুবক। জাতিধর্মনির্বিশেষে ঈশ্বর লাভের জন্য এই সব অমূল্য পথ-নির্দেশ চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে। গোস্বামী মহাশয়ের তখন গীতায় বর্ণিত ‘স্থিতধী’ অবস্থা।

ভারত-আশ্রম সংগঠনে দেখতে দেখতে দেড় বছর কেটে যায়। প্রচারকগণ আবার ধর্ম প্রচারে মনঃ-সংযোগ করেন। গোস্বামী মহাশয় শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, কাছাড়, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। এই সময় বিজয়কৃষ্ণের একটি কন্যাসন্তান জন্মে। ভগবানের দান জেনে কৃতজ্ঞচিত্তে মেয়েটির নাম রাখেন প্রেমমালা। এই সময় ভারত-আশ্রম মির্জাপুরে স্থানান্তরিত হয়। বিজয়কৃষ্ণের পরিবারের সকলে কিছুদিনের জন্য শান্তিপুর যান।

বাগ-আঁচড়ায় ইঙ্গিতপূর্ণ স্বপ্ন

১২৭৯ সালের শ্রাবণ মাসে বিজয়কৃষ্ণ প্রচারের উদ্দেশ্যে রংপুর যান। রংপুরবাসীরা প্রথমে তাঁর কথা শোনা দূরের কথা, তাঁকে গৃহে স্থান দিতেই সম্মত হন নি। কত যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তাঁরা তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু শেষে বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতা ও উপাসনায় যোগ দিয়ে কেঁদেকেটে ভাসিয়েছেন। ২১ শ্রাবণ (১২৭৯) সকালে ব্রহ্মমন্দিরে গোস্বামী মহাশয় ‘উপাসনা ও উপাসনার আবশ্যকতা’ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই ভাষণ শুনে শুষ্ক তরু যেন মঞ্জরিত হল। দেহের পুষ্টির জন্য আহার যেমন একান্ত প্রয়োজন, আত্মার বিকাশের জন্য উপাসনা তেমনই অপরিহার্য। অসুস্থ দেহ যেমন ভোজন-বিরোধী, তেমনই অসুস্থ আত্মা ভজন-বিরোধী হয়। বিকারগ্রস্ত রোগীর কাছে প্রথম প্রথম যেমন মিশ্রি তিক্ত স্বাদ বহন করে, অথচ বার বার গ্রহণের পর তার প্রকৃত স্বাদ সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তেমনই ভজন-বিহীন সাধারণ মানুষও অভ্যাস ও নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা, উপাসনা ও নাম স্মরণের মাধ্যমে প্রকৃত ব্রহ্মোপলব্ধির আনন্দঘন রসাস্বাদন করতে সক্ষম হন। এই বক্তৃতা সম্পর্কে স্থানীয় প্রচার-বিবরণীতে লিখিত আছে, ‘এই বক্তৃতা দ্বারা অনেক দুষ্কর্মা ও পতনশীল ভ্রাতার হৃদয় প্রবলরূপে আহত হইয়াছিল, অনেক নির্জীবহৃদয়ে শান্তি পবিত্রতা আসিবার কারণ হইয়াছিল, উপাসনা যে অন্নপানের

ন্যায় অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহা অনেক ভ্রাতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।' ঐ দিনই সন্ধ্যায় 'পরকালে বিশ্বাস' বিষয়ে তাঁর পরবর্তী ভাষণ শুনে লোকের পাপপ্রবৃত্তি হ্রাস পায়। পরকালের জীবন পবিত্র করার জন্য সচেষ্ট হন। পরাহের উপাসনা-বিবরণীতে পাওয়া যায়—সেদিনের পরিবেশ হয়েছিল প্রীতিপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর। শ্রোতৃবর্গ যেন কতকাল অনাহারে ছিলেন, প্রেমান্ন পরিবেষণে এবং পরমপিতার কৃপাবারি সেবনে যেন নবজীবন ফিরে পেলেন তাঁরা।

২৪ শ্রাবণ (১২৭৯) গোস্বামী মহাশয় কাকিনার জমিদার মহিমারঞ্জন রায়ের রংপুরস্থ বাড়ীতে 'জ্ঞান, ধর্ম ও সভ্যতার সামঞ্জস্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এতে সুরাপান, ব্যভিচার ও উৎকোচ-গ্রহণের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে ধর্মজীবনের সার্থকতা নিয়ে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন বিজয়কৃষ্ণ।

পরদিন কয়েকজন শিক্ষিত অভিমানী হিন্দু যুবক এবং কয়েকজন রাজকর্মচারী মিলিত হয়ে অন্যত্র বিজয়কৃষ্ণের বিরোধিতা করে সভা করলেও তাতে বাক্‌চাতুর্য ছাড়া কোনও মূল্যবান যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন নি। তাঁদের বক্তৃতার মর্ম ছিল, জ্ঞান, ধর্ম, সভ্যতার সামঞ্জস্য করা যায় না এবং তার কোন প্রয়োজনও নেই। ধর্ম শিক্ষা দ্বারা জনসমাজকে ধার্মিক করার চেষ্টা হাস্যকর। ধর্ম কখনও লোককে সুখী করতে পারে নি, বরং মানুষের মনে অশান্তি ও অসদ্ভাব সৃষ্টি করেছে।

ব্যভিচারের সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব নয়, সুরাপান সব সভ্যসমাজে বিদ্যমান, এমতাবস্থায় তা তুলে দেবার চেষ্টা অর্থহীন। পাপপুণ্য বলে কিছু নেই, এসব এক শ্রেণীর মানুষের তৈরি এবং দুর্বল মানুষকে পদানত করে রাখার জন্যই এই সব নীতিকথার অবতারণা। জগতের সভ্যসমাজে এসব কথার কোন মূল্য কেহ দেয় না। যাহা সর্বকালে সর্বদেশে স্বীকৃত হয়েছে তা হল সৎ এবং অসৎ, সত্য এবং মিথ্যা। এও আবার স্থিরীকৃত হয়েছে স্থান, কাল ও পাত্রের উপর নির্ভর করে। জাগতিক পরিবর্তনের সঙ্গে এর মূল্যায়নও পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এসবেরও শেষ কথা কিছু নেই।...

কঠিন যুক্তিজাল বিস্তার করে বক্তারা তাঁদের বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে শ্লেষের সঙ্গে আক্রমণ করছিলেন বিজয়কৃষ্ণকে। এতে ফল হল বিপরীত। হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত চিন্তাধারার কোন মূল্য নেই, নেই শাশ্বত সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাভাব, নেই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতি কোন আকর্ষণ, নেই সাধারণ সৌজন্যবোধও। তাঁরা জানেন না যাহা সৎ, তাহাই ঈশ্বরীয়; যাহা সত্য, তাহাই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এই সত্যই শাশ্বত, চিরন্তন, স্থান-কাল ও পাত্র-নিরপেক্ষ। তাই শ্রোতারা এমন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা শুনতে প্রস্তুত নন অসত্যকে সত্য বলে প্রচারধর্মী কোনও কথা, প্রস্তুত নন তথাকথিত মিথ্যা যুক্তিজালে পল্লবিত ইহলোক-সর্বস্ব বিলেতী বুলি কপচান কথা শুনতে। সহজেই বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। সভা মধ্যপথেই সমাপ্ত হল। সমবেত ভদ্রজনেরা কোন প্রকারে বক্তাদের সরিয়ে নিলেন। এঁদের মধ্যে দুইজনই ছিলেন সরকারী কর্মচারী—একজন মুন্সেফ, আর একজন সিভিল সার্জন।

শহরে সাড়া পড়ে গেল, জনসাধারণ বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতা শুনবেন। ৩১ শ্রাবণ, ১২৭৯ জগদীশনারায়ণ চৌধুরীর গৃহে 'ব্রাহ্মধর্মের সহিত অন্যান্য ধর্মের সম্বন্ধ নিরূপণ' বিষয়ে গোস্বামী মহাশয় জনসাধারণের উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে এক মধুর ভাষণ দিলেন—

'মনুষ্যের প্রকৃতিই ধর্ম। ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতিতে গভীররূপে ধর্মভাব অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। যতদিন মনুষ্য ও মনুষ্যহৃদয় বর্তমান থাকিবে, ততদিন তাহার ধর্মও থাকিবে। ঈশ্বর, পরকাল, ভক্তি, শান্তি, জ্ঞান, কৃতজ্ঞতা, দয়া, আশা, কামনা প্রভৃতিই মনুষ্যের প্রকৃতি এবং এইগুলিই তাহার ধর্ম। কোনও মনুষ্য এই প্রকৃতি বা ধর্মকে বিনষ্ট করিতে পারে না। কখনও মনুষ্য প্রকৃত নাস্তিক হইতে পারে না; তাহার প্রকৃতিই তাহাকে বলপূর্বক ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। যাহারা অনবরত পাপ করে, তাহারা ঈশ্বরের কথা মনে করিতেও ভয় পায়; এই নিমিত্ত মনে করে ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থান করাই ভাল। কিন্তু যাঁহার চক্ষু সর্বত্র প্রসারিত, অন্ধকার রজনীতে লুক্কারিত হইয়া পাপ করিলেও যিনি দেখিতে পান তাঁহাকে প্রতারণা করা যায় না। মনুষ্য যখন বিপদে পতিত হয়; যখন পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব পৃথিবীর কোন লোকের দ্বারা উপকার পাইবার তাহার আশা থাকে না, যখন চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখে, তখন "কোথায় দয়াময়" বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে। অতএব মানবের ধর্মভাব বিনষ্ট হইবার নহে।'

'মনুষ্যের ধর্ম নিত্য ও সত্য, সহজ ও স্বাভাবিক। ধর্মালোচনা না করিলে কিংবা পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করিলে ধর্মভাব মলিন হইতে পারে ; কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় না। এই স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক ধর্মই ব্রাহ্মধর্ম। মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান, ভক্তি, কার্য এই সকল অঙ্গ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম পূর্ণধর্ম বলিয়া অভিহিত। যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম। যাহা ধর্ম, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্মধর্মই পূর্ণধর্ম, অন্য ধর্মে পূর্ণতা নাই। অন্য ধর্মে যে সত্য আছে. তাহা ব্রাহ্মধর্মেরই অংশ। এজন্য ব্রাহ্ম সর্বত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিবেন। যিনি যে পরিমাণে সত্য পালন করেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম পালন করেন। ব্রাহ্মধর্মে যেমন জ্ঞানের প্রয়োজন, তেমনই ভক্তি ও কার্যের প্রয়োজন। জ্ঞান দ্বারা সত্য, সুন্দর, মঙ্গল বিষয় নির্বাহিত হয়; ভক্তি দ্বারা ধ্যান, প্রার্থনা, কৃতজ্ঞতা ও ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কর্তব্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়; কার্য দ্বারা জগতের ও নিজের মঙ্গল হয়। জ্ঞানের আদর্শ প্রাচীন ঋষিতে, ভক্তির আদর্শ চৈতন্যে, বিশ্বাস ও নির্ভরের আদর্শ প্রহ্লাদে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।'

গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনা, বক্তৃতা ও সর্বোপরি মধুর-স্বভাব জনগণকে বিমুগ্ধ করেছিল। রংপুর থেকে তিনি যান কোচবিহার। তাঁর বক্তৃতার ফলে ওখানে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। এখানে হৃদ্‌রোগে তিনি কাতর হয়ে পড়েন এবং অবিলম্বে শান্তিপুর গিয়ে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নেন।

১২৭৯ সালের ভাদ্র মাসে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ঘটে যোগাযোগ। কেশবচন্দ্র মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বর যান; রামকৃষ্ণও তাঁর গৃহে আসেন। রামকৃষ্ণদেব একদিন কেশবচন্দ্রকে বলেন, 'দিনেরবেলায় তো একটিও তারা দেখা যায় না, তা বলে কি তারা নেই? দুধে মাখন রয়েছে, কিন্তু দুধ দেখে কি তা বোঝা যায়? ঈশ্বরও তেমনই। যদি মাখন দেখতে চাও, তাহলে দুধকে আগে দই কর, তারপর সূর্যোদয়ের পূর্বে দধিমন্থন কর, তখন মাখন দেখা যায়। দুধ ধব্‌ধবে সাদা। দুধকে বাদ দিয়ে দুধের সাদা ভাব যায় না, আবার দুধের শুভ্রতা ছেড়ে দুধকেও ভাবা যায় না। তেমনই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে আর শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। যিনি সত্য—তিনিই ব্রহ্ম। কালীই ব্রহ্ম—ব্রহ্মই কালী। কালী কি কালো? দূরে তাই কালো। কাছে পেলে নয়। আকাশ নীল, কাছে গিয়ে দেখ কোন

রঙ নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল—হাতে তুলে দেখ কোন রঙই নেই।'

মুগ্ধ হন কেশবচন্দ্র সেন। হিতবাদী পত্রিকায় রামকৃষ্ণের অশেষস্তুতি করে তিনি প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেই প্রবন্ধ পাঠ করে কোন রকম আনন্দ প্রকাশ না করে চুপ করে থাকেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে রামকৃষ্ণদেব বলেন, 'প্রবন্ধ লিখে, বক্তৃতা দিয়ে কি কেউ কাউকে বড় করতে পারে? বড় করেন মা।'

দিনে দিনে কেশবচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরমহংসদেবের জীবন্ত বৈরাগ্য দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে কেশববাবুও বৈরাগ্যসাধনে প্রবৃত্ত হন এবং বিজয়কৃষ্ণকে অবিলম্বে কলিকাতা আসার অনুরোধ করে তিনি শান্তিপুরে খবর পাঠান। বিজয়কৃষ্ণ এসে দেখেন, কেশবচন্দ্র স্বপাক আহার করছেন এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতে বৈরাগ্য প্রবেশ করে তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। কয়েকজন ব্রাহ্মের বিরোধিতা সত্ত্বেও ধর্ম-সাধনের প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মদের ঐকান্তিকতা বেড়ে যায়। কেশববাবু যোগ ও ভক্তি বিষয়ে নিয়মিত উপদেশ দিতে থাকেন। বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ তাঁকে এবিষয়ে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করেন। কেশবচন্দ্র উৎসাহিত হয়ে কোন্নগরে মোড়পুকুর গ্রামে 'সাধন-কানন' স্থাপন করেন। এদিকে ভক্তিসাধনের সঙ্কল্প নিয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ। ব্রতী হয়ে তাঁরা কয়েকটি সংযম-বিধি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে থাকেন। এই সংযম-বিধির অন্যতম হল—প্রাতঃস্মরণ, প্রাতঃস্নান, নামশ্রবণ, নামগান, উপাসনা, ভক্তিগ্রন্থ থেকে শ্লোকাদি পাঠ। রন্ধন, দরিদ্রকে দান, পশুপক্ষী-উদ্ভিদাদির সেবা, প্রাতঃকালে পঠিত শ্লোকাদির পুনর্পঠন, সৎপ্রসঙ্গ, নির্জনে স্তব ও কীর্তন, প্রার্থনা ও সমবেত কীর্তন এবং ভক্তদের আশীর্বাদ প্রার্থনা।

গোস্বামী মহাশয় গভীর সাধনায় ডুবে যান। তাঁর মধ্যে এক-একটি করে কয়েকটি ভক্তি লক্ষণ আপনা-আপনি প্রকাশ পায়। কখনও কখনও সমাধিস্থ হয়ে তিনি সম্বিৎ হারিয়ে ফেলতেন; কখনও বা ভক্তির প্রাবল্যে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়তেন। সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত, বৈষ্ণব সকলকে তিনি শ্রদ্ধা ও সমাদর করতেন। ধর্ম-সাধনে তাঁর পরমুখাপেক্ষা ছিল না। কে কি ভাববে বা বলবে, এসব কথা তাঁর মনে স্থান পেত না। ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য সবরকম দুঃখকষ্ট তিনি অম্লানবদনে সহ্য করতেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলতেন, 'আমি বিজয়বাবুর ন্যায় ধর্মপিপাসু লোক কখনও দেখি নাই। ধর্মের জন্য তিনি সবই করিতে ও সহ্য করিতে পারিতেন।'

১২৮০ সালের শীতকালে প্রচারের কাজে কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ পশ্চিমাঞ্চলে বের হন। লক্ষ্মৌ, দেরাদুন, বেরিলি, সাহাজানপুর, লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ ও জব্বলপুরে ও'দের উপস্থিতি ও বক্তৃতায় সর্বত্র ব্রহ্ম-নামের সাড়া পড়ে যায়। এ যাত্রায়ও জীবন-সঙ্কটময় হৃদ্‌রোগে কাতর হয়ে পড়েন বিজয়কৃষ্ণ। ভগবদ্‌কৃপায় এবং সহযাত্রীদের সেবাযত্নে তিনি আরোগ্য লাভ করেন এবং পূর্ণোদ্যমে প্রচারের কাজে লেগে যান। ধর্মপ্রচারে বিজয়কৃষ্ণ জীবনপণ-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন; এজন্য রোগশয্যায়ও তাঁর বিশ্রাম ছিল না। এ সময় কলিকাতায় তাঁর তৃতীয় শিশু সন্তান প্রেমমালার কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে তাঁকে অবিলম্বে ফিরে আসতে হয়।

১২৮০ সালে চতুর্থ সন্তান শান্তিসুধার জন্ম হয়। স্নেহশীলা প্রকৃতির হলেও সন্তান-বাৎসল্যে যোগমায়া দেবী ছিলেন আসক্তিহীন। কন্যা সন্তোষিণীর মৃত্যুতে

তিনি একটুও বিচলিত হন নি। প্রেমমালার অসুখের কয়েকদিন পরই পুত্র যোগজীবনও খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিন প্রায় বারো ঘণ্টা অজ্ঞান থাকেন। চিকিৎসকগণ তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দেন। ডাক্তারদের মন্তব্য যোগমায়া দেবী জানতে পেলে অস্থির হয়ে পড়বেন ভেবে বিজয়কৃষ্ণ শৌচে গিয়ে বিলম্ব করেন। ছেলের জীবনের আশা নেই জেনেও মা ধৈর্য হারান না। কিন্তু শৌচাগারে স্বামীর অস্বাভাবিক বিলম্ব দেখে তাঁর উদ্বেগ হয়। তিনি বিজয়কৃষ্ণকে শুনিয়ে বলেন, 'আমার বড় ভয় হচ্ছে আপনার বিলম্ব দেখে। আপনার হৃদ্‌রোগ আবার কি বাড়ল? যোগজীবনের অবস্থাও খারাপ, সে যদি চলে যায়, কি আর করব? ভগবান যদি তাঁর গচ্ছিত ধন নিতে চান নেবেন! আপনি তাড়াতাড়ি করুন।' ভগবদ্‌ ইচ্ছায় এইবার (১২৮১) যোগজীবনের জীবন রক্ষা পায়।

১২৮২ সালের ফাল্গুন মাসে কেশবচন্দ্র 'সাধনের শ্রেণী বিভাগ' সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন, যার মূল কথা হল প্রত্যেক মানুষের মনে যে ভাবটি প্রবল, তিনি যদি সেই ভাব আশ্রয় করে লেগে থাকেন, তা হলে তাঁর জীবন সফল হবেই। এই ভাষণের পর বিজয়কৃষ্ণ ভক্তিপথে, অঘোরনাথ যোগসাধনে ও মুক্তকেশী দেবী সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর যথানিয়মে সংযম-ব্রত পালনের পর 'ভক্তি-শিক্ষার্থী' বিজয়কৃষ্ণ এবং 'যোগ-শিক্ষার্থী' অঘোরনাথকে আচার্য কেশবচন্দ্র সময়োপযোগী কয়েকটি উপদেশ দেন—

'তোমরা দুইজন একসময় সংসার ছাড়িয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলে। "থাক্‌ পড়িয়া থাক্‌ সংসার" একথা বলিয়া তোমরা সেবার চলিয়া গিয়াছিলে। সেবার বাহ্যিক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এবার সামাজিক সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাও। অন্তরের সংসার, অন্তরের পাপ-বিকার পড়িয়া থাক্‌ এই কথা বলিয়া চলিয়া যাও। এবার উপাসনার ভিতরে তোমরা গভীর সাধনে নিযুক্ত হইবে। তোমরা এখনও ভাল করিয়া ঈশ্বরকে দেখ নাই—সেই প্রসন্ন পরমেশ্বরকে দেখ নাই, যাঁহাকে দেখিলে আনন্দসাগরে পরমযোগী পরমভাবে ভাসেন; যাঁহার সৌন্দর্য সর্বদাই ভক্তদিগকে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছেন, যেখানে সেই বিধানের পরম দেবতা স্বহস্তে কার্য করিতেছেন। এই বিধানের আদিবর্ণ হইতে শেষবর্ণ পর্যন্ত সমস্ত পরমেশ্বরের হস্তে, ইহাতে কিছুমাত্র মানুষের কৃত্রিম ব্যাপার নাই। সেই শাস্ত্র কোথায়? সেই বিধান কোথায়? সেই ঈশ্বর কোথায়? সম্মুখে তাকাইয়া দেখ, বহু দূরে এই পথ অতিক্রম করিয়া যখন তোমরা সেই স্থানে যাইবে, তোমাদের প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে।'

'বিজয় ও অঘোর তোমরা সেখানে গিয়া দেখিবে, তোমাদের ইচ্ছা হইবে আরও উচ্চতর কোন ধামে গিয়া উপস্থিত হই। উপাসনা কেবল তীর্থ ভ্রমণ। কতক দূরে গিয়া দেখিবে আবার সব ফেলিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ কতবার যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে, কতবার শেষ করিতে হইবে, তাহার সীমা নাই। তোমাদিগকে আজ আদর করিব না, বড়লোক বলিয়া সম্মান করিব না, তোমাদিগকে ক্ষুদ্র কীট বলিয়া তোমাদের ভ্রাতা-ভগিনীদের পদতলে ফেলিয়া দিতেছি। তোমাদিগকে রাজবেশ দিব না, ধার্মিকদের মধ্যেও গণ্য করিব না।'

'ব্রতদান তোমাদিগকে বড় করিবার জন্য নহে। তোমাদের স্থান ভ্রাতাদের মস্তকের উপরে নহে, কিন্তু সকলের পদতলে। যতবার তাঁহাদিগকে দেখিবে, তাঁহাদের চরণ প্রথম দেখিবে। সেবার বিষয় আগে ভাবিবে। সেবার জন্য তোমরা ভৃত্য

হইয়াছে। তোমরা চিরকাল বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ইন্দ্রিয়সংযম অতি কঠিন কার্য; কিন্তু যে ইন্দ্রিয়সংযম না করে সে মরে। যদি রসনা শুদ্ধ না হয়, হস্ত পবিত্র না হয়, শুদ্ধাচারী না হও, সকলই বৃথা। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া বলিবে, "দূর হও কাম রিপু, দূর হও ক্রোধ, দূর হও লোভ, দূর হও অহঙ্কার, দূর হও অসূয়া দ্বেষ, দূর হও সংসারচক্র, দূর হও মনঃকষ্ট, দূর হও স্বার্থপরতা।" ব্রহ্মবলে বলী হইয়া এই কয়েকটিকে প্রতিদিন "দূর হও" বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে; তপস্যাভূমির নিকটে আসিতে দিবে না। ব্রহ্ম শিখাইবেন, কিসে এ কার্য সুসিদ্ধ হইবে। এইরূপে ইহাদিগকে যদি দমন করিতে না পার, তোমাদের পুরাতন বন্ধু পাপ তোমাদিগকে সংসারের দিকে টানিবে। ঈশ্বর করুন এরূপ না হয়। প্রবল রিপু জয় করা উপহাসের কথা নহে। মিথ্যাবাদী, কামী, ক্রোধী, লোভী, স্বার্থপর ইহাদিগের যোগে অধিকার নাই। সর্বসাক্ষী ঈশ্বর সাক্ষী হইলেন। এই দুইজন সমুদয় রিপু বিনাশ করিবার জন্য সংকল্প করিল। পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, আপনার শরীর মন কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সহায় হইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। তোমরা জান না, আমিও জানি না, ঈশ্বরই জানেন কিসে দমন হয়। পৃথিবীর মধ্যে সার কর্ম, মন দমন করা। স্বর্গ হইতে বিশুদ্ধ অগ্নি আসিয়া হৃদয়ের ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেয়। একান্ত মনে নির্ভর করিয়া থাক, রিপুকুল বশীভূত হইবে। হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একজন যোগ, একজন ভক্তি অনুসরণ করিবে। প্রণালীবিধি ঈশ্বর জানেন, তোমরা জান না, আমি জানি না। তিনি প্রসন্ন হইয়া উহা প্রকাশ করেন। আমি জানাইব তোমাদিগকে, যখন তিনি শুভবুদ্ধি প্রকাশ করিবেন। তাঁহার মন্ত্র আমার কথা দ্বারা তোমাদের কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিবে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিবে। যেখানে কণ্টক, যেখানে নিশ্চিত অপবিত্রতা; স্ত্রী হউন, সন্তান হউন, সহোদর হউন, আপনার ব্রাহ্মভ্রাতা হউন, আপনার ব্রাহ্মিকা ভগিনী হউন, বিষবৎ সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যে কার্য করিলে, যাহাদের সঙ্গে যোগ দিলে, ভক্তিপ্রসঙ্গ ভঙ্গ হয়, কার্য ও তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যদি দশ দিন কি একমাস কালও একাকী থাকা আবশ্যক মনে কর, একাকী থাকিতে হইবে। প্রলোভনকে বিষধর জানিয়া সাবধানে তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিবে। অন্যে যদি কিছু না করে, তবু তোমাদের ব্রত পালন করিতেই হইবে। মন যদি তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে অস্থির হয়, তোমাদের মহাপাপ হইবে। চিত্তের অস্থিরতা, অবিশ্বাস, নিরাশা মহাপাপ। দ্বিতীয় মহাপাপ পুরাতন পাপ পোষণের ইচ্ছা। সর্বাপেক্ষা মহাপাপ অবিশ্বাস। পরস্পরের কাছে এমনভাবে থাকিবে যে অন্যে বাধা দিলে "আমরা ব্রত পালন করি না" এরূপ নির্বন্ধ কদাপি করিবে না। এই নিগূঢ় বিধি সর্বদা অপরাজিত চিত্তে পালন করিবে। যদি আদেশ পাইয়া তাহা লঙ্ঘন কর, যদি ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, মহাপরাধ হইবে। অন্য প্রকার যদি অসদাচরণ হয়, তথাপি ব্রত লঙ্ঘন করিবে না। অন্য পাঁচ প্রকার দোষ আছে বলিয়া, বিধি, যাহা বাঁচিবার উপায় এবং ঔষধ, তাহার প্রতি কখন যেন কোন প্রকার অযত্ন ও অবহেলা না হয়।'

'ভক্তির অনেক প্রণালী ও অনেক লক্ষণ আছে। চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িবে, নাম শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিবে, পাঁচজন ভক্ত একত্র হইয়াছেন, ইহা দেখিবামাত্র আনন্দিত হইবে। নামে ভক্তি, প্রেমে ভক্তি এ সমুদয় ভক্তের লক্ষণ। প্রমত্ত হওয়া, বিজয়, তোমার জীবনের অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা মনে করিবে। সামান্য নাম উচ্চারণ

করিবামাত্র তোমার হৃদয়ে প্রেম উথলিত হইবে। দিবসে রাত্রিতে ভক্তি তোমার স্বর্গ হইবে। ভক্তিতে আহ্লাদিত হইবে। চিরপ্রসন্নতা ভক্তির লক্ষণ।'

'তোমরা দুইজনে এই স্বর্গ গ্রহণ কর। তোমাদের চারিদিকে যাঁহারা বসিয়া আছেন, তোমাদের সঙ্গে তাঁহাদের কিছু ব্যবধান রহিল। তোমাদের ভিতর দিয়া যাহা কিছু জ্যোতির বার্তা আসিবে, তাঁহারা তাহাতেই শিক্ষালাভ করিবেন।'

'আমিও ব্রত গ্রহণ করিলাম না, আমিও তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব। শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিব। শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব। এই প্রকার ধর্মজ্ঞান বিনিময়ের ভিতরে বসিয়া এই ধর্ম ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যাঁহারা তোমাদের নিকটে আছেন, তাঁহারা তোমাদের নিকটে শিক্ষা করিবেন। কে বলিতে পারে—কার হস্ত পিতা কবে ধরিবেন?'

ব্রতে ব্রতী হয়ে বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রত পালন করে চললেন। যথানিয়মে নিত্যকৃত্য, মাসিককৃত্য ও অন্যান্য বিশেষ বিধি পালন করার পর ১২৮৩ সালের বৈশাখ মাসে আচার্য কেশবচন্দ্র বস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণাদি দিয়ে বিজয়কৃষ্ণকে বরণ করলেন।

এই সময় কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন, 'আপনি ঈশ্বরভক্ত, আপনি বড়। আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অভ্যন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই ভক্তবিহারীকে প্রণাম করি।'

ইতিমধ্যে গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয় জ্ঞান-ব্রতে ব্রতী হয়েছেন। ব্রতীদের জন্য আরও কতকগুলি বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। সকলেই সাধন-কাননে অবস্থান করছেন। নিষেধ—বিশেষ প্রয়োজন ও অনুমতি বিনা কানন ত্যাগ, আলস্য, উপবাস, পরনিন্দা, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, কুতর্ক, অনুমতি বিনা ফুল পাড়া। বিধি—অতিথি সমাগমে দণ্ডায়মান ও তাঁহার যথোচিত সেবা। উপাসনা-মন্দির ও ঘাট পরিমার্জনা। প্রতিজ্ঞা—'আমি কোন বিষয়ে মনে অহঙ্কার আসিতে দিব না। আমি নারী সম্বন্ধে কোন কুচিন্তা মনে আসিতে দিব না। আমি পরদুঃখে কাতর হইব। আমার জিহ্বা আমোদপ্রমোদে বা অসাবধানতাবশতঃ মিথ্যা বলিবে না। আমি কাহারও হৃদয়ে শক্ত কথা দ্বারা পীড়া দিব না। চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে আমি অনুগত দাসের ন্যায় থাকিব। আমি ভ্রাতাদের প্রসন্নতা ও আশীর্বাদের জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকিব। আমি নিজের মঙ্গল, সাধুসেবা ও জগতের হিত সাধনের জন্য উপযুক্ত পরিশ্রম না করিলে ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে ধান্য লইব না।'

কেশবচন্দ্র প্রকৃত ভক্তিমান ছিলেন। ভক্তিপ্রাবল্যে কখনও কখনও তাঁর অশ্রুধারার সঙ্গে রক্ত ঝরত। কেশবচন্দ্র, অঘোরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ সমবয়সী ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ। পরস্পরের প্রতি ছিল প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধাভক্তি। বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ একদিন কোন প্রয়োজনে বাগবাজারের দিকে যান। উভয়ে ক্ষুধার্ত হয়েছেন, তাই স্থির করেন কিছু কিনে খাবেন। ময়রার দোকানে চমৎকার রসগোল্লা দেখে বিজয়কৃষ্ণ অঘোরনাথকে বলেন. 'কেশব ধনীর দুলাল। স্বপাক আহার করে খান, তাঁর অসুবিধার অন্ত নাই। রসগোল্লা ওঁর বড় প্রিয়। চল, আমরা এক পয়সার মুড়ি খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করি, আর উদ্বৃত্ত পয়সা দিয়ে যে কয়েকটা রসগোল্লা মেলে তা কেশবের জন্য কিনে নিয়ে যাই।' যেই কথা সেই কাজ। নিজেরা মুড়ি খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে কেশবচন্দ্রের জন্য রসগোল্লা নিলেন।

মির্জাপুর স্ট্রীটের আশ্রমগৃহের ছাদের উপর অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ এবং অন্যান্য আশ্রমবাসী ব্রাহ্মভ্রাতাগণ ধ্যানে বসতেন। সকলে উঠে গেলেও বিজয়কৃষ্ণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানে ডুবে থাকতেন। আজন্ম সংস্কার বশে এমনিতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও উদাসীনদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। দীনহীন কাঙাল, বৈষ্ণব. পথচারীও তাঁর কাছে যথোচিত মর্যাদা পেতেন। কোথাও কোন উদাসীন সাধুর সাক্ষাৎ পেলে তিনি তাঁর জাতিধর্ম ও সম্প্রদায়ের ইতরবিশেষ না করে তাঁর সাথে ভগবদ্-আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে গিয়ে কতদিন বিজয়কৃষ্ণ ভস্মমাখা বিভিন্ন বেশধারী সাধু দেখে তাঁদের সঙ্গে ভগবদ্ প্রসঙ্গে ডুবে গিয়ে তাঁদের দেওয়া চন্দন ও ভস্মতিলক কপালে নিয়েই ভারত-আশ্রমে উপনীত হতেন। তিলক, ভস্ম নিয়ে তাঁর নিজের কোন সংস্কার ছিল না। একজন বৈষ্ণব যদি তাঁকে তিলকসজ্জা করে আনন্দ পান, তাতে তিনি বাধা দিতেন না। যা তাঁর বিবেকের বিচারে পরিপন্থী নয়, অথচ অপরে প্রসন্ন হন, তাতে তিনি উৎসাহই দিতেন। কিন্তু আশ্রমবাসী অনেক ব্রাহ্মদের কাছে এসব বিসদৃশ মনে হত।

পরবর্তীকালে সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে গোসাঁইজী একদিন বলেছিলেন, 'একদিন মেছোবাজার স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, আমার জুতা ছিঁড়ে গেল। রাস্তার উপর একটি মুচিকে দেখে তাকে জুতা সেলাই করতে দিলাম। কিন্তু সে মজুরী সম্বন্ধে নীরব রইল। সেলাই হলে আমি তাকে কয়েকটি পয়সা দিলাম। তার মধ্যে দুটি পয়সা আমাকে ফেরৎ দিয়ে সে তার তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিল। আমার কি রকম অস্বাভাবিক মনে হল। তার পিছন নিলাম। সে বাবুঘাটে গিয়ে একটি ভাঙ্গা খিলানে জিনিসপত্র গুঁজে রেখে গঙ্গাস্নান করল। পরে তিলকসেবা এবং সন্ধ্যাতর্পণাদি শেষ করে খিদিরপুরের দিকে চলল। আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগলাম। খিদিরপুরে সে একটি বাড়ীতে প্রবেশ করল। আমিও ঐ বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হওয়া মাত্রই একটি লোক এসে আমাকে অতিথি মনে করে ভিতরে আহ্বান করল। যেয়ে দেখি আমার দেখা সেই মুচি এই আশ্রমের মহান্তের গদীতে বসে আছেন। তাঁর অনেক শিষ্যসেবক। আমি এসব দেখে-শুনে অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার এত শিষ্যসেবক, নিজে মহান্ত, জাতিতেও ব্রাহ্মণ, তবে আপনি জুতা সেলাই করেন কেন?" মহান্ত বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে কেঁদে ফেললেন এবং হাত জোড় করে তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ করে বার বার নমস্কার করতে করতে বললেন. "গুরু আমার বড় দয়াল ছিলেন। একদিন অতিথিকে ভোজন করাবার পূর্বেই আমি আহার করেছিলাম, তাতে তিনি আমাকে শাসন করে বললেন, আরে তু কাহে সাধু হুয়া, তু তো চামার হো। আমার গুরুদেবের সেই বাক্য কি করে অন্যথা হবে? এইজন্য আমি সেই দিন থেকেই চামারের কাজ করে জীবিকানির্বাহ করছি। জুতা সেলাই করে নিজের আহার-উপযোগী চার আনা পয়সা হলেই আমি চলে আসি। গুরুদেব শেষকালে তাঁর গদিতেই আমাকে দয়া করে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু তা হলেও আমি আমার জীবিকার জন্য চামারের কাজ করেই দিন কাটাচ্ছি। আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন, শেষ দিন পর্যন্ত আমার গুরুদেবের বাক্য রক্ষা করে যেতে পারি।" এঁকে দেখার পর আমার মনে হল, এই প্রকার ছদ্মবেশে না জানি কত মহাত্মাই এখানে সেখানে পড়ে আছেন। বাইরের আকার, বেশভূষা ও আচার-ব্যবহার দেখে তাঁদের চেনবার জো নেই। কার কি অবস্থা কি প্রকারে বুঝব? তাই তখন থেকেই আমি পথে বার হলেই দুদিকে স্ত্রীলোক,

পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, মেথর, চামার, হাড়ী, ডোম, মুটে, মজুর যাঁকেই রাস্তায় আমার সম্মুখে ও দুপাশে দেখতে পাই, মনে মনে তাঁদের নমস্কার করে চলি। এতে করে লোকালয়ে যে সকল মহাত্মা মহাপুরুষেরা সময়ে সময়ে নানা প্রকার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান, সামনে পড়লেই তাঁদেরও আমার শ্রদ্ধা জানান হল।'

এ সময়ে আর একদিনের কথা আরও চমকপ্রদ। ভারত-আশ্রমে গভীর রাতে একাকী একমনে বসে ব্রহ্মনামে বিভোর বিজয়কৃষ্ণ। দরজায় মৃদু আঘাত হল। স্বপ্নচারীর মত টলতে টলতে বিজয়কৃষ্ণ অর্গল মুক্ত করে দেন। একে একে ঘরে প্রবেশ করলেন কয়েকজন দিব্যকান্তি পুরুষ। একজন এগিয়ে এসে আত্মপরিচয় দিলেন অদ্বৈতাচার্য বলে। ইনিই একে একে আর সকলকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি মহাপ্রভু', 'ইনি নিত্যানন্দ প্রভু' আর 'ইনি শ্রীবাস' বলে। পরিচয় করানোর পর তিনি বিজয়কৃষ্ণকে বললেন, 'তোমার ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হয়েছে। এখন মহাপ্রভুর অনুগত হও। এখনই তোমার সাধন হবে। স্নান করে এস।' মন্ত্রমুগ্ধের মত বিজয়কৃষ্ণ স্নান করে এসে দীক্ষিত হলেন স্বয়ং মহাপ্রভুর কাছে। দীক্ষান্তে সপার্ষদ মহাপ্রভু অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। বিজয়কৃষ্ণ বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে তদ্‌গত হয়ে রইলেন সারা রাত। ভোরবেলা পাতকুয়োর পাশে স্বামীর পরনের ধুতি পড়ে আছে দেখে যোগমায়া দেবী তা কেচে নিয়ে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কাপড় কখন ছাড়লেন?' রাতের অলৌকিক ঘটনা ও আগন্তুক চারজনের কথা তখন তাঁর স্মরণ হয়। এক অচিন্ত্য অনুভূতিতে তাঁর চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

কেশবচন্দ্রের কাছে এই বিচিত্র ঘটনার কথা খুলে বলতেই আনন্দে ও বিস্ময়ে তিনি বলেন, 'এ কথা আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না। ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিবে না, অধিকন্তু তোমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে।' পরবর্তীকালে গোসাঁইজী দুঃখ করে বলেছেন, 'কি দুর্দৈব—মহাপ্রভু-প্রদত্ত নাম কতদিন যে ধামাচাপা পড়ে ছিল! তখন তো জানতুম না তিনি যে স্বয়ং ভগবান। বরং সন্দেহ হয়েছিল, অশরীরী কয়েকটি আত্মা আমাকে বাজিয়ে নিচ্ছেন, আমি কেমনতর ব্রাহ্ম!'

১২৮৩ সালের ফাল্গুন মাসে ভক্তিসাধন-ব্রতের বছর পূর্তিতে কেশববাবু গোস্বামী মহাশয়কে বলেন, 'বড়ই আনন্দের কথা তুমি ভক্তিযোগে সিদ্ধ হয়েছ।' তদুত্তরে বিজয়কৃষ্ণ বিনয়সহকারে বলেন, 'ভক্তিভাব অঙ্কুরিত হলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় বলে শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, তার অনেকগুলিই কিন্তু আমার মধ্যে প্রকাশ পায় নি।' ভক্তিগ্রন্থে আছে ভক্তিভাব অঙ্কুরিত হলে ক্ষমা. শমতা, বৈরাগ্য, মানশূন্যতা, ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে বলবতী আশা, অপ্রাপ্তিতে উৎকণ্ঠা, তাঁর নামগানে রুচি, তাঁর গুণ বর্ণনে আসক্তি, তাঁর প্রীতিপ্রদ অধিষ্ঠানসমূহের প্রতি প্রীতি ও আকর্ষণ,—এ সব লক্ষণ ফুটে ওঠে।

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তৎ গুণাখ্যানে প্রীতিস্তৎ বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে॥[১]

কেশবচন্দ্র তাঁর মুখে এ সব কথা নির্বাক হয়ে শুনে যান। গোস্বামী মহাশয়ের

---

১. ভক্তিরসামৃত সিন্ধু

অকপট উক্তি তিনি সম্ভবত সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। কেশববাবু ছিলেন তীক্ষ্ণধী বাগ্মী, বিরাগী, ধর্মার্থী, স্বীয় পন্থায় আস্থাবান এবং স্বাধিপত্য-প্রবণ, যা তাঁর মধ্যে এনে দিয়েছিল একনায়কত্ববোধ, আত্মপ্রিয়তা।

এদিকে ভারত-আশ্রমে বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন অনাত্মীয়জন এবং প্রতিকূল পরিবেশে অসচ্ছলতার মধ্যে বাস করেও যোগমায়া দেবীর মধ্যে সন্তোষের অভাব কখনও দেখা যায় নি। দিন দিন স্বামীর যথাযোগ্য সহধর্মিণীর বিকাশই তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। সকলেই শতমুখে তাঁর অসাধারণ সত্যপ্রিয়তা, অকৃত্রিম সহৃদয়তা ও মধুর স্বভাবের প্রশংসায় ছিলেন মুখর। যোগমায়া দেবীর অনিন্দ্যসুন্দর আচরণে পরিবারে অভাববোধ অতি অল্পই ছিল। সন্তান-সন্ততির শিক্ষা এবং আচার-ব্যবহারও অনুরূপ হয়েছিল। বিজয়কৃষ্ণ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও যোগজীবন ও শান্তিসুধার শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। তাদের শৈশবে তিনি মুখে মুখে সংস্কৃত স্তোত্র শেখাতেন। গোস্বামী মহাশয়ের সন্তানেরা আহার-বিহার নিয়ে কখনও বায়না ধরে নি। কলহ-বিবাদ করেও ওরা মাতাপিতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করে নি। যোগমায়া দেবী ছিলেন সুকণ্ঠ। তিনি নিজে গাইতেন একতারা বাজিয়ে। শান্তিসুধা এবং পরে প্রেমসখীর জন্ম হলে তিনি তাদের দুজনকেই গান শেখান। উত্তরকালে গোঁসাইজী একদিন কথা প্রসঙ্গে সহধর্মিণী সম্বন্ধে শিষ্য শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, 'ওঁর সহযোগিতায়ই আমার ধর্মপথে চলা সম্ভব হয়েছে। উনি ছিলেন বিদ্যাশক্তি। একটি দিনের তরেও কোন ভোগসামগ্রী তিনি আমার কাছে চান নি। অভাব-অনটনের মধ্যেও কখন ওঁর মুখ মলিন দেখি নি। নারী যদি তার মোহিনীশক্তি আত্মসুখে নিয়োগ করে, তা হলে পুরুষের কি সাধ্য ধর্মপথে অগ্রসর হয়।'

ভক্তি-পথের ভিখারী বিজয়কৃষ্ণের তখন 'তৃণাদপি সুনীচেন' ভাব প্রায় সব সময় একা একাই থাকতে চান। এ সময় কেশবচন্দ্র একদিন গোস্বামী মহাশয়কে বলেন, 'গোসাঁই, তোমার মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতের আর আমার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের ভাব বিদ্যমান রয়েছে। এই কি তুমি উপলব্ধি করতে পার?' বিজয়কৃষ্ণ ভাবেন, 'একি বাতুলতা! কেশবচন্দ্র এ সব কি কথা বলছেন, তিনি কি তবে অবতার হতে চাইছেন?' কেশবচন্দ্রের ভাবধারণা সেদিন বিজয়কৃষ্ণ খুব ভাল মনে গ্রহণ করতে পারলেন না।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরের ঘটনা। নিরীহ আশ্রমবাসী হরনাথ বসুর পরিবারের প্রতি ভারত-আশ্রমের অধ্যক্ষ প্রচারক উমানাথ গুপ্তের রূঢ় ও হৃদয়হীন আচরণের প্রতিবাদ করেন বিজয়কৃষ্ণ। কয়েকজন প্রচারককে সত্যের অপলাপ করে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে কথা বলতে দেখে তিনি মর্মাহত হন। পক্ষপাতদুষ্ট এই পরিবেশে আর থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। এইদিনই তিনি সপরিবারে ভারত-আশ্রম ত্যাগ করে বাগ-আঁচড়া রওনা হয়ে যান।

বাইশ বছর বয়সে বিজয়কৃষ্ণ প্রথম গিয়েছিলেন বাগ-আঁচড়ায়। ওখানকার কয়েকটি পরিবারকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। মধ্যে মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি ওখানে গিয়ে থেকেছেন; সমাজগৃহ, বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। এখানে এসে খুব কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন বিজয়কৃষ্ণ। সকালে রোগী দেখা, দুপুরে শিক্ষকতা, রাত্রে ধর্মোপদেশ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ; শনিবার ব্রহ্মোপাসনা ও রবিবার সঙ্গত-সভা, বৃহস্পতি ও শুক্রবার অপরাহ্নে ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষণ ছিল তাঁর বাগ-আঁচড়া-বাসের দৈনন্দিন কর্মসূচী। তাঁর পবিত্র জীবন-সংস্পর্শে গ্রামটি একটি আদর্শ ব্রাহ্ম-গ্রামে পরিণত হয়। গ্রামবাসীরা হাট-

বাজারে দর কষাকষি পর্যন্ত করে না; তারা সামান্য লাভে জিনিসপত্র বিক্রয় করে—ক্রেতারাও এককথায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে নেয়। মিথ্যা কথা বলতে হবে এই ভয়ে তারা মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত করে না।

অগ্নিপ্রাণ আত্মার আলোর অনুরাগে,
অন্য মনে মহৎ হবার প্রেরণা জাগে।[১]

অগ্নির সংস্পর্শে যেমন পূতিগন্ধযুক্ত আবর্জনা ভস্মীভূত হয়, তেমনি অগ্নিগর্ভ পুরুষের প্রভাবে মানুষের ভুলভ্রান্তি, নীচতা, স্বার্থচিন্তা দূর হয়।

এবারকার বাগ-আঁচড়ায় নির্জন বাস বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম-সাধনের পথে খুব অনুকূল হয়। ১২৮৪ সালের ভাদ্র মাসে এখানে ব্রহ্মোৎসবে মন্দাকিনী প্রবাহ যেন নেমে আসে, আনন্দের হাট বসে। এক বছরের জন্য একটি ব্রত নিয়েছেন গোস্বামী মহাশয়। প্রাতে একজোড়া করতাল নিয়ে বাড়ী বাড়ী কীর্তন করে একজনের উপযোগী ভিক্ষান্ন নিয়ে গৃহে ফিরে স্বপাক আহার করতেন। কোলাহলমুক্ত নির্জন সাধনায় তাঁর আত্মদৃষ্টি ক্রমশ প্রখর হতে থাকে। তিনি লিখেছেন, 'আমি যখন বাগ-আঁচড়া গ্রামে ছিলাম, তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ম হয়; এবং তাহাতে দেখি যে জীবনে প্রকৃত ধর্মের অবস্থা অতি হীন। সুবিধা হইলে এবং লোকে না জানিতে পারিলে সকল প্রকার পাপই আমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে; অর্থাৎ তখনও পাপাসক্তির মূল জীবিত ছিল। অবকাশ পাইলে অনায়াসেই আমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। এইরূপ হীন অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল। এতকাল ধর্মচিন্তা, আলোচনা, উপাসনা, ধ্যান-ধারণাদি এবং নানা দেশ-বিদেশে ধর্মপ্রচার করিয়া হায় আমার অবস্থা এমন হীন ও শোচনীয়! তবে ধর্মের ভিত্তি কোথায়? নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইল। বুঝিলাম যে ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তৎসহ বাস ব্যতীত ইহার আর কোন উপায়ই নাই। তাঁহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এই মহাব্যাধির অন্য ঔষধ নাই।'[২]

সংসারের চারিদিকের দেয়াল বড় ধুলো-কালি মাখা
একটু অসাবধান হলেই তা গায়ে লাগে, মনের চেহারা বদলায়—
... ...
বিচারের আলোয় খুব সতর্ক হয়ে চলতে হয়,
তা হলে আর থাকে না ভয়॥[৩]

গোস্বামী মহাশয় আর এক জায়গায় লিখেছেন, 'এই সময় বাগ-আঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উদ্যানে একদিন নির্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছি, হঠাৎ আমার মধ্যে যেন একটি জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল এবং কে যেন বলিল, 'তুই আর আপনাকে বন্ধ রাখিস না। গণ্ডির মধ্যে থাকিলে ধর্ম হয় না।' এদিকে কিন্তু কলিকাতা হইতে প্রচারক-ভ্রাতারা পত্র লিখছেন সত্বর কলিকাতায় এসে ভক্তি-তরঙ্গে ডুবে যেতে। ইচ্ছা যে না হয় তা নয়, তবে মনে যেন আর তেমন করে সায় পান না বিজয়কৃষ্ণ। এই সময়ই গোস্বামী মহাশয় আবার স্পষ্ট দৈববাণী শোনেন, 'যদি ধর্ম-জীবন চাও,

---

[১] শ্রীমদ্ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী প্রণীত 'অক্ষর'

[২] শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত 'যোগসাধন'

[৩] শ্রীমদ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী প্রণীত 'অক্ষর'

আর গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিও না।' এই গণ্ডি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'আমি পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড়িতে গিয়া পাখায় বল পাই না; তখন বুঝিলাম ইহা গণ্ডির পরিণাম।'[১] এই প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছেন, 'ঐ সময়ে আমার কার্য-প্রণালী, বক্তৃতা ও উপদেশাদি লইয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে খুব হুলস্থুল পড়িয়াছিল। আমি অত্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলাম। আমার কয়েকটি বন্ধু এই সকল আলোচনার প্রতিবাদ করাতে, কলিকাতা হইতে আমাকে পুনঃ পুনঃ লিখিতে লাগিলেন এবং আমাকে কলিকাতায় উপস্থিত হইতে বলিলেন। আমি বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। নিজের কর্তব্যবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে থাকা ঠিক হইবে কিনা, প্রাণে সর্বদা এই আলোচনা হইতে লাগিল। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম, "ঠাকুর, এ সময় আমার কি করা কর্তব্য বলিয়া দাও।" এই সময় পরিষ্কাররূপে আকাশবাণী হইল, শুনিলাম, "গণ্ডির ভিতর থাকিলে, জীবনে সত্য লাভ হইবে না।" আকাশবাণী শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। মানুষের দিকে চাহিয়া চলিলে ধর্মকর্ম কখনও হয় না। মানুষে আমার কার্যের নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন, সেইদিকে দৃষ্টি পড়িলেই সর্বনাশ। কাহারও দিকে না তাকাইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যদি নিজের কর্তব্য-বুদ্ধিতে কার্য করিয়া যাইতে পারি, ইহা হইলেই রক্ষা, না হইলে নিজেকে বাঁচান বড়ই কঠিন। সত্য অনন্ত, সত্যের ভাব অনন্ত, সত্যের রূপ অনন্ত, আবার এই সত্য লাভের উপায়ও অনন্ত। এই সত্য লাভের জন্য সকলকেই যে একই পথে, একই মতে চলিতে হইবে, তাহা বলা যায় না। মানুষ যেমন পৃথক পৃথক, তাহাদের প্রকৃতিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সকলকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন পথ, সুতরাং প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অবলম্বন করা আবশ্যক হয়।'

বাগ-আঁচড়ায় শান্ত পরিবেশে একমনে ব্রহ্মসাধনায় বড়ই আনন্দলাভ করছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। মাঝে মাঝে কলিকাতার ব্রাহ্মভ্রাতারা চিঠিপত্রে তাঁর মনকে অস্থির করে তুলতেন সন্দেহ নেই, তবে সেটা সাময়িক মাত্র। গ্রামের ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান ধর্মপিপাসু জনসাধারণের সরল প্রাণের অনাবিল আকুতি তাঁর সাধনার পথে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। তাঁদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে একাত্ম করে ফেলেছিলেন। প্রতিদিনই বহু ধর্মার্থী এসে সমবেত হতেন বাগ-আঁচড়া ব্রহ্মমন্দিরে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গ ও উপদেশ লাভ করবার জন্য।

ব্রাহ্মধর্ম এবং সমাজের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'আমি জীবনের পরীক্ষায় বুঝিয়াছি ব্রাহ্মসমাজ কোন দল বা সম্প্রদায় নহে। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, খ্রীস্টান সকল সম্প্রদায়েরই সেই পরব্রহ্মের পূজাই লক্ষ্য। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা যেখানে, সেখানেই ধর্ম। ধর্মই উদ্দেশ্য, দল নহে। দলাদলি না করিয়া প্রকৃত ধর্মের জন্য লালায়িত হইলে আর ব্রাহ্মসমাজ লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ করিতে হয় না।'[২]

---

[১] শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রণীত 'ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়'

[২] শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রণীত 'ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়'

স্বার্থের প্রাচীরে ঘেরা মন—
তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন,
রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশের মতন॥[১]

এখানে গোস্বামী মহাশয় একদিন একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নটির বিবরণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ‘যখন আমি বাগ-আঁচড়ায় ছিলাম তখন একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, আমি একটা ভীষণ অরণ্যের মধ্যে বাস করিতেছি। অরণ্য ঘোরতর অন্ধকার ও হিংস্রজন্তুগণের বিকট চীৎকারে পরিপূর্ণ। আমার সাথের সাথী কিছুই নাই। সে অরণ্য হইতে বাহির হইবার কোনও পথ পাইতেছি না। যতই চলিতে যাই, পথ হারাইয়া কেবল ঘুরিয়া মরি এবং কণ্টকাঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়। শ্বাপদ-গণ যেন প্রতি মুহূর্তে আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমি নিরাশ্রয় হইয়া দিশাহারা হইয়াছি এমন সময় উপরে একটি আলো দেখিলাম। রাস্তায় বা দোকানের সাইনবোর্ডে যেমন একখানা হাত আঁকা থাকে, সেই আলোর মধ্যে সেইরূপ একখানা হাত আঁকা দেখিলাম। হাতের তর্জনী অঙ্গুলী আমাকে এক দিক দেখাইয়া দিতেছে। আমি সেই সঙ্কেত অনুসারে আঙ্গুল যেদিকে দেখাইতেছিল সেইদিকে চলিলাম। হাতখানি আমার মাথার কিছু উপরে উপরে আমার আগে আগে চলিল। এইভাবে আমি অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে অরণ্য উত্তীর্ণ হইলাম। তখন সম্মুখে এক প্রকাণ্ড তরঙ্গাকুল নদী পড়িল। আমি সভয়ে নদীর তীরে দাঁড়ালাম। তথায় একটি সাইন বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, বিশ্বাসীর পারের ঘাট। কিন্তু আমার পথপ্রদর্শক সেই হাতখানি নদীর উপর দিয়া চলিল দেখিয়া আমি সাহসের সহিত নদীতে অবগাহন করিলাম। প্রকাণ্ড নদী, অগাধ জল, প্রবল স্রোত, প্রলয়-তরঙ্গ; কিন্তু কিছুতেই আমার কিছু করিতে পারিল না। আমি আমার রক্ষাকর্তার হাতের পশ্চাতে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেলাম। অবশেষে একটি পাহাড়ের উপরিস্থিত একটি আশ্রম দেখাইয়া হাতখানি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। আমি সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরের মধ্যে মহাবীরের মূর্তি। মহাবীর আমাকে হাত ইসারা করিয়া পাহাড়ের শিখরদেশে একটি স্থান দেখাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেইদিন হইতে আমি বুঝিয়াছি যে অপার্থিব হস্তের ইঙ্গিতেই আমাকে চলিতে হইবে। মনুষ্যের মতে চলিতে হইবে না।’

লোকনিরপেক্ষ ধর্মসাধনা সামাজিক জীবনে দুরূহ। যাঁরা লোকমতের ঊর্ধ্বে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তাঁরা অসাধারণ। গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ তিনি জনমতের ঊর্ধ্বে অবস্থান করতেন। ধর্মের নিরাপদভূমি লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয় তাঁর এই বাগ-আঁচড়ায় ধর্মজীবন সাধনার পথে। সে সময়ই তিনি লিখেছিলেন, ‘যদিও সামাজিক ধর্ম মানুষকে সুখী করে, আনন্দ দেয়, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত নিরাপদ অবস্থা লাভের সম্ভাবনা নাই। জীবনে এই ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিষ্ঠার জন্য আরও নিমগ্ন হইতে হইবে, আরও প্রগাঢ়রূপে তাঁহার সাধন-ভজনে নিয়োজিত হইয়া দিবসযামিনী তৎ-সহবাসে বাস করিতে হইবে।’

বাগ-আঁচড়ায় বিজয়কৃষ্ণ ধর্মের নিরাপদভূমি প্রাপ্তির জন্য গভীর ধ্যানধারণায়

---

১. শ্রীমদ্ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী-প্রণীত ‘অক্ষর’

নিমগ্ন হয়েছেন, আর এদিকে কলিকাতায় এসময় কেশবচন্দ্রের কন্যার বিয়ের ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রচণ্ড হুলস্থুল শুরু হয়ে গেছে 'ব্রাহ্ম বিবাহ-বিধি' আইনে পরিণত হবার সাত বছর যেতে না যেতেই এই আইন অমান্য করার জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র। কোচবিহারের রাজার সঙ্গে তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহের সম্মতি দিয়েছেন তিনি। কন্যা অপ্রাপ্তবয়স্কা, তদুপরি হিন্দুমতে বিবাহ, উভয়ই ব্রাহ্মসমাজের নীতি-বিরোধী। স্বভাবতই আলোচনা আন্দোলন পর্যায়ে পর্যবসিত হল, বাদ-প্রতিবাদ অনেক স্থলেই ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে গেল। অধিকাংশ ব্রাহ্মভক্তগণ কেশবচন্দ্রের এই আচরণে খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন; তাঁরা বিজয়কৃষ্ণকে এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আহ্বান করেন। এ সময় গোসাঁইজীর মানসিক অবস্থা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের অপূর্ব শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি। চিরকাল তাঁহারই চরণ ধরিয়া থাকিব। কোন মনুষ্যের মতে অনুমোদন করিব না। এজন্য যদি অনাহারে সপরিবারে শুকাইয়া মরি তাহাও সুখের বিষয়।'

'এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি মনে করিয়াছি, এখন হইতে একাকীই মহান ঈশ্বরের সত্যনাম প্রচার করিব। কোন দলে আর প্রবেশ করিব না। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির জন্য সত্যকে রক্ষা করিবেন, প্রাণপণে তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব।'

'বিদ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা, কপটতা এই সকল পাপ হইতে দূরে থাকিয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পবিত্র সত্য প্রচার করিব।'

'সত্যের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে হইবে; কিন্তু হিংসা, বিদ্বেষ, নিন্দা প্রভৃতি পাপে যেন ব্রাহ্মদিগের হৃদয় কলঙ্কিত না হয়।'

কেশবচন্দ্র নিজেই একদিন যে বিধানকে 'ঈশ্বরের বিধান' বলে সানন্দে ঘোষণা করেছিলেন, সেই বিধান অগ্রাহ্য করে এখন আবার 'ঈশ্বরের আদেশ' বলে আপন কন্যার বিবাহ স্থিরীকৃত করেছেন। স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য যিনি ভগবানকে আপন ইচ্ছামত চালনা করতে পারেন, তাঁকে বিজয়কৃষ্ণ কোন প্রকারেই সমর্থন করতে পারেন না। সত্যের এই অপলাপ তিনি কখনই সহ্য করবেন না। কেশবচন্দ্র তাঁর অন্তরের সুহৃদ সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি তো আর তাঁর প্রাণের আরাম, মনের আনন্দস্বরূপ নন।

স্বাভাবিক কারণেই বিজয়কৃষ্ণ বাগ-আঁচড়ায় বসে কেশবচন্দ্রের এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে থাকলেন। এতে কেশবচন্দ্রের কোন একজন অতি ভক্ত ব্রাহ্ম যোগমায়া দেবীকে ভীতিপ্রদর্শন করে একখানি চিঠি লেখেন, 'আপনি গোস্বামী মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিবেন, তিনি যেন কেশববাবুর বিরুদ্ধে কিছু না লেখেন অথবা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বন না করেন। এরূপ করিলে আপনারা নিরুপায় হইয়া পড়িবেন।'

এই চিঠি পড়ে বিজয়কৃষ্ণ খুব কৌতুক বোধ করেন। অতি-ভক্তির এই অশালীন প্রকাশে বিরক্তির সুরে গোঁসাইজী বলেছিলেন, 'ইঁহারা কি পাগল হইয়াছেন? কেশববাবু কি আমার সৃষ্টিকর্তা না পালনকর্তা? আমি কি তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি? সত্যের অবমাননা আমি কখনও সহ্য করিতে পারিব না।'

সত্য ও শরণাগতির মূর্ত প্রতীক বিজয়কৃষ্ণ; সত্যরক্ষার্থেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর প্রতিবাদ-ধ্বনিতে ব্রাহ্মভ্রাতাগণের মনে আশার সঞ্চার হল। 'ঢাকা

প্রকাশ' পত্রিকায় তিনি লিখলেন, 'পূর্বে মনে করিতাম, ব্রাহ্মসমাজ চিরশান্তির স্থান, এখানে কোন প্রকার গোলযোগ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। এক একবার মনে করি, ব্রাহ্মসমাজে যাহা হয় হউক, আর কোন প্রকার আন্দোলন করিব না। কিন্তু সত্যের প্রতি, ধর্মের প্রতি এবং স্বদেশের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর স্থির থাকিতে পারি না। অন্যায় ও অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ; সুতরাং উদাসীন থাকিতে পারি না। আমি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বসাধারণের নিকট নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।'

'কেশববাবুর সঙ্গে আমার শত্রুতা ছিল না, এখনও নাই। কেবল ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার কথা বলিতে হইতেছে। আমাকে লোকে অস্থির, চঞ্চল প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করিতেছে। তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। যখন যাহা সত্য বুঝিব, তাহাই প্রতিপালন করিব। তজ্জন্য চিরদিন বরং অস্থির থাকিতেই অভিলাষ করি। কিন্তু কোন বিষয়কে অসত্য জানিয়াও স্থায়ীভাবে তাহার অনুসরণ করাকে কপটতা, মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি।'

'কেশববাবু ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইলে ব্রাহ্মমন্দির হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই বিধি কেবল রাজবিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের বিধি, তাঁহার আদেশেই সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় কন্যার বিবাহে কেশববাবু সেই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এক নূতন আদেশ প্রচার করিলেন, যাহাতে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইবে।'

'পাপকার্যকে ঈশ্বরাদেশ বলিলে যেরূপ ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি অপ্রেমও প্রকাশিত হয়। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি কি নিজের দোষ উপাস্য দেবতার উপর স্থাপন করিতে পারেন? কখনই না।'

'ঈশ্বরের আদেশ ব্রাহ্মদিগের ধর্মশাস্ত্র; তাহা তাঁহারা কোন কালে অস্বীকার করিতে পারেন না, যথার্থ ঈশ্বরাদেশকে আমরা সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকি। ঈশ্বর সত্য, পবিত্র, অপরিবর্তনীয়; তাঁহার আদেশও সত্য, পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয় হইবে। আদেশ অসত্য, অপবিত্র এবং পরিবর্তনীয় বলিলে আমরা ঘৃণার সহিত তাহা পরিত্যাগ করিব।'

'হিন্দুসমাজে অতি আদরে ও সম্ভ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলাম। কিন্তু সত্যস্বরূপ ঈশ্বর আমার হৃদয়কে যতই সত্যের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই আমি হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। মনে করিতাম, ব্রাহ্মসমাজে সকল অভাব দূর হইবে, ব্রাহ্মসমাজ শান্তিনিকেতন; সেখানে অশান্তি, অসত্য নাই। বাস্তবিকও ব্রাহ্মসমাজকে প্রথমে শান্তিনিকেতনই দেখিয়াছিলাম; তখন ব্রহ্মনাম শুনিবামাত্রই আনন্দ হইত। এখন বোধ হয়, সে সকল স্বপ্ন; মনে হয় দয়াময় ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ছবি একবার প্রকাশ করিয়া আমাদের দোষে তাহা কাড়িয়া লইয়াছেন। এখন ব্রাহ্মসমাজে শান্তি নাই, সত্যেরও সমাদর নাই। অশান্তি ও অসত্যের প্রশ্রয়স্থানকে আর ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। ব্রাহ্মসমাজ বলিতে হইলে পূর্বের আদর্শের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে।'

'ব্রাহ্মসমাজের দুর্গতি হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে হইবে যে, ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের সম্মান অপেক্ষা মনুষ্যের সম্মান ও মনুষ্যের প্রতি ভালবাসা অধিক হইয়াছে বলিয়াই ঈশ্বরের সত্য ব্রাহ্মদিগের নিকট হৃতগৌরব হইয়াছে।'

'ঈশ্বর বলিলেন, আমার সমক্ষে আর কাহাকেও পূজা করিও না। কতকগুলি

ব্রাহ্ম সে আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া কেশববাবুকে অবতার মনে করিয়া পূজা করিলেন। ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল, কেশববাবু অবতার নহেন এইরূপ প্রতিবাদ দেখিয়া দুইজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব হইয়া গেলেন।'

'পৃথিবীর সমস্ত সাধু-ভক্তদিগের নিকট মস্তক অবনত করিব, কিন্তু ঈশ্বরের সিংহাসনে কাহাকেও বসিতে দিব না।'

'যাঁহারা আমা কর্তৃক পত্রিকায় প্রকাশিত কথা কেশববাবুর মুখে স্বকর্ণে শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদের প্রতিবাদ করিবার অধিকার নাই। চন্দ্র-সূর্যের প্রত্যক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু আমার কথায় বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। আমি স্বকর্ণে স্বয়ং কেশববাবুর মুখে শ্রবণ করিয়াছি।'

'বন্ধুগণ, প্রাণসম ব্রাহ্মসমাজের আর দুর্গতি দেখিতে পারিব না। প্রাণ ফাটিয়া যায়, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে; এখন ঈশ্বরের রাজত্ব বিস্তৃত হউক। ব্রাহ্মসমাজের শান্তি-সদ্ভাব বিস্তৃত হউক।'

এ সময় আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ গণ্যমান্য ব্রাহ্মেরা কালীনাথ দত্ত ও নবকুমার বাগচিকে বাগ-আঁচড়া পাঠান সপরিবারে গোস্বামী মহাশয়কে কলিকাতা নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে। পূর্ব বাংলার ব্রাহ্মেরাও তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যেতে উদ্যোগী হলেন। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মভ্রাতাগণের আন্তরিক আহ্বানে তাঁদের সঙ্গেই সপরিবারে বাগ-আঁচড়া থেকে কলিকাতা ফিরে আসেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান

১২৮৫ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ কেশববিরোধী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত সভ্যদের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয় কলিকাতা টাউন হলে। একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনার জন্যই আহূত হয় এই সভা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুমোদনক্রমে এই নূতন ব্রাহ্মসমাজের নাম হয় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। বিদুষী ইংরেজ মহিলা মিস্ কলেট গোস্বামী মহাশয়কে প্রধান করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ এতে রাজী হন না। তবে এই দিনের এই বিশেষ অধিবেশনে গোস্বামী মহাশয় মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন,—'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হউক'। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ অধিকাংশ সদস্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। গোস্বামী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য ও প্রচারক পদে বৃত হন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সমাজগৃহ নির্মাণের জন্য কেশবচন্দ্রের নামে কেনা মেছুয়াবাজারের জমির উপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কোন দাবি তুললেন না। এই জমি কেশবচন্দ্রের অনুবর্তীদের হাতেই রইল।

জীবনে আঘাত কেশবচন্দ্র অনেক পেয়েছেন, কিন্তু এবারের আঘাত বড়ই মর্মান্তিক। জীর্ণবসনের মত অতি আপন বন্ধুজনেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে গেলেন। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপবাদ সবই তাঁকে সহ্য করতে হল নীরবে। অনুবর্তীরা কখনও নরম, কখনও গরম, কখনও সরব হলেও কেশবচন্দ্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে নীরবে উপেক্ষা করেছেন। এই নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মধ্যে যে পরিকল্পনা ও কর্মপ্রণালী কেশবচন্দ্র গ্রহণ করলেন, তার দ্বারা সমগ্র বঙ্গসমাজ এক

অসাধারণ ধর্ম-সাহিত্য-সম্পদ লাভ করল। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রচর্চা এবং যথাযোগ্য পাত্রে এই শাস্ত্রানুশীলনের ভার অর্পণ করায় যে সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়ে উঠল তা সকল দিক থেকেই অতুলনীয়। খ্রীস্ট ধর্মচর্চায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রচর্চায় সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রচর্চায় গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, মুসলমান ধর্মশাস্ত্রচর্চায় মৌলানা গিরিশচন্দ্রের অবদান বাংলা সাহিত্যে সুমহৎ। কেশবচন্দ্রের এসময়কার বক্তৃতা ও উপদেশ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মূল্যবান নিবন্ধগুলি বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্ভার। সর্বধর্ম ও সর্বশাস্ত্রচর্চায় গভীরভাবে নিমগ্ন হলেন আত্মজনপরিবৃত কেশবচন্দ্র। প্রত্যেকেরই সাধনার পথ ও মত বিভিন্ন হলেও লক্ষ্য ছিল সকলেরই এক—ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মানন্দলাভ এবং সত্যের সমন্বয়সাধন। এইভাবে চলতে চলতে কেশবচন্দ্র তাঁর সাধনার ক্ষেত্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে নূতন করে নামাঙ্কিত করলেন 'নববিধান সমাজ' বলে। এতে বিরুদ্ধপক্ষের উদ্যম আরও সংহত, আরও সমুজ্জ্বল হতে লাগল দিন দিন। বিধাতার অমোঘবিধান, দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই ঘটে আদর্শের বিকাশ, সত্যের হয় সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা। বিজয়কৃষ্ণ সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠায় আরও গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন স্বতন্ত্র স্বভাবের মানুষ। বিজয়কৃষ্ণের বিরোধ ছিল মতাদর্শের, ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে নয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হল কিন্তু কেশবচন্দ্র তাঁর অতি আপনজনই রইলেন। মত ও পথের ভেদ থাকা সত্ত্বেও সমগ্র ব্রাহ্মবন্ধুগণের মধ্যে কেশবচন্দ্র এবং সাধু অঘোরনাথ ছিলেন বিজয়কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভেদ উভয়ের অন্তরে অন্তরে। এ-ভেদ, এ-বিচ্ছেদ বিজয়কৃষ্ণের পক্ষে দুঃসহনীয় হলেও, অনিবার্য হয়ে উঠে। যা বিজয়কৃষ্ণ সত্য বলে মনে করেন না, তার সঙ্গে আপোষ করে চলার মানুষ তিনি নন। তাঁর কাছে সকল সম্পর্কের ঊর্ধ্বে ছিল সত্য। সত্যের জন্য, আদর্শের জন্য জীবন আহুতি দিতেও তিনি পরাঙ্মুখ নন। সত্যার্থে নিবেদিতপ্রাণ বিজয়কৃষ্ণ; সংসারে থেকেও তিনি সন্ন্যাসী, নির্লিপ্ত, নিরাসক্তচিত্ত। বসুজন তাঁর কুটুম্ব। তিনি যেমন, তেমন ভাবেন সকলকে—স্বার্থদুষ্ট সংসারে, তাই পেতে হয় তাঁকে দুঃখ, আঘাত। অশান্তির অনলে দগ্ধ হয়ে অনেক সময় নির্জনে বসে আত্মসমীক্ষায় রত হন, চলে সত্যের সন্ধান, নীরব জীবন-সাধনা। তিনি সত্যের জন্য কোন সংগ্রামকেই ভয় করেন নি, আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আপন সত্যাদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিসীম উৎসাহ ও উদ্দীপনায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে নিজেকে সর্বপ্রযত্নে নিয়োগ করেছেন। কিন্তু কোথায় যেন তাঁর একটা অতৃপ্তি ছিল, অভাববোধ ছিল। প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম, যা সনাতন ব্রহ্মবাদ থেকে বহু স্বতন্ত্র, উপনিষদের উদার মহান সত্যের এক খণ্ডিত রূপ, তা বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসাকে বেশিদিন নিবৃত্ত করতে পারল না। তিনি আকুল আগ্রহ নিয়ে অমৃতের অন্বেষণ করতে লাগলেন।

অনন্যসাধারণ লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী হয়ে জগৎবরেণ্য হওয়া সম্ভব, সম্ভব দুর্জয় সাহস ও শক্তির অধিকারী হয়ে ইতিহাসের অমর অধ্যায় রচনা; কিন্তু সাধনা ভিন্ন সম্ভব নয় সর্বলোকেশ্বরের সামান্যতম পরিচয় জ্ঞাত হওয়া, সম্ভব নয় আত্মার পরমাত্মীয়কে আপন অন্তরে অনুভব। এ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ, এ-পথে জীবন দিয়ে পেতে হয় জীবনেশ্বরের পরিচয় এবং এই পথের সিদ্ধপুরুষরাই কেবলমাত্র লোকশিক্ষার অধিকারী হতে পারেন। অধিকার ভেদে এঁরা

'তর' 'তম' হতে পারেন, সে-কথা সম্পূর্ণ আলাদা। আকার-নিরাকার, স্বগুণ-নির্গুণ, সবিশেষ-নির্বিশেষ সব পথই পথ, সব পথেরই লক্ষ্য এক। এই লক্ষ্যবস্তুতে আত্মসমাহিত যিনি, তিনিই শুধু লোকশিক্ষার অধিকারী। অপরোক্ষ অনুভবের উপর, অখণ্ড সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁদের বাণী, সেই বাণীই সর্বদেশের সর্বকালের সর্বলোকের পরম আস্বাদনীয় বস্তু। এইভাবেই ভারত-আত্মার অমর-বাণী যুগ যুগ ধরে প্রচারিত হয়ে আসছে। যিনি সত্যকে জানেন, তিনি তাঁকে জানেন। যিনি তাঁকে জানেন, তিনিই শুধু মানুষের ঘরে তাঁর অমৃত-আলোক বহন করে নিয়ে যাবার অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, চাপরাস না পেলে প্রচার করা যায় না। কেশবচন্দ্র ভগবানের চিহ্নিতজন ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর-অনুজ্ঞার অভাবে তাঁর ধর্মমত প্রচারের চেষ্টা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। দুই কন্যার বিবাহ একটি উপলক্ষ্যমাত্র। কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে সনাতন ধর্মের সত্য উপলব্ধি করেন। একারণেই, মনে হয়, তিনি তাঁর কন্যার বিবাহে সম্মতি দেন, পূর্বমত পরিবর্তন করেন। কেশবচন্দ্র সামান্য স্বার্থের জন্য জীবনের বৃহত্তম স্বার্থ বিসর্জন দেন নি; এর পশ্চাতে ছিল সনাতন ধর্মের প্রতি তাঁর ক্রমবর্ধমান শ্রদ্ধা; এবং রাজশক্তির ও স্বধর্মনিরতা, গৌরভক্তের শিষ্যা আপন জননীর প্রভাব।

'যত মত তত পথ' এ-কথা নূতন কিছু নয়। কিন্তু এ-কথা রামকৃষ্ণের মুখে নূতন করে শোনাল সর্বধর্ম সর্বশাস্ত্র সমন্বয়ের অপূর্ব বাণীরূপে। অথচ গভীর অনুশীলনলব্ধ এই সত্যটি নববিধান সমাজে গৃহীত হলেও তা সকলের অন্তরকে তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারে নি সেদিন; কেননা এতে কেশবচন্দ্রের ছিল দুর্বলতা। তিনি যদি 'নির্দ্বন্দ্ব' হতে পারতেন, যদি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর-ইচ্ছার আলো হাতে নিয়ে চলতে পারতেন, কোনভাবে লোকাপেক্ষা না করতেন, তাহলে আর এমনটি হত না। কেশবচন্দ্রের এ অবস্থা সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'এদিক ওদিক দুই রাখতে গিয়ে তেমন কিছু পারলেন না।' সংসারে থেকে লোক-শিক্ষাদানের ব্রতে ব্রতী হওয়া সহজসাধ্য বিষয় নয়। কেশবচন্দ্রের বিফলতা এখানেই। এই প্রসঙ্গে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের মন্তব্যে অনেকে দ্বিমত প্রকাশ করলেও, তাহা সেকালের দৃষ্টিতে কেশবচরিত্রের একটি বিশেষ পরিচয় তুলে ধরেছে। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে 'রাণাঘাটের মেলা' নিবন্ধে লিখেছেন, 'এই মেলায় আমি খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেনের জননীদেবীর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার দীর্ঘ তেজস্বিনী দেবীমূর্তি দেখিয়াই বুঝিলাম যে, এমত মাতা না হইলে এমন পুত্র হয় না। এই মাতৃমূর্তি দেখিয়া আমার হৃদয় ভক্তিতে ভরিয়া গেল। আমি তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিলাম—"মা! কেশববাবু আমাকে বড় স্নেহ করতেন, এবং কৃষ্ণবিহারী আমার সহপাঠী ছিলেন। আমি আপনার পুত্র। আপনি আমার শিবিরে চলুন।" সঙ্গে আমার স্ত্রী নাই। বিশেষতঃ তিনি মন্দিরের নিকটে থাকিতে চাহেন বলিয়া, আমাকে অনেক আশীর্বাদ করিয়া, যাইতে অসম্মত হইলেন। শুনিলাম, তিনি বৎসর বৎসর আসিয়া মন্দিরের ছায়াতে "হরিবাসর" কাটাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মধর্মের নববিধান-প্রবর্তক কেশবচন্দ্রের মাতা বৈষ্ণবদের পৌত্তলিক মেলায় আসিয়াছেন—অপূর্ব সমাচার! কেশববাবু অজাতশ্মশ্রু যুবকদের পালে পালে "নিরাকারিক" করিয়াছেন, আর তাঁহার আপনার বৃদ্ধা জননী "সাকারিক বা পৌত্তলিক"!

প্রতাপবাবুর রচিত কেশববাবুর জীবনীতে তাঁহার মাতার অঙ্কে মস্তক রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণের বর্ণনা-পাঠে অশ্রুপাত করিয়া, সেইখানে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—"মাতা হিন্দুধর্মের অঙ্কে শিশু ব্রাহ্মধর্মের নির্বাণ।" দুঃখের বিষয় যে, ব্রাহ্মরা এ-কথা বুঝিতেছেন না। বেদান্তমূলক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া ক্ষণজন্মা রামমোহন রায় দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যথা আজ অর্ধেক শিক্ষিত হিন্দু খৃষ্টান হইত। কেশববাবু তদানীন্তন খৃষ্টধর্মের প্রাবল্যে বেদান্তমূল হইতে ব্রাহ্মধর্ম বিচ্ছিন্ন করিয়া, উহা খৃষ্টধর্মের স্রোতে এরূপ বেগে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার "যিসাস ক্রাইষ্ট, ইউরোপ অ্যান্ড এশিয়া" বক্তৃতার পর তাঁহার খৃষ্টান হইবার বড় বাকী নাই বলিয়া মিশনারিরা আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আকর্ষণে পড়িয়া কেশববাবু নিজের ভ্রম বুঝেন এবং রামকৃষ্ণের ধর্মই "নববিধান" নাম দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। একবারে তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিলে, ২০ বৎসর যাবৎ তিনি যাহাদের হিন্দু-সমাজচ্যুত করিয়া বিজাতীয় পথে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে লাঞ্ছনার একশেষ করিবে, এবং কার্যও পন্ড হইবে বুঝিয়া, তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্মে হরি, শিব, লক্ষ্মী-সরস্বতীকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রবেশ করাইতেছিলেন। তিনি টাউন হলের এক বক্তৃতায় প্রকাশ্যভাবে বলেন—"আমরা পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিকতা (Spirit) গ্রহণ করিব, এবং মূর্তি (Form) অস্বীকার করিব।" তিনি আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে, আমার ভরসা ছিল যে, মূর্তিগুলি যে ধর্মশিক্ষার অক্ষর, এবং তাহাদেরও প্রয়োজন আছে, তাহা ক্রমে ক্রমে স্বীকার করিয়া, ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের অঙ্কে নির্বাণ প্রদান করিয়া এবং "প্রকৃত ধর্ম" সংস্থাপন করিয়া, হিন্দুদের গৃহে ভারত-পূজিত কেশব যুগাবতার বলিয়া গৃহীত ও পূজিত হইতেন। ভারতের দুরদৃষ্ট, ভারতের ক্ষণজন্মা পুরুষেরা প্রায় সকলেই তাঁহাদের জীবনের কার্যের আরম্ভে তিরোহিত হইয়াছেন।"[১]

কেশবচন্দ্রকে যথাযথ বুঝতে হলে, তাঁর ভাবলোকের সঞ্চারী মনোভাবের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে তাঁকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে হবে। 'বিধাতার নির্দেশ' শুধুমাত্র প্রতিপক্ষকে নিবৃত্ত করবার জন্য সাজান কথা নয়, 'বিধাতার নির্দেশ' কেশবচন্দ্রের আত্মার একটি জ্ঞানময় আলোকসংকেত, অথবা সহজাত ভক্তিভূমির বিশ্বাস। ইহাকেই তিনি 'বিধাতার নির্দেশ' বলে মনে করেছেন। এই সংস্কার হঠাৎ করে উপজাত হয় নি, এই সংস্কার কেশবচন্দ্রের জন্ম-জন্মান্তরের। শ্রীরামকৃষ্ণ এমন কেশবচন্দ্রকেই ভালবেসেছিলেন, এমন কেশবচন্দ্রের জন্যই তাঁর মন আকুলি-বিকুলি করে কেঁদে উঠত, এমন কেশবচন্দ্রের অসুখেই তিনি মায়ের কাছে ডাব-চিনি মানত করতেন।

বিজয়কৃষ্ণ তবে কি ভুল বুঝেছিলেন কেশবচন্দ্রকে? না। সত্যের স্বচ্ছ রূপটি অনেকাংশে আচ্ছন্ন হয়েছিল অত্যুৎসাহী কেশবভক্তদের জন্য। এরা যদি বাগআঁচড়ায় থাকাকালীন বিজয়কৃষ্ণকে জোর-জোবরদস্তি করে কেশবচন্দ্রের অন্ধ অনুবর্তী করার চেষ্টা না করতেন এবং কেশবচন্দ্রের মানসিকতার যথার্থ পরিচয় বিজয়কৃষ্ণকে জ্ঞাপন করতেন, তাহলে সমস্ত বিষয়টা হয়ত অন্য রূপ নিত, বিজয়কৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে মত ও পথের ব্যবধান এত বিরাট হয়ে উঠত না।

---

১. নবীনচন্দ্র রচনাবলী ৩য় খন্ড, ব. সা. পরিষৎ সং; পৃ ১৭৩-১৭৪

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধানের দ্বন্দ্ব যখন চরম সীমায়, তখন কয়েক জন কেশবভক্ত বিজয়কৃষ্ণকে হত্যার হীন ষড়যন্ত্র করেন। এই ঘটনা জেনে কেশবচন্দ্র অত্যন্ত মর্মাহত হন। একদিন এক ভদ্রলোক বিজয়কৃষ্ণকে তাঁর বাসভবনে এসে জনকয়েক কেশবভক্তের চক্রান্তটি ফাঁস করে দেন। উভয়ের পরিচিত এবং বন্ধুস্থানীয় এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করে তিনি বার বার গোস্বামী মহাশয়কে সাবধান করে বলেন যে, এই ভদ্রলোকটি এসে ডাকাডাকি করলেও যেন তিনি কিছুতেই তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না করেন। কারণ, তার উদ্দেশ্য অতি ভয়ংকর। ভদ্রলোক গুণ্ডা লাগিয়ে বিজয়কৃষ্ণকে হত্যা করবার গোপন আয়োজন করেছেন। এই হীন চক্রান্তে যারা মিলিত হয়েছিল, তাদের ধারণা বিজয়কৃষ্ণকে কোনভাবে হত্যা করতে পারলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ক্রমোন্নতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। এই সময় বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে কলেজ স্কোয়ারে গুরুচরণ মহালানবীশের গৃহে বাস করতেন। 'তাঁহার বাসভবন শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা, সৎসঙ্গ, সাধু-সমাগম ও কীর্তনানন্দে প্রকৃত আশ্রম পদে পরিণত হয়।'[১]

এই দিনই সন্ধ্যার সময় সেই ভদ্রলোকটি বিজয়কৃষ্ণের বাসভবনে এসে তাঁকে খুব ডাকাডাকি করতে লাগলেন। বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। এদিকে গৃহের প্রায় সকলেই এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরেছিলেন, তাই বিজয়কৃষ্ণকে ভদ্রলোকের উপস্থিতির কথা জানতে দেওয়া হল না। ভদ্রলোকটিকে বলে দেওয়া হল যে, বিজয়কৃষ্ণ একটি জরুরী কাজে খুব ব্যস্ত আছেন, আজ কিছুতেই তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর সন্ধ্যার দিকে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন। বাড়ীর ছাদ থেকে আবছায়া অন্ধকারে সকলেই দেখতে পেলেন, অদূরে অপেক্ষমান একজন বিরূপদর্শন ব্যক্তিকে ভদ্রলোক পকেট থেকে বার করে সম্ভবত কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করছেন। অর্থপ্রাপ্তির প্রশ্নে দরকষাকষি না হলে অবশ্য বিষয়টি এতটা পরিষ্কার হত না। অতঃপর বিজয়কৃষ্ণকে তাঁর অনুরক্ত ভক্তজনেরা আর একাকী কোথাও বড় একটা যাতায়াত করতে দিতেন না। এসব ব্যবস্থা যাঁর জন্য করা হল, তিনি কিন্তু এর কিছুই জানতে পারলেন না।

ঘটনাটির বিষয় কেশবচন্দ্র জানতে পেরে খুবই বিব্রত ও ম্রিয়মান হয়ে পড়েন। অনুরক্তদের এই পাপকার্যের কিভাবে প্রায়শ্চিত্ত করবেন কেশবচন্দ্র? সেইদিনই অন্তরঙ্গদের কাছে ডেকে তিনি নববিধান সমাজে অবশ্য-পালনীয় নিয়ম-বিধির মধ্যে আর একটি নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন, বন্ধু-পরিজন সেবার মত নববিধানের সভ্যেরা যেন শত্রুরও সেবা করেন। শত্রু-মিত্রকে সমজ্ঞানে সেবা করা নিয়ম-বিধিতে যুক্ত হওয়ায় উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হল। সাধারণ ও নববিধানের সভ্যগণ এর ফলে আবার হাসিমুখে সৌজন্যমূলক আচার-আচরণ শুরু করলেন। মনান্তর, মতান্তর থাকলেও সৌজন্যের অভাব অনেকটা এতে প্রশমিত হল। এই অতিভক্তদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্য কেশবচন্দ্রকে কম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় নি, কম শাস্তি তিনি নীরবে সহ্য করেন নি। এই নীরবতার জন্যও কেশবচন্দ্রের চরিত্রমহিমা অনেকখানি ম্লান হয়েছে।

---

১. তত্ত্বকৌমুদী, ১৩০৬

বিজয়কৃষ্ণ বহু বিরোধ, বেদনা অতিক্রম করে নিজের চিহ্নিত পথে এগিয়ে চললেন। পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্মসমাজের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। সেখানকার ব্রাহ্মভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হয়ে পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদ গ্রহণ করেন। ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে সপরিবারে ঢাকায় পৌঁছেন। পাতলা খাঁ গলির আগের বাড়ীটিই তাঁর জন্য ভাড়া করে রাখা হয়েছিল।

বিজয়কৃষ্ণকে আচার্যরূপে পেয়ে ঢাকার ব্রাহ্মভক্তগণ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আবার মেতে ওঠেন। সংসার বিষয়ে অনাসক্ত বিজয়কৃষ্ণকে তাঁরা ভালভাবেই জানতেন। এজন্য তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপন-পথে যাতে করে তাঁর কোন অসুবিধা ভোগ না করতে হয়, সেজন্য তাঁরা যথাযোগ্য আর্থিক ও অন্যবিধ ব্যবস্থা আগে থাকতেই করে রেখেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের এবারের ঢাকা-অবস্থান পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর হয়েছিল। ঢাকাতেও বিজয়কৃষ্ণের জীবন-নাশের চেষ্টা হয়েছে, তবে সফল হয় নি। নির্ভীক বিজয়কৃষ্ণ জীবনের ভয়ে লুকিয়ে থাকার মানুষ নন, এজন্য অনুরক্ত ভক্তজনেরা তাঁকে প্রায় সকল সময়ই আগলিয়ে রাখতেন।

কার্ত্তিক মাসে গোস্বামী মহাশয় ময়মনসিংহ যান। ওখানে তিনি কেশবচন্দ্রের একান্ত অনুগামী গোপীনাথ মুন্শি মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। বিজয়কৃষ্ণের উপাসনা ও উপদেশে স্থানীয় ব্রাহ্মদের অন্তরে উত্তেজনা অনেকটা হ্রাস পায়। গোস্বামী মহাশয় নর্মাল স্কুলের সভায় ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সমালোচনামূলক এই বক্তৃতা শুনে গোপীনাথবাবু অন্তরে খুব আঘাত পান। তিনি ক্ষুব্ধমনে সভাকক্ষ পরিত্যাগ করার পথে চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের সৃষ্ট, মানুষ ইহার কি করিবে?' গোস্বামী মহাশয় তাঁর সম্মানিত অতিথি, অথচ তিনি এভাবে সভাকক্ষ হতে চলে আসায় অনেকেই খুব অস্বস্তি বোধ করলেন। এঁদের অনেকেই গোপীনাথবাবুর এই অশোভন আচরণের পর গোস্বামী মহাশয়কে অনুরোধ করেন, তিনি যেন এমতাবস্থায় গোপীনাথবাবুর গৃহে না থেকে অন্যত্র গিয়ে থাকেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ তাঁদের কথায় সম্মত না হয়ে বললেন, 'গোপীনাথবাবু পূর্ববৎ এখনও আমার বন্ধু। আমি তাঁর বাড়ীতেই যাব।' গোপীনাথবাবুও ভেবেছিলেন তাঁর এমন আচরণের পর নিশ্চয়ই গোস্বামী মহাশয় তাঁর গৃহে আর থাকবেন না। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর গৃহে ফিরে আসতে দেখে তিনি তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চান। বিজয়কৃষ্ণও পরম প্রীতিভরে তাঁকে আলিঙ্গন করেন। ১২৮৫ সালের আষাঢ় মাস থেকে ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছর কাল গোস্বামী মহাশয় পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে নিযুক্ত থেকে প্রচারের কাজে স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, বাগ-আঁচড়া, মহেশপুর, কলিকাতা, কুমিল্লা, বিক্রমপুরের অন্তর্গত তাজপুর, পশ্চিমপাড়া, জৈনসার, মহেশতলা, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, আলোচনা ও বক্তৃতাদি করেন। ১২৮৬ সালে তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের জন্ম হয় পাতলা খাঁ গলির বাসায়। পিতা আদর করে নাম রাখেন প্রেমসখী ওরফে কুতুবুড়ী।

প্রচারকের কর্তব্য সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের সময়োপযোগী উপদেশ বড়

হৃদয়গ্রাহী। তিনি বলেছিলেন, 'বর্তমান ব্রাহ্মসমাজের দুর্দশা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সর্বসাধারণের ঘৃণা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব প্রচারকগণ স্বীয় স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবেন। সহস্র উপদেশ অপেক্ষা সৎ দৃষ্টান্তেই অধিক উপকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি স্বীয় স্বীয় জীবনকে দৃষ্টান্তস্থল করিতে পারেন তাহা হইলে শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের দুর্নাম দূরীভূত হইবে।

আমরা সত্যের জন্য সংগ্রাম করিব, কিন্তু দলাদলি করিব না। এইটির প্রতি প্রচারকদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্মের উদারতা ও পবিত্রতা বিশেষরূপে প্রচার করিতে হইবে। আমরা উদার হইতে গিয়া অসত্য ও অপবিত্রতার অনুমোদন করিব না। পবিত্রতা রক্ষা করিতে গিয়া হৃদয়ের প্রশস্ততাকেও নষ্ট করিব না। বিনয় ও মহত্ত্ব প্রচারক-জীবনের ভূষণ হইবে। আমরা অহঙ্কারী হইব না, কিন্তু কল্পিত বিনয় দেখাইবার জন্য হৃদয়ের মহত্ত্বও নষ্ট করিব না। তেজস্বিতা ধর্মোন্নতির প্রধান সহায়। কল্পিত ভাল মানুষ হইবার জন্য আমরা যেন তেজস্বিতাকে বলিদান না করি।

ঈশ্বর-প্রেম প্রচারকের অঙ্গকান্তি হইবে। তিনি লোকের নিকট উপাসক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য উপাসনা প্রদর্শন করিবেন না, অথচ তাঁহার শরীর-মন দ্বারা উপাসনার ভাব প্রকাশিত হইবে। উপাসনাই ব্রাহ্মের প্রাণ। এজন্য বিশেষরূপে উপাসনা প্রচার করা কর্তব্য।

জীবনের প্রত্যেক কার্য ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া সম্পন্ন করিলেও যে ঈশ্বরের উপাসনা হয়, তাহা প্রচার করিতে হইবে। এইভাবে ব্রহ্মধর্ম প্রচার না হওয়াতে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজকে শিক্ষিতদিগের আশ্রয়স্থান করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষিতদিগের জন্য যেমন যত্ন থাকিবে, তদ্রূপ অশিক্ষিতদিগকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া আসিয়া শিক্ষিত করিতে হইবে।

কিছুদিন হইতে ব্রাহ্মধর্মকে অনেকে বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর ধর্ম বলিয়া মনে করিত এবং সেইরূপে প্রচারিতও হইতেছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উক্ত দূষিত ভাবকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়া ব্রাহ্মধর্মকে গৃহীর ধর্ম ও বিষয়ীর ধর্ম বলিয়া প্রচার করিবেন।'

এই সব উপদেশ থেকে গোসাঁইজীর জীবন্ত আদর্শের পরিচয় মিলে। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি নিখুঁত ধর্মসংস্থায় পরিণত করার প্রয়াসে পর্বতপ্রমাণ বাধা, বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেছেন সত্যনিষ্ঠার অমোঘ বীর্যে। নিদারুণ প্রতিকূল পরিবেশেও তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। তাঁর চারিত্রিক প্রভাব শত শত লোকের অন্তরে উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চারিত করেছে। ঈশ্বরে তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস ও তীব্র ব্যাকুলতা কত অবিশ্বাসী হৃদয়কে যে সরস করে গড়ে তুলেছে তা বলে শেষ করা যাবে না। তবুও এ সংসারে ত্রুটি খুঁজে বের করা যাদের স্বভাব তারা চাঁদে কলঙ্কই দেখে, কুসুমেও কীটের সন্ধান করে। একবার এমনি ধারা মনোবৃত্তিসম্পন্ন কয়েকজন ব্রাহ্ম গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে অসামঞ্জস্য অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে বলেছিলেন 'গোসাঁইজীকে সত্যাশ্রয়ী বলি-ই বা কি করে? নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম হয়ে তিনি কি করে মাদক দ্রব্য সেবন করেন?'

'তাঁর কানে এ কথা যেতেই তিনি মরফিয়া সেবন বন্ধ করে দেন; ফলে রোগ যায়

বেড়ে, চোদ্দ দিন তিনি সংজ্ঞাশূন্য হয়ে থাকেন। নবকুমার বাগচী ও যোগমায়া দেবী উপায়ান্তর না দেখে ডাঃ রুদ্র নাগের ডিস্পেনসারী থেকে মরফিয়া এনে তাঁকে সেবন করান। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। নবকুমার বাগচী বলেন, 'এ তো আপনার মাদক সেবন নয়, এ আপনার জীবন-সালসা। প্রখ্যাত চিকিৎসক আপনার জন্য আজীবন এর ব্যবস্থা করেছেন। ওঁদের অবান্তর কথায় কেন এই মহাজীবন বিপন্ন করেন?'

গোস্বামী মহাশয় দুঃখ করে বলেন, 'আমার শরীরের যে কি অবস্থা তা ওঁরা বোঝেন না, তাই ভেবেছিলাম, দূর হোক, দেহটা পাত হলেই যদি আপদ চুকে যায় ভাল।' এই ঘটনার পর আর কখনও তিনি মরফিয়া ত্যাগ করেন নি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব থেকে প্রচারকের কাজ করলেও, ১২৮৬ সালে মাঘোৎসবের সময় যথাযথভাবে বিজয়কৃষ্ণ প্রচারকপদে অভিষিক্ত হন। এই সময় আরও তিনজন প্রচারক পদে অভিষিক্ত হন, এঁরা হলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী। মাঘোৎসবের অধিবেশনে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতা সমাজগৃহে উপাসনার কাজ করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'পশ্চিম প্রদেশ হইতে কয়েকজন ঋষি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহারা ভারতবর্ষে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা তপস্যা দ্বারা যে সমস্ত সত্য লাভ করেন, শ্রুতিপরম্পরায় সেই সকল ক্রমে প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু লোকে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্রমে শ্রুতি ও বেদ পাঠই ব্রহ্মোপাসনা জ্ঞান করিয়া কুসংস্কারজালে জড়িত হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে লোককে উপদেশ দিতে লাগিলেন,—"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ব বেদঃ, শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণ ছন্দো জ্যোতিষমিতি।" এইরূপে তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার রক্ষকস্বরূপ হইয়া তাহা বিশুদ্ধভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। পরে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে রামমোহন এই ১১ মাঘ ব্রহ্মোপাসনার পুনরুদ্ধার করেন। অদ্য আমরা তাঁহার কৃপায় এই স্থানে সকলে সবান্ধবে মিলিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে সমর্থ হইতেছি।'

গোস্বামী মহাশয় লক্ষ্য করেন, ক্রিয়াকাণ্ডের উপর সাধারণ মানুষের বড় আকর্ষণ। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণে অক্ষমতাই এই বিভ্রান্তির হেতু বলে তাঁর প্রতীতি হয়। শাস্ত্রের মর্মকথা সহজ ও সাবলীল ভাষায় লোকসমাজে তুলে ধরা তিনি কল্যাণকর প্রচেষ্টা বলে মনে করেন। এজন্য তিনি মহানির্বাণতন্ত্র থেকে শিব ও পার্বতীর কথোপকথন 'ব্রহ্মপূজা' নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তিনি নানা জায়গায় অনেক বক্তৃতাও করেন। "ব্রহ্মপূজায়" তিনি লিখেছেন, 'হিমাচল শিখরে মৌনব্রতধারী সদানন্দ সদাশিবকে প্রসন্নচিত্ত দেখিয়া জনগণের হিতের জন্য পার্বতী "ব্রহ্মপূজা" সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে শিবের উক্তি,—"বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বাত্মা বিশ্বপতি পরমেশ্বর প্রীত হয়েন। কারণ জগৎ তাঁহার আশ্রিত। তিনি এক, সৎস্বরূপ, সত্য, অদ্বৈত, পরাৎপর, স্বপ্রকাশ, সদা-পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, নির্বিকার। সেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সত্যতা আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক পদার্থ পৃথক পৃথক সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। হে দেবি, তাঁহা হইতেই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেই একমাত্র পরমেশ্বর সর্বভূতের কারণ। তিনি সৃষ্টিকর্তা, এজন্য ত্রিলোকে তিনি স্রষ্টা ও ব্রহ্ম বলিয়া গীত

হইয়া থাকেন। যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, মেঘ বারি বর্ষণ করে, তরুসকল পুষ্পিত হয়, যিনি কালে কালকে নিয়মিত করেন, যিনি মৃত্যুর মৃত্যু, ভয়ের ভয় এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে। তিনি তুষ্ট হইলেই জগৎ তুষ্ট, তিনি প্রীত হইলেই জগৎ প্রীত। তাঁহার আরাধনাতে সকলেরই প্রীতি হয়। তরুর মূলে জল সেচন করিলে যেমন সমস্ত শাখাপল্লব সজীব হয়, তদ্রূপ তাঁহার পূজাতে সকলেই প্রীত হয়। সেই ধ্যেয়, পূজ্য, সুখারাধ্য পরমেশ্বরের পূজা ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। যাঁহার সাধনে কোনো শ্রম নাই, উপবাস নাই, শারীরিক ক্লেশ নাই, আচারাদি নিয়মের প্রয়োজন নাই, এবং দিক, কাল, মুদ্রান্যাসেরও বিধি নাই, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিবে না?"

সে-ই ধন্য, কৃতার্থ, কৃতী, ধার্মিক, যাহার কর্ণে ওঁকার মহামন্ত্র প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার পিতামাতা ধন্য, তাঁহার কুল পবিত্র। তাঁহারা রোমাঞ্চিত শরীরে এই বলিয়া গান করেন:—"আমাদিগের কুলে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গয়ায় আমাদের পিণ্ডদানের প্রয়োজন কি? তীর্থ দর্শনের প্রয়োজন কি? শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দান, জপ, হোমেরই বা আবশ্যক কি? আমাদিগের পুত্রের সাধনে আমরা অক্ষয়কীর্তি লাভ করিয়াছি।" আমি সত্য বলিতেছি, ব্রহ্মোপাসকের অন্য সাধনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মপূজার অন্য প্রকার আয়োজনও নাই।'

ব্রহ্মপূজা সম্পর্কে গোসাঁইজী আপন অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, 'ব্রহ্মপূজাই জনগণের মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। অনেকে নিরাকার ব্রহ্মের পূজা করা কঠিন মনে করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাহা কঠিন নহে। মন নিরাকার, অথচ আমরা মনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, স্নেহ-মমতা, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ প্রভৃতি নিরাকার ভাবগুলিকে স্পষ্ট উপলব্ধি করি। সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপগুলিও হৃদয়ঙ্গম করা যায়।'

ব্রহ্মপূজার নিয়মবিধি বর্ণনাপ্রসঙ্গে গোসাঁইজী বলেছেন, 'ব্রহ্মপূজার সামান্য নিয়ম—

১. পরমেশ্বরের মহিমা চিন্তা করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদান করিতে হইবে।

২. ধ্যান করিতে হইবে। তমসাচ্ছন্ন নিশীথসময়ে গভীর অন্ধকারময় পর্বত-গহ্বরে দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিলে উভয়ের সত্তা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না; ধ্যানের কালে সেইরূপ আর কিছু দেখিবে না, এবং মনেও করিবে না। কেবল ব্রহ্মের নির্বিশেষ সত্তা চিন্তা করিবে। "হে পরমেশ্বর, তুমি আছ"—কেবল এই কথা স্মরণ করিবে। ক্রমে ব্রহ্মের আবির্ভাব ঊষার আলোকের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া হৃদয়কে জ্যোতিষ্মান করিবে। তখন শরীর মন প্রেমানন্দে পূর্ণ হইতে থাকিবে।

৩. প্রার্থনা করিয়া আত্মার অভাবগুলি দূর করিতে হইবে; প্রার্থনাসকল অকৃত্রিম হইলে আত্মা দিন দিন উন্নত হইতে থাকে।

৪. পরমেশ্বর উপাসকের বিবেক-কর্ণে কর্তব্যের উপদেশ ও আদেশ করিয়া থাকেন। এজন্য প্রকৃত উপাসকের জীবন বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রহ্মপূজায় অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে তাহাকে ব্রহ্মপূজা বলিয়া গণ্য করা যায় না।

৫. ব্রহ্মোপাসক কর্মহীন নহেন; সমস্ত সাধুকার্যকে তিনি ব্রহ্মসেবা বলিয়া

প্রাণপণে সৎকার্য সংসাধন করিয়া থাকেন।

৬. জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই ত্রিবিধযোগে ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মপূজার মধুরতার আস্বাদন করিতে হইবে।

এই ব্রহ্মপূজাই ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম। শিব স্বীয়মুখে পরব্রহ্মের পূজা প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মপূজা যে কষ্টসাধ্য নহে তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। এই শারদীয়া উৎসবে গৃহে গৃহে যে পার্বতীর পূজা হইতেছে—সেই পার্বতীই ব্রহ্মপূজা জানিবার জন্য শিবের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

অতএব ভারতবাসীর গৃহে গৃহে ব্রহ্মপূজাই প্রচলিত হউক। ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনিতে ভারতবর্ষ পুনর্বার কম্পিত হউক। ব্রহ্মপূজার প্রভাবেই আর্যগণ সর্বপ্রকার উন্নতি লাভ করিয়া মহাগৌরবে কাল যাপন করিয়া গিয়াছেন।'

১২৮৭ সালে ঢাকা থেকে অবসর গ্রহণ করে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে গোস্বামী মহাশয় প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঢাকা থেকে চলে আসায় পূর্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভা গোসাঁইজীর ঢাকা-অবস্থান-কাল স্মরণ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন—

'তিনি আচার্য নিযুক্ত থাকাতে গত দুই বৎসরকাল এখানকার সমাজের কার্য এমত উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল যে, তাহা সভ্যমাত্রই বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন, এমত লোক এখানে দেখা যাইতেছে না।'

বিজয়কৃষ্ণের স্থান পূর্ণ করবার মত মানুষ আর কোথায় পাবেন তাঁরা?—

যিনি নিজের জন্য বাঁধেন না ঘর, অথচ সব ঘরে আছে তাঁর ঠাঁই,
কারো দিকে বাড়ান না হাত—তাঁর ভান্ডার পূর্ণ থাকে সর্বদাই।
ঘর নেই তাঁর, অথচ কতজনকে দেন ঘরের ঠিকানা
পোঁছে দেন আনন্দ-মন্দিরে।
মুক্ত পক্ষীর মত করেন বিচরণ—অথচ শান্তির ছায়া কখনো
তাঁর উপর থেকে যায় না সরে।

নিঃস্ব কাঙাল হয়ে সবচেয়ে মহৎ সম্পদ করেন দান—
সকল উপাধি, পদের গৌরব ছেড়ে সবার কাছে পান মান।
দুঃখের তপস্যা করেন, দুঃখ তাঁর কাছ থেকে সর্বদা থাকে দূরে,
সর্বহারা—অথচ অনুক্ষণ সব পাওয়ার আনন্দ
বিরাজ করে তাঁর হৃদয়পুরে।

প্রতিষ্ঠা চান না, বহুর অন্তরে তাঁর জন্য থাকে প্রতিষ্ঠার আসন,
ঐশ্বর্যের পশ্চাতে ঘোরে মানুষ—ঐশ্বর্য ঘোরে তার পশ্চাতে—
অথচ সকল ঐশ্বর্যকে তিনি পরিহার করে চলেন,
কে তাঁর মত ঐশ্বর্যবান? তিনি বাস করেন আত্মাতে,
আপনাকে রাখেন সকলের অগোচর; যিনি ঐশ্বর্য দেখান,
তিনি তা হারান—শেষে ভগবানকেও ভুলে যান॥[১]

---

[১] শ্রীমদ্ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী-প্রণীত 'অক্ষর' কাব্যগ্রন্থ থেকে

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে মন্দির ও প্রচারনিবাসের নির্মাণকার্য তখনও শেষ হয় নি। ঢাকা থেকে সপরিবারে এসে গোস্বামী মহাশয় ঝামাপুকুরে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে ওঠেন। সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশ দত্ত ঐ বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে থাকতেন। দরদী বিজয়কৃষ্ণ, একাধারে ছিলেন মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু। শাস্ত্রে আছে, অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, তপস্যা, শান্তি প্রভৃতি সদ্গুণ হরিভক্তজনকে আশ্রয় করে; হরি-ভজনে প্রবৃত্ত ব্যাধও দুর্লভ এবং আপাতবিরোধী অহিংসাদি অপার্থিব গুণের অধিকারী হয়,—পুণ্যাত্মাদের তো কথাই নেই। এমনই দরদী বিজয়কৃষ্ণ; মানুষের দুঃখে আত্মহারা হয়ে পড়েন। বরিশালে এক পাচক ব্রাহ্মণের বিয়ে দিয়েছিলেন গোস্বামী মহাশয়। পরে তিনি জানতে পারেন, ঐ লোকটি কলিকাতায় এসে বড় দুরবস্থায় পড়েছেন। ব্রজ গাঙ্গুলীকে সঙ্গে করে তিনি নিজে যান সেই পাচক ব্রাহ্মণের আস্তানা তালতলায়; খবর নিয়ে জানেন—দুদিন ধরেই পরিবারের সকলে অভুক্ত। তখনই তিনি ফিরে আসেন শঙ্কর ঘোষ লেনে উপেন্দ্র মিত্রের কাছে। ব্রাহ্মণ পাচকটির দুরবস্থার কথা বলতে বলতে দুঃখ ও বেদনায় সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেন গোসাঁইজী। তাঁকে সুস্থ করে, পরে উপেনবাবু এক মণ চাল, আলু, শাক-সব্জী মুটের মাথায় চাপিয়ে ব্রজবাবুকে দিয়ে এই পাচক ব্রাহ্মণের গৃহে পাঠান। এমন কত যে কাহিনী গোসাঁইজীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। একদিন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে সমাজ-মন্দির থেকে ঝামাপুকুর গৃহে ফিরতে রাত ন'টা বেজে যায়। মেছুয়াবাজারে ফুটপাতের পাশে আবছায়া আলোয় গোসাঁইজী দেখেন ছিন্নবসন, ক্লিষ্টবদন একটি যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাকে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করেন, 'এত রাত্রে তুমি এখানে কেন মা?' কথা ফোটে না মেয়েটির মুখে। আম্‌তা আম্‌তা করে বলে, 'তিন-চারদিন কেউ আসে নি, উপোষ করে আছি।' তার এই কথা শুনে খুব দুঃখ পান গোসাঁইজী; আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'একটু অপেক্ষা কর মা, দেখি, ভগবান কি ব্যবস্থা করেন!' নিজের হাত তখন শূন্য। তক্ষুনি ব্রাহ্ম সতীর্থদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে পাঁচ টাকা সংগ্রহ করেন তিনি; আড়াই টাকা দিয়ে একখানা শাড়ী কিনেন, আর আট আনার কিছু খাবার। রাত এগারোটায় গিয়ে দেখেন, মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। জিনিসগুলো তার হাতে তুলে দিয়ে তিনি বলেন, 'মা, ভগবান তোমার জন্য আজ এসব জুটিয়েছেন; খাবারগুলো খেয়ো, শাড়ীখানা পরো; আর টাকা দুটো প্রয়োজনবোধে খরচ করো।' মেয়েটির দুগাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে; কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তার আর কোন ভাষা নেই।

অভাবগ্রস্ত, দুঃখী-দীন নিগৃহীত মানুষের জন্য বিজয়কৃষ্ণের অন্তরাত্মা সহজেই কেঁদে উঠত। তিনি সহ্য করতে পারতেন না, বিচলিত হয়ে পড়তেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোনপ্রকার কিছু সাহায্য না করতে পারতেন, ততক্ষণ তিনি সুস্থির হয়ে কোন কাজই করতে পারতেন না। একদিন তাঁর প্রতিবেশী এক বাবুর সঙ্গে পাওনা নিয়ে একটি মুটের কথা কাটাকাটি হয়। মুটে প্রদত্ত মজুরী না নিয়ে বলে, 'তাহলে আপনিই ওটা রেখে দিন।' এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বাবুটি তাকে মারধর করেন; সে তখন কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। গোসাঁইজী বাড়ী বসে সমস্ত ঘটনাটি লক্ষ্য করেন, তারপর হাতের কাজ ফেলে রেখে বাইরে বেরিয়ে পড়েন, মুটেকে অনুসরণ করে তার প্রাপ্য প্রতিবেশীর অজান্তে নিজ থেকে মিটিয়ে মিষ্টি কথায় তাকে শান্ত করে বিদায় দেন।

'প্রচারনিবাস' বাসোপযোগী হলে তিনি ঝামাপুকুরের বাড়ী ছেড়ে সপরিবারে ওখানে উঠে যান। এ সময়ে তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন্নগর, হরিনাভি, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং বাংলার বাইরে গয়া, বাঁকিপুর, মজঃফরপুর, মতিহারী, গাজীপুর, প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রচারের কাজে একবার বিজয়কৃষ্ণ আরও দুজন সঙ্গীকে নিয়ে কাঁথি পৌঁছেন এক দুর্যোগের রাতে। পথ ভুল করে একটি বাড়ীর অন্দরে তাঁরা প্রবেশ করেন। বাড়ীটি ছিল এক কুখ্যাত ডাকাতের। দুষ্টবুদ্ধি ডাকাত জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিল কোথায় যাবেন তাঁরা। বিজয়কৃষ্ণের আত্মভোলা চেহারা আর গন্তব্যস্থল 'মাস্টার মহাশয়ের বাড়ী' শুনে কি ভেবে নিজেই আলো জ্বালিয়ে ওঁদের পৌঁছে দিয়ে গেল মাস্টার মহাশয়ের বাড়ী। এখানেই একদিন নির্জন এক দীঘির পাশ ধরে চলেছেন বিজয়কৃষ্ণ, সঙ্গে প্যারীলাল ঘোষ। সারা দীঘি জুড়ে ফুটে রয়েছে লাল পদ্ম—লীলাময়ের সৃষ্ট এক অপরূপ দৃশ্য। অপলক নেত্রে চেয়ে থাকেন গোসাঁইজী; চকিতে হয় তাঁর এক অভাবনীয় দর্শন। প্রকাশিত হন স্বয়ং কমলেকামিনী—মুহূর্তের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ ঝাঁপিয়ে পড়েন জলে। বিস্ময় ও উৎকণ্ঠায় প্যারীবাবুও লাফিয়ে পড়েন। গোস্বামী মহাশয়কে ডাঙ্গায় তোলামাত্র প্যারীবাবুর মধ্যে চলে এক অজানা শক্তির খেলা। এই শক্তির প্রভাবে তাঁর আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে; তিনি উদাসীন হয়ে ঘর ছাড়েন। দীঘির লাল পদ্মটি ছিল গোসাঁইজীর মুঠোর ভিতর। সমাধি-মন্দিরে এখনও তা আছে তাঁর ঝোলার ভিতর। এই প্রসঙ্গে পরে একদিন গোসাঁইজী বলেছিলেন, 'ঐ স্থানটিতে শ্রীমন্ত সওদাগরের "কমলেকামিনী" দর্শন হয়েছিল। সত্য বস্তু একবার প্রকাশ হলে অনন্তকাল ধরেও নষ্ট হয় না। যাঁর দৃষ্টি খুলে যায়, তিনি ওখানে গেলেই তা দেখতে পান।'

মুর্শিদাবাদ গিয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ভোরে নগেনবাবুর ঘুম ভাঙ্গতেই গোসাঁইজী চায়ের পেয়ালা তুলে ধরেন তাঁর হাতে। অবাক হয়ে নগেনবাবু বলেন, 'এ কি গোসাঁই।' গোসাঁইজী স্মিত হেসে বলেন, 'আপনার যে চা খেয়ে বিছানা ছাড়ার অভ্যাস, নইলে দিনভর কষ্ট হয়।' এমনি সতর্ক দৃষ্টি ছিল তাঁর সকলের প্রতি। প্রত্যেকের প্রয়োজন তিনি সযত্নে মিটাতে সব সময়ই চেষ্টা রাখতেন।

একদিন হৃদয়ের শুষ্কতায় অধীর হয়ে গোস্বামী মহাশয় পথে বের হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দ্বি-প্রহর। পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক ঝাঁকাওয়ালা মুটে তাঁর পাশ কাটিয়ে। মাথায় তার বিরাট বোঝা, ঘর্মাক্ত কলেবর নিয়ে একটু দ্রুতগতিতেই চলছিল সে মনের আনন্দে, অনেকটা নৃত্যের তালে তালে। আপন কর্তব্যসাধনপথে এমন সদানন্দময় রূপ দেখে বিজয়কৃষ্ণ মোহিত হয়ে পড়লেন। ঝাঁকাওয়ালা মুটের মধ্যে আনন্দময়ের প্রকাশ দেখতে পেলেন বিজয়কৃষ্ণ। তিনি লুটিয়ে পড়লেন তার পায়ে। সে তখন বোঝা নামিয়ে 'বাবা' 'বাবা', একি করছেন বলে গোসাঁইজীকে জড়িয়ে ধরতেই গোসাঁইজীর প্রাণ-মন জুড়িয়ে গেল। শুষ্ক হৃদয়ের অন্তরাল থেকে অনাবিল সরস ভাবের উদয় হতেই কেঁদে ফেললেন বিজয়কৃষ্ণ। মূর্খ ঝাঁকাওয়ালা স্তম্ভিত; তাজ্জব ব্যাপার ভাবতে ভাবতে সে চলে গেল তার আপন পথে। আর বিজয়কৃষ্ণ ভাবলেন, এরাই তো পথের পথিকগুরু এ জীবনে।

'ঈশ্বর স্রষ্টা নয়, নির্মাতা'—এই মন্তব্যে একদিন বিজয়কৃষ্ণ কঠিন তিরস্কার করেছিলেন বন্ধুবর কালীনাথ দত্ত মহাশয়কে। অথচ মানুষ হিসাবে কালীনাথ বাবু ছিলেন অত্যন্ত সদাশয় ও ধর্মপ্রাণ। এতটা কঠিন কথা তিনি না বললেও পারতেন কালীনাথবাবুকে। সেদিন রাতে ভাল ঘুম হল না বিজয়কৃষ্ণের। অনেক রাতে ঘুম ভাঙ্গতেই কালীনাথবাবুর কথা মনে হল বিজয়কৃষ্ণের। তখনই বেরিয়ে পড়লেন বন্ধুর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করবার জন্য। দুই মাইল পথ হেঁটে রাত তিনটার সময় বন্ধুর বাড়ী গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে তুললেন বিজয়কৃষ্ণ। পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছেন বিজয়কৃষ্ণ এবং 'ক্ষমা করেছি' একথা না বলা পর্যন্ত তাঁর পা ছাড়েন না তিনি। স্তম্ভিত কালীনাথবাবুও। কি বলবেন বিজয়কৃষ্ণকে, তাঁর যে সবই আলাদা।

গোসাঁইজীর বন্ধুপ্রীতির তুলনা নেই। একবার তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর দেশের বাড়ীতে যান। শাস্ত্রী মহাশয় তখন অন্যত্র ছিলেন। সদা ভাবময় মানুষ বিজয়কৃষ্ণ, বন্ধুর অদর্শন-বিরহে কাতর হয়ে তিনি 'এইটি আমার বন্ধুর বাড়ী' বলতে বলতে উঠানে গড়াগড়ি দিতে থাকেন। সকলে অবাক বিস্ময়ে বিজয়কৃষ্ণের ভাবাবেগ দেখে চমকিত হন। তুলে ধরে বিজয়কৃষ্ণকে বসান হল, তিনি তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। এই বন্ধুত্ব প্রসঙ্গেই বিজয়কৃষ্ণ বলেছেন, 'পুত্র অপেক্ষা বন্ধু শ্রেষ্ঠ। পুত্রঃ পিন্ড প্রয়োজনাৎ, বন্ধু চিরদিনই বন্ধু, সর্বক্ষণ বন্ধু। বন্ধুর স্বার্থ নাই, প্রয়োজন নাই। বন্ধু সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তৃপ্তিতে তৃপ্ত। এমন বন্ধু যাহার নাই, সেই বন্ধুহীন। পূর্বকালে বন্ধু সকলেরই দুই-একজন অবশ্য থাকিত, এখন বন্ধু পাওয়া অতি অসম্ভব। মতে মতে মিলনে বন্ধুত্ব হয় না। এক উদ্দেশ্য, এক প্রয়োজন, এক বাণিজ্য, ইহা বন্ধুত্ব নহে; বাস্তবিক বন্ধুলাভ অসম্ভব হইয়াছে।' এই বন্ধুত্ব প্রসঙ্গেই তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'বন্ধু পাওয়া দূরের কথা, যাহাকে মনের কথা বলিয়া প্রাণ খোলসা করা যায়, এমন বিশ্বাসী লোকই দুর্লভ। বিশ্বাস করিয়া অতি গোপনে যাহা বলিয়াছি, তাহা বাজারে শুনিতে পাইবে; তাহা লইয়া উপহাস চলিতেছে দেখিবে। ইহা কালের অবস্থা। নিজের মনের সুখ, দুঃখ লোকে যদি ব্যক্ত করিতে না পারে তবে হৃদয় ক্রমেই কুটিল হইতে থাকে। কুটিলতা মহাপাপ, লোক যদি কোনও প্রকার সাধন ভজন না করে সরলতার প্রভাবেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। সরল হৃদয় সর্বদা সর্বক্ষণ সত্যবাদী। কপট হৃদয় সর্বদাই অসত্য চর্বন করে, অসত্য রোমন্থন করে। এক বন্ধুহীনতার এত দুর্গতি।'[১]

অকৃত্রিম ঈশ্বর বিশ্বাসের উপরই যে এই কর্মযোগীর জীবনের বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারব্রতে উৎসর্গীকৃত তাঁর হৃদয় ও মন, তাঁর কর্ম ও সাধনা। কি আদি সমাজে, কি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সর্বত্রই এই অনাসক্ত যোগী বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন সমাজের অন্যতম প্রাণশক্তি। তাঁর ধর্মপ্রাণতা, নিষ্ঠা, ভক্তি ও কাতরতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নবদ্বীপচন্দ্র দাস বলেছেন, 'গোস্বামী মহাশয়ের ব্যাকুলতা, নিষ্ঠা, বিনয়, ধর্মসাধনে অনুরাগ ও ভক্তিলাভের আগ্রহ এত অধিক ছিল, ঐরূপ প্রায় দেখা যায় না। তিনি যখনই কোন সাধকের সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন, তখনই তাঁহার

---

১. নব্যভারত, ফাল্গুন, ১৩০৬

পদধূলি গ্রহণ করিয়া দীনতার পরিচয় দিতেন। আমরা এক পুষ্প-বৃক্ষ-তলে বসিয়া উপাসনা করিতাম। একদিন ধ্যানের সময় হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া দেখি, তিনি কাঁদিয়া অধীর হইয়াছেন এবং ক্রমাগত মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। তাঁহার তৎকালের কাতরতা দর্শনে আমার মনে হইয়াছিল, ইনিই যথার্থ ধর্মার্থী।'

এই প্রসঙ্গেই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'আমার মনে হয় ধর্মের জন্য একেবারে ক্ষ্যাপা হইয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে এরূপ লোকের অভাব হইয়াছে। এরূপ লোক আমি দেখি না। একটি লোক দেখিয়াছিলাম, তিনি সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। আমি তাঁহার ন্যায় ধর্মের জন্য ব্যাকুলাত্মা দেখি নাই।'

বরিশালের ব্রাহ্ম-প্রচারক কালীমোহন দাসও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন, 'গোসাঁইজীকে ধর্মের জন্য যেরূপ ব্যাকুল দেখিয়াছি, সেরূপ প্রায় দেখা যায় না।' এক সময়ে ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার মনে গভীর প্রশ্নের উদয় হইলে তিনি বিজয়কৃষ্ণকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় বিজয়কৃষ্ণ বলেন, 'এ প্রশ্ন বড় কঠিন; কিরূপে সকল অভাব দূর হয়, এই প্রশ্নই লোকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু দর্শন সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করেন না। এই ব্রহ্মদর্শন অতীব সত্য; আর ইহা ব্যতীত ধর্মজীবনের কোন মূল্য নাই। এজন্য সাধন ভজন প্রয়োজন। সাংসারিক অভাবে পড়িলে, আমরা যাঁহার নিকট সাহায্য পাই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হই। এই আধ্যাত্মিক অভাব পূরণের জন্য আমাদিগকে পরমেশ্বরের চরণে উপস্থিত হইতে হইবে। অকপটে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। এই প্রার্থনা জাগ্রত করিতে হইলে অন্তরের কপট ভাব, অর্থাৎ জীবনে যাহা লাভ হয় নাই, তাহা বলা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অকপট ভাব সর্বদা রক্ষা না করিতে পারিলে কখনও প্রকৃত প্রার্থনার উদয় হয় না। আর প্রকৃত প্রার্থনা ব্যতীত দর্শন সম্ভবে না।'

একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দোতলায় বসে বিজয়কৃষ্ণ ও শিবনাথ শাস্ত্রী ধর্মপ্রসঙ্গে আলাপ করছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ বলেন, 'ধর্মের জন্য না করিতে পারি এমন কোন কাজ নাই। যদি কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন, এই দ্বিতল হইতে লম্ফ প্রদান করিলে ধর্মলাভ হইবে, তবে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই মুহূর্তে লম্ফপ্রদান করিতে পারি।' এই কথাগুলি বলার সময় তাঁর মুখশ্রী অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠে। শাস্ত্রী মহাশয় তা লক্ষ্য করে অভিভূত হন। তিনি লিখেছেন, 'ঐরূপ সরল অন্তরে সমুদয় হৃদয়, মন, প্রাণের সহিত আর কাহাকেও ধর্ম অনুসন্ধান করিতে দেখিয়াছি কিনা মনে হয় না। এমন ভক্তি ও বিনয় অতি অল্পই দেখিয়াছি। এই কারণে, তিনি আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু হইয়াও গুরুস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহার ভক্তি ও বিনয় যদি পাই, তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া যাই। তিনি তাঁহার পবিত্র জীবনে ব্রাহ্মসমাজকে, ভক্তিপথ যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, সেজন্য ব্রাহ্মসমাজের তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে।'

শাস্ত্রী মহাশয় আর এক জায়গায় বলেছেন, 'ব্রাহ্মধর্মের মৌখিক প্রচার আর কি করিব? গোসাঁইজীকে একখানি আসনে বসাইয়া দ্বারে দ্বারে দেখাইলেই ব্রাহ্মধর্মের যথেষ্ট প্রচার করা হয়। যেখানে গোসাঁই সেখানেই উৎসব, যে গৃহে তিনি, সে গৃহই সরস। কি শহর, কি মফঃস্বল, সকল স্থানের ব্রাহ্ম নরনারীগণের মনের আকর্ষণ তাঁহার দিকে ছিল।'

গোস্বামী মহাশয়ের ধর্মনিষ্ঠায় ও ব্যক্তিগত সাধন-ভজনে প্রচার-নিবাসের অধিবাসীরা বিশেষ অনুপ্রেরণা পেতেন। ঊষাকালে খঞ্জনী বাজিয়ে তিনি উপাসনায় বসতেন। বেলা বারটা পর্যন্ত আসনে থাকতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সহধর্মিণী প্রসন্নময়ী দেবী রাঁধতে রাঁধতে বার বার গিয়ে ধ্যানরত গোসাঁইজীকে দর্শন করে আসতেন। তিনি বলতেন গোসাঁইজীকে দর্শন করলেই উপাসনার ফল হয়। অপরাহ্ণে প্রায়ই গোঁসাইজী নবকুমার বাগচীকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতেন। একটি নির্জন স্থানে বসে তাঁরা ধ্যান করতেন। একদিন বহু চেষ্টা করেও ধ্যানে মন বসাতে পারছেন না বিজয়কৃষ্ণ। শুষ্ক প্রাণে গৃহে ফেরার সময় পথে দেখেন অনেক সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। গোসাঁইজী একজন একজন করে সব সাধুর কাছে যান, কিন্তু কোথাও বসেন না, আবার চলতে শুরু করেন। ফেরার পথে এক গৃহের দোতলা থেকে 'নিধুবাবুর টপ্পা'র প্রাণমাতান আবেদনে খুব অভিভূত হয়ে পথের ধারে বসে পড়েন বিজয়কৃষ্ণ। সংগীতের মূর্ছনায় প্রাণ-মন তাঁর ভরপুর। বার বার শুধু 'আহা' 'আহা' করে আনন্দধ্বনি প্রকাশ করছেন। কিন্তু আশ্চর্য, গানের ফাঁকে ফাঁকে 'পান লে আও,' 'তামাক লে আও,' 'সরাব লে আও' বলে যে ডাকাডাকি ভেসে আসছে, তা তিনি আদৌ শুনতে পারছেন না। আনন্দে আত্মহারা ভাব। গান থামতেই তিনি করুণাময়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আবার হাঁটতে শুরু করেন। পথে বাগচী মহাশয়কে বলেন, 'আহা! ঠাকুরের বড় দয়া! আজ শুষ্ক প্রাণ-মন লইয়া কত চেষ্টা করিলাম, তথাপি এক বিন্দুও প্রেমবারি পাইলাম না, প্রাণ কিছুতেই শীতল হইল না। অকস্মাৎ ঠাকুর অযাচিত করুণা-স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া দিলেন। তিনিই ধন্য।'

১২৮৭ সালের মাঘোৎসব। এবারের উৎসবের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে উপাসনা জীবন্ত হয়ে উঠে। গোসাঁইজীর যথারীতি উপাসনা কার্য পরিচালনায় বাধা এসে যায়। উপাসনায় বসে অল্পকালের মধ্যেই তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে পড়েন, বার বার মাথার উপর হাত তুলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন, 'এই যে আমার মা' 'এই যে আমার মা'। উপস্থিত সকলেই যেন সেই সঙ্গে গোসাঁইজীর অমৃতময়ী মাতৃনামের কাতর আহ্বানে তাঁকে অনুসরণ করে চলতে থাকেন। সকলেই ভাবাবেগে অধীর হয়ে পড়েছেন। সারা মন্দিরময় কান্নার রোল পড়ে যায়। সমবেত কেউ আর সেদিন শুষ্ক হৃদয়ে বসে নেই। সকলেই মাতৃনামের সুখানুভূতিতে বিভোর। এভাবেই উদ্বোধন ও আরাধনা শেষ হল। সমস্বরে 'অসতো মা সদ্‌গময়/তমসো মা জ্যোতির্গময়/মৃত্যোর্মামৃতং গময়' প্রার্থনাদি আবৃত্তি করার আগে গোসাঁইজী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলেন, 'আমি আজ ও প্রার্থনা করিতে পারি না, তিনি যে আমাকে অসত্য হইতে সত্যতে নিয়াছেন, আমি এই এখানে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং আমি আর ও প্রার্থনা কিরূপে করিতে পারি?' অন্তরের ব্যাকুলতা নিয়ে গোসাঁইজী এমনভাবে কথাগুলি বললেন, যাতে করে সকলের মন ব্যাথায় ভরে উঠল, সবাই বালকের ন্যায় কেঁদে উঠলেন। গোসাঁইজী বার বার বলছেন, 'আজ আমার নূতন জন্ম হইল, আজ আমার নাম ব্রহ্মসন্তান হইল।'

অতঃপর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই প্রার্থনা ও উপাসনা কার্য পরিচালনা করলেন। অবশেষে, গোসাঁইজীর উপদেশদানকালে আবার সমস্ত নরনারী কান্নায় ভেঙে পড়লেন. ভক্তির ভাবতরঙ্গে সকলেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন।

এই দিনের কথা বলতে গিয়ে পরবর্তীকালে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,

'বিজয়কৃষ্ণ বেদীর উপর বসিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে মা মা ধ্বনি করিতেছেন, আর তাঁহার সঙ্গে শত শত উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে মা মা ধ্বনি বিনিসৃত হইয়া উপাসনা মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সে দৃশ্য কখনও ভুলিব না। মর্ত্যে সেই যে কৈবল্যধাম দেখিয়াছি তাহা কখনও ভুলিব না।'

ব্রহ্মদর্শন একমাত্র গোসাঁইজীর পক্ষেই সম্ভব একথা সকলেই জানতেন তাই তাঁরা সেদিনের ঘটনায় আশ্চর্য হন নাই, বরং আন্তরিকতায় সকলে এতটা আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। আপন জীবনের উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে গোসাঁইজী বলেছেন, 'জীবন একখানি নৌকার ন্যায় একটানা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে নিত্য নূতন দৃশ্য দেখা যাইতেছে, কখনও মরুভূমি, কখনও পুষ্পবন। কখনও সমতল ক্ষেত্র, কখনও বন্ধুর প্রদেশ। যখন যাহা দেখিয়াছি, তখন তাহাই বলিতেছি। যাহারা শুনিতেছে, তাহারা অনেক কথায়ই অসামঞ্জস্য দেখিবে। কিন্তু তাই বলিয়া তো আর সত্য গোপন করা যায় না।'

সত্যস্বরূপ ভাবময় বিজয়কৃষ্ণ, সকল কিছুতেই পরমেশ্বরের অপার লীলা দর্শন করে চলেছেন, ব্রহ্মদর্শনের স্বাদ এখন নিত্য আস্বাদনীয় বস্তু, নিত্য সম্ভোগের বিষয় হয়ে পড়েছে বিজয়কৃষ্ণের। তাই অন্তরের আর্তনাদ, কাতরতা, ব্যাকুলতা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে ভূমানন্দের স্থায়ী আস্বাদন-মানসে। এই আস্বাদন-মানসেই একদিন পুরুষোত্তম শচীনন্দন 'কৃষ্ণরে বাপরে কোথা গেলিরে' বলে কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন, ভূলুণ্ঠিত হয়ে সারা অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছেন। স্বর্ণময়ী-নন্দন বিজয়কৃষ্ণেরও সেই এক অবস্থা। নিন্দা-স্তুতির ধার তিনি আর ধারেন না, তাঁর দৃষ্টি শুধু এক দিকে—'কোথায় গেলে পাব তাঁরে'। বিজয়কৃষ্ণ বলেছেন, 'তোরা বল, আমার সে কোথায়? তোরা যে গালি দিস, তোরা কি বলিতে পারিস আমার অন্তরে কি জ্বালা? যদি না পারিস তবে তোরা যত বলিস বল, আমার প্রাণ কিছুতেই সুস্থ হইবে না।' আবার বলছেন, 'সংসারের কেহই আমার নয়। পুরাতন বন্ধুদিগের নিকট যদি আমাকে বিক্রয় করিতাম, তবে আমি এখন কোথায় দাঁড়াইতাম? তবে আমার কি গতি হইত? সংসারে যাঁহারা বন্ধু ছিলেন, যদি আমি তাঁহাদের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকিতাম তবেই বা আমার কি গতি হইত? না, না, সংসারের কেহই আমার সঙ্গী নয়। সেই পরম সুহৃদই আমার নিত্য সহায়।' গন্ডীর বন্ধন অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন বিজয়কৃষ্ণ। তিনি বলছেন, 'আমি হিন্দুসমাজও চাই না, ব্রাহ্মসমাজও চাই না, খ্রীস্টানসমাজও চাই না। আমি কোন দলাদলিই চাই না। কেবল সেই প্রাণের দেবতাকে চাই।'

প্রাণের দেবতার জন্যই গোসাঁইজী এত অধীর হয়ে পড়েছেন। সমাজের গন্ডীর মধ্যে থেকে প্রাণের দেবতার সঙ্গে স্থায়িভাবে বিচরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সঞ্চারী অবস্থায় বিজয়কৃষ্ণ বলছেন, '...ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার হইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিল না; কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না। উপাসনা সময়ে অনেক সময় তাঁহার জাগ্রত জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অভূতপূর্ব আনন্দ, আশা ও শান্তি উপভোগ করিতাম সত্য, কিন্তু কেন জানি না, এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না।'

ধর্মজীবনে গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা

এই সময়ে একদিন মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে একজন সাধুর সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের ভগবৎপ্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ হয়। সাধুজী বিজয়কৃষ্ণের আহ্বানে একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরেও আসেন। উপাসনা শেষে উভয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করেন। বিজয়কৃষ্ণ তাঁর সঞ্চারী মনের দুরবস্থার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় সাধুজী তাঁর গুরুকরণ হয়েছে কিনা তা জানতে চান। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বিজয়কৃষ্ণ, আজ বড় কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। যে প্রশ্ন এর আগেও তাঁর মনকে কয়েকবার নাড়া দিয়ে গেছে, তিনি কোন সদুত্তর খুঁজে পান নি তার। নানা যুক্তি দিয়ে মনকে প্রবোধ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু সান্ত্বনা পান নি তিনি কোনদিনই। আজও সেই যুক্তির কথাই সাধুজীকে জানালেন তিনি। পরমেশ্বরের সন্তান তাঁরা, সাক্ষাৎ সম্পর্ক তাঁদের, তবুও তার মধ্যে আর এক জনের প্রশ্ন আসে কেন? ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষা, দীক্ষা, এ সব কিছুই আছে এবং এ সব কিছুই সম্পন্ন হয় আচার্যের মাধ্যমে। গুরুবাদে বিশ্বাস তাঁরা করেন না। পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু, একমাত্র উপাস্য, কোন মানুষই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন না।

বিজয়কৃষ্ণের আন্তরিকতায় সাধুজী মুগ্ধ। চুপ করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বিজয়কৃষ্ণের মুখের দিকে। একটা অপার্থিব আনন্দধারায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর মুখমণ্ডল, আবার তাঁরই মাঝে যেন ফুটে উঠেছে একটি বেদনার প্রতিচ্ছবি। বেদনার্ত কণ্ঠেই সাধুজী বললেন, 'ওঃ এইছিওয়াস্তে সব্ বিগড় গিয়া।' এজন্যই তো তাঁর দর্শন স্থায়ী হয় না, সবই পণ্ডশ্রম হয়ে যাচ্ছে। আধার ঠিক আছে, ঘরখানাও বেশ প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু ভিত্তিহীন আলগা খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে বলে এই অনিশ্চিত অবস্থা হয়েছে। এভাবে নিশ্চিত ফললাভ করা আকাশকুসুম কল্পনামাত্র। বৃষ্টির জলধারা ধরে আকাশে ওঠা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি অসম্ভব গুরুকরণ ছাড়া প্রকৃত ধর্মলাভ।

সাধুজীর কথাগুলি গোসাঁইজীর অন্তরকে আবার আন্দোলিত করে তুলল; মন-প্রাণ যেন সকল দিক থেকেই সাধুজীর কথাই সমর্থন করতে চায়; লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে বিজয়কৃষ্ণের পরম ইষ্টলাভের আশায়। ইষ্টলাভের ইহাই যে একমাত্র পথ। সাধুজী কি তাঁকে অনুগ্রহ করে কৃপা করবেন?

'নেহি। তোম্‌হারা গুরু দোস্‌রা হায়, বখৎ হোনেসে মিল যায়গা। ঘাবড়াও মৎ।' বলে স্মিত হেসে বিজয়কৃষ্ণকে সাধুবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন সাধুজী। বিজয়কৃষ্ণের গুরু তিনি নন, তাঁর গুরু নির্দিষ্ট হয়ে আছেন আর একজন। সময় হলেই গুরুর দেখা পাবেন বিজয়কৃষ্ণ। সাধনার পথে বিরাটতম এই আশ্বাসবাণী বিজয়কৃষ্ণকে নূতন করে ভাবিয়ে তুলল, সেদিন থেকেই চলল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার পথে সদ্‌গুরুর অন্বেষণ।

সংসারে গুরু অনেক, কিন্তু সকলেই সদ্‌গুরু নন। তন্ত্রের বিচারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যাঁর জাগ্রত হয়েছে, যিনি সত্যদ্রষ্টা সিদ্ধপুরুষ, তিনিই সদ্‌গুরু বা তন্ত্রমতে কৌলগুরু। এমন সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করলে ভগবদ্দর্শন হয় না। ইহাই ভগবানের বিধান। ধর্মলাভের যোগ্যতা অর্জনের প্রথম সোপান গুরুকরণ। ধর্মরাজ্যে এই বিধি আবহমান কাল ধরে সকল দেশে সকল সম্প্রদায়ে চলে আসছে। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান সকল ধর্মেই এই এক রীতি। অবতার

পুরুষেরাও যখন যুগ-প্রয়োজনে আসেন, তাঁদেরও গুরুকরণ করতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, যীশুখ্রীস্ট সকলকেই গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের গুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেব, শ্রীকৃষ্ণের গুরু মহর্ষি গর্গমুনি, শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু মহাত্মা ঈশ্বরপুরী, আর যীশুর গুরু হলেন জন দি ব্যাপটিস্ট।

মায়ের কাছে শুনেছেন ধ্রুব বিপদবারণ শ্রীমধুসূদনের কথা। তাঁকে পেলে কারও আর কোন দুঃখ থাকে না। তাই তো শিশু ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন মধুসূদন দাদার অন্বেষণে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আকুল অন্তরে ডাকছেন, ‘মধুসূদন দাদা, তুমি কোথায়? আমায় দেখা দাও, আমায় দেখা দাও।’ ডাকছেন আর কাঁদছেন। তাঁর ব্যাকুলতায়, তাঁর আকুল আহ্বানে মধুবনের শান্ত পরিবেশও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আকাশে বাতাসে সে কান্নার সুর ভেসে বেড়ায়। সন্তানের কাতরতা মায়ের প্রাণে আঘাত হানে; গোলোকের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী দেবী ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে অন্তর্যামী নারায়ণকে বলছেন, ‘প্রভু! দুগ্ধপোষ্য শিশু আপনাকে ডেকে ডেকে দেহপাত করছে, আর আপনি তার ডাকে কোন সাড়া দিচ্ছেন না! আপনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, অথচ ধ্রুবের প্রতি কেমন করে আপনি এমন উদাসীন হয়ে বসে আছেন?’ অন্তর্যামী নারায়ণের অন্তরও বেদনাভারাক্রান্ত, ভক্তের বেদনায় তিনিও অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন কিন্তু কি করবেন, সৃষ্টির কল্যাণের জন্য যে বিধি-নিষেধ প্রবর্তন হয়েছে, তা তিনিও এড়িয়ে যেতে পারেন না। সত্য ও সনাতন এ ধারা; তিনিই এ ধারার প্রবর্তক, কিন্তু তাঁর পক্ষেও একে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তাই তো বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লীলায় তাঁকেও এই ধারা অনুসরণ করে চলতে হয়েছে। ভক্তের বেদনায় কাতর লক্ষ্মী-নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করলেন সমস্যা সমাধান করাবার জন্য। দেবর্ষি নারদ শিশু ধ্রুবকে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষাদান করলেন এবং তাঁর কৃপাতেই ভক্ত ও ভগবানের মিলন সম্ভবপর হল।

গুরুকরণতত্ত্ব প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে গোসাঁইজী তাঁর লিখিত ‘আশাবতীর উপাখ্যান’ গ্রন্থে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসু আশাবতী মূলত বিজয়কৃষ্ণ স্বয়ং।

আশাবতী : পিতঃ! গুরু না পাইলে কি ধর্মলাভ করা যায় না?

যোগী : না মা! গুরু না পাইলে ধর্মলাভ হয় না। ক খ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কৃষি বা বাণিজ্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কেবল ধর্ম শিখিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহার পর আশ্চর্যের কথা আর নাই। যদি বল ধর্ম আমার মধ্যেই আছে তাহা আবার কাহার নিকই শিক্ষা করিব? তবে ক, খ প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয় তো পড়িয়া আছে, শিখিলেই হয়; তজ্জন্য অন্যের খোসামোদ করা হয় কেন? বন-জঙ্গলে, পাহাড়ে-খনিতে রোগের ঔষধ আছে, তাহা শিখিবার জন্য কবিরাজের শিষ্য হও কেন? যাহার জলপিপাসা হয়, সে ব্যক্তি কোদাল-খন্তা লইয়া কূপ অথবা পুষ্করিণী খনন করিতে প্রবৃত্ত হয় না; যেখানে জলাশয় আছে, সেখানে জলপাত্র লইয়া জল গ্রহণ করে। তদ্রূপ সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান স্বয়ং গুরুশক্তিরূপে সর্বভূতে বিরাজ করিতেছেন। যেখানে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছেন, সে-স্থান হইতে সেইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। যেখানে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস পবিত্রতারূপে ধর্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সে-স্থান হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম একটি প্রণালী নহে, মত নহে, দল অথবা সম্প্রদায় নহে। স্বয়ং ভগবানই

ধর্ম। সেই পরাশক্তি ভগবতী বিশ্বজননী স্বয়ং ধর্ম। ধর্ম বাক্য নহে—শক্তি। ধর্ম মত নহে, কিন্তু সম্ভোগের বস্তু। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখাইয়া দেন, অন্তরে জানাইয়া দেন, তিনিই গুরু। যিনি যে বিষয়ের শিক্ষা দেন, তিনি সেই বিষয়ের গুরু। সকলের পদানত হইয়া পদধূলি লইতে লইতে অহংকার নষ্ট হইয়া হৃদয় বিনীত হয়। হৃদয় এইরূপ বিনীত না হইলে গুরুদর্শন হয় না।

আশাবতী : নিজে নিজে ঈশ্বরের নাম লইলে কি ধর্ম হয় না?

যোগী : হইবে না কেন? পুষ্করিণী কাটিয়া জলপান করার মত। পিপাসায় প্রাণ যায়, নিকটে পুষ্করিণী, তাহাতে জলপান না করিয়া পুষ্করিণী খনন করিয়া জলপান করিলে যেরূপ সুবুদ্ধির কার্য হয়, তদ্‌রূপ। বিশেষতঃ ঈশ্বরের নাম অক্ষর নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নামও শক্তি। আমি যে নাম করি, তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নাম স্পর্শমাত্র যদি প্রেম ভক্তি পবিত্রতা প্রাণে ভোগ না করি, তবে তাহা ঈশ্বরের নাম নহে। কয়েকটি অক্ষর। এ বিষয়ে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলি, শ্রবণ কর,—এক ব্রাহ্মণ বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। ব্যাস বলিলেন, 'হে বিপ্র! তুমি কি জন্য আমার নিকট দৈন্য প্রকাশ করিতেছ? আমি তোমার কি উপকার করিব?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'হে পরাশর-পুত্র! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি তোমার শরণাগত, আমার উপকার কর। আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দাও যে, আমি যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারি।'

ব্রাহ্মণের এই দৈন্যোক্তি শ্রবণপূর্বক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একটি বিল্বপত্রে কিছু লিখিয়া দিয়া বলিলেন, 'হে দ্বিজ! এই বিল্বপত্রে যাহা লিখিয়া দিলাম, তাহা দেখিও না। ইহা হস্তে রাখিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিবে। এই পত্র হস্তে থাকিতে তোমার স্বৈরবিহারে কেহই বাধা দিতে পারিবে না।' ব্রাহ্মণ সেই পত্র লইয়া পরমানন্দে সর্বত্র গমন করিতে লাগিলেন। কখনো ইন্দ্রলোকে, কখনো চন্দ্রলোকে, কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে মনের সাধে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন, পত্রটি শুকাইয়া গিয়াছে। মনে করিলেন, পত্রটি শুষ্ক হইল, কখন চূর্ণ হইয়া যাইবে; অতএব ইহাতে যাহা লেখা আছে, তাহা একটি নূতন পত্রে লিখিয়া লই। পত্রটি খুলিয়া দেখেন, "ওঁ রামঃ"। আবার ব্যাসের হস্তাক্ষরও ভাল নহে, হিজিবিজি। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'ও হরি! এই সঙ্কেত! "ওঁ রাম"!! লেখারও শ্রী দেখ! দূর হউক, শুষ্ক পত্রটি রাখিয়া আর লাভ কি? আমার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর, মুক্তার মত।' ইহা বলিয়া একটি বিল্বপত্রে দিব্য অক্ষরে "ওঁ রামঃ" লিখিলেন, শুষ্ক পত্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ স্বহস্ত-লিখিত পত্রটি হস্তে লইয়া মনে করিলেন, 'মন, চল একবার কাশী যাই। ওঃ একি, উঠি না কেন?' অনেক চেষ্টা করিলেন, সমস্ত বিফল হইল। কাশী যাওয়া হইল না। তখন ঘৃণা, লজ্জা, দুঃখে অবসন্ন হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। আর কোন উপায় না দেখিয়া পুনঃ ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন। ব্যাস কহিলেন, 'হে বিপ্র! তোমার অবিশ্বাস তোমাকে নষ্ট করিয়াছে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এই পত্রের মধ্যে কি আছে, তাহা দেখিও না। আমি বহুকাল গুরুসেবাপূর্বক তাঁহার কৃপা লাভ করি। সেই গুরুদত্ত শক্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে সেই শক্তি আমার দেবতারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় ও বরে আমি তাহা সঞ্চারণ করিতে পারি। এজন্য আমার লিখিত নামে সেই শক্তি বর্তমান ছিল। সেই শক্তিপ্রভাবেই তুমি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়াছ। "ওঁ রামঃ" এই ক'টি অক্ষরের

কোন মূল্য নাই। এজন্য তোমার হস্তাক্ষর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই।' ব্রাহ্মণ অনেক রোদন করিলেন, কিন্তু ব্যাসদেব অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে সময় হয় নাই বলিয়া আর শক্তি সঞ্চারণ করিলেন না।

আশাবতী : প্রভো! সময় হয় নাই, ইহার তাৎপর্য কি?

যোগী : কৃষকেরা শস্য রোপণ করিয়া শস্য পক্ক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। পক্ষী ডিম্ব প্রসব করিয়া তা দিতে থাকে। সময় না হইলে ডিম ফুটায় না। অসময়ে ডিম ফুটাইলে ডিম কেচে যায়। সেইরূপ যাহার হৃদয়ে ধর্মের জন্য আকুলতা হয় নাই, স্বীয় অহঙ্কার নষ্ট হয় নাই, তাহাকে ধর্মের উপদেশ দিলে তাহাতে উপকার না হইয়া অপকার হয়।

মানবজীবনে দীক্ষা শস্যক্ষেত্রে বীজ বপনের মতই। বীজ বপন করার পূর্বে জমি ভালভাবে প্রস্তুত করতে হয়; তবেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। অসময়ে বীজ বপন করলে অঙ্কুর হয় না। মানবজীবনেও ঠিক তেমনি, সত্যানুবৃত্তিই ধর্মলাভের সোপান বা ক্ষেত্র। সত্যনিষ্ঠ হয়ে গুরুদত্ত বীজমন্ত্র যথারীতি সাধন-ভজন করলে ধর্মলাভ অবশ্যম্ভাবী। গীতায় ভগবান বলেছেন, 'মম মায়া দুরত্যয়া'। তিনি স্বয়ং মানুষকে মায়ার গোলকধাঁধা থেকে উদ্ধার না করলে, মানুষের কি সাধ্য? তিনিই গুরুরূপে মায়ার কুহেলিকা থেকে পথের নির্দেশ দেন। গুরুশক্তি মায়াশক্তি থেকে প্রবল বলেই এই পন্থা। এজন্য শাস্ত্রকার বলেছেন—

গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আশাবতী : কুণ্ডলিনী শক্তি কাহাকে বলে?

যোগী : যোগে প্রবৃত্ত হইলে জানিতে পারিবে। তথাপি এই মাত্র বলি, ধর্মসাধনের আরম্ভেই গুরুর কৃপাদৃষ্টিতে আত্মা মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া, স্বীয় গৃহ-দেহকে শুদ্ধ করিবার জন্য গুরুদত্ত মহাশক্তি শরীরে প্রয়োগ করেন, তাহাতে শরীরে এক অপূর্ব তাড়িত-শক্তি প্রবাহিত হইতে থাকে। মেরুদণ্ড তাহার পথ, মস্তিষ্ক গম্য স্থান, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই স্নায়ুত্রয় এই তাড়িত-শক্তি চালনের রজ্জু। এই তাড়িত-শক্তি যতই শরীরে চালিত হয়, ততই শরীর শুদ্ধ হয়।

ঈশ্বরের শক্তি সকলের মধ্যেই রয়েছে। ইহাই কুণ্ডলিনী শক্তি। মহাপুরুষের প্রবল শক্তিদ্বারা সেই শক্তিকে জাগিয়ে দেওয়াই শক্তিসঞ্চার। এ শক্তি সাধারণত সুপ্ত থাকে। জাগিয়ে দিলেও আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারে। অবিরাম শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করলে এ শক্তি জাগ্রত অবস্থায় খেলতে থাকে। সদ্‌গুরুদত্ত সাধনকে শাস্ত্রকারগণ 'ত্রিবেণী' স্নান বলেছেন। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না-ই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। ইহাদের মিলনস্থান কুণ্ডলিনীকে ত্রিবেণী বলে। কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগানই ত্রিবেণী স্নান।

কুলগুরু অর্থ পৈত্রিক গুরু নয়। লোকে অর্থ না বুঝে পিতা-মাতার গুরুকে বা বংশগত গুরুকে 'কুলগুরু' বলে থাকে। কুলগুরুর প্রকৃত অর্থ, যিনি সাধনদ্বারা অন্তর্নিহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করেছেন তিনিই কুলগুরু। কুলগুরু বা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা না নিয়ে যার-তার কাছে দীক্ষা লওয়ায় ধর্মের এত

দুর্গতি এবং গুরুবাদের প্রতি এত অবিশ্বাস এসেছে। তৈলঙ্গস্বামী, ভোলাগিরি মহারাজ, রামদাস কাঠিয়াবাবা, গম্ভীরনাথজী এঁরা কেউ পৈত্রিক গুরুর কাছে দীক্ষা না নিয়ে সদ্‌গুরু লাভ করে ধর্মরাজ্যে এক একজন দিকপাল হয়েছিলেন।

সদ্‌গুরুই ভগবান। সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না। তিনি গুরু করেন। শিষ্যের অন্তরে নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরই সেবাপূজা করেন। শিষ্যের দেহ তাঁর মন্দির। দেবমন্দিরে কোন রকম অপচার অনাচার হলে সেবকরূপে সদ্‌গুরু তা দেখে লজ্জায়, ক্ষোভে মর্মাহত হন। শিষ্যের কোন দুর্দশা দেখলে গুরু নিজের সেবাপূজায় ত্রুটি হয়েছে মনে করে মলিন হয়ে পড়েন। সদ্‌গুরু-প্রদত্ত নাম, অক্ষরসমষ্টি বা শব্দনিচয় নয়। এই নামেই ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের ভিতর এই শক্তিসঞ্চারই সদ্‌গুরুর সাধন। কুমীরে পোকার আরসোলা ধরার ন্যায় সদ্‌গুরু শক্তিসঞ্চার করে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যকে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করে নেন। সদ্‌গুরুর দীক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে—

দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'গুরু নাম দেন কানে, আর সদ্‌গুরু প্রাণে।' শক্তিসঞ্চার দৃষ্টিদ্বারা, স্পর্শের দ্বারা এবং ধ্যানের মাধ্যমেও হতে পারে। দৃষ্টিদ্বারা শক্তিসঞ্চারের উদাহরণ মৎস। মাছ ডিম পেড়ে চোখে চোখে রাখে। দৃষ্টিশক্তি ডিমে সঞ্চারিত হয়, ডিম ফোটে। স্পর্শদ্বারা শক্তিসঞ্চারের উদাহরণ পক্ষী। পাখী ডিম পেড়ে তা দেয়। স্পর্শশক্তি ডিমে সঞ্চারিত হয়ে ডিম ফোটে। ধ্যানের উদাহরণ কচ্ছপ। সে ডিম পেড়ে মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে চলে যায় কিন্তু ডিমের কথা মনে মনে ধ্যান করে। সেই ধ্যানশক্তি দ্বারা ডিম ফোটে।

গুরু লাভ করে পরিণত বয়সে গোসাঁইজী বলেছেন—'আমি এ কথা নিশ্চয়রূপে জেনেছি, গুরু ব্যতীত কখনও ধর্মলাভ হতে পারে না। সামান্য একটা কিছু জানতে হলে, সামান্য একটু শিক্ষা লাভ করতে হলে, গুরুর প্রয়োজন হয়, গুরু ব্যতীত হবার যো নেই।' তিনি আরও বলেছেন—'আর সর্বাপেক্ষা যে বিষয়টি দুর্বোধ্য, গুরু ব্যতীত অনায়াসে তা লাভ হবে, এ কখনও হয় না। বিশেষভাবে একটি মানুষকেই ধরতে হবে। একটি বিশেষ ব্যক্তিতে গুরুত্ব স্থাপন করতে পারলেই প্রকৃত গুরুলাভ হয়। তখন সমস্ত পদার্থই গুরুময় হয়ে যায়। এরূপটি হলে সাধারণ গুরুভাব আর থাকে না। যাঁতে ভগবানের চিৎশক্তির বিলাস হয়, যাঁতে তাঁর জ্ঞানশক্তির প্রকাশ পায়—তিনি গুরু। গুরু অন্য কেহ হতে পারেন না। মহাপুরুষেরাই গুরু।'

সকলেই গুণের অধীন। গুরুর অধীন মানুষ অনেক পরে হয়। গুরুতে বিশ্বাস হওয়া অতি কঠিন। বিশ্বাস হবার একমাত্র পথ—নির্বিচারে গুরুবাক্য পালন। বিচিত্র এই সংসার। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে অতি অল্প জনেরই ঈশ্বর লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। দৈবী শক্তির অচিন্ত্যলীলায় কারো কারো উদ্ধারণের তীরে তরী ভিড়ে, সাধুসঙ্গের দ্বারা শোধিত, রূপান্তরিত হয় মন। গুরু লাভ করে ধন্য হয় জীবন। একমাত্র পরতত্ত্ববেত্তাই গুরু হবার অধিকারী।

চৈতন্যচরিতকার বলেছেন—

সংসারে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥ ২।২২।২৮

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥ ২।২২।৩৩
কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই গুরু হয়॥ ২।৮।১০০
গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম শিক্ষাপৃচ্ছ সাধুমার্গানুগমন॥ ২।২২।৬১

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার-পথে সদ্‌গুরু অন্বেষণ

১২৮৭ সালে ১ চৈত্র গোস্বামী মহাশয় বিহার অঞ্চলে প্রচারের কাজে বের হন। সঙ্গে প্রচারক শশিভূষণ বসু। মধুপুর, হাজারিবাগ হয়ে ১২৮৮ সালের বৈশাখের প্রথমদিকে গয়া পোঁছে তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মভক্ত গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিতের আমন্ত্রণে তাঁর গৃহে উঠেন। 'ব্রাহ্মধর্ম ও নববিধানের ধর্মমতের পার্থক্য' নিয়ে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এতে কোনপ্রকার ব্যক্তিগত সমালোচনা থাকত না। নববিধানের ধর্মমত ব্রাহ্মধর্ম নয়, বরং ব্রাহ্মধর্মবিরোধী এই তথ্য তিনি যুক্তি দিয়ে পরিবেষণ করতেন। প্রতিদিন তিনি ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে উপদেশ দিতেন। সাধারণত তিনি বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত, উপনিষদ, মহানির্বাণতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করতেন। বহু সনাতনী হিন্দু পরিবারও সান্ধ্য উপাসনায় তাঁর ভাষণ ও ব্যাখ্যা শুনতে আসতেন এবং তাঁরা গোসাঁইজীকে সবান্ধবে আমন্ত্রণ করে আপন আপন গৃহে কীর্তন করতেন ও তাঁকে দিয়ে শাস্ত্রব্যাখ্যার ব্যবস্থা করতেন। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ সালে গয়ায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। গয়াকে কেন্দ্র করে শ্রাবণ মাস অবধি গোসাঁইজী বাঁকিপুর, মজঃফরপুর, মতিহারি ও গাজিপুরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। এ সময়ে তিনি তিনটি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নগুলির বৃত্তান্ত তিনি স্বহস্তে লিখে রেখেছেন। তৃতীয় স্বপ্নটির বিবরণ সাধারণ্যে প্রচার করা নিষিদ্ধ বলে বর্তমান গ্রন্থে বিধৃত হল না।

প্রথম স্বপ্ন ঃ গয়া/সাহেবগঞ্জ

২৮ বৈশাখ, সোমবার, ১২৮৮ সাল

আমি একটি প্রকান্ড নদীর তীরে বসিয়া আছি, লক্ষ লক্ষ লোক সহস্র সহস্র নৌকায় পার হইতেছে; আমাকে কেহই ডাকিতেছে না। একজন আমাকে হঠাৎ ডাকিয়া নৌকায় উঠাইল। নৌকাযোগে পারে উপস্থিত হইলে, কতিপয় পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আমাকে একটি বাগানে লইয়া গেলেন। বাগানে সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ আছে। তথাকার প্রাচীরের লতায় এক অপূর্ব পুষ্প দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। ক্রমে আমি অচেতন হইলাম; তখন ঐ পুষ্পসকল পরমাসুন্দরী স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আমাকে বলিল, 'হে ভদ্র, তোমার হৃদয়নাথকে অন্বেষণ কর।' আমি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্যানের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময় একটি কুকুর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিল, 'আতিথ্যস্বরূপ এই ফল ভক্ষণ কর।' আমি ফলটি ভক্ষণ করিবামাত্র কুকুরটি চলিয়া

গেল। এমন সময় একটি জটাধারী মহর্ষি আমার নিকটে আসিয়া কহিলেন, 'বৎস! আমার হস্ত ধারণ কর।' আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করিবামাত্র উভয়ে আকাশপথে ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিলাম। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ-উপগ্রহ অতিক্রম করিয়া, এক জ্যোতির্ময় ধামে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানের জ্যোতি এত অধিক যে, আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। আর সকল বস্তু যেন অন্ধকারে ঢাকা। ক্রমে যাইতে যাইতে একটি সুন্দর স্থানে যাইয়া দেখি, কয়েকজন মহর্ষি উজ্জ্বল তারকার ন্যায় চতুর্দিক আলোকিত করিয়া যোগাসনে বসিয়া আছেন। আমার পথপ্রদর্শক মহর্ষি আমার হস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন করিলেন। ঐ সাধুমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কস্ত্বং?' আমি উত্তর করিলাম, 'অস্তি পৃথিব্যাং ভাগীরথীতীরে শান্তিপুর নামা কশ্চিৎ জনপদঃ। তস্মিন্ পুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-নামা প্রসিদ্ধঃ সিদ্ধপুরুষোঽভূৎ। তস্য কুলে জাতো বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামা অকিঞ্চনোঽহং ভগবতাম্ সমীপে সমাগতঃ। ভগবদ্দর্শনলালসকাতরতয়া মনঃ-প্রাণাবিদীর্যন্তে। হে সত্তমা, মাং কৃপাং কুরুত।' আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া, সেই কৃপালু সাধু বলিলেন, 'বৎস, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, উপবিশ।' আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম। সাধুগণ সমস্বরে স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন—

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়॥
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
নমঃ ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥

স্তব পাঠ করিতে করিতে তাঁহারা নৃত্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভগবানের প্রকাশ হইল। সেই শোভা-সৌন্দর্য দেখিয়া আমি অচেতন হইলাম। সচেতন হইয়া দেখি, আমি পৃথিবীর সেই উদ্যানে রহিয়াছি। তখন উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্বক দৌড়িতে লাগিলাম। হায়! কেন আমি প্রভুকে দেখিয়া অচেতন হইলাম? হে প্রাণ, তুমি কেন সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলে? তখন কে যেন আমাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'বৎস, স্থির হও, প্রভুর চরণ ধ্যান কর, আশা পূর্ণ হইবে। প্রভু তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন।' ইহার পরই নিদ্রা ভংগ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় স্বপ্ন ঃ গয়া/সাহেবগঞ্জ

২ আষাঢ়, রবিবার, ১২৮৮ সাল

মধ্যাহ্নে আহারান্তে গ্রীষ্মাধিক্য-প্রযুক্ত শরীর কিছু কাতর হইল। শয়ন করিলাম। অনেকক্ষণ নিদ্রা আসিল না। চারিটার পর হঠাৎ নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রিতাবস্থায় দেখিলাম, কোথায় একটি ব্রাহ্মসমাজে সম্বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন হইতেছে। একজন বলিল, 'সাধারণ সমাজকে নিমন্ত্রণ না করিলে, পরে নিন্দা-ভাজন হইতে হইবে।' এ কথা শুনিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। পথের মধ্যে কতকগুলি ভদ্রলোক দণ্ডায়মান আছেন, তাহার মধ্যে একজন বীরবেশী পণ্ডিত আমার সহিত ধর্মশাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ বিচার করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এমন সময়ে একজন বলিলেন, 'ইনি ব্রহ্মজ্ঞানী।' এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত ক্রোধপূর্বক আমার একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেন। আমি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম। সম্মুখের পথ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের প্রশস্ত পথে গমন করিয়া

দেখি, পথে অসংখ্য বানর। প্রথমে অনেক বানর দেখিয়া মনে কিছু ভয় হইল, তথাপি সেই পথে চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 'জয়রাম, শ্রীরাম' বলিতে বলিতে যাইতেছেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ 'ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ' উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে চলিলাম। আমাকে পশ্চাতে যাইতে দেখিয়া সেই বৃদ্ধ এক বীরপুরুষ হইলেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমাকে চেন?' আমি কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। ক্রমে আমরা উভয়ে একটি ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে উদ্যান, সরোবর এবং মধ্যে চার-পাঁচটি মন্দির। ঠাকুরঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাকে চেন?' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞা না।' তিনি বলিলেন, 'আমি বীর হনুমান।' এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 'কি জন্য আসিয়াছ?' আমি বলিলাম, 'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী।' তিনি বলিলেন, 'আমি কি ব্রহ্মজ্ঞানী নহি? আমি রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রকে পূজা করি না। সেই আত্মারাম পরব্রহ্মকেই পূজা করিয়া থাকি। রমতে ইতি রামঃ। আত্মারাম, প্রাণারাম,—এই দেখ!' ইহা বলিয়া বক্ষঃস্থল চিরিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম, তাঁহার প্রত্যেক অস্থি, মাংস ও পেশীর মধ্যে 'ওঁ রামঃ ওঁ রামঃ' এইরূপ স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'আমায় কিছু উপদেশ প্রদান করুন।' তিনি বলিলেন, 'তোমাকে যোগদীক্ষা দিব, চল যাই।' ইহা বলিয়া হস্তে একখানি কোদালী লইয়া আমার পশ্চাৎ চলিলেন। কিছুদূর গিয়া সরোবরের তীরে একটি বৃক্ষতলে ছোট একটি কুটীর দেখাইয়া বলিলেন, 'এই কুটীরে তোমার তপস্যা হইবে। কেমন হইবে না?' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞা হইবে।' তিনি বলিলেন, 'দেখ, আমি মনে করিলে এক মুহূর্তে অট্টালিকা নির্মাণ করিতে পারি, যদি প্রয়োজন থাকে বল।' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞা, ইহাতেই যথেষ্ট হইবে। আর প্রস্তুত করিতে হইবে না।' তিনি বলিলেন, 'ভাল, তবে এস, উপদেশ গ্রহণ কর। "ওঁ তৎসৎ, ওঁ রামঃ" এই নামের ভাব ধ্যান কর এবং জপ কর। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা ব্রহ্ম, তিনি প্রাণারাম, হৃদয়রমণ, তিনিই সত্য, ইহাই এই মন্ত্রের অর্থ। এই মন্ত্রার্থ সাধন কর।' এই মন্ত্র সাধন করিতে করিতে অনেক দিন অতীত হইল। একদিন বীর হনুমান আসিয়া বলিলেন, 'তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। তোমার শরীরের লোমকূপ দিয়া আনন্দস্রোতঃ যাইতেছে। আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ, অবিশ্রান্ত হইতেছে। কেমন, আত্মা পূর্ণ হইয়াছে ত?' আমি বলিলাম, 'সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়াছে।' তিনি বলিলেন, 'তবে অন্য সাধনের উপদেশ গ্রহণ কর।' আমি বলিলাম, 'অন্য সাধন কি?' তিনি বলিলেন, 'ব্রহ্মে প্রবেশ, ইহাকেই সন্ন্যাস বলে।' আমি বলিলাম, 'ব্রাহ্মধর্মে সংসার ত্যাগ নিষেধ। বিশেষতঃ আমাকে ধর্ম প্রচার করিতে হইবে। দেশে ত ধর্মের অভাব।' তিনি বলিলেন, 'ভাল, কিছুদিন আনন্দে ধর্ম প্রচার করিয়া সর্বদেশে ব্রহ্মানন্দ বিস্তার কর। পরে ব্রহ্মে প্রবেশ করিও। এস, এখন আমরা সংকীর্তন করি।' ইহা বলিয়া প্রকাণ্ড বানর দেহ ধারণ করিলেন। মস্তক ও লেজ আকাশে উঠিয়াছে চক্ষু দুইটি যেন চন্দ্র-সূর্য, দেখিলে ভয় হয়। তাঁহার রোমেও 'ওঁ রামঃ, ওঁ রামঃ, ওঁ রামঃ'। মস্তকে, চক্ষুতে, হস্তে, কর্ণে, সর্বশরীরে 'ওঁ রামঃ, ওঁ রামঃ'। এত উজ্জ্বল যেন ছোট ছোট ফুকো শিশির আলোর মত বোধ হইতে লাগিল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার বানর দেহের মুখখানি কি জান?' আমি বলিলাম, 'না।' তিনি বলিলেন, 'আমার মুখখানি "ওঁ"। এই "ওঁ", পুরুষ; আমার লেজ, প্রকৃতি।

এইজন্য লেজের দ্বারা রাবণের সর্বনাশ করিয়াছি। আমার শরীরটি পুরুষ প্রকৃতি। সাধন করিলে, অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করিলে, তুমিও বানর দেহ লাভ করিবে।' আমি বলিলাম, 'আমার কি লেজও হইবে?' তিনি বলিলেন, 'অবশ্য। পুরুষ প্রকৃতি এক না হইলে ব্রহ্মে প্রবেশ করিবার অধিকার হয় না। এখন কীর্তন করি।' ইহা বলিয়া দুই বাহু ঊর্ধ্বে বিস্তার করিয়া "ওঁ রামঃ, ওঁ তৎসৎ" এই নামগান করিতে করিতে উন্মত্ত হইলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া এই কীর্তনে যোগ দিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। গণেশ খোল ও করতাল চারি হাতে বাজাইতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে শিবের জটা খসিয়া পড়িল। পার্বতী জটা ধরিয়া নাচিতে লাগিলেন। নারদ ও সরস্বতী বীণা বাজাইতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই, ইহার মধ্যে এক জ্যোতি প্রকাশিত হইল। সকলেই করযোড়ে ব্রহ্মের স্তব করিতে লাগিলেন। আমি ব্রহ্মের জ্যোতির মধ্যে লুটাইতে লাগিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি করিতেছ?' আমি বলিলাম, 'আমি মাখিয়া লইতেছি।' তিনি বলিলেন, 'খুব মাখ, খানিকটা কাপড়ে বাঁধিয়া লও।' আমি বলিলাম, 'নিরাকারকে কি রকমে বাঁধিব?' তিনি বলিলেন, 'সে কাপড় জড় নহে, হৃদয় কাপড়।' ক্ষণকাল পরে জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণ কিছুক্ষণ কীর্তন করিয়া ভক্ত হনুমানকে আলিঙ্গনপূর্বক চলিয়া গেলেন। হনুমান আমাকে বলিলেন, 'এইখানে প্রতিদিন এইরূপ হয়। এতদিন তপস্যায় ছিলে, কিছু জানিতে পার নাই।' আমি বলিলাম, 'আমার নিতান্ত অভিলাষ, আমি এখানে বাস করি। কিন্তু কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজের বড় অনিষ্ট করিতেছেন। তাহা নিবারণের জন্য যাইতে হইবে।' হনুমান বলিলেন, 'কেশববাবু ছিলেন ভাল। এখন তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন। নিজে অন্ধ হইয়া অনেককে অন্ধকূপে ফেলিতেছেন। আমি যদি ব্রহ্মে প্রবেশ না করিতাম, কেশববাবুকে সংশোধন করিয়া আসিতাম। মহাভারত পড়িয়াছ ত? ভীমের অহঙ্কার যেমন নির্বিবাদে নষ্ট করিয়াছিলাম।' আমি বলিলাম, 'আমি তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব?' তিনি বলিলেন, 'অসত্য নষ্ট কর, আর প্রেম কর। প্রেম, প্রেম, প্রেম।' ইহার পরই নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

সময়ান্তরে তিনি আর একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। প্রসঙ্গত এখানেই সে স্বপ্নবৃত্তান্ত বিধৃত হল।—একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, 'আমি অকস্মাৎ শূন্যমার্গে উঠিতেছি। নিম্নে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সাগর, অরণ্য, গ্রাম-নগর, আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি পার হইয়া অবশেষে গোলোকে গিয়া উপনীত হইলাম। তথায় এক অপূর্ব শোভা-সৌন্দর্যসমন্বিত গৃহে স্বর্ণ সিংহাসনের উপরে রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত রহিয়াছেন দেখিলাম। যেরূপ ঝাপি দর্শন হয়, সেইরূপ দর্শন হইতে লাগিল। রাধাকৃষ্ণ এক-একবার মিশিয়া এক হইতেছেন, আবার পৃথক হইয়া পূর্বের ন্যায় দুই হইতেছেন। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলাম, "প্রভো, জগতের জীবের বড়ই দুর্দশা, কৃপা করিয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন কর।" এমন সময়ে দিব্য মহা-প্রসাদসহ একখানি থালা আমার সম্মুখে আনীত হইল। রাধাকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "যাও, এই মহাপ্রসাদ লইয়া জগজ্জনকে বিতরণ কর। ইহা হইতেই তাহাদের সর্বপ্রকারের দুঃখ বিমোচন হইবে।" আমি সেই মহাপ্রসাদ লইয়া মনের আনন্দে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। লোক-লোকান্তর হইতে দেবতারা

আসিয়া আমার নিকটে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিয়া দ্রুতবেগে পৃথিবীর দিকে নামিতে লাগিলাম। নামিবার কালীন পৃথিবীর সেই শোভা-সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে অবশেষে দিল্লীর নিকটে এক স্থানে অবতরণ করিলাম। অবতরণ করিয়াই গৃহাভিমুখে ছুটিতে লাগিলাম, এবং প্রসাদ লইবার জন্য কত লোককে ডাকিলাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কেহই প্রসাদ চায় না। আমি গোলোক হইতে আসিয়াছি শুনিয়া তাহারা নানারূপ কাম্যবস্তু আমার নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল। অবশেষে পাণ্ডুয়া স্টেশনের নিকটে, একটি মাত্র লোক আমার নিকট হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিল; ইহার পর আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।'

কয়েকটি আশ্চর্য স্বপ্ন ও অপ্রাকৃত অনুভূতির ভিতর দিয়ে গোস্বামীপ্রভুর জীবনের দিব্য পরিবর্তন আরম্ভ হয়। তিনি নানা স্থান ভ্রমণ করে তখনও গয়ায় অবস্থান করছেন।

গয়ায় আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এক বিলাতফেরত ভদ্রলোক তখন বৈষয়িক কার্যে গয়া এসেছিলেন। তাঁর পরলোকবাসী পিতা তাঁকে স্বপ্নে বলেন, 'বাপু, গয়ায় যখন এসেছ, তখন আমার জন্য একটি পিণ্ড দিও।' ভদ্রলোক এই স্বপ্নের কোন গুরুত্ব দেন না। আর একদিন এই একই স্বপ্ন আবার দেখে তিনি গোসাঁইজীকে স্বপ্নবৃত্তান্তের কথা বলেন। ভদ্রলোকের এসবে বিশ্বাস নেই জেনেও গোস্বামী মহাশয় তাঁকে পিতার ইচ্ছামত কাজ করতে বলেন। ভদ্রলোক বলেন, 'আমি কি করে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেই? নিজে যা বিশ্বাস করি না, তা আমার পক্ষে কি করে করা সম্ভব?' এর পরও একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেন, পিতা পিণ্ড লাভের আশায় ব্যাকুল হয়ে অনুনয় করছেন। এসব কথা গোসাঁইজীকে বলায় তিনি বলেন, 'আপনি তো আর আপনার বিশ্বাস মত পিণ্ড দিচ্ছেন না, আপনার পিতার যখন তৃপ্তি হবে, তখন পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করাই সমীচীন। আর যদি নিজে না দিতে চান, তবে একজন পাণ্ডাকে প্রতিনিধি করে পিণ্ডটি দিয়ে দিন।' তাই হয়; ভদ্রলোক গোসাঁইজীকে পিণ্ডদানের সময় সঙ্গে নিয়ে যান। পিণ্ডদানের সময় ভদ্রলোক অঝোরে কেঁদে বলেন, 'আমি দেখলাম, বাবা দু হাত জোড় করে পিণ্ড গ্রহণ করছেন। গ্রহণমাত্র তাঁর শরীর বদলে গেল। অভিনব এক উজ্জ্বল মূর্তি ধারণ করে তিনি অন্তর্হিত হলেন। এরূপ জানলে আমি নিজেই পিণ্ড দিতাম।'

সাধনমার্গে সাধক যখন অগ্রসর হন, তখন পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি অনেক সময় তাঁর মানসপটে ফুটে উঠে। গয়াধামে অবস্থানকালে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত রামগয়া পাহাড়ে একদিন সাধুসন্দর্শনে যান গোস্বামী মহাশয়। ওখানে পৌঁছামাত্রই তাঁর পূর্ব জন্মের কথা স্মৃতিপটে উদয় হয়। তাঁর মনে হয়, তিনি যেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নন, অপর কেউ। একজন অতি প্রাচীন দেহধারী ব্রাহ্মণ একটি গাছের নীচে বসে ছিলেন; তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানে তিনজন সন্ন্যাসী ছিলেন,—তাঁরা কোথায় গেলেন?' ব্রাহ্মণ বলেন, 'কাঁদের কথা বলছেন? তাঁরা তো বহুদিন দেহ রেখেছেন।' গোসাঁইজী আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানে নৃসিংহদেবের মন্দির ছিল না?' ব্রাহ্মণ বলেন, 'হ্যাঁ, এখনও আছে। এগিয়ে যান, দেখতে পাবেন।'

নৃসিংহদেবের মন্দিরে প্রবেশমাত্র তাঁর স্মরণ হয়, তিনি আরও তিন জন সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই মন্দিরে বাস করতেন। কোন্ ঘরে শয়ন করতেন, কোথায় আহার করতেন, কোথায় বসে পাঠ করতেন সবই একে একে তাঁর মনে পড়ে।

ঘরগুলি তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেন। অদূরে একটি দীঘিতে ওঁরা স্নান করতেন, স্মরণ হতেই নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখেন, তখনও জলাশয়টি রয়েছে। আবার মনে পড়ে, একটি বৃক্ষের গায় ছাল কেটে তিনি কি যেন লিখেছিলেন। অনুসন্ধান করে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ দেখলেন; তাতে 'ওঁ রামঃ' এ কথাটি লেখা রয়েছে। অক্ষরগুলো আঁকাবাঁকা হয়ে গেলেও তাঁর বুঝতে কষ্ট হল না। এ তাঁরই জন্মান্তরের স্বহস্ত-লিখন। এ বিষয়ে গোসাঁইজী 'আশাবতীর উপাখ্যানে' লিখেছেন,— 'একি, একি? আমার প্রাণ কেমন করিতেছে! আমি যেন এখানে ছিলাম। আরও তিনটি সাধু এখানে থাকিতেন।......এই বৃক্ষতলে আমার আসন ছিল। ঐ বৃক্ষের উত্তরের শাখায় আমার একটি চিহ্ন আছে। নৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়া "এই যে, এই যে" বলিয়া যেন কত পরিচিত আত্মীয়স্বজনের চরণে প্রণাম করিলাম।'

গাজীপুরে এক বাবাজীর সঙ্গে আলাপে গোসাঁইজী মুগ্ধ হন। তিনি যেন বিনয়ের জীবন্ত পট। একটি চোখ নেই, তথাপি মুখশ্রীর কোন হানি হয় নি। 'দাস' বলে তিনি নিজেকে অভিহিত করেন। কেউ কোন প্রশ্ন করলে বলেন, 'দাসকা ক্যায়া মালুম? গোসাঁইজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ধর্মসাধনের প্রতিবন্ধক কি?' বার বার তিনি অনুরোধ করলে সবিনয়ে বাবাজী বলেন, 'হামবারাই।' অর্থাৎ অভিমান, অহঙ্কার। গোসাঁইজী আবার প্রশ্ন করেন, 'অনন্তস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মকে কি করে লাভ করা যায়?' বাবাজী বলেন, 'শনৈঃ শনৈঃ, এক রোজমে নেহি।'

এর পর, কন্যা প্রেমমালার গুরুতর পীড়ার সংবাদে বাংলা ১২৮৮ সালের ভাদ্র মাসের দুই তারিখে কলিকাতা ফিরে এসে গোসাঁইজী শোনেন, পূর্ব দিনই কন্যার মৃত্যু হয়েছে। সন্তোষিণীর মৃত্যুতে গোস্বামী মহাশয়ের দুঃসহ শোকের কথা ভেবে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অনুগামীরা শঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেন। কিন্তু এবার গোসাঁইজীর মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য না দেখে সকলে অবাক হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। এই সন্তান বিয়োগের চার-পাঁচদিন পরই তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ভক্তি বিষয়ে উপদেশ দেন। এই সময় কিছু দিন তিনি কলিকাতায় থাকেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং কলিকাতার আশেপাশে উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন। ছাত্রসমাজ তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

সাধু-সন্ন্যাসী, উদাসীনদের প্রতি দিন দিন গোসাঁইজীর এক অমোঘ আকর্ষণ দেখা যায়। যখনই তিনি কোন সাধুর দর্শন পেতেন, তখনই তাঁর সঙ্গে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। আপন অভীষ্ট সাধনের জন্য যোগী, সন্ন্যাসী, বাবাজী, পীর, ফকির কত রকম ধর্মার্থীর সঙ্গেই না অন্তরঙ্গভাবে তিনি মিশেছেন। তাঁদের পরামর্শে বেদ, ভাগবত, গ্রন্থসাহেব. বাইবেল, কোরাণ আর কতই না গ্রন্থ পড়েছেন। আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম যোগের কত না প্রক্রিয়ার উপদেশ পেয়েছেন। বিদ্যার্থীর অধ্যবসায় নিয়ে যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন, তাই তাঁর নিজের জীবনে রূপায়িত করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন নি।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ, ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ম্ প্রেম্ন প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

—ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু

সর্বপ্রথমেই শ্রদ্ধা, শাস্ত্রে ও সদাচারে বিশ্বাস। শাস্ত্র ও সদাচারে বিশ্বাস জন্মালেই সাধুসঙ্গের অধিকার হয়। শাস্ত্র সদাচার অনুসরণ করে, সাধুরা কিরূপ জীবন লাভ করেছেন, কিভাবে শান্তিতে দিন যাপন করেছেন, এ সব দেখে-শুনে সাধুদের মত জীবন লাভ করতে একটা আকাঙ্ক্ষা হয়; আগ্রহ হয়। এই প্রকার হলেই তখন ভজনক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে করতে সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হয়। অন্তরে কোনও প্রকার অনিষ্টকর প্রতিকূল অবস্থাই আর থাকে না; ভজনে সব দূর হয়। এর পর ভাব। ভাবের পরে ভক্তি; তারপর প্রেম। ভাব বৃক্ষ, ভক্তি পুষ্প; প্রেম সুপক্ক ফল।

গোস্বামী মহাশয় ঈশ্বর লাভের জন্য নানা সম্প্রদায়ের সাধুর সঙ্গে মেলামেশা করলেও কেহই তাঁকে দলভুক্ত করতে পারেন নি। তিনি নিজেও মন্তব্য করেছেন, ‘ঐ সকল সাধুর মধ্যে নগণ্যসংখ্যকই প্রকৃত ধর্মার্থী। দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব ও ঐশ্বর্যলাভই অধিকাংশের লক্ষ্য।’

যাঁরা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, মুখে ধর্ম ধর্ম করলেও ধর্মপথে চলার যোগ্যতা তাঁরা অর্জন করেন না। ধর্মলাভের আকাঙ্ক্ষা হলেই অহঙ্কার নষ্ট হয়। সেই নিরহঙ্কার চিত্তেই ধর্মপারিজাতের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। এই অবস্থায় কোন যথার্থ ধর্মার্থী চণ্ডালের পদধূলি নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥

গোসাঁইজী ঈশ্বরলাভের জন্য ব্রাহ্মসমাজে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁর মনোবাঞ্ছা সর্বতোভাবে সিদ্ধ না হওয়ায় কাঙ্গালের ন্যায় বিনীত হৃদয়ে যেখানেই তিনি ধর্মপ্রসঙ্গের আলোচনার কথা শুনেছেন, সেখানেই গিয়েছেন। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সেখানকার ভজনপ্রণালী অবলম্বন করে সাধন করেছেন। এইভাবে তিনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধধর্মের যত রকম সাধনপ্রণালী এদেশে প্রচলিত আছে, তার অধিকাংশই একে একে আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু কোথাও পরিপূর্ণতার স্বাদ পান নি। সিকি বা আধুলি ঐ পর্যন্তই; ষোল আনা কোথায়ও নেই। এমনই এক অন্তর্নিহিত শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল, যার ফলে আজীবন কঠোর সাধনভজন করে অর্জন করা যা সাধারণ ধর্মার্থীর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, তা তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলতেন। সকল সম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালী আয়ত্ত করার ফলে পরবর্তীকালে যে কোন সম্প্রদায়ের সাধক তাঁর সাধনভজন সম্পর্কীয় গুহ্য বিষয়ের যথাযথ সমাধান গোসাঁইজীর কাছে জানতে এসে বিস্ময়ে হতবাক হতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘সত্য বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে অনেক ঘুরেছি—কোথায় কি আছে—প্রত্যক্ষ করতে কবিরপন্থী, দাউদপন্থী, গোরক্ষপন্থী, সুন্দরপন্থী, বাউল, দরবেশাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের ভিতরই প্রবেশ করলাম। একটি একটি করে, তাঁদের প্রণালী মত সাধন করে, কোন্ সম্প্রদায়ের কতদূর কি আছে দেখে নিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হল না। আমি যাহা চাই, তাহা কোথাও পেলাম না।’

একবার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের দলপতি জগচ্চন্দ্র গুপ্তের কাছে গোসাঁইজী দীক্ষা নিয়ে সাধন-ভজন আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মপিপাসু আচার্য উমেশচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধককে গুরু বলে মান্য করতেন। প্রাণয়াম কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনের প্রধান অঙ্গ। তাঁর এই কর্তাভজা মতে দীক্ষা সম্বন্ধে গোসাঁইজী বলেছেন, ‘সে

এক বিষম কাণ্ড। আমি তো বিপদেই পড়েছিলাম। বাউল সম্প্রদায়ে অনেক স্থলে বড়ই জঘন্য ব্যাপার—তা আর মুখে আনা যায় না। ভাল ভাল লোকও বাউলদের মধ্যে আছেন। তাঁরা সব চন্দ্রসিদ্ধি করেন। শুক্রচান, শনিচান, গরলচান, উন্মাদচান—এই চার চান সিদ্ধি হলেই মনে করেন সমস্ত হল। শরীরের পুঁজ, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র কিছুই তাঁরা ফেলেন না, সবই খান। একদিন একটি বাউলকে আমরক্ত বিষ্ঠা খেতে দেখে খুব বিরক্তি প্রকাশ করলাম। আখড়ার মহান্ত আমার মন্তব্য শুনে আমাকে শাসন করে বলেন, "তোমাকে উন্মাদচান, গরলচান সিদ্ধি করতে বিষ্ঠা-মূত্র খেতেই হবে।" আমি বললাম, "ওটি আমি পারব না। বিষ্ঠা, মূত্র খেয়ে যে ধর্মলাভ হয়, তা আমি চাই না।" মহান্ত খুব রেগে উঠে বললেন, "এতকাল তুমি আমাদের সম্প্রদায়ে থেকে, আমাদের সমস্ত জেনে নিলে, আর এখন বলছ, সাধন করব না। তোমাকে ও-সব সাধন করতেই হবে।" আমি বললাম, "তা কখনই করব না।" মহান্ত শুনে গালি দিতে দিতে আমাকে মারতে এলেন, শিষ্যেরাও মার মার শব্দ করে এসে পড়ল। আমি তখন খুব ধমক দিয়ে বললাম, "বটে, এতদূর আস্পর্দ্ধা! মারবে! জান, আমি কে? আমি শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশের গোস্বামী, আমাকে বলছ বিষ্ঠা মূত খেতে?" আমার ধমক খেয়ে সকলে চমকে গেল। মহান্ত খুব কাতর হয়ে এসে নমস্কার করে করজোড়ে বললেন, "প্রভো! আপনি গোস্বামী সন্তান, অদ্বৈত প্রভুর বংশ আমি জানতাম না। বড় অপরাধ করেছি। দয়া করে ক্ষমা করুন।" আমি তখনই ওখান থেকে চলে এলাম। ঊর্ধ্বরেতা হওয়াই ওঁদের সাধনের লক্ষ্য, এবং সেরূপ লোকও বাউলদের ভিতর আছেন।' এক দুর্বার ধর্মপিপাসায় বিজয়কৃষ্ণ কাঙালের মত সর্বত্র বিচরণ করেছেন। কত সাধুসন্তের চরণতলে বসে তাঁদের প্রসাদ ভিক্ষা করেছেন।

গোস্বামী মহাশয় বলেছেন, 'একদিন আমি মির্জাপুর স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পেলাম একজন দীর্ঘাকৃতি কাঙ্গালবেশ সাধু দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে আসছেন। দূর হতে দেখতে পেয়ে আমি তাঁকে নমস্কার করব মনে করে ফুটপাতের অপর দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি নিকটে আসতেই আমি তাঁকে নমস্কার করলাম। চলতে চলতে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তখন মনে হল যেন আধ মণ বরফ আমার মাথায় তিনি চাপিয়ে দিলেন। আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি সাধুর সঙ্গে চলতে মনস্থ করা মাত্র তিনি আমার পিঠে একটি চাপড় মেরে বললেন, "চলো, বাচ্ছা চলো।" এই বলে খুব দ্রুতপদে চলতে লাগলেন। আমিও তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। কিভাবে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যে গেলাম কিছুই বুঝলাম না। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেন চলেছি। কতক্ষণ পরে দেখি ইডেন গার্ডেনে এসেছি। একটি গাছের নীচে বসিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন। "গুরু ব্যতীত কিছুই হয় না"—তিনি পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলেন। তাঁর নিকট আমি দীক্ষা প্রার্থনা করাতে বললেন, "না, তা হবে না। তোমার গুরু নির্দিষ্ট রয়েছেন। সময়ে তিনিই তোমাকে খুঁজে নেবেন, ব্যস্ত হতে হবে না।" তারপর আমি তাঁর অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হয়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললাম। হাওড়ার পুলের উপর চলতে চলতে দেখলাম, হঠাৎ সাধু অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। এ ঘটনার পর সাধুদের প্রতি আমার আরও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।'

১২৮৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে অঘোরনাথ গুপ্ত যুক্তপ্রদেশে পরলোক গমন করেন। এই সংবাদে গোসাঁইজী বড়ই মর্মাহত হয়ে পড়েন।

এই বৎসরের মাঘোৎসবে কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে বেদীর কাজ পরিচালনাকালে গোসাঁইজী গায়কদের মাতৃসংগীত গাইতে অনুরোধ করেন। তাঁরা একটির পর একটি মাতৃসংগীত গেয়ে যান। মাতৃসংগীতের অপূর্ব আবেদনে উপাসনা-মন্দিরে এক সম্মোহনী পরিবেশ সৃষ্ট হয়। এক সময় ভাবে বিভোর হয়ে গোস্বামী মহাশয় বলে উঠেন, 'আমি মহাপ্রস্থান করব।' তাঁর এই কথা শুনে সমাজ-মন্দির কান্নায় ভেংগে পড়ে। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় গোসাঁইজীর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্যাকুল হয়ে বলেন, 'ব্রাহ্মধর্মে মহাপ্রস্থান নাই।' সকলেরই দৃষ্টি গোসাঁইজীর প্রতি, সকলের অন্তরই ভারাক্রান্ত, সকলেই গোসাঁইজীকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্য ব্যাকুল।

মাঘোৎসবের পর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শশিভূষণ বসু মহাশয়কে সংগে নিয়ে গোসাঁইজী প্রচারকার্যে গয়া যান। অন্যত্র বাড়ী ভাড়া থাকা সত্ত্বেও গয়ার ব্রাহ্মভক্ত গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় তাঁর আপন গৃহেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেন। গোবিন্দবাবুর বাড়ীর ছাদে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা ও উপাসনা হত। আলোচনা করতে করতে গোসাঁইজী ধ্যানে ডুবে যেতেন। দু-তিন ঘণ্টা পর ধ্যান ভাংগত। একদিন গোস্বামী মহাশয় শশীবাবুকে নিয়ে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে সাধু-দর্শনে যান। শোনা যায়, দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে একটি জলাশয়ে পা ধুয়েছিলেন। জল শুকিয়ে গেলেও স্থানটির নাম তখন থেকেই 'গোড় ধোয়া' চলে আসছে। মহাপ্রভু এখানে পাদস্পর্শ করতেই শ্রীনন্দনন্দনের জন্য ব্যাকুলভাবে কাঁদতে থাকেন। শ্যামসুন্দরের চকিত দর্শন পেয়ে গোসাঁইজীও এখানে এসে 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলে কেঁদে উঠেন। এর পর আর একদিন বুদ্ধগয়ায় গিয়ে নিরঞ্জনা নদীর তীরে বসে ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন গোসাঁইজী। বেলা পড়ে গেল অথচ গোসাঁইজী তখনও বাড়ী ফিরছেন না দেখে শশীবাবু খুব অস্থির হয়ে পড়েন। সন্ধ্যার অনেক পরে ধ্যান ভাংগলে গোসাঁইজী সেদিন বাড়ী ফেরেন। এমনি চলছে দৈনন্দিন জীবন, ধ্যানে মগ্নতা আর সাধু সন্দর্শন। কথাপ্রসংগে গোবিন্দবাবু একদিন গোসাঁইজীকে আকাশগংগা পাহাড়ের রামাৎপন্থী বৃদ্ধ সাধুর কথা বলেন। এই সাধু একজন সিদ্ধ মহাত্মা বলে গোবিন্দবাবু তাঁর খুব প্রশংসা করেন। গোসাঁইজী গোবিন্দবাবুর কথা শোনার পর থেকেই এই সিদ্ধ-মাহাত্মার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। রাত্রি প্রভাত হতেই শশীবাবুকে সংগে নিয়ে তিনি আকাশগংগা পাহাড়ে যান। বাবাজীর শান্ত সৌম্য মূর্তি দর্শন করে গোসাঁইজী খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বাবাজীর পায়ে পড়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে ব্যাকুল হয়ে বলেন, 'আমি নিতান্ত অজ্ঞান, কিছুই জানি নে। আমাকে ধর্মশিক্ষা দিন, আমাকে ভক্তিপথের সন্ধান বলে দিন।' অনেক বুঝিয়ে বাবাজী তাঁকে শান্ত করেন, প্রীতিপূর্ণভাবে গোসাঁইজীকে বলেন, 'স্থির হও, স্থির হও। ধর্মের জন্য এমন ব্যাকুলতা কোথাও তো বড়-একটা দেখি না। তোমার যদি ধর্ম না হয়, তবে কার ধর্ম হবে? তুমি নিশ্চয়ই ধর্মলাভ করবে।' বাবাজীর জন্য কিছু 'সিধা', চাল ডাল প্রভৃতি তাঁরা সংগে করে নিয়েছিলেন। বাবাজীর হাতে সে-সব তুলে দেওয়া হল। প্রশান্ত হাসিতে তাঁদের প্রদত্ত 'সিধা' গ্রহণ করে তাঁদের বিশ্রাম করতে বলে বাবাজী ভোগের আয়োজনে প্রবৃত্ত হলেন। নিকটে ঝর্ণার জলে তাঁরা স্নান করে ক্লান্তি দূর করেন। ভোগ সরিয়ে বাবাজী সকলকে পরম পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ পাইয়ে পরে নিজে প্রসাদ গ্রহণ করেন। রঘুবর বাবাজীর কথা বলতে গিয়ে

পরবর্তীকালে একদিন গোসাঁইজী বলেছিলেন, 'বাবাজীর অদ্ভুত শক্তি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। রাত্রে বড় বড় বাঘ এসে বাবাজীর পায়ের কাছে মাথা হেঁট করে পড়ে থাকত। বাবাজী আটার টিক্কা প্রস্তুত করে রাখতেন। রাত্রিতে বাঘ এলে হাতে করে তিনি তাই বাঘদের খাওয়াতেন। বিষধর সাপগুলি বাবাজীর চারদিকে ঘুরে বেড়াত, বাবাজী নিশ্চল হয়ে নামজপে মগ্ন থাকতেন। কখনও কখনও দিনের বেলা আকাশের নীচে তাকিয়ে পাখীদের বলতেন, "আরে তু ভি রামজীকা জীব হো, ম্যায় ভি উনহিকা দাস; হিয়াঁ আয়কে মেরা কান সাফা কর দে।" বাবাজী এই কথা বলামাত্র পাখীরা উড়ে এসে বাবাজীর ঘাড়ে বসত এবং কান খুঁচিয়ে দিয়ে যেত। এক এক সময় দু-তিন শত লোক বাবাজীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেও বাবাজী আসন হতে না উঠে তাদের লুচি মণ্ডা দিয়ে ভোজন করাতেন। পাহাড়ে জলাভাবে অনেক সময় বিষম ক্লেশ হত, বাবাজী মহাবীরের কাছে তিন দিন ধন্না দিয়ে পড়ে রইলেন। পরে মহাবীরের কৃপা হল। পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর দেখিয়ে মহাবীর বললেন, "একখানা লাঠি দিয়ে এই পাথরের উপর সামান্য আঘাত কর, পাথরের নীচ থেকে ঝরণা বেরিয়ে পড়বে।" বাবাজী তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে একখানা লাঠি নিয়ে যেমনই ঐ প্রস্তরের উপর আঘাত করলেন, অমনই প্রকাণ্ড একটা পাথরের চটান—লক্ষ মণেরও অধিক—দুম করে ভেঙ্গে পড়ে গেল। আর সেই স্থান হতে কল কল রবে জল ছুটল। বাবাজী ঐ ঝরণার নাম যমুনা রেখেছিলেন। এখনও সেই ঝরণা সেই রকমই আছে। কখনও ওখানে জলাভাব হয় না।'

একদিন অপরাহ্নে আকাশগঙ্গার পাশে এক পাহাড়ে শশীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বসে আছেন গোস্বামী মহাশয়। কথায় কথায় সাধু অঘোরনাথের কথা উঠতেই গোসাঁইজী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, 'অঘোরনাথের সঙ্গে কথা হয়েছিল, আমরা দু ভাই মিলে সারা ভারতে ব্রহ্মনাম প্রচার করব। কিন্তু হায়! তা আর হয়ে উঠল না। অঘোর আমায় একাকী ফেলে চলে গেল।' তারপর সন্ধ্যা নেমে এল। গোস্বামী মহাশয় ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়লেন। ধ্যান ভাঙ্গলে গোসাঁইজী বললেন, 'শশি, তুমি আমার পাশে ঘুমিয়ে পড়, আমি সারা রাত জাগা থাকব।' নিজের উত্তরীয় দিয়ে তিনি শশীবাবুর উপাধান করে দেন। সেই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে ব্রহ্মধ্যানে ডুবে নিরুদ্বেগে তিনি রাত্রি যাপন করেন। শশীবাবুর বিনিদ্র রজনী যেন শেষ হয় না। ব্রাহ্মমুহূর্তে শশীবাবুকে নিয়ে ঝর্ণায় গিয়ে স্নান করেন গোসাঁইজী। তারপর আবার ধ্যানে বসেন। এবার শশীবাবুও ধ্যানে বসেন গোসাঁইজীর সঙ্গে। সূর্যোদয়ের পর শশীবাবুর চোখে পড়ে, একটি প্রকাণ্ড সাপ বিজয়কৃষ্ণের গলা জড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাপটি আবার নেমে গেল। গোসাঁইজী নির্বিকার; শঙ্কা, ডর, ভয়, উদ্বেগের সামান্য লেশমাত্র তাঁর কোথাও দেখা গেল না। ভক্তি-যোগাশ্রিত চিত্তের প্রভাবে হিংস্র প্রাণীও হিংসা দ্বেষ ভুলে যায়। মহাভারতের অমৃত অক্ষয় বাণী প্রত্যক্ষ করলেন শশীবাবু, 'যাঁদের ভিতরে হিংসা নাই, তাঁদের কেহই হিংসা করে না। হিংস্র জন্তুসকলও তাঁদের সাধারণ গাছ বা পাথরের মত মনে করে।' এই হিংসা প্রসঙ্গেই বলতে বলতে গোসাঁইজী একদিন বলেছিলেন, 'যেখানে হিংসা নাই, সেখানে সাপে বাঘেও হিংসা করে না।'

রঘুবর বাবাজীর আশ্রমে এক সাধু ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর খুব প্রীতি ও সৌহার্দ হয়। তাঁরই অনুরোধে গোস্বামী মহাশয় গেরুয়া পরতে মনস্থ

করেন এবং এ বিষয়ে একদিন শশীবাবুকে বলেন, 'আমার ইচ্ছা হচ্ছে গেরুয়া পরে প্রচার করি। এতে সঙ্গে বেশী কাপড় রাখার প্রয়োজন হয় না। কাপড়ের বদলে কয়েকখানা গ্রন্থ বরং সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করা যায়।' যেমন কথা তেমনই কাজ। সেদিনই পরিচারককে ডেকে বলেন, 'আমাকে ফকির সাজিয়ে দাও।' তোরঙ্গ খুলে বেশীর ভাগ ধুতি, জামা তিনি বিলিয়ে দেন, আর কয়েকখানা গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে নেন। কোর্ট থেকে ফিরে এসে গোবিন্দবাবু দেখেন সব লালে লাল।

এর কয়েক দিন পরের কথা। সাধন-ভজন করতে একটা স্বতন্ত্র স্থানে একটি সাধন-কুটীরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন গোসাঁইজী। গোসাঁইজীর এই মনের কথা রঘুবর বাবাজী অনুভব করেছিলেন, তাই পর দিন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গেলে রঘুবর বাবাজী নিজে থেকেই গোসাঁইজীকে বলতে থাকেন, 'তোমার যেমন ব্যাকুলতা দেখছি, তাতে তোমার সাধন-কুটীর বিশেষ আবশ্যক; আমি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত আমার ঐ সাধন-কুটীর তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি সেখানে অবস্থান করে সাধন-ভজন কর।'

কয়েক দিন বাদে গোস্বামী মহাশয় শশীবাবুকে বললেন, 'শশি, তুমি কলিকাতা ফিরে যাও। আমি আর ফিরব না।'

গয়াতে গৌরসুন্দরও তাঁর সঙ্গীদের এমনি কথাই বলেছিলেন, 'তোমরা গৃহে ফিরে যাও, আমি আর সংসারে ফিরে যাব না। আমি প্রাণেশ্বরকে দর্শন করতে বৃন্দাবন চললাম।'

গয়ায় প্রবাসকালের কথা লিখতে গিয়ে শশীবাবু লিখেছেন, 'কলিকাতায় তাঁহার পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি যেন তাঁহার কোন মায়া নাই। কলিকাতা পরিত্যাগ অবধি একবারও তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ না করায় মনে হইত তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার কোন চিন্তাই ছিল না। ...গয়াতে কিছুদিন একত্র বাস করিয়া দেখিয়াছি, ধর্মের জন্য তাঁহার অসাধ্য কিছুই ছিল না। এইরূপ লোকের জন্মধারণে প্রকৃতই বসুন্ধরা পুণ্যবতী হয়।' গোসাঁইজীর মানসিকতার বিস্তারিত সংবাদ শশীবাবু কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধুদের জানিয়ে দেন। তাঁর গয়ায় থেকে যাবার অভিপ্রায়ে সকলেই খুব শংকিত হয়ে পড়েন। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী অবশ্য তখন শশীবাবুকে একাই কলিকাতা ফিরে আসার নির্দেশ দেন। এর কয়েক দিন পরেই সকলে পরামর্শ করে গোস্বামী মহাশয়কে কলিকাতায় ফিরিয়ে আনার জন্য অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে গয়ায় পাঠিয়ে দেন।

গয়া থেকে ফিরে এসে ১২৮৯ সালের প্রথম দিকে গোসাঁইজী ব্রাহ্মধর্ম প্রচার-কার্যে উত্তরবঙ্গে যান। নাটোরের পথে হেঁটে চলেছেন গোস্বামী মহাশয় আর নবকুমার বাগচী। বাগচী মহাশয় আগে আগে চলেছেন। এক তেমাথায় পেঁছে বাগচী মহাশয় থমকে দাঁড়ান, তাঁদের গন্তব্য স্থল জয়কালী মন্দিরে যাবার পথ কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন বলে। অথচ একান্ত অচেনা পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও গোসাঁইজী মন্দিরে পেঁছবার সোজা পথটির নিশানা বলে দেন বাগচী মহাশয়কে। গোসাঁইজীর অভ্রান্ত নির্দেশে সহজেই জয়কালী মন্দিরে পেঁছেন তাঁরা। ফেরার পথে নবকুমারবাবু মন্দিরে পেঁছবার সহজ পথটি কি করে জানলেন জিজ্ঞাসা করায় গোসাঁইজী একটু হেসে তন্ময়ভাবেই বললেন, 'কেন? জয়কালী মা যে কুমারী বেশে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন।'

সৈদপুর সভাগৃহে গোসাঁইজী মহানির্বাণতন্ত্র থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে পরব্রহ্মের পূজাই যে আর্যধর্মের মূল কথা তা অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে সকলের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর আবেগময়ী ভাষণে শুষ্ক প্রাণেও আনন্দধারা বয়ে যায়। একদিন সন্ধ্যায় বেদীতে বসে উপাসনাকালে আকলুসা নামে রাজবংশী শ্রেণীর একটি লোক গোসাঁইজীকে হাত-পাখায় বাতাস করছিল। উপাসনা-স্থলের গুরু-গম্ভীর পরিবেশে মৃদঙ্গ করতালির ধ্বনি-ঝংকারে আকলুসা অনেকটা নৃত্যের তালে তালে বাতাস করে যাচ্ছিল গোসাঁইজীকে। উপাসনা শেষে হঠাৎ সে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে থাকে। একমাত্র প্রিয়জন-বিরহে কাতর হয়ে এমন কান্না মানুষে কাঁদে। কি হল আকলুসার, ও অমন করে কাঁদছে কেন? বঙ্কবিহারী কর মহাশয় অনেক করে তাকে শান্ত করেন। শান্ত করলেও কান্না তার থামে না, বার বার বলতে থাকে, 'সোনার বরণ একজন কোথায় গেলেন তিনি, আপনারা আমায় বলুন কোথায় গেলেন তিনি?' সকলেই অবাক, একমাত্র গোসাঁইজী অবাক হন নি, তিনিও কাঁদছেন। প্রায় এমনিধারা আর একবার হয়েছিল উত্তরপাড়া ব্রাহ্মসমাজে। বেদীতে বসে কীর্তন সুরু হতে না হতেই গোসাঁইজী সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেন। স্থির অপলক দৃষ্টি, যেন কারও দর্শন পেয়ে তন্ময় হয়ে পড়েছেন বিজয়কৃষ্ণ। বাধ্য হয়ে নগেনবাবু উপাসনার কাজ চালিয়ে যান। জ্ঞান ফিরে এলে গোসাঁইজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু এসেছিলেন। অনিমেষ নয়নে ওঁদেরই মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম।' তারপর একটু থেমে আবার বললেন, 'যখন আমি বেদীতে বসি, তখন যেন আর কীর্তন না করা হয়। কীর্তনে আমার শরীর অবশ হয়ে আসে।'

সৈদপুর থেকে গোস্বামী মহাশয় তাঁর দাদা ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের তিরোভাবের খোঁজ-খবর নিজে সংগ্রহ করতে রংপুর জেলার রসুলপুর গ্রামে যান। কয়েক বছর পূর্বে এই গ্রামেই শিষ্য দুর্গাচরণ গোপের গৃহে আটত্রিশ বছর বয়সে দেহত্যাগ করে তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। বিজয়কৃষ্ণ খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, অন্তিমকাল আসন্ন বুঝতে পেরে রসুলপুরের কয়েকজন শিষ্যকে তিনি তাঁর শবদেহ দাহ না করে সমাহিত করবার নির্দেশ দেন। কিন্তু গোস্বামী-সন্তানের দেহ দাহ না করে সমাধিস্থ করার পর নিয়মিত ভোগ-পূজাদি না হলে অপরাধ হবে এই মনে করে ভয়ে শিষ্যেরা তাঁর মরদেহ সংকারের জন্য তিস্তা ও মানস নদীর সঙ্গমে নিয়ে যান। মরদেহ সঙ্গমে নিয়ে আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে আসে। শবদেহের কাছে একজন লোক রেখে আর সকলে কাষ্ঠ-সংগ্রহে বেরিয়ে যায়। তারপর তারা কাষ্ঠ-সংগ্রহ করে ফিরে এসে দেখে গুরুদেবের শবদেহ ও পাহারারত লোকটিও নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাহারারত লোকটিকে পাওয়া গেল। সে ভয়ে কাঁপছিল, কাঁপতে-কাঁপতে কেঁদে বলল, 'গুরুদেবের মরদেহে প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে দেখে আমি ভয়ে পালিয়ে এসেছি।' তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর গুরুদেবের মরদেহের কোন সন্ধান তারা পায় নি। অথচ পরের দিনের ঘটনা, চিলমারী-নিবাসী একজন শিষ্য গুরুদেব ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের দর্শন-মানসে রসুলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে আসার পথে স্বয়ং গুরুদেবের সাক্ষাৎ পান। এই শিষ্যকেই তিনি তাঁর মনোগত বাসনা শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার কথা বলেন। এই শিষ্যটিকেই তিনি অনেক উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে রসুলপুরে পাঠিয়ে বলে দেন যে, তাঁর যে টাকা-পয়সা দুর্গাচরণ গোপের নিকট

গচ্ছিত রয়েছে, তা যেন সে মহোৎসবে ব্যয় করে। শিষ্যটি রসুলপুরে পৌঁছে গুরুদেবের কথা সকলকে জানায়। শিষ্য-সম্প্রদায়ে কান্নার রোল পড়ে যায়, না জানি কি অপরাধে গুরুদেব তাদের এই শাস্তি দিলেন; তাদের ছেড়ে চলে গেলেন! গুরুর নির্দেশক্রমে যথারীতি একাদশ দিবসে মহাসমারোহে মহোৎসব হয়।

বিজয়কৃষ্ণ তিস্তাসঙ্গমে যেখানে তাঁর অগ্রজের মরদেহ নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল, সে স্থানটি দেখে আসেন, তারপর আবার সৈদপুর হয়ে দার্জিলিং যান। দার্জিলিংয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, উপাসনা, বক্তৃতা করছেন, আর তারই অবসরে বৌদ্ধলামাদের মঠে মঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এক রাত্রে বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে তিনি অদূরে একটি স্নিগ্ধ জ্যোতির রেখা দেখতে পান। অপূর্ব এই আলোর ছটা লক্ষ্য করে তিনি এগিয়ে যান এবং সবিস্ময়ে দেখতে পান এক ধ্যানস্থ যোগীকে। এই ধ্যানস্থ যোগীর মাথা থেকেই এই দিব্য জ্যোতি ঠিক্‌রে পড়ছে চারদিক আলো করে। ধ্যানস্থ যোগীর সামান্য ব্যবধানে বিজয়কৃষ্ণ প্রণতি জানিয়ে বসে পড়লেন। তারপর অনেকটা সময় কেটে গেল। যোগীবরের ধ্যান ভঙ্গের পর সম্বিৎ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি মিলিয়ে গেল। যোগীবরকে প্রণাম করে বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তে ঐ আলোর উৎস কোথায় তা জিজ্ঞাসা করেন বিজয়কৃষ্ণ। স্মিত হেসে যোগীবর বললেন, 'কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ষটচক্র ভেদ করে সহস্রারে পৌঁছলে এই জ্যোতি বের হয়।' গোসাঁইজীর সরল মনের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার বাসনা বুঝতে পারেন যোগীবর, তাই তিনি আবার স্বল্পকাল মধ্যেই ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে গোসাঁইজীর জ্যোতির উৎস-সন্ধানে সহায়ক হন। বিমুগ্ধ বিজয়কৃষ্ণ। অনেক অনুনয়-বিনয় করে যোগীবরের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করেন বিজয়কৃষ্ণ। যোগীবর দীক্ষাদানে রাজী হলেন না, তবে এ পথে যথার্থ সাহায্য যিনি করতে পারবেন এমন একজন মহাত্মার নাম ঠিকানা তিনি বলে দেন বিজয়কৃষ্ণকে। এই মহাত্মাই যোগীবরের গুরু। নর্মদাতীরে তখন তিনি সাধন-ভজনে নিমগ্ন রয়েছেন। গোসাঁইজীর আর কালবিলম্ব করবার ইচ্ছা নেই। অচিরেই কলিকাতা হয়ে তিনি নর্মদাতীরের এই সাধুমহাত্মার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। পথশ্রমের সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য করে গোসাঁইজী এই সাধু-মহাত্মার কাছে উপস্থিত হয়ে আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন, অন্তরতম অন্তরের আকুতি জানিয়ে সকাতরে করেন আশ্রয়-ভিক্ষা। গোসাঁইজীকে যথোচিত সমাদর জানিয়ে মহাত্মা বললেন, 'ম্যায় তুম্‌হারা গুরু নেহি হুঁ। যো তুম্‌হারা গুরু হ্যায় ওয়ে সময়কি প্রতীক্ষা কর্ রহে হ্যাঁয়। বখত আনে পর দীক্ষা দেয়েঙ্গে। তুম্ ওত ওয়ালে মৎ হও। সময় হোনে পর গুরু মিলেঙ্গে।'

বিফল মনোরথে ভেঙ্গে পড়েন বিজয়কৃষ্ণ। কোথায় গেলে পাবেন তিনি তাঁর গুরুর সন্ধান? নর্মদাতীর থেকে ফেরার পথে বিন্ধ্যাচলে এক সাধুর কথা জানতে পেরে, তিনি সেখানে যাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন। বিন্ধ্যাচলের বিচিত্র বনশোভা: তন্ময় হয়ে বিজয়কৃষ্ণ চলেছেন এই বনপথ ধরে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে। জনমানবশূন্য, কাউকে জিজ্ঞাসা করারও কোন উপায় নেই। দূরে অস্পষ্ট আলোর রেখা অবলম্বন করে বিজয়কৃষ্ণ অগ্রসর হতে থাকেন। অনেকটা পথ অতিক্রম করে সাধুজীর আস্তানায় পৌঁছেন বিজয়কৃষ্ণ। প্রণাম নিবেদন করে তাঁর মনের অবস্থা জানান সাধুজীকে। কথায় বার্তায় অনেক রাত হয়ে যায়। সাধুজীর অনুরোধে গোসাঁইজী তাঁর সঙ্গেই সেই রাত্রি যাপন করেন। পাশেই ডাকাতদের

ঘাঁটি। সাধুর কাছে আসার সময় ডাকাতরা তাঁকে লক্ষ্য করেছিল, ভেবেছিল পুলিশের লোক। তাদের খোঁজ-খবর নেবার জন্যই পুলিশের এই গোপন পদক্ষেপ। এজন্য ডাকাতদলও পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করে ফেলল, কিছুতেই ফিরে যেতে দেওয়া হবে না এই অজ্ঞাতকুলশীলকে। গভীর রাত্রে সাধুর কুটীর চড়াও করতে গিয়ে ডাকাতদল দেখে, বিশালকায় দুইটি বাঘ সাধুর ডেরার সামনে শান্ত্রীর মত বসে আছে। পেছনের দিকেও সেই একই অবস্থা, সেখানেও এক জোড়া বাঘ সাধুর ডেরা আগলে বসে আছে। এর মধ্যে আবার ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। ভোরবেলা বৃষ্টি থামলেই সাধুর কাছে বিদায় নেন গোসাঁইজী। পথে বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরের মঙ্গল-আরতির কাসর-ঘণ্টার ধ্বনি শুনে, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন গোসাঁইজী। ডাকাতদলের সর্দার তখন সেখানে ছিল, গোসাঁইজীকে দেখে তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে সে বলল, 'বাবা, তোমার চার শেরকে দেখে পালাবার মুখে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। বিন্ধ্যামা রেহাই দিলেন না। বাজ পড়ে আমার লোকগুলিও মারা গেল। তোমার সর্বনাশ করতে গিয়েই আমার এই সর্বনাশ হল। তুমি সহজ মানুষ নও। আমাকে ক্ষমা কর বাবা!' অবাক হন ডাকাত-সর্দারের কথা শুনে। সব কথাই জানতে পারেন তিনি। করুণাময় ভগবান তাঁকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। করুণাময় ভগবান তাঁর আশ্রয়প্রার্থীর জন্য সদা সর্বদা সজাগ হয়ে বসে আছেন। আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন বিজয়কৃষ্ণ।

গোস্বামীপ্রভু সদ্‌গুরু অন্বেষণে কত সাধু-ভক্ত-যোগীর দুয়ারে মাথা খুঁড়ছেন, কতই না বিপদ আপদ মাথায় নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অন্তরের জ্বালা তবুও মিটছে না, সদ্‌গুরু তখনও পান নি। এভাবে কিছুদিন ঘুরে-ফিরে আবার কার্ত্তিক মাসে তিনি কলিকাতা ফিরে আসেন।

১২৮৯ সালের এই কার্ত্তিক মাসের কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন গোস্বামী মহাশয়ের ইচ্ছা হয় একটি বার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দর্শন করে আসেন। অপরাহ্ণে তিনি দক্ষিণেশ্বর যান। সন্ধ্যার পূর্বে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সদালাপে রত আছেন, এমন সময় কেশবচন্দ্রের অনুগামী কয়েকজন ব্রাহ্ম এসে রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করে বলেন, 'মহাশয়, জাহাজ এসেছে আপনাকে যেতে হবে, চলুন একটু বেড়িয়ে আসবেন; কেশববাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন।' রামকৃষ্ণদেব বিজয়কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে নৌকা করে উঠলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান স্থাপনের পর বিজয়কৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের আর সাক্ষাৎ হয় নি। এদিকে জাহাজে উঠার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েন। ভক্তেরা ধরাধরি করে তাঁকে জাহাজের কেবিনঘরে নিয়ে আসেন, সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণও আসেন। বিজয়কৃষ্ণকে দেখে কেশবচন্দ্র বেশ একটু অপ্রস্তুত। কেশবচন্দ্র উঠে কেবিনঘরের একটি জানালা খুলে দিলেন। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হলে ভাবের ঘোরেই কথা বলে চলেছেন।

এবার ফেরার পালা। নারকেল সহযোগে মুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সকলের মনই খুশিতে ভরপুর—আনন্দের হাট। এই অবসরে ঠাকুর দেখলেন বিজয়কৃষ্ণ এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব উভয়ের ভাব করিয়ে দেবার আশায় কেশবচন্দ্রকে বললেন, 'ওগো, এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ—যেমন শিব ও রামের যুদ্ধ (হাস্য)। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হোলো, দুজনে ভাবও হোলো। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো

আর রামের বানরগুলো—ওদের ঝগড়া কিচিমিচি আর মেটে না (উচ্চ হাস্য)। আপনার লোক! তা এরূপ হয়ে থাকে। লবকুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আবার জানো, মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। যেন মা'র মঙ্গল, আর মেয়ের মঙ্গল দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটি সমাজ আছে, আবার ওর একটি দরকার (সকলের হাস্য)। তবে এসব চাই। যদি বলো ভগবান নিজে লীলা করেছেন, সেখানে জটীলে-কুটীলের কি দরকার? জটীলে-কুটীলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না (সকলের হাস্য)। জটীলে-কুটীলে না থাকলে রগড় হয় না (উচ্চ হাস্য)।'

১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গোস্বামী মহাশয় আবার গুরু অন্বেষণে বের হয়ে পড়েন। এবার চন্দ্রনাথ পাহাড়ে তিনি দাবানলের মধ্যে পড়েন। দিনের বেলা খাঁ খাঁ রোদ। আচমকা চারদিক আগুনে ছেয়ে যায়, যেন কালাগ্নি চারদিকে সহস্র পায়ে ছুটে চলেছে। স্বাভাবিক বৈরিভাব ভুলে হিংস্র প্রাণীসকল প্রাণের দায়ে ছুটে চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। নিশ্চিত মৃত্যু জেনে গোসাঁইজী হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপান্তে গিয়ে দাঁড়ান, একেবারে নিরুপায়। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি নামের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এইবার জীবনের শেষ, আর গুরুকরণ হল না। তাঁর সমস্ত অন্তর মথিত করে এল আক্ষেপ ও প্রার্থনা, 'দয়াময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।' এমন সময় চকিতে কোথা থেকে এক উলঙ্গ সাধু ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেন। নিশ্চিত শমনের কথা ভেবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন গোসাঁইজী। সম্বিৎ ফিরে এলে দেখেন, পাহাড়ের পাদদেশে অক্ষত দেহে তিনি পড়ে আছেন। পরবর্তীকালে এই নাম-না-জানা মহাপুরুষকে নিত্য স্মরণ করে তিনি কৃতজ্ঞতা জানাতেন—যতদিন দেহে ছিলেন।

এর পর গোসাঁইজী যান হিমালয়ে। তিব্বতে তিনি লামা গুরুদের মঠে মঠে ঘুরে বেড়ান। বরফাবৃত দেশে ঘোরাঘুরি করে ক্ষুৎ-পিপাসা ও ঠান্ডায় তিনি একদিন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে এলে দেখেন, এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী তাঁকে আগুন দিয়ে সেঁকছেন। সেই সন্ন্যাসী সরষের মত ছোট ছোট দানা তাঁর হাতে দিয়ে বলেন, 'বাচ্চা, এ হি খা লেও। ভূখ্ পিয়াস ছুট্ জায়গা।' সেই দানার গুণে দূর হয় তাঁর ক্ষুধা, পিপাসা ও নিদারুণ পথশ্রান্তি। সদ্‌গুরু সন্ধানে গোসাঁইজীর জীবনপণ প্রচেষ্টা এবং সে সময়কার মানসিকতার কথা বলতে গিয়ে পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, '"গুরু নির্দিষ্ট রয়েছেন, সময়ে লাভ হবে" পুনঃ পুনঃ এরূপ কথা মহাত্মাদের মুখে শুনে আমি গুরুর অনুসন্ধানে অস্থির হয়ে পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগলাম। সেই সময় আমি হিমালয়ে উঠে, বহু দুর্গম স্থানে, লামা গুরুদের মঠে মঠে ঘুরতে লাগলাম। কয়েক জন বৌদ্ধ-যোগীর মুখে শুনতে পেলাম, ঝরণার উপরে গভীর অরণ্যের ভিতর একটি গোফার সন্নিকটে, এই পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গে, একজন বাঙ্গালী মহাপুরুষ বহুকাল আছেন। প্রায় অহোরাত্র তিনি সমাধিস্থই থাকেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত শিষ্যেরা নিকটবর্তী গোফা হতে বের হয়ে-এসে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করান। মহাপুরুষের খবর পেয়ে তাঁর দর্শন আকাঙ্ক্ষায় আমি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লাম। হিমালয়ের উপরে নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে অজ্ঞাত পথে মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে চলতে লাগলাম। দুই দিন দুই রাত্রি আমার আহার নিদ্রা একেবারে ছিল না। তৃতীয়

দিনে ক্ষুধা ও পিপাসায় শরীর এত অবসন্ন হল যে, একটি বৃক্ষমূলে আমি সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়লাম। ভগবানের অদ্ভুত দয়া, একজন উলঙ্গ দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাকে এসে সুস্থ করলেন। পরে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ, আমার হাতে দিয়ে বললেন, "বাচ্চা, এ হি দানা খায় লেও, ভূখ্ পিয়াস ছুট্ যায়েগা। পর্বত পর যেৎ না রোজ রহোগে, দো দানা খায় লিও, ভূখ্ পিয়াস কভি নেহি হোগা।" এই বলে তিনি আমাকে কতকগুলি সরষের দানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দিলেন। আমি দুই একটি দানা খেতেই ক্ষুধা পিপাসা ও পথশ্রান্তি একেবারে দূর হয়ে গেল। ঐ বীজ অনেক দিন আমার সঙ্গে ছিল। পাহাড়ে আমি যতকাল ছিলাম, ঐ বীজ দুই একটি প্রয়োজন মত খেতাম।' এই সন্ন্যাসীকে বাঙ্গালী মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, "হা, বঙ্গালী এক বড়া ভারী মহাত্মা পর্বতকা উপর মে রহতে হ্যাঁয়; কভি কভি নীচুমে আয়কে ঝরণামে আস্নান করকে বিজলিকা মাফিক তুরন্ত চলে যাতে। লম্বা লম্বা জটা, পানি ঝর্ ঝর্ গিরতি হ্যায়। এয়সে চলে যাও, মিল যায়ে গা।" এই বলে তিনি ঐ অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করলেন। আমি ঐ পথ ধরে চলতে চলতে মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হলাম। দেখলাম, দুটি শিষ্য নিয়ত তাঁর সেবায় রয়েছেন। মহাপুরুষ অনাবৃত স্থানে প্রস্তরের উপরে একভাবে একাসনে সমাধিস্থ হয়ে আছেন। রাত্রিতে বরফে মহাপুরুষের সর্বাঙ্গ একেবারে ঢেকে যায়। পরদিন সকালে বরফের স্তূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। পরে যেমন বেলা হতে থাকে, বরফ গলে গলে ক্রমে ক্রমে মহাপুরুষের কলেবরও প্রকাশ পেতে থাকে। শিষ্যেরাও এই সময়ে মহাপুরুষের সম্মুখে আগুন জ্বেলে তাপ দিতে আরম্ভ করেন এবং অবসর বুঝে সময় সময় গরম চা তাঁর মুখে ঢেলে দেন। বেলা প্রায় এগারোটার সময় মহাপুরুষের বাহ্যজ্ঞান হয়।...হিমালয়ের উপরে যে সকল বৌদ্ধ যোগী মহাত্মারা আছেন, নিয়তই তাঁদের ধুনিতে চায়ের জল চড়ান থাকে। দশ পনর মিনিট অন্তর অন্তর তাঁরা একটু একটু চা খেয়ে থাকেন। সেই চা আমাদের চায়ের মত নয়। ঐ চায়ের গাছ খুব বড় হয়। সাধুরা সেই পাতা এনে শুকিয়ে রাখেন। পাতাগুলিও খুব বড় বড় হয়।

পালানে দুধভার হলেই পাহাড়ের গাভীরা এক একটা নির্দিষ্ট স্থানে দুধ ছেড়ে যায়। ঐ দুধ বরফময় প্রস্তরে পড়ামাত্রই জমাট হয়ে যায়। সাধুরা ঐ দুধ চিমটা দিয়ে খুঁড়ে নিয়ে আসেন। গরম জলে ফেললেই উৎকৃষ্ট দুধ হয়। চায়েতে তাঁরা মিষ্টি দেন না। প্রয়োজন হলে তাও অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারেন। ইক্ষুরসের মত মিষ্টরসযুক্ত লতাপাতা পাহাড়ে বিস্তর জন্মায়। সাধুরা সে সকলেরও সন্ধান রাখেন।

মহাপুরুষ নিজের সমস্ত পরিচয় দিলেন। অল্প বয়সে উপনয়নের পরই এক সন্ন্যাসীর সঙ্গ পেয়ে তিনি গৃহ ছেড়ে চলে যান। তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে অবশেষে এই বললেন, "বীর্যধারণ ও সত্যরক্ষা এই দুটি ঠিক হলেই ক্রমে যোগজনদুর্লভ "ব্রহ্মপদ" লাভ হয়। বীর্যধারণ ও সত্যরক্ষা না হলে কিছুই হয় না। বীর্যধারণ যেমন শরীর রক্ষা বিষয়ে একপক্ষে সর্বপ্রধান কারণ, সত্যও আত্মরক্ষা বিষয়ে ঠিক তদ্রূপ। অসত্য চিন্তা, অসত্য ব্যবহার যোগসাধন বিষয়ে বিষম অনিষ্টকর। মিথ্যা কথা বলা যেমন মহাপাপ, মিথ্যা কথা কল্পনা করাও ঠিক সেইরূপ। যাঁরা যোগপথে চলবেন, যাবতীয় কার্যেই তাঁদের সত্যের সঙ্গে যোগ থাকা

চাই। নাটক, নভেল প্রভৃতি যাহার মূলই অসত্য বা মিথ্যা তা শুনা বা পড়া যোগশাস্ত্রে নিষেধ। অসত্য চিন্তা মহাপাপ জানবে, ওতে মস্তিষ্ক নষ্ট করে। ভগবানই সত্য। ভগবচ্চিন্তাতে মস্তিষ্কের শক্তি সকল দিকেই এত বৃদ্ধি করে যে তাহা বলা যায় না।"’

হিমালয়ের অপরূপ মহান গম্ভীর পরিবেশে এক ধ্যানস্থ লামা সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁর প্রতিও গোস্বামী মহাশয় বিশেষ আকৃষ্ট হন। সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙলে তাঁর কাছে সাধন প্রার্থনা করেন। তিনিও একই কথা বলেন। গুরু নির্দিষ্ট রয়েছেন। অচিরে তিনিই উপস্থিত হয়ে তাঁকে আত্মসাৎ করবেন।

বিহারের উত্তরাপথের ঢালু ভূমি ধরে গোসাঁইজী মুঙ্গেরে এসে পৌঁছেন। ঐখানে কষ্টহারিণীর ঘাটে দক্ষিণদেশীয় এক মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সময়টি ১২৮৯ সালের পৌষ মাস। এই উদাসী সাধু গয়া যাচ্ছেন শুনে গোসাঁইজীও এক দুর্জ্ঞেয় দুর্জয় শক্তির আকর্ষণে এই সাধুটির সঙ্গে গয়ায় এসে উপনীত হন। এই মহাত্মা রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমে গিয়ে উঠবেন জেনে গোস্বামী মহাশয়ও সেখানেই উঠবেন বলে স্থির করেন। রঘুবরদাস বাবাজীও পরমানন্দে উভয়ের থাকার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে যে সাধন-কুটীরটিতে গোসাঁইজীর সাধন-ভজনের জন্য ব্যবস্থা হয়েছিল, এবারও সেই কুটীরটিই তাঁকে দেওয়া হল। গোসাঁইজী পরমানন্দে এই সাধন-কুটীরেই তাঁর আসন পাতলেন। ব্রহ্মযোনিপাহাড় এক নূতন রূপ নিয়ে এক অপূর্ব মধুরিমায় গোসাঁইজীর সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এই আশ্রম তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। প্রচারে গয়ায় এসে কত দিন তিনি এখানে এসেছেন, কিন্তু এমনটি তো আর কখন হয় নি। মহাবীরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেই তাঁর মনে পড়ে সেই বাগ-আঁচড়ার স্বপ্নের কথা। এই তো সেই পাহাড়, সেই আশ্রম, সেই মন্দির—সেই মহাবীরজী! তাঁর রোমাঞ্চ হয়। আশার আনন্দে তাঁর হৃদয় নেচে ওঠে। মহাবীরকে বার বার প্রণাম করতে করতে বলেন, ‘ভক্তরাজ! তুমি আমার সহায় হও।’ নবানুরাগে সাধন-ভজনে ডুবে যান গোস্বামী মহাশয়।

গুরুলাভ

রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমের মহাবীর মূর্তিকে কেন্দ্র করে গোসাঁইজীর অভীষ্টসিদ্ধির প্রতীক্ষা চলে, দিনের পর দিন ঊষা থেকে গোধূলি পর্যন্ত। এক-একটি দিন ঘুরে আসে, আর ব্যাকুলতা বাড়ে। তাঁর বদ্ধমূল বিশ্বাস, অকাশগঙ্গা পাহাড়েই গুরুলাভ হবে। যিনি অন্তরতম, যাঁর কাছে কিছুই অজানা নেই, তিনিই প্রেরণা যোগান। গোসাঁইজী সাধনায় ডুবে যান। অপরিসীম তিতিক্ষা ও ধৈর্য-সহকারে দিনের পর দিন তিনি প্রতীক্ষা করেছেন; পথ চেয়ে রয়েছেন আশার দীপ জ্বেলে। কতই না কষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে এজন্য। এই ধৈর্য ও দুঃখবরণই তাঁর জীবনকে করেছিল ধন্য।

ধৈর্যধারণ করা প্রসঙ্গে গোসাঁইজী বলেছেন, ‘মানুষের সমস্ত অশান্তিই ধৈর্যের অভাবে। ধৈর্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। চঞ্চলতাই অশান্তির একমাত্র কারণ। মানুষের কোন বিষয়েই চঞ্চল হওয়া ঠিক নয়। মানুষ যখনই যা করবে—স্থিরভাবে বিচার করে করা উচিত। হঠাৎ কোন কাজ করাই সঙ্গত নয়। সকল বিষয়েই খুব ধৈর্য

ধরে কার্য করতে হয়। ধৈর্যই ধর্ম।' ধৈর্য ধরে নিজের কর্তব্য করে গেলে, ঋষিপন্থা অনুসরণ করে চললে,একদিন তাঁর দয়া হবেই হবে।

গয়ার ব্রাহ্মেরা ১২৮৯ সালের মাঘোৎসব উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করেন, 'গোড়ধোয়া' বা পাদোদক তীর্থে। উৎসবে আচার্যের কাজ করার জন্য তাঁরা আকাশগঙ্গা পাহাড় থেকে আমন্ত্রণ করে গোস্বামী মহাশয়কে নিয়ে আসেন। যুগপৎ প্রচার ও গুরু-অন্বেষণে লিপ্ত থেকে গোসাঁইজী আট-ন'মাস ধরে গুরুলাভের জন্য পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে আছেন। উৎসবে উপাসনা শুরু হতে না হতে, দু-চার কথা বলতে না বলতে ভাবাবেশে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। তিনি ব্রাহ্মভক্তদের বলেন, 'আপনাদের মধ্যে কেউ উপাসনা পরিচালনা করুন। আমার শরীর অবশ বোধ হচ্ছে; বাক্যস্ফুরণ হচ্ছে না।' এই কথা বলেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর ঈশ্বরীয় ভাবের ছোঁয়াচ লাগে সমবেত ব্রাহ্মদের মধ্যে। তাঁদের অন্তর সরস হয়ে ওঠে। হরসুন্দরবাবু উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়ে বলেন, 'হে প্রভো, আজ তোমার প্রিয় ভক্তের মুখে তোমার অমৃত কথা শুনব বলে আশা করেছিলাম, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। তথাপি, তোমার প্রিয় ভক্তকে এনে তোমার প্রেমসুধায় আমাদের চক্ষুকে ও কর্ণকে সার্থক করেছ। তোমার প্রেমস্পর্শে এ ভাবেই আমাদের ধন্য কর।' এইদিনই আবার গোস্বামী মহাশয় ফিরে যান আকাশগঙ্গায়।

চৈত্র অবসান। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে গোসাঁইজী সেই স্বপ্ননির্দিষ্ট স্থানে উঠে পায়চারী করেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে তাঁর চারদিকে। বেশ খানিকটা জুড়ে তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূমি, দূরত্ব মহাবীরের মন্দির থেকে দু'শ গজের বেশী নয়। রাখালেরা সেখানে আসে তৃণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। গোসাঁইজী তাদের অনুরোধ করে রেখেছেন, কোন সাধু চোখে পড়লে, তারা যেন তখনই তাঁকে একবার কুটীরে নেমে খবর দিয়ে যায়।

গ্রীষ্মের দৌরাত্ম্য দিন দিন বাড়ে। বেলা বাড়লে কুটীর থেকে বের হওয়া খুব কষ্টদায়ক হয়। একদিন ব্রহ্মচারীজী ও দক্ষিণদেশীয় একজন সাধু এসে তাঁকে বলেন, 'নববর্ষের দিনে খুব ভোরবেলা কয়েকজন সাধু দর্শন করে এলে কেমন হয়? শুনেছি, চারজন সিদ্ধ মহাত্মা বরাবর পাহাড়ে একসঙ্গে আছেন। বাঁকিপুরের পথে, বুদ্ধগয়া অবধিও যেতে হয় না। সাত-আট মাইলের বেশী না। চারটায় বের হলে ভোর ছ'টায় পৌঁছে যাব। আবার দশটার মধ্যে ফিরে আসব।'

রাজী হন গোস্বামী মহাশয়। আবার আশঙ্কাও জাগে, যাঁর অপেক্ষায় এখানে পড়ে আছেন বিজয়কৃষ্ণ, তিনি যদি এসে ফিরে যান? প্রিয়জনের প্রতীক্ষায় যেমন ক্ষণে ক্ষণে ভয়-উৎকণ্ঠা, তেমনি অনির্বচনীয় আনন্দও আছে। প্রতীক্ষা প্রহরকে করে আলোকিত, প্রাণকে করে প্রিয়-মিলনের ভাবনায় অভিষিক্ত।

ভোর হতেই ও'রা বরাবর পাহাড়ের নীচে পৌঁছেন। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করলেই তাঁদের উপর ঢিল পড়তে থাকে। দেখা যায়, এক ভৈরব সর্বাঙ্গে কালি ও মুখে সিঁদুর মেখে উপর থেকে পাথরের টুকরা ছুঁড়ছেন। গোসাঁইজীর পায়ে ঢিল লেগে রক্তক্ষরণ হয়। দক্ষিণদেশীয় সাধুটি ক্ষুব্ধ হয়ে এই অসাধু আচরণের প্রতিবাদ করেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁকে অনেক করে বোঝান, অযথা বাগ্‌বিতণ্ডায় তাঁদের আসার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তিনি ভৈরবের স্তব করতে করতে তাঁর পদপ্রান্তে পৌঁছে প্রণাম করেন। বিনীতভাবে তাঁকে বলেন, 'আমাদিগকে দয়া করুন। আমরা মহাপুরুষ দর্শন করতে এসেছি।' ভৈরবের মুখে তখন হাসি ফোটে।

তিনি বলেন, 'তোমরা হয়ত ভেবেছ আমি খামখেয়ালি, নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এখানে কয়েকজন সিদ্ধ যোগী আছেন; বিষয়াসক্ত লোকেরা এসে তাঁদের সাধন-ভজনের যাতে বিঘ্ন না ঘটায়, এই উদ্দেশ্যেই আমি ভয় দেখিয়ে থাকি। বিষয়ী লোকেদের জ্বালাতনে সম্প্রতি তাঁরা গুহার অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গপথে গিয়ে প্রবেশ করেছেন। এই গুহাগুলি বৌদ্ধ যুগের। ধর্ম-জিজ্ঞাসুদের এখানে আসার বাধা নেই। কে প্রকৃত ধার্মিক তা আমি ঢিল মেরে নির্ণয় করি। বিষয়ীরা আমার মার্-মূর্তি দেখে ভয়ে পালায়; আর যাঁরা তোমাদের মত তাঁরা আমার এই নির্মম অভিনয় উপেক্ষা করে উঠে আসেন। এস, তোমাদের আমি যোগীবরদের দর্শনে নিয়ে যাই; কিন্তু তোমরা পথশ্রান্ত। এখানে ঝর্ণা রয়েছে, আগে হাত-মুখ ধুয়ে এস, তারপর প্রসাদ পেয়ে ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তি কর।' হাত-মুখ ধুয়ে এলে ভৈরব তাঁদের সামনে তিনটি মাথার খুলিতে করে নরমাংস প্রসাদ এনে ধরেন। গোসাঁইজী বিনীতভাবে বলেন, 'আমরা নিরামিশাষী, আমাদের ক্ষমা করবেন।' একটু বিরক্ত হয়েই ভৈরব তখন কিছু ফলমূল এনে দেন। এর পর ভৈরব হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হন। তাঁরাও ধীরে ধীরে ভৈরবের অনুগমন করেন। ভিতরে প্রবেশ করে দেখেন, মুক্ত আকাশের নীচে পর্বতগাত্র-পরিবেষ্টিত একদ্বারী একটি প্রকোষ্ঠের চারদিকে চারজন মহাপুরুষ বসে আছেন। কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে যোগীদের মধ্যে একজন ভৈরবকে বলেন, 'তুমি নিজে অঘোরপন্থী। নরমাংস তোমার আহার। কিন্তু যাদের এ-খাদ্য নয়, তাঁদের কেন তুমি তা দিলে? তুমি কি মনে কর, অঘোরপন্থী না হলে বুঝি কেউ সিদ্ধ হতে পারে না? এ তোমার ভুল ধারণা। পথ শুধু একটি উপায়, সিদ্ধিলাভ স্বতন্ত্র বিষয়। এই যে আমরা এখানে চারজন আছি, আমরাও তো এক পথের পথিক ছিলাম না। আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন আচারী বৈষ্ণব, একজন অঘোরী, একজন কাপালিক, আর একজন নানকপন্থী। প্রকৃতপক্ষে আমাদের পথ ছিল পরস্পরের বিরোধী; কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল এক এবং অভিন্ন। এখন সকলেরই এক পথ, প্রণালী বলতে আর কিছু নেই।'

গোসাঁইজী যোগীদের যা জিজ্ঞাসা করবেন ভেবেছিলেন, তার উত্তর তিনি ভৈরবের প্রতি যোগীর উপদেশ মাধ্যমেই পেয়ে গেলেন। এই চারজন যোগীর মধ্যে একজন ছিলেন গম্ভীরনাথজী। তিনিই ভৈরবকে উপদেশ দিলেন। তাঁদের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের আরও অনেক কথাবার্তা হয়। যোগীরা যে তৃতীয় নেত্রে সব কিছুই দেখতে পান, পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে, বা কোথায় কি ঘটবে, সবই যে তাঁদের জানা বিষয়। এঁরাই সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী। একমাত্র যোগশক্তি দ্বারাই এ সম্ভব। চৈতন্যময় ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনা, এমন কি ক্ষুদ্রতম পরমাণুর প্রত্যেকটি তত্ত্ব পর্যন্ত আপনা থেকে সাধকের কাছে প্রকাশ পায়।

গম্ভীরনাথজী অঘোরপন্থী ছিলেন। গোসাঁইজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, নরমাংস ভোজন করা কি ধর্মের অঙ্গ?' তিনি বলেন, 'না, ধর্ম এক। যত মত তত পথ। যে যে পথ বেছে নেয়, সেই পথের অনুরূপ তার সাধন-ভজন ও আচরণ; একবার জায়গায় গিয়ে পৌঁছলে ভেদবুদ্ধি আর থাকে না। শাস্ত্রে বহু পথের কথা বলা হয়েছে। শাস্ত্রানুমোদিত যে কোন পথ ধরে চললেই সময়ে সিদ্ধি লাভ হয়। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। সরলতা, নির্ভরতা এবং নিষ্ঠাযুক্ত সাধনাই সিদ্ধি-

লাভের অন্যতম সোপান।' এর পর, চার মহাত্মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে গোস্বামী মহাশয় সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে আসেন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে।

১২৯০ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ কেটে যায়। গোসাঁইজী সেই শুভ মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় বসে আছেন। সময় না হলে কিছুই হয় না। গোসাঁইজী নিজেই পরবর্তী জীবনে ভক্তদের উপদেশস্থলে বলেছেন, 'সকলেরই একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। গাছে যে ফুল হয়, ফল হয়, তারও একটা সময় আছে। চাষারা যে চাষ করে, তারও একটা কাল ঠিক আছে। দেখেছ তো চাষারা বীজ বোনবার পূর্বে কত কি করে! সময়মত হাল চাষ করে ক্ষেতে আগাছা, নানা আবর্জনা সব বেছে ফেলে পরে বীজ বোনে। বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন আবার সুন্দর করে নিড়িয়ে দেয়; তবে সে-সব গাছে তেজ হয়, ফসলও খুব সুন্দর হয়। যে সকল চাষা আগে ক্ষেত পরিষ্কার করে না, নানাপ্রকার জঙ্গল আগাছা জন্মে, তাদের ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে। তখন চাষাদের আগাছা তুলতে প্রাণ যায়। আর ও-সব গাছেরও ফসল ভাল হয় না। চাষাদের তো দুর্দশার একশেষ, ফসলের দফাও ইতি। সমস্তই এই প্রকার জানবে। যথাসময়েই চাষারা সব করে নেয়। অসময়ে কিছু করতে গেলে সেরূপ হয় না। খুব সাধন করে যাও, সময়ে ফল পাবে।'

দিন যায়, রাত্রি যায়। এমনি করে কত দিন-রাত্রি কেটে গেল, তবুও বিজয়কৃষ্ণ অটল বিশ্বাস নিয়ে বসে আছেন; তাঁর স্বপ্ন বিফল হতে পারে না। ক্রমশ আরও নিবিড়ভাবে সাধন-ভজনে মগ্ন হয়ে পড়ছেন বিজয়কৃষ্ণ। দিন-রাত্রি কখন যে কিভাবে কেটে যায় তাও বড় একটা খেয়াল রাখতে পারেন না। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসও এমনি ভাবেই কেটে গেল। ভাদ্র মাসে একদিন গোসাঁইজী, ব্রহ্মচারীজী এবং রঘুবরদাস বাবাজী একসঙ্গে বসে সদালাপে মগ্ন আছেন, এমন সময় কয়েকটি রাখাল বালক এসে তাঁদের খবর দিল যে, পাহাড়ের উপর একজন অতিবৃদ্ধ সাধু এসেছেন। গোস্বামী মহাশয় এবং ব্রহ্মচারীজী তখনই রাখাল বালকদের নির্দেশ অনুযায়ী একটি বিশেষ স্থানে অপূর্ব রূপলাবণ্যযুক্ত এক মহাত্মাকে আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। উভয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠতেই সাধুজী তাঁদের সেখান থেকে চলে যাবার ইসারা করেন। যোগীবরের আদেশ কি করে লঙ্ঘন করবেন তাঁরা, তাই বাধ্য হয়ে চলে আসেন। কিন্তু গোসাঁইজীর মন তো আর চলে আসতে চায় না, মন যে নিবন্ধ রয়েছে যোগীবরের সান্নিধ্য কামনায়। পড়ন্ত বেলা। সন্ধ্যার দিকে আর যাওয়া সম্ভব নয়, তাই বাধ্য হয়ে বিজয়কৃষ্ণকে অপেক্ষা করতে হবে পরের দিনের জন্য। সাধু সন্দর্শনে কিছু ফলমূল নিয়ে যেতে হয়, তাই তিনি নেমে এলেন গয়া শহরে। মনের মত কয়েকটি ফল ও কিছুটা সিদ্ধি সংগ্রহ করে ফিরে আসতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁর অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য, কখনও ভীত-শঙ্কিত, কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন বিজয়কৃষ্ণ। এভাবেই রাত্রি অবসান হয়ে এল। সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি, তাড়াতাড়ি ঝর্ণায় স্নান করে এলেন। ব্রহ্মচারীজী অন্যত্র বিশেষ কাজে ব্যাপৃত, আশ্রমের আর সকলে কেউ উঠেছেন, কেউ উঠেন নি। এমনি সময় সংগৃহীত সামান্য ফলমূল নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ একাকী বেরিয়ে পড়লেন যোগীবরের দর্শন-মানসে। যোগীবর পূর্ব দিন যেখানে আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেখানে কাউকে কোথাও দেখতে পেলেন না বিজয়কৃষ্ণ। ভগ্নমনোরথে একেবারে বিমূঢ় অবস্থা বিজয়কৃষ্ণের। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানালেন তিনি যোগীবরের শূন্য আসনস্থলে, তারপর আপনার

অজান্তেই এক সময় যোগীবরের শূন্য আসন থেকে একটু দূরে বসে পড়েছেন; সম্বিত হারিয়ে ফেললেন বিজয়কৃষ্ণ।

কত সময় এভাবে কেটে গেল, তা তিনি জানেন না। সম্বিত ফিরে আসার পথে অনুভব করছেন বিজয়কৃষ্ণ প্রাণমন-জুড়ান অনাবিল স্পর্শসুখ, সুধামাখা সস্নেহ আদর! গোসাঁইজী এ সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, 'জ্ঞান হলে পর দেখি, একটি মহাপুরুষের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। তিনি খুব স্নেহের সহিত আমার গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। আমি অমনি উঠে তাঁর চরণে পড়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কে? কখন এখানে এসেছেন?" তিনি বললেন, "আমি পরমহংস; মানস-সরোবরে থাকি। তোমার এই ক্লেশের অবস্থা দেখে, তোমাকে দীক্ষা দিতে এইমাত্র এখানে এসেছি।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এইমাত্র কি প্রকারে আপনি মানস-সরোবর হতে এলেন ?" পরমহংস বললেন, "যোগীরা তা পারেন। যোগীরা দেহের পঞ্চভূতকে পঞ্চভূতে মিলিয়ে দিয়ে, চৈতন্যমাত্র অবলম্বন করে যথা-ইচ্ছা যেতে পারেন; পরে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সেই পঞ্চভূতকে আকর্ষণ করে আবার স্থূল দেহ ধারণ করেন। যোগীদের এ-সব ক্ষমতা আছে। আমার এই যে স্থূল দেহ দেখছ ইহাও ঐরূপ।" এই প্রকার অনেক কথাবার্তার পর তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষাগ্রহণমাত্রই আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ হল। চৈতন্য হলে পর, চারিদিকে চেয়ে দেখি পরমহংস নেই। আমার ভয়ানক নেশা হয়েছিল। ভাল করে চোখ মেলতে পারলাম না। ঢুলু-ঢুলু অবস্থায় কোন প্রকারে বাবাজীর আশ্রমে নেমে এলাম। গোফার ধারে বেলগাছের নীচে বড় পাথরের চটাংখানার উপরে বসে পড়লাম। এগার দিন এগার রাত্রি একই অবস্থায় কেটে গেল। সে সময় বাবাজী খুব যত্নের সহিত আমার দেহটি রক্ষা করেছিলেন। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসতেন।'[১]

বিরাট এই সৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে স্রষ্টার অপরূপ লীলারহস্য। একমাত্র পরমযোগীরাই এই লীলারহস্যের স্বরূপ-সন্ধান জানেন। এঁরাই ইচ্ছা করলে জানতে পারেন জগৎ-সংসারের সমস্ত কিছু, এঁরাই ইচ্ছামাত্র রূপ পরিগ্রহ করে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সীমা পরিক্রমা করতে পারেন। এমনই আশ্চর্য যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ হলেন এই ব্রহ্মানন্দ পরমহংস। বিজয়কৃষ্ণের সমস্ত কিছুই ব্রহ্মানন্দ পরমহংস জানতেন, জানতেন বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম সাধনার পথে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারব্রতের কথাও। বিজয়কৃষ্ণ প্রথম দিকে একটু অবাকই হয়েছিলেন, যখন তিনি ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের মুখে শুনেছিলেন 'ব্রাহ্মধরম্ ম্যায় জান্তা হুঁ। কলকাত্তামে ব্রাহ্মসমাজ হ্যায়, রাজা রামমোহন মহাত্মা থেঁ। ওহি ব্রাহ্মধরম স্থাপন কিয়া। ওলোগ বেলায়েত গিয়া। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔর কেশব সেনকো ভি মেরা মালুম হ্যায়। দেবেন্দ্রনাথ আদমি সাচ্চা হ্যায়, লেকিন সমঝ্‌নেমে গড়বড় কিয়া। ভক্তি উনকা বড়ীয়া থী।'

গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ পরমহংস এবং তাঁর দীক্ষা সম্পর্কে গোসাঁইজী তাঁর আত্মজীবনীমূলক "আশাবতীর উপাখ্যান" গ্রন্থে লিখেছেন, 'পরদিন প্রাতঃকালে যোগীবর ও আশাবতী স্নান পূজা করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় কয়েকটি রাখাল আসিয়া বলিল যে, উপরের পাহাড়ে একটি মহাত্মা বসিয়া আছেন। ইহা শ্রবণমাত্র আশাবতী কিছু সেবার বস্তু লইয়া সেই মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাত্মার দিব্যকান্তি, দিব্যলাবণ্য; এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতি বাহির হইতেছে।

---

১. শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ ২য় খণ্ড, (৪র্থ মুদ্রণ) পৃ ১০৮/১০৯।

তদ্দর্শনে আশাবতী মুগ্ধা হইলেন; জ্ঞানহারা হইয়া অজ্ঞাতভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা যেরূপ কন্যাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, মহাত্মা আশাবতীকে সেইরূপ গ্রহণ করিলেন। আশাবতী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সেই মহাপুরুষের প্রতি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিলেন। আশাবতীর প্রাণে এক অপূর্ব শক্তি প্রবেশ করিল। মহাপুরুষ আশাবতীকে সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিলেন। আশাবতী এই অযাচিত দয়া লাভ করিয়া ভক্তিভাবে গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। আশাবতী প্রণাম করিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন। উঠিয়া দেখিলেন, মহাপুরুষ প্রস্থান করিয়াছেন। অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিছুতেই পাইলেন না।'

দীক্ষা লাভের পর প্রায় একপক্ষকাল গোসাঁইজীর ক্ষুৎ-পিপাসা, মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি দেহের আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়াগুলি একরকম প্রায় লোপ পেয়েছিল। এই সময় রঘুবরদাস বাবাজী পরম স্নেহে গোসাঁইজীকে দুধে বেলপাতা সিদ্ধ ছেঁকে নিয়ে তাই একটু একটু করে খাওয়াতেন। প্রায় সর্বক্ষণ তিনি গোসাঁইজীর কাছে থেকে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার দিকে নজর রেখে চলেছেন। এই সময়েই একদিন খুব বড় একটা পাহাড়ীয়া সাপ গোসাঁইজীর সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে কিছুক্ষণ থাকার পর আবার যথাস্থানে নেমে যায়। কোন অনিষ্ট করা দূরের কথা, মনে হল যেন, সে অসীম শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে গোসাঁইজীকে প্রণতি জানাল; প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা দিয়ে আদর করে গেল। গোসাঁইজীর মহাভাবে বিহ্বলাবস্থা; জাগতিক সমস্ত কিছু থেকেই নিস্পৃহ হয়ে আছেন তিনি। বাহ্যিক বিহ্বলভাব থাকলেও গোসাঁইজীর অন্তরে চলছিল নিরন্তর নাম-রসের আস্বাদন। সমাধি ভঙ্গের পর উপস্থিত সকলের অনুরোধক্রমে গোসাঁইজী এ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি ইহার কিছুই জানি না। যখন সাধন করিতে বসি, দেখিলাম মা সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী আসিয়াছেন এবং আমাকে বলিতেছেন—"মায়ার অপর পারে যাইতে হইলে পরীক্ষা দিতে হইবে।" আমি বলিলাম—"আমি পরীক্ষার উপযুক্ত নহি, আমায় দয়া কর মা।" মা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার কথাই বলিতে লাগিলেন। আমি কাতর প্রাণে স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলাম। তখন মা প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্রোড়ে করিয়া আকাশপথে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দিব্যলোকে উপস্থিত হইলাম। এই লোকের বৃক্ষ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। আপনারা যে সময়ের কথা বলিতেছেন, তখন আমি ঐ লোকেই ছিলাম।'

বহুবাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে বিজয়কৃষ্ণ নিজেকে ধন্য মনে করলেন। গুরুকৃপা তাঁর আত্মায় অমৃত সিঞ্চন করল। অসীম উদ্যম ও আন্তরিকতা নিয়ে রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমে তিনি সাধনায় নিমগ্ন হলেন। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আহার-নিদ্রা তুচ্ছ করে তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। হঠাৎ গুরুদেব একদিন প্রকাশিত হয়ে বললেন, 'ঘাবড়াও মৎ। ভজন করণা। বখৎমে সব মিল যায়গা।' গোসাঁইজীকে তিনি উৎসাহ দিয়ে আবার সহজেই মিলিয়ে যান।

ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর জন্ম হয়েছিল পাঞ্জাবদেশীয় ব্রাহ্মণ বংশে। প্রথমে তিনি ছিলেন নানকপন্থী; পরে বৈদিক মতে সিদ্ধিলাভ করেন। একেই ঋষি-পন্থা বলা হয়ে থাকে। রামায়ণে আছে ব্রহ্মার মানস থেকে বিচিত্র এক সরোবর উৎপন্ন হয়; ইহাই 'মানস-সরোবর', কৈলাসে এর অবস্থিতি। প্রচণ্ড শীত, সাধারণ লোকের সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র যাঁরা যোগসিদ্ধ এবং হঠযোগে পারদর্শী তাঁদের পক্ষেই সেখানে যাওয়া সম্ভব। ভূগোলে যে মানস-সরোবরের কথা আছে, তার অবস্থান তিব্বতে; সাধুরা একে মানতালাও বলে থাকেন। কৈলাসে অবস্থিত মানস-

সরোবরই হল প্রকৃত মানস-সরোবর। এই মানস-সরোবর পরিক্রমা করতে দুই মাসেরও বেশী সময় লাগে, আর মানতালাও পরিক্রমা করতে লাগে মাত্র কুড়ি দিন। একটি প্রকাণ্ড কচ্ছপ কখনও কখনও মানস-সরোবরে ভেসে ওঠে। তাঁ এত বিরাট যে তখন মনে হয় বুঝি বা কোনো দ্বীপের উদ্ভব হয়েছে। এঁর সারা দেহে অসংখ্য 'প্রণব', যেন স্বর্ণরেখা দিয়ে অঙ্কিত। মায়াধীন জীবের অগম্য স্থানে অবস্থিত বলে ইহা এখনও অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত। এরই তীরে 'মুক্তিনাথ' নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ত্রিগুণাতীত সিদ্ধ মহাত্মারা থাকেন। তাঁরা একজনকে নায়করূপে বরণ করেন, যিনি ভগবানের আদেশে এবং অন্যান্য মহাজনদের সহযোগিতায় সমগ্র বিশ্বের ধর্মের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। এ সব মহাত্মারা কখন বা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে, আবার কখন বা বিশুদ্ধাত্মা ভক্তের দেহে আবিষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদের ধর্মশিক্ষা দিয়ে থাকেন। গোস্বামীপ্রভুর গুরুদেবই এই মহাজনদের নায়ক।

এক মাস যেতে না যেতে আবার একদিন ব্রহ্মানন্দজী প্রকাশিত হয়ে গোসাঁইজীকে আদেশ করেন, 'তোমাকে সন্ন্যাস নিতে হবে। কাশীধামে স্বামী হরিহরানন্দ সরস্বতী নামে একজন সন্ন্যাসী আছেন। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালীন জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যা করেছ সব খুলে বল। সন্ন্যাস নিলে তোমার কল্যাণ হবে।'

গোসাঁইজী কাশী গিয়ে হরিহরানন্দ সরস্বতী মহারাজের কাছে সন্ন্যাস যাচ্ঞা করেন। হরিহরানন্দজীকে তিনি সব কথা খুলে বলেন, দুবার উপবীত ত্যাগ করার কথাও গোপন করলেন না। সব শুনে তিনি গোসাঁইজীকে বলেন, 'তোমাকে সন্ন্যাস দেবার জন্যই আমি কাশী এসেছি। তোমার এখনকার অবস্থা পরমহংসদেরও দুর্লভ। প্রায়শ্চিত্তের কথা ওঠে না। কিন্তু ভগবদ্‌বিধানে তোমাদ্বারা শাস্ত্র ও সদাচার প্রতিষ্ঠিত হবে। তুমি নিজে শাস্ত্রের মর্যাদা না দিলে অপরে কেন দেবে ? অনেক অনাচার করেছ। এখন মস্তক মুণ্ডন করে প্রায়শ্চিত্ত কর। পরে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ কর, তারপরে সন্ন্যাস।' গোসাঁইজীও আপন মস্তক মুণ্ডন করে নিলেন। তিন দিন ব্রহ্মচর্য করার পরই চতুর্থ দিনে শিখাসূত্র বিরজা হোমে আহুতি দেবার পর স্বামী হরিহরানন্দ তাঁকে সন্ন্যাস-আশ্রমে অভিষিক্ত করেন। গোস্বামীপ্রভুর সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম 'স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।' গোসাঁইজী এই মর্যাদাসূচক নাম কখন ব্যবহার করেন নি। ১২৯০ সালের আশ্বিন মাসে তাঁর সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়।

সন্ন্যাস প্রকৃতপক্ষে আত্মার একটি অবস্থা। সন্ন্যাস অন্তর্মুখী প্রস্তুতির সোপান। সন্ন্যাসের মূল কথা নাম, বেশ ও উপাধি নয়; আত্মার ও অন্তরের এ এক উন্নত প্রকাশ। গোস্বামীপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা বহুদিন কারও কাছে প্রকাশ করেন নি। তিনি বলেছেন, 'সন্ন্যাস নিয়ে আমি আর ফিরব না মনে করেছিলাম। রাধাকুণ্ডে গিয়ে সাধন-ভজন করব বলে মনে মনে স্থির করি। কিন্তু পরমহংসজী প্রকাশিত হয়ে আদেশ করেন, যেমন ছিলাম তেমনই গিয়ে সংসারের কাজ করতে হবে; অনেক কাজ বাকী আছে।'

বিজয়কৃষ্ণের মন এতে সাড়া দেয় না, নিত্যধাম বৃন্দাবনে থেকে সাধন-ভজন করার ইচ্ছা তখন তাঁর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, বার বার গুরুকে তিনি অনুনয় করেন তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য। পরমহংসজী তখন বলেন, 'স্থির হো কর্

মেরা ভাষণ শোন্‌হ। তুম্‌হারে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, শাস তুম্‌হারে আশ্রিতজন হ্যাঁয়। তুম উনকে অগর পরিত্যাগ করগে ত অকর্তব্যপরায়ণ হোগে, ঔর কিসিকো প্রকারকা সাধন-ভজন করনে নেহি সেকে। তুম সব লোকনে মিলকর ইস মোকানকো বানায়া হে। তুম চলে আয়, ইস্‌ মোকানকো আর কোই নেহি রাখ সেকতে হ্যাঁয়। তুমনে যব্‌ ইসে হাত মে লিয়া হে, ইয়ে পূরা কর্‌ ঔর ভগবানকো নজরমে দোষী হওগে।'

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মুখে এসব কথা শুনে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হন; কোন প্রত্যুত্তর না করে তিনি গুরুর মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। গুরু তখন আবার বলেন, 'ভগবান তুমহারে দুয়ারা ধর্মসংস্থাপন করায় গে।' গোসাঁইজী বলেন, 'আপনি নিজে কেন তা করেন না?' স্মিত হেসে পরমহংসজী সস্নেহে তাঁর উত্তরে বলেন, 'লোকনে মুঝে কো কেঁও মানে গে? অদ্বৈত বংশমে তুমহারা জন্ম হুয়াহে। তুম্‌হারে সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ঔর ধর্মানুরাগমে লেশমাত্র সংশয় নেহি হে। তুম্‌ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে লেকর এক সাথে হি রহো। ইস্‌মে কুছ্‌ভি বিঘ্ন নেহি হোগা। সংসার ত্যাগ করনা তুম্‌হারা পথ নেহি হে। ব্রাহ্মসমাজ ভি ছোড় মৎ। সময় হোনে পর সমাজ অপনে আগ্‌-পিছে ছোটে গা।'

আশ্চর্য এই মহাপুরুষ ব্রহ্মানন্দ পরমহংস। জগতের কল্যাণই তাঁর একমাত্র বিষয়, একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে ব্রহ্মানন্দ পেলেন একজন পরম নির্ভরশীল আশ্রয় বিজয়কৃষ্ণকে। বিজয়কৃষ্ণ বিধাতার নির্দিষ্ট পুরুষ, পতিতজনের উদ্ধার ও দুঃখহরণ করবার জন্য তিনি জগতে এসেছেন। ঈশ্বরে এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাস, নির্ভরতা ও এমন একান্ত নিবেদিত-প্রাণ বলেই তো ব্রহ্মানন্দ পরমহংস এই মহা উদ্ধারণব্রতে নির্বাচন করেছেন বিজয়কৃষ্ণকে। এই ব্রত উদ্‌যাপন তাঁকে সংসারে থেকেই করতে হবে এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ছিন্ন করার কোন প্রয়োজন নেই। এই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে গোসাঁইজী 'যোগদর্শন' গ্রন্থে লিখেছেন, '...অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় গয়াতীর্থে আকাশগঙ্গা নামক পর্বতে একজন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগধর্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনের এক অপূর্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারি না, কিন্তু এইটুকু না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় যে আমার সেই অভাব মোচন হইয়াছে, এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি; কি যে সম্মুখে দেখিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।'

এ সংসারে এমন কয়জন আছেন, যাঁরা পরিপূর্ণ প্রশান্তি নিয়ে বলতে পারেন তাঁদের সকল 'অভাব মোচন' হয়েছে? যাঁদের অভাব মোচন হয়, কেবল তাঁরাই লীলাময়ের এই অনন্ত লীলার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন; তাঁরাই স্রষ্টার অনন্ত লীলারহস্যের অনির্বচনীয় সুধারস আস্বাদন করে পরমানন্দে ব্রহ্মবিহারে মগ্ন থাকেন। এঁরাই তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, তাঁকে দেখেছেন, তাঁকে জেনেছেন। এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের মুখেই আমরা শুনেছি, 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ'। তিনি পুত্র বিত্ত সব কিছু থেকে প্রিয়, সমস্ত পাওয়ার মধ্যে বড় পাওয়া, তাকে পেলে মানুষের আর কোন চাওয়া থাকে না। তার সকল অভাব মোচন হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই অবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আপন সীমাকে অতিক্রম করে সে ভাবতে পারে না; সংসারের রূপ-রস, মায়া-মমতার বেড়াজাল তাকে আবদ্ধ করে রাখে সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে।

রিপুর তাড়নায় মানুষ গড়তে বসে আপন সসীম সাম্রাজ্য তারই লালিত বাসনা-কামনার মাপকাঠি দিয়ে; আত্মাভিমানে অন্ধ হয়ে সে নিজেই স্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করে বসে। ভক্তি ও বিশ্বাসের পাদভূমি পিচ্ছিল হয়ে পড়ে, নির্ভরতা আর থাকে না। এ রকম অবস্থাতেই আপন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে সে নানা যুক্তি-তর্ক দিয়ে সত্যকে মিথ্যায় রূপান্তরিত করে। সন্দেহ আর অবিশ্বাস ক্রমশ মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তখনই প্রশ্ন নিয়ে বসে; যাঁকে দেখা যায় না, শোনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করতে আর মন সায় দেয় না। এমনি অবস্থায় মনের দ্বন্দ্বও বেড়ে যায়, কেবলই অভাববোধ জাগ্রত হয় জীবনের প্রতিপদে প্রতিক্ষেত্রে। ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের কৃপায় বিজয়কৃষ্ণ সকল অভাব থেকে বিমুক্ত হয়েছেন, তাই তিনি এমন প্রশান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পেরেছেন তাঁর সকল অভাব মোচন হয়েছে।

মানুষের অভাববোধ দূর করবার জন্যই যুগ-যুগান্ত ধরে ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষি-সাধু-সন্ত মহাপুরুষেরা বার বার তাঁদের নিভৃত সাধনার ক্ষেত্র থেকে মানুষের মধ্যে নেমে এসেছেন, তুলে ধরেছেন তাঁদের সাধনার ধারা সর্বসমক্ষে। মোক্ষলাভ তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য সন্দেহ নেই, তাই বলে জগতের কল্যাণের কথা তাঁরা ভুলে থাকেন নি। জীবনের উপলব্ধ সত্য এমনিভাবেই তাঁরা প্রচার করে গেছেন জগজ্জনের মহাউদ্ধারণব্রতে।

মানবের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণই তাঁরা চিন্তা করেছেন। সুস্থ, স্ব-স্থ এবং সুশৃঙ্খল সমাজজীবন না হলে মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ সহজলভ্য হয় না। তাই সর্বপ্রকার সমাজোন্নয়ন কর্মধারায় তাঁরা প্রেরণা ও উৎসাহ দান করে আসছেন। সমাজধর্মের সুবিন্যাস ও উৎকর্ষ সাধন মানবের আত্মোন্নতির পথে একটি সোপান মাত্র; মানবাত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশই মূল বিষয়। মহাপুরুষদের সংস্পর্শে এসে মানুষ এই মূল বিষয়টি অনুধাবন করবার সুযোগ পায়, বুঝতে পারে ঐহিক ভোগ-সুখের অসারতা, বুঝতে পারে ত্যাগের মহিমা। বোধের উদয় হলেই মানুষ মহাবস্তু লাভ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। একমাত্র সনাতন শাস্ত্র অনুশীলন ও মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেই মানুষ এই শাশ্বত সত্য মহাবস্তু লাভ করতে পারে। এমনি করেই বিষয়াসক্ত মানুষের পক্ষে মোক্ষলাভের পথ হয় উন্মুক্ত।

মোক্ষধর্ম আর সমাজধর্মে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মোক্ষধর্মের সারকথা আত্মশুদ্ধি। নিষ্কাম কর্মের ভিতর দিয়ে বিনাশ হয় ধর্মার্থীর কর্তৃত্ববুদ্ধি; সমাজশাসনের ফলে মানুষের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিগুলির মূর্তি লুকিয়ে থাকে। লোকচক্ষুর অন্তরালে সুযোগ পেলেই তার মুখোস খসে পড়ে। সমাজসেবায় যিনি যত কর্মকুশল, তাঁর অভিমান ও কর্তৃত্ববুদ্ধিও তত প্রবল হয়ে ওঠে। ঈশ্বরীয় প্রেরণা-শূন্য সমাজধর্ম চিত্ত বা আত্মাকে শুদ্ধ করতে পারে না।

যথার্থ ধর্মকে যিনি আশ্রয় করেন, তাঁর দৃষ্টি হয় অন্তর্মুখী; পদে পদে তিনি করেন আত্মবিশ্লেষণ। সর্বদাই তাঁর চেষ্টা থাকে আত্মশোধনের দিকে। তাঁর রিপুর মোড় যায় তখন ঘুরে; কাম রূপান্তরিত হয় প্রেমে; ক্রোধ নবরূপ নিয়ে হয় তেজ। লোভ হয় ভগবৎ-গুণগানে আসক্তি; মোহ পদে পদে বুঝিয়ে দেয় মানুষের অসারতা, আর মদ বা অহঙ্কার তখন উপলব্ধি করায় আমাদের শক্তিহীনতার পেছনে পরমাশক্তির খেলা। এ সবই কৃপাসাপেক্ষ।

ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করা আর আস্তিক্যবুদ্ধি লাভ করা, এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। আস্তিক্যবুদ্ধি আসে তাঁরই কৃপায়; সাধন-ভজনের পরিণত অবস্থায়। তখন সর্বভূতে হয় ভগবদ্দর্শন। কোন নিভৃত স্থানেও তখন কোন পাপকার্য করার চিন্তা করা সম্ভব হয় না; সমস্ত রকম অসত্য চিন্তার হয় অবসান। এ সত্য যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁরা যথার্থ ভাগ্যবান। মহামায়ার মায়াজালে মানুষ অহরহ কি জ্বালায় না জ্বলছে! গৃহে প্রিয়জনের জীবনসংশয় পীড়া, তাই তখন উপান্তর না দেখে ভগবানের কাছে মানং করছে তাঁর পূজা দেবে বলে। কিসের পূজা? এ পূজা তারই রিপুর পূজা, তারই কামনা-বাসনার পূজা অথচ আশ্চর্য, একবারও তার মনে উদয় হচ্ছে না তার অভীষ্ট-সিদ্ধির বিনিময়ে তারই কাছে রক্ষিত ভগবানের অফুরন্ত ভাণ্ডারের অকিঞ্চন সামগ্রী—অহেতুকী ভক্তি-সুধা তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করি! মানুষ অভিমানবশত ভুলে যায় যে, সে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করছে মাত্র। ভক্তি যে ভগবানেরই অপার্থিব দান। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু তিনি, কৃপা করে তিনি ভক্তের সাধ পূর্ণ করেন। ভক্তের দান তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন, তা সে যত অকিঞ্চিৎকরই হউক না কেন। বিদুরের সহধর্মিণী-প্রদত্ত কদলীর খোসাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা, ৯।২৬

পাতা ফুল ফল জল যা কিছু আমাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে দেওয়া হয়, সেই ভক্তি-অর্ঘ্য আমি তৃপ্তির সঙ্গে আস্বাদন করি।

তিনি দীনদয়াল, করুণার সাগর। তাঁকে ডাকলেই হল। আত্মবিদ্‌, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, যে যেভাবেই তাঁকে ডাকুন না কেন, তিনি সাড়া দেন। অন্তরে তাঁর জন্য ব্যাকুলতা এলেই হয়। তিনি হৃদয়দর্শী, বাইরের আড়ম্বর অনুষ্ঠান তিনি দেখেন না; প্রেমহীন পূজায় তাঁকে লাভ করা যায় না। তবে তাঁর উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু করলেও তা বিফল হয় না। এমন কি নামাভাসেও তাঁর প্রসাদ লাভ করা যায়।

যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
'হারাম' 'হারাম' কহে নামাভাসে॥

—শ্রীচৈ-চ, ৩।৩।৫২

দস্যু রত্নাকর 'মরা' 'মরা' জপ করেই হলেন মহাকবি বাল্মীকি। মৃত্যুপথযাত্রী অজামিল তাঁর 'নারায়ণ' নামধারী পুত্রকে স্মরণ করেই বৈকুণ্ঠে থাকার অধিকার পেলেন।

ধর্মাচরণের পথে দেখা যায় কলের পুতুলের মত মানুষ সচরাচর বহিরঙ্গ সাধন করে যায়। কীর্তন, পূজা, পাঠ, আবৃত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহির্মুখী সাধনের প্রকাশ। বহির্মুখী সাধনের যে প্রারম্ভিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য তা নয়। স্বাধ্যায়, সংকীর্তন, সাধুসঙ্গ, নামসাধন—এ সকলেরই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তির উন্মেষ। প্রকৃতপক্ষে নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে, ইন্দ্রিয় চেষ্টার নিবৃত্তি অভ্যাস করে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণই সাধনভজনের গূঢ় উদ্দেশ্য। সাধনের এই মূলকথা। কিন্তু পূজা, পাঠ, নামকীর্তন যখন দম্ভ, অভিমান ও প্রতিষ্ঠার পরিপোষক হয়, তখন এসব আচার ধর্মাচরণের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। এই

অবস্থায় ভগবান দূরে সরে যান এবং ধর্ম সম্পর্কে লোকের মনে দেখা দেয় নানা প্রতিক্রিয়া।

ভগবানের প্রতি যখন সাধকের প্রেমভক্তি জন্মে, তখনই তাঁর সাধন-ভজন সার্থক হয়। আবার এই প্রেমভক্তি যখন সম্পূর্ণ নির্হেতু হয়, তখন আনন্দ-বৃন্দাবনের দুয়ার খোলে। একেই বলা হয় মাধুর্যের সাধন। ব্রজগোপিনীরা এই মাধুর্যের সাধনে, ভগবানের সঙ্গে প্রেমভক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। ঐশ্বর্য ও মাধুর্য বিপরীতমুখী, পরস্পরবিরোধী। গোসাঁইজীর চলেছে এই মাধুর্যের সাধন; ঐশ্বর্য তাঁর কাঙ্ক্ষিত নয়।

পরমহংসজীর কাছে সাধন পেয়ে তিন-চার মাস কেটে যায়। সাধনের মাধুর্যময় ভাবের দিব্য প্রকাশ ঘটে গোসাঁইজীর অবয়বে। তাঁর শ্রীদেহে ঘটে দিন দিন এক আশ্চর্য রূপান্তর। অবয়বের অণুপরমাণুর দ্রুত পরিবর্তনে তাঁর কলেবর অভিনব সুদর্শন কান্তি ধারণ করে।

যথাযথ ধ্যানে নামীর রূপ-মাধুরী নেমে আসে সাধকের অন্তরে-বাহিরে। একলব্যের তা প্রকাশ পেয়েছিল। দ্রোণাচার্য যখন কিরাত-তনয় বলে একলব্যকে ধনুর্বিদ্যা শিখাতে অসম্মত হলেন, তখন একলব্য আর কোনও উপায় না দেখে ধনুর্বিদ্যাকুশলী দ্রোণাচার্যের মূর্তি গড়ে গভীর অরণ্যে তাঁর ধ্যানে সমাহিত হন। অচিরে তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় ধনুর্বিদ্যার বিচিত্র কৌশল; যা দ্রোণাচার্যের প্রিয়তম শিষ্য অর্জুনের কাছেও হয়েছিল বিস্ময়ের বিষয়।

প্রাণি-বিজ্ঞানেও এর নজির আছে। কাঁচপোকার (কুমরে পোকা) বংশরক্ষা চিরাচরিত প্রথায় হয় না। দেয়ালে বা দরজার পাশে একটি উপযোগী মাটির ঘর বানিয়ে কাঁচপোকা একটি আরশোলা ধরে জোর করে তার ভিতর ঢুকিয়ে দেয়, তারপরে প্রবেশদ্বারের বাইরে বসে অতন্দ্র দৃষ্টি রাখে যাতে সে না পালাতে পারে। দুদিন যেতে না যেতে নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কবশত আবদ্ধ আরশোলাটি রূপে ও স্বভাবে হুবহু কাঁচপোকা হয়ে যায়।

গোস্বামীপ্রভুর অবয়বে অপরূপ বৈচিত্র্য আর আচরণে অকপট হৃদ্যতা লক্ষ্য করে, তাঁর কথা নিয়েই সর্বদা সশ্রদ্ধচিত্তে আলাপ-আলোচনা করেন আকাশগঙ্গা পাহাড়বাসী সাধুসন্তবৃন্দ। মুগ্ধ হন তাঁরা তাঁর মধ্যে দেবাদিদেবের নবরূপের বিকাশ দেখে। মধুর সন্ধানে মৌমাছির মত কত অজানা অচেনা পথিক আলোর দিশারীর খোঁজে এই দুর্গম পাহাড়ে এসে গোসাঁইজীকে প্রণতি জ্ঞাপন করেন।

রঘুবরদাস বাবাজী উন্নত অবস্থার সাধক। অধ্যাত্মমার্গে এই নবদীক্ষিতের অসামান্য অগ্রগতি স্বচক্ষে দেখে তিনি খুব উল্লসিত। কিন্তু সকলে পঞ্চমুখে গোসাঁইজীর জয়ধ্বনি করছেন দেখে তাঁর মন হয় বিরূপ; ঈর্ষানলে তিনি জ্বলে উঠেন। কতদিন আর মনের কথা গোপন করে রাখবেন? একদিন তিনি গোসাঁইজীকে বলেই ফেললেন, 'আরে এক জঙ্গলমে দু শের নেহি রহ সেকতে হ্যাঁয়। হিঁয়া আর অউর কোই নেহি হ্যায়। তুম্‌হরা যো কুচ হুয়া, হম হি কিয়ে। দেখো হিঁয়া যমুনা হম্ হি লে আয়ে—দোস্‌রা কোই নেহি।'

বাবাজীর মুখে এইরূপ কথা শুনে গোসাঁইজী তাঁকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে বিনীতভাবে বলেন, 'আমি আপনার বালক। আপনিই আমাকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। আপনার আশ্রয়ে এসেই আমার গুরুলাভ হয়েছে। আপনার কৃপায়ই

আমি বেঁচে আছি। আপনার আশ্রম আমার মহাতীর্থ। আমার প্রতি সদয় হউন। আমি সামান্য কীট।' গোসাঁইজীর বিনয়বচন শুনে বাবাজী প্রসন্ন হন। কথাপ্রসঙ্গে পরে একদিন রঘুবরদাসজীর কথা বলতে গিয়ে গোসাঁইজী বলেন, 'আকাশগঙ্গার বাবাজীর বর্তমান অবস্থা দেখলে তাঁর অতীত অবস্থা স্বপ্ন বলে মনে হয়। আকাশের নক্ষত্র যেমন ছুটে পড়ে, একটু অহঙ্কার জন্মালেই মহামহাযোগীরও সেই প্রকার পতন হয়। অহঙ্কারের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায়, সর্বজীবে সেবা। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতারও সেবা করতে হয়। গুয়ের পোকাকেও ঘৃণা করতে নেই। সকলকেই নিজ হতে বড় মনে করতে হয়। প্রাণের সহিত সকলের পায়ে মাথা নোয়ায়ে রাখলেই রক্ষা। মাথা তুললে আর নিস্তার নাই।'

গয়ার ব্রাহ্মভক্তেরা গোসাঁইজীর হাবভাব দেখে বুঝতে পারেন যে গোসাঁইজী দিন দিন বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের প্রতি গোসাঁইজীর অনাসক্ত ও উদাসীন মনোভাব। এসব দেখে তাঁরা যুক্তি করে গোসাঁইজীর সহধর্মিণীকে সব কথা জানিয়ে অনুরোধ করেন, যেন কালবিলম্ব না করে তিনি গয়ায় এসে গোসাঁইজীকে কলিকাতা ফিরিয়ে নিয়ে যান।

১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গোসাঁইজী কলিকাতায় ফিরে আসেন। এবার তাঁর মন-প্রাণ সম্পূর্ণ অন্য রকম। ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নির্দেশেই তিনি ফিরে এসেছেন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের প্রচারনিবাসে। আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে আবার যথারীতি বসবাস করতে থাকেন। দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর বেশ, পরিধানে গৈরিক বসন, অভিনব মূর্তি গোসাঁইজীর। তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধমোহন অমৃতশীতল চাহনি। সন্ন্যাস গ্রহণ করেও তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-শাশুড়ীকে নিয়ে বসবাস করছেন। পাঁকাল মাছ, তাই তো পাঁকে থাকলেও পাঁক গায়ে লাগে না।

তীর্থভ্রমণ ও প্রচার

বিজয়কৃষ্ণই ব্রাহ্মসমাজের অদ্বিতীয় আকর্ষণ। অথচ এমন বেশভূষা যে, সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না। গোসাঁইজীকে তাঁরা সমীহ করেন, শ্রদ্ধা করেন। প্রচারনিবাসেই সপরিবারে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁকে আবার নিজেদের মধ্যে ফিরে পেয়ে তাঁরা আন্তরিক সুখী।

জহুরী জহর চেনে। কলিকাতা পৌঁছার কদিন পরই গোসাঁইজী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চুঁচুড়ায় যান। তাঁকে দেখে দেবেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত। প্রকাশ্যে তিনি বলেন, 'গোসাঁই, তোমাকে যে নূতন মানুষ দেখছি! এই দেবদুর্লভ বস্তু তুমি কোথায় পেলে?' গোসাঁইজী তখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গুরুলাভের কথা তাঁকে খুলে বলেন। মহর্ষি সব শুনে প্রসন্ন হয়ে বলেন, 'যে অমূল্য বস্তু লাভ করেছ তাতে তুমি ধন্য হয়ে যাবে। এই পরম বস্তু কদাপি ছেড় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে তোমার স্থান হবে না। সেখানে তোমার টিকে থাকা দায় হবে। সমাজ ছাড়তে হয় ছাড়বে, তথাপি এই অমূল্য সম্পদের কখনও অমর্যাদা কর না। এই দেবদুর্লভ বস্তু ছেড় না।'

গোস্বামী মহাশয় কেশববাবুরও খোঁজ-খবর করেন। সংবাদ পান, সিমলায় তিনি বহুমূত্র রোগে শয্যাগত; চার-পাঁচ দিনের মধ্যে তাঁর ফেরার কথা। গোসাঁইজীর ইচ্ছা ছিল কেশববাবুর সঙ্গে দেখা করে রামকৃষ্ণদেবের কাছে যাবেন; কিন্তু কেশববাবু কলিকাতায় না থাকায় (১০ অগ্রহায়ণ, ১২৯০) গোসাঁইজী যান রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ-মানসে বরাহনগরে মণি মল্লিকের বাগানে। এখানে সিঁদুরিয়াপটীর ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে রামকৃষ্ণদেব আসবেন কথা আছে। গুরু-লাভের পর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর এই প্রথম সাক্ষাৎ। গোসাঁইজীকে অপরূপ বেশে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপলক দৃষ্টিতে তাঁকে নিরীক্ষণ করে বলেন, 'বিজয়, তুমি কি বাসা পাকড়েছ? দেখ, দুজন সাধু ভ্রমণ করতে করতে এক শহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ করে শহরের বাজার, দোকান, বাড়ী, দেখছিল এমন সময় অপরটির সঙ্গে দেখা। তখন সেই সাধুটি বললে, আমি আগে বাসা পাকড়ে, তল্পিতল্পা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়েছি। এখন শহরে রঙ্ দেখে বেড়াচ্ছি। তাই তোমাকে জিজ্ঞেস কচ্ছি তুমি কি বাসা পাকড়েছ?' কথামৃতকার মহেন্দ্র গুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'দেখ, বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এবার খুলে গেছে।'

গোসাঁইজী তাঁকে দীক্ষালাভের বিবরণ জ্ঞাপন করেন।

যিনি যত উন্নত সাধু, তিনি অন্যান্য সাধুদের প্রতি তত শ্রদ্ধাশীল এবং উভয়ের মধ্যে তখন স্থাপিত হয় গভীর আত্মীয়তার সম্বন্ধ। ভগবান সর্বভূতে রয়েছেন, এই সত্য সাধারণের জানা নেই। নাভির কস্তুরী-গন্ধে হরিণ ছোটাছুটি করে। সে জানে না, তার নাভিই এই সুগন্ধের উৎস। খুব কাছের মানুষকেও মানুষ আপন ভাবতে পারে না। জানার যিনি, তিনি থাকেন অজানার গন্ডীর মধ্যে, দূরের মানুষ আরও দূরে। কিন্তু সাধুসন্তদের এই তত্ত্ব অজানা নেই; তাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য সমদর্শন, সকলের প্রতি মধুর প্রীতি ও প্রেম।

রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতের পরই গড়ে উঠে পরম প্রীতি, অনুরাগ ও আন্তরিকতার সম্পর্ক। তাঁরা সমসাময়িক হলেও রামকৃষ্ণ ছিলেন বয়সে ছয় বছরের বড়। উভয়ের জীবন-কথার মধ্যে প্রকাশ পায় বিচিত্র সৌসাদৃশ্য।

রামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়ায় তীর্থকার্য সমাধার পর স্বপ্ন দেখেন, গদাধর বলছেন, 'আমি তোর ছেলে হয়ে আসছি।' এর পরই তাঁর তৃতীয় পুত্রের জন্ম; পিতা নাম রাখেন 'গদাধর'। শক্তিধরই বটে, বলভদ্রের নবপ্রকাশ! জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই ধাত্রী ধনী কামারণীর হাত থেকে তিনি ঢেঁকিশালের চুলোয় পড়েন ফস্‌কে। ছাইভস্ম লাগে শিশুর সারা গায়। শৈশবে তাঁর পিসির কাঁধে ভর করে এক বিদেহী আত্মা। সব ভয়ে জড়সড়, আর পাঁচ বছরের এই শিশু নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বলে, 'পিসির উপর যিনি ভর করেছেন, তিনি যদি আমার কাঁধে চলে আসেন তাহলে কি মজাটাই না হয়!' সাত বছর বয়সে ভূতিরখালের শ্মশানে তিনি একা একা ঘুরে বেড়ান, দিনদুপুরে যেখানে যেতে অতি বড় সাহসীরও ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়। নয় বছরে তাঁর পৈতে হয়, বায়না ধরেন ধনী কামারণীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষে নেবেন। কার্যত তাই হয়। রানী রাসমনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠ হল গদাধরের সাধনক্ষেত্র। বিদুষী শাস্ত্রপারদর্শিনী যোগেশ্বরী ভৈরবী এসে তন্ত্রসাধনে তাঁকে করেন অনুপ্রাণিত।

গদাধরের দিব্যোন্মাদ ভাব। ভৈরবী মিলিয়ে দেখেন, মহাপ্রভুর মহাভাবের রেশ। গদাধরের মুখে ভৈরবী একদিন শুনেন, তাঁর খোল থেকে দুটি শিশু বেরু হয়ে আবার তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করে। ভৈরবীর তখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়, ওঁরা নিত্যানন্দ রায় আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নিত্যানন্দ ছিলেন বলরামের অবতার। তাই বলরামের 'রাম' আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের 'কৃষ্ণ' মিলিয়ে তিনি গদাধরকে 'রামকৃষ্ণ' নামে ডাকেন। দাস্যভাবের সাধনার সময় মহাবীরের ভাবে ভাবিত হয়ে রামকৃষ্ণের লেজ পর্যন্ত গজিয়ে যায়। আবার মধুর ভাবের সাধনার সময় স্ত্রীদেহের মতো রজঃস্বলা হয়েছিলেন তিনি। বিভিন্ন মতে সাধন করে, প্রতিক্ষেত্রেই পরম বস্তু লাভ করে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে প্রচার করে গেছেন, 'যত মত, তত পথ'। রামকৃষ্ণ লেখাপড়া শেখেন নি, শাস্ত্রপাঠ তিনি করেন নি; কিন্তু ভবতারিণী মার কৃপাপ্রসাদে শাস্ত্রের জটিল বিষয়ও প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বলে গেছেন। কত জ্ঞানীজন তাঁর চরণতলে বসে জ্ঞান লাভ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'সনাতন ধর্ম ও শাস্ত্র যে সত্য ও অভ্রান্ত, তা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব প্রমাণ করেছেন।' বস্তুত জীবনদর্শন নিয়ে তিনি যে সব উক্তি করে গেছেন তার তুলনা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে যেতেন। একদিন তিনি গোসাঁইজীকে বলেন, 'তোমায় দেখলে আমার হৃৎকমল বিকশিত হয়ে উঠে।' একবার রামকৃষ্ণদেবের হাত ভাঙ্গে। যন্ত্রণায় উঃ আঃ করছেন দেখে একজন ব্রাহ্মভক্ত তাঁকে বলেন, 'আপনি জীবন্মুক্ত পুরুষ, সাধারণের মত আপনারও এত দেহের কষ্ট!' পরমহংসদেব তাঁকে বলেন, 'শালা, তোদের সঙ্গে কথা বলে আমি যন্ত্রণা ভুলব? বিজয়কে নিয়ে আয় দিকিনি! তাঁকে দেখলে আমি আপনাকে ভুলে যাই।'

রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে ছিল প্রাণের এক নিবিড় যোগাযোগ। উভয়ের সাক্ষাৎ হলে উভয়েরই ভাবসিন্ধু উথলে উঠত। কলিকাতায় অবস্থিতির সময় গোসাঁইজী নবকুমার বাগচীকে নিয়ে সপ্তাহে তিন-চারদিন যেতেন দক্ষিণেশ্বরে। আবার রামকৃষ্ণদেব কলিকাতায় কোথাও এলে গোসাঁইজীকে আগেই খবর দিতেন সেখানে আসবার জন্য।

কেশব সেনের অসুস্থতার খবর পেয়ে (১২ অগ্রহায়ণ, ১২৯০) রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর থেকে 'কমলকুটীরে' রাজাবাজারের বাড়ীতে কেশবচন্দ্রকে দেখতে আসেন। গোস্বামীপ্রভুকে এবার আর খবর দেওয়া হয়ে উঠে নি। অস্থিচর্মসার কেশবচন্দ্র দেয়াল ধরে এসে রামকৃষ্ণদেবকে অনেকক্ষণ ধরে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে উঠে বসেন। কেশবচন্দ্রের মা ছেলেকে আশীর্বাদ করার প্রার্থনা জানান।

রামকৃষ্ণদেব বলেন, 'ঈশ্বর দুইবার হাসেন—একবার হাসেন, যখন দুই ভাই জমি বখরা করে আর দড়ি মেপে বলে, "এদিকটা আমার—ওদিকটা তোমার।" ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন—"আমার জগৎ, আর ওরা খানিকটা মাটি নিয়ে করছে—এদিকটা আমার—ওদিকটা তোমার!" ঈশ্বর আর একবার হাসেন,—ছেলের সঙ্কটাপন্ন অসুখ। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলছে "ভয় কি মা, আমি ভাল করবো।" বৈদ্য জানে না—ঈশ্বর যদি মারেন কার সাধ্য রক্ষা করে?'

২২ অগ্রহায়ণ, ১২৯০ সালে রাজাবাজারের বাড়ীতেই গোসাঁইজী অন্তিমশয্যায় শায়িত কেশবচন্দ্রকে দেখতে যান। তাঁকে হাতের কাছে পেয়ে নববিধানের কয়েকজন ব্রাহ্ম ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বুকে পেটে করে

আঘাত। গোস্বামীপ্রভু নির্বিকার। দোতলা থেকে সোরগোল শুনে রোগী নিজে গোসাঁইজীকে ডেকে পাঠান তাঁর শয্যাপাশে; ক্ষমা চান তিনি তাঁর হাত ধরে পশুপ্রকৃতি অনুগামীদের অমার্জনীয় অপরাধের জন্য। কেশবচন্দ্র এদের তিরস্কার করে বলেন, 'তোমাদের মুখ দেখতে নেই। তোমরা সমাজের কলঙ্ক। ধর্ম-কর্ম তোমাদের ভস্মে ঘি ঢালার সামিল।' কেশবচন্দ্রের নিষ্প্রভ চেহারা দেখে গোস্বামীপ্রভু মনে মনে গভীর বেদনা বোধ করেন। সমবেদনায় তাঁর মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। কেশবচন্দ্র বলেন, 'গোসাঁই, যা ভেবেছিলাম তা আর হল না। পথহারা হয়ে ঘুরে ঘুরে যখন পথের সন্ধান পেলাম বলে মনে হল তখন ধরল এই রোগে। তুমি নাকি নূতন পথ নিয়েছো?' গোসাঁইজী বললেন, 'নূতন, পুরাতন বুঝি না। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করব বলে ব্রাহ্মসমাজে এসেছিলাম, বাইরের বিষয় নিয়ে গোল করতে আসি নি। এখন ব্রাহ্মসমাজে কত পরিবার, তখন কিছুই ছিল না। ভগবানকে উদ্দেশ্য করে তাঁকে লাভ করতে যে কোন উপায় অবলম্বন করতে হয় করব; মৃত্যুকালে কৃতার্থ হয়ে বলব, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। প্রভো, তুমিই সত্য;—এই বলে মরব, এই আমার আকাঙ্ক্ষা।'

তাঁর কথা শুনে কেশবচন্দ্র বললেন, 'এ বিষয়ে আমার অনেক বলার আছে। যদি সেরে উঠি, তোমাকে ডেকে পাঠাব।' গোস্বামীপ্রভুর কাছে তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করবার অবকাশ আর হয়ে উঠে নি; নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে নিল। ১২৯০ সালের ২৩ পৌষ গোসাঁইজীর সঙ্গে সাক্ষাতের ঠিক এক মাস পরে কেশবচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে গোসাঁইজী মর্মাহত হন। শবানুগমন করবেন বলে তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন; কিন্তু দীর্ঘদিনের সহযোগী সুহৃদের শোকে ১০৪° জ্বরে তিনি শয্যাগত হয়ে পড়েন। বন্ধুবিচ্ছেদে বিছানায় পড়ে গোসাঁইজী ছট্‌ফট্‌ করছেন, আচম্‌কা কানে আসে কেশবচন্দ্রের কণ্ঠস্বর, 'বিজয়! বিজয়, আমার জন্য প্রার্থনা কর। ওরা করল না, তুমি কর।'

সমস্ত প্রাণমন দিয়ে প্রার্থনা জানান বিজয়কৃষ্ণ জীবনের অন্যতম ধর্মবন্ধু, ভাই, আত্মজন কেশবচন্দ্রের বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনায়। কেশবচন্দ্রের জন্য মনটা বড়ই বিষাদময় হয়ে পড়েছিল, তবুও কর্তব্যে অবহেলা হয় নি। আজ তাঁর বার বার মনে হল, কেশববাবু সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা, 'আজ কেশব আমাকে পূজা করেছে, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করে, উহার লোকেরা পাছে টের পায়। তা দরজা বন্ধই থাক্‌বে।'[1] তিনি ভাবলেন, 'কেশববাবু প্রকাশ্যে উঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলে, এতদিনে সকলে উদ্ধার হইয়া যাইত।'[2]

গয়া থেকে ফিরে এসে প্রচারকার্যে গোসাঁইজীর উৎসাহ বরং আরও বেড়ে যায়। কলিকাতায় মাঘোৎসব উদ্‌যাপন করে তিনি নিকটবর্তী নানা জায়গায় উপাসনা ও প্রচারের কাজে ব্যাপৃত থাকেন।

একদিন গোসাঁইজী প্রচার-নিবাসের দোতলায় বসে আছেন, এমন সময় যোগজীবন এসে বললেন, 'বাবা, এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, নাম বললেন জলপাইগুড়ির শ্রীধর ঘোষ।'

১/২ শ্রীমদ্‌ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ৪র্থ পুনর্মুদ্রণ, পৃ ৮৩।

শ্রীধরবাবু পূর্বে গোসাঁইজীর কাছ থেকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা পেয়েছিলেন। বাড়ী ফরিদপুর সদরদি গ্রামে। তিনি ছিলেন সরল, আত্মভোলা, বৈরাগ্যময় প্রকৃতির লোক। জলপাইগুড়িতে তিনি পুলিশের কাজ করতেন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষার সময়ই তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে প্রচারের কাজে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। গোসাঁইজী তখন তাঁকে বারণ করেছিলেন। তারপর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর চাকুরী ছেড়ে দেন এবং গোসাঁইজীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার। ব্রাহ্মপাড়ায় রামকুমার বিদ্যারত্নের সঙ্গে থেকে তিনিও তখন থেকে প্রচারের কাজে লেগে যান।

১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে দুপুরে প্রসাদ পেয়ে গোসাঁইজী প্রচারনিবাসে বসে আছেন এমন সময় ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী প্রকাশিত হয়ে তাঁকে বলেন, 'এস আমার সঙ্গে।' গোসাঁইজী বিনীতভাবে বললেন, 'একটু সময় দিন; আমি প্রস্তুত হয়ে নিই।' পরমহংসজী বললেন, 'মুহূর্তকাল আর অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; তুমি পরে এস। গয়া, কাশী ও বৃন্দাবনে দেখা না হলে নর্মদাতীরে দেখা হবে।' পরদিনই গোসাঁইজী পরমহংসজীর নির্দেশমত বের হয়ে পড়েন। নবকুমার বাগচী ও স্বামী দেবপ্রতিপালক নামে এক সাধু তাঁর সঙ্গ ধরেন। পথে বাঁকিপুরে এক সপ্তাহ কাটিয়ে গয়ায় পৌঁছে তাঁরা রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমে উঠেন। একই ঘরে তাঁদের তিনজনের থাকার ব্যবস্থা হয়। একদিন কপিলধারায় তাঁরা গম্ভীরনাথজীকে দর্শন করতে যান। তিনি তাঁদের একটি বস্তু খেতে দেন। অপূর্ব তার স্বাদ, নাম বললেন, 'বজ্রংকা রোট'। গম্ভীরনাথজীকে গোসাঁইজী অনুরোধ করেন, 'সাধন বিষয়ে আমাদের কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'বাবা, আমি কিছুই জানি না। আমার গোফার ভিতর এসে আমি কি করি ইচ্ছা হলে দেখতে পারেন।' হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে গিয়ে গোসাঁইজী দেখেন, সর্বাঙ্গে তাঁর ভস্মমাখা, মস্তকে জটাজুট, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা, সুদীর্ঘ বাহু, দিব্যকান্তি পুরুষ; জ্যোতি যেন ঠিকরে পড়ছে। আসনের সামনে প্রদীপ ও ধুনি। শান্ত-সমাহিত পরিবেশ। পূর্বাশ্রমের পরিচয়ের কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কি হবে মায়ার সম্পর্ক টেনে এনে?' তাঁর বংশের পরিচয় বা পিতৃদত্ত নাম কিছুই জানা যায় নি। কাশ্মীরে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মেছিলেন তিনি, প্রাচুর্যের মধ্যে হন পালিত। যৌবনে হলেন স্বভাববৈরাগী; গ্রামের শ্মশানে এক সন্ন্যাসীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁর কাছে তিনি দীক্ষা প্রার্থনা করায় তিনি বললেন, 'তোমার নির্ধারিত গুরু গোরখপুরে নাথসম্প্রদায়ের মহান্ত বাবা গোপালনাথ।' তারপরে গোরখনাথ মঠে গিয়ে এই প্রিয়দর্শন যুবক গোপালনাথের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনিও এই নবীন সাধককে আত্মসাৎ করে সন্ন্যাস নাম দেন, গম্ভীরনাথ। তিন বছর মঠে থেকে নাথযোগীদের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান আয়ত্ত করে গুরুদেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নানাস্থানে সাধন-ভজন করে গম্ভীরনাথ গয়ায় ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের সানুদেশে কপিলধারার নির্জন পার্বত্য পরিবেশে আত্মসাধনায় ডুবে যান। নৃপৎনাথ নামে এক তরুণ সাধক তাঁকে দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সেবা-যত্নের ভার নিজে গ্রহণ করেন। তাঁর সাধন-ভজনে যাতে আগন্তুকরা এসে বিঘ্ন না ঘটায় এই উদ্দেশ্যে ভৈরবের ভীতিপ্রদ বেশ ধারণ করে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলছিলেন তিনি।

সেতারশিল্পী হিসাবেও গম্ভীরনাথজী সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় লিখেছেন, 'শ্বাপদসঙ্কুল গয়ার পাহাড়ে নির্জন কপিলধারার শৃঙ্গে

বসে গম্ভীরনাথজী সেতার বাজিয়ে ভজন গাইতেন, আর আকাশগঙ্গার পাহাড় থেকে গোসাঁইজী সঙ্গীদের ফেলে একাকী তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। কিসের আকর্ষণে, কিসের প্রেমে এই নিশীথ-অভিসার? কোন্ প্রেমে এঁরা বাঁধা পড়েছেন? এর যোগসূত্রই বা কোথায়? এই পুণ্য কাহিনী স্মরণ করলেও হৃদয় পবিত্র হয়।'

নবকুমার বাগচী মহাশয় লিখেছেন, 'সুগভীর জ্যোৎস্নারজনীতে সেই সঙ্গীত-লহরী দিগ্‌দিগন্ত উদ্‌ভ্রান্ত করে আমাদের স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত।'

তিন সপ্তাহ আকাশগঙ্গা পাহাড়ে থেকেও পরমহংসজীর দর্শন মেলে না। এই সময় গোসাঁইজী ব্রাহ্মসমাজে গিয়েও উপাসনা করতেন, বক্তৃতা দিতেন। একদিন ভোরে তিনি বললেন, 'গুরুজী যেন দেখা দিয়েও দেখা দেন না।' তাঁর কথা শুনে সঙ্গীদ্বয় আশংকা প্রকাশ করে বলেন, 'তবে কি আমাদের উপস্থিতির জন্য তিনি দেখা দিচ্ছেন না?' 'না না তা নয়, তাঁর ইচ্ছা হলে আপনাদের সাক্ষাতেই দর্শন দেবেন,' বললেন গোসাঁইজী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে। আষাঢ় মাসে (১২৯১) গোসাঁইজী বললেন, 'চলুন, এবার কাশী যাই।' রথযাত্রার সময় তাঁরা গাজীপুর থাকেন, তারপর প্রয়াগ হয়ে কাশী। গাজীপুরেও ব্রাহ্মসমাজের কাজে গোসাঁইজীর খুব উৎসাহ দেখা যায়। কাশীতে শিকরোলের স্টেশন মাস্টার মহেন্দ্র মিত্রের বাসায় তাঁরা উঠেন। মহেন্দ্রবাবুর যত্নের ত্রুটি নেই। প্রচন্ড গরম থাকায় গৃহস্বামী সারারাত টানা-পাখার ব্যবস্থা করেন। বাগচী মহাশয় লিখেছেন, 'তাতে স্বামী দেবপ্রতিপালক ও আমি সুখে নিদ্রা যেতাম। কিন্তু গোসাঁইজী সারারাত আসনে বসে কাটাতেন। যখনই ঘুম ভেঙ্গেছে, দেখি তিনি স্থিরভাবে আসনে বসে আছেন।' একদিন গোসাঁইজী বেণীমাধবের ধ্বজায় তৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করতে গেলেন। তিনি তখন মৌনী ছিলেন; গোসাঁইজীকে দেখেই খুশী হয়ে হাতের তেলোতে দেবনাগরী হরফে লিখলেন, 'ইয়াদ্ হ্যায়?' দেখেই গোসাঁইজী বুঝলেন, তাঁর দীক্ষাপ্রসঙ্গে এই প্রশ্ন। হেসে তিনি উত্তর দেন, 'হাঁ, মহারাজ।'

একদিন অপরাহ্নে দুর্গাবাড়ীর বাগানে গোসাঁইজী স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতীকে দর্শন করতে যান। স্বামীজী তখন ভূগর্ভস্থ আপন নির্জন গুফাঘরে সাধনায় মগ্ন। এই সময়ে দেখা হওয়া সম্ভব নয়, স্বামীজীর জনৈক ভক্ত একথা জানালে, গোসাঁইজী একটি বৃক্ষের নীচে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন। কিছুক্ষণ যেতেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজী তাঁর ভজন-কুটীরের দুয়ার খুলে এসে অত্যন্ত প্রেমভরে বিজয়কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন। ভাস্করানন্দ দীর্ঘকায় তপঃক্লিষ্ট উলঙ্গ-দেহ, সুস্মিত-বদন।

গোসাঁইজীর সঙ্গে তাঁর অনেক কথা হয়। তাঁকে মাঝে মাঝে যেতে বলেন। ভাস্করানন্দ স্বামীর পূর্ব পরিচয়ে জানা যায় যে, তিনি কানপুর জেলার মৈথেলালপুরে নৈষ্ঠিক এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১২৪০ সালে। পূর্বাশ্রমের নাম জ্যোতিরাম মিশ্র, আঠার বছর বয়সে আপন আত্মজ ভূমিষ্ঠ হবার দিনই অজানার টানে, অচিন্ পথে তিনি পাড়ি দেন। কয়েক বছর পরিব্রাজক অবস্থায় কাটিয়ে পূর্ণানন্দ স্বামীর কাছে তিনি সন্ন্যাস নেন। তখন নাম হয় ভাস্করানন্দ সরস্বতী। তিনি কাশীধামে আনন্দবাগে আসন নিয়ে বসেন। তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন ও যোগবিভূতির কথা তখন ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। 'Holyman of Benaras' বলতে তাঁকেই বুঝাত। তাঁকে দর্শন করতে প্রতিদিন অনেক দেশী-বিদেশী ভক্তজন আসতেন। Mark Twain কলিকাতায় এলে সাংবাদিকেরা তাঁকে

ঘিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ‘এ দেশে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কি দেখলেন?’ ‘বারাণসীর পবিত্রাত্মা মহাত্মা’ বলেই তিনি ভাস্করানন্দজীর নগ্ন ফটোগ্রাফটি তুলে ধরেন।

কাশীতেও গোসাঁইজী ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে উপাসনা করেন, বক্তৃতা দেন। বিশ্বনাথকে দর্শন করে তাঁর ভাবসিন্ধু উথ্‌লে উঠত। ভাবাবেগে একদিন এক সন্ন্যাসীকে তিনি আলিঙ্গন করেন। উভয়েই বিশ্বেশ্বরের কুণ্ডের উপর পড়ে যান। পরমহংসজীর দর্শন এখানেও মেলে না, কি আর করেন? শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রার জন্য তিনি প্রস্তুত হন। একটি কমণ্ডলু ও দেবীভাগবত কেনার ইচ্ছা। কমণ্ডলুটি পছন্দ হলে দোকানদার যে মূল্য চায়, তাই মিটিয়ে দিয়ে তিনি তাকে সবিনয়ে বলেন, ‘আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন আমার ভক্তিলাভ হয়।’ বইয়ের দোকানে গিয়ে তিনি দেবীভাগবতের খোঁজ করেন। দোকানী বইয়ের দাম আঠার টাকা চায়। বাড়তি টাকা এমন বিশেষ কিছু সঙ্গে নেই বিজয়কৃষ্ণের, তাই বাধ্য হয়ে তিনি দোকানীকে অনুরোধ করে বলেন, কলিকাতা পৌঁছে তিনি টাকা পাঠাবেন, তখন যেন গ্রন্থখানা তাঁকে পাঠান হয়। দোকানী বিজয়কৃষ্ণের অবস্থা অনুভব করলেন, তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কি ভেবে বললেন, ‘আপনার গ্রন্থটি সংগ্রহ করার একান্ত বাসনা, অথচ এই একখানি গ্রন্থই আমার কাছে আছে। আপনি বরং গ্রন্থটি এখনই নিয়ে যান, টাকা পরে পাঠিয়ে দেবেন।’ কলিকাতা পৌঁছেই টাকা পাঠিয়ে দেবার জন্য তিনি বাগচী মহাশয়কে দোকানের নাম-ঠিকানা লিখে নিতে বলেন। বিজয়কৃষ্ণের সমাধি-মন্দিরে এই গ্রন্থখানি এখনও রক্ষিত আছে।

অযোধ্যা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ হয়ে শ্রীবৃন্দাবন এবার লক্ষ্যস্থল। অযোধ্যার স্টেশন-মাস্টার শান্তিপুরের গোসাঁইবাড়ীর শিষ্য; জাতিতে তন্তুবায়। তিনি সবান্ধব গোসাঁইজীকে তাঁর আবাসে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখে এবং সাধু-মহাত্মাদের দর্শন করে তাঁরা কানপুর যান। সেখানে শান্তিপুরের অধিবাসী সঙ্গীতপারদর্শী পুণ্ডরীকবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধক্রমে তাঁরা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। পুণ্ডরীকবাবুর অবস্থা স্বচ্ছল নয় সত্য, তবে আন্তরিকতার একটুও অভাব নেই। স্ত্রীর রান্না অড়হর ডাল, শাক আর লাফরা ব্যঞ্জন সহযোগে প্রসাদ পেয়ে গোসাঁইজী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন। অপ্রত্যাশিতভাবে গোসাঁইজীকে পেয়েছেন যখন, তখন খুব শীঘ্র ছেড়ে দেবেন না তাঁরা। অন্তরের আবেদন গোসাঁইজীকে স্বীকার করতেই হবে। এখানেও ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ও বক্তৃতার বিরাম নেই, সকাল-সন্ধ্যায় চলে সঙ্গীত-সাধনা। পুণ্ডরীকবাবু ভক্ত মানুষ, তিনি তাঁর স্বরচিত গানগুলি একের পর এক গেয়ে শোনান গোসাঁইজীকে। গায়ক ও শ্রোতা উভয়েই তখন তন্ময় সঙ্গীত-মাধুর্যে, উভয়েরই মুখমণ্ডলেই প্রকাশিত হয়ে উঠে আনন্দের অভিব্যক্তি, পরমানন্দময় পরিতৃপ্তি। কয়েক দিন এখানে থেকে তাঁরা লক্ষ্ণৌ যান এবং সেখানে রামবাবুর বাসায় উঠেন। গোসাঁইজীকে পেয়ে রামবাবুর কি উৎসাহ, উদ্দীপনা; কোথায় কি ভাল জিনিস পাওয়া যায়, তা তিনি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন গোসাঁইজীর জন্য। গ্রীষ্মের দারুণ তাপপ্রবাহ অথচ তার মধ্যেও রামবাবু বাইরে যাচ্ছেন তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য। খুঁজে খুঁজে এই অগ্নিদাহের মধ্যেও তিনি নবাবদের প্রিয় সফেদা, আম, আনার প্রভৃতি যোগাড় করে নিয়ে আসেন। বাধা দিলে মানেন না, বলেন, এমন সুযোগ

জীবনে যদি আর না আসে? লক্ষ্ণৌতেও বক্তৃতা ও উপাসনার ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। কয়েক দিন ব্যস্ততার মধ্যে এখানে কাটিয়ে একদিন তাঁরা সকলে শ্রীবৃন্দাবনের পথে মথুরার গাড়ীতে উঠে পড়েন। পথে এক ব্রজবাসী তাঁদের পেছন নেন। গোসাঁইজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন শ্রীবৃন্দাবনে তিনি তাঁদের জন্য একটি ভাল বাসা ঠিক করে দিতে পারেন কিনা? ব্রজবাসী সাগ্রহে সম্মতি জানান এবং শ্রীবৃন্দাবনে ছিপি গলিতে একটি বাসাও ঠিক করে দেন। মাঝপথ থেকে এ পর্যন্ত ব্রজবাসী একপ্রকার ছায়ার মতই তাঁদের সঙ্গে লেগে আছেন। গোসাঁইজীর ভাল লাগছে না ব্রজবাসীর এমন লেগে থাকা ভাব। দুই টাকা প্রণামী দিয়ে গোসাঁইজী তাঁকে বিনীতভাবে বলেন, 'আর আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে অবশ্যই আমরা আপনার খবর করব; এবার আপনি আসুন।' কিন্তু কিছুতেই তিনি নড়ছেন না দেখে গোসাঁইজী অগত্যা তাঁকে একটু রাগতভাবে ধমক দিয়ে বললেন, 'আপনাকে বার বার বলছি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, তবুও আপনি যাচ্ছেন না। এখানে আবার যদি আসেন, তবে আমরা বাধ্য হয়েই পুলিশে খবর দেব।' এবার ঔষধে কাজ হল। বাঁকিপুরের ব্রজেন দাশ মহাশয় নবকুমারবাবুর হাতে ত্রিশ টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। কলিকাতা থেকে বাগচী মহাশয় যে টাকা নিয়ে এসেছিলেন, তার উপর আর হাত পড়ে নি। যেখানেই গেছেন, সেখানকার লোকেরাই সব ব্যবস্থা করেছেন। এমন কি তাঁদের তিনজনের রেল-টিকিটও তাঁরাই কিনে দিয়েছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে তখন পুরি, কচুড়ির সের পাঁচ ছয় পয়সা। দুধ, রাবড়িও খুব সস্তা। বাজার থেকে এসব খাবার কিনেই ওঁদের দিন চলে। এই বাড়ীটিতে গোসাঁইজীর মন টিকছে না, দুদিন যেতে না যেতেই গোসাঁইজী বললেন, 'আমরা ভূতুড়ে বাড়ীতে রয়েছি, আজই এখান থেকে চলে যেতে হবে।' এই কথা বলে তিনি যমুনায় স্নান করতে বের হন। পথে নেমেই কিশোরী মৈত্র মহাশয়কে দেখতে পেয়ে গোসাঁইজী 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে তাঁর দিকে ছুটে যান। ইনিই সেই মৈত্র মহাশয়, গোসাঁইজীর পরমাত্মীয়, যিনি গোঁড়া ব্রাহ্ম হয়ে আত্মজার অসবর্ণ বিয়ে দিয়েছিলেন। আর আজ তিনি ব্রজবাসী, পরম বৈষ্ণব। গোস্বামী মহাশয়ের গৈরিক বেশ দেখে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। তাঁরা যে বাড়ীতে উঠেছেন তার খোঁজ পেয়ে মৈত্র মহাশয় সবিস্ময়ে বললেন, 'কি দুর্দৈব! এখনই ঐ স্থান পরিত্যাগ কর। ঐ গৃহে কয়েক জন ব্রজবাসী খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়ে এক ভদ্রলোককে মেরে ফেলেছেন। তোমরা এখনই ঐ বাড়ী ছেড়ে নাভাজীর কুঞ্জে আমার ওখানে এসে উঠবে।' যমুনা থেকে ফিরে এসেই তাঁরা নাভাজীর কুঞ্জে উঠে যান।

একদিন গোস্বামীপ্রভু গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কুঞ্জে যাবেন। তিনজনই একত্রে বের হন। বাগচী মহাশয় ও স্বামী দেবপ্রতিপালক কথা বলতে বলতে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। খেয়াল হতেই ফিরে তাঁরা গোসাঁইজীর সন্ধান করেন। বেশ খানিকটা পেছনে ওঁরা দেখেন, নীচের দিকে তাকিয়ে গোসাঁইজী ঢুলতে ঢুলতে তাঁদের দিকে আসছেন। তারপর তাঁদের সামনে এসে গোসাঁইজী আনন্দে তদ্গত হয়ে বললেন, 'নবকুমারবাবু, যে জন্য আমার এখানে আসা, তা আজ সার্থক হয়েছে। গুরুজী কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন। একটি গলির ভিতর ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি যা বলার ও দেখাবার, তা সবই করলেন, আমি বড় শান্তি পেলাম। আপনাদের দর্শন দিতে অনুনয় করেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন, তাতে

আপনাদের অকল্যাণ হবে। এখন দেখা দিলে অবিশ্বাস ও নিষ্ঠাভঙ্গের সম্ভাবনা।'

সন্ধ্যা হতে তখনও অনেক দেরি। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কুঞ্জে গিয়ে পৌঁছেন। শিরোমণি মহাশয় কাছেই কোথায় গিয়েছেন। খবর দিতে লোক ছোটে। কুঞ্জমধ্যে সুললিতকণ্ঠে ভক্তিগদগদচিত্তে পাঠক মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করছিলেন। গোসাঁইজী মুগ্ধ হয়ে পাঠ শুনছেন। শিরোমণি মহাশয় কুঞ্জে ফিরে এসে আসরের বাইরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। গৌরবর্ণ সুপুরুষ মানুষ শিরোমণি মহাশয়। দেখলেই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসে। এদিকে গোসাঁইজীর হুঁশ নেই। গৌরলীলায় তিনি তদ্‌গত হয়ে ডুবে গেছেন। সন্ধ্যায় পাঠ বন্ধ হতেই খোল করতাল বেজে ওঠে। গোসাঁইজী কীর্তনে যোগ দেন। লৌকিক পরিচিতির অবকাশ আর হয়ে ওঠে না। কীর্তনও জমে ওঠে। ভাবাবেশে নাচতে নাচতে সমাধিস্থ হয়ে প্রায় এক ঘণ্টার মত তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন, গোসাঁইজীর অবস্থা দেখে নবকুমারবাবুও তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়েন। পড়ে যাবার উপক্রম হতেই ধরে বসান। বহুক্ষণ পর সমাধি ভাঙ্গতেই একটি লোক গোসাঁইজীর পায়ে জল ঢেলে দেয়, অনেকেই তাঁর পাদোদক পান করেন। দুই মহাজনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কিন্তু কথাবার্তা নেই। ভাব জমাট বেঁধে গেছে। আত্মায় আত্মায় যেখানে আলিঙ্গন, ভাষা সেখানে মৌন, স্তব্ধ। শিরোমণি মহাশয় গোসাঁইজী আর তাঁর সঙ্গীদের উপাদেয় প্রসাদ দিয়ে জলযোগ করান, পরে পাশেই এক বাবাজীর গোফায় ওঁদের নিয়ে যান। এখানে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল, বিষয়—দর্শন ও হঠযোগ। পাঠ বন্ধ করতে বলে গোফার বাবাজী মহাশয় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে গোসাঁইজীর মুখে কিছু শুনতে চান। সমুচিত বিনয় সহকারে গোসাঁইজী বলেন, 'আমি বিশেষ কিছু জানিনে বুঝিনে; শুধু এইটুকু জানি যে, ভগবানের নামেই সব হয়।' এর কিছুক্ষণ পর সকলে ফিরে যান যে যাঁর কুঞ্জে।

গোসাঁইজী ও শিরোমণি মহাশয়ের মধ্যে হয় আন্তরিক হৃদ্যতা। শিরোমণি মহাশয়ের পূর্বাশ্রম ছিল কাটোয়ায়। গোসাঁইজী তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'তিনি দেশে একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। ষড়দর্শনে, স্মৃতি ও পুরাণে তাঁর অগাধ জ্ঞান। একদিন তিনি ভাগবত পাঠ শুনতে যান। আসরে গণ্যমান্য ভক্ত-পণ্ডিত উপস্থিত। ভক্ত ব্রাহ্মণ পাঠক ভাগবত পাঠ শুরু করার পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা পড়ছেন। সর্বত্রই এই নিয়ম। শিরোমণি মহাশয় এই সময়ে পাঠক মহাশয়কে সম্বোধন করে বলেন, 'এ কি শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করছেন? সম্মুখে ভাগবত খোলা রয়েছে। ওদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে আপনি 'গৌর-বন্দনা' আবৃত্তি করছেন কেন? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে বসে সম্মুখে শালগ্রাম রেখে এই অভিনয় কেন? ভাগবতে ও সব কোথায় আছে?'

ভক্ত পাঠক করজোড়ে শিরোমণি মহাশয়কে বলেন, 'প্রভো, ভাগবতই আমি পাঠ করছি। এই সমস্তই ভাগবতে আছে। আমি অসত্য ভাষণ বা অভিনয় করি নাই।'

শিরোমণি মহাশয় তখন আসন হতে উঠে পাঠক মহাশয়ের কাছে গিয়ে বলেন, 'মহাশয়, ভাগবতের কোথায়—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্‌।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

এই শেলাকটি আছে দেখান দেখি?’

পাঠক মহাশয় তখন প্রতি দুই পংক্তির ভিতর ফাঁক দেখিয়ে বলেন, ‘এই খালি জায়গায় দৃষ্টি নিবন্ধ করুন।’

শিরোমণি মহাশয় বিজয়গর্বে বলেন, ‘এ কি রকম কথা? ওখানে আবার লেখা কোথায়?’ ভক্ত পাঠক মহাশয় তবুও বলছেন, ‘আপনি না দেখতে পেলে আমি কি করব বলুন? চোখ মেলে চেয়ে দেখুন, সবটাই দেখতে পাবেন।’ শিরোমণি মহাশয় এবার রেগে গিয়ে বলেন, ‘এত সব ব্রাহ্মণের মধ্যে আপনি কি করে এসব মিথ্যা কথা অনর্গল বলে যাচ্ছেন?’

ব্রাহ্মণ পাঠক তখন তেজের সঙ্গে বলেন, ‘এই ব্রাহ্মণ শ্রোতাদের সম্মুখে আমি শালগ্রাম সাক্ষী করে যথার্থই বলছি, ভাগবতের প্রতি দুই ছত্রের মধ্যে গৌর-বন্দনা লেখা রয়েছে। আপনি সিদ্ধ কোন বৈষ্ণব মহাত্মার নিকট দীক্ষা নিয়ে আসুন, আমি কয়েকটি নিয়ম তখন বলে দেব, সেই মত এক সপ্তাহ কাল চলুন। তারপর অষ্টম দিবসে এখানে আসবেন, তখন ভাগবতের ফাঁকে ফাঁকে যদি গৌরচন্দ্রিকা আপনাকে না দেখাতে পারি, তাহলে আমার জিভ কেটে ফেলব। সকলের সমক্ষে আমি এই শপথ করছি।’

শিরোমণি মহাশয়ও কম যান না। তিনি সেইদিনই সিদ্ধ বৈষ্ণব চৈতন্যদাস বাবাজীর কাছে গিয়ে দীক্ষা প্রার্থনা করেন। দীক্ষা পেয়ে পাঠক মহাশয়ের নির্দেশ মত সাতদিন পর তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, ‘এখন দয়া করে দেখাবেন কি?’ পাঠক মহাশয় ভাগবত খুলে বলেন, ‘আচ্ছা, এবার এখানে দৃষ্টি করুন।’ তখন শিরোমণি মহাশয় সবিস্ময়ে দেখেন ভাগবতের শেলাকের প্রতি দুই পংক্তির মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে গৌর-বন্দনা পরিষ্কার লেখা রয়েছে। পাণ্ডিত্যের অহংকার তাঁর ভেঙ্গে পড়ে; লুটিয়ে মাটিতে পড়ে গড়াতে থাকেন। কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়েন। এইদিনই সব ছেড়েছুড়ে পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন শিরোমণি মহাশয়। বৃন্দাবনে পৌঁছে ভাগবত পাঠ করে যা পেতেন, তাতেই স্বচ্ছন্দে তাঁর চলে যেত। বৈষ্ণব এক মহাত্মার কাছে একদিন তিনি শোনেন, ‘ভক্তিশাস্ত্র যিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পাঠ করেন, তিনি যেখানে বসেন সেই স্থানও অপবিত্র হয়।’ তখন থেকে তাঁর এই আকাশবৃত্তি।

গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধারমণ, রাধাদামোদর, শ্যামসুন্দর বিগ্রহ দর্শন করেন গোসাঁইজী। একদিন পথে একটি ভদ্রঘরের যুবতী রমণী কাতরভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘প্রভো, এখানে কয়েকজন বাবাজী বারবার আমায় শোনাচ্ছেন, ব্রজধাম যুগল-উপাসনার স্থান। এখানে যুগলভাবে না থাকলে রাধারাণীর কৃপা হয় না। এ বিষয়ে আমার কি কর্তব্য আপনি কৃপা করে আদেশ করুন।’ এই কথা শুনে গোসাঁইজী বলেন, ‘মা, সতীত্বই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। প্রাণ দিয়েও তা রক্ষা করবেন। সতীত্বই যদি গেল, তাহলে আর রইল কি? দুষ্ট লোকের কথায় কখনও কান দেবেন না।’ দিনকয়েক পর একদিন একখানি এক্কা গাড়ী করে তাঁরা বৃন্দাবন পরিক্রমায় বের হন। তাঁরা রাধাকুণ্ড ও গোবর্ধন দর্শন করেন। গোবর্ধনে রাত্রে নবকুমারবাবু বলেন, ‘আজ এগার দিন অন্ন মুখে পড়ে নি। তাই ঠিক করেছি খিচুড়ি রাঁধব।’ একটি বেশ বড় মাটির হাঁড়ি জুটে যায়, তাতে পাঁচ-ছ সের চাল

ধরে। রেঁধে গোসাঁইজীর পাশে তিনি রাখেন। তিনটি পাতায় সমান করে পাঁচ সের চাল-ডালের খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়। অপূর্ব স্বাদ; তৃপ্তিতে সঙ্গে তিনজনই প্রসাদ পান। একটুও উদ্বৃত্ত থাকে না। নবকুমারবাবু গোসাঁইজীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনিই জানেন কি করেছেন!'

আর একদিন গভীর নিশীথে ঘুম ভাঙলে পর নবকুমারবাবু দেখেন, ফটকের পাশে গাছের নীচে গোসাঁইজী বসে আছেন। সর্বাঙ্গ তাঁর কাঁপছে, মুখে বেদনা-ব্যঞ্জক ধ্বনি। নবকুমারবাবু কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার জ্বর উঠেছে কি?' এমন সময় 'জয় রাধে শ্রীরাধে' ধ্বনি করতে করতে ফটক দিয়ে পাহারাওয়ালা প্রবেশ করতে করতে বলে, 'রাধারাণী আজ আমাকে এখানে পাঠালেন। এদিকে আমি কখনও আসি নি, কিন্তু আজ এখানে আসার বিচিত্র এক তাগিদ বোধ করলাম।'

গোসাঁইজীও 'জয় রাধারাণী' বলে নীরব হন। 'জয় রাধে শ্রীরাধে' হাঁকতে হাঁকতে পাহারাওয়ালা চলে যায়। সেই ধ্বনি নিস্তব্ধ রজনীতে আকাশ-বাতাস মধুময় করে তোলে।

গোসাঁইজী বলে উঠেন, মধুরং মধুরং পরিপূর্ণানন্দম্। নবকুমারবাবু উপলব্ধি করেন, রাধারাণীর মধুর ভাবে গোসাঁইজী বিভোর হয়ে আছেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই গোসাঁইজী কলিকাতা ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েন।

ফেরার পথে বাঁকিপুরে দু-একদিন থেকে ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে তাঁরা কলিকাতা পেঁছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, 'হঠাৎ এমন করে চলে গেলেন, পূর্বে কেউ জানতেও পারে নি। যেখানেই আপনি গিয়েছেন সেখানেই জয়-জয়কার পড়েছে বলে স্থানীয় ব্রাহ্মেরা জানিয়েছেন।' গোসাঁইজী সংক্ষেপে বলেন, 'কি করব, এতে আমার কোন হাত ছিল না। আমি শুধু গুরুজীর আদেশ পালন করেছি।' উত্তরটি প্রশ্নকর্তাদের মনঃপূত হয় না। অথচ এর উপর আর কথাও চলে না। এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষটির মৃদু সমালোচনাই বা কে করে!

কলিকাতা ফিরে এসে একদিন গোসাঁইজী দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করেন। গোসাঁইজীকে পেয়ে তাঁর কী আদর-আপ্যায়ন! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কি প্রশ্ন করেন, 'এবার কেমন সব সাধু দেখলে? কি রকম ভাব-বিনিময় হল' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে গোসাঁইজী বলেন, 'কোথাও আট আনা, কোথাও দশ আনা আর কোথাও বা বার আনা। আপনার এখানেই ষোল আনা।' গোসাঁইজীর কথায় রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হয়ে পড়েন।

ভগবদ্-দর্শন লাভ

১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের আমন্ত্রণ আসে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে, গোসাঁইজী যেন উৎসবে সপরিবারে উপস্থিত থেকে আচার্যের কাজ করেন। ধুমধামের মধ্যে উৎসব হয়। সকাল-সন্ধ্যায় কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের বাউল গানে গোসাঁইজীর মহাভাবের অভ্যুদয়ে আনন্দের হাট বসে। সমাজের

উৎসবের শেষের দিন নগর-সঙ্কীর্তন বের হয়। এতে সারা শহর মেতে ওঠে। পথিকেরা পথের ধূলি সর্বাঙ্গে মেখে নগর প্রদক্ষিণ করে। সকলের মধ্যে ভাবের ছড়াছড়ি। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! বাজারের দোকানদারেরা একের পর আর বাতাসা, নকুলদানা, সন্দেশ লুট দিতে থাকেন। উৎসবের পর আরও কয়েক দিন এখানে সৎপ্রসঙ্গ ও কীর্তনানন্দে কাটিয়ে গোসাঁইজী নৌকায় সারাঘাট এসে সপরিবারে কলিকাতার গাড়ী ধরেন।

এদিকে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ থেকে আচার্যের পদ গ্রহণ করে ওখানে বসবাসের জন্য গোস্বামীপ্রভুর কাছে আসে সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধানেরা গোসাঁইজীর যোগসাধন সুনজরে দেখেন না। ব্রাহ্মসমাজে যে তাঁর সমকক্ষ ধার্মিক আর একজনও নেই, তা সমাজের কারও অজানা নয়। কিন্তু গোসাঁইজীর মতিগতি বুঝা ভার। এর উপর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে এত মাখামাখিও অনেকের পছন্দ নয়। কেশব সেন পর্যন্ত পরমহংসদেবের প্রভাবে পড়ে নিজের সত্তাটুকু হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাঁর চিন্তাধরার মধ্যে এসেছিল বিরাট এক পরিবর্তন। কোথায় ছিলেন তিনি নিরাকার ব্রহ্মবাদী, আর মৃত্যুর পূর্বে হলেন সাকার সাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। গোসাঁইজীর এত দক্ষিণেশ্বরে যাবার কি প্রয়োজন? কিন্তু কে তাঁকে বারণ করবে? আর তিনিই বা শুনবেন কেন? সুযোগ এসেছে, যদি ঢাকায় আচার্যের কার্যভার গ্রহণ করতে তাঁকে সম্মত করান যায়, তাহলে ওখানে গিয়ে এমনি ডুবে যাবেন যে, তাতে রামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবমুক্ত আপনিই হয়ে পড়বেন। ব্রাহ্মরা চান না গোসাঁইজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গ করেন। কেউ কেউ এ নিয়ে কটাক্ষও করেন।

৯ আশ্বিন (১২৯১) গোসাঁইজীকে রামকৃষ্ণদেব হেসে বলেন, 'তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো বলে তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে? যে ভগবানের ভক্ত, তাঁর কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের 'নেহাই'। হাতুড়ীর ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার। অসৎলোকে তোমাকে কত কি বলবে, নিন্দা করবে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য করবে। দুষ্ট লোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বর-চিন্তা হয় না? দেখ না, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করতেন। চারদিকে বাঘ-ভাল্লুক, নানা হিংস্র জন্তু। অসৎলোকের বাঘ-ভাল্লুকের স্বভাব,—তেড়ে এসে অনিষ্ট করবে।'[১]

গোসাঁইজী ঢাকায় আচার্যের কার্যভার গ্রহণ করতে সম্মত হন। জমিদার প্রতাপচন্দ্র দাশ তাঁর পিতার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের পাশে 'রামচন্দ্র ব্রাহ্মপ্রচারক নিবাস' নির্মাণ করে ওখানে গোসাঁইজীর পরিবারের অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। গোসাঁইজীর উপস্থিতিতে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে এক অভূতপূর্ব প্রাণের সাড়া পড়ে। ধর্মই জীবনের পরম আশ্রয়, তাঁর কথাবার্তায় ও চালচলনে এই মহাসত্য উপলব্ধি করে ব্রাহ্মসমাজের উপাসক ও সভ্যগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়। 'প্রকৃত উপাসনা', 'ব্রাহ্মধর্ম কি', 'জীবনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য' নিয়ে তাঁর ভাষণ শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হন। 'ব্রাহ্মধর্ম কি' এই বক্তৃতায় ধর্মের অন্তরঙ্গ রূপটি তিনি সাধারণের কাছে তুলে ধরেন। ব্রহ্ম অসীম ও অনন্ত। যা সত্য তাই ধর্ম এবং যা ধর্ম তাই ব্রাহ্মধর্ম।

---

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃ. ১২৬

সেখানে সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামির নামগন্ধ নাই।

'ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন' পুস্তিকাতে তিনি তখন লেখেন, 'যে ধর্মে কোন মনুষ্যের মত, কল্পনা বা প্রভুত্ব নাই, যে ধর্ম কোন দেশ বা জাতির নামে পরিচিত নহে, যে ধর্ম কোন পুস্তকে বা প্রণালীতে আবদ্ধ নহে, যে ধর্ম কেবল একমাত্র ঈশ্বরের পূজাই মনুষ্যজাতির মুক্তির একমাত্র হেতু বলিয়া উপদেশ দেয়, যে ধর্ম কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার ভাবে বদ্ধ নহে, যে ধর্ম দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম। একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ। ঈশ্বর হইতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচ্ছিন্ন হইলেই ব্রাহ্মধর্মের মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মধর্ম কাহাকেও ঘৃণা করেন না। সূর্য, চন্দ্র, যেমন সাধারণের মঙ্গলের জন্য, ব্রাহ্মধর্ম সেইরূপ সাধারণের মঙ্গলের জন্য। ব্রাহ্মধর্ম সম্পূর্ণ পবিত্র! কোন পাপ এ ধর্মে স্থান পাইবে না।'

'জ্ঞানী হইয়া যদি বিশুদ্ধ, বিশ্বাসী, ধার্মিক না হও, তবে তোমার অপেক্ষা একজন মূর্খ কৃষকও অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। অধার্মিক জ্ঞানীতে আর ব্যাঘ্র-ভল্লুকে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। জ্ঞান-সাপেক্ষ বিশ্বাস ধর্মরাজ্যে যাইবার প্রধান অবলম্বন। সাধন এবং ব্রহ্মকৃপা-সাপেক্ষ বিশ্বাস ধর্মরাজ্যের প্রকৃত দ্বার। সে দ্বারে গমন না করিলে, নিউটনের ন্যায় সুপণ্ডিত মনুষ্যও সহস্র বৎসর চেষ্টা করিয়া ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না।'

'ভক্তি ব্রাহ্মধর্মের জীবন। ভক্তি না থাকিলে তাহাকে ধর্ম বলিয়াই গণ্য করা যায় না। অন্ধ ভক্তিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে প্রকৃত ভক্তিও ব্রাহ্মদিগের ভূষণ হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রাহ্মগণ সর্বদা বিবেকের আদেশ অনুসারে কার্য করিবেন। যাহা সত্য জানিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে।...বাহিরের পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিতে যেমন যত্ন করিবে, আন্তরিক পৌত্তলিকা ত্যাগ করিতে তেমনই যত্ন করিবে। রিপুগণ, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পৌত্তলিকতার পূজা করিলে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা হয় না। প্রতিদিন ভক্তিভাবে ব্রহ্মপূজা করিয়া জীবন সার্থক করিতে হইবে। কিন্তু সেই পূজা যেন কেবল প্রণালীগত না হয়। উপাসনা কালে যতক্ষণ ঈশ্বরের আবির্ভাব হৃদয়ঙ্গম না করিবে ততক্ষণ উপাসনা হইল না বলিয়া বিশ্বাস করিবে।'

আশাবতীর উপাখ্যানে আছে—

যোগীঃ ভগবান সচ্চিদানন্দ। তাঁহার সীমা নাই, তিনি অনন্ত। তিনি সর্বব্যাপী নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। আমাদের যেমন শরীর আছে, তাঁহার সেরূপ শরীর থাকা কখনই সম্ভব নয়।

আশাবতীঃ তবে লোকে তাঁহার মূর্তি গড়িয়া পূজা করে কেন?

যোগীঃ অজ্ঞান লোকদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য শাস্ত্রকাররা ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। দেখ, কুম্ভকারের গৃহে যখন প্রতিমা থাকে, লোকে তাহার পূজা করে না। সেই প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তবে তাহার পূজা করে। সুতরাং ঐ প্রতিমা দেবতা নহে। সেই প্রতিমায় যে প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করা হয়—সেই প্রাণই দেবতা। প্রাণ নিরাকার বই সাকার হইতে পারে না।

ঢাকায় অবস্থানকালীন সমাজের কাজকর্মে বিজয়কৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে এই সময়ে 'সমালোচক' পত্রে মন্তব্য বের হয়—

'পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকা নগরীতে আগমন অবধি অত্রত্য ব্রাহ্মগণের উৎসাহ, স্ফূর্তি ও নূতন জীবন লাভ হইল। পূর্বে মন্দিরের আসনগুলি শূন্যপ্রায় থাকিত। বিজয়বাবুর ধর্মানুরাগ, সরল ব্যবহার ও সৎ উপদেশে এত লোক আকৃষ্ট হইতে লাগিল যে, ব্রহ্মমন্দিরে আর লোকের স্থান হইত না। পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজ বিজয়বাবুর নিকট বিশেষ ঋণী এবং অনেক দিন হইতে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত।...এখানে সর্বদা বিজয়বাবুর ন্যায় একজন সচ্চরিত্র ও বিশুদ্ধমতাবলম্বী আচার্য থাকেন—ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।'

ঢাকায় আচার্য থাকাকালীন গোসাঁইজী প্রায়ই কলিকাতায় যেতেন। তিনি কলিকাতায় এলে সমাজের উপাসনার ভার তাঁর উপরই এসে পড়ত। কয়েক বার কলিকাতা হয়ে অন্যত্রও গিয়েছেন। যদিও এ সময় তাঁর পরিবারের সকলে ঢাকা ব্রাহ্ম প্রচারক-নিবাসেই ছিলেন এবং সমাজই তাঁদের দেখাশোনা করতেন।

ঢাকা থাকাকালীন গোস্বামীপ্রভু লোকচক্ষুর অন্তরালে কঠোর সাধন-ভজনে ব্রতী হন। ঢাকার উপকণ্ঠে অবস্থিত গেণ্ডেরিয়ার গভীর বনে একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে আসন করে গোসাঁইজী আত্মসাধনায় নিমগ্ন হন। কত যে বাধা, বিঘ্ন, বিভীষিকা, প্রলোভন ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তিনি অকুতোভয়ে জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করে সাধনমার্গের দুরূহ পথ অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকেন, তা বলে শেষ করা যায় না। দৈব উৎপাতের সময় তাঁর আসনের খানিক দূরে সাধনরতা এক সিদ্ধা যোগিনী তাঁকে প্রায়ই অভয়বাণী শোনাতেন। প্রলোভন সম্পর্কে গোস্বামীপ্রভু নিজে বলেছেন, 'এক রাত্রে চারজন পরমাসুন্দরী যুবতী এসে আমাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। বিফল-মনোরথ হয়ে এক ঘড়া সোনার মোহর আমার সামনে রেখে বলে, "এ সব তোমার, তুমি গ্রহণ কর।" প্রত্যাখ্যান করায় তারা বলে, "আমাদিগকে শিষ্যা কর।" "তোমরা কে?" জিজ্ঞাসা করায় বলে, "আমরা পতিতা, আমাদের উদ্ধার কর।" তখন আমি তাদের বলি, "বেশ, শিষ্যা করব। মস্তক মুণ্ডন করে অলঙ্কার ও সুচারু বেশ পরিত্যাগ করে ছিন্ন বেশ পরিধান করে এসো।" তখন তারা হেসে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে বলে, "আমরা মায়ার দাসী। কতদিন যে আমাদের চরণ সেবা করেছ, এখন চিনতেই পারছ না। ভাল, তোমার কল্যাণ হউক। আমাদের আশীর্বাদ কর।" এই বলে তারা বিদায় নিল।'

একদিন তিনি দেখেন একটি প্রকাণ্ড বাঘ তাঁর দিকে ছুটে আসছে। তিনি গুরুকে স্মরণ করে আরও তেজের সঙ্গে নাম করতেই বাঘ মিলিয়ে যায়। আর একদিন তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে আসে প্রকাণ্ড এক অজগর; নামের প্রভাবে সেও মিলিয়ে যায়। সাধনার অন্তরায়স্বরূপ প্রায়ই একটা না একটা কিছু বাধা আসতই। একদিন দেখেন এক পল্টন সৈন্য কুচকাওয়াজ করে তাঁর দিকে আসছে, আবার কোন দিন বা দেখেন কোন অশরীরী আত্মা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন করছে। এমনি ধারা সব উৎপাত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে প্রায় প্রতিদিন, তবে সবই মিলিয়ে যেত নামের প্রভাবে।

নিরবচ্ছিন্ন ধর্মসাধনের মধ্যেও এই সময় একদিন তাঁর জীবনে ঘোর শুষ্কতা আসে। গুরু-প্রদর্শিত শ্বাসপ্রশ্বাসে নামসাধনেও বীতস্পৃহ হয়ে উঠেন। ধর্ম সাধন-সাপেক্ষ আবার কৃপা-সাপেক্ষও বটে। ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী কৃপা পরবশ হয়ে এই সঙ্কট সময়ে গেণ্ডেরিয়ার নির্জন বনপ্রান্তে প্রকাশিত হয়ে তাঁকে ভরসা ও

প্রেরণা দেন। তিনি গোসাঁইজীকে বিন্ধ্যাচল পর্বতে গিয়ে নির্জনে সাধন-ভজনের নির্দেশ দেন। গোসাঁইজীও কালক্ষেপ না করে কলিকাতা হয়ে গন্তব্য স্থানের কথা ব্যক্ত না করে বিন্ধ্যপর্বত অভিমুখে যাত্রা করেন। অতঃপর বিন্ধ্যপর্বতের একটি নির্জন স্থানে গোসাঁইজী গভীর সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

বিজ্ঞান-সাধনায় যন্ত্রের সাহায্যে অবিরল অনুশীলনের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান-বীক্ষার শর্তগুলি যথাযথ অনুসৃত হলে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের পরীক্ষিত প্রমাণ সহজেই গোচরীভূত হয়। ধর্ম অনুশীলনের সময়ও যদি ঋষি-পন্থা অবলম্বন করে ধর্মার্থী অগ্রসর হন, তখন এক একটি করে নির্দিষ্ট অবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি অগ্রসর হতে থাকেন। বিজ্ঞানের সত্য আর ধর্মের সত্য সাধনা দ্বারাই লাভ করতে হয়। বিজ্ঞানসাধনায় প্রয়োজন হয় যন্ত্রের, আর ধর্মসাধনায় মন্ত্রের।

বিজ্ঞান বস্তু-সত্য নির্ণয় করে, ধর্মসাধনা চিন্ময় চৈতন্যের স্বরূপকে জানায়, তার সঙ্গে ঘটায় যোগ। তাই বলা হয়ে থাকে—Religion is a science. ধর্মও একপ্রকার বিজ্ঞান। সাধকের সাধনপথে চলার সময় কত রকম যে অভিজ্ঞতা হয়—বিজ্ঞানের গবেষণায় যেমনটি হয়ে থাকে। সাধকজীবনে বিভূতি বা অষ্টসিদ্ধির প্রকাশ ঘটে যদি সাধনমার্গে তাঁর পদক্ষেপ শাস্ত্রবিধিসাপেক্ষ হয়। যিনি প্রকৃত ধর্মার্থী, তিনি বিভূতি উপেক্ষা করে তাঁর অভীষ্টসিদ্ধির পথে এগিয়ে যান।

বিন্ধ্যপর্বতে এসে সাধনে প্রবৃত্ত হবার কিছুদিন পর গোসাঁইজী সাধনমার্গের এক জ্বালাময়ী অবস্থার ভিতর এসে পৌঁছেন। দিবানিশি তাঁর দেহমন হু হু করে জ্বলতে থাকে। আহার-বিহারে তাঁর রুচি থাকে না; দেহের এমন উত্তাপ, যেন জ্বর হয়েছে। নাম ছাড়লেই স্বস্তি; কিন্তু নাম ছাড়ার তাৎপর্য অভীষ্টসিদ্ধির পথে বিড়ম্বনা। তার চেয়ে মরণ ভাল। ক্রমে আসে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি। গুরুদেব প্রকাশিত হয়ে তাঁকে উৎসাহ দেন, সাবধান করে দেন নামের আশ্রয় যেন তিনি না ছাড়েন। তিনি আরও অভয় দেন, অচিরে এসব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হবে; তথাপি যদি অসহ্য বোধ হয় তাহলে তাঁকে জ্বালামুখী গিয়ে সাধন করার অনুমতি দেন। এতে দ্রুত এই অসহনীয় অবস্থা দূর হবে। এই নিদারুণ অগ্নিদাহকে ‘পঞ্চতপা’ বলে। সাধন-ভজনের ঐকান্তিকতায়—গুরুশক্তির খেলায়, সাধন যখন বেশ খানিকটা এগিয়ে যায়, সাধকের অন্তরে তখন নামাগ্নি জ্বলে উঠে। তাতে সব বাসনা পুড়ে ছাই হতে থাকে আর আত্মা হয় দিন দিন নির্মল। বিষয়-রস মনে থাকতে ব্রহ্মানন্দ-সম্ভোগ সম্ভব নয়। এ সময় সাধকের অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করতে হয়। একে ইন্দ্রের অত্যাচারও বলা হয়ে থাকে। সংসারে সুখের বস্তু আর তখন সুখ দিতে পারে না। জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ। সব কিছুই বোধ হয় বিষবৎ। এ অবস্থায় কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলেন। কেউ বা পাগল হয়ে যান। বেশীর ভাগ সাধকই সাধন ছেড়ে দেন। এই সঙ্কট মুহূর্তে গুরুকৃপাতেই সাধক রক্ষা পান। দীনহীনভাবে ছোট-বড় সকলের পদধূলি নিলে, জ্বালার প্রকোপ খানিকটা হ্রাস হয়। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই অবস্থায় জগন্নাথদেবের রথের চাকায় আত্মাহুতি দিতে চেয়েছিলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাঁকে রক্ষা করেন। রঘুনাথদাস গোস্বামীও পর্বত থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন। সনাতন গোস্বামী তাঁকে প্রবোধ দিয়ে নিবৃত্ত করেন। গুরুর আদেশে গোসাঁইজী জ্বালা-

মুখী গিয়ে সাধন-ভজন করেন। কিছুদিন সাধন করার পরই তাঁর প্রাণ সরস হয়ে উঠে।

এই যোগসঙ্কট সম্বন্ধে গোসাঁইজী বলেছেন, 'নাম করতে করতে একটা সময় আসে, যখন শরীরে ও মনে নানাপ্রকার জ্বালা হতে থাকে। উহা সাধনেরই একটা অবস্থা। এই সময় কখন কখন শরীর আগুনে পুড়লে যেমন জ্বালা হয়, তেমনি জ্বালা হয়ে থাকে। সময়ে সময়ে হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ, কান ও নাড়িভুঁড়ি টানতে থাকে। এই ক্লেশ বড় সহজ ক্লেশ নয়। অনেকে এই যন্ত্রণায় সাধন-ভজন ছেড়ে দেয়। ইহাকে যোগসঙ্কট বলে। খুব সাবধানতার সহিত এই সময়টা ভালমতে কাটায়ে দিতে পারলেই হয়। এই সময় মিশ্রির সরবৎ, ডাব ও ঠান্ডা জিনিস খেতে হয়। শরীর ঠান্ডা ও অবসন্ন হয়ে পড়লে, গরম ঘি সৈন্ধব লবণ দিয়ে পান করতে হয়। এরূপ করলেই ঐ সকল যন্ত্রণার শান্তি। যোগসঙ্কট অবস্থা একবার কাটায়ে যেতে পারলে আর কোন উৎপাতই থাকে না। সাধন করলে উহা সকলেরই একবার ভুগতে হয়। পূর্বে মুনি-ঋষিরা শিষ্যদের দেহ-মন শুদ্ধ করতে তুষানল করতেন। এখন আর তাহা চলে না। নামানলেই দগ্ধ করে এখন সেই কাজ করায়ে নেন।'

সাধনজীবনে এই যোগসঙ্কট কতটা প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে বলতে গিয়ে গোসাঁইজী বলেছেন, 'দেখ গ্রীষ্মকাল কেমন ভয়ানক। পুকুর, খাল, বিল, সমস্ত শুকায়ে গেছে। সূর্যের প্রখর উত্তাপে সবাই অস্থির হতেছে, সকল প্রাণীই হাহাকার করছে। গাছপালাও পূর্বের মত নাই। দেখলেই মনে হয় যে, কি এক বিষম অবস্থা! বাস্তবিক, প্রকৃতির পক্ষে এমন দারুণ অবস্থা আর কখনও হয় না। কিন্তু ভেবে দেখ, এই গ্রীষ্মকাল না হলে বর্ষা আসে না; প্রকৃতি আবার নূতন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয় না। এই গ্রীষ্মকালই প্রকৃতির নূতন সৌন্দর্যের কারণ। গ্রীষ্ম হয় বলেই আমরা বর্ষার এত সুখ এত সৌন্দর্য অনুভব করি। সাধনের অবস্থাও ঠিক এই প্রকার। সাধনের সময়ে শুষ্কতা, নৈরাশ্য, জ্বালা ইত্যাদি বিবিধপ্রকার দুঃখের অবস্থা ভোগ করতে হয় বলেই ধর্মের এত সৌন্দর্য। নৈরাশ্য বা শুষ্কতা না এলে ধর্মের আনন্দই থাকত না। এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়ে মানুষ যখন ধর্মের উচ্চতম শৃঙ্গে উপনীত হয়, তখনই যথার্থ শান্তি লাভ করে। তা না হওয়া পর্যন্ত এসকল অবস্থা হতে মানুষ কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। এখন এসকলই প্রয়োজন। যদি শান্তির অবস্থা একবার লাভ হয়, তাহলে আর কিছুতেই তা নষ্ট হয় না।'

গোসাঁইজী জ্বালামুখী থেকে ফিরে আসেন গয়ায়। দুঃখের নিশি প্রভাত হয়। মনের খুব সরস অবস্থা। রঘুবর বাবাজীর আশ্রমে এসে আবার তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। পরমহংসজী মধ্যে মধ্যে দর্শন দিয়ে সাধন উপদেশ দেন। একদিন অষ্টসিদ্ধির কথা উঠলে পরমহংসজী বললেন, 'শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টাদশ সিদ্ধির কথা আছে, তার মধ্যে আটটি প্রধান।

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণ হেতবঃ॥ ১১।১৫।৩

অণিমা—আয়তনে বিরাট হলেও, অণু-পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হবার শক্তি।
গরিমা—আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও, পর্বতের ন্যায় বিরাট হবার শক্তি।
লঘিমা—গুরুভার হলেও, বায়ুর ন্যায় লঘু হবার সামর্থ্য।
প্রাপ্তি—ইচ্ছামাত্র কাছে বা দূরে যে কোন স্থানে অবস্থিত পদার্থ হাতের মুঠোর

মধ্যে পাবার শক্তি।
প্রাকাম্য—ইচ্ছাশক্তির অ-ব্যাঘাত, যা ইচ্ছা করা যাবে তাই পূর্ণ করার শক্তি।
বশিত্ব—সমস্ত পদার্থ ও প্রাণীমাত্রকে বশীভূত করার শক্তি।
ঈশিত্ব—ঈশ্বরের ন্যায় সব কিছুর উপর কর্তৃত্ব লাভের ক্ষমতা।
যৎকামস্তদবস্যাতি—সত্য সঙ্কল্পতা, বিষকে অমৃতত্বে পরিণত করা, মৃতকে জীবন দেওয়া এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা লাভ করা।”

সাধনার দ্বারা জগতে সব কিছুই করা সম্ভব, সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হয় না। এ সবই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন বিজয়কৃষ্ণ, তবুও মনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাসনা জাগে। প্রিয় শিষ্যের মনের কথা বুঝতে পারেন পরমহংসজী, তাই তাঁকে তখন অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যান। এক-একটি করে অষ্টসিদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি তুলে ধরেন তাঁর সম্মুখে। কখনও বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা দেহ ধারণ করে তিনি শূন্যে হাঁটতে থাকেন, কখনও সূক্ষ্ম হয়ে পাহাড় ভেদ করে এদিক ওদিক করেন। এমনিভাবে সমস্ত প্রকার সিদ্ধির ক্ষমতা পরমহংসজী প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শন করে গোসাঁইজীর সমস্ত সংশয় দূর করে দেন। বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তে গুরুদেবকে প্রণিপাত করে গোসাঁইজী বললেন, ‘প্রভো, শাস্ত্র অভ্রান্ত। কিন্তু আজ যা আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন তা আপনার ন্যায় মহাসাধকের পক্ষেই সম্ভব।’ পরমহংসজী একটু হেসে সস্নেহে বললেন, ‘বেটা, সাধন কর্‌না, তুম্‌হারা ভি এইছা শক্তি জরুর হোগী।’

এরপর একদিন এক অমানিশা রজনীতে ব্রহ্মানন্দজী গোস্বামীপ্রভুকে নিয়ে বুদ্ধগয়ার পথ ধরে বরাবর পাহাড়ে উপনীত হন। দুপুর রাত্রি, ঘুটঘুটে অন্ধকার। জনমানবশূন্য একটি স্থানে চলতে চলতে একটি কুটীরের সামনে তাঁরা উপস্থিত হন। কুটীর-দ্বারে তরবারি হাতে একজন সাধু পাহারায় আছেন। পরমহংসজীকে দেখে সসম্ভ্রমে তিনি দ্বার ছেড়ে দেন। গুরুদেবকে অনুসরণ করে ভিতরে গিয়ে গোসাঁইজী দেখেন, একজন স্ত্রীলোককে ঘিরে জন পনর সাধক যোগাসনে বসে আছেন। পরমহংসজীর পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই চক্রের কাজ শুরু হয়। চক্রেশ্বর খানিকটা জল মন্ত্রপূত করে সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেন। সকলেরই তখন বালক-ভাব প্রকাশিত হল, সকলেই স্ত্রীলোকটিকে মাতৃভাবে দর্শন করতে লাগলেন। গোসাঁইজীরও তখন বালকভাব, তিনি হামাগুড়ি দিয়ে ‘মা’ ‘মা’ বলে স্ত্রীলোকটির কোলে উঠে তাঁর স্তনপান করতে লাগলেন। স্ত্রীলোকটিও মায়ের মত পিঠ চাপড়িয়ে আদর করে গোসাঁইজীকে বললেন, ‘আজ থেকে তুমি জিতেন্দ্রিয় হলে।’ গোসাঁইজী পুনরায় আসনে বসে লক্ষ্য করলেন, চক্রেশ্বর যে দেবতাকে অর্ঘ্য দিয়ে আহবান করছেন, সেই দেবতা তখনই প্রকাশিত হয়ে অর্ঘ্য গ্রহণ করছেন। তদনন্তর স্ত্রীলোকটি ছিন্নমস্তা-সাধনের প্রক্রিয়া শুরু করলেন এবং ভাবাবেশে নাচতে নাচতে দক্ষিণ হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা আপন মস্তক ছেদন করে বাম হস্তে তা গ্রহণ করলেন। ছিন্নমস্তক মুখব্যাদান করে গলদেশ হতে নির্গত রুধিরধারা পান করতে লাগল। সাধকেরা সকলে মিলে তখন স্তবপাঠ ও নামকীর্তন করছেন। এমন সময় স্বয়ং মহাদেব সেখানে প্রকাশিত হন। আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। ছিন্নমস্তক যথাস্থানে স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত হয়। সকলে জয়ধ্বনি করে উঠেন। মহাদেব সকলকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হন। এই অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ স্বচক্ষে দেখে গোসাঁইজী শাস্ত্রোক্ত তান্ত্রিকক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হন।

ক্রমে সাধনরাজ্যের দ্বার একটির পর একটি করে তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হতে লাগল। কিন্তু এতে গোসাঁইজী মনে ভাবলেন, এ সব দর্শনাদি মস্তিষ্কের দুর্বলতা-প্রসূত। এইসব যে সাধনরাজ্যেরই বৈশিষ্ট্য তা তিনি বুঝতে পারেন নি। কলিকাতা ফেরার পথে গোসাঁইজী দ্বারভাঙ্গা যান। এখানে পরমহংসজী তাঁকে দর্শন দেন। তাঁর দর্শন পেয়ে অকূলপাথারে তিনি কূল পেলেন। গুরুদেবকে তাঁর মাথার অসুখের কথা বলতে গিয়ে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা একে একে খুলে বলেন। এ কি রকম ব্যাধি? পরমহংসজী মৃদু মৃদু হেসে দ্বারভাঙ্গার একটি পুস্তকালয়ের নাম বলে সেখান থেকে একখানি 'বিচারসাগর' ও একখানি 'হঠযোগ প্রদীপিকা' গ্রন্থ কিনে তাঁকে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করতে বলেন। দুখানি গ্রন্থের মূল্য কত হবে তাও বলে দেন। গোসাঁইজী অবিলম্বে ঐ দোকান থেকে পুস্তক দুখানা কিনে আনেন। পরমহংসজী যে মূল্য বলেছিলেন, দোকানীও সেই মূল্যই চেয়ে নিল। আশ্চর্য, সমস্ত দ্বারভাঙ্গা সহরে শুধু এই দোকানটিতেই এ বই দুটি এক কপি করে বহুদিন অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে। গোসাঁইজী বই দুখানি খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে থাকেন। তিনি যে সব অবস্থাকে মাথার বিকার বলে মনে করেছিলেন, সে সবই তাঁর জীবনে সংঘটিত বিচিত্র অভিজ্ঞতার হুবহু প্রকাশ বলে গ্রন্থদ্বয়ে সাধনস্তরের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনায় বিধৃত হয়ে আছে। শাস্ত্রের অভ্রান্ত প্রমাণ পেয়ে গোসাঁইজী নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিন্ত হন। তাঁর মন থেকে এক গুরুভার নেমে যায়। অতঃপর কিছুদিন বাদে আবার একদিন গুরুদেবের দর্শন পেয়ে তিনি তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'পূর্বে যদি বইগুলি পড়তে বলতেন, তা হলে অযথা এই ভয়-ভাবনা এবং উদ্বেগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতাম।' গোসাঁইজীর কথা শুনে পরমহংসজী হেসে বললেন, 'পূর্বে না পড়ে ভালই করেছ। পুস্তকের বিষয়গুলি জানা থাকলে এ সব অলীক দর্শন নয় বলে জানতে; তাতে তোমার সাধনা পরিপূর্ণ হত না, বরং অহংকার বাসা বাঁধবার সুযোগ পেত। পরে বইগুলি পড়ায় এখন উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছ, বুঝতে পেরেছ এ-সবের প্রকৃত তাৎপর্য।'

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই গোসাঁইজী গুরুজীর নির্দেশমত আবার কলিকাতা ফিরে আসেন। কলিকাতা এসে গোসাঁইজী প্রচার-নিবাসে কিছুদিন থাকেন। দেখতে দেখতে মাঘোৎসব এসে যায়। খুব ধুমধাম করে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব প্রতিপালিত হয়। ১১ মাঘ, ১২৯১ সাল, গোস্বামীপ্রভু বেদীর কাজ করেন। উপাসনার সময় এক আধ্যাত্মিক দৃশ্যের অবতারণা হয়। বিজয়কৃষ্ণ দেখছেন তাঁর চোখের সামনে ছায়াচিত্রের মত জীবন্ত সব ঘটনা, দেখছেন মহাপ্রভুকে ঘিরে রয়েছেন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃীস্টান সমস্ত ধর্মগুরু ও প্রচারকগণ; রয়েছেন আরও অনেক সাধু-সন্ত মহাত্মারা। তাঁরা সকলেই আনন্দে হাত ধরাধরি করে নৃত্য করছেন। এ যেন ভাবীকালের সর্বধর্মসমন্বয়ের ইঙ্গিত, সম্প্রদায় ও গন্ডীর বিলোপ সাধনের গভীর তাৎপর্যময় প্রতিচ্ছবি।

মাঘোৎসবের পর একদিন গোস্বামীপ্রভু বরাহনগরের এক জনাকীর্ণ পথ ধরে হেঁটে চলেছেন; হঠাৎ চোখে পড়ে পথের মধ্যে সামান্য ব্যবধানে এক অপূর্বদর্শন প্রকান্ড একটি বাঘ ধীর পদক্ষেপে হেলতে দুলতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। অথচ আশ্চর্য, এই জনাকীর্ণ পথের পথচারীদের কেহই ইহার উপস্থিতিতে সন্ত্রস্ত হচ্ছে না, কোন চাঞ্চল্যই প্রকাশ করছে না। যে যার পথে স্বাভাবিক ভাবেই চলে

যাচ্ছে। তবে কি এরা এই অপূর্বদর্শন বাঘটিকে দেখতে পায় নি? ডর-ভয় দূরের কথা, তাঁর নিজের অন্তরাত্মাও আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠছে। একটি অনাস্বাদিত মধুর আস্বাদনে বিভোর হয়ে পড়ছেন গোস্বামীপ্রভু; সর্বাঙ্গ তাঁর আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠছে, মন-প্রাণ চাইছে তাঁর সমস্ত সত্তা নিয়ে এই অপূর্বদর্শন বাঘটির শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করতে। অপলকদৃষ্টিতে গোস্বামীপ্রভু তাকিয়ে আছেন, দেখছেন অনিন্দ্য-সুন্দর জ্যোতির্ময় রূপ ধরে বাঘটি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁর সুরভিত অঙ্গের সুবাস চারদিক আমোদিত করে তুলেছে। গোস্বামীপ্রভু স্তব্ধ-বিস্ময়ে এই জ্যোতির্ময় ব্যাঘ্রমূর্তিকে প্রণাম করলেন, লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের কাছে। আনন্দধারা বয়ে চলেছে তখন বিজয়কৃষ্ণের দেহ-মন-প্রাণে, ভগবান আজ ব্যাঘ্রমূর্তিতে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছেন বিজয়কৃষ্ণের কাছে। ভক্তি-বিগলিত চিত্তে বিজয়কৃষ্ণ স্তব-স্তুতি করছেন, হঠাৎ ব্যাঘ্রমূর্তি শ্যামসুন্দরের রূপ ধরে তাঁর প্রতি স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে অভয়বাণী জানিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

যাঁকে পাবার জন্য পথের কোনো বাধাই তাঁকে নিরুৎসাহ ও নিবৃত্ত করতে পারে নি, যাঁর দর্শন-মানসে কত না বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, ঐহিক সুখ-সম্পদ, মান, যশ, শূকরী বিষ্ঠাবৎ তুচ্ছ করেছেন, অদ্বৈতবংশতিলক হয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন, যে পরমপুরুষকে লাভের প্রস্তুতির জন্য মন-মুখ এক করতে দুবার উপবীত পরিত্যাগ করে মার মনে কতই না দুঃখ দিয়েছিলেন, সেই প্রাণারামকে দেখে তাঁর উত্তপ্ত হৃদয় শান্ত করে আজ তিনি চিরাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় উপনীত হয়েছেন।

এই সময় থেকেই গোসাঁইজী ষড়রিপুর প্রভাবমুক্ত হন। তাঁর মায়ার বন্ধন ছিন্ন হয়; বাসনা, অহঙ্কার হয় বিলীন। ভূমি থেকে বৃক্ষের মূল ছিন্ন হবার পর কান্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি ঈশ্বর-দর্শনের ফলে মায়ামূল থেকে তিনি ছিন্ন হন। জীবের পক্ষে প্রবৃত্তি দমন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু ভগবদ্দর্শনে তাও সম্ভব হয়।

ভগবান রসস্বরূপ। 'রসো বৈ সঃ'। তাঁকে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাই তাঁর সমস্ত রস ও ভাবের বিকাশ ঘটে গোসাঁইজীর মধ্যে। তিনি ব্রহ্মের স্বারূপ্য লাভ করেন। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তাঁর কাছে বিলীন হয়ে যায়। ব্রহ্মান্ডের কোন ঘটনা বা তত্ত্ব তাঁর কাছে থাকে না অজ্ঞেয়। অষ্টসিদ্ধি আমলকীবৎ তাঁর করতলগত হয়। বেদের প্রকৃত মর্ম ও তত্ত্ব তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়। শাস্ত্রকর্তা ও ঋষিদের প্রসাদে শাস্ত্রের তত্ত্ব তিনি অবগত হন। শাস্ত্র সম্পর্কে গোসাঁইজী বলতেন, 'শাস্ত্রে বিন্দুমাত্র ভ্রম বা প্রমাদ নাই। শাস্ত্র অভ্রান্ত; তার প্রতিটি অক্ষর সজীব ও জীবন্ত। তবে শাস্ত্রের মধ্যে যে সব প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে যা ঋষিবাক্য নয়, সে সব সজীব নয়। শাস্ত্রের একটি বাক্যও নিরর্থক নয়। ধর্মের ভিত্তি শাস্ত্র না হলে যথেচ্ছাচার ও স্বেচ্ছাচার ধর্মের আসন দখল করে, ধর্মের মহিমা-মাধুর্য করে নষ্ট; ধর্মকে আশ্রয় করে দেখা দেয় নানা অনাচার, ভেদ ও বিরোধ। মানুষের বিবেকজ জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক। ভগবান এক অখন্ড ব্রহ্মরূপে সর্বত্র বর্তমান, আবার সকল পদার্থে তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে রয়েছেন। এসব দেবতারও নিজস্ব রূপ ও বিগ্রহ রয়েছে, এগুলি কল্পনা নয়।'

সিদ্ধিলাভ করে গোসাঁইজী নিরীক্ষণ করেন আপ্তবাক্যমূলক সকল ধর্মই ভগবানকে লাভ করার বিভিন্ন পথ। বিভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করে সাধক একই

সচ্চিদানন্দসাগরে উপনীত হন।

বিচিত্র মানবচরিত্র, বিচিত্র তাই তার চলার পথ; কিন্তু সকল পথের লক্ষ্য এক। সকল পথেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আদি ও অন্তে ধর্মের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ নেই। সমস্ত ধর্মের মূল কথা, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। বেদেও আছে, একমেবাদ্বিতীয়ম্; শুধু মাঝখানে গণ্ডগোল। সনাতন পন্থায় সিদ্ধ মহাপুরুষরা কোন ধর্মের সঙ্গে কোনও ধর্মের বিরোধ খুঁজে পান না; বিরোধ শুধু আচারে। সিদ্ধ যোগভক্ত সন্তেরা 'যত মত তত পথ', এই মতেরই উদ্গাতা। ভগবানকে দর্শন করে সব বিরোধ বিতর্কের হয় অবসান। যারা বলেন, 'আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ, অপর সব নিকৃষ্ট'—তারা ধর্মরাজ্যের এলাকা থেকে বহুদূরে রয়েছেন। ভগবানকে লাভ করার পরও গোস্বামীপ্রভু আপনাকে 'ব্রাহ্ম' বলে বলতেন। এই উক্তির তাৎপর্য 'ব্রহ্মে'র সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে দর্শন করে তিনি যথার্থ 'ব্রাহ্ম' হয়েছিলেন। এই পরিচিতির সার কথা এই নয় যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত।

আশাবতীর উপাখ্যানে আছে—

'প্রশ্ন : নির্ভয় কে?

উত্তর : যিনি যুক্তযোগী, সর্বদাই পরব্রহ্মে সংযুক্ত থাকেন; যাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা ব্রহ্মের জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাতে সর্বদা সংযুক্ত, তিনিই যুক্তযোগী, তিনিই জীবন্মুক্ত। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার দাস হয়, তিনিই মুক্ত, তিনিই স্বাধীন।

প্রঃ—আমার বড় ভয়ানক স্বার্থপরতা। সংসারে আমার বলিতে কেহ নাই, তথাপি কোন বস্তু যখন পরিবেশন করি, তখন পরিচিত লোককে ভাল ভাল বস্তু অনেক করিয়া দেই, অন্যকে যেমন তেমন করিয়া কিছু দিয়া যেন বাঁচিলাম বোধ হয়। ভাল জিনিসটি আপনি লই; অন্যের জন্য মন্দ বস্তু রাখিয়া দেই। একবার জগন্নাথে গিয়াছিলাম, পথের মধ্যে বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে চটী আছে। চটীর মধ্যে যেটি ভাল ঘর, আমি সেইটিই লইতাম। এমন কি অনেক ঘুসটুস দিয়াও ভাল স্থানটি অধিকার করিতাম। লোকে কষ্ট পাইতেছে, তাহা অনায়াসে দেখিতাম। কাহারও ভাল দেখিতে পারি না। অন্যের ভাল দেখিলে কষ্ট হয়।

উঃ—স্বার্থপরতাই সকল পাপের মূল। সামান্য ঔষধে এ-রোগ নিবারণ করা যায় না। 'সংসার অসার অনিত্য' সর্বদা এইরূপ চিন্তা ও আলোচনা এবং সাধুসঙ্গ করিতে করিতে যখন বাস্তবিকই সংসারের তাবৎ পদার্থকে অসার অনিত্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইবে, তখনই স্বার্থপরতা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া তীব্র জীবন্ত বৈরাগ্য প্রকাশিত হইবে। সাধকমাত্রেরই প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বনীয়। ভস্মমাখা কৌপীনপরা বৈরাগ্য নহে। স্বার্থনাশই প্রকৃত বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য হইতেই সাধনে অধিকার জন্মিবে। যেমন মনে মনে পরপুরুষ কামনা করিলে সতীত্ব নষ্ট হয়, সেইরূপ মনে মনে অধর্ম আলোচনা করিলে চরিত্র কলঙ্কিত হয়। কলঙ্কিত মনে ধর্মসাধন হয় না। চরিত্র শুদ্ধ করিয়া প্রস্তুত থাক, নিশ্চয়ই পরব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে।

প্রঃ—এ সংবাদ কে আনিল?

উঃ—মানুষের যেমন বাহিরের চক্ষু-কর্ণ, সেইরূপ অন্তরে আত্মারও চক্ষু-কর্ণ আছে। চিত্তশুদ্ধিপূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সংযুক্ত হইলে ব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তি সেই চক্ষু-কর্ণে প্রবেশ করে। তখন একস্থানে থাকিয়া সমস্ত জগতের সংবাদ জানা যায়।

প্রঃ—এক ঘরে থেকে অন্য ঘরে কি হয় জানা, একি সম্ভব?

উঃ—এই ভারতবর্ষের সেই জীবন্ত ধর্মভাব নাই। ধর্মের কতকগুলি প্রণালী বা খোসা লইয়া লোকে ব্যস্ত রহিয়াছে। যখন ভারতে যোগধর্মের আলোচনা ছিল, যখন ধর্ম জীবিত ছিল, তখন অন্তরের চক্ষু-কর্ণের কথা সকলেই বুঝিত। প্রাচীন ঋষিগণ উপনিষদে লিখিয়াছেন যে, পরমেশ্বর চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন। কেবল পুস্তক পড়িয়া এ কথা বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা যুক্তযোগী, কেবল তাঁহারাই ইহার মর্ম জানেন। আমাদের পৃথিবী হইতে আকাশের চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রসকল কত দূরে, তথাপি জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ তাহাদের বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতেছেন। পৃথিবী হইতে কি প্রকারে জানিতে পারিলেন? জ্ঞানযোগে চিন্তা করিতে করিতে এক-একটি দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। কেবল মনুষ্যের জ্ঞানে যদি আকাশের নক্ষত্রাদিগকে জানা সম্ভব হয়, তবে মনুষ্যের জ্ঞানে যদি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান, সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে কিছু কি অজানা থাকে? না, কখনই না।

প্রঃ—সিদ্ধপুরুষ হইবার উপায় কি?

উঃ—সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতেই সিদ্ধিলাভ হয়।

প্রঃ—সংসারাসক্তি কাহাকে বলে?

উঃ—এই নশ্বর শরীরকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করাকেই সংসার কহে। এই দেহকে অত্যন্ত ভালবাসা, তাহারই নাম সংসারাসক্তি। যে স্ত্রী কি পুরুষ কেবল আহার, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহ, শয্যা এই সমস্ত লইয়াই ব্যস্ত, সেও সংসারাসক্ত। অনেকে মনে করে, নগর ছাড়িয়া বনে বাস করিলেই, সংসার ত্যাগ করা হইল; ইহা অত্যন্ত ভ্রম। বনে আসিয়াও আহার লইয়া, কুটীর, কৌপীন, আসন, অগ্নিকুণ্ড, কমণ্ডলু লইয়া যে ব্যস্ত, সেও সংসারাসক্ত।

প্রঃ—সংসার ছাড়িয়া উদাসীন হইয়াছেন, তবে আপনাদের আবার রিপুর ভয় কেন?

উঃ—ঘর-বাড়ী, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু অন্তরের কাম-ক্রোধ রিপুগুলিকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। তাহারা আমার সংগে সংগেই আসিয়াছে। বিশেষতঃ ঘর-বাড়ী, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করিলেই যে সংসার ত্যাগ করা হইল, তাহা নহে। সংসার কোন পদার্থ নহে। ভগবানকে প্রেম না করিয়া তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ সকলকে ভালবাসা, তাহাতে আসক্ত হওয়ার নামই সংসার। যতদিন ঈশ্বরে সম্পূর্ণ প্রেম না হয়, ততদিন সংসার ত্যাগ করা যায় না।'

গৃহে সাধন-ভজনে বাধা হয়, এজন্য নির্জনে একাকী রহিয়াছি। তিলক, মালা প্রভৃতি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। যিনি অনন্যভাবে ভগবান বিষ্ণুকে প্রেম করেন—তিনিই বৈষ্ণব।

গোস্বামীপ্রভুর সিদ্ধিলাভ ১২৯১ সালের ফাল্গুন থেকে ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠের মধ্যে হয়েছিল। তখন তিনি কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এবং ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য।

১২৯২ সালের আষাঢ় মাসে জ্যোতিরিন্দ্রপ্রসাদের আমন্ত্রণে তাঁর পিতা ব্রজসুন্দর মিত্রের দেহান্তরে ব্রহ্মোপাসনায় আচার্যের কাজ করার জন্য গোস্বামী-

প্রভু ঢাকা যাত্রা করেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মকে নিয়ে গোস্বামীপ্রভু ঢাকার উপকণ্ঠে গ্রামে গ্রামে কীর্তন করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে ব্রজসুন্দরবাবুর স্মৃতি-তর্পণ করেন। গোসাঁইজীর জীবন্ত ধর্মভাব দেখে গ্রামের লোকের মধ্যে ধর্ম-আচরণের উদ্দীপনা দেখা যায়।

ঢাকায় প্রচারক-নিবাসে একদিন যোগমায়া দেবীর সঙ্গে গোস্বামীপ্রভু কথাবার্তা বলছেন, হঠাৎ দেখেন যোগমায়া দেবীর মুখে অপূর্ব এক ব্রহ্মজ্যোতি। গোসাঁইজীর সর্বাঙ্গ প্রায় বিবশ হয়ে আসে, তিনি যোগমায়া দেবীর চরণতলে লুটিয়ে পড়েন, তাঁর পদধূলি নিয়ে নিজের মাথায় ও সর্বাঙ্গে বার বার মাখতে থাকেন। যোগমায়া দেবী স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি এ কি করছেন?'

গোস্বামীপ্রভু কোন কথাই শুনছেন না। তখনও তিনি যোগমায়া দেবীর পায়ে হাত বুলিয়ে তাঁর পদধূলি নিচ্ছেন নিজের মাথায়।

কিছু সময় পরে এই ভাবটি কেটে গেলে গোস্বামীপ্রভু যোগমায়া দেবীকে বলেন, 'হঠাৎ দেখি তোমার মুখমণ্ডল থেকে অপূর্ব এক জ্যোতি ঠিক্‌রে পড়ছে; দেহ থেকে ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশ পাচ্ছে। তোমার মধ্যে জগজ্জননীর প্রকাশ দেখে, তাঁকে বার বার প্রণাম করেছি। আর তাঁরই পদধূলি নিয়েছি। তোমার কোন অকল্যাণ বা অমর্যাদা করি নাই।'

গোসাঁইজীর কথায় যোগমায়া দেবী আশ্বস্ত হন।

সদ্‌গুরুপদে অধিষ্ঠিত

ভগবানের সত্যধর্ম যিনি যে পরিমাণে আয়ত্ত করেন, তাঁর সেই অনুপাতে শক্তি লাভ হয়। কিন্তু অপরের ধর্মচক্ষু খুলে দিতে যে শক্তি আবশ্যক, তা যিনি লাভ করেন নি, তিনি কখনও অপরের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করার অধিকারী নন। যোগসাধনের চারটি অবস্থা—প্রবর্তক, সাধক, যুঞ্জন ও যুক্তসিদ্ধ। গোসাঁইজী 'যোগসাধন' গ্রন্থে লিখেছেন,—'প্রবর্তক অবস্থার মধ্যে ধর্মের প্রাথমিক কয়েকটি ভাব মাত্র উন্মেষিত হয়; যেমন—দীনতা, বৈরাগ্য, প্রেম ও পবিত্রতা। তৎপরে সাধক অবস্থায় ভগবানের আবির্ভাব অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতে থাকে, এবং সেই অবস্থার শেষভাগে সুস্পষ্ট ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। তারপর যুঞ্জন যোগীদের অবস্থা। তাঁহারা প্রায়ই ঈশ্বর-সহবাসে থাকেন ও বিবিধ সত্য লাভে জীবন কৃতার্থ করেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইঁহাদেরও বিচ্ছেদ হয়, সেই সময় অত্যন্ত ক্লেশে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যেও বিচ্ছেদের মুহূর্তে পাপ প্রবেশ করিয়া সর্বনাশ করিতে পারে। অবশেষে ঈশ্বরের কৃপায় যাঁহারা অবিচ্ছিন্ন যোগের অবস্থায় থাকিয়া সেই পূর্ণ পরমেশ্বরে প্রতিনিয়ত অবস্থিতি ও বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে যুক্তযোগী কহে। ইহাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা।...যাঁহার শক্তি অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বরে যুক্ত হইয়াছে—তিনিই শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ লাভ করিয়াছেন।'

গোস্বামীপ্রভু যুক্তসিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হলে পরমহংসজীর আদেশে সদ্‌গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। গুরুদেব তাঁকে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদের শক্তিসঞ্চার করে সাধন দিতে আদেশ করেন। যিনি শব্দব্রহ্মবিদ্‌ ও পরব্রহ্মবিদ্‌, তাঁকেই সদ্‌গুরু বলা হয়। বেদের মন্ত্র ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যাঁর কাছে প্রকাশিত হন

তিনি শব্দব্রহ্মবিদ্। তিনি শব্দব্রহ্মবিদ্ হয়ে পরব্রহ্মকে লাভ করলে সদ্‌গুরু নামে অভিহিত হন। সদ্‌গুরু শিষ্যের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করেন। বহু জন্মের সুকৃতিতে সদ্‌গুরু লাভ হয়। সদ্‌গুরু লোক-উদ্ধারের জন্য অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। তিনি সব সময় পৃথিবীতে আসেন না। এক সময় একজনের বেশী সদ্‌গুরু আসেন না। সিদ্ধ বা মহাপুরুষ মাত্রই সদ্‌গুরুবাচ্য নন। জীবকোটি অপেক্ষা সিদ্ধপুরুষ সহস্রগুণ শক্তিশালী। সদ্‌গুরু সিদ্ধপুরুষ অপেক্ষাও শক্তিমান; সদ্‌গুরু ভগবানের আবেশ বা অংশাবতার বা স্বয়ং তিনি। কর্মপাশ ছিন্ন করার কর্তা সদ্‌গুরু।

কেউ সাধনপ্রার্থী হয়ে এলে পরমহংসজীর সম্মতি আছে কিনা জানার জন্য গোসাঁইজী আসনে বসে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। যুক্তসিদ্ধ অবস্থায় স্থান কাল ও সময়ের ব্যবধান থাকে না। এই অবস্থায় তাঁর অনুমতি পেলে সাধনের সময় দিয়ে নির্দিষ্ট দিনে তিনি দীক্ষার্থীকে শক্তিসঞ্চার করে নির্জনে দীক্ষামন্ত্র বলে দিতেন। দীক্ষাকালে শিষ্য ছাড়া অপরের থাকার নিয়ম ছিল না। গোস্বামীপ্রভু বলতেন যে, সাধনের সময় পরমহংসজী তাঁকে আশ্রয় করে নিজেই সাধন দিতেন। তাঁর সাধনে কৃচ্ছ্রতা ছিল না। শুদ্ধ আহার ও শ্বাসে-প্রশ্বাসে গুরুদত্ত নামজপই এই সাধনের বৈশিষ্ট্য; মালা, তিলক বা বাইরের বেশভূষা এতে নেই। দেহশুদ্ধির জন্য এক রকম প্রাণায়াম তিনি দেখিয়ে দিতেন, কিন্তু তা সাধনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। সত্য রক্ষা, আহারশুদ্ধি, বীর্যধারণ এবং শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামসাধনের উপরই তিনি গুরুত্ব দিতেন। তাছাড়া প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান, মাতাপিতাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা, সম্প্রদায়নির্বিশেষে সাধুভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিব্যভাবময় মহৎ প্রেম-সম্পর্ক স্থাপন এই সাধনের নিগূঢ় অনুজ্ঞা। উচ্ছিষ্ট, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, ডিম ও অন্যান্য তমোগুণ-সম্পন্ন খাদ্য গ্রহণও এই সাধনে নিষিদ্ধ। এই সাধন সম্পূর্ণ অহৈতুকী। জাতি, কুল, শিক্ষা, সমাজ, কৌলীন্য এই সাধন পাবার মাপকাঠি নয়। এ ভগবানের একান্ত কৃপাসাপেক্ষ। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান আপন আপন ধর্মবিশ্বাস অটুট রেখে এ সাধন পেতেন। পরনিন্দা এই সাধনে বিষবৎ বর্জনীয়।

গুরুজীর নির্দেশে গোস্বামীপ্রভু অন্তরঙ্গ অনুগামী প্রার্থীকে যোগসাধন দীক্ষা দিতে শুরু করেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত পদ্ধতিতে ভগবানকে লাভ করা সম্ভব নয়—এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তিনি ব্রাহ্মসতীর্থদের কল্যাণের জন্য শাস্ত্রীয় ব্রহ্মোপাসনার উপর বিশেষ জোর দিতে বলেন। ব্রাহ্ম অনুরাগীরা সদ্‌গুরুর সাধনপ্রাপ্তির পরবর্তী কালের গোস্বামী মহাশয়কে দেখে আরও মুগ্ধ হন।

১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে নবকুমার বাগচী মহাশয়কে গয়ায় আকাশগঙ্গায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি 'নাম' দিয়েছিলেন। পরমহংসজীর ঢালা নির্দেশ পেয়ে ১২৯২ সালের আশ্বিন মাসে ঢাকায় প্রচারক-নিবাসে গোস্বামী মহাশয় প্রথম যোগসাধন দীক্ষা দেন বরিশালের বানাড়িপাড়ার ব্রাহ্মভাবাপন্ন বি-এ পরীক্ষার্থী যুবক সত্যকুমার গুহঠাকুরতাকে।[১]

গোসাঁইজী কখনও ঢাকা কখনও বা কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের কাজ

---

[১] যোগমায়া গুহঠাকুরতা মহাশয়ার নিকট রক্ষিত খাতা অবলম্বনে।

করেন, আবার স্থানে স্থানে ব্রাহ্ম-উৎসবে যোগ দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন এবং দীক্ষাপ্রার্থীদের যোগসাধন দেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠার জীবন্ত মূর্তি, শরণাগতির বিগ্রহ, গোস্বামীপ্রভুর সারগর্ভ বক্তৃতা ও উপদেশে এবং তাঁর মুখে বার বার 'গুরুকরণ ব্যতীত ধর্মলাভ হয় না' একথা শুনে ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্ম অনুগামী ও সহযোগীরা অনেকেই একে একে তাঁকে গুরুপদে বরণ করে কৃতার্থ হন। আবার কেউ কেউ বা জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে অপ্রাকৃত প্রভাবে বা মহতের নির্দেশে তাঁর কাছে যোগসাধন দীক্ষা লাভ করে ধন্য হন।

বেদীতে বসে যখন গোস্বামীপ্রভু উপাসনা করেন তখন উপাসনা-মন্দির উৎসব-মুখর হয়ে ওঠে। ভক্তি-তরঙ্গে আগন্তুকেরা অধীর হয়ে উঠতেন। তাঁর সরস সারগর্ভ উক্তি শুনে সমাজ-গৃহের সর্বত্র উঠত ক্রন্দনের রোল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান সকল সম্প্রদায়ের দর্শনার্থীরা তাঁর দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ভগবানের নামের মহিমায় আত্মহারা হতেন। তাঁর আবেগময়ী প্রার্থনায় স্বর্গ যেন উপাসনালয়ে নেমে আসত। কীর্তনের সময় তাঁর শ্রীমুখনিসৃত হরিধ্বনিতে ব্রহ্মমন্দির প্রকম্পিত হয়ে খোল-করতালের ঐকতানে অপূর্ব রসসৃষ্টি করত। ব্রাহ্মধর্মের অসাম্প্রদায়িক ধর্মচেতনার স্বতঃসিদ্ধ উচ্ছ্বাস দেখে মনে হয়, এই সময়টিতে ছিল যেন ব্রাহ্মসমাজের সুবর্ণযুগ। দিন দিন উপাসক-সংখ্যা বেড়ে যায়। প্রচার-আশ্রমে ধর্মার্থীর ভিড় লেগেই থাকে। গোসাঁইজীর ভক্তি, ব্যাকুলতা, বিনয়, ধর্মানুরাগ দূর-দূরাঞ্চলের অধিবাসীদেরও প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। বেদীতে বসে অনেক সময় তিনি উপাসনার সময় দুবাহু বাড়িয়ে আগন্তুকদের পদধূলি চাইতেন। তিনি বলতেন, 'আপনারা আমার সহায় হউন। আপনারা প্রসন্ন হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন আমি বিনয়ী হতে পারি, যেন আমি প্রভুর আহ্বান শুনে সকল বন্ধন ছিন্ন করে তাঁর কাছে ছুটে যেতে পারি। আপনারা আমার মস্তকে পদাঘাত করে আমার অহঙ্কার চূর্ণ করুন।'

ভাবরাজ্যে আরও নিবিড় হয়ে পড়েছেন গোস্বামীপ্রভু। অগ্রহায়ণ ১২৯২ থেকে তিনি পূর্ব বাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরে যে সব বক্তৃতা দেন তার তুলনা নেই। তাঁর এই সময়কার ভাষণগুলির কিছু কিছু 'বক্তৃতা ও উপদেশ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়েছে।

প্রথম দুটি বক্তৃতা এখানে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে—

১। উপদেশ

তুলসীদাসের রামায়ণে লিখিত আছে, যখন রাবণ অত্যন্ত অত্যাচার ও উৎপাত আরম্ভ করিলেন, তখন পৃথিবী সেই অত্যাচার সহ্য করিতে অক্ষম হইলেন। আমরা এখন যেমন উল্কাপাত, মহামারী প্রভৃতি দেখিতেছি, তখনও এইরূপ সমস্ত উপদ্রব দেখিয়া লোকের বড়ই ভয় হইয়াছিল। কথিত আছে যে, পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়া দেবতাদিগের নিকট গমন করিলেন এবং আপনার অবস্থা জানাইয়া তাঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তখন দেবতারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে, সকলে একত্র হইয়া মহাবিষ্ণুর নিকট যাইবেন; তিনি ভিন্ন এই সংকটে পরিত্রাণের আর কেহই নাই। তাঁহারা এই সুস্থির করিয়া, কোথায় গেলে মহাবিষ্ণুর সাক্ষাৎ পাইবেন, সেই বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কোথায়

তিনি থাকেন? কেহ বলিলেন, 'গোলোকে চলুন, সেখানে গোলোকবিহারীর সাক্ষাৎ পাইব;' কেহ বলিলেন, 'পাতালে বলির দ্বারে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে;' কেহ বলিলেন, 'মথুরায় গেলে তাঁহার দেখা পাইব।' এইরূপে দেবতারা এক এক জনে এক এক মত প্রকাশ করিয়া, প্রকৃতপক্ষে কোথায় গেলে যে দেখা হইবে, এই বিষয়ে সকলেই চিন্তিত হইলেন। এমন সময় শিব বলিলেন, 'দেবগণ! তোমাদের এই মোহ কেন উপস্থিত হইল? তোমরা এত ভ্রান্ত হইলে কেন?' তখন দেবগণ শিবকে বলিলেন, 'আপনি মহাযোগী, আপনি কৃপা করিয়া বলুন, আমরা কোথায় গেলে সেই মহাবিষ্ণুর সাক্ষাৎ পাইব।' শিব বলিলেন, 'আমরা যাঁহার উপাসনার জন্য যাইতেছি তিনি সর্বদা সর্বস্থানে থাকেন; যে তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে, সেই তাঁহাকে সর্বত্র দেখিতে পায়। অন্তরে উপলব্ধি না করিলে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া কোথায়ও পাওয়া যায় না।'

এই যে আখ্যায়িকাটি শুনিলাম, ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন চারিদিকে উল্কাপাত, মহামারী প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যখন এই সংসারে রোগ, শোক, জ্বালা-যন্ত্রণাদি নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হয়, তখন ভ্রম হয়, নানা প্রকার মোহ উপস্থিত হয়; তখন মনুষ্যগণ সুস্থিরভাবে কাজ করিতে পারে না। কেননা যতদিন আরাধ্য বিষয়ে দৃঢ়তা না জন্মে, ততদিন সকল সময়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না; একটুকু ভয়ে, একটুকু বিপদে পড়িলেই দিশাহারা হয়, আর আপনার দেবতাকে অন্বেষণ করিয়া পায় না। শিব যে দেবতাকে আরাধনা করিতেন, তাঁহাতে তিনি এতদূর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে, কোনপ্রকার বিপদেই তাঁহার সেই বিশ্বাস বিন্দুমাত্র বিচলিত হইত না; ইহারই নাম বিশ্বাসের দৃঢ়তা। আমাদের অন্তঃকরণকে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, যিনি আমার আরাধ্য দেব, যিনি আমার অবলম্বন, তিনি সর্বত্র আছেন, ইহা কি আমি গ্রন্থে অথবা উপদেশ শুনিয়া বিশ্বাস করি, না—ইহা আমি প্রকৃতই প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিতেছি? উল্কা-আদি বিপদ চিহ্ন দেখিয়া লোকের মন যে ভীত হয় সন্দেহ নাই, চারিদিকে যখন বিপদ উপস্থিত হয় তখন ধর্মকে ঠিক রাখা সুকঠিন; কিন্তু আমি যাহাকে প্রকৃত নিষ্ঠা বলি, তাহাকে ঠিক রাখা যাইতে পারে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কথা একবার মনে করুন—দ্রৌপদীর কিরূপ বিপন্ন অবস্থা! কোথায় বল-ভরসা? মহাবল পান্ডবেরা মুখ তুলিলেন না; তাঁহাদিগের এতদূর নিষ্ঠাভক্তি যে, সহধর্মিণীকে সভামধ্যে এই প্রকার অপমান করিতেছে, ইচ্ছা করিলে, তখনই দুষ্টদিগকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিতে পারিতেন, কিন্তু সমস্ত শক্তি সত্ত্বেও ধর্মনিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য এত অপমান সহ্য করিলেন; ইহারই নাম ধর্মনিষ্ঠা!! নিরাশ্রয়া অবলা ভীষ্মের মুখের দিকে চাহিলেন। ভীষ্ম বলিলেন, 'মা! আমি ধর্মের গতি বুঝিতে পারিলাম না!!' দ্রোণও ঐ একইরূপ উত্তর করিলেন। তখন দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তিনি রাজসূয় যজ্ঞে মহারানী হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, মানবজন্মে নারীকুলে আমার সমান কে আছে? এই যে অভিমান জন্মিয়াছিল, সেই অভিমান চূর্ণ হইল। এখন দেখিলেন তিনি সহায়শূন্যা, নিতান্ত নিরাশ্রয়া; অমনি তাঁহার প্রাণের মধ্য হইতে রব উঠিল, 'দীননাথ, দীনবন্ধু! তুমি কোথায়?' অমনি তাঁহার মস্তকের উপর 'মাভৈঃ' 'মাভৈঃ' রব হইল, লজ্জানিবারণ পরে লজ্জা রক্ষা করিলেন। যদি এইরূপ বিশ্বাস থাকে, নিষ্ঠা থাকে, তবেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। আমার দেবতা কোথায়? সমাজে, কি মাঠে, কি ঘাটে,

না প্রাণের মধ্যে? প্রাণের মধ্যে ডাকিলে যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, সে বিশ্বাস কি আছে? যদি এ বিশ্বাস স্থির না থাকে, তবে সে নিষ্ঠাভক্তি কি? যখন বিবেক বিচ্ছিন্ন হয়, জ্ঞানও বিকল হয়, তখন যদি তাঁকে ডাকিতে পারি, তবেই তো প্রকৃত বিশ্বাস।

যিনি ধনী ছিলেন, তিনি যদি হঠাৎ দুরবস্থায় পড়েন, তবে কোন ভাই-ভগ্নী, রাজা-প্রজা, কীট-পতঙ্গ, কে তাঁহাকে সাহায্য করে? কেহই না; কেবল আপনার দুঃখে আপনি মরেন, কেহই সাহায্য করে না; কেবল একজনই আছেন—সেই দীনবন্ধু, দীননাথই সে সময়ে একমাত্র দুঃখীর সাহায্যকর্তা। এ সংসারে কেহ বা রাজদ্বারে কেহ বা লোকসমাজে লাঞ্ছিত হইতেছে, কে তাহাকে রক্ষা করে? কেহ না। যখন ভাল সময় থাকে, তখন অনেকে সাহায্য করে; অসময়ে কেহই নয়; ধনী মনে করেন, নিকটে গেলে পাছে বা টাকা চায়; যাহারা চিরদিন বাধ্য ছিল, তাহারাও নিকটে যায় না। যিনি বড় ধার্মিক বলিয়া সকলের পূজ্য, আজ যদি তাঁহার পদস্খলন হয়, কেহ তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না; আরও কত লাঞ্ছনা করিবে। ধর্ম, অর্থ, রাজশক্তি, সময়েতে সাহায্য করে, অসময়ে পারে না। সমস্ত শাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছে যে, যাহারা পৃথিবীর শক্তির উপর নির্ভর করে, তাহারা অন্ধ। কেবল একমাত্র সহায় দীননাথ, কাঙ্গালশরণ, তিনিই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। তাই বলি, তাঁকে যদি বিপদে, সম্পদে, ডাকিতে না পারি, তবেই আমরা দুঃখী। যদি প্রাণের মধ্যে সর্বদা দেখিয়া বলিতে পারি, 'এই তো মা—আমার মা; দেখহে জগৎবাসী! আমার প্রাণের মধ্যে মা-আনন্দময়ী বিরাজ করিতেছেন;' তবেই তো সুখী হইব; নইলে, যদি কথায় বলিয়া প্রাণে না পাই, তবে আমার মত দুঃখী কে?—নিরাশ্রয় কে? এই জন্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব, মা প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন কিনা? পুস্তকে কি উপদেশে শুনিয়া নয়, আমি নীচ, অধম, সামান্য, তবু আমার প্রভু পরমেশ্বর, এ কথা ভাবিলে আনন্দের আর সীমা থাকে না। আমি কেমন করে 'না' বলব? খুব দেখেছি, নিশ্চয় করেছি, আমার প্রভু পরমেশ্বর। সত্য সত্য বলি, আমি যেমন 'আমার' বলে তাঁকে বলতে পারি, এমন আর কাহাকেও পারি না। আপনাদের সকলের নিকটে আমি ভিক্ষা করি, আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমার প্রভুকে যেন আমি প্রেম-ভক্তি করিতে পারি। তাঁহাকে কেমন করিয়া ভক্তি করিব, কিছুই জানি না।

প্রভু হে দীননাথ দীনবন্ধু! 'তুমি সত্য', আমি আর কিছুই জানি না, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য![1]

২। উৎসবে উপদেশ

রাম বনবাসে গেলেন; ভরত নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যায় আগমন করিলেন। আসিয়া শ্রবণ করিলেন, রাম বনে গমন করিয়াছেন ও পিতার মৃত্যু হইয়াছে। ভরত শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কৈকেয়ী মনে করিয়াছিলেন, ভরত আপনার রাজ্যপ্রাপ্তি-শ্রবণে, অতিশয় সন্তোষ লাভ করিবেন; কিন্তু তাহা হইল না, ভরত

---

[1] ১. পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা ও উপদেশ'। ১৫ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১২৯২।

অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন এবং কৌশল্যার নিকট সকল সংবাদ শ্রবণ করিয়া, আপনার মনের ভাব তাঁহাকে জানাইলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি অমাত্যবর্গ তাঁহাকে রাজ্যগ্রহণে অনুরোধ করিলেন; ভরত কোনমতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি কৌশল্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গ সঙ্গে লইয়া শ্রীরামদর্শন-অভিলাষে চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীরামের বন্ধু গুহকচণ্ডাল শুনিতে পাইলেন, চতুরঙ্গ সৈন্য-সঙ্গে ভরত আসিতেছেন; গুহকের মনে সন্দেহের উদয় হইল; তিনি আপনার নিষাদ সৈন্য-সমস্তকে একত্র ও সজ্জিত করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'ঐ দেখ, ভরত, আমার বন্ধু রামচন্দ্রকে বিনষ্ট করিবার জন্য যাইতেছে; অতএব তোমরা সকলে, উহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমার বন্ধুকে রক্ষা কর।' এইরূপে গুহক যুদ্ধসজ্জা করিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ বলিলেন, 'হে গুহক! তুমি অবিবেচকের ন্যায় কার্য করিতেছ কেন? ভরত কি উদ্দেশ্যে গমন করিতেছেন, অগ্রে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ; তুমি যাঁহার সখা, ভরত তাঁহারই ভ্রাতা; অতএব তাঁহার সহিত অনর্থক যুদ্ধ করা কোনরূপেই উচিত নহে।' এই বৃদ্ধের কথা ভাল বিবেচনা করিয়া, গুহক ভরতের নিকটে গমন করিলেন। বশিষ্ঠ ভরতকে বলিলেন, ঐ শ্রীরাম-সখা গুহক আসিতেছেন; অমনি ভরত দূরে থাকিতেই রথ হইতে অবতরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া গুহককে অভিবাদন করিলেন এবং রামকে যেরূপভাবে দেখেন, সেইরূপ প্রেমভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ভরত অত্যন্ত রোদন করিলেন এবং 'আমার প্রভুর এত কষ্ট!' এই বলিয়া কত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন; গুহককে বলিলেন, 'আপনার এখানে কোথায় রাম ছিলেন, কোথায় তিনি বসিতেন, কোন্ পথ দিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত আমাকে বলিয়া দিন।' ভরত যে যে স্থলে রামের পদচিহ্ন দর্শন করিলেন সেই সেই স্থলে প্রণাম করিলেন এবং রামের নাম উচ্চারণপূর্বক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন গুহক বুঝিতে পারিলেন, ভরত সদ্‌ভাবেই রাম-অন্বেষণে যাইতেছেন। ভরত গঙ্গা পার হইয়া পদব্রজে চলিলেন; সকলে তাঁহাকে যানারোহণে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'আমার প্রভু, যিনি রাজ্যেশ্বর রাজা, তিনি পদব্রজে গমন করিয়াছেন, আমি কি যানারোহণে যাইতে পারি?' গুহক দেখিলেন, সমস্তই অতি সদ্ভাবের লক্ষণ। ক্রমে সৈন্যসকল পার হইল; ভরত পদব্রজে চলিলেন।

তুলসীদাস এ কথায় অতিচমৎকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্য যে পর্যন্ত সংসারে প্রবেশ না করে, সে পর্যন্ত অতিপবিত্র থাকে। যিনি কখনও কোন কুকার্য করেন নাই, কখনও কুসঙ্গে চলেন নাই, ধর্মকেই যিনি এতকাল শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া আসিতেছেন, ক্রমে তিনি সংসারে প্রবেশ করিলে তাহার কুমতি আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, 'আমি তোমার ধর্মকে রাজা করিতে দিব না, আমার সংসারকেই রাজা করিতে হইবে।' তখন সেই কুমতি-বশীভূত জীব, সংসারকেই রাজা করিয়া ধর্মকেই দূর করিয়া দেয়; কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্মার্থী, তিনি এই অবস্থায় কুমতির কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলেন 'আমি স্বয়ং কখনও রাজা হইব না, আমার প্রভুকেই রাজা করিতে হইবে, তাঁহার পরিবর্তে আমি সংসারকে কখনই রাজত্ব প্রদান করিব না।' এইরূপে সেই জীব যখন ধর্মান্বেষণে বাহির হন, তখন রাস্তায় যে সাধুভক্ত দেখিতে পান, তিনি যদি চণ্ডালও হন, তথাপি তিনি অতিপূজনীয়, সুতরাং রথ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। 'সংসারের লোক,

ধর্মকে নষ্ট করিতে যাইতেছে, সংসারের বিড়ম্বনা দেখিয়া—জাঁকজমক দেখিয়া, বোধহয় ধর্মকে তাড়াইতে যাইতেছে, নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়া আসিতেছে।' এই ভাব মনে করিয়া তখন সেই সাধুভক্ত চিন্তিত হন এবং যাহাতে ঐ সংসারী ধর্মকে নষ্ট করিতে না পারে, সেইজন্য সজ্জিত হন। কিন্তু সংসারীর মধ্যেও ধার্মিক আছেন; সেই ধার্মিক যদি রাজাও হন এবং দাসদাসী-অশ্বরথে পরিপূর্ণও হন, তথাপি ধর্মের অন্বেষণে চণ্ডালের নিকট যাইতে হইলে, রথ হইতে নামিয়া 'কোথায় আমার প্রভু,' 'কোথায় তিনি থাকেন', 'কোথায় তিনি ছিলেন?'—এই বলিয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে থাকেন। তখন সেই সাধুর বিশ্বাস হয়, সংসারীর মধ্যেও ধার্মিক আছেন এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দাস, তিনি রাজাই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, ভদ্র বা চণ্ডালই হউন, সাধু বলিয়া সকলেরই আদরণীয়। ভগবানের প্রতি যাঁহার ভালবাসা, তিনিই কেবল শ্রেষ্ঠ; তাঁহাকে যদি কেহ বলে, 'তুমি রাজা হও', তিনি বলেন, 'আমি প্রভুকে ছাড়িয়া কখনই রাজা হইব না; আমি ভিক্ষা করিয়া খাইব, তথাপি আমার সংসারে আমি তাঁহাকেই রাজা করিব, আমি এ সংসারে তাঁর দাস হইয়া থাকিব।' এইরূপ যিনি ভক্ত, তিনি প্রভুকে ছাড়িয়া রাজা বা ধনী হইতে চান না, তাঁহার পূজায়, তাঁহার সেবায়ই সুখ—তাঁহার আনন্দেই প্রকৃত আনন্দ অনুভব করেন।

সংসারে থাকিয়া যে ধর্ম করা যায়, তুলসীদাস রামায়ণে তাহাই দেখাইয়াছেন। ভরতরূপ-ভক্ত, প্রভুর জন্য সকল ত্যাগ করিলেন—সূর্যবংশে দশরথের পুত্র—অতুল সম্পদের অধিপতি হইয়াও সমস্ত ত্যাগ করিলেন। সেই ব্যক্তিই এসব ত্যাগ করিতে পারেন, যিনি চিনিয়াছেন, জানিয়াছেন, আপনার প্রভুকে বুঝিয়াছেন; তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুই উপভোগ করিতে পারেন না। তাঁহাকে যদি কেহ বলে 'তুমি ধনী হও, বড় হও, রাজা হও', তিনি বলিবেন, 'না, আমি কিছুই হইব না; আমার প্রভু রাজা, তিনি আমার সিংহাসনে বসিলেই আমার প্রকৃত শোভা ও সুখ, নতুবা আমার সুখ কি?' তুলসীদাস এই দৃশ্য ভরতকে দিয়া দেখাইয়াছেন। যতদিন রামকে ফিরাইয়া আনিতে না পারিলেন—সিংহাসনে বসাইতে না পারিলেন, ততদিন কি করিলেন? না, প্রভুর ন্যায় বেশভূষা, আহারবিহার করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ প্রভুর প্রতীক্ষায়, তাঁহার অনুকরণে চরিত্র গঠন করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরকে লাভ করিতে হইলে, নিজের চরিত্রকে তাঁহার অনুরূপ গঠন করিতে হয়। ভরতের মনে হইল, 'প্রভু বিনা আমার সুখ কি? আমার সংসারে প্রভুর আদর নাই, আমার সুখ কি? আমার আহার কি? আমার প্রভুকে তোমরা তাড়াইয়াছ, তবে আমাকেও সেই দিকে তাড়াইয়া দাও।' বাস্তবিক যদি ভক্ত দেখেন যে তাঁর ঘরে প্রভুর আদর নাই, তবে আর তাঁহার কোন বিষয়েই সুখ থাকে না। তিনি বলেন, 'কেন তোমরা তাঁহাকে দূর করিয়াছ, তিনি বিনে আমার সুখ কি?' তাঁহার আর আনন্দ থাকে না, সুখ থাকে না। যতদিন সেই প্রাণের প্রভুকে না পাওয়া যায়, ততদিনই তাঁহার বৈরাগ্য। এইরূপ আমার প্রভুকে যদি আমি সংসারের রাজা না করিলাম, তবে আমার সুখ কি? পরমেশ্বর কি কেবল বনে? যিনি অস্থিতে অস্থিতে সমস্ত শরীরে বাস করিতেছেন, আমি কোন প্রাণে বলিব, তিনি বনে। দেখিতে হইবে, আমার সংসারে তাঁহাকে রাজা করিয়াছি কিনা?—দেখিতে হইবে, যিনি আমার প্রভু, তাঁহার সঙ্গে আমি কিরূপ ব্যবহার করি? 'প্রভু, আমার রাজ্যে রাজা নহে', অথচ যদি আমার সুখে নিদ্রা আসিল, তবে কেমনে বলিব তাঁকে

ভালবাসি ? যদি ভরতের মত হইতে পারি, তবেই তাঁহাকে ভালবাসি। আমি কি এ কথা বলিতে পারি ? আমার প্রভুর—চরাচরের দেবতার অপমান হইতেছে, এ কি সহ্য করিতে পারি ? মাতা-পিতা-গুরুজনের নিন্দায় প্রাণ দগ্ধ হয়, কিন্তু আমার প্রভু পরমেশ্বর, তাঁহাকে যদি কেহ অপমান করে—রাজত্ব না দেয়, তাড়াইয়া দেয়, তাহাতে যদি আমার দুঃখ না হয়, তবে কিসের তাঁহাকে ভালবাসি ?

সংসারে থাকিয়া ধর্ম হয়, চিরকাল হইয়াছে—এখনও হইতেছে। এই শরীরই সংসার; এই সংসারে যদি তাঁকে রাজা করিতে পারি, তবেই তো সুখ। আমি কি বলিব ? সংসারে যদি তাঁর সম্মান না দেখি, তবে সুখ-সৌন্দর্য কোথায় ? অযোধ্যা যেমন রাম-বিহনে শ্মশান হইয়াছিল, সংসারও তাঁহার বিহনে তাহাই হয়; নতুবা প্রভুর গৌরব কি ? 'প্রভুকে ফেলিয়া সিংহাসনে বসিলাম—আমার স্বার্থ—আমার সুখ রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ হইল; একটুকু অপমান কি দুঃখ, ধর্মের জন্য সহ্য করিতে পারি না', ইহা পৃথিবীর রাজত্ব, তাঁর রাজত্ব নয়। যেখানে তাঁহার রাজত্ব, সেখানে স্বার্থত্যাগ। যেখানে কেবল আমার সুখ রক্ষার জন্য প্রভুকে ত্যাগ করিতে হয়, দেখিতে হয় সেখানে আমি কি করি ? সংসার কি ? পরমেশ্বরে যে বহির্মুখতা—তাহাই সংসার; টাকা-কড়ি, স্ত্রী-পুত্র, সংসার নয়—পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থের পূজা—তাঁহার অনাদর; এই সংসার। এই সংসার—আমিই সৃষ্টি করি। যদি আমার মনে প্রকৃত ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে অতিক্রম করিতে পারে, কাহার সাধ্য ? যদি অতি হীন, নীচ, নরাধম, চণ্ডালও হই, তবু পৃথিবীর রাজাও আমাকে বাধা দিতে পারে না। 'প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তবেই সংসারে ধর্ম হইবে। তুমি রাজা, তুমি প্রভু, তুমি আমার হৃদয়সিংহাসনে বসো।' যে ব্যক্তি এইরূপে প্রভুকে রাজত্ব দেয়, তাঁহার সঙ্গে কেহই পারে না, কেহ চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয় না, সমস্ত পার্থিব শক্তি একত্র হইয়াও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে না; সংসারের শক্তি—ছায়াবাজী, সমস্তই স্বপ্নের ন্যায়; স্বপ্নে যেমন ব্যাঘ্রাদি দর্শন হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের কোন শক্তি নাই, সংসারের শক্তিও সেইরূপ, রজ্জুকে সর্পজ্ঞান—সকলই ধোঁকার টাটি। একবার যদি বোধ হয়, এসব কিছু নয়—কেবল একবার যদি প্রকৃত বোধ হয়, তবে সেই চরাচরের রাজারই জয় হয়। এইরূপে একবার যদি হৃদয়ে তাঁহাকে বসাইতে পারি, তবেই সংসারে জয়, তখন সংসারই ধর্ম। সংসারে ধর্ম দেখলে হৃদয় ও চক্ষু তৃপ্ত হয়। যে সংসারে সমস্ত দিন তাঁহার উপাসনা, পূজা, নাম-গান হয়, সেই সংসারই ধন্য! সেই সংসারই সুখের। সে-ই সৌভাগ্যশালী, যাহার সংসার এইরূপ। এইরূপ সংসার করিতে হইবে—কেবল কথাতে নহে, চিন্তাতে নহে, কল্পনাতে নহে; যদি তাঁহাকে প্রাণের সহিত রাজা করিতে পারি, তবেই সংসার—ধর্মের সংসার। আমার প্রভু পরমেশ্বর, আমার সংসারের রাজা, এ দেখতে পেলেই জীবন সফল। আমাদের সংসার—ধর্মের সংসার হউক, পরিবারে পরিবারে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক। জয় প্রভু! জয় রাজা!! জয় রাজা!!! জয় প্রভু! জয় রাজা!! জয় মহারাজা!!! জয় মহারাজা!!! তোমারই জয়, তোমারই জয়!!! তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য!! তোমারই শরণাপন্ন হই।[১]

ঢাকা বিক্রমপুরের তেজপুর রশুনিয়া গ্রামের নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ শ্যামাকান্ত

---

[১] পূর্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত 'বক্তৃতা ও উপদেশ'। ২১ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১২৯২

চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে মানিকদহ স্কুলে পনর বছর ধরে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নিষ্ঠায় ও তেজস্বিতায় মুগ্ধ হয়ে মানিকদহের উচ্ছৃঙ্খল জমিদার বিপিন রায়ও ব্রাহ্ম হন। ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা এসে গোস্বামীপ্রভুকে দেখে তাঁর মনে হয়, তিনি পূর্বপরিচিত আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নন; আর কেউ। তাঁর তখন দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, গোস্বামীপ্রভু ধর্মরাজ্যের তুঙ্গে আরোহণ করে ব্রহ্মতেজে উদ্ভাসিত হচ্ছেন। ১৯ অগ্রহায়ণ (১২৯২) তিনি তাঁর কাছে যোগসাধন দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর মত জ্ঞানী, গুণী নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মকে দীক্ষা নিতে দেখে অন্যান্য ব্রাহ্মগণ বিস্মিত হন। অল্পকালের মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখে যোগসাধনে অনেকে প্রেরণা পান।[1]

পণ্ডিত মহাশয়ের দীক্ষালাভের পরদিন যোগমায়া দেবী গোস্বামীপ্রভুকে বলেন, 'আমি কি সাধন পাব না?' গোস্বামীপ্রভু সহাস্যে বললেন, 'চাইলেই ব্যবস্থা হবে।' যোগমায়া দেবীর আন্তরিক ইচ্ছায় সেইদিনই তাঁর সাধন হয়। যোগমায়া দেবীর সাধন হল। সাধন হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চৈতন্যশক্তি লোপ পায়। এজন্যই প্রাণায়াম-পদ্ধতি তাঁকে পরে শিখে নিতে হয়েছিল। চেতনালাভের পর যোগমায়া দেবী বলেন, 'মন্ত্র কানে যেতেই পাকা দাড়ি, লাল মুখ বৃদ্ধকে দেখি, যাঁকে একবার শান্তিপুরে সিঁড়ির পাশে দেখে ভয় পেয়েছিলাম।'

তাঁর কথা শুনে গোসাঁইজী বললেন, 'তুমি ভাগ্যবতী। ইনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। তিনি তোমার শক্তিসঞ্চারে সহায় হলেন।'

ঐদিনই কুঞ্জলাল নাগেরও দীক্ষা হয়। কয়েকদিন পর শান্তিসুধা ও প্রেমসখী পিতার নিকট সাধন পান। এই সময়েই গোসাঁইজী একবার সমাজের উৎসবে বর্ধমান যান। যোগজীবন সঙ্গে গিয়েছিলেন। বর্ধমান মহারাজের নন্দনকাননের শিবমন্দিরের ভিতর তিনি পিতার কাছে সাধন পান।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে শ্রীধর ঢাকায় এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখেই গোসাঁইজী বললেন, 'এস শ্রীধর, গুরুজী আদেশ করেছেন তোমাকে সাধন দিতে।' তখনই সাধন হয় শ্রীধরের। সাধন পেয়ে তিনি গোসাঁইজীকে দেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। মাথা তুলে দেখেন তাঁর সামনে ষড়ভুজ রূপ প্রকট. শ্রীধর লুটিয়ে পড়েন তাঁর পায়। আর একদিন প্রণাম করে চোখ মেলে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম; পলক পড়তেই দেখেন গোস্বামীপ্রভু।[2]

ঢাকা প্রচারক-নিবাসে সমাধি অবস্থায় গোসাঁইজী জানতে পারেন, এক মহাসাধক বারদীতে আত্মগোপন করে আছেন। সাধনবৈঠকে একদিন গোসাঁইজী আনন্দাপ্লুত চিত্তে বলে উঠলেন, 'জয় রামকৃষ্ণ পরমহংস', 'জয় লোকনাথ ব্রহ্মচারী'। অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের বাড়ী বারদী গ্রামে। তাঁর কাছ থেকেই গোসাঁইজী জানতে পারেন. বিগত পঁচিশ বছর ধরে ব্রহ্মচারী মহাশয় গ্রামে আত্মগোপন করে আছেন। কুঞ্জলালবাবুর নিকট হতেই গোসাঁইজীর কথা শুনে তাঁকে ব্রহ্মচারী মহাশয় বলেছিলেন, 'গোসাঁই এত কাছে আছেন, তা আমাকে এসে একবার দর্শন দেবেন না? তিনি না এলে, আমাকেই তাঁর কাছে যেতে হবে। ভাল লোক বলে মনে হচ্ছে। আত্মিক সম্বন্ধও কিছু থাকতে পারে! কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে,

---

[1] মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয়ের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে।

[2] ঐ

নইলে তাঁর জন্য আমার মন এত টানছে কেন?' কুঞ্জলালবাবুর মুখে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের এই কথা শুনে অন্তরঙ্গ ভক্তজনসহ গোস্বামীপ্রভু ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে সপরিবারে বারদী যান। গোসাঁইজীকে প্রথম দর্শনেই ব্রহ্মচারী মহাশয় বলে উঠেন, 'আমাকে চিন্‌তে পারিস্‌? চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সেই দাবানলের কথা স্মরণ আছে তোর?' গোসাঁইজী সেকথা ভোলেন নি, ভুলতে পারেন না। তবে ব্রহ্মচারী মহাশয়ই যে সেদিন তাঁকে করুণাময়ের অশেষ কৃপায় সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন, তা তিনি নিজে ব্যক্ত না করলে হয়ত কোনদিনই গোসাঁইজী সে-কথা জানার সুযোগ পেতেন না। ব্রহ্মচারী মহাশয় অদ্বৈতবংশের সন্তান এবং সম্পর্কে তিনি তাঁর পিতামহের খুড়ো, এ পরিচয়ও গোসাঁইজী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট থেকেই জানতে পারেন। এ সময়ে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বয়স ১৫৬ বৎসর। পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তিনি গোসাঁইজীকে বিরাট একজোড়া খড়ম ও একখানি কম্বল উপহার দেন। গোসাঁইজী আনন্দের সঙ্গে ভক্তিযুক্তচিত্তে এই আন্তরিক উপহার মাথায় তুলে নেন।

শিশুর মত সরল লোকনাথ ব্রহ্মচারী, তিনি সম্পর্কের সূত্র ধরে যোগমায়া দেবীকে আবদার করে বলেন, 'ছোট শিশুর মত মনে করে আজ আমাকে তোমায় খাইয়ে দিতে হবে।' যোগমায়া দেবীও পরম আন্তরিকতার সঙ্গে সে হুকুম তামিল করেছিলেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। একদিন তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোসাঁইজী বলেছিলেন, 'ব্রহ্মচারীর চোখে পলক নাই। পাঁচ মিনিট তাঁর চোখের দিকে তাকালে, মূর্ছা যাবে। তিব্বত, হিমালয় থেকে প্রাচীন যোগীরা তাঁর কাছে যোগ শিখতে আসেন। তাই সূর্যাস্তের পরই ঘরের দরজা বন্ধ করেন।'

গোসাঁইজীকে দেখিয়ে বারদীর আখড়ার মহান্তকে ব্রহ্মচারী মহাশয় বলেন, 'তোমাদের গৌরাঙ্গ চলতে ফিরতে পারেন না, অচল। আর এই দেখ, আমার সচল গৌরাঙ্গ!' গৌরভক্ত উত্তরে বলেন, 'আমাদের গৌরাঙ্গ ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন।' ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মুখ বাগিয়ে হাসতে হাসতে বলতে থাকেন, 'আর আমার গৌরাঙ্গ সকলের সঙ্গে কথা বলেন।'

ব্রহ্মচারী মহাশয় গোসাঁইজীকে 'জীবনকৃষ্ণ' বলে ডাকতেন। প্রতিদিন শেষ রাত্রে, 'জীবনকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ, প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ' এই পদ গেয়ে গেয়ে কেঁদে আকুল হতেন।

ইষ্টপ্রসঙ্গে গোসাঁইজীর অত্যাধিক তন্ময়ভাব অনেক সময় সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াত। তাঁর এই অতি-প্রাকৃত অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ লোক সব সময় সুবিচার করতে পারে নি। তারা না জেনে, না বুঝে অনেক সময় অনেক কটূক্তি করত। সদ্‌গুরু লাভের পরও তাঁকে অনেকে 'ভ্রান্ত' ও মতিচ্ছন্ন বলে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। এই জাতীয় লোক কেউ কখনও যদি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কাছে গোসাঁইজী সম্পর্কে কোন কিছু বলতে গেছে, তাহলে আর তার রক্ষা থাকত না। ভীষণ রেগে যেতেন তিনি গোসাঁইজীর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলেই। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কাছে দীক্ষা প্রার্থনা নিয়ে গেছেন এমন অনেককেই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন বিজয়কৃষ্ণের কাছে। তিনি স্পষ্টতই বলতেন, 'এখন শুধু বিজয়কৃষ্ণের উপরই সাধন দেওয়ার ভার। তিনিই এখন সদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ।' এমনি একদিন দীক্ষাপ্রার্থনা নিয়ে গিয়েছিলেন শ্যামাচরণ বক্সী এবং বিপিনচন্দ্র

রায় ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট। তাঁদের তিনি অনেক সদুপদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন গোসাঁইজীর কাছে, গোসাঁই যেন তাঁদের কৃপা করেন।

ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রচারক বিজয়কৃষ্ণকে শ্যামাচরণবাবু ভালভাবেই চিনতেন, কিন্তু সে চেনা আর এবারের চেনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এবার তিনি দেখেন গোসাঁইজীর আরেক রূপ। তিনি ছিলেন বিপ্লবী ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মণকুলে জন্মে অসবর্ণ বিবাহ পর্যন্ত করেছিলেন। মেয়েদের স্কুলে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। গোস্বামীপ্রভুর কাছে যোগসাধন নিয়ে এক অপূর্ব শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রকাশ হল তাঁর মধ্যে। গুরুর কাছে চান পাদোদক; গোসাঁইজী আমলই দেন না। তাই এর পর থেকে রাতে ঘুমোবার আগে পাদোদক প্রার্থনা করে শিয়রের কাছে তিনি খালি একটি বাটি রেখে দিতেন; ভোরে উঠে রোজই দেখতেন বাটিতে পাদোদক রয়েছে!

শরৎকামিনী বসু, কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের বোন। তিনি পুত্রশোকে পাগলিনী-প্রায় দেখে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহধর্মিণী তাঁকে পাঠিয়ে দেন গোসাঁইজীর কাছে। গোসাঁইজীকে দর্শন করে এবং তাঁর উপদেশ শুনে শরৎকামিনী দেবীর শোকের জ্বালা জুড়িয়ে যায়। কিছুদিন পর তিনি গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন গ্রহণ করেন। স্বামী কামিনীমোহন বসু ছিলেন বিলাত-ফেরৎ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তিনি স্ত্রীর সদাচার নিয়ে নানা কটাক্ষ করতেন। নিজে সংগীতরসজ্ঞ হলেও তিনি ছিলেন কীর্তন-বিরোধী। অথচ একদিন গৃহে ফেরার পথে, এই কীর্তনের সুরই তাঁর কানে সুধাবর্ষণ করে। কিছুদিন যাবৎ স্ত্রীর মধ্যেও তিনি লক্ষ্য করছিলেন ভাবান্তর, যেন দিনে দিনে শরৎকামিনী দেবীর আলাপ-আচরণ আরও সুন্দর, আরও মধুর হয়ে উঠছে। এতে গোস্বামীপ্রভুকে দর্শনের একটা অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা জাগে তাঁর মনে। একদিন তিনি স্ত্রীকে নিয়ে গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন করতে যান। গোস্বামীপ্রভুর ভাবগম্ভীর অপ্রাকৃত রূপ, তাঁর কথা, তাঁর প্রভাব কামিনীবাবুকে মুগ্ধ করে। কিছুদিনের মধ্যেই আবার তিনি গোস্বামীপ্রভুকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হন। প্রথমবার কোট-প্যাণ্ট পরে গিয়েছিলেন, এবার কিন্তু নিজেই বাজার থেকে ধুতি-পাঞ্জাবী কিনে এনে তাই পরে যান এবং গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন করে সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাতপূর্বক কাতর হয়ে করজোড়ে বলেন, 'আমার স্ত্রীকে আপনি যে দিব্যসম্পদ দান করেছেন, তা কি আমি পেতে পারি না?' উত্তরে গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'স্ত্রী যখন পেয়েছেন, তখন আপনিও পাবেন।' গোস্বামীপ্রভু তাঁকে স্নান করে আসতে বলেন। অন্য কোন বস্ত্র তাঁর সঙ্গে ছিল না। সিক্তবসনে সাধন নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরেন। অল্প দিনের মধ্যেই কামিনীবাবু আর এক মানুষ হয়ে উঠলেন। ক্রমে অশ্রু, পুলক ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাববিকার দেখা দিল তাঁর মধ্যে। কুঞ্জ ঘোষেরও এই সময় সাধন হয়।

১২৯২ সালের মাঘোৎসবে ফিকিরচাঁদ (কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার) কীর্তনের দল নিয়ে ঢাকায় এসে গোসাঁইজীর সঙ্গে মিলিত হন। গোস্বামীপ্রভুর জীবন্ত উপাসনা দেখার জন্য, আর ফিকিরচাঁদের গান শোনার জন্য ব্রহ্মমন্দিরের চাতাল ও প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। প্রবেশপথেও লোক বসে। তিলধারণের জায়গা নেই। বেদীতে বসে প্রভু উপাসনা শুরু করেন। কি যে মনোরম তাঁর কথা বলার ভঙ্গী; অমৃতবর্ষণ—আনন্দম্। প্রতিটি কথা যেন প্রেরণার উৎস। আচার্য, উপাসক, দর্শক, শ্রোতা সকলেরই চোখের জলে বুক ভাসে। প্রভুর চোখের সামনে আবার ভেসে

ওঠে সেই সর্বধর্মসমন্বয়ের দৃশ্য। কীর্তন আরম্ভ হতেই কান্নার রোল ওঠে। এ যেন পাষাণ-গলা গৌরলীলার পট-পরিবর্তন। অনেকে যোগসাধন প্রার্থনা করেন। কাঙ্গাল হরিনাথ বলেন, 'প্রভো, আমি কি পাব না?' সেদিন অনেক দীক্ষা-প্রার্থীর সাধন হয়।

চার পাঁচ মাস হল সাধন পেয়েছেন সত্যকুমার গুহঠাকুরতা। পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন সাধনের সমস্ত নিয়মপ্রণালী। এদিকে বি.এ. পরীক্ষাও এসে গিয়েছে। ভালভাবে পাশ না করতে পারলে লোকে নানা কথা বলবে। শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না তাঁর। এমতাবস্থায় পড়াশুনায় একটু বেশি মনোযোগ দিলে সাধন-ভজন মনের মত হয় না। তাই তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন তিনি গোসাঁইজীকে। গোসাঁইজী মানিকদহে রওনা হয়ে যাবার আগে সত্যকুমারকে ৬, ভবানীচরণ লেন, কলিকাতা ঠিকানায় চিঠি দেন—

ওঁ হরি

ফাল্গুন, ১২৯২

কল্যাণবরেষু,

আমাকে পত্র লিখিয়া উত্তর না পাইলে দুঃখিত হইবেন না। কারণ, মনুষ্যজীবন অল্প, সময় নাই বলিলেই হয়।

পরীক্ষা প্রসঙ্গে অধিক পরিশ্রম করায় শরীর দুর্বল হইয়া নানা প্রকার পীড়া হয়। বিশেষত কৃতকার্য ভোগ না করিলে উপায় নাই। দুর্বল শরীরে প্রাণায়াম করিতে ক্লেশ হইতে পারে। এই সময় কেবল নামসাধন করিবেন। ভক্তিপূর্বক প্রতি শ্বাসেপ্রশ্বাসে নামসাধন অভ্যাস করিলে প্রাণায়াম আপনিই হইয়া থাকে।

জগদীশ্বরের কৃপায় সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করুন।

আপনাদের সংবাদ লইয়া থাকি। তাহা না লইয়া পারি না। আপনাদের মঙ্গল হউক, কল্যাণ হউক।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ফরিদপুর জিলার মানিকদহের ব্রাহ্ম জমিদার বিপিনবিহারী রায় ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন পৃষ্ঠপোষক। তিনি গোসাঁইজীকে সপরিবারে মানিকদহে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেন। মাঘোৎসবের পর প্রভু যাবেন বলে কথা দেন। এতে কলিকাতার গোঁড়া ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাঁরা ত্রিশটি জটিল প্রশ্ন লিখে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মকে মানিকদহে পাঠান। গোসাঁইজীকে বিব্রত করাই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। উৎসবের পর সমাগত ব্রাহ্মেরা একে একে প্রশ্নগুলি করতে থাকেন। মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক শিক্ষিত ব্রাহ্ম যুবক গোসাঁইজীর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তিনি গোস্বামীপ্রভুর উত্তরগুলি লিখে নেন। উপস্থিত ব্রাহ্মেরা গোসাঁইজীর আবেগপূর্ণ উত্তর শুনে খুব মুগ্ধ হন। বিপিনবাবু অভিভূত হয়ে বলেন, উত্তরগুলি তিনি ছাপিয়ে ফেলবেন। তাঁরই অর্থানুকূল্যে গোসাঁইজীর উত্তরগুলি 'যোগসাধন' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। জমিদার বিপিনবিহারী রায়, সস্ত্রীক এবং আরও ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা মানিকদহে তাঁর কাছে সাধন পান। মন্মথবাবুরও ঐ সময় সাধন হয়। প্রমাদ গণেন গোঁড়া ব্রাহ্মেরা। পণ্ডিত মহাশয়ও এই সময় স্কুলের কাজ ছেড়ে প্রভুর সঙ্গ নেন। মানিকদহে গোস্বামীপ্রভুকে যে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছিল,—

যোগপথাবলম্বী ব্যক্তিগণ প্রায়ই ভাবপ্রিয় ও কর্মবিমুখ, এ কথা সত্য কিনা? উত্তরে গোসাঁইজী বলেছিলেন, 'ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। যোগীদিগের সংবাদপত্র নাই, বক্তৃতা নাই, বাহ্য কোন চিহ্নের দ্বারা তাঁহাদের সংবাদ প্রকাশিত হয় না। তাঁহারা প্রায়ই গোপনে, নির্জন কাননে কিংবা গিরিকন্দরে বাস করেন, যখন লোকালয়ে আসেন তখনও সচরাচর সাধারণ লোকের সহিত দুই চারিটি কথা বলিয়া চলিয়া যান, এই সকল কারণে যদি কেহ মনে করেন যে, তাঁহারা অলসপ্রকৃতি, ধ্যান-পরায়ণ, সংসার-বিমুখ ভিক্ষু মাত্র, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি ঘোরতর অপরাধ হয় মনে করি। যদি একটি সপ্তাহ কোন প্রকৃত যোগীর সহবাসে কাটান যায়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা কিরূপ পরোপকারী, সংসারের কল্যাণের জন্য কত চিন্তা করেন, ও কিরূপ ভয়ানক ত্যাগ স্বীকার করিয়া জনসমাজের দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পান এবং কেমন অদ্ভুত নিয়মবশে ঈশ্বরের কৃপায় এবং নিজেদের শক্তিবলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হন। যাঁহারা জীবনে কখনও কোনও যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কখনও কোন মহাত্মার সঙ্গলাভে জীবন সার্থক করেন নাই, কেবল কতকগুলি ভণ্ড, অলস ও ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী মাত্র দেখিয়া যোগি-দর্শনের জ্ঞান পাইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা যোগিচরিত্রের অদ্ভুত রহস্য কি বুঝিবেন? তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবারই অধিকার নাই।

'যে দেশের ঋষিরা কবি, ঋষিরা দার্শনিক, ঋষিরা সাহিত্যিক, লেখক, ঋষিরা বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কারকর্তা, ঋষিরা জ্যোতির্বিদ্, ঋষিরা গণিতশাস্ত্রের উদ্ভাবক, ঋষিরা দৈহিক যন্ত্রবিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদের সৃষ্টিকর্তা, ঋষিরা ব্যবস্থাপক ও রাজকার্যের তত্ত্বাবধায়ক, যে দেশের ঋষিরাই সংসারযাত্রা-নির্বাহোপযোগী যাবতীয় বিষয়ের আদি মধ্য অন্ত, সেই দেশে যে আজ যোগতপস্যা ও আলস্য এক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য ও দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? যে দেশে জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাযোগিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার ও ধর্ম যে একই বস্তু, এই মহাসত্যের পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, যে দেশের তপস্যাগ্রগণ্য বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, গুরুনানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য সকলেই জনসমাজের পরম মঙ্গল সংসাধনের জন্য আপন আপন সুখ-স্বচ্ছন্দতা, শান্তি ও সমাধি, সমস্ত জীবনই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি যে দেশের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পাশবাচার দূর করিবার জন্য কত শত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অরণ্যের বা পর্বতগুহার নির্জন সাধন ত্যাগ করিয়া পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং বিধিমতে ধর্মপিপাসু জনগণের অন্ধকারময় জীবনাকাশে প্রেম পবিত্রতা ও সত্যধর্মের জ্যোতিঃ সমুদিত করিয়া, জলকষ্টপীড়িত লোকদিগের ক্লেশ বিদূরিত করিয়া, অন্নকষ্টে মৃতপ্রায় সহস্র সহস্র দরিদ্র লোকের সাহায্যার্থে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা পর্যন্ত সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া এবং রুগ্নকে ঔষধ, শোকার্তকে সান্ত্বনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান, হতাশকে আশা দিয়া প্রতিদিন এই হতভাগ্য দেশে পুনরায় সৌভাগ্যলক্ষ্মী আনয়ন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছেন, হায়! সেই দেশের লোক হইয়া, চক্ষু থাকিতে আমরা অন্ধের ন্যায় চীৎকার করিতেছি, যোগে আলস্য ও কর্মবিমুখতা আনিয়া দেয়। লজ্জার কথা, ক্ষোভের কথা, অজ্ঞতার কথা! যাঁহাদের ষড়ৈশ্বর্যশালিত্ব, যাঁহাদের মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বীরত্বের কিছুমাত্র আভাস পাইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা স্তম্ভিত ও

বিস্ময়ে স্তব্ধ, যাঁহাদের দুই-চারিটির কথার প্রতিধ্বনি Emerson, Carlyle প্রমুখ পাশ্চাত্য যোগিগণের নিকট পাইয়া ঊনবিংশ শতাব্দী তাঁহাদের উপাসনা করিতেছে এবং যে মহাত্মাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা Jesus Christ এবং মহম্মদ এই দুই সহস্র বৎসর পৃথিবীর অধিকাংশ মানবমণ্ডলীকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সন্তান হইয়া অন্ধ যে আমরা, ইংরাজদিগের যৌবনসুলভ চপলতা দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি ও যোগকে আলস্য মনে করিতেছি, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে?

‘বস্তুত যোগে আলস্য আনে না, বরং ঠিক তার বিপরীত। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম এই তিনের এককালীন সমঞ্জসীভূত উন্নতিই যোগের ফল। পরমেশ্বর রসের স্বরূপ; রস যেমন উদ্ভিদের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, এককালে তাহার মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা ও পত্র সর্বত্র সমভাবে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করে, মানবাত্মায় পরমাত্মার আবির্ভাব হইলেও সেইরূপ তাহার সমস্ত ভাব একসঙ্গে সমভাবে বর্ধিত হইতে থাকে। আংশিক উন্নতি ইহার বিরুদ্ধ। তিনি পূর্ণ, সেই পূর্ণ আদর্শ প্রাণে অবতীর্ণ হইলে, অপূর্ণতা কি সঙ্কীর্ণতা তথায় স্থান পায় না। প্রকৃত উন্নতি লাভ করিলে কার্য করিতেই হইবে। তবে কার্য সকলের একরূপ কখনই হইতে পারে না। সকলেই প্রচার কি বক্তৃতা বা সংবাদপত্র প্রকাশ ও পুস্তক প্রণয়ন করিবে, নতুবা তাহাদিগকে ক্রিয়াশীল বলিব না, ইহা অজ্ঞের কথা। সকলেই ধর্মপরায়ণ যোগী হওয়া চাই, অথচ সাংসারিক নানা কর্মে বিভক্ত হইতে হইবে। বক্তৃতা করা কাহারও কার্য, পুস্তক লেখা অপরের কার্য, কেহ বা কৃষিকার্য করিবে, কেহ বিচারপতি হইবে, কাহাকেও জমিদারী দেখিতে হইবে, কাহাকেও স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে, অন্য কেহ বা কেবল নির্জনে বসিয়া সাধন করিবেন ও অপর সকলকে আপনার ধর্মজীবনের অমূল্য সত্যসমূহ বিরলে শিক্ষা দিবেন। সুতরাং দেখা গেল যে, যোগ সকলের সাধারণ ভিত্তিভূমি। তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া যাঁহার যেরূপ সুবিধা তিনি সেইরূপ উপায়ে মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন।’

মানিকদহ থেকে সপরিবারে গোস্বামীপ্রভু কলিকাতা পৌঁছে প্রচার-নিবাসে উঠেন। পৌঁছার দিনই তিনি কয়েকজন শিষ্যশিষ্যাকে নিয়ে সপরিবারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করতে যান। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরমহংসদেব প্রত্যেকের পরিচয় নেন। সব শুনে তিনি গোসাঁইজীকে বলেন, ‘বটে! তুমি এদের মধ্যে থেকেও এ অবস্থা লাভ করেছো! তুমি তো দেখছি, জনকঋষির ধর্মযাজন করছো! আমার তো ধারণা ছিল, তুমি উদাসীন হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছ! তুমি যে আদর্শ দেখালে, এ সংসারে তা দুর্লভ।’ যোগমায়াদেবীকে দেখিয়ে বলেন, ‘এঁকে কতদিন হল সাধন দিয়েছ? এঁর মধ্যে যে অতীব আশ্চর্য শক্তি দেখছি। সাক্ষাৎ মহাশক্তির মুখোমুখি হলে আমার যেমন হয়, এঁকে দেখে আমারও ঐরূপ অবস্থা হলো।’

সকলে ঘুরে ঘুরে দেখছেন; মুক্তকেশী দেবী ও শরৎকামিনী বসু রামকৃষ্ণদেবের কাছে বসে রইলেন। মুক্তকেশী দেবীকে লক্ষ্য করে পরমহংসদেব বলেন, ‘তুমি নীতিপরায়ণা ব্রাহ্ম হয়ে, এই ন্যাংটা মানুষটির কাছে কি করে রয়ে গেলে!’ তিনি সসম্ভ্রমে উত্তর দেন, ‘আপনার কাছে পরিধেয়ই বা কি! আর ন্যাংটাই বা কি?’ রামকৃষ্ণদেব বলেন, ‘বটে! তুমি তা বুঝেছ! তবে আরও কাছে এসে বস। ব্রাহ্মসমাজের শুক্‌নো বাঁশের মুড়ো আর কদিন চিবুবে? এখন ভক্তির আশ্রয় নাও।

যাঁকে তুমি জামাতা ভাব্‌ছো, তিনি স্বয়ং ভক্তির ভাণ্ডারী; তাঁর কাছে প্রেমভক্তি লাভ করে ধন্য হও।' তিনিও কয়েকদিন পরে আপন জামাতার কাছে সাধন পান। গোসাঁইজী কথাপ্রসংগে রামকৃষ্ণদেবকে বলেন, 'ভগবানের বিগ্রহ, চিত্র, পটাদি ভাবশুদ্ধভাবে প্রায়ই করা হয় না।' শুনে পরমহংসদেব বলেন, 'এঁড়েদহের মন্দিরের চাতালে মহাপ্রভুর চিত্রপটখানা দেখেছো? ওখানা যথাযথ চিত্র। একদিন গিয়ে দেখে এস।' 'আপনি সংগে করে নিয়ে গেলে হতে পারে,' বললেন গোসাঁইজী। রামকৃষ্ণদেব একটি দিন স্থির করেন। ঐদিন উভয়ে এঁড়েদহ পৌঁছে দেখেন মন্দির বন্ধ। পুজারী পেছনের দরজায় তালা দিয়ে কোথায় গেছেন! কি করেন? মন্দিরের পেছনে গদাধরের সমাধিস্থান দর্শন করতে করতে গোসাঁইজী ভাবাবেশে লুটোপুটি খান। পরে তাঁরা মন্দিরের চাতালে এসে বসেন। গোস্বামীপ্রভুর তখনও ভাবের ঘোর কাটে নি। তাঁর এমন অবস্থা দেখে পরমহংসদেব গান ধরেন। গোস্বামী মহাশয় পরমহংসদেবের গানে আরও বিভোর হয়ে পড়েন এবং ভাবের আবেগে আঙিনায় গড়াগড়ি দেন। প্রকৃতিস্থ হলে রামকৃষ্ণদেব মহাপ্রভুর সেই চিত্রখানা গোসাঁইজীকে দেখান। মন্দির তখনও বন্ধ। বন্ধ দরজার সামনে গোস্বামীপ্রভু সাষ্টাংগ দিতেই মন্দিরের দরজা আপনা থেকে খুলে যায়। সকলে অবাক। এই ঘটনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবও অভিভূত হন। কিছুক্ষণ পরে পুজারী ফিরে এসে বিস্মিত হন। তিনি বিগ্রহের প্রসাদীমালা এনে উভয়ের গলায় পরিয়ে দেন।

আর একদিন গোসাঁইজী কথাপ্রসংগে রামকৃষ্ণদেবকে বলেন, 'কে একজন সব সময় ছায়ার মত আমার সংগে সংগে থাকেন, আর জানিয়ে দেন—কোথায় কি হচ্ছে। ঢাকায় ধ্যানের সময় গায়ে হাত দিয়ে আপনাকে দেখেছি। বুঝেছি আপনি কে!' শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ অবস্থায় বললেন, 'যদি তা হয়ে থাকে তো তাই।'

গোস্বামীপ্রভুর দৃষ্টি থেকে মায়ার আবরণ সম্পূর্ণ অপসৃত। তিনি তখন নিত্যসত্য অবস্থা লাভ করেছেন। যেখানে যার মধ্যে যে সত্যবস্তু নিহিত আছে, তা তিনি উপলব্ধি করছেন আপন উপলব্ধ সত্যের আলোকশিখায়। সমস্ত কিছুই তখন তাঁর কাছে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষরূপে উদ্‌ভাসিত।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন

কলিকাতা প্রচার-নিবাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনেকেই গোস্বামী মহাশয়ের কাছে দিনরাত ঘোরাফেরা করছিলেন দেখে গোঁড়া ব্রাহ্মদের আশঙ্কা হয়, এ সব ব্রাহ্মেরা বুঝি বা সমাজের সাধনপ্রণালী ছেড়ে যোগসাধন গ্রহণ করেন! প্রভুর আচরণের মধ্যে তখন নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁদের চোখে পড়ে; গোস্বামীপ্রভু প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজবিরোধী সাধন দেন, বাসগৃহে রাধাকৃষ্ণ ও হিন্দু দেবদেবীর ছবি রাখেন এবং এঁদের প্রশস্তিমূলক সংগীতে প্রশ্রয় দেন। তিনি নিজেও দেবদেবীর চিত্র ও প্রতিমা প্রণাম করেন।

প্রতিবাদের গুঞ্জন গোস্বামীপ্রভুর কানে পৌঁছতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভার কাছে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ১০ চৈত্র, ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'আচার্য ও প্রচারক'—পদত্যাগ-পত্র পেশ করেন। কিন্তু কার্য-নির্বাহক সভার বিশেষ অনুরোধে তা তিনি প্রত্যাহার করেন। এতে পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার এবং গগনচন্দ্র

হোম সভার কাছে অশোভন প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন। তাঁদের জিজ্ঞাস্য, 'গোসাঁইজী ছাড়া কি ব্রাহ্মসমাজ চলে না? প্রচার-নিবাসে কেন তিনি থাকেন? যোগসাধন যদি ব্রাহ্মধর্মের অঙ্গ হয়, তাহলে বেদী থেকে সর্বসমক্ষে তা দেওয়া হয় না কেন?'

তাঁদের চিঠি পেয়ে কর্মপরিষদ তথ্যানিরূপণ কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সদস্য মনোনীত হন, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, নবদ্বীপচন্দ্র দাশ, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই বিরূপতা সত্ত্বেও প্রচারের কাজে গোস্বামীপ্রভুর বিরাম নেই। চারদিক থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসে তিনি যেন সপরিবারে উৎসবে যোগ দেন।

বরিশালের মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ছিলেন আদর্শবাদী, সত্যবাদী, স্বদেশহিতৈষী ও বাগ্মী। তিনি বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গোসাঁইজীর ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের দৃঢ়তা, আস্তিক্যবুদ্ধি ও আন্তরিকতায় তিনি মুগ্ধ হন। আদর্শবাদী অশ্বিনীকুমার দত্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ না করলেও হিন্দুধর্মে আস্থা হারিয়ে ব্রাহ্মমতে চলতেন। বরিশালে গোসাঁইজী পূর্বে কয়েকবার আসায় তিনিও ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ।

১২৯৩ সালের বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে একদিন অশ্বিনীবাবু ও মনোরঞ্জনবাবু পরলোকতত্ত্ব জানতে উৎসাহী হয়ে মৃতব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সচেষ্ট হন। ঐ সময় একটি বিদেহী আত্মা তাঁদের লক্ষ্য করে বলেন, 'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সদ্গুরুর অবতার। তাঁর কাছে আপনারা যোগসাধন দীক্ষা গ্রহণ করলে আপনাদের বিশেষ কল্যাণ হবে। তিনি বাগেরহাটে আছেন, পরশু বরিশালে পৌঁছিবেন।'

এঁরা অবাক হয়ে পরলোকবাসী আত্মার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বিজয়কৃষ্ণ এলেই জানতে পারবেন।' উভয়ে মনঃস্থির করে ফেলেন, দীক্ষা নেবেন। মনোরঞ্জনবাবু গোস্বামীপ্রভুকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে বাগেরহাট যান, এবং যে স্টীমারে যান সেই স্টীমারেই তিনি গোসাঁইজীকে নিয়ে রাত্রে বরিশালে পৌঁছেন। গোস্বামীপ্রভু রাখালবাবুর গৃহে উঠেন। এই রাত্রেই অশ্বিনীবাবু ও মনোরঞ্জনবাবুর সাধন হয়। আত্মাটি গোস্বামী মহাশয়কে বলেন, 'আমি তোমার সেই।' দুই বন্ধুতে তখন কত কথা!...

গোস্বামীপ্রভু তাঁদের বলেন, 'আপনারা বড় ভাগ্যবান। সাধু অঘোরনাথের পুণ্যাত্মা আপনাদের কাছে ধরা দিয়েছেন।'

সাধনে উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষেধ। অথচ অশ্বিনীবাবুকে নানা জায়গায় সভা-সমিতিতে যেতে হয়। গোসাঁইজী তাঁকে বলেন, 'এ নিয়ম আপনার না মানলেও ক্ষতি হবে না। নাম করে, নিবেদন করে গ্রহণ করবেন, তাতেই আপনার নিয়ম রক্ষা হবে।' বরিশালের অনেকেই তাঁর কাছে এবার সাধন পান। সরলনাথ গুহঠাকুরতা, রাখাল রায়চৌধুরী, গোরাচাঁদ দাশ এবং আরও অনেকে এই সময় সাধন পান। বরিশাল থেকে অশ্বিনীবাবু, মনোরঞ্জনবাবু ও রাখালবাবুর সাধন পাবার সংবাদ পেয়ে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তা-ব্যক্তিরা বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা আরও জানতে পারেন, গোস্বামী মহাশয় বরিশাল থেকে কাকিনীয়া যাচ্ছেন। দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়, গোসাঁইজীর প্রভাবে কাকিনীয়ার রাজা মহিমারঞ্জন

না আবার হাতছাড়া হয়ে পড়েন।

'ব্রহ্মমন্দির' প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করে রাজা মহিমারঞ্জন প্রতিনিধি পাঠান ঢাকায় গোস্বামীপ্রভুকে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে সপরিবারে শিষ্যদের সহ কাকিনীয়া নিয়ে যেতে। ঢাকায় তাঁকে না পেয়ে রাজা মহিমারঞ্জনের প্রতিনিধি প্রথমে যান মানিকদহ, তারপর কলিকাতায়। কিন্তু কোথাও না পেয়ে ঘুরে ঘুরে অবশেষে বরিশাল গিয়ে তিনি গোসাঁইজীকে ধরেন। উৎসবের আর দেরী নেই দেখে গোসাঁইজী বরিশাল থেকে সপরিবারে শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা, নবকুমার বাগচী এবং আরও কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে কাকিনীয়া যাত্রা করেন। এদিকে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্মপরিষদ লোকমারফৎ গোসাঁইজীকে জানান, ৩০ বৈশাখ, ১২৯৩ সনে সিটি কলেজে ব্রাহ্মদের এক সভা আহূত হয়েছে, তিনি যেন উপস্থিত থেকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগের উত্তর দেন। নির্দেশনামা পেয়ে গোসাঁইজী তাঁদের লিখে জানান, বন্ধুভাবে এইদিন তাঁর বাসস্থানে আলাপ-আলোচনা করতে তিনি সম্মত।

কাকিনীয়া যথারীতি উৎসবমুখর হয়ে উঠে। কাঙ্গাল হরিনাথও এসে উপস্থিত হয়েছেন। বেদীতে উপাসনারত গোস্বামী মহাশয়ের কাছে ফুটে উঠে এক আধ্যাত্মিক দৃশ্য; রাজা রামমোহন রায় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' গেয়ে গেয়ে মহাপুরুষদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচছেন। ইতিপূর্বে আরও দুবার ঐ দৃশ্য তিনি দেখেছিলেন।

রাজাবাহাদুরের উদ্যোগে আশিটি মৃদঙ্গ, আর আশি-জোড়া করতাল নিয়ে নগর-সঙ্কীর্তন বের হয়। গোস্বামীপ্রভু মহাভাবে বিভোর হয়ে নেচে নেচে চলেছেন, চলেছেন কাঙ্গাল হরিনাথ দলবল নিয়ে। হাজার হাজার কণ্ঠে নামকীর্তনে এক অভূতপূর্ব পরিবেশ সৃষ্ট হয়। গোসাঁইজীর কৃপায় গায়কের কণ্ঠ ও বাদকের বাদ্যযন্ত্র অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

রাত্রে ছাত্রসমাজ উৎসবের আয়োজন করেছে, গোস্বামীপ্রভুর উপাসনা করার কথা। অপরাহ্ণে বৈষ্ণবসমাজের আমন্ত্রণে তিনি কীর্তনে গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে মৌন দেখে অস্থির হয়ে উঠে ছাত্রদল। ছাত্রনেতারা গিয়ে স্বচক্ষে তাঁর অবস্থা দেখে নিরাশ হয়ে পড়ে। এদিকে পাঁচ হাজার শ্রোতা; নানা জন নানা মন্তব্য প্রকাশ করছেন। বহু ভাগ্য, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর সম্বিত ফিরে আসে। তিনি তখনই ছাত্রসভায় উপস্থিত হয়ে উপাসনা শুরু করেন। ভাবাবেশে তিনি বলেন, 'মা, এ কি দেখছি? আমাকে লোকে গালাগাল দিয়েছে বলে সর্বাঙ্গে তোমার আঘাতের চিহ্ন! এখন তোমার পূজা করব না কাঁদব?' যাঁরা অনুদার মন্তব্য করেছিলেন, তাঁরা ভয়ে বিস্ময়ে ক্ষমা চান। গোস্বামীপ্রভু তখন মনোরঞ্জনবাবুকে আহ্বান করে তাঁর ধর্মজীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে কিছু বলতে বলেন। তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েকদিন জ্বরে ভুগে তিনি সেইদিনই মাত্র অন্নপথ্য করেছেন, শরীরও তাই খুব অবসন্ন ও দুর্বল। গুরুকে স্মরণ করে তিনি উঠে দাঁড়ান। প্রায় তিন ঘণ্টা তিনি ভাষণ দিয়ে যান। তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলী অভিভূত হয়ে পড়ে।

রাজাবাহাদুর তাঁকে অভিবাদন করে বলেন, 'এমন তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা সারারাত ধরে শুনেও অস্বস্তি বোধ হয় না।' মনোরঞ্জনবাবু তাঁকে বলেন, 'আমার দাঁড়াবার সামর্থ্য ছিল না; কথা বলবার শক্তিও ছিল না; তার উপর, কী বলব তাও একবার ভেবে দেখবার সুযোগ পাই নি। গোসাঁইজীর আদেশে উঠে দাঁড়াতেই

কোথা থেকে অভাবনীয় এক শক্তি অনুভব করলাম আমার মধ্যে; সম্মোহিতের মত আমি বলে গেলাম। এতে আমার কোন কৃতিত্বই নেই।'

গোসাঁইজীকে কলিকাতা ফিরতে হয় বৈশাখের শেষ সপ্তাহেই। এত শীঘ্র বিদায় দিতে রাজাবাহাদুরের মন সরে না। কথা দিয়ে আসতে হয়, কার্ত্তিক মাসে এসে দু সপ্তাহ থেকে যাবেন।

'ব্রাহ্মবন্ধুদের প্রতি নিবেদন' নাম দিয়ে ৩১ বৈশাখ, ১২৯৩ গোসাঁইজী এক মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন—

যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্মধর্ম সার্বভৌমিক ধর্ম। ইহাতে দলাদলি নাই। এই জন্য আমি যেখানে সত্য পাই এবং যাহা সত্য বুঝি, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আশঙ্কা করিতেছেন যে, আমার কার্যে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য আমি তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত বাহ্যিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধানসমাজ, আদিসমাজ, হিন্দুসমাজ, খ্রীস্টীয়সমাজ, মুসলমান সমাজ, আমি সকল সমাজের দাসানুদাস। আমার কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ সকল সম্প্রদায়ই আমার। যেখানে যতটুকু সত্য সেইখানে আমার ব্রাহ্মধর্ম। এখন হইতে এই সারসত্য সার্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিব। আমার মতের আভাস নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—

এই অসীম বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দ-শান্তি-মঙ্গলস্বরূপ, অজর, অমর, নিত্য, একমাত্র অদ্বিতীয়, পবিত্রস্বরূপ। তিনি নিরাকার অর্থাৎ তাঁহার কোনপ্রকার জড় রূপ নাই। তিনি সকলের স্রষ্টা, কোন সৃষ্ট বস্তুর মত নহেন। তিনি স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না।

তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, জগতে দুইজন ঈশ্বর নাই, তিনজনও নাই; অথবা অনেক ঈশ্বর নাই। যে কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে তাঁহাকে ডাকে, সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ডাকে। আর দ্বিতীয় যখন নাই, তখন অন্য ঈশ্বর কোথা হইতে আসিবেন?

পরমেশ্বরের কোন নির্দিষ্ট নাম নাই। নানা দেশের লোকে আপন আপন ভাষায় তাঁহাকে এক একটি নাম করিয়া ডাকিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্তাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি ব্রহ্ম বল, আল্লা বল, খোদা বল, হরি বল, রাম বল, কৃষ্ণ বল, কালী বল, দুর্গা বল তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কেহ কেহ বলেন লোকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে। এ কথাও ঠিক নহে। কারণ হরি শব্দে সিংহ, অশ্ব, বানর, এবং পাপহরণকর্তা পরমেশ্বর, এই সমস্তগুলি বুঝাইয়া থাকে। কেহ যদি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া 'হরি' বলিয়া গদগদভাবে ডাকিতে ডাকিতে অশ্রুপাত করে তখন এমন লোক কেহ নাই যে বলিবে লোকটা বানর প্রভৃতি পশুগুলোকে ডাকিয়া কাঁদিতেছে। বিশেষত মনুষ্যের ভ্রম হইলেই বা ক্ষতি কি? আমাদের উদ্ধারকর্তা মনুষ্য নহেন। আমার দেবতা অন্তর্যামী, তিনি জানিলেই হইবে। তুমি যে নামে ভগবানকে লাভ কর, সেই নাম তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অন্যে যে নামেই ডাকুক তাহাতে আপত্তি কি?

পূর্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বরের জড় রূপ নাই। এজন্য তাঁহাকে নিরাকার বলি। কিন্তু তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। তাঁহাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন

করা যায়। যেমন জ্ঞানচক্ষু আছে, সেইরূপ জ্ঞানকর্ণ আছে, জ্ঞাননাসিকা, জ্ঞানরসনা ইত্যাদি আছে যাহাতে শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন অনুভব হয়। জ্ঞানচক্ষে ইহলোকে পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধন দ্বারা জ্ঞানচক্ষু বিকশিত করা হয়। যাঁহার শরীর আত্মা নির্মল, তাঁহার আপনা-আপনি জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইতে পারে; অনেকেরই হয়। পরমেশ্বর এক, তাঁহার প্রদত্ত মানবীয় ধর্মও এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম। সত্যধর্মে দল নাই, সম্প্রদায় নাই। মনুষ্যের ভ্রমপ্রমাদে দলাদলির সৃষ্টি হয়; প্রকৃত ধর্মে দল নাই।

ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করা তাঁহার উপাসনা; তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিলে তবে তাঁহার প্রিয় কার্য করা যায়। আমি যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভালবাসি, তাহা হইলে যে কেহ তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহাকে পূজা-অর্চনা করেন, তিনি আমার পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু। এজন্য যেখানে তাঁহার পূজা-অর্চনা হয়, সেই স্থানেই গমন করি; যেখানে তাঁহার নামকীর্তন হয়. সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করি। আমার প্রভুকে পূজা করিতেছে, আমার প্রভুর নাম কীর্তন করিতেছে, কত আনন্দ, আনন্দ আর ধরে না। এজন্য শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, খ্রীস্টান, মুসলমান সকল স্থানে প্রভুকে অন্বেষণ করি। কত বৃক্ষতলে, কত পর্বতে, নদীগর্ভে, দেবমন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় আমার প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণ একটি অধ্যাত্মিক রূপক। উপাসনা ও যোগের এরূপ উচ্চভাব আর আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা, পরমেশ্বর। বুদ্ধ, যীশুখ্রীস্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তির পাত্র। উপাসনাকালে ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখা যায়।

পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু। তিনি গুরু হইয়া সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। জল, বায়ু. অগ্নি, বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্বত, গ্রহ, উপগ্রহ, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য, সকলেরই মধ্য দিয়া সেই জগদ্‌গুরু শিক্ষা দিতেছেন। যখন যে বস্তুর মধ্যে শিক্ষা পাই সেই বস্তুকেই ভালবাসি, ভক্তি করি। পিতা, মাতা, উপদেষ্টা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করা প্রয়োজন; তাঁহাদের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে ধর্মলাভ হয়। কোন মনুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে, কি তাঁহার অবতার, কি মধ্যবর্তীরূপে প্রার্থনা করিলে অধোগতি হয়। নিজের অহঙ্কার নষ্ট করিতে হইলে নরনারী মাত্রেরই পদধূলি গ্রহণ করা বিশেষ উপায়।

অহঙ্কার নষ্ট না হইলে ধর্মের অঙ্কুর বাহির হয় না। পরমেশ্বর প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে জ্ঞান, প্রেম, ভক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার জ্ঞান, প্রেম, ভক্তির যোগ করাকেই যোগসাধন বলে। এই যোগসাধন করিলে মনুষ্যের দিব্যদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকেই 'করতলন্যস্ত আমলকবৎ' বলিয়াছেন। এ অবস্থা হইলে সংশয় থাকে না। এজন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-নিবাস। নিবেদক
৩১ বৈশাখ, ১২৯৩ (১৮০৮ শক)। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

তথ্যানিরূপণ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বে গোসাঁইজী প্রচারক-পদে ইস্তফা

দেন। কয়েকজন ব্রাহ্ম এসে ধরেন, তিনি যেন প্রচারক-পদে থাকাকালে 'ব্রাহ্মদের প্রতি নিবেদন' প্রচার না করেন। অন্যথায় সমাজের বড় ক্ষতি হবে। তদুত্তরে গোসাঁইজী এলবার্ট হলে জনসভায় তাঁর বক্তব্য বলবেন বলায়, তাঁরা বলেন, এতে ব্রাহ্মেরা হেয় প্রতিপন্ন হবেন। ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩ সনে সিটি কলেজে কেবল ব্রাহ্ম সদস্যদের সভা ডাকা হয়। গোস্বামীপ্রভু সেই সভায় পদত্যাগপত্র পেশ করেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্ব মৈত্র প্রমুখ ব্রাহ্মগণ এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিবেচনার জন্য সভা স্থগিত রাখার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সকলের বক্তব্য উপেক্ষা করে তড়িঘড়ি ঘোষণা করেন, 'আমি কার্যনির্বাহক সভার পক্ষ থেকে গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলাম।'

'ব্রাহ্মদের প্রতি নিবেদন' ঐ দিনই বিতরণ করা হয়।

পদত্যাগ পত্র

সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে দিব্যচক্ষে দর্শন করা যায় এবং তাহাই ব্রাহ্মধর্মের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। তাঁহাকে নিয়ত দেখা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহের দিব্যাবস্থায় সম্ভোগ করা, এক কথায় তাঁহাকে লাভ করিয়া নিয়তই তাঁহার সত্ত্বাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সমস্ত কর্ম করা ও জীবনযাপন করাই ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ।

১. এইরূপ ব্রহ্মলাভ কেবল মানুষের নিজের চেষ্টায় বা সাধনে হয় না। সম্পূর্ণ তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য সাধন-ভজন করিলে যথাসময়ে সেই অবস্থা প্রাণে অবতীর্ণ হয়। এইজন্য তাঁহার চরণেই আমার ধর্মজীবনের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত যোগসাধনপথ অবলম্বনে গত কয়েক বৎসর চলিয়া আসিতেছি। পরমহংস বাবাজীর উপদেশানুসারে যোগপিপাসু ব্যক্তিগণের মঙ্গলার্থে উক্ত সাধনপথ তাহাদিগকে উপদেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

২. এই সাধনে বাহিরের কিছুরই সহিত সংশ্রব নাই, ইহা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিক বস্তু। তবে কিছুদিনের জন্য ভূতশুদ্ধি করণোদ্দেশে অনেককে প্রাণায়াম করিতে হয়। কিন্তু উহা আমাদের সাধন নহে।

৩. এইজন্য সাধকমণ্ডলীর বহির্ভূত লোকদিগের সম্মুখে আমরা সাধন করি না। তাঁহারা ইঁহার ভিতরের তত্ত্বকথা কিছুই বুঝিবেন না, কেবল বাহিরের প্রাণায়ামটুকু দেখিয়া সাধনের প্রতি অশ্রদ্ধা হইলে, তাঁহাদেরই আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

৪. কোনরূপ অহঙ্কার বা অন্য পাপাচার, পাপ চিন্তা, পাপ কল্পনা পর্যন্ত দ্বারাও এ সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। আমরা কোন সম্প্রদায়বিশেষ মানি না; হিন্দু, পৌত্তলিক, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খ্রীস্টান, মুসলমান এবং ব্রাহ্মসমাজের লোক যে কেহ আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থী হন, তিনিই সাধন পাইতে পারেন; এবং সাধন করিতে থাকিলে তাঁহার সমস্ত ভ্রম, অজ্ঞানতা, পাপ, নীচতা, ও কুসংস্কার ব্রহ্মকৃপায় দূর হইয়া তিনি পবিত্র হইবেন।

৫. ইহাতে গুরুবাদের লেশমাত্র নাই। ঈশ্বর স্বয়ংই ইহার গুরু, আর সকলেই উপদেষ্টা ও তন্নিযুক্ত পথপ্রদর্শক মাত্র। যেমন তিনি বৃক্ষ, লতা, গ্রহ,

উপগ্রহ ও পর্বত রূপ উপায় দ্বারা নানাভাবে শিক্ষা দেন, তদ্রূপ মনুষ্যরূপ উপায় দ্বারাও ধর্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। এইজন্য আমরা সমস্ত পদার্থকে ও মনুষ্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই এই যোগশক্তি বর্তমান আছে। এই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য একজন জাগ্রত, শক্তিশালী মনুষ্যের সাহায্য আবশ্যক; এবং তদ্ভিন্নও নিতান্ত ব্যাকুলতা থাকিলে ও অন্যান্য অবস্থা ঠিক অনুকূল হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের শক্তিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ অবস্থা অতি বিরল। সুতরাং মনুষ্যের সাহায্যের নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। যেমন চক্ষের দৃষ্টিশক্তি ভগবান দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যদি কুটা পড়ে, তাহা অন্যের দ্বারা না উঠাইলে চলে না।

৬. পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের ন্যায় ধর্মোপদেষ্টাদিগকেও প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা করা ধর্মসঙ্গত। পদধূলি লওয়া সম্বন্ধে আমাদের কোন নিষেধ নাই। আত্মার যেরূপ অবস্থায় পদধূলি গ্রহণের ইচ্ছা হয়, সেই বিনীত অবস্থা অতি সুন্দর ও উপকারী। এইজন্য অন্যের উপকার হইতেছে দেখিলে, আমরা পদধূলি লইতে বাধা দেই না। আমিও সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাকে যিনি যখনই প্রণাম করেন, তখনই আমি সেই প্রণাম সেই বিশ্বগুরুর প্রাপ্য এই অর্থে 'জয় গুরু, জয় গুরু' উচ্চারণ করিয়া থাকি। একটি প্রণামও স্বয়ং গ্রহণ করি না।

৭. আমরা অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন উচিত মনে করি না। তাহাতে নানা শারীরিক ব্যাধি সংক্রামিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাহাতে আধ্যাত্মিক অবনতিও হয়, এ কথা সাধু মহাত্মারা পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকেন, এবং তাহা পরীক্ষিতও হইয়াছে। তবে পিতামাতা গুরুজন যখন আদর করিয়া কিছু দেন, তাহা এবং যখন কোন শ্রদ্ধেয় ধর্মাত্মার ভুক্তাবশেষকে প্রসাদ বলিয়া মনে হয়, তাহা আহার করিলে হানি নাই; বরং উপকারই হইয়া থাকে। এজন্য সকল সম্প্রদায়ের ধার্মিক লোকের প্রসাদ ভোজন উচিত মনে হইলে করিয়া থাকি।

৮. দেবতার মন্দিরে কালী দুর্গা বা অন্য প্রতিমার সম্মুখেই যদি আমার ব্রহ্মস্ফূর্তি হয়, তবে সেইখানেই আমি আত্মহারা হইয়া যাই; ও আমার ইষ্ট-দেবতাকে প্রণাম করিয়াও হয়ত সেইখানে গড়াগড়ি দিয়া চরিতার্থ হই। আমার ঈশ্বর সর্বব্যাপী সুতরাং আমি যেখানেই তাঁহার দর্শন পাই সেখানেই মুগ্ধ হই, স্থানের বিচার থাকে না।

৯. কালী দুর্গা সকল নামেই ভক্ত ভগবানকে ডাকিতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ দেখি না। এজন্য আমার যখন যে নামে প্রাণে আরাম হয়, তখন তাই বলিয়াই ডাকিয়া থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময়ে কোথাও এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান সময়ে এইরূপ করাও উপযুক্ত মনে করি না।

১০. রাধাকৃষ্ণের ভাবের মত ধর্ম ও যোগপথের সহায় অন্য কোন ভাব নাই মনে করি। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য, দেবতা পরমেশ্বর; এজন্য সর্বপ্রযত্নে আমি ঐ ভাব সাধনের চেষ্টা করি ও যাঁহারা ঐ আধ্যাত্মিক ভাবে উপকার পান, তাঁহাদিগকে লইয়া একত্রে রাধাকৃষ্ণের গান করিয়া থাকি। তবে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার সময়ে কখনও ঐ নাম গ্রহণ করি নাই; এবং বর্তমান সময়ে ঐরূপ করা উচিতও মনে করি না।

এই আমাদের যোগসাধন-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বাহিরের কথা। ভিতরের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই সকল বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্যের

সহিত আমার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। যাহা সত্য বুঝিব তাহাই অবনত মস্তকে অনুসরণ করিব, এইজন্য এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য আমার এই প্রকার কার্যের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস প্রচারের হানি হইতে পারে আশঙ্কা করেন বলিয়া আমি উক্ত সমাজের সহিত সমস্ত বাহ্যিক সংশ্রব পরিত্যাগ করিলাম। আন্তরিক যোগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। কেবল প্রচারক-পদ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি ধর্মপ্রচারের সমস্ত কার্য আমার নিজের দায়িত্বে করিতে থাকিব। আমার একটি কথাও এখন অবধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিয়া পরিগণিত না হউক।

আমি মনে করি যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম, এবং সমস্ত মানবমণ্ডলীর মধ্যেই এই সত্য লাভ করা যায়। এইজন্য ব্রাহ্মধর্মকে সার্বভৌমিক ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করি। পরমেশ্বর এক, তাঁহার ধর্মও এক। মনুষ্যের ভ্রম, প্রমাদ ও রুচি অনুসারে নানা প্রকার দল ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত ধর্মে দল বা সম্প্রদায় নাই। আমি সেই সার সত্য অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতেছি; এবং করিব। আমি সমস্ত মনুষ্যসমাজের দাসানুদাস, কিন্তু কোন দল বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি। দয়াময় প্রভু আশীর্বাদ করুন, এই সার্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম চিরদিন প্রচার করিতে পারি।

কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার আশ্রম — নিবেদক
৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩ সাল, ১৮০৮ শক। — শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ধর্মান্তরের তরঙ্গ রোধ করতে ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব হলেও নানারকম আদর্শ-সংঘাতে প্রগতিপন্থীরা হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। অনেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে নিজেদের আধুনিক মনে করে 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন" হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রাহ্ম হন। জাতিভেদ বর্জন, বাল্যবিবাহ নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ছিল এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আবার অনেকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয়ধ্বনি করে ব্রাহ্মসমাজকে এর পরিপোষক মনে করে সমাজে যোগ দেন। আবার কেহ-কেহও বা পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ ও পৌরহিত্য-প্রথা অকল্যাণকর ভেবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। বিদেশ-প্রত্যাগত অনেকে হিন্দুসমাজে অপাংক্তেয় গণ্য হয়ে অবশেষে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। এঁদের মধ্যে অনীশ্বরবাদীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আবার এমন লোকও ছিলেন যাঁরা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও, উপাসনার সার্থকতায় ছিলেন সন্দিহান। এই সব বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্য নিয়ে সংগঠিত ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃতপক্ষে ছিল সংস্কৃতিমূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ভগবানকে লাভ করার সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিলেন মুষ্টিমেয় ধর্মার্থী, তাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ। তথাপি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ব কৌমুদী' গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণে মন্তব্য করেন—'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত এবং প্রচারক-সংখ্যা যেরূপ অলপ, তাহাতে গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় একজন প্রচারককে নিজ পদ হইতে অপসৃত হইতে দেওয়া কি সুখের ব্যাপার? যাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সেবা আর কেহ করেন নাই, যিনি ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন, যিনি ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য চিরদিনের মত স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছেন, যিনি সমস্ত দিন অনাহার ও পথশ্রমের পর মুৎপিণ্ডমাত্র আহার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার

করিয়াছেন, যিনি বিশ্বাস, নিষ্ঠা, ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শস্থল, তাঁহাকে সহজে ও অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে কে পারে?...

'গোস্বামী মহাশয়ের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের এই সংস্কার যে, তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতা ও প্রবল নিষ্ঠা দ্বারা বিশেষ রূপে ধর্মভাব প্রচারিত হইতেছে ও হইবে।......

'কিরূপে সত্যের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা যেমন তাঁহার নিকট পাইয়াছি, এমন অতি অল্প স্থানেই দেখিয়াছি। তাঁহার ন্যায় কুসংস্কার ও অসত্যের প্রতিবাদ কে করিয়াছে? তিনিই তো সর্বপ্রথমে প্রতিবাদ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন, তিনিই বর্ধিতকীর্তি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কার্যের প্রতিবাদ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠনে সহায়তা করেন। আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রতি তাঁহার এই একমাত্র দাওয়া নহে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির প্রতি 'সাধক' নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তিনি তন্মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।'

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলেও, পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গোসাঁইজীকে আচার্য পদে মনোনীত করেন। তাঁদের যুক্তি, পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীন নয়। জগদ্বন্ধু লাহা, রজনীকান্ত ঘোষ, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ঢাকার অন্যান্য ব্রাহ্মপ্রধানেরা গোসাঁইজীকে সাদর আহ্বান জানান। তিনি পূর্ববাঙ্গলায় স্বাধীনভাবে ধর্মযাজন করতে পারবেন এই ভেবে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ঢাকায় রওনা হবার পূর্বে মাকে দেখার জন্য জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহেই গোস্বামীপ্রভু সপরিবারে শান্তিপুর যান।

স্বর্ণময়ী দেবীর স্বাভাবিক অবস্থা। ছেলেকে পেয়ে ভারী খুশী। ছেলে দীক্ষা দিচ্ছেন জেনে আনন্দ আর ধরে না। কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী আর জগদ্বন্ধু গোস্বামীকে ডেকে বলেন, 'বিজয়ের কাছে গিয়ে সাধন নে।' গোসাঁইজীর কাছে গিয়ে সাধন চাইতেই তিনি তাঁদের বলেন, 'গুরুজীর অনুমতি ছাড়া সাধন দেবার যো নাই।' স্বর্ণময়ী দেবী এই মন্তব্য শুনে ছেলেকে গিয়ে অভিমানের সুরে বলেন, 'হ্যাঁরে বিজয়, আমি বুঝি তোর গুরু নই? ওদের সাধন দে।' মাতৃভক্ত ছেলে পরমহংসজীর অনুমতি নিয়ে তাঁদের সাধন দেন। এইদিন লালেরও সাধন হয়। লালবিহারী ওরফে কল্যাণবিহারী বসু, পিতা রামগোপাল বসু, নিবাস শান্তিপুর। আট বছর বয়সে ঘর ছেড়ে বিবাগী হন। সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশ একে একে ছয়জন সিদ্ধপুরুষ থেকে সাধন পেয়ে কৈশোরেই তিনি হন ভজনকুশলী। অতি অল্প বয়সে আশ্চর্য যোগৈশ্বর্য প্রকাশ পায় তাঁর মধ্যে, তবু যেন কিসের অভাব! দৈবকৃপায় স্বপ্নে গোকুলচাঁদ বিগ্রহের নির্দেশ পেয়ে তিনি গোসাঁইজীর কাছে আসেন।

গোস্বামীপ্রভু সমাধিস্থ, লালও তাঁর পাশে বসে নাম করছেন। হঠাৎ লাল চোখ মেলে দেখেন, গোসাঁইজীর কলেবর থেকে বেরিয়ে আসছেন ধনুর্ধারী নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরাম। নিমেষের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র রূপান্তরিত হলেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পীতবসন বনমালী রূপে, তারপর আবার দেখা দিলেন স্বর্ণকান্তি দণ্ডকমণ্ডলুধারী মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে। এই রূপান্তরের পথেই তিনি আবার লীন হয়ে যাচ্ছেন গোসাঁইজীর শ্রীঅঙ্গে। ছায়াচিত্রের মত এই দর্শন চলে তিন দিন

ধরে। গোস্বামীপ্রভু সদ্‌গুরুর অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর অধ্যাত্ম পরিচয় লালই প্রকাশ করেন সর্বসমক্ষে।

লালের একদিন কি খেয়াল হল শান্তিপুরের প্রতি গৃহে রাতভর লিখে আসলেন, 'হরিনাম সত্য'। ভোর হলে দেখা গেল একটি বাড়ীও বাদ পড়ে নি। শান্তিপুরবাসীরা স্তব্ধ, রোমাঞ্চিত। দুদিন পর লাল বিষ পান করে প্রভুর আসনের পাশে শুয়ে পড়লেন। সারাদিন কোন সাড়া নেই। বাড়ীর লোক বলছেন, 'লালকে কি কাল ঘুমেই না পেয়েছে!' প্রভু নির্বিকার! সন্ধ্যারতির পর শ্যামসুন্দরের মন্দির থেকে ফিরে এসে লালের অসাড় দেহের পাশে বসে প্রভু ডাকেন, 'লাল এসো।' তারপর তিনি নাম শোনান, আধঘণ্টা পর লাল উঠে বসেন। লাল এসময়-কার অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'দেহ থেকে বের হয়ে কোথায় যে চলে গিয়ে-ছিলাম! কত কি অতিক্রম করে চলেছি। হঠাৎ প্রকাণ্ড এক মূর্তি আমার পথ রুখে দাঁড়িয়ে বলে, ফিরে যাও; তোমার গুরু তোমাকে ডাকছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সাধ্য নেই তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করেন। আমি পথ ছেড়ে দিচ্ছি, এবার তুমি যাও দেখি। এক পা-ও এগুতে পারছি নে। এমন সময় গোসাঁই নিজে গিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে আসেন।'

শান্তিপুর থেকে কলিকাতা এসে গোসাঁইজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করতে যান দক্ষিণেশ্বর, তখন নাট্যকার গিরীশ ঘোষ মহাশয়ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে বসে ছিলেন। পরমহংসদেব ঘোষ মহাশয়কে বললেন, 'গোসাঁইকে তোমাদের "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দেখাবে না?" পরের দিনই স্টার থিয়েটারের অভিনয়ে সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু আমন্ত্রিত হন; মঞ্চসংলগ্ন বিশিষ্ট দর্শকের সারিতে তাঁদের আসনের ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যার আগে সকলকে সঙ্গে নিয়ে গোসাঁইজী নাট্যশালায় এসে পৌঁছলে স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ অমৃতলাল বসু তাঁদের সমাদর করে সম্মানিত নির্দিষ্ট আসনে নিয়ে গিয়ে বসান।

গোস্বামী মহাশয় অভিনয় দর্শন করে ভাবাবেশে অভিভূত হয়ে পড়েন। এর মধ্যে এক সময় মঞ্চে শুরু হল কীর্তন—

'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারী।
মাধব-মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।
ব্রজকিশোর কালিয়হর কাতর ভয়ভঞ্জন;
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা,
রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন,
গোবর্ধন-ধারণ, বন-কুসুম-ভূষণ,
দামোদর কংস-দর্পহারী
শ্যাম রাস-রস-বিহারী।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার।'

এই গানটি শুরু হতেই গোসাঁইজী ভাব সম্বরণ করতে না পেরে "জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন" বলে হুঙ্কার দিয়ে রঙ্গমঞ্চে উঠে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে থাকেন; ভাবে বিভোর হয়ে তাঁর শিষ্যেরাও মঞ্চে উঠে কীর্তনে যোগ দেন। অভিনেতা আর দর্শকেরা হন দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত, নামানন্দে রঙ্গালয় হয়ে ওঠে হরিবাসর। অমৃতলাল বসু রঙ্গমঞ্চে এসে বলেন, 'আজ আমার থিয়েটার করা সার্থক হল।'

তারপর করতালি দিতে দিতে "হরিবোল" বলে বলে তিনিও মেতে ওঠেন। উৎসাহিত হয়ে অভিনেতারা আবার গান ধরেন—

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নম বামনরূপধারী।
গোপীগণ-মনোমোহন, মঞ্জু-কুঞ্জচারী।
জয় রাধে, শ্রীরাধে।
ব্রজবালকসঙ্গ, মদন-মানভঙ্গ,
উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদতরঙ্গ।
দৈত্যছলন নারায়ণ, সুরগণ-ভয়হারী,
ব্রজবিহারী গোপনারী-মান-ভিখারী।
জয় রাধে, শ্রীরাধে॥

স্বামী হরিমোহন, ভক্তপ্রবর শ্রীধর ঘোষের মনোরম ভঙ্গিমায় নৃত্য দেখে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে পড়েন। অভিনয় শেষ হলে গোস্বামীপ্রভুকে অভিবাদন করে অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন, 'প্রভো, গোস্বামীগণের গ্রন্থে পড়েছি, চার শতাব্দী পূর্বে মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তনের তরঙ্গে ভারতভূমি দেবভূমিতে পরিণত হয়েছিল। আজ সেই অভিনব লীলা আপনার প্রসাদে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলাম। এই রঙ্গভূমি আজ পবিত্র হল।'

১২৯৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫।১৬ তারিখ গোসাঁইজী ঢাকা যাত্রা করেন।

পুনরায় ঢাকায়, পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ

পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীন নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। ঢাকার ব্রাহ্মবন্ধুগণের আন্তরিক আগ্রহাতিশয্যে গোস্বামীপ্রভু সপরিবারে ঢাকায় এলেন। প্রচারক-নিবাসে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। এখানে তিনি স্বাধীনভাবে ধর্মপ্রচার করতে পারবেন এই আশ্বাসে তিনি আবার পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও প্রধান প্রচারকের পদ গ্রহণ করলেন। গোস্বামীপ্রভুর আগমনের পর থেকেই প্রচারক-নিবাস ও সমাজমন্দিরের পূর্বতন বিধিব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন দেখা দিল। আগে মন্দিরে খ্রীস্টানদের অনুকরণে সপ্তাহে একদিন উপাসনার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এখন সেখানে প্রতিদিন সংকীর্তন ও উপাসনার ব্যবস্থা হল। ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনিতে সমাজগৃহ মুখর হয়ে উঠল। প্রচারক-নিবাসেও চলছিল অহর্নিশ মহোৎসব, ধর্মার্থীর আনাগোনা। সর্বত্র সৎপ্রসঙ্গ শাস্ত্রচর্চা, ধর্মকথা, ধর্মচিন্তা। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীস্টানে কোন ভেদ নেই। প্রবল স্রোতের মত ধর্মার্থী আসছেন গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গ লাভ করবার জন্য, আসছেন তাপদগ্ধ হৃদয় নিয়ে, ফিরে যাচ্ছেন পরম স্নিগ্ধ আশ্বাস লাভ করে। সকলের মধ্যেই এক অপূর্ব ধর্মভাব, প্রাণ-মাতান উন্মাদনা। প্রতিদিনের উৎসবে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে, সমাজমন্দিরে স্থান সংকুলান হয় না; তাই সমাজমন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়েও প্রতিদিনের উৎসবে যোগদান করেন অগণিত নরনারী, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন গোস্বামীপ্রভুর উপদেশ শোনবার জন্য।

জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ গোস্বামীপ্রভুর সব সময়েই তদ্‌গত ভাব; আপন উপলব্ধি

নিয়ে পারমার্থিক প্রসঙ্গে যখন তিনি সকলকে উপদেশ দিতে থাকেন, তখন উপস্থিত সকলের প্রাণমন সরস হয়ে উঠে। ভক্তহৃদয়ে আনন্দের জোয়ার বয়, সকলেই সাত্ত্বিক ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। তারপর যখন তিনি পরমানন্দে বিভোর হয়ে হাতে তালি দিয়ে দিয়ে সংকীর্তনে নৃত্য করতে থাকেন এবং উচ্চনাদে হরিধ্বনি দিতে থাকেন, তখন সকলের সমস্ত বাধা ভেঙ্গে যায়, অপূর্ব এক উন্মাদনায় উঠে দাঁড়িয়ে তাঁরা গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গে ভাবাবেশে নাচতে থাকেন। অতি বড় বিষয়ী, অতি বড় অহংকারী লোকও এই সঙ্গসুখে কিছুকালের জন্য সব কিছু ভুলে পরমানন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন।

দূরদূরান্ত থেকে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণ যোগসাধন নেবার জন্য আসছেন, সকলেরই আন্তরিক বাসনা গোস্বামীপ্রভু তাঁদের কৃপা করবেন। পরমহংসজীর অনুগ্রহে বহু ধর্মপিপাসু নরনারী এ-সময় গোস্বামীপ্রভুর নিকট যোগসাধনে দীক্ষিত হন।

রথযাত্রার সময় গোস্বামীপ্রভু ধামরাই যান, সঙ্গে ছিলেন নবকুমার বাগচী, হরিমোহন চৌধুরী, পণ্ডিত মহাশয় আর শ্রীধর ঘোষ। মাধবের মন্দির-দুয়ারে এসে গোস্বমীপ্রভু সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ নামকীর্তনের পর গোস্বামীপ্রভুর সমাধি ভঙ্গ হয়, এর পর অনাথবন্ধু মৌলিক মহাশয় গোস্বামীপ্রভুকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান। মাধব-মন্দিরের অন্যতম ভক্ত ও সেবক পরশুরাম গোস্বামীপ্রভুকে দেখার পর থেকেই তাঁর পিছু নিয়েছেন, নীরবে তিনি শুধু গোস্বামীপ্রভুর দিকেই তাকিয়ে থাকেন। মৌলিক মহাশয়ের বাড়ীতেই প্রসাদের ব্যবস্থা হয়। প্রসাদ গ্রহণের সময় গোস্বামীপ্রভু বার বার পরশুরামকে তাঁদের সঙ্গে প্রসাদ পেতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ভক্ত পরশুরাম কিছুতেই রাজী হন না; তিনি কেবলই বলতে থাকেন, 'প্রভু, আগে আপনি ভক্তদের নিয়ে সেবা করে নিন, তারপর আমি তো আছিই।' কিছুতেই বসলেন না পরশুরাম, তিনি পরে প্রসাদ পাবেন। ভক্তদের নিয়ে গোস্বামীপ্রভু প্রসাদ পেতে বসেছেন, অদূরে পরশুরাম 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি দিতে দিতে ভাবে বিভোর। দুয়ারের এক কোণে একটা বেড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে তিনি নাম নিয়ে চলেছেন। গোস্বামীপ্রভু প্রসাদ পেয়ে উঠে পড়লেন। হাতমুখ ধুয়ে পরশুরামের দিকে এগিয়ে আসতেই গোস্বামীপ্রভু দেখেন তাঁর প্রতিটি লোমকূপের গোড়া থেকে কণা কণা রক্তবিন্দু উদ্গত হয়ে সমস্ত বসন এবং উত্তরীয় রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। সামান্য সময় কি ভাবলেন গোস্বামীপ্রভু, তারপর জড়িয়ে ধরলেন পরশুরামকে, সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন তাঁর। পরশুরাম প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রসাদ পেলেন।

মৌলিক মহাশয়ের কাছ থেকে পরশুরামের জীবনকথা সবই শুনলেন গোস্বামীপ্রভু,—পরশুরামের বয়স এখন আশির কোঠায়, ধামরাই গ্রামে এক সময়ে তিনি ছিলেন একজন সচ্ছল মানুষ; জাতিতে তন্তুবায়। জোর তেজারতি কারবার ছিল তাঁর, জোত-জমিও ছিল প্রচুর। বিরাট পরিবার, আট ছেলে, ছয় মেয়ে। মেয়েদের সকলকেই ভাল ঘর-বর দেখে বিয়ে দিয়েছেন পরশুরাম, ছেলেরাও সকলে বেশ উপযুক্ত। বিষয়-আশয় নিয়ে আর আত্মজন-পরিবৃত হয়ে বেশ সুখে ও স্বচ্ছন্দে দিন কাটছিল পরশুরামের। এর মধ্যে বিনা মেঘে হল বজ্রাঘাত। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দেখতে দেখতে পরশুরামের আটটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে, আর স্ত্রীর মৃত্যু হল। জীবিতা কন্যাটিও তার স্বামীকে হারিয়ে চলে এল পিত্রালয়ে; দুঃসময়ে সে-ই

একমাত্র আশা-ভরসা। বিধাতার নির্মম আঘাতে ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন পরশুরাম। শোকের তীব্র দহনে তাঁর দেহমন ছারখার হয়ে যাচ্ছে, কিছুই আর ভাবতে পারেন না তিনি; কেবলই হায় হায় করে কাঁদতে থাকেন। কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেন পরশুরাম। এমনি অবস্থার মধ্যে অধমর্ণেরা মিলিত হয়ে গভীর চক্রান্ত করে বসল। দুষ্টবুদ্ধি-প্রধান লোকের অভাব নেই। তারা অশেষ লাঞ্ছনা করে একমাত্র জীবিতা কন্যাটিরও প্রাণনাশ করল। দুর্বৃত্তেরা সুযোগ বুঝে একদিন রাত্রে সমস্ত মূল্যবান দলিলপত্র, সোনাদানা, টাকাপয়সা সব লুটপাট করে নিয়ে অসহায় পরশুরামকে হাত-পা বেঁধে পাথর চাপা দিয়ে গেল। পরশুরামের তবুও মৃত্যু হল না। পরদিন সকালবেলা গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক পরশুরামের শোচনীয় অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে আপন গৃহে এনে আশ্রয় দেন। দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা এতেও তৃপ্ত নয়, তারা নানাভাবে ব্রাহ্মণ ভদ্রলোককে ভীতিপ্রদর্শন করতে থাকে। পরশুরাম নিজের অভিশপ্ত জীবনের জন্য আর ব্রাহ্মণের ক্ষতি সাধনের কারণ হবেন না, তীব্র অনুশোচনা এসেছে তাঁর মনে। জীবনভর শুধু বিষয়-আশয় আর আত্মসুখের কথাই তিনি চিন্তা করে এসেছেন. মানুষের কথা ভাবেন নি তিনি, ভাবেন নি পরকালের কথাও। অন্ধ নিঃস্ব অসহায় হয়ে তিনি আর অপরকে তাঁর যাতনার ভাগী করবেন না; জীবনদাতার পায়েই বিলিয়ে দিতে চান তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি। আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটিকে কাতর অনুনয় করে তাঁর শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন, 'আমাকে দয়া করে মাধবের মন্দিরে রেখে আসুন।' পরশুরামের কাতর প্রার্থনায় ব্রাহ্মণ বাধ্য হয়ে তাঁকে মাধবের মন্দিরে রেখে আসেন। এখানে পরশুরাম হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে ঠাকুরবাড়ীর আঙ্গিনাটি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রাখেন, আর মন্দিরেরই এক কোণে মাধবের নাম নিয়েই পড়ে থাকেন। মাধবের পূজারী আর ভক্তজনের অনুগ্রহে পরশুরামের দিন কেটে যায়; পরশুরাম নামে বিভোর হয়ে পড়েন। মাধবের সেবা করবার সুযোগ পেয়ে পরিতৃপ্ত পরশুরাম। তাঁর প্রেম ভক্তি ও নিষ্ঠায় মাধব সাড়া দেন। একদিন মাধব পরশুরামকে তাঁর দিকে তাকাতে বলেন। অন্ধ পরশুরাম তাকাতে গিয়েই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। মাধব-দর্শনে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়। এর পর থেকে পরশুরাম যেন আর এক মানুষ; মাধব ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই, আর কোন বিষয় নেই। গ্রামের সকলেই এখন তাঁকে একজন সিদ্ধপুরুষ বলে খুব সম্মান করেন।

রথের পর ধামরাই থেকে চলে আসার সময় পরশুরাম গোস্বামীপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে উঠে চিৎকার করে বলে উঠেন, 'প্রভু, তুমি যে আমার মাধবকে তোমার ভিতরে লুকিয়ে রেখেছ।' সমবেত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গোস্বামীপ্রভুকে দেখিয়ে তিনি বলতে থাকেন, 'এই যে আমার জীবন্ত রাধামাধব, তোমরা দেখ, দেখ, রাধামাধব দেখ; যার চোখ আছে. একবার চেয়ে দেখ।'

ধামরাই থেকে ফিরে এসে গোস্বামীপ্রভু যথারীতি সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রাতে সাধন-ভজন ও কীর্তনান্তে সমাগত সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তদের সঙ্গে পারমার্থিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, দ্বিপ্রহরে শাস্ত্রপাঠ ও অনুশীলন, সন্ধ্যায় উপাসনা, বক্তৃতা ও উপদেশ এবং সব শেষে কীর্তনানন্দে অবগাহন করে গোস্বামীপ্রভুর দৈনন্দিন জীবন শেষ হয়, অতঃপর গভীর রাত্রে আবার শুরু হয় আপন অধ্যাত্ম-সাধনা। আষাঢ় মাসের শেষ দিকে খবর আসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কঠিন পীড়াগ্রস্ত বলে; গোসাঁইজীর মন কেঁদে ওঠে। পরদিনই তিনি কলিকাতা রওনা হয়ে যান

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখবার জন্য। শিয়ালদহ পৌঁছে তিনি সোজা চলে যান কাশীপুরে মণি মল্লিকের বাগানবাড়ীতে। অন্তিমশয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব। অনুরক্ত ভক্ত-পার্ষদগণ গোসাঁইজীকে পরমহংসদেবের অবস্থার কথা জানিয়ে বিনীতভাবে বললেন, 'আপনাকে দেখলেই তিনি কথা বলতে শুরু করবেন। কারও কথা শুনবেন না, অথচ ডাক্তারগণ বারণ করেছেন কথা বলতে।' সমস্ত অবস্থাটি অনুধাবন করলেন গোসাঁইজী, তারপর কি ভেবে ফিরে আসার পথ ধরলেন। প্রায় ফটকের কাছে চলে এসেছেন, এমন সময় পেছন দিক থেকে একজন ভক্ত ছুটে এসে গোসাঁইজীকে বললেন, 'ঠাকুর জেনে ফেলেছেন আপনার কথা। আপনি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না। ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা আপনি এখনই তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করেন।'

গোসাঁইজী ফিরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে ঢুকলেন। সকলকেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার ইসারা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব; সবাই বেরিয়ে গেলেন। এবার ঘরের দরজাটি বন্ধ করবার ইঙ্গিত করলেন গোসাঁইজীকে। গোসাঁইজী দরজা বন্ধ করে ঠাকুরের পাশে এসে বসলেন। তারপর চলল অন্তরের বিনিময়; কত অশ্রুতপূর্ব অজ্ঞাত কথা, কত কি আলাপ, যার সাক্ষী কেউ রইল না এক গোসাঁইজী ছাড়া। বেশ খানিকটা সময় এভাবে কাটালেন তাঁরা; তারপর এক সময় গোসাঁইজী বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ঘরের বাইরে দাঁড়ান ভক্ত-পার্ষদগণের সঙ্গে সামান্য দু-একটি কথা বলেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এলেন গোসাঁইজী গুরুচরণ মহালনবীশের গৃহে। স্তব্ধ গম্ভীর ভাব নিয়ে সারাটা দিন কাটালেন গোসাঁইজী; কারও কথার কোন জবাব পর্যন্ত দিলেন না। তিনি এলেন, আবার চলেও গেলেন ঢাকায় সেদিনকার রাত্রের ট্রেনে।

রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ—কি সম্পর্ক তাঁদের আজও তা সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত। আশ্চর্য মিল রয়েছে এঁদের জীবনদর্শনে, মনে হয় যেন সম্পূর্ণ অভিন্ন তাঁরা, একই লীলাধারার একজন বিলাস, আর একজন তাঁর প্রকাশ। একজন মহাশক্তিধররূপে নরনারীকে ধর্মপথে আকর্ষণ করতে এসেছেন, আর একজন এসেছেন সদ্‌গুরুরূপে সকল ধর্মার্থীকে আত্মসাৎ করে মোক্ষদান করবার জন্য।

দুই রূপেতে হয় ভগবানের প্রকাশ।
একেতে প্রকাশ হয়, আরেতে বিলাস॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।১।৩৫

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ একটি মন্তব্য করেছেন, 'এই অলোকসামান্য জীবনে সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেহই এ পর্যন্ত অনুশীলন করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' কথাটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। যথার্থই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকথা অনুশীলিত হয় নি, হলে এই মহাজীবনের প্রবুদ্ধ জ্ঞানালোকে সমগ্র পরিস্থিতি অন্য রূপ ধারণ করত, মানুষ তার জীবনে সদ্‌গুরুর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হত। হয়ত এজন্যই একদিন গোস্বামীপ্রভু দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমার গুরু আমাকে তিনটি অমূল্য সম্পদ দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি তোমাদের দিয়েছি। দুটি এখনও দেবার সুযোগ পাই নি। যা দেওয়া হয়েছে, তারও যথার্থ বিকাশ হচ্ছে না আহারের দোষে।' অন্যত্র তিনি একদিন অনুরূপ প্রসঙ্গে হরিদাস বসু মহাশয়কে বলেছিলেন, 'ইহা মহাপ্রভুর নিজস্ব সাধন। তিনি মাত্র সাড়ে তিন জনকে

দিয়েছিলেন। এখন তা সর্বসাধারণে বিতরণ করা হচ্ছে।'

পরদিনই গোস্বামীপ্রভু ঢাকায় ফিরে এলেন। ঢাকায় তখন মহাসমারোহে চলছে ধর্মযজ্ঞ।। সর্বত্র ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি। 'জয় ব্রহ্ম-আত্মা ভগবান', 'জয় ব্রহ্মমায়া জীব জগৎ', 'জয় ভাগবৎ ভক্ত ভগবান', 'জয় গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব'। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে এই জয়ধ্বনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন দিয়েছিলেন. তবে সেদিন সকলে সমস্বরে সে ধ্বনি দিতে পারেন নি,—দ্বিধা ছিল, সংকোচ ছিল। এখানে, ঢাকায়, এখন আর সে বাধা নেই, সে সংকোচ নেই। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সে জয়ধ্বনি সমগ্র ঢাকার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিল এক প্রাণ-মাতান উন্মাদনা। দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরের জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হল ঢাকার বুড়ীগঙ্গাতীরে। 'জয়গুরু ব্রহ্মানন্দ পরমহংস', 'জয় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য,' 'জয় প্রভু নিত্যানন্দ'।

৩ শ্রাবণ (১২৯৩), রবিবার, ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে গোস্বামীপ্রভু উপদেশ দান কালে বললেন, 'বিষ্ণুপুরাণের একস্থানে লেখা আছে যে, যম তাঁহার দূতদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, "তোমরা বিষ্ণুভক্তগণের নিকট গমন করিবে না। বিষ্ণুভক্তগণ আমার শাসন অধিকারের বাহিরে। তোমরা কখনও তাঁহাদের স্পর্শ করিবে না।" এই কথা শুনিয়া যমদূতগণ বলিল, "ধর্মরাজ! আমরা কি লক্ষণে বিষ্ণুভক্তগণকে চিনিতে পারিব?" তখন যম তাঁহাদের যে সব লক্ষণ বলিতেছেন, তাহা এই বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থ[১] হইতে আমি পাঠ করিতেছি—

কলিকলুষ-মলেন যস্যনাত্মা বিমল-মতেৰ্ম্মলিনী কৃতো-ঽস্ত-মোহে।
মনসিকৃত-জনার্দ্দনং মনুষ্যম্ সততমবেহি হরেরতীবভক্তম্॥ ২১॥

অর্থাৎ, কলির পাপ-রূপ মালিন্যে যাঁহার হৃদয় মলিন হয় নাই, যাঁহার মোহহীন হৃদয়ে জনার্দন বাস করেন, তিনিই হরির অতীব ভক্ত।

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য, বুদ্ধ্যা তৃণমিব যঃ সমবৈতি বৈ পরস্বম্।
ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ, পুরুষবরম্ তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥ ২২॥

অর্থাৎ, যিনি নির্জনেও সুবর্ণময় পরধনকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন এবং সর্বদা অনন্য মনে ভগবানে স্থিতি করেন, তিনিই বিষ্ণুভক্ত।

বিমল-মতি-বিমৎসরপ্রশান্তঃ শুচিচরিতাঽখিল সত্বমিত্রভূতঃ।
প্রিয়হিতবচনোঽস্ত-মান-মায়ো, বসতি সদাহৃদিতস্য বাসুদেবঃ॥ ২৪॥

অর্থাৎ, বিমলমতি, মৎসরতা-রহিত, প্রশান্ত, শুদ্ধচরিত্র, সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ এবং যাঁহার বাক্য প্রিয় এবং হিতজনক, যিনি অমানী ও মায়ামুক্ত, তাঁহার হৃদয়ে বাসুদেব বিরাজ করেন, তিনিই প্রকৃত ভক্ত।

'এই উপদেশের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ করা উচিত। ইহাতে দুই প্রকারই বলিতেছেন—কি কি গুণ থাকিলে ভক্ত হওয়া যায় এবং কোন্ কোন্ কার্য হইতে তিনি দূরে থাকেন। আমরা অনেক সময় মনে ভাবি, কতকগুলি মৌখিক কথা উচ্চারণ করিলাম, বাহিরের খোল-করতাল বাজাইলাম, সঙ্গীত-সঙ্কীর্তন করিয়া নৃত্য করিলাম, তাহাতে হয়ত সময় সময় আমাদের প্রাণে সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাস হইল, অশ্রুপাত হইল, প্রাণে এক প্রকার সুখও অনুভব হইল; অনেক সময় আমরা ইহাকেই ভক্তি বলিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভক্তি ইহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র জিনিস। ভক্তি বাহিরের খোল-করতাল নয়, ভক্তি

---

[১] বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ৭ম অধ্যায়।

সঙ্গীত-সঙ্কীর্তনও নয়, বাহিরের কোন লক্ষণও ভক্তি নয়, ভক্তি অন্তরের জিনিস। ভক্তি মানবাত্মার একটি বৃত্তি—আত্মার একটি প্রকৃতি। যেমন আমার আত্মার দয়া আছে, যেমন জ্ঞান আছে, সেইরূপ ভক্তি নামে একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি আমাদের প্রাণে আছে, তাহা অঙ্কুরিত এবং বর্ধিত হইলে ভক্তি কি জানা যায়। সেই ভক্তি একবার প্রাণে অঙ্কুরিত হইলে—একবার তাহা প্রাণে প্রকাশিত হইলে, আর অন্তর্হিত হয় না, তাহা ক্রমেই বর্ধিত হইতে থাকে। আমার প্রাণে একটু ভাব আসিল, একটু উচ্ছ্বাস হইল, আবার পরক্ষণে তাহা থাকিল না, একবার আমার প্রাণে ভক্তি দেখা দিল, আবার তাহা কোথায় গেল, এই প্রকার সাময়িক ভাব কখনও ভক্তি নয়। ভক্তি যাহা, তাহা স্থায়ী; তাহা একবার অন্তরে উপস্থিত হইলে চিরকালই থাকিবে এবং বর্ধিত হইতে থাকিবে। যেমন একটি বীজের মধ্য হইতে বৃক্ষ বাহির হইলে আর তাহা বীজের মধ্যে লুকাইতে পারে না, ক্রমে শাখা-প্রশাখায় বাড়িতে থাকে, ভক্তির লক্ষণও এই প্রকার। একবার তাহা প্রকাশ পাইলে আর অন্তর্হিত হয় না, ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অগ্রের সাময়িক ভাব ও উচ্ছ্বাসকে আমরা কখনও ভক্তি বলিতে পারি না; সে প্রকার ভাব অনেক কারণে অনেক সময়ই হইয়া থাকে। অনেক সময় আমরা যাত্রাগান, নৃত্যগীত শুনিতে যাইয়া ঐ প্রকার সাময়িক ভাব লাভ করিয়া থাকি, সে একটি ভাব মাত্র, তাহা ভক্তি নয়। এখন জিজ্ঞাস্য, কি উপায়ে এই ভক্তিলাভ হইতে পারে? সেই প্রাণের প্রাণ ভক্তবৎসলই ভক্তিলাভের উপায়; ভক্তির আধার তিনি, তাঁহার সঙ্গেই ভক্তির যোগ। তাঁহাকে না পাইলে আমার প্রাণে ভক্তিলাভ হইতে পারে না। যেমন, মনুষ্যের প্রাণে অপত্যস্নেহ আছে, কিন্তু যতদিন মনুষ্য সন্তানের মুখ না দেখেন, ততদিন সেই অপত্যস্নেহ কি, তা তিনি জানিতে পারেন না। অপরের সন্তান দেখিলে, তাঁহার প্রাণে এক প্রকার ভালবাসার উদয় হইতে পারে—ভাব হইতে পারে কিন্তু তাহা অপত্যস্নেহ নয়। নিজ সন্তানের মুখ না দেখিলে যেমন অপত্যস্নেহ জন্মে না, সেইরূপ ভক্তবৎসল সেই পরমেশ্বরকে না পাইলে, তাঁহার প্রসন্ন মুখ না দেখিলে, ভক্তিলাভ হইতে পারে না। যে বৃত্তির যে বিষয়, তাহা না পাইলে সেই বৃত্তির বিকাশ হইতে পারে না, ভক্তি-বৃত্তির বিষয় পরমেশ্বর, তাঁহাকে লাভ করিতে না পারিলে প্রাণে ভক্তির উদয় হয় না। যেরূপ নদীর স্রোত অনবরত সাগরের দিকে যাইতেছে, যথার্থ ভক্তির স্রোতও সেইরূপ সাময়িক নহে—সর্বদা ভগবানের দিকে চলিতে থাকে। যাঁহার প্রাণে ভক্তি জন্মিয়াছে, তিনি আর পরোপকার না করিয়া থাকিতে পারেন না; নিজের সুখ-দুঃখের বিচার না করিয়া সর্বদা পরসেবাতেই রত থাকেন। পবিত্রতা অবিচারিতভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যথার্থ ভক্ত, বাহিরে কোন বস্তু—সঙ্গীত বা বাক্য কিছুই অবলম্বন না করিয়া, ভগবানের আবির্ভাব দর্শনে, 'এই তিনি', 'এই তিনি' বজ্রের ন্যায় গম্ভীর রবে বলিতে থাকেন। সেই প্রভুতে যদি আমার মন নিহিত না হয়, তাহা হইলে প্রকৃত ধর্মভাব কিছুই জন্মিবে না। যেমন কোন বীজ, মৃত্তিকায় বপন করিলে, তাহাতে রস প্রবিষ্ট হইলে উহা অঙ্কুরিত হয়; কিন্তু উক্ত বীজটিকে যদি তুমি কোন বাক্সে পুরিয়া রাখিয়া দেও, তবে যেমন তাহা অঙ্কুরিত হয় না—মৃত্তিকা, বায়ু ও সূর্যের সহায়তা আবশ্যক; সেইরূপ মানবের প্রাণও সেই পরমেশ্বরে নিহিত হইয়া সেই রসস্বরূপের রসপ্রাপ্ত না হইলে, তাঁহার বায়ু, তাঁহার উত্তাপ প্রাপ্ত না হইলে, তাহাতে ভাব অঙ্কুরিত হয় না। আমাদের মনে ভক্তির ভাব হইয়াছে কিনা জানিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে,

আমার অন্তরে সেই প্রাণের প্রাণ প্রকাশিত হইলেন কিনা, সেই প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ প্রাণে প্রকাশিত হইলে, মন নির্মল হইল কিনা? তাহা যদি হইয়া থাকে তবে প্রকৃত ধর্মভাব লাভ হইয়াছে। আমি ভক্তিলাভ করিলাম, অথচ আমার মনে সদ্ভাব আসিল না—আমার একটুকু ভাল ভাবও নাই, ইহা কখনও হইতে পারে না। আমরা কতদিনে সেই ভক্তি লাভ করিব? যেমন নদী সর্বদা সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, তখন কোন বাধা মানে না, আমার কবে ঐরূপ হইবে, তাহা না হইলে তো বাঁচি না! সংসারে যাহা কিছু দেখি, কিছুই তো আমার হইল না। যখন সংসারের দিকে তাকাই, তখন দেখি সেই প্রাণের প্রাণ ছাড়া ইহার কিছুই তো আমার নয়! আমার কিছুই হইল না, আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমার গতি নদীর ন্যায় হউক। নদী, যেমন সমুদ্রের সহিত মিলিত হইতে কাহারও কোন বাধা মানে না, প্রকাণ্ড হিমালয়ও যদি তাহার সম্মুখে পড়ে, তাহাও বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া যায়; আমার সেই প্রকার ভাব হউক। নদীর যেমন কল্‌কল্‌ শব্দ হয়, নদী তদ্বিষয়ে কিছু ভাবে না, সেইরূপ আমারও অহৈতুকী ভাব হউক। আমি আর কাহারও দিকে চাহিব না—কেবল সর্বদা সেই করুণাময় পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিব।

‘প্রাণের প্রাণ দীনবন্ধো! ভাল করে আকর্ষণ কর। সমুদ্র যেমন নদীকে টানে, সে যেমন কোন বাধা মানে না, সেইরূপ আমাকে কর। প্রভো! আমাকে তোমার দিকে টানিয়া লও। প্রভো! আমি তোমাতে সর্বদা থাকিব, এই আমার প্রাণের আশা।’

সারা শ্রাবণ মাসভরই অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছে গোস্বামীপ্রভুকে। এর মধ্যে আবার আমন্ত্রণ এসেছে রামপুরহাট থেকে। রামপুরহাটের কর্মাধ্যক্ষ যদুনাথ রায় বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরের উৎসবে গোস্বামীপ্রভুর উপস্থিতি কামনা করে। মাসের শেষ দিকেই রামপুরহাট যাবেন স্থির করেছেন তিনি। রামপুরহাট যাত্রার দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই যেন গোস্বামীপ্রভু গম্ভীর হয়ে পড়ছেন। কাউকে কিছুই বড় একটা বলেন না, বেশীর ভাগ সময়ই ভাবসমাধিতে তন্ময় হয়ে আসনে বসে থাকেন। মাঝে মাঝেই অবিরল ধারায় নয়নজল প্রবাহিত হয়ে সর্বাঙ্গ ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, গোস্বামীপ্রভু তদ্গত হয়ে বসেই আছেন। সকলেই খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন গোস্বামীপ্রভুর এই অবস্থায়, কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না তাঁরা। এমনি অবস্থার মধ্যেই গোস্বামীপ্রভু রওনা হয়ে গেলেন রামপুরহাট, সঙ্গে গেলেন শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, নবকুমার বাগচী আর শ্রীধর ঘোষ।

৩১ শ্রাবণ রাত্রি একটার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহরক্ষা করেন। ১ ভাদ্র ঢাকার সমাজমন্দিরে এ-সংবাদ এসে পৌঁছল সকাল বেলাতেই। এবার তাঁরা সকলেই গোস্বামীপ্রভুর ভাবান্তরের অন্যতম কারণ অনেকটা অনুমান করতে পারলেন।

রামপুরহাট পৌঁছেছেন গোস্বামীপ্রভু। নিস্তরঙ্গ ভাবসাগরে যেন আরও স্তব্ধভাব দেখা দিয়েছে। খুব কম কথা বলছেন গোস্বামীপ্রভু। এদিকে যদুনাথবাবুও খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন গোস্বামীপ্রভুর অবস্থা দেখে; এর উপর আবার শেষ মুহূর্তে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উৎসবে যোগদানের অক্ষমতার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। উৎসবে বেদীর কাজ পরিচালনা তাঁরই করবার কথা।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ও উৎসবে যোগদানের অক্ষমতার সংবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। এ-সব কারণেই খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন যদুনাথবাবু। বার বার গোস্বামীপ্রভুর কাছে এসে তাঁর অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তেমন কোন সাড়া দিচ্ছেন না, বা কোন ব্যবস্থার কথা বলছেন না গোস্বামীপ্রভু। কেবলই বলছেন ভাববার কোন কারণ নেই, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। উৎসবের আগের দিন যদুনাথবাবুর কাতর অবস্থা দেখে খুবই ব্যথিত বোধ করলেন গোস্বামীপ্রভু, আশ্বাস দিয়ে তাঁকে বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, নগেনবাবু এসে যাচ্ছেন। ট্রেনের টাইমে স্টেশনে লোক পাঠান।' নৈরাশ্যের আঁধারে যেন আলোর শিখা দেখতে পেলেন যদুনাথবাবু; সবিস্ময়ে বললেন, 'তিনি যে আসবেন না বলে চিঠি লিখেছেন।' 'তিনি যাই লিখে থাকুন, আপনি কাউকে স্টেশনে পাঠান', একটু জোরের সঙ্গে বললেন গোস্বামীপ্রভু। স্টেশনে লোক পাঠান হল, যথাসময়ে এসে পৌঁছলেন নগেনবাবু। তিনি এসেই গোস্বামীপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি করে জানলেন যে আমি আসছি?' গোস্বামীপ্রভু হেসে বললেন, 'আমি যে আপনাকে ঘোড়ার গাড়ী করে হাওড়া স্টেশনে এসে টিকিট কিনে ট্রেনের কামরায় উঠে বসতে দেখলাম।' সকলে অবাক হলেও গোস্বামীপ্রভু এ-কথার গুরুত্ব আরোপ করতে আদৌ প্রস্তুত নন, তিনি অন্য কথার অবতারণা করতে থাকেন।

উৎসব খুব জমজমাট হল। কীর্তনে গোসাঁইজীর ভাবাবেশে নৃত্যরত অবস্থা উপাসক-মণ্ডলীর প্রাণমন সরস করে তুলল, তাঁরাও ভাবে বিভোর হয়ে গোসাঁইজীর সঙ্গে নেচে গেয়ে কীর্তনানন্দে আকুল হলেন। উপাসনার পর বেদীতে বসে সেদিন গোসাঁইজী বার বার বলছিলেন, 'হে দেব, আমাকে শিরোমণি কর, আমাকে পরশুরাম কর।' গোসাঁইজীর এই প্রার্থনা শুনে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, তিনি কেন বার বার মাতৃহন্তারক পরশুরাম হতে চাইছেন; আর শিরোমণি বলতেই বা তিনি কাঁর কথা বলছেন? হেসে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন গোসাঁইজী, 'ধামরাই গ্রামের পরশুরাম নামে এক পরম ভক্ত বৈষ্ণব, আর শ্রীবৃন্দাবনের গৌর শিরোমণি মহাশয়, আমি তাঁদের কথাই বলেছি।'

রামপুরহাটের প্রশান্ত পরিবেশে গোসাঁইজী জ্যোৎস্নালোকে ঘুরে বেড়াতে বড়ই ভালবাসেন। প্রায় প্রতিদিনই বেড়ান। এর মধ্যে একদিন পূর্ণিমা রাতে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় এক বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গোসাঁইজী; সঙ্গে রয়েছেন রাজকুমারবাবু। উভয়েই করুণাময় পরমেশ্বরের অনাবিল করুণাধারায় স্নাত হয়ে উঠেছেন। পরম প্রশান্তিতে গোসাঁইজী এক সময় দাঁড়িয়ে পড়লেন, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি তাঁর গায়ের উত্তরীয়। আর আনন্দে বিভোর হয়ে পিঠে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন রাজকুমারবাবু, 'কি হয়েছে, ব্যাপার কি?' 'কিছু নয়, কিছু নয়, ব্রহ্মজ্যোতি মাখছি'—বললেন গোসাঁইজী। করুণাময়ের অকৃপণ স্নেহসুধা পরম আদরের সঙ্গে তিনি মেখে নিচ্ছেন তাঁর সর্বাঙ্গে, আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে পরম তৃপ্তির আভাস। বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক নিষ্কম্প হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি, তারপর চঞ্চল হাস্যমুখর কিশোরের মত শুরু করলেন সারা মাঠভরে ছুটোছুটি। সেদিন বাসায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। আর একদিন এমনি জ্যোৎস্নাময়ী রাতে উপাসনা শেষে গোসাঁইজী অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে ফিরছেন স্থানীয় আবাসে। নির্জন পথের দুপাশে তরুশ্রেণী জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ আলো-আঁধারি আল্‌পনা

এঁকে রেখেছে, পক্ষীকুলের কলকণ্ঠ কাকলি অনেকক্ষণ আগেই থেমে গেছে, তবে তার মধ্যেও দু-একটি পাখির নিদ্রাভঙ্গজনিত আচম্‌কা ডাক সমগ্র নিস্তব্ধ পরিবেশকে সচকিত করে তুলছে। পথচারী ভাব-বিহ্বল গোসাঁইজী, সঙ্গীরাও তন্ময় হয়ে চলেছেন সেই পথ ধরে। হঠাৎ এক সময় পথের এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন গোসাঁইজী, কান পেতে শুনতে লাগলেন একটি তিতির পাখির করুণ আবেদনপূর্ণ ডাক। পাখির ডাকে গোসাঁইজীর ভাবসিন্ধু উথলে উঠল, সর্বাঙ্গে শিহরণ হতে লাগল। অবোলা জীবের কাতর নিবেদনে ভগবানের জয়গান শুনতে পেয়েছেন গোসাঁইজী, তাই এমন ভাবোন্মাদ হয়ে পড়েছেন। এমন অবস্থা গোসাঁইজীর প্রায়ই হয়, এজন্য গোসাঁইজীর সঙ্গিগণ সদাসর্বদা সতর্ক হয়ে চলতেন।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন রামপুরহাটে গোসাঁইজীর প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। গোসাঁইজী রামপুরহাট আসছেন জেনেই তিনি এসেছেন দ্বারভাঙ্গা থেকে। প্রায় ছ-সাত মাস হয়ে গেল, জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং তাঁর পিতৃব্য রাধাকৃষ্ণ দত্ত সপরিবারে দ্বারভাঙ্গায় গোসাঁইজীর কাছ থেকে যোগসাধন পেয়েছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন বয়সে নবীন কিন্তু বড়ই সরল এবং গোসাঁইজীগত-প্রাণ। এখানে থাকাকালীনই থৈপাড়া থেকে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পিতার গুরুতর অসুখের সংবাদ আসে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন থৈপাড়া রওনা হয়ে যাবেন, তাঁর একান্ত বাসনা গোসাঁইজীও তাঁর সঙ্গে থৈপাড়া যান। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন গোসাঁইজী। গোসাঁইজীর থৈপাড়া আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পিতা সুস্থ হয়ে উঠেন। এখান থেকেই একদিন তাঁরা কাটোয়া হয়ে সপ্তগ্রাম যান উদ্ধারণ দত্তের পাটবাড়ীতে। পাটবাড়ীতে যখন গোসাঁইজী এসে পৌঁছেন, তখন মন্দির বন্ধ ছিল। পুজারী জনপ্রতি পাঁচসিকে দর্শনী পেলে বিগ্রহ দর্শনের সুযোগ করে দেবেন বলায়, গোসাঁইজী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ধর্মাচরণে এমন অন্যায় এবং অনুচিত দাবী প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নন গোসাঁইজী। মন্দিরের দুয়ার বন্ধ থাকুক, আর নাই থাকুক, বিগ্রহ দর্শনে বাধা নেই তাঁর। গোসাঁইজীর অন্তরের দুয়ার খোলা রয়েছে, সেই দুয়ারপথেই দেখছেন তিনি মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ-মণ্ডল, মন্দিরের দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি সকলকে ডেকে বলছেন, 'তোমরা সকলে দেখ, কৃপালু মহাপ্রভু আমাদের দর্শন দিলেন।' বিমোহিত ভাব গোসাঁইজীর, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত। অধীর আবেগে তিনি আঙ্গিনায় সাষ্টাঙ্গ দিয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। সহসা অর্গলবন্ধ মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। পুজারী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে আঙ্গিনার এক পাশে দাঁড়িয়ে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা এসেছে তাঁর মনে, বুঝতে পেরেছেন তিনি তাঁর অন্যায় আচরণের কথা। নতজানু হয়ে তাই গোসাঁইজীর কাছে ক্ষমা চাইছেন বার বার। ক্ষমাসুন্দর গোসাঁইজীর সপ্রেম আলিঙ্গনে ধন্য হলেন সেদিন সপ্তগ্রামের পাটবাড়ীর পুজারী।

থৈপাড়া থেকে ঢাকা ফিরে যাবার পথে গোসাঁইজী কোন্নগরে আসেন। কোন্নগরে বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখনও সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার। প্রায় ছ-সাত মাস পূর্বে গোসাঁইজী এসেছিলেন এখানে। সেবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন নবকুমার বাগচী, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ঘোষ এবং মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়। এঁরা সকলেই গোসাঁইজীর কাছে সাধন পেয়েছেন। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-নিবাসে সপরিবারে বাস করছিলেন নগেন্দ্রনাথ। সশিষ্য

গোসাঁইজীকে পেয়ে সেবার কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটিয়েছিলেন তাঁরা। নগেনবাবুর স্ত্রী তখন সংগোপনে সাধন পেলেন। বাৎসল্যভাবের সম্পর্ক হল তাঁদের। সেবার গোসাঁইজী আসার দিন মাতঙ্গিনী দেবী রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন তাঁর উপাস্য বালগোপাল এসেছেন কোন্নগরে। ভুবনমোহন দিব্যশিশু বালগোপালের চিন্তায় বাৎসল্যরসে আপ্লুত হয়ে উঠলেন তিনি। গোসাঁইজীর মধ্যেই তিনি দেখেছেন তাঁর বালগোপালকে। যশোদা-মাতঙ্গিনীর অঞ্চলনিধি বালগোপাল-বিজয়কৃষ্ণ। প্রত্যুষে শৌচে যাবেন বিজয়কৃষ্ণ, সেখানে জলপাত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছেন মাতঙ্গিনী দেবী। কত করে বোঝাতে চেষ্টা করছেন নগেনবাবু, কত কাতর আবেদন নিবেদন করে বলছেন বিজয়কৃষ্ণ, 'ক্ষমা কর মা! জন্মে জন্মে তুমি কতবার যে আমাকে শুদ্ধ করেছ, আমি পবিত্র হয়েছি। এবার তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও, আমাকে ক্ষমা কর।' অনেক অনুরোধ উপরোধে ফিরে আসেন মাতঙ্গিনী দেবী, কিন্তু মন তাঁর পড়ে থাকে অবোধ সন্তান বালগোপালের সুখ-সুবিধে ও আরাম-বিরামের বিলিব্যবস্থায়। হাত মুখ ধুয়ে বসন ছেড়ে পবিত্র হয়ে এসেছেন ঘরে বিজয়কৃষ্ণ, মাতঙ্গিনী দেবী অঞ্জন নিয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে। শিশুকে অঞ্জন পরিয়ে দেবেন, মুকুট পরিয়ে সাজাবেন তাঁর মা! যুগ-যুগান্তরের লীলাখেলার ভাব-ভাবনায় বিভোর হয়ে পড়েন বিজয়কৃষ্ণ, গদ্‌গদ কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'ভাল করে জ্ঞানাঞ্জন পরিয়ে দাও মা, সর্বভূতে যেন তোমার ভুবনমোহিনী রূপ দেখতে পাই।' বালগোপালের বাল্যভোগের আয়োজনও প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ধামা-কাঠা ভরে মুড়ি-মুড়কি, বিভিন্ন পাত্রে ননী ছানা ক্ষীর সন্দেশ। বিজয়কৃষ্ণ বাল্যভোজনে বসেছেন, মাতঙ্গিনী দেবী বাৎসল্যরসে আপ্লুত হয়ে গান ধরলেন—

দেখ সবে আসি, যত ন'দে বাসী
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
গোরা প্রভাতে উঠিয়া, অঞ্চল ধরিয়া
ননী দে মা বলে কাঁদে।

মাতঙ্গিনী দেবীর দৃঢ় ধারণা গোসাঁইজী দয়ার অবতার, ভবপারের অন্যতম কাণ্ডারী বলে। তাই কথাপ্রসঙ্গে এক সময় তাঁর দুখিনী পরিচারিকাটির জন্য তিনি গোসাঁইজীর কৃপা প্রার্থনা করে বলেন, 'গোসাঁই, তুমি তো কত পতিতজনকে উদ্ধার করেছ, একে এবার দয়া কর।' মাতঙ্গিনী দেবীর দরদী মনের পরিচয় গোসাঁইজী ভালভাবেই জানেন, পরিচারিকার প্রতি তাঁর এই উদার মনোভাব বিজয়কৃষ্ণকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করল, পরমহংসজীর অনুমোদন পেয়ে বললেন. 'তোমার আদেশ পালন করা, এ যে আমার পক্ষে মহান গৌরবের বস্তু!' যথাবিধি সেইদিনই পরিচারিকাটিকে যোগসাধনে দীক্ষা দিলেন বিজয়কৃষ্ণ। পরিচারিকাটির অতীত জীবন যতই কলুষিত থাকুক না কেন, তার আকূতি, তার নির্ভরতা ছিল অপরিসীম। দীক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তার অপূর্ব ভাবসমাধি হয়, ক্রমে নানা সাত্ত্বিক গুণাবলীর প্রকাশ হতে থাকে তার সর্বাঙ্গে। পরিচারিকাটির দীক্ষান্তের অবস্থা দেখে মাতঙ্গিনী দেবী খুব উল্লসিত হয়ে উঠেন। তাঁর বালগোপাল যে পতিতজনের উদ্ধারকারী; পরপারের কাণ্ডারী! সন্তানের গৌরবে গর্বিতা মাতা আনন্দে অধীর হয়ে গেয়ে উঠেন—

ভবপারে যেতে ভয় কি আছে রে।
ঐ দেখ নামতরি লয়ে, হরি নাবিক সেজেছে।

(পারের ভয় নাই, ভয় নাই!)
ঐ দেখ পতিতপাবন দয়াল হরি, কান্ডারী সেজেছে।

কিছুদিন পর একদিন কৃপাপ্রাপ্ত এই পরিচারিকাটিকে দেখে জগন্নাথঘাটের এক সাধু তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বলেছিলেন, 'মা, এই জিনিস তুই কোথায় পেলি? এ যে দেখছি সদ্‌গুরু তোকে কৃপা করেছেন।'

সেবার বিদায়ের দিন কথা দিয়েছিলেন বিজয়কৃষ্ণ, যতবারই এদিকে আসবেন ততবারই তিনি মাতঙ্গিনীদেবীকে দেখা দিয়ে যাবেন। বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথেরও সেই এক কথা। তাই এবারও গোসাঁইজী থৈপাড়া থেকে ঢাকা ফেরার পথে কোন্নগরে এসেছেন মায়ের সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্য।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি গোস্বামীপ্রভু ঢাকায় ফিরে আসেন। আবার ঢাকায় ভাবের বন্যা বয়ে যায়। সর্বক্ষণ চলে অবিরাম সাধন-ভজন, নামগান, প্রার্থনা, উপাসনা, বক্তৃতা, উপদেশ। গোসাঁইজীর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, সব সময়ই নামানন্দে ডুবে আছেন। কাকিনীয়ার রাজা মহিমারঞ্জন গোসাঁইজীকে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিলেন। গোসাঁইজী তাঁকে কথা দিয়েছিলেন আশ্বিন মাসে তিনি কাকিনীয়া যাবেন বলে। আশ্বিনের শেষ দিকে অবশ্যই কাকিনীয়া যাবেন বলে জানালেন গোসাঁইজী। বরিশাল থেকে মনোরঞ্জনবাবুকেও এই সময় কাকিনীয়া উপস্থিত থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হল।

৩১ আশ্বিন (১২৯৩) কাকিনীয়া ব্রহ্মমন্দিরে গোস্বামীপ্রভু কৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দেন।

একদিন এক ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে গোসাঁইজী শিষ্যদের ও রাজাবাহাদুরকে নিয়ে সংকীর্তনে যান। গোসাঁইজীর এক জ্ঞাতি দাদা তখন কাকিনীয়ায় ছিলেন, তিনিও আমন্ত্রিত হন। গোসাঁইজী ভাবে বিভোর হয়ে নাচতে থাকলে তিনিও নাচতে শুরু করেন। পরদিন প্রাতে তিনি এসে অকপটে বলেন, 'বিজয়, তুমি ভাবাবেশে কি অপূর্ব নৃত্যই যে করলে, আমি তা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তোমার দেখাদেখি আমিও নেচেছি। তোমার একটু ছিটেফোঁটা পেলেও ধন্য হই! আমায় একটু কৃপা কর, ভাই।' অনুজের কাছে এই আত্মনিবেদনে সকলে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এই বিনয় অদ্বৈতবংশের মাহাত্ম্য। অদ্বৈতাচার্য ছিলেন মহাপ্রভুর শিক্ষাগুরু। তিনি স্বপ্নে মহাপ্রভুর পরিচয় পাওয়ার পর তাঁর চরণে নিঃশেষে আত্মনিবেদন করেন। বয়স বা বিদ্যার অহঙ্কার সত্য লাভের পথে অন্তরায় হতে পারে নি। সেই মহৎ ভাবেরই ধারা-প্রবাহের প্রভাব বংশের মধ্যে সঞ্চারিত। তাই বৈষ্ণব ভক্তগণ এই কুলের শিশুরও পদধূলি নিয়ে অদ্বৈতপ্রভুকে মর্যাদা দেন।

রাজা মহিমারঞ্জনের সভাপন্ডিতের ছেলে কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য এম.এ. পাশ করে কাকিনীয়ায় এসেছেন। তিনিও প্রভুর কাছে সাধন পান। গৃহে ফিরতেই বৃদ্ধ পিতা পুত্রের মুখের পানে তাকিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। তিনি তখন স্নানের উদ্যোগ করছিলেন। ছেলেকে দেখেই বললেন, 'এ কি! তোমার মধ্যে আজ এই বৈলক্ষণ্য কেন?' কোকিলেশ্বর হতচকিত হয়ে উত্তর দিলেন, 'কোথায়? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, বাবা।' শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতের চোখ এড়ায় নি, তিনি ঠিকই দেখেছেন। আনন্দে, গৌরবে উল্লসিত হয়ে তিনি প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য বললেন, 'তোমার চোখে মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। সদ্‌গুরুর সাধন পেলে যে সব লক্ষণের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে,

আজ তোমার মধ্যে তারই প্রকাশ দেখছি।' এবার সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে পড়ল তাঁর কাছে, সবিনয়ে পিতার পদধূলি মাথায় নিয়ে তিনি তাঁর সাধনপ্রাপ্তির কথা জানিয়ে বললেন, 'বাবা, আজ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আমি দীক্ষা পেয়েছি।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন বহুদর্শী শাস্ত্রজ্ঞ সভাপণ্ডিত। পুত্রের সৌভাগ্যের, পরমপ্রাপ্তির আনন্দে তিনি আজ বড়ই কৃতার্থ বোধ করলেন। পুত্রের গৌরবে তিনি আজ সত্যই গৌরবান্বিত। সস্নেহে পুত্রকে বললেন, 'বাবা, আজ আমি তোমায় মনপ্রাণ ঢেলে আশীর্বাদ করছি। তুমি বড় ভাগ্যবান! তোমার সৌভাগ্যের কথা আর কি বলব। এখনই চল আমার সঙ্গে। আমিও এই বস্তু তাঁর কাছে যাচ্ঞা করব।'

কোকিলেশ্বর পিতাকে স্নান সেরে নিতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু পিতার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব সইছে না। তিনি বললেন, 'দেখ বাবা, সদ্‌গুরু লাভ বহু ভাগ্যে ঘটে। ক্ষণমাত্র বিলম্ব এ ব্যাপারে সমীচীন নয়। কি জানি, মৃত্যু যদি ব্যাঘাত ঘটায় বা এই শুভবুদ্ধির যদি বিলোপ হয়! সুতরাং আর দেরী নয়, চল। শীঘ্র চল, আর বিলম্ব কর না।' পিতাকে নিয়ে পুত্র গোস্বামীপ্রভুর কাছে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেন। গোস্বামীপ্রভু সাধন দানে সম্মত হয়ে বলেন, 'কিছুদিন অপেক্ষা করুন, যথাসময়ে আপনার সাধন হবে।' অশীতিপর বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় তখন কাতর অনুনয় করে বলেন, 'আপনি কথা দিন আমি এই সাধন পাব।' এই কথা শুনে গোসাঁইজী বলেন, 'যান তাহলে এক্ষুণি স্নান সেরে আসুন।' এইদিনই পণ্ডিত মহাশয় সাধন পান। পরে একদিন গোসাঁইজী পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে দীক্ষা দান করেন।

রাজা মহিমারঞ্জন একদিন গোসাঁইজীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি নাকি সব দেশের ভাষাই বুঝতে পারেন?' গোস্বামীপ্রভু মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। রাজাবাহাদুর বলেন, 'বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষা কখনও আয়ত্ত করেছেন বলে শুনি নি। কি করে তাহলে বিভিন্ন দেশের ভাষা বুঝেন?' প্রভুপাদ উত্তরে বলেন, 'ভগবান সর্বজ্ঞ। সেই পূর্ণ পুরুষের সঙ্গে মানুষ যোগযুক্ত হলে তাঁর অজানা কিছুই থাকে না। জানবার ইচ্ছা হলেই হল।'

২২ কার্ত্তিক (১২৯৩) কাকিনীয়া ব্রহ্মমন্দিরে গোস্বামীপ্রভু ভাষণ দেন। উপাসনা, বক্তৃতা ও কীর্তনের ভিতর দিয়ে কাকিনীয়ায় জীবন্ত ধর্মের স্রোত প্রবাহিত করে অগ্রহায়ণ মাসের (১২৯৩) গোড়ার দিকে গোসাঁইজী ঢাকা প্রচারক-নিবাসে ফিরে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচারক-নিবাস উৎসবমুখর হয়ে উঠে। সারাদিনই লোকের ভিড়। অপরাহ্নে স্কুল-কলেজের ছাত্র, অফিসের লোক, বাউল, বৈষ্ণব, মুসলমান, খ্রীস্টানদের আগমনে ব্রহ্মমন্দির ও অঙ্গন গিজ্‌গিজ্‌ করে। একদিন সন্ধ্যায় সমাজগৃহে উপাসনার উদ্বোধনকালে প্রভু বলেন, 'সরল বিশ্বাসে ভগবানের নিকট কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি তা পূর্ণ করেন।' দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। 'ইউরোপের কোন দেশে দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টি হয়। এই সময় একটি শহরে কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যায় সকলে গির্জায় সমবেত হয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবেন বলে স্থির হয়। নির্দিষ্ট দিনে একটি বালক ছাতা হাতে গির্জায় উপস্থিত হলে কেউ কেউ তাকে বলেন, "কি হে বাপু, তুমি যে দেখছি একেবারে ছাতা নিয়ে এসেছ!" সে বললে, "বৃষ্টির জন্য সবাই মিলে প্রার্থনা

করবেন। বৃষ্টি নিশ্চয়ই হবে। তখন বাড়ী ফিরব কি করে, যদি ছাতা সঙ্গে না থাকে?” প্রার্থনার পর সত্যই মুষলধারায় বৃষ্টি হয়।’ গোসাঁইজী এইদিন ‘সরল বিশ্বাসে কাতরতার সহিত প্রার্থনা বিষয়ে’ সকলকে উপদেশ দেন।

অগ্রহায়ণ মাসে (১২৯৩) ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে মন্দির আর চারিদিকের প্রাঙ্গণে লোক ধরে না। বেদীতে উপাসনায় বসে দু-চার কথা বলেই গোস্বামী মহাশয় ভাবে বিভোর হয়ে বলতে থাকেন, ‘এই মা! এই যে আমার মা এসেছেন! মা আমার আজ তাঁর কাঙ্গাল ছেলেদের খাওয়াতে প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে এসেছেন। মা আমাকে প্রসাদ নিয়ে সাধছেন। মা, আজ আমি একা পাব না; সকলকে তুমি হাত ধরে তোমার প্রসাদ দাও, তবে আমি পাব।’ এই কথা বলে ভগবানকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেই যেন গদ্‌গদ ভাবে, করজোড়ে স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। তাঁর প্রতিটি কথায় উপস্থিত সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল, একটি অব্যক্ত অনির্বচনীয় ভাব সকলকে অভিভূত করে ফেলল। সেদিন গোস্বামীপ্রভু বেদীতে বসে উপদেশ দিলেন, ‘ধর্মকে জীবনে দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন না করিলে, উহা কখনও টেকে না, বেশী দিন স্থায়ী হয় না। পরমেশ্বরকে আমরা চার প্রকার অবস্থায় ডাকি। জল, বায়ু, আহার উত্তাপাদি দ্বারা যেমন এ দেহের রক্ষা হয়, পুষ্টি হয়; কোনটির অভাব হইলেই যেমন দেহ স্বভাব হইতেই তাহা চায়, না পাওয়া পর্যন্ত স্থির হইতে পারে না; সেই প্রকার আত্মার কল্যাণের জন্য, আত্মার উন্নতির জন্য পরমেশ্বরের উপাসনাও প্রয়োজন হয়। আত্মা স্বভাবতই পরমেশ্বরকে ডাকে, তাঁর উপাসনা করে; না হলে স্থির হতে পারে না। পরমেশ্বরের কাছে কোন আশা নাই, প্রার্থনা নাই; মুক্তিও চাই না, ভক্তিও বুঝি না। তিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁকে না ডেকে পারি না, তাই তাঁকে ডাকি; এই প্রকার স্বভাব হইতে যে তাঁকে ডাকা, ইহা বড়ই দুর্লভ এবং ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট।

‘অভাব বোধেও আমরা ভগবানকে ডাকি। কোনও একটা বিষয়ে তেমন অভাব বোধ হলে, তাহা পূরণ করবার জন্য যখন কাহাকেও পাই না, নিজের অভাব ক্লেশ দূর করতে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, চেষ্টা-সামর্থ্য যখন একেবারে পরাস্ত হয়ে যায়, তখন চারদিক অন্ধকার দেখে তাঁরই শরণাপন্ন হই, তাঁকেই ডাকি। এইভাবে ভগবানকে ডাকাও ভাল; ইহাতে জীবনের যথেষ্ট কল্যাণ হয়। কিন্তু অভাবে পড়ে তাঁকে ডাকলাম, অভাব পূরণ হলে, আর তাঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রইল না; রোগের যন্ত্রণায় পড়ে ডাকলাম, রোগ আরোগ্য হল, আর তাঁকে ভুলে গেলাম—এই প্রকার হলে এইভাবে ডাকায়, জীবনের কোন উপকারই হয় না। পরে কৃতজ্ঞতা থেকে গেলেই মঙ্গল, না হলে সমস্তই বৃথা।

‘জিজ্ঞাসুভাব সংশয় নিবৃত্তির জন্যও আমরা ভগবানকে ডেকে থাকি। শুনতে পাই ধর্ম বলে একটা বড়ই আশ্চর্য জিনিষ আছে; ধর্মকর্ম করলে, ভগবানকে ডাকলে কোনও ক্লেশই থাকে না, কোনরূপ অশান্তি নাকি অন্তরকে স্পর্শ করে না। আচ্ছা, একবার ধর্মকর্ম করে জপতপ করে, ভগবানকে ডেকে দেখাই যাক না কেন, সত্যই তাই কি না। হিন্দুধর্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম না কি ভাল। আচ্ছা, দিনকতক সমাজে গিয়ে দেখিই না কেন? লোক ধর্ম-ধর্ম করে কত স্বার্থত্যাগ করছে, কত অপমান নির্যাতন যন্ত্রণা ভোগ করছে! এর ভিতরে একটা কিছু আরামের বস্তু থাকতেও পারে। আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না কেন এতে কিছু আছে কি না—এই ভাবের লোকই আজকাল অধিক। এদের প্রার্থনা প্রভৃতি সন্দেহে

পরিপূর্ণ। ভগবানকে পরীক্ষা করতে যেন ইঁহারা আসেন। শ্রদ্ধাভক্তিশূন্য সংশয়াপন্ন মনে এসব লোক ভগবানকে ডেকে কোন ফল পান না।

'অনুকরণের ভাবেও আমরা ভগবানকে ডেকে থাকি। যাঁরা ধার্মিক, লোকে তাঁদের কেমন একটা সম্মান করে, ধার্মিক লোককে সকলেই বিশ্বাস করে! একটু একটু ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান করলে, ভগবানের নাম নিলে, লোকসমাজে যদি একটা প্রতিষ্ঠা হয়, ক্ষতি কি? মানুষ সম্মান লাভের জন্য কতই তো করে! আমি যদি একটু ধর্মের অনুকরণ করে কীর্তনাদিতে দু-চারবার "হরিবোল" বলে চীৎকার করলে ও লম্পঝম্প দিলে, বা উপাসনাতে একটু চোখের জল ফেললেই সেই সম্মান পাই, লাভ বই লোকসান তো কিছুই নাই। একবার দেখি না? এই প্রকার কপটভাবে ধর্মের অনুকরণ করা অতি নিকৃষ্ট। ইহাতে কল্যাণ তো কিছুই হয় না, বরং আত্মার অধোগতি হয়।'

মাঘোৎসব সমাগতপ্রায়। চারদিকে সাজ সাজ রব। ঘষা-মাজার কাজ চলছে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে। ডাঃ পি. কে. রায়ের উপর দেখাশোনার ভার। মালীকে হুকুম করেন ডাঃ রায়, 'ডাল ছাঁটাই কাঁচি নিয়ে এস, বাগানের গাছপালাগুলি সুন্দরভাবে ছেঁটে ফেল।' মালী হুকুম তামিল করতে শুরু করে দেয়। তার কাঁচি চলার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা যায় গোসাঁইজীর অস্ফুট কণ্ঠস্বর। ডাঃ রায় গোসাঁইজীর ঘরের দিকে ছুটে যান, গিয়ে দেখেন গোসাঁইজীর ছল ছল আঁখি, করুণ বেদনার্ত মুখচ্ছবি নিয়ে অসহায়ভাবে আসনে বসে কেবলই আঃ, উঃ করছেন। দুঃসহ বেদনা তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন রায়সাহেব, 'বুকে বুঝি খুব লাগছে?' মাথা নেড়ে অতি কষ্টে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করেন গোসাঁইজী। গোসাঁইজীর পুরাতন ব্যথাটাই আবার 'রিল্যাপ্‌স্‌' করেছে মনে করে রায়সাহেব ডাক্তার ডাকবার কথা বলায় গোসাঁইজী বাগানের দিকে হাত বাড়িয়ে মালীর কর্মকান্ডের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবার বুঝতে পারেন ডাঃ রায়। লজ্জায় তাঁর মুখমন্ডল রক্তিম হয়ে উঠে, তাড়াতাড়ি মালীকে আর ডালপালা ছাঁটতে বারণ করে দেন। বৃক্ষলতাগুল্মের প্রতি সমবেদনায় মানুষ এমন কাতর হয়ে পড়তে পারেন, এমন অবস্থা ডাঃ রায় ভাবতেও পারেন না। 'সর্বভূতে আত্মদর্শন' বিচিত্র এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, তিনি গোসাঁইজীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন; অনুতপ্তচিত্তে বার বার ক্ষমা চাইলেন তাঁর কাছে। গোসাঁইজী তখনও অঝোরে কাঁদছেন, দর-বিগলিতধারায় চোখের জল বয়ে নামছে তাঁর গন্ড বেয়ে। মহতের মহানুভবতা পরিমাপ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; তাঁদের ভাবনাই আলাদা।

২ পৌষ (১২৯৩) কুলদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধন হয়। সাধন পাবার কয়েকদিন পরই কুলদাকান্তকে বাড়ী যেতে হয়। বাড়ীতে পৌঁছেই দেখেন তাঁর মায়ের অবস্থা খুবই শোচনীয়, জীবন-মরণ আশঙ্কা। আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করেন তিনি, 'গোসাঁই মাকে বাঁচাও, তুমিই একমাত্র ভরসা।' ভাইঝিরও শুরু হয় ভেদ-বমি। ডাক্তার এসে রোগী দেখে নিরাশ হয়ে পড়েন, যাবার সময় বলে যান; 'মায়ের আশা কম, তবে তাড়াতাড়ি ঔষধ পড়লে ভাইঝি হয়ত সেরে উঠতে পারে।' ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে কুলদাকান্ত তখনই ঢাকায় ছোটেন ঔষধপত্র আনতে। ঢাকায় আসার পথে কুলদাকান্ত ঠিক করে ফেললেন সর্বাগ্রে তিনি গোসাঁইজীর কাছে গিয়ে মায়ের জন্য প্রার্থনা জানাবেন। একটি ডাক্তারখানায় ব্যবস্থাপত্রমত

ঔষধ তৈরি করতে বলে কুলদাকান্ত চলে আসেন গোসাঁইজীর কাছে। অসময়ে কুলদাকান্তকে দেখে গোস্বামীপ্রভু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি এসময় এখানে কুলদা! বাড়ী যাও নাই? ও, বাড়ী থেকে এলে বুঝি?' কুলদাকান্ত কিছু বলবার আগেই কেঁদে ফেললেন, কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'বাড়ী থেকে এইমাত্র এসেছি। মা আর ভাইঝির কলেরা হয়েছে, তাই ঔষধপত্র নিতে ঢাকায় এসেছি। ডাক্তার বলেছেন ভাইঝি বাঁচলেও বাঁচতে পারে, মায়ের আর জীবনের আশা নেই। এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা, মাকে ভাল করে দিন গোসাঁই।' গোসাঁইজী সকাতরে মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করছেন, 'মেয়েটি ছোট বুঝি, আঃ! তা আর দেরী কর না, শীগ্‌গীর ঔষধপত্র নিয়ে বাড়ী চলে যাও। গাঁয়ের লোকেরও অনেক উপকারে আসবে। মায়ের জন্য কোনই চিন্তা কর না কুলদা, মা ঠিক ভাল হয়ে যাবেন।'

বাড়ী পেঁ‌ৗছে কুলদাকান্ত শোনেন সকালবেলা তাঁর রওনা হবার পরই ভাইঝি মারা যায়; তবে মায়ের অবস্থা অনেকটা ভালর দিকে। কয়েক দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেন তাঁর মা, আর তাঁর আনীত ঔষধপত্র দিয়েই গ্রামের আরও কয়েকজনের চিকিৎসা করা সম্ভব হল। কুলদাকান্তের দৃঢ় ধারণা একমাত্র গোসাঁইজীর কৃপাতেই তাঁর মা ভাল হয়ে উঠেছেন।

মাঘ মাস (১২৯৩) আসতেই ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে মহা ধুমধাম পড়ে যায়। চারদিক থেকে অনেক গণ্যমান্য ব্রাহ্মভক্তজন আসছেন ঢাকায় মাঘোৎসবে যোগদান করবার জন্য। ময়মনসিংহ, রংপুর, বরিশাল, ফরিদপুর থেকে অনেকে এসেছেন, এসেছেন আরও দূরদূরান্ত থেকে। কলিকাতা থেকেও এসেছেন অনেক ব্রাহ্মভক্ত, এঁদের সকলেরই একমাত্র আকর্ষণ বিজয়কৃষ্ণ। কুমারখালি থেকে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ এসেছেন তাঁর দলবল নিয়ে। তিনি এসেই আসর মাতিয়ে তুলেছেন। প্রচারক-নিবাস লোকে পরিপূর্ণ। ১০ মাঘ প্রচারক-নিবাসে গোসাঁইজীর আসনের পাশে বসে ওঁরা গান ধরলেন—

মা, নই আমি সে ছেলে—
যার আছে সাধনের জোর,
সে কি মা তোর ভয় করে—
তুই ভয় দেখালে?

গোসাঁইজী আপন আসনের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সম্মুখের দিকে। সমস্ত শরীর তাঁর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে এক একবার কেবল 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে ভাবের ঘোরে লম্ফ দিয়ে উঠছেন। পড়ে যাবার উপক্রম হলেই শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ধরে ফেলছেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ এক সময় খল্ খল্ করে হেসে উঠলেন গোসাঁইজী। সে-হাসির তুলনা নেই। তাঁর প্রাণভুলান হাসির লহরী তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে সমগ্র পরিবেশটিকে এক অপূর্ব ভাবসম্পদে উদ্বেলিত করে তুলল। ঘরে-বাইরে সকলেরই এক অবস্থা, সকলেই ভাবে বিভোর; মনপ্রাণ সকলেরই আনন্দ-হিল্লোলে আন্দোলিত। ভাব-বিহ্বল গোসাঁইজী, সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছেন, 'ঐ দেখ, ঐ দেখ—তোমরা সকলে দেখে নাও; ঐ দেখ পাগল এসেছে। ঐ যে পাগলা দাঁড়ায়ে রয়েছে। পাগলা যেতে চায়।—ধর, ধর, ধর। না, আবার ফিরেছে। দেখ, দেখ, পাগলা যে এগিয়ে আসছে; ঐ দেখ, ঐ ঐ। বাব্বা!

কত বড় গুরু! ওটা কেমন দেখ,—বাঃ, ওর কপালে একটা চোখ, সেটার জ্যোতি কত!—সূর্যের মত, এ যে সূর্যই দেখছি! বাঃ, এ আবার কি? উঃ, কত বড় শিং! আহা!—ঐ দেখ নন্দীভৃঙ্গী। মনে করেছিলাম, ওরা কেউ নয়।—পাগলার সঙ্গে ওরা যে এদিকে আসছে।' একভাবে তাকিয়ে আছেন গোসাঁইজী, চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল তাঁর, আনন্দে উন্মথিত হয়ে করজোড়ে নমস্কার করতে করতে গোসাঁইজী বলে উঠলেন, 'জয় মা! জয় মা! সকলে দেখ আমার মা এসেছেন। ধন্য মা! ধন্য মা! আহা, কত যোগী, কত ঋষি মার চারদিকে নাচছেন! ঐ দেখ, শ্রীচৈতন্য, বাল্মীকি, নারদ, বশিষ্ঠাদি; আরও কত!—নাম জানি না। আহা! বাড়ীর সামনে সবটা যে ভরে গেল! এঁরা কত আনন্দ করছেন! আমার মাকে নিয়ে আনন্দ করছেন! আহা! ওখানে সকলেই তো আছেন; আমার পরিচিত কত লোকও যে আছেন। বাঃ আবার তামাসা দেখ,—মাও যে আমার সকলের সঙ্গে নাচছেন! ঐ দেখ, মা আমাকে ডাকছেন।' কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গোস্বামীপ্রভু ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে পড়লেন। উপস্থিত সকলে মুগ্ধ-বিস্ময়ে যন্ত্রবৎ যে যেখানে বসে এবং দাঁড়িয়ে রইলেন। গোস্বামীপ্রভু সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন। সেদিন সমাধি ভাঙ্গল তাঁর অনেক বেলায়।

১১ মাঘ প্রচারক-নিবাসে দুপুরবেলা সকলে আহারে বসেছেন। আহার্যবস্তু সব পাতে পড়ে রয়েছে, অথচ কারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই; সকলেই ভাবে মগ্ন। কেহই আহার করছেন না। কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় অনন্য ভাব নিয়ে খোল বাজিয়ে কীর্তন করছেন। সকলেরই তন্ময় অবস্থা, সকলেরই দৃষ্টি গোসাঁইজীর দিকে। খোলের অপূর্ব ধ্বনি-তরঙ্গ সমগ্র পরিবেশকে মাতিয়ে তুলেছে। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ে আছেন, কেউ আবার ডাল-ভাত, তরী-তরকারী সর্বাঙ্গে মাখছেন। কেউ বা পাতের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছেন। অবিরাম নামপ্রবাহ সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে পরমানন্দময় মর্ত্যের অমরাপুরে। গোসাঁইজী নিমীলিত চোখে আসনে বসে; মনে হচ্ছে যেন কোন অজ্ঞাতলোকে তিনি বিচরণ করছেন। তন্দ্রা-জড়িত তাঁর ঢুলুঢুলু ভাব। অনেকটা সময় এভাবে কেটে গেল। এক সময় সচকিত হয়ে স্থির হয়ে বসলেন গোসাঁইজী, কি যেন হারিয়ে ফেলেছেন; বেদনাভরা কণ্ঠে বললেন, 'অতলস্পর্শ মহাসাগরে একগণ্ডুষমাত্র জলে আজ গিয়ে পড়েছিলাম। সাগরের যে ঢেউ, এক ধাক্কায় আবার তীরে এনে ফেলেছে। আহা! এই মহাসাগরে যাঁরা একবার গিয়ে পড়েছেন, তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কত নৃত্য করছেন, কত আনন্দ করছেন।'

ভক্তদের সেদিন কার ভাগ্যে আহার জুটল কার বা জুটল না সে প্রশ্ন নেই, তাঁদের সকলের মধ্যেই দেখা দিয়েছে এক পরমাস্বাদিত রসাস্বাদনের পরিতৃপ্ত মুখচ্ছবি। সন্ধ্যা হতে না হতেই সমাজমন্দিরে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল। ঘরে-বাইরে কোথাও স্থান সংগ্রহ করতে না পেরে অনেকে মন্দির-সংলগ্ন রাস্তায় এসে স্থান সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা আজ গোসাঁইজীর ভাষণ শুনবেন বলে বহু দূরদূরান্ত থেকে এখানে এসেছেন। গোসাঁইজী সারাদিনই আজ ভাবে বিভোর হয়ে আছেন। সন্ধ্যার সময় ভক্তবৃন্দের সহায়তায় কোনক্রমে তিনি ঢুলতে ঢুলতে এসে বেদীতে বসলেন। যথারীতি উদ্বোধন-সঙ্গীত সহযোগে বেদীর কাজ আরম্ভ হল। প্রার্থনার সময় গোসাঁইজী ভগবৎ-স্তুতি করতে করতে কেঁদে ফেললেন। সমবেত সকলেরই অবস্থা তখন কাঁদকাঁদ। ভগবানের আবির্ভাবজনিত

প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র ব্রহ্মমন্দিরের পরিবেশটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। গোসাঁইজী কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'মা, এসেছ? আহা! তোমার সঙ্গে কত লোক! ঐ যে কত মুনি, কত ঋষি, কত সাধুমহাত্মা রয়েছেন! মা, তোমার চারদিকে কত আনন্দে এঁরা নৃত্য করছেন! ওখানে আমার পরিচিতও তো কত লোক দেখছি! মা, আমাকে ডাকছ কেন? আমি কি ওখানে যেতে পারি? তুমি দয়া করে আমায় হাতে ধরে নিবে? আমার যে যাবার ক্ষমতা নাই। আর, আমি যাবই বা কোথায়? ওখানে? না, তা কি হয়? কেন মা,আমায় ফাঁকি দিচ্ছ? আমার কি সাধ্য ওখানে যেতে পারি, ঐ স্থানে বসতে পারি? মা, আমাকে ওখানে বসতে দিবে, বারবারই বলছ কেন? আমি যে নিতান্ত পাপী। ঐ সব মুনি ঋষিদের সামনে আমি কি করে বসব মা?’ আর কথা বলতে পারলেন না গোসাঁইজী, সম্বিত হারিয়ে ফেললেন। ভক্তগণ গান শুরু করলেন, অনেকক্ষণ চলল সংকীর্তন; কিন্তু তাতেও কিছু হল না। গোসাঁইজী একই ভাবে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় বেদীর উপর বসে, ভক্তগণও তাঁর চারপাশে নাম নিয়ে বসে আছেন।

এবারকার মাঘোৎসবে একটি বিশেষ অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অগণিত জমসমাগমে সমাজ-অঙ্গন সকল সময়ই পরিপূর্ণ হয়ে থাকছে; মন্দির-প্রাঙ্গণে স্থান সংকুলান করতে না পেরে, অনেকে রাস্তার ধারেও বসে পড়ছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তজন আসছেন গোসাঁইজীর আকর্ষণে, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবার জন্য। গোসাঁইজীর বর্তমান অবস্থার কথা তিনি যে কিছু বলতে পারছেন তাও নয়, তবুও লোক সমাগমের বিরতি নেই; বরং উত্তরোত্তর তা বেড়েই যাচ্ছে। কত লোক যে প্রতিদিন এসে গোসাঁইজীকে দেখে যাচ্ছেন, তাঁদের অন্তরের আবেদন জানিয়ে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করে যাচ্ছেন, তার ইয়ত্তা নেই। ব্রাহ্মসমাজের এই শ্রীবৃদ্ধিতে ভক্তজন খুবই উল্লসিত। তাঁরা দেখছেন প্রতিদিন অগণিত জনসাধারণ সমাজে আসছেন এবং যাবার সময় ফিরে যাচ্ছেন অপূর্ব আত্মপ্রসাদ নিয়ে। জীবন্ত দেবতার পুণ্য প্রভাবে তাঁরা সঞ্জীবিত হয়ে উঠছেন। সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী কিন্তু গোসাঁইজীর এই ভাবধারাকে বিশেষ সুনজরে দেখছেন না। এঁরা গোসাঁইজীকে নিয়ে অন্য পাঁচজনের নিকট বিশেষ গর্ব করেন বটে, তবে তাঁর ভাবধারা সব সময় বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি যে কোন্ মতের উপাসক. সাকার না নিরাকার, তাও তাঁরা ঠিক ধরতে পারছেন না; অথচ গোসাঁইজীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবার সাহসও তাঁদের নেই।

১২ মাঘ সন্ধ্যায় সমাজমন্দিরে গোসাঁইজী 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবাদী' বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। যথারীতি সমাজমন্দির লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে। এত ভিড় যে মন্দিরের সম্মুখস্থ পথ দিয়ে লোক চলাচলও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্থানীয় রোমান ক্যাথলিক গির্জার অন্যতম পাদরী বার্নার্ড সাহেবকেও দেখা যাচ্ছে, সেদিন এই জনারণ্যের এক কোণে গোসাঁইজীর বক্তৃতা শোনবার জন্য অধীর ভাবে অপেক্ষা করছেন তিনি। সন্ধ্যার একটু পরে গোসাঁইজী ভক্তজনসহ সমাজমন্দিরে এলেন। চারদিক থেকে জয়ধ্বনি উঠল। গোসাঁইজী সকলকে করজোড়ে অভিবাদন জানিয়ে বেদীতে বসলেন। আজও গোসাঁইজীর সেই তন্ময়ভাব, তবুও যথারীতি প্রার্থনান্তে বক্তৃতা শুরু করলেন, 'পুরাকালে বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, সনক-সনাতনাদি ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, শাস্ত্র-পুরাণ-বেদ-বেদাঙ্গ-উপনিষদাদি যে ব্রহ্মের মহিমার কণিকামাত্র বর্ণন করিতে গিয়া, পার না পাইয়া "অব্যক্ত অনির্বচনীয়"

বলিয়া নির্বাক হইয়াছেন, তুচ্ছাদপি তুচ্ছ অজ্ঞান আমি, আমার মুখে আজ আপনারা সেই মহান্ ব্রহ্মের কথা শুনিতে আসিয়াছেন!' আর গোসাঁইজী বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলেন না। অবোধ শিশুর মত হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। বার বার চেষ্টা করেও তিনি কিছু বলতে পারছেন না, কান্নায় সমস্ত কথা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মহর্ষিগণের ধ্যানগম্য পরাৎপর পরব্রহ্মের বিষয়ে যখনই কিছু বলছেন, তখনই আবার কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। কিছুক্ষণ এইভাবে দুচার কথা বললেন বটে, কিন্তু শেষটায় আর পারলেন না। ভাবের অদম্য আবেগ সংবরণ করা আর সম্ভব হল না, গোসাঁইজী বেদীতে বসে করজোড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন; 'আজ আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন। আপনারা সকলে দয়া করে আমার মস্তকে পদাঘাত করে আমার অহঙ্কার চূর্ণ করুন। আমি ভয়ানক অভিমানী—আমি তাঁর কথা বলব। আমি কি জানি? আমি ছাই! আমি ছাই!' কথাগুলি বলেই গোসাঁইজী অস্ফুট স্বরে সেই অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় পুরাণপুরুষের স্তব আবৃত্তি করতে লাগলেন। সামান্য সময়ের মধ্যেই ভাবমগ্নাবস্থায় তিনি 'ত্বং হি' 'ত্বং হি' বলতে বলতে পরিপূর্ণভাবে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। বহুজন-পরিপূর্ণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির একেবারে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করল। সকলেই যেন সেই অজ্ঞাত-পুরুষের সন্ধান পেয়েছেন, সকলেই যেন ভাবসমৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। বক্তৃতা শুনে তাঁরা কতটা কি পেতেন তা বলা মুস্কিল, তবে তার চাইতেও অনেক বেশী তাঁরা পেলেন গোসাঁইজীর না-বলা কথায়। গোসাঁইজীর সান্নিধ্যে এসে তাঁরা ধন্য হয়েছেন; ধন্য পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ!

১৫ মাঘ ব্রাহ্মভক্তগণের আন্তরিক অনুরোধক্রমে সেখানকার 'সারস্বত উৎসবে' যোগদান করবার জন্য গোসাঁইজী ময়মনসিংহ যান। গোসাঁইজীর উপস্থিতি এবং তাঁর প্রাণস্পর্শী আবেদনে সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় তাঁর তখনকার বিবরণীতে গোসাঁইজী সম্পর্কে একটি বিশেষ সংবাদ ধরে রেখেছেন, 'যিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দিগ্বিজয়ী বক্তারূপে যুগধর্মের বিজয়ভেরী বাজাইয়া পূর্ববঙ্গ বিকম্পিত এবং সর্বত্র নবজীবনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, যিনি শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানে নবভক্তির সঞ্জীবনীসুধা মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মধর্মে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, আর বর্ণিত সময়ে যাঁহার মুখে অমৃতময় "মা" নাম শুনিয়া কত শুষ্ক ও মলিন হৃদয় বিগলিত হইতেছিল, এই শেষবার আমরা তাঁহার পবিত্র সঙ্গ লাভ করিলাম; ময়মনসিংহে আর তাঁহার পদধূলি পতিত হয় নাই; ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আর সেই অমৃতবাণী শ্রবণ করি নাই।' ২০ মাঘ শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা ও তাঁহার তৃতীয় পুত্রের নামকরণ উৎসব সমাপন করে গোসাঁইজী ঢাকায় ফিরে আসেন।

সময় নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই গোসাঁইজীকে বেরিয়ে পড়তে হবে। অনেক আগেই ঠিক হয়ে আছে দ্বারভাঙ্গা যাবার কথা। গোসাঁইজীর আন্তরিক ইচ্ছা দ্বারভাঙ্গা যাবার আগে তিনি একবার গয়ায় যান। এদিকে বর্ধমানের উৎসবেও উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ রয়েছে, তাই আর বিলম্ব না করে অচিরেই রওনা হবেন স্থির করলেন গোসাঁইজী। ১০ ফাল্গুন শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে গোসাঁইজী কলিকাতা আসেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ-সময় চুঁচুড়ায় অবস্থান করছেন। গোসাঁইজী বর্ধমান উৎসবে যোগদান করার আগে মহর্ষিদেবের সঙ্গে দেখা করে যাবেন। শ্যামনগর হয়ে গঙ্গা

পার হয়ে চুঁচুড়া এলেন গোসাঁইজী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এখানে প্রায় সারাদিনই ধ্যানধারণা আর অধ্যয়ন নিয়েই আবদ্ধ আছেন। ভক্তি-পথের সমুজ্জ্বল প্রভায় তিনি তখন দেখছেন তাঁর মানস-প্রতিমাটিকে; স্বভাবতই এ সময় গোসাঁইজীকে পেয়ে তিনি খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। গোসাঁইজীকে পরমস্নেহে জড়িয়ে ধরে বললেন দেবেন্দ্রনাথ, 'আহা! সকলে বলে "গোসাঁই পাগল হয়েছেন, পৌত্তলিকের ন্যায় ব্যবহার করেন"; কিন্তু কই? আমি তো এঁকে ধূপ-ধুনার সুগন্ধ-ধূমাবৃত উজ্জ্বল দুর্গাপ্রতিমার ন্যায় দেখছি।' কতকাল পর মহর্ষি তাঁর মনের মানুষকে পেয়েছেন; তাই আনন্দ আর ধরে না। এমন মানুষের বিরুদ্ধেও অভিযোগ এসেছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। মহর্ষি তাঁদের অভিযোগ মানতে প্রস্তুত নন। নিত্য-সঙ্গী প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে ডেকে বলেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, 'লিখে দাও এখন হতে.........গোসাঁই যাহা বলেন, তাহা আমারই কথা।'

চুঁচুড়া থেকে গোসাঁইজী বর্ধমানে আসেন। নবকুমার বাগচী মহাশয়ও এখানে এসে মিলিত হন। উদয়াস্ত ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা চলে, কলিকাতা থেকেও অনেক নামকরা ব্রাহ্মভক্ত এখানকার উৎসবে যোগদান করেন। গোসাঁইজীর ব্রজলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সকলে মুগ্ধ হন, বর্ধমান ব্রজধামে রূপান্তরিত হয়। এখানেই একদিন দুপুরবেলা একটি পলাশগাছের দিকে তাকিয়ে আত্মসমাহিত হয়ে পড়েন গোসাঁইজী, প্রতিটি পলাশপুষ্পে তিনি দেখতে পান ষড়ৈশ্বর্যশালিনী দেবী ভগবতীর আত্মপ্রকাশ; আর একদিন এমনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন বর্ধমান মহারাজের গোলাপবাগে গিয়ে। গোলাপ ফুলের শোভা ও সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে পড়েন গোসাঁইজী, ভাবনা চলে যায় অনন্তবিলাসী প্রেমময় স্রষ্টার স্বরূপ-সাধনায়। বর্ধমান অবস্থান কালে এবার কুঞ্জবিহারী গুহ, দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গোসাঁইজীর নিকট থেকে যোগসাধন পান। এখান থেকে গোসাঁইজী গয়ার পথে বাঁকিপুর যান। বাঁকিপুরে কয়েকদিন অবস্থান করে তিনি চলে আসেন গয়ায়। গয়ায় আকাশগঙ্গা পাহাড়ে সশিষ্য গোসাঁইজী রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমে অবস্থান করতে থাকেন। এখানেই বাঁকিপুরের উকিল ব্রজেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় গোসাঁইজীর নিকট থেকে সাধন পান। এই উপলক্ষে ব্রজেনবাবু বিশেষভাবে সাধুসেবার ব্যবস্থা করলেন। রঘুবরদাস বাবাজীর আর আনন্দ ধরে না, অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করে তিনি সকলের সেবা করলেন। কয়েকদিন পরম আনন্দে কেটে গেল, অতঃপর এখান থেকে গোসাঁইজী সশিষ্য রওনা হলেন দ্বারভাঙ্গায়।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি মোকামাঘাট হয়ে গোসাঁইজী দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছলেন। দ্বারভাঙ্গায় রাধাকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় অনেক দিন থেকেই গোসাঁইজীর আগমন অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছেন।

গোসাঁইজীর আগমনে রাধাকৃষ্ণবাবুর গৃহ মধুবৃন্দাবনে রূপান্তরিত হয়। আনন্দের হাট বসে। চারদিক থেকে জনসমাগম হতে থাকে, সর্বত্র ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি শোনা যায়। কয়েকদিন দিবারাত্র অসম্ভব পরিশ্রমে গোসাঁইজী কঠিন পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অবস্থার ক্রমাবনতিতে সকলে খুব সংশয়াকুল হয়ে ওঠেন। অনতিবিলম্বে গোসাঁইজীর পরিবারের সকলকে দ্বারভাঙ্গায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। দিনের পর দিন অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে; বুকের ব্যথায় পাশ ফিরতেও পারছেন না গোসাঁইজী; ফুসফুসে জল জমেছে, উদরী বলেও কয়েকজন চিকিৎসক

সন্দেহ করছেন। বাঁ-কাত হয়ে একটানা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছেন। মলমূত্র পরিষ্কার ও সেবাযত্নের দিক থেকে যেভাবে শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ঘোষ এবং নবকুমার বাগচী মহাশয় করছেন, তার তুলনা নেই। পণ্ডিত মহাশয়ের সেবাযত্নের কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে গোসাঁইজী একদিন বলেছিলেন, 'পণ্ডিত মহাশয়—আমার পিতা। পিতার মত তিনি দ্বারভাঙ্গায় আমার সেবাযত্ন করেছিলেন। এ ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।' বাঁকিপুর, সমস্তিপুর প্রভৃতি নানা জায়গা থেকে নামকরা সমস্ত ডাক্তারগণ আসছেন; স্থানীয় ডাক্তারগণের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে, কিন্তু রোগ উপশমের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না; বরং অবস্থার অবনতি হচ্ছে দিনের পর দিন। চারদিক থেকে টাকাপয়সা ও শুভকামনা-সূচক চিঠিপত্র আসছে। কলিকাতা থেকে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, 'গোস্বামী মহাশয় কেমন থাকেন জানাবেন। আরও টাকা পাঠাচ্ছি। চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়।' দীর্ঘদিন রোগভোগ করে গোসাঁইজীও বেঁকে বসেছেন, আর ঔষধ খাবেন না তিনি। প্রায় এক মাস হয়ে গেল; ঔষধপত্র, পথ্যাপথ্য, স্নেহ-যত্ন—অনেক ওজর-আপত্তি সহ্য করেছেন গোসাঁইজী; কিন্তু এখন আর পারছেন না। বার বার আকুতি করে বলছেন তিনি, 'ঔষধ খেয়ে কি হবে? ঔষধে কি রোগ সারে? রোগ ভাল হয় ভগবানের কৃপায়।' আর ঔষধ খাবেন না গোসাঁইজী। অনেক অনুনয়-বিনয় করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সম্মত করান হয় গোসাঁইজীকে। নবীন ভক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে প্রায় সর্বক্ষণ বসে আছেন গোসাঁইজীর পাশে। এদিকে ঢাকায় গোসাঁইজীর কঠিন পীড়ার কথা সবাই জেনে ফেলেছেন। গোসাঁইজীগত-প্রাণ শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয় উপায়ান্তর না দেখে বারদী এসেছেন, কাতর অনুনয়ে ব্রহ্মচারীকে বলছেন, 'আমার অর্ধেক আয়ু দিয়ে গোসাঁইজীকে বাঁচান।' ব্রহ্মচারী গোসাঁইজীর কঠিন অসুস্থতার কথা শুনে খুবই ভাবিত হয়ে পড়লেন; তারপর কিছুক্ষণ সময় দুচোখ বন্ধ করে নীরবে বসে রইলেন তাঁর আসনে। গুরুভক্তি-পরায়ণ শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয়ের উৎকণ্ঠিত অবস্থা দেখে খুবই মুগ্ধ হলেন ব্রহ্মচারী; অভয় দিয়ে বললেন তাঁকে, 'সময় শেষ করে এসেছিস। দেখি কি করতে পারি।' এদিকে দ্বারভাঙ্গা যাত্রাপথে গোসাঁইজীর পরিবারের সকলে বিমর্ষভাবে গোয়ালন্দের জাহাজে বসে আছেন। হঠাৎ যোগজীবন আকাশপথে ব্রহ্মচারীকে দেখতে পান। ব্রহ্মচারী যেন অভয় দিচ্ছেন যোগজীবনকে। যোগজীবন আশ্বস্ত হলেন সত্য, কিন্তু তাঁর দুর্ভাবনা কমল না। এদিকে গোসাঁইজীর জীবনদীপ নির্বাপিতপ্রায়। চিকিৎসকগণ জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁদের ধারণা দু-একদিনের মধ্যেই গোসাঁইজী দেহরক্ষা করবেন। পরিচিত, অপরিচিত কত জন কত দূরদূরান্ত থেকে এসে গোসাঁইজীকে দেখে যাচ্ছেন। আসছেন ভক্ত-বান্ধব, আত্মজন, আসছেন সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির-বাউল। কেউ বা গোসাঁইজীর অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন, কেউ বা শুধু গোসাঁইজীকে একবার দেখেই চলে যাচ্ছেন। এমন অবস্থার মধ্যেই এলেন একদিন সৌম্যদর্শন অতি বৃদ্ধ এক সাধু। ভোরবেলা তিনি এলেন, গোসাঁইজীর ঘরের বারান্দায় বসে বেশ খানিকক্ষণ কাটিয়েও গেলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না, জানতে পারলেন না। গোসাঁইজীগত-প্রাণ জ্ঞানেন্দ্রমোহন সকালবেলা গোসাঁইজীর ঘরে ঢোকার পথে এই অনন্যদর্শন সাধুটিকে প্রণাম করলেন বটে, কিন্তু তাঁর পরিচয় জানবার কোন

সুযোগ নিলেন না। গুরু-শিষ্য-সংবাদ সকলের অজ্ঞাতই রয়ে গেল। এ দিনটা ভালভাবেই কাটল, গোসাঁইজীকে আজ যেন বেশ প্রফুল্ল মনে হল। সন্ধ্যার দিকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন সকালবেলার অনন্যদর্শন সেই সাধুর কথা উত্থাপন করায় গোসাঁইজী ক্ষীণকণ্ঠে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আজ পরমহংসজী আসিয়াছিলেন। সময় হয় নাই বলিয়া তিনি তোমাদের নিকট পরিচয় প্রদান করেন নাই।' এই দিনই সন্ধ্যার পর গোসাঁইজীর শয্যার পাশে ভক্তদের অনেকে ক্ষণিকের জন্য একসঙ্গে তিনজন সাধুকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখেছেন, এঁদের একজনকে বারদীর ব্রহ্মচারী বলে তাঁদের মনে হয়েছে।

পরদিন রবিবার। অনেক ব্রাহ্মভক্ত এসে জড় হয়েছেন রাধাকৃষ্ণবাবুর বাসায়। গোসাঁইজীর জন্য সকলেই খুব চিন্তিত, বিষাদক্লিষ্ট। গোসাঁইজীর পাশের ঘরে উপাসনায় বসলেন তাঁরা। কিছুতেই মন বসাতে পারছেন না তাঁরা উপাসনায়, কেবলই গোসাঁইজীর রোগজীর্ণ চেহারাটাই বার বার ভেসে উঠছে তাঁদের সামনে। কোনপ্রকারে অতি ধীরে সন্তর্পণে উপাসনা শেষ করে মৃদুভাবে সংকীর্তন আরম্ভ করলেন তাঁরা। নামের আকর্ষণে গোসাঁইজী যেন আজ বেশ সজাগ হয়ে উঠলেন। সকলের সমস্ত প্রকার নিষেধ, অনুরোধ, আপত্তি অবহেলা করে তিনি উঠে বসলেন তাঁর শয্যায়; তারপর কখন যে সবার অলক্ষ্যে নিমেষের মধ্যে এসে পড়েছেন পাশের ঘরে, যোগ দিয়েছেন কীর্তনানন্দে, তা কেউ বুঝতেও পারছেন না। সবাই কি হল কি হল করছেন, আর এদিকে গোসাঁইজী কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কে বলে গোস্বামীপ্রভু চলচ্ছক্তিহীন, মৃত্যুপথযাত্রী? এ যেন তাঁর আর এক রূপ, সজীব সদানন্দময়, অপরূপ শোভায় আসরে অবতীর্ণ নবদুর্বাদলকান্তি নিয়ে স্বয়ং শ্যামরায়! ভক্তগণ ভুলে গেলেন, গোস্বামীপ্রভু অসুস্থ। গৃহের অন্যান্য পরিজন বার বার চেষ্টা করেও এ বিষয়ে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছেন না। মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি চারদিক মাতোয়ারা করে তুলেছে। গোস্বামীপ্রভু ভাবে বিভোর, কখনও মুরলীমোহন ভাবরূপে ত্রিভঙ্গ হয়ে মধুর নৃত্যছন্দে, কখনও বা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে উদ্দাম নৃত্যে সমস্ত পরিবেশটিকে আরও ভাবোন্মাদ করে তুলছেন।

কর্তা স্বয়ং ভগবান। মানুষ ভুল করে মাঝে মাঝে কর্তা সেজে বসে কিন্তু সে কর্তাত্তি যে কত ঠুনকো তা সহজেই ধরা পড়ে যায়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কথা ফলল না, গোস্বামীপ্রভু সকলকে স্তম্ভিত করে অনিবার্য মৃত্যুদিনেই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভ করলেন। পরদিনই গোস্বামীপ্রভু অন্নপথ্য করবেন। ভগবৎকৃপায় এইদিনই সকালবেলায় গোস্বামীপ্রভুর পরিবারের সকলে দ্বারভাঙ্গায় এসে পৌঁছলেন। যোগমায়াদেবী এসে পড়ায় তিনিই রোগীর পথ্য রন্ধন করে গোসাঁইজীকে অন্নপথ্য করালেন।

প্রায় আড়াই মাস পর ১৯ জ্যৈষ্ঠ (১২৯৪) গোসাঁইজী সপরিবারে শিষ্য ও ভক্তদের নিয়ে দ্বারভাঙ্গা থেকে দেওঘর রওনা হন। আসার পথে রেললাইনের দুদিকের লিচুবাগান দেখছেন গোসাঁইজী। লিচু পাকার আগেই তাঁরা চলে যাচ্ছেন, মজফরপুরের লিচু আর এবার খাওয়া হল না বলে রহস্য করে বলছেন গোসাঁইজী, 'এজন্য হয়তো মজফরপুরে লিচুর পোকা হয়ে জন্মাতে হবে।' গোসাঁইজীর রহস্য-ভরা কথার সূত্র ধরে পার্শ্ববর্তী একজন হিন্দুস্থানী মহাজন গোসাঁইজীকে অনেকগুলি সুপক্ক লিচু উপহার দেন। গোসাঁইজী লিচুগুলি গ্রহণ করলে খুব কৃতার্থ

হবেন জানালেন তিনি। টোপা টোপা বড় বড় এমন সুপক্ক ফল বড় একটা দেখা যায় না; এর আস্বাদও অমৃততুল্য। কিন্তু যিনি দাতা, তিনি আর তখন সেখানে নেই। সকলেই অবাক হলেন এই হিন্দুস্থানী মহাজন ব্যক্তিটির অদর্শনে; কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আর সম্ভব হল না তাঁদের। গোসাঁইজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি হেসে বললেন, 'এই অসময়ে পরমহংসজী ছাড়া এমন আদর করে আর কে লিচু দেবেন।' সকলে অবাক। ভক্তজনের প্রতি পরমহংসজীর অপরিসীম স্নেহ ও প্রীতির কথা ভেবে নতমস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তাঁরা।

দেওঘরে সশিষ্য গোসাঁইজী তাঁর ভায়রাভাই ক্ষেত্রনাথ বাগচীর গৃহে উঠলেন। কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটল সবার। গোসাঁইজী প্রতিদিন সকালবেলা রাজনারায়ণ বসুর বাসায় যান; সেখানে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে তাঁদের আলাপ-আলোচনা চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। একদিন আলোচনা এমন জমে উঠেছিল যে বলার নয়; দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেল, অথচ কারও খেয়াল নেই সেদিকে। তাঁরা উভয়েই যেন তখন অন্য জগতে বাস করছিলেন।

দেওঘর থেকে গোসাঁইজী ২৯ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা পৌঁছেন। কলিকাতায় বন্ধুবর গুরুচরণ মহালনবিশের বাড়ীতে একদিন থেকে, সকলকে নিয়ে তিনি পরদিন শান্তিপুর যান। পরের দিন চুয়াডাঙ্গায় এসে পরিবারের সকলকে কুমারখালি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে নবকুমার বাগচী মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে একটা গরুর গাড়ী করে রওনা হন মাতুলালয় শিকারপুরে। গোসাঁই-জননী স্বর্ণময়ী দেবী তখন ঘোর উন্মাদাবস্থায় শিকারপুরে আছেন। মায়ের এই নিদারুণ অবস্থায় একমাত্র শুশ্রূষাকারিণী গোসাঁইজীর সম্পর্কিত এক মাসি। তিনিই তাঁর দিদির সেবাযত্ন করছেন, সমস্ত ধকল তাঁর উপর দিয়েই যাচ্ছে। এ সমস্ত খবর সবই গোঁসাঁইজী জানতে পেরেছেন দ্বারভাঙ্গা থাকাকালীন। শিকারপুরে মাতুলালয় পৌঁছতেই গোসাঁইজীকে দেখে মাতুল বেণীমাধব জোয়ারদার আনন্দে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'দিদি! তোমার বিজয়কৃষ্ণ এসেছে দেখ।' উন্মাদিনী হলে কি হবে; পুত্রের নাম শুনেই বেরিয়ে পড়েছেন ঘর থেকে, আলুথালু অবস্থায় প্রায় অর্ধনগ্নবেশে। বার বার তাকিয়ে দেখছেন তিনি, মনে হয় যেন ঠিক চিনতে পারছেন না বিজয়কৃষ্ণকে। গোসাঁইজী মা বলে প্রণাম করতেই দুপা পিছিয়ে গেলেন স্বর্ণময়ী দেবী, তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে উঠলেন, 'ধ্যাৎ, এ কোথাকার একটা ভূত! কে তুই? আমার ছেলের দাড়ি হবে কেন? বিজয়কৃষ্ণ আমার সোনারচাঁদ।' মাতাপুত্রের মিলন হয়েও হল না; বড়ই ব্যথিত হলেন গোসাঁইজী। মাতুলের সঙ্গে মায়ের চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হল তাঁর। গোসাঁইজী ভগবৎকৃপায় বিশ্বাসী; তাই মায়ের প্রশ্নেও তিনি প্রাকৃতিক চিকিৎসা ভিন্ন অন্য কিছু অনুমোদন করতে পারলেন না। যে মায়ের সন্তান সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী, সেই মায়ের অবস্থা কোন বিশেষ অবস্থার অনুবর্তিনী না হয়ে পারে না। গোসাঁইজী চিন্তান্বিত হলেও মায়ের এই বিশেষ অবস্থাটি বিশেষভাবেই লক্ষ্য করে দেখেছেন। পরমকারুণিক ভগবানই একমাত্র ভরসা, তিনিই সর্বরোগহর; তাঁকে নির্ভর করে চলাই মায়ের সুচিকিৎসা। পরদিন রওনা হলেন গোসাঁইজী কুমারখালির পথে। কুমারখালিতে কাঙ্গাল হরিনাথ ছাড়বার পাত্র নন। গোসাঁইজীর উপস্থিতির ষোল আনা উসুল করে নেবেন তিনি। আনন্দবাজার বসে গেল কুমারখালিতে। এর পর কুমারখালি থেকে সকলকে নিয়ে

গোসাঁইজী বারদী হয়ে ঢাকায় ফিরলেন আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহেই।

গোসাঁইজী ঢাকায় ফিরে আসার পর থেকেই প্রচারক-নিবাস আবার সরগরম হয়ে উঠল। প্রতিদিন নানা সম্প্রদায়ের ধর্মার্থী, ভক্তবৈষ্ণব, আউল-বাউল, ফকির-দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড় বাড়তে লাগল। প্রচারক-নিবাসে গঞ্জিকা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য গ্রহণ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ছিল, অথচ বিভিন্ন শ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তজনের আনাগোনায় ওই নিয়ম বিঘ্নিত হতে লাগল। একদিন কয়েকজন সাধু প্রচারক-নিবাসে গোসাঁইজীর সঙ্গে দেখা করতে এসে এক অবসরে গঞ্জিকা সেবন করলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মগণ এই অনিয়ম সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। একটা চাপা অসন্তোষ ক্রমশ যেন দানা বেঁধে উঠতে লাগল। এ সমস্ত বিষয়ে কয়েকবার গোসাঁইজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেও তেমন কোন ফল হয় নি। এর মধ্যে একদিনের ঘটনা বড়ই দৃষ্টিকটু হয়ে পড়ল। শ্রাবণ মাস, প্রচারক-নিবাসের আঙ্গিনায় সঙ্কীর্তন হচ্ছে। আনন্দ-কোলাহলে সমস্ত অঙ্গন পরিপূর্ণ। অঙ্গনের চারদিকে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে সঙ্কীর্তন শুনছেন। অনেকেই ভাবাবেশে বিভোর হয়ে আছেন। গোসাঁইজীর অন্যতম ভক্ত শ্রীধর ঘোষ কীর্তনানন্দে নৃত্য করতে করতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন, এবং এই অবস্থার মধ্যেই মাঝে মাঝে "আল্লা-হো-আকবর" "আল্লা-হো-আকবর" ধ্বনিতে সমস্ত অঙ্গন কাঁপিয়ে তুলছেন। ভাবাবিষ্ট শ্রীধরকে একজন গণ্যমান্য ব্রাহ্মভক্ত জড়িয়ে ধরে নিজেও ভাবগঙ্গায় অবগাহন করছেন, এমন সময় শ্রীধর ঘোষ উচ্চলম্ফ সহকারে আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতে লাগলেন, 'ঐ দেখ কালী, ঐ দেখ কালী; জয় মা কালী, জয় মা কালী।' নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মভক্ত এতক্ষণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে শ্রীধরকে জড়িয়ে ধরে ছিলেন, কিন্তু এবার যখন 'ঐ কালী' শব্দটি শ্রীধর উচ্চারণ করেছেন অমনি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'দূর শালা! "পরব্রহ্ম বল", "পরব্রহ্ম বল"।' অতঃপর বাদ-প্রতিবাদ উত্থিত হতে লাগল, কীর্তন আর জমল না।

ঘটনাটির ফল সুদূরপ্রসারী হল। যাঁরা গোসাঁইজীর নিকট থেকে যোগসাধনে দীক্ষালাভ করেছেন, আর যাঁরা ব্রাহ্মধারামতে দীক্ষালাভ করেছেন, তাঁরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপর সামান্য কারণেই প্রচারক-নিবাসে নানা বিতণ্ডা উপস্থিত হতে লাগল। যোগসাধনাশ্রিত ভক্তগণের বেশীর ভাগই ছিলেন ভাবরাজ্যের মানুষ, অতিশয় সরল ও নিরহঙ্কার প্রকৃতির। বাদ-প্রতিবাদে তাঁরা বড় একটা জড়িত হতে চাইতেন না, তবে যখন বিষয় বিস্তারিত হয়ে গোসাঁইজী প্রতিপক্ষের বিশেষ আক্রমণস্থল হয়ে পড়তেন, তখন তাঁরাও অত্যন্ত কঠোরভাব ধারণ করতেন।

ভাদ্র ১২৯৪ জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের সহধর্মিণী মনোরমা দেবী ঢাকায় আসেন। মনোরঞ্জনবাবুর বিনীত প্রার্থনায় এই সময় কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে গিয়ে গোসাঁইজী মনোরমাদেবীকে সাধন দিলেন।

এমনিতেই গোসাঁইজীর শরীরের অবস্থা তেমন ভাল যাচ্ছিল না, কঠিন রোগ ভোগের পর যে বিশ্রামের আশু প্রয়োজন ছিল, তাও গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। এর উপর প্রচারক-নিবাসের বর্তমান অবস্থা গোসাঁইজীর প্রাত্যহিক জীবনে গভীর প্রতিক্রিয়া করতে লাগল। নীরব দর্শক হয়ে সব কিছু দেখছেন তিনি, আর ক্রমশ' যেন আরও স্থির ও গম্ভীর হয়ে পড়ছেন। মনে হচ্ছে যেন তিনি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলছেন। দিন-রাত্রির বেশীর ভাগ সময়ই তন্ময় হয়ে ইষ্টচিন্তায়

নিমগ্ন হয়ে থাকেন। কখনও সম্বিত থাকে, কখনও থাকে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাসনে বসে এমনি অবস্থায় গোসাঁইজীর দিন কাটছে। বাইরের প্রাকৃতিক গর্জন আর বর্ষণের সঙ্গে প্রচারক-নিবাসের অন্তর্দলীয় গর্জন ও বর্ষণ সমান তালে তাল মিলিয়ে চলছে। অব্যবস্থা, অনীহা ও অনাদর যেন প্রচারক-নিবাসের ধর্মার্থীদের ধর্মপথের অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোসাঁইজীর শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। আহারে রুচি নেই। সামান্য যা গ্রহণ করেন, তাও যেন ধারণ করতে পারছেন না। পরিপাকশক্তি অসম্ভব রকম হ্রাস পেয়ে গেছে। গোসাঁইজীর শরীরের এই অবস্থায় ভক্তগণ খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে মনে করে ভক্তগণ গোসাঁইজীকে কিছুদিন নৌকায় বাস করার প্রস্তাব করেন। গোসাঁইজী সম্মত হন। ভাল দেখে একটি বজরা ভাড়া করা হয়। মানিকদহ থেকে বিপিন রায় মহাশয় দুর্গাপূজার সময় গোসাঁইজীকে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করে লিখেছেন। আশ্বিনের প্রথম দিকটা পদ্মায় নৌকাবাস করে তাঁরা মানিকদহে পূজার সময়টা কাটাতে পারবেন বলে সকলেই বিশেষ আনন্দিত। আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহেই পরিবারের সকলকে নিয়ে পদ্মায় নৌকাবাসের জন্য গোসাঁইজী বজরায় উঠেন। ভক্তদের মধ্যে শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, নবকুমার বাগচী, শ্রীধর ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত গোসাঁইজীর সঙ্গী হন। জলবায়ুর গুণে কয়েক দিনের মধ্যেই গোসাঁইজীর স্বাস্থ্যের অনেক পরিবর্তন দেখা দিল। গোসাঁইজীর আহারে রুচি ফিরে এসেছে। সকলকে নিয়ে বেশ আনন্দে দিন কাটছে গোসাঁইজীর। ধীর মন্থরগতিতে উজান বেয়ে বজরা চলেছে, পাশেই চাঁচরতলার সিদ্ধপীঠ। গোসাঁইজী চাঁচরতলার কালীবাড়ী যাবেন বলে মাঝিদের ঘাটে বজরা বাঁধতে নির্দেশ করলেন। জনমানবশূন্য নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এক মহাত্মা অনেককাল আগে এখানে ঘট স্থাপন করে মায়ের আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন, সেই থেকেই চাঁচরতলা কালীবাড়ীর প্রসিদ্ধি। সন্ধ্যার পর কেউ বড় একটা এখানে আসতেন না, তবে বিশেষ বিশেষ পালপার্বণে বহু দূরবর্তী অঞ্চল থেকেও অনেক ভক্ত সমাগম হত। তখন দিনরাত্রিভর কালীবাড়ী জনকোলাহলে সরগরম থাকত। সন্ধ্যার পর গোসাঁইজী সকলকে নিয়ে কালীবাড়ী এলেন। কাছে-পিঠে কাউকে দেখতে না পেয়ে গোসাঁইজী হাতে তালি দিয়ে নৃত্যছন্দে মায়ের গুণগান করতে লাগলেন। সকলেই একে একে যোগ দিলেন মায়ের নামগানে। সহসা দেখা গেল অনেক লোকজন খোল-করতাল বাজিয়ে নামসঙ্কীর্তন করতে করতে এগিয়ে আসছেন কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণের দিকে। গোসাঁইজীর উপস্থিতিতে কীর্তনীয়ারা মেতে উঠলেন, সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা। অন্তরীক্ষ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল, সাদা সাদা গোল গোল 'ঢ্যাপ্' খৈ-এর মত সব ফুল। অপূর্ব মনোমুগ্ধকর তার সুবাসে চারদিক আমোদিত হয়ে উঠেছে। এ ফুল এখানে কেউ আর কোনদিন দেখে নি। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় মহানন্দে অনেকগুলি ফুল কুড়িয়ে নিলেন। গোসাঁইজী হঠাৎ মায়ের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর উচ্চস্বরে “জয় মা কালী”, “জয় মা কালী”, “জয় মা জগদ্ধাত্রী”, ‘‘জয় মা জগদ্ধাত্রী” বলে মন্দির-প্রাঙ্গণে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে পড়লেন। সঙ্কীর্তন আরও জমে উঠল। সেদিন নৌকায় ফিরে আসতে অনেক রাত হয়ে গেল।

মহানন্দেই কাটছে পদ্মায় নৌকাবাসের দিনগুলি। নিয়মিত সাধন-ভজন ও

সঙ্কীর্তন চলছে, আবার তারই মধ্যে চলছে দৈনন্দিন জীবনের খাওয়া-পরা, চলা-ফেরার অম্লমধুর টুকিটাকি কথার আলপনা। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না, এমন কি গোসাঁইজীও এর ব্যতিক্রম নন। এমনি একদিন শান্তি ও কুতুবুড়ী বায়না ধরলেন গোসাঁইজীর কাছে গল্প বলার জন্য। প্রশান্ত হাসি হেসে গোসাঁইজী গল্প বলা শুরু করলেন—'এক গ্রামে সঙ্গতিসম্পন্ন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পতি বাস করতেন। তাঁরা ঠিক করলেন জীবনের এই শেষবেলায় একবার গঙ্গাসাগর তীর্থে যাবেন। বাড়ীতে সাজ সাজ রব উঠল। সঙ্গে কি নেবেন, কি না নেবেন, এই নিয়ে দুজনের মাঝে মাঝেই কথা-কাটাকাটি হতে লাগল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরই জয় হতে লাগল। এমন সময় ব্রাহ্মণীর কাছে এল এক অসম্ভব প্রস্তাব। ব্রাহ্মণীর অতিপ্রিয় এক পরিচারিকা ছিল। সে একজোড়া নারকেল নিয়ে এসে ব্রাহ্মণীকে দিয়ে কাতর অনুনয় করে বলল, "মা, তোমার মেয়ের একটা ভিক্ষা আছে; এ তোমাকে রাখতেই হবে। তুমি মা, গঙ্গাসাগরে স্নান করে মেয়ের এই নারকেলজোড়া হাতে নিয়ে আমার নাম করে গঙ্গা-মায়ের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু দেখ, গঙ্গা-মা হাত বাড়িয়ে না নিলে দিয়ো না যেন।" ব্রাহ্মণী সহজ সরল বুদ্ধিতে বুঝলেন এ প্রস্তাব নিতান্তই অসম্ভব, তবুও ব্রাহ্মণের তীক্ষ্ম বিষয়বুদ্ধি ও বিচার-ভাবনার ঊর্ধ্বে একটা কিছু অসম্ভব প্রস্তাবকেও সম্ভব করবার মত মন নিয়ে পরিচারিকাপ্রদত্ত নারকেলজোড়া গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মণ এসব কথা শুনে হেসেই খুন, তবুও আর ব্রাহ্মণীকে চটালেন না।

'সংকল্প মত যথাসময়ে ব্রাহ্মণদম্পতি গঙ্গাসাগরে এলেন; স্নান করলেন, আপন-আপন মনোবাঞ্ছা নিবেদন করলেন গঙ্গা-মায়ের কাছে। পরিচারিকার কথা মনে আছে ব্রাহ্মণীর। ব্রাহ্মণী আপন প্রতিশ্রুতি মত স্নান করে পরিচারিকাপ্রদত্ত নারকেলজোড়া নিয়ে গঙ্গা-মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন। হঠাৎ দেখা গেল, সাগরের জলের উপর সোনার বালা-পরা একজোড়া হাত বাড়িয়ে গঙ্গা-মা ব্রাহ্মণীর হাত থেকে নারকেলজোড়া গ্রহণ করলেন। এক পলকের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণী ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বার বার মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে থাকলেন।। ব্রাহ্মণ হতবাক। জগত-সংসারে সবই সম্ভব। ধন্য সরলা পরিচারিকা; ধন্য সহজ-সরলা ব্রাহ্মণী।

'গঙ্গাসাগর থেকে ফিরে এসে ব্রাহ্মণদম্পতি খুব সাধুবাদ জানালেন পরিচারিকাকে। ব্রাহ্মণী বললেন, "ধন্য তুই, তোর জন্যই আমরা মায়ের শ্রীহস্তের দর্শন পেলাম। তোর এমন ভক্তি, এ তো আগে জানতাম না মা!" সত্যিই তো, পরিচারিকা নিজেও এমন করে ভেবে দেখে নি কোন দিন। তার প্রস্তাব যে নিতান্তই অবাস্তব ছিল তাও সে জানত না। সরল বিশ্বাসেই সে ব্রাহ্মণীকে তার মনের বাসনা জানিয়েছিল। তার না আছে কোন সাধন-ভজন, না আছে কোন ভক্তিনিষ্ঠা। তবে এমন হল কেন? এ ব্রাহ্মণীর পুণ্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে, সে উপলক্ষ মাত্র। তবে একটা কথা সত্য এই যে, সে জীবনে জ্ঞাতসারে কোনদিনই মিথ্যা কথা বলে নি। "এজন্যই তোর কথা ফলেছে রে মা!" বলে উঠলেন ব্রাহ্মণ, "তুই এতকাল সত্য কথা বলেছিস বলেই এখন তুই বাক্‌সিদ্ধা! ধন্য তুই, ধন্য আমরা, তোর সংস্পর্শে এসে।"'

অধীর আগ্রহ নিয়ে গোসাঁইজীর গল্প শুনছিলেন সকলেই। শান্তি আর কুতুবুড়ীর মুখমণ্ডল আনন্দে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছিল গোসাঁইজীর কথা শুনতে শুনতে। গল্প শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বলে উঠলেন, 'বাবা, আমরাও তো

কখনও মিথ্যা কথা বলি নে। আমরা যদি এমনি করে গঙ্গা-মাকে কিছু নিবেদন করতে চাই, তাহলে কি এমনি করেই হাত বাড়িয়ে তিনি আমাদের নিবেদিত বস্তু নেবেন?' ধীর গম্ভীর স্বরে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন গোসাঁইজী, 'হ্যাঁ মা, নিশ্চয় নেবেন তিনি, তবে তোমাদের প্রার্থনা যথার্থ হওয়া চাই। সত্য চিরকালই সত্য। মা তোমাদের ফাঁকি দেবেন না নিশ্চয়ই।'

পরদিনই দুপুরবেলা উপবাসী শান্তি ও কুতুবুড়ী সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এক নৈবেদ্য রচনা করলেন, তারপর সেই নৈবেদ্যের থালা নিয়ে এলেন গোসাঁইজীর কাছে। গোসাঁইজী তন্ময় হয়ে স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন গঙ্গা মায়ের। সকলেই এক-মনে করজোড়ে প্রার্থনা করছেন মায়ের কৃপা লাভ করবার জন্য। ভক্তের কাতর আহ্বান বৃথা যায় না। সামান্য সময়ের মধ্যেই অতলস্পর্শী পদ্মার জলের উপর গঙ্গাদেবী প্রকাশিত হলেন। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ হল। সত্যের জয় ঘোষিত হল। গোসাঁইজী আনন্দে আবেগে কন্যাদ্বয়কে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা ভাগ্যবতী। কলিতে এমন প্রত্যক্ষ দর্শন সচরাচর হয় না।'

শারদীয়া মায়ের পূজা সমাগতপ্রায়। এবার গোসাঁইজীর বজরা চলেছে মানিকদহের পথে। এই পথেই একদিন মাঝিরা তাড়াহুড়া করে বেলা থাকতেই এক কোলের মধ্যে নিয়ে বজরা বাঁধল। কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় মাঝিরা বলল, 'এখনই ঝড় উঠবে।' আকাশে কোথাও কোন জল-ঝড়ের চিহ্ন নেই, নেই এক বিন্দু কোথাও কোন কাল মেঘের ছায়া, অথচ মাঝিরা দিব্বি বলছে এখনই ঝড় উঠবে। আনন্দোৎসব-মুখরিত মানিকদহের ছবি ভেসে উঠছে তাঁদের চোখের সামনে, সকলেই প্রায় অধীর হয়ে উঠেছেন সেই উৎসবে যোগদান করবার জন্য; এমন অবস্থায় কিনা এই বাধা! মাঝিদের কথাবার্তা এবং কাণ্ডকারখানায় আর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন না তাঁরা। মাঝিরা ততক্ষণে বজরার নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় সমস্ত প্রকার আট-ঘাট বেঁধে ফেলেছে। গোসাঁইজী তন্ময় হয়ে এতক্ষণ আসনে বসে ছিলেন। সোরগোলে বজরার ভিতর থেকে সামনের দিকে বেরিয়ে এসে মাঝিদের প্রতি জিজ্ঞাসুভাবে তাকাতেই বড় মাঝি বলল, 'বাবা! ঝড়ের আগে পদ্মায় এক রকম পাখি উড়ে বেড়ায়। ঐ যে দেখছেন কয়েকটি পাখি উড়ে যাচ্ছে পূব দিক পানে—এটাই ঝড়ের সংকেত। বেশ বড় ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে। এখনই দেখতে পাবেন, পনের-বিশ মিনিটের মধ্যেই চারদিক আঁধার করে ঝড় উঠবে। এই সময় কত অবুঝ জনপ্রাণীর জীবন সংশয় হয়ে দাঁড়াবে! আমরা সময় থাকতেই জায়গাটি একটু নিরাপদ স্থল মনে করে এখানে এসে বজরা বেঁধেছি।' মাঝির কথা বলার সামান্য সময়ের মধ্যেই দেখা গেল পশ্চিম দিগন্তে কাল মেঘের ছায়া, তারপর দেখতে দেখতে ফুটফুটে দিনের বেলা অমাবস্যার অন্ধকারে আবৃত হয়ে পড়ল; প্রচণ্ড বেগে ঝড় উঠল, প্রবল বর্ষণ শুরু হল। কেবলই এলোপাতারি ঝাঁকানি আর অসম্ভব শাঁ-শাঁ রব। এ রব, এ জলোচ্ছ্বাস একমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিন্ন হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। পদ্মার এই ভয়াল দৃশ্যে সকলেই খুব সশংকিত অবস্থায় সে রাত কাটালেন, গোসাঁইজীই শুধু একমাত্র ব্যতিক্রম, একাসনে বসে সমস্ত সময় উন্মত্ত প্রকৃতির সর্বনাশী লীলাখেলায় অবিচল সাক্ষ্যস্বরূপ মহাভাবে কাটিয়ে দিলেন।

একটু রাত থাকতেই মাঝিরা মানিকদহের পথে গাজী ও পাঁচ-পীরের ধ্বনি দিয়ে বজরা ছাড়ল। পরদিন সকলে মানিকদহে এসে পৌঁছলেন। মহানন্দে

পূজার কয়েকটা দিন সেখানে কাটিয়ে সকলকে নিয়ে গোসাঁইজী এবার আবার ঢাকায় ফেরার পথে রওনা হলেন। কয়েক দিনের অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনিদ্রা, অনিয়ম, বিশেষ করে ঋতু-পরিবর্তনকালীন মানিকদহের ম্যালেরিয়া-প্রকটিত আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসে গোসাঁইজীর পরিবারের প্রায় সকলে এবং মাঝিদের কয়েকজন জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এজন্য ফিরতি পথে যথেষ্ট বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হল। গোসাঁইজী বারদী হয়ে ঢাকা ফেরার সঙ্কল্প করলেন।

বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীজীকে দর্শনান্তে কার্ত্তিক মাসের প্রায় মাঝামাঝি ঢাকায় ফিরে এলেন গোসাঁইজী। প্রচারক-নিবাসে ফিরে এসেই তিনি শান্তিপুর থেকে আসা এক দুঃসহ খবর পেলেন—মাতাঠাকুরাণীর জীবন-সংশয়রূপ পীড়া। আর কোন দিকে না তাকিয়ে সেইদিনই রওনা হয়ে গেলেন তিনি একাকী শান্তিপুর। মাতাঠাকুরাণী তখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। মাকে ভাল দেখে একটু সুস্থির হলেন গোসাঁইজী। কিন্তু সুস্থির থাকবার উপায় নেই, ঢাকা থেকে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জীবন-সংগ্রামের পথে আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হলেন গোসাঁইজী। ঢাকার প্রচারক-নিবাসের জন্য অবশ্য পালনীয় একটি নিয়মাবলীর খসড়া পাঠিয়েছেন ঢাকা থেকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়। সমস্ত অবস্থাটাই উপলব্ধি করলেন গোসাঁইজী। ভালই হয়েছে, এবার স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে পারবেন তিনি। অভিশাপ যেন আশীর্বাদরূপে অনুভব করলেন গোসাঁইজী। পরদিনই কলিকাতা এসে চিঠি লিখলেন তিনি রজনীবাবুকে।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

আপনার পত্র এবং পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত প্রচারক-নিবাস সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলাম। এ বিষয়ে আমি অধিক কিছু লিখিতে চাহি না, তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, আমি যে নিয়মে প্রচারক-নিবাসে চলিয়া থাকি, আমার বিশ্বাসমতে তাহা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের প্রতিবন্ধকতা করে না, বরং এই প্রণালীতে সার্বভৌমিক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম বিশেষরূপে প্রচারিত হইতেছে।

আপনারা যদি আমার প্রচার-প্রণালী মনোনীত না করেন, আপনাদের বিশ্বাস-মত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত নিয়মাবলীতে সম্মত হইয়া আমি প্রচারক-নিবাসে বাস করিতে পারি না। সুতরাং আমাকে ভিন্ন বাসা করিয়া থাকিতে হইবে। ভিন্ন বাসা করিলেই যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ থাকিবে না তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্মপ্রচার আমার জীবনের ব্রত। যেখানে থাকি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াই জীবন শেষ করিব। আশীর্বাদ করিবেন যেন আমার জীবনে ব্রত পালন করিয়া যাইতে পারি।

২৫ কার্ত্তিক, ১৮০৯ শক (১২৯৪) নিবেদক
কলিকাতা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

গোসাঁইজী যোগমায়া দেবীকেও চিঠি লেখেন, তিনি যেন তাঁর পত্র প্রাপ্তিমাত্র প্রচারক-নিবাস ছেড়ে সকলকে নিয়ে বাড়ী ভাড়া করে অন্যত্র যান। পাতলা খাঁর গলির পূর্বের বাসাটি পাওয়া যায়। ঐ গৃহে তাঁরা অবিলম্বে উঠে যান।

এ চিঠির পরেও গোসাঁইজীর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে চলতে লাগল। গোসাঁইজী ঢাকায় ফিরে এলেন, কিন্তু প্রচারক-নিবাসে আর উঠলেন না। ঢাকার পাতলা খাঁর গলিতে শিকওয়ালা বাসায় গিয়ে উঠলেন। এদিকে ব্রাহ্ম-

সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব এসে গেল। ২২ অগ্রহায়ণ (১২৯৪) দলে দলে লোক এসে উপস্থিত হয়েছে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে।

সমাজমন্দিরে আর লোক ধরে না। আশেপাশের সমস্ত খালি জায়গায় লোক দাঁড়িয়ে পড়েছেন। দলে দলে সঙ্কীর্তনের মহাসমারোহ। অপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে চলেছে। এক মহাশক্তির আবেশে সকলেই যেন আবিষ্ট হয়ে সঙ্কীর্তন-মহোৎসবে মেতে উঠেছেন। অনেকেই সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়েছেন, অনেকে আবার তাঁদের কানের কাছে "হরিবোল" "হরিবোল" বলে চৈতন্য সঞ্চার করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। গোসাঁইজী ভাবাবেশে তন্ময় হয়ে আছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল, অথচ তখনও উপাসনার কোনই ব্যবস্থা করা সম্ভব হল না। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মভক্তগণ অস্থির হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যার পর গোসাঁইজীর সম্বিৎ ফিরে এল, তিনি তৎপর হয়ে পড়লেন উপাসনার ব্যবস্থাপনায়। বেদীতে এসে বসলেন গোসাঁইজী। উপাসনা শুরু হল, কিন্তু প্রণালীমত উপাসনার কাজ আর করতে পারছেন না গোসাঁইজী। উপাসনাস্থলে নারদ, বাল্মীকি, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহা-মহা যোগীশ্বরদের উপস্থিতি লক্ষ্য করে তাঁদেরই স্তব স্তুতি করতে করতে কান্নায় ভেংগে পড়লেন গোসাঁইজী। উপস্থিত সকলেই খুব অভিভূত হয়ে পড়েছেন, তাঁরাও কাঁদছেন। এমনি অভিভূত অবস্থার মধ্যেই গোসাঁইজী প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলছেন, 'ঐ দেখ, মা আসছেন। আজ মা থালাভরে প্রসাদ নিয়ে আসছেন। দেখ, মা আমাকে এ-কথা বলতে নিষেধ করছেন। কেন মা, বলব না কেন? রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে প্রসাদ খাওয়াও, আজ তোমার সকল ছেলেকেই দিতে হবে। শুধু আমাকে দিলে খাব না। তুমি সকলেরই তো মা। এঁদের কেন দেও না? এঁরা যে উপবাসী থাকেন। মা, তোমার এ কি ব্যবহার? আজ মা তোমার সব চালাকী সকলকে বলে দিব। বিক্রমপুরের সেই পাতক্ষীরের কথা বলে দিব, রামবাবুর কথা বলে দিব, শিকল খুলে দিয়েছিলে সে-কথাও বলে দিব, তোমার ঘরের সব কথাই বলে দিব। যে ভাবে চললে তোমার প্রসাদ পাওয়া যায়, তা সব আজ বলে দিব। দেখুন, আপনাদের বলে দিচ্ছি— আপনারা এই তিনটি নিয়ম রক্ষা করে চললে মায়ের প্রসাদ পাবেন। যখন যা কিছু গ্রহণ করবেন, আহার করবেন, মাকে নিবেদন করে নিবেন; অনিবেদিত বস্তু কখনও গ্রহণ করবেন না। অন্যের কুৎসা নিন্দা কখনও করবেন না। দেখুন, মা আমার মুখ চেপে ধরছেন—আর বলতে দিচ্ছেন না। মা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরছেন। জয় মা! জয় মা! জয় মা!'

অস্ফুটস্বরে কথাগুলি বলতে বলতেই গোসাঁইজীর কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হয়ে পড়ল, গোসাঁইজী সম্বিৎ হারালেন। চারদিক থেকে হরিধ্বনি উঠল। মহাভাবে ভাবাবিষ্ট হয়ে একে একে সকলে সেদিন ব্রাহ্মসমাজমন্দির থেকে বিদায় নিলেন।

সাম্বৎসরিক উৎসবের পূর্বাপর সমস্ত ঘটনায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হল। গোঁড়া ব্রাহ্মসমাজ জ্বলে উঠল, তাঁরা গোসাঁইজীর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করলেন। গোসাঁইজী এসব প্রশ্নে আর কোন বাদ-প্রতিবাদে জড়িত হতে চাইলেন না। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সংগে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার পথে কর্তৃপক্ষকে লিখিত বক্তব্য জানালেন।—

'সত্যই ব্রাহ্মধর্ম, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি তাহাকে ব্রাহ্মধর্মজ্ঞানে পালন করিয়া থাকি। আমার কার্য লইয়া কেহ প্রতিবাদ করিয়া আলোচনা করিলে

তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, সত্যই তিনি। সুতরাং সত্য অজর অমর। যাহা সত্য তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। অসত্য বায়ুরাশিতে মিলিয়া যাইবে।

‘যাঁহারা আমার কার্য লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, আমার ভ্রম বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছেন আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদের সহিত প্রণাম করি। আপনারা আশীর্বাদ করুন আমি যেন চিরদিন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।’[১]

কোন বিকার নেই, বিদ্বেষ নেই; কারও প্রতি কোন অভিযোগ নেই গোসাঁইজীর। এত বড় একটা ঘটনা এমন সহজভাবে গোসাঁইজী নেবেন, তা কেউ কল্পনাও করে নি। বরং গোসাঁইজী এতে আরও যেন খুশী হয়েছেন বেশি। এ সময়েই অনেকে যোগসাধনে দীক্ষিত হলেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ও এই সময় সাধন পান।

ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রশ্নে গোসাঁইজী প্রথম নির্দেশ পান স্বপ্নে অদ্বৈতপ্রভুর কাছ থেকে। ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এই প্রস্তাবকে। বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীজীও রহস্যভরে চিঠির মাধ্যমে লিখে জানান, ‘কাকের বাসায় কোকিল আর কতদিন থাকে?’ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেই গোস্বামীপ্রভু কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে শান্তিপুরে গিয়েছিলেন। যেদিন সন্ধ্যায় শান্তিপুর পৌঁছেন, ঐদিন ছিল শ্যামসুন্দরের রাজবেশ। গোসাঁইজী ভক্তিভরে প্রণাম করতেই শ্রীবিগ্রহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কেমন দেখছিস্ আমাকে? গোসাঁইজী হেসে জবাব দিলেন, ‘অপূর্ব! কিন্তু এই যদি তোমার ইচ্ছা ছিল, তাহলে এতকাল ঘুরিয়ে মারলে কেন? কেনই বা আমাকে কালাপাহাড় তৈরি করলে; ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে এত খেলাই বা খেললে কেন?’ স্মিত মধুর হেসে অপরূপভঙ্গীতে বললেন শ্যামসুন্দর, ‘ভেঙ্গেছি আমি, আবার গড়েছিও আমি। অলংকার ভেঙ্গে গড়লে কত উজ্জ্বল হয়, দেখতে কত সুন্দর হয়, তা জানিস না?’

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর

‘হিন্দুরা মূর্তিপূজা করেন, ওঁরা পৌত্তলিক’ বিদেশীরা একথা বলেন। আধুনিক ভারতীয়েরাও মোটামুটি মেনে নেন এঁদের মন্তব্য। কোন কোন মহলে আবার এই উক্তির প্রতিবাদে শোনা যায়, ‘আমাদের ঋষিরাও বলে গেছেন, তাঁকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, পাওয়া যায় না। তিনি বাক্য ও মনের অগোচর।’

> নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা—
>
> —কঠোপনিষদ ৬।১২

যোগবাশিষ্ঠে আছে রাজর্ষি জনক তমাল বনে বেড়াতে বেড়াতে অশরীরী সিদ্ধগণের কণ্ঠে শুনতে পান, ‘যিনি অবয়বশূন্য (অর্থাৎ কোন জড়ীয়রূপহীন), যিনি অহরহঃ বলছেন, “আমি আছি” “আমি আছি”, তাঁকে আমরা উপাসনা করি।’ এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে বাইবেলের Exodus-এ।—God said unto

---

[১] পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্যবিবরণ

Moses—'I am that I am and He said, Thus shalt thou say unto the children of Israel.'

—Exodus iii 14.

আসল কথা হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছে উদারতা। যুগ যুগ ধরে অনেক ঝড়-ঝাপটা গিয়েছে এর উপর দিয়ে। এক সময় শকহুনেরা বিজেতা হয়ে আশ্রয় নিল সনাতন ধর্মের ছায়াতলে। তারপর এল পাঠান, মোগল, ইংরেজ। হাজার হাজার বছরের পরাধীনতার পরও ভারতের বেশির ভাগ লোক আজও হিন্দুই রয়েছে। জগতের কাছে এ যেন এক বিস্ময়কর ঘটনা। সনাতন ধর্মের ভিত্তি শাস্ত্র ও আপ্তবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মূর্তিপূজা সম্পর্কে অনেক আধুনিক শিক্ষিতেরা কখনও কখনও ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, মূর্তিপূজা হল সাধন-সোপানের নীচের ধাপ। কেবলমাত্র অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য এই মূর্তিপূজার ব্যবস্থা। মূল লক্ষ্য হল সাকারের মাধ্যমে নিরাকারে পোঁছান।

আসলে মূর্তিপূজা প্রথমাবস্থায় অস্থির মনের অবলম্বন-বিশেষ। সাধন-সিদ্ধির উচ্চ অবস্থায় রূপের মধ্যে ঘটে অরূপের প্রকাশ, স্থাপিত হয় নিত্যলীলার অপ্রাকৃত সম্বন্ধ। ব্রহ্মের জড়ীয় কোন রূপ নেই, তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'সাকার-নিরাকার দুই-ই সত্য। যেমন বাষ্প, তাই আবার জমে বরফ হয়; তেমনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভক্তিতে জমে সাকার হন।'

জটাজুটধারী নিরাভরণ সন্ন্যাসী তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে উপযুক্ত আধার বিবেচনা করে তাঁকে বেদান্তমতে সাধন করবার জন্য উপদেশ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবতারিণী মায়ের অনুমোদন হলেই বেদান্তমতে সাধন-ভজন আরম্ভ করতে পারেন বলায় তোতাপুরী বিস্মিত হয়ে পড়েন। সাধন-ভজনপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের প্রভাব দেখে তিনি খুবই আশ্চর্যবোধ করেন।

একদিন হাততালি দিয়ে নামকীর্তন করছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এতে বিদ্রূপ করে তোতাপুরী বলেন, 'ক্যায়া রোটি ঠোক্‌তে হো?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব চুপ করে রইলেন। মনে বড় দুঃখ পেলেন সাকার-সাধনার প্রতি উপেক্ষায়। এইদিনই তোতাপুরীর আমাশয় রোগ দেখা দেয়। রোগটি ধীরে ধীরে অসহ্য রূপ ধারণ করে। তোতাপুরী সমাধিমগ্ন হয়ে রোগ-যন্ত্রণা ভুলতে চান, কিন্তু যন্ত্রণায় কিছুতেই মনকে আয়ত্তে আনতে পারেন না। শেষে গঙ্গার জলে ডুবে দেহত্যাগ করবেন স্থির করেন। গঙ্গার এপার থেকে ওপার চলে যান, কোথাও আর ডুবজল হয় না। তোতাপুরী তখন অবাক হয়ে ভাবেন, 'এ ক্যায়া দৈবীমায়া।' তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। পরে একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলেন, 'যেমন ব্রহ্ম সত্য, তেমনি তোমার মাও সত্য। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভবতারিণী। নিরাকার-সাকার দুই-ই সত্য।'

নির্গুণ হৈ সো পিতা হমারা, সগুণ হৈ মহ্‌তারী—
কাকে নিন্দোঁ কাকে বন্দোঁ, দুয়ো পাল্লা ভারী॥

—তুলসীদাস

'যিনি নির্গুণ, তিনিই আমার বাবা, আর যিনি সগুণ তিনিই আমার মা। দুই-ই আমার কাছে সমান। কাকেই বা নিন্দা করি, আর কারই বা প্রশস্তি গাই।

ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজে গোসাঁইজী আচার্য থাকাকালে ব্রাহ্মদের উৎসাহের অন্ত নেই। তাঁরা বলাবলি করেন, 'যাঁরা বলেন ব্রাহ্মসমাজে কিছু নেই, তাঁরা একবার গোসাঁইকে দেখুন।' হিন্দুরাও ছেড়ে কথা বলেন না। তাঁদের যুক্তি, গোসাঁই আর ব্রাহ্ম নেই। সমাজের লোকদের মনেও একই সংশয়। বেদীতে বসে গোসাঁইজী তন্ময় হয়ে দেবদেবীর কথা বলে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ঘরোয়া বৈঠক চলে এ নিয়ে গোঁড়া ব্রাহ্মদের মধ্যে। নিভৃতে একজন গোসাঁইজীকে গিয়ে প্রশ্ন করেন, 'কালী, দুর্গা, শিব, এঁরা কি সত্যি সত্যি আছেন?' গোসাঁইজী উত্তরে বলেন, 'ব্রহ্মকে সাকার আর নিরাকার দুই-ই বলে আমি জানি। তাঁর জড়ীয় রূপ নেই, তাই তিনি নিরাকার। আবার তাঁর চিন্ময় রূপ আছে, তাই তিনি সাকার। তাঁর হাত, পা, মুখ, চোখ, কান, সবই আছে; তাই তিনি চিন্ময়। সাধারণে নিরাকার বলতে যা বুঝে, তা তিনি নন। তাঁর সাকার রূপই ভক্তগণ দেখে থাকেন। তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, আমোদ-আহ্লাদ করা যায়, আমি প্রত্যক্ষ করেই এ কথা বলছি।'

গোসাঁইজী আরও বলেন, 'নির্গুণ অন্বয় স্ফূর্ত না হলে, সগুণ-সাকারতত্ত্ব বুঝবার কি সাধ্য আছে? সাকার কি এত সোজা কথা? নির্গুণ পরব্রহ্মই সাকার হয়ে লীলা করেন। প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বভূতে তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি। দ্বিতীয়ে যোগ, আত্মাতে পরমাত্মা প্রত্যক্ষ; আর তৃতীয়ে দর্শন।'

অনাদি অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সর্বত্র রয়েছেন। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁর উপাসনা করা, ধ্যান করা সহজ। সাধকেরা প্রথমেই এই ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁর উপাসনা করেন। অবতারতত্ত্বে, লীলাতত্ত্বে বিশ্বাস অনেক পরের কথা। শ্রদ্ধাভরে সেবা-পূজা করলে বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে উঠেন। তখন তিনি ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন, নানা আবদার করেন। কোন অনাচার হলে বলে দেন। মানুষের মত খাবার চেয়ে খান।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, তিনি কল্যাণকর গুণের আধার। শ্রুতি বলছেন, 'যাঁ হতে সব সৃষ্ট হয়েছে, যাঁকে আশ্রয় করে সব আছে, আর যাঁতে আকর্ষিত হয়ে সব লীন হয়েছে, তিনিই ব্রহ্ম।'

বেদান্তমতেও সেই একই প্রতিধ্বনি; গাছ, পাতা, লতা, গিরি, নদী, জীব, জন্তু, গ্রহ, নক্ষত্র সবই ব্রহ্ম। 'সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম।' তেমনি রয়েছে শ্রীমদ্‌ভাগবতে—

'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমন্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥'

কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের কথাতেই সেই একই কথা—

'প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান॥'

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।২।৭

অনন্ত অসীম ব্রহ্মের বিরাটত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে ব্যোমবিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কার থেকেও। সৌরজগত বলতে আমরা বুঝি, সূর্য আর তার গ্রহগুলিকে। মোটামুটি নয়টি গ্রহের কথা বলা হয়ে থাকে। হার্সেল, প্লুটো আরও কয়েকটি গ্রহের কথা পরে জানা গিয়েছে। সূর্য থেকে চারশত ষাট কোটি মাইল ব্যবধানে রয়েছে দূরতম গ্রহ প্লুটো। ওখানে সূর্যের আলো পৌঁছতে লাগে ছয় ঘণ্টা। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এই দূরত্বকে বলা হয় এক আলোক সেকেন্ড। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব এই মাপকাঠিতে আট 'আলোক মিনিট'। সূর্য আর প্লুটোর ব্যবধান, ছয় 'আলোক

ঘণ্টা'। আকাশে রয়েছে অনন্ত কোটি নক্ষত্র। এক-একটি নক্ষত্র যেন এক-একটি সূর্য; আর প্রত্যেকটি নক্ষত্রের রয়েছে একটি করে সৌরজগত।

আমাদের সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে সূর্য থেকে দূরত্বের তুলনায় পৃথিবী থেকে নিকটতম নক্ষত্রের অবস্থিতি ৪·২ 'আলোক বৎসর'। মামুলি হিসাবে দাঁড়ায়, পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল। সপ্তর্ষিমণ্ডলে রয়েছে, 'M-81' নামে এক বিশ্ব। এর দূরত্ব সত্তর লক্ষ 'আলোক বছর'।

এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যারা সূর্য থেকে বহু গুণ বড়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে (Alpha Scorpio) যদি সূর্যের জায়গায় বসানো যায়, তবে তা পৃথিবীর কক্ষপথ অতিক্রম করে মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ অবধি পৌঁছবে। এ ধরনের নক্ষত্রের যেটি প্রকাণ্ডতম, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'VV'। এর ব্যাস, সূর্যের তুলনায় তিন হাজার গুণ বড়। এই নক্ষত্রটি আমাদের সৌরমণ্ডলের আধাআধি জায়গা অনায়াসে জুড়ে থাকতে পারে। বৈজ্ঞানিক মতে কোটি কোটি সৌরজগত রয়েছে। আমাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণও তাই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলেছেন। এক-একটি সৌরমণ্ডলকে তাঁরা ব্রহ্মের এক-একটি অণ্ড বলে অভিহিত করেছেন।

পাখি উড়ে যায়। সীমাহীন আকাশে ডানা মেলে ওড়াই যেন তার বিলাস। সে জানে আকাশ অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ব্রহ্মকে জানার ব্যাপারেও এই উপমাটি খাটে। উপনিষদে রয়েছে—

'নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ'।

আমি যে ব্রহ্মকে ভালো করে জেনেছি এ কথা যেমন ঠিক নয়, আমি যে তাঁকে মোটেই জানিনে এ কথাও তেমনি ঠিক নয়।

উপনিষদে আরও দেখছি—

'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥'

বাক্য ও মন ব্রহ্মের কাছে না পৌঁছেই ফিরে আসে। অথচ ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন, তিনি কোনো কিছুকে ভয় করেন না।

একই শ্লোকের দুই চরণে এমন বিরুদ্ধ কথা আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত ঠেকে। এর অর্থ গিয়ে দাঁড়ায়, যাঁকে মোটেই জানা যায় না, তাঁকে আবার এমনই গভীরভাবে জানা যায় যে আর ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। এ-জানা আনন্দের জানা, হৃদয়ের জানা, প্রেমের জানা।

জ্ঞান জানার আলো, কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধ, বাহির দুয়ারে তার অবস্থান; প্রেম যুবতী, অন্দরমহলে তার প্রবেশাধিকার। প্রেমের দ্বারা আরও অনেক গভীরভাবে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রেমের কি অপরিসীম শক্তি! প্রেমের যাদুকাঠিতে একদিকে যেখানে কিছুই জানিনে, অপরদিকে সবই জানি। প্রেমেতে অসীম সীমার মাঝে ধরা দেন, আর সীমা অসীমকে করে আলিঙ্গন।

অণু আর আণবিক শক্তি। একশত বছর পূর্বে রুশ রাসায়নিক ম্যানডেলিফ বিজ্ঞান-জগতকে একখানি চার্ট (Chart) উপহার দেন। এতে বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের তালিকা ছিল। প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলেন, 'যত রকম জিনিস দুনিয়ায় আছে বা হবে, এসবের উদ্ভব হয়েছে বা হবে উপরোক্ত তালিকাবর্ণিত দুটি বা তার বেশিসংখ্যক মৌলিক পদার্থের সংযোগ থেকে।

অণু পরমাণুর গবেষণায় এটা স্বীকৃত হয়েছে যে, ইলেকট্রন (Electron)

এবং প্রোটনের (Proton) রকমারি সমাবেশ থেকেই ম্যানডেলিফের মৌলিক পদার্থগুলির উৎপত্তি হয়েছে। ৯২টি জায়গায় এখন পর্যন্ত ১০২ মৌলিক পদার্থের কথা জানা গিয়েছে। ইলেকট্রন নেগেটিভ্ (Negative) আর প্রোটন পজিটিভ্ (Positive) বিদ্যুৎকণা। এ যেন প্রকৃতি আর পুরুষ।

ইলেকট্রনগুলির স্থিতি ঘটে দুভাবে—প্রোটনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে থাকতে পারে nucleus-এ, অথবা কেন্দ্রে। আর নির্দিষ্ট সংখ্যকের থাকতে হয় সারি করে nucleus-এর চারদিকে বিভিন্ন বৃত্তপথে বা orbits-এ। এদের কক্ষপথে ওরা চলে, আর বৃত্ত হতে বৃত্তান্তরে নিয়মানুবর্তী হয়ে করে ছুটাছুটি। এদের এই অভিযান যুগ-যুগান্তরের, বিরামবিহীন; না আছে এর আদি, না আছে এর অন্ত। জড়, অচেতন বলে যা আমরা মনে করি, লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে এদের মাঝে বিদ্যুৎ-শক্তির ঘূর্ণাবর্ত। প্রাচীরের ইটগুলির ভিতরও চলে এই বিস্ময়কর শক্তির অনাদি, অনন্ত, অনলস আলোড়ন। ব্রহ্মভাব আর ঈশ্বরভাব। একের মাঝে আর।

ঋষিগণ এসব তত্ত্ব ধ্যানে জেনেছেন। তাই তাঁরা বলে গেছেন ব্যক্ত আর অব্যক্ত চেতনার কথা। কাঠ, ইট, মাটি, পাথর, বই, টেবিল, যাদের বলি আমরা জড় অচেতন পদার্থ; এদেরও চেতনা আছে। এই চেতনা বলা হয়েছে, অব্যক্ত চেতনা। আর উদ্ভিদ, শাক-সব্জী ও প্রাণী যাদের সুখ-দুঃখ বোধ রয়েছে, তাদের চেতনাকে বলা হয় ব্যক্ত চেতনা।

'অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ।' শ্রীভগবান নিজে বলেছেন, 'তাঁর জন্মকর্ম অলৌকিক আর অপ্রাকৃত।' সূর্য মোটামুটি একই জায়গায় থাকে, প্রকৃতপক্ষে উদয় হয় না। পৃথিবীর আহ্নিকগতির দরুণ দিবারাত্রির উদ্ভব হয়, অথচ বলা হয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের কথা। ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাবও অনুরূপ। তিনি স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হন নরলীলায়, অব্যয় আর বিকারমুক্ত হয়ে ঐশ্বর্য আর স্বরূপকে আশ্রয় করে। অর্জুনের কাছে তিনি এ কথা স্বীকার করেছেন। তাই তিনি যখন লীলাভিনয়ে আসেন, তাঁর মাঝে মানবভাবের আর দিব্যভাবের থাকে বিচিত্র সমন্বয়। তাঁর চিন্তাধারা, চলাফেরা, কাজকর্ম জাগতিক বুদ্ধির মাপকাঠিতে কখনও বা সহজেই অনুধাবন করা যায়, আর কখনও বা হয়ে ওঠে মনুষ্যবুদ্ধির অনধিগম্য। এক এক সময় সহজ স্বাভাবিক মানুষটির মত তাঁর আচরণ ও কথাবার্তা, আবার এক এক সময় দিব্যভাবে বিভোর হয়ে অন্তর্লোকে থাকেন তিনি তন্ময় হয়ে। তাঁর শ্রীঅঙ্গ শুধু থাকে এ ধরায় স্পন্দনহীন হয়ে। মর্ত্য আর অমরাবতীর দেশে তাঁর যাতায়াত সহজসাধ্য বলে মরলোকে অবরোহণের সময় অমরলোকের উজ্জীবনী শক্তির অমৃতধারা আনেন সাথে করে। যাঁদের এ বস্তু আস্বাদন করার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁদেরই এ জগতে আসা সার্থক হয়। কখনও বা নরদেহে চলে দেবসঙ্গ, অপূর্ব লীলারঙ্গ। মর্ত্যে থেকেই কখনও বা করেন অমরগোষ্ঠীর অভিমান নিরসন। কখনও বা করেন সেবা গ্রহণ; চলে ভক্তসঙ্গে দিনের পর দিন লীলারঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় ব্রহ্মা বিভ্রান্ত হয়েছেন। আবার ব্রহ্মার অভিমানকে করেছেন চূর্ণ। ব্রহ্মা আসেন দ্বারকায়। দ্বারপাল গিয়ে খবর দেন। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করে পাঠান 'কোন্ ব্রহ্মা?' ব্রহ্মা ভাবেন, এ আবার কেমনধারা প্রশ্ন? অভিমানবশে ব্রহ্মা দ্বারীকে বলেন, 'গিয়ে বল, সনকপিতা চতুর্মুখ ব্রহ্মা।' তারপর সাক্ষাতে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে ব্রহ্মা বলেন—

'কোন্ ব্রহ্মা পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে।
আমা বহি জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে॥'
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২১।৫০

মৃদু হেসে শ্রীভগবান ব্রহ্মার পানে তাকিয়ে দেখতে থাকেন। নিমেষে সহস্র-লক্ষ-কোটি-মুখ ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র সকলে এসে তাঁকে প্রণতি জানান। ব্রহ্মা তখন হতবুদ্ধি। অনন্তের অচিন্ত্যলীলা দর্শন করে স্তব্ধ, নির্বাক।

দেখি চতুর্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইল।
হস্তিগণ মধ্যে যেন শশক রহিল॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২১।৫৪

ইন্দ্রের অভিমানও তিনি চূর্ণ করেন গোবর্ধন ধারণ করে। শিশুপুত্রের কথায় চিরাচরিত ইন্দ্রপ্রীতি-যজ্ঞের উদ্দেশে আহৃত দ্রব্যসম্ভারে গোপরাজ নন্দ করেন পর্বত পূজা। কুপিত হন ইন্দ্র। প্রচন্ড বায়ুপ্রবাহে, আর বিরামবিহীন বর্ষণে গোকুল বুঝি মহাপ্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়!

গোপ-গোপী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সাত বছরের শিশুর নির্দেশে যথাসর্বস্ব নিয়ে গোবর্ধন পর্বতে নেন আশ্রয়। সাত দিন ধরে গিরি ধারণ করেন এই দুগ্ধপোষ্য বালক। গিরিধারীর পরাক্রম দেখে ইন্দ্র তাঁর স্বরূপ জেনে কৃতাঞ্জলিপুটে বলেন, 'প্রভো, আমায় ক্ষমা কর। তুমি দর্পহারী। তোমার এই ঐশ্বর্য দেখিয়ে আমাকে অনুগ্রহই করেছ।'

শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেন, 'কৃপাপরবশ হয়েই তোমার যজ্ঞ আমি বন্ধ করেছি। আমার ভক্ত যদি কখনও আত্মবিস্মৃত হয়, অলীকের মোহে আমাকে ভুলে যায়, তখন তাকে আমি এইভাবেই আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে আনি।' ইন্দ্র তাঁকে অভিবাদন করে ফিরে যান। গন্ধর্ব বিদ্যাধর আর সকল দেবতারা মিলে উল্লাস করেন। দেবর্ষি নারদ যখন তখন মর্ত্যে এসে এমনি করেই তাঁর স্তবস্তুতি করে ফিরে যান। মর্ত্যে থেকে শ্রীভগবান এমনিভাবেই দেবতাদের সঙ্গে করেন রঙ্গরস! বৈষ্ণবী-মায়ায় সম্মোহিত মানুষ। সাধ্য কি তার এ লীলারস আস্বাদন করে। কৃষ্ণসখা সব্যসাচীর পক্ষে পর্যন্ত সম্ভব হয় নি এই রস-আস্বাদন। শ্রীভগবান কৃপা করে যখন তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দিলেন, তখনই একমাত্র তাঁর শ্রীঅঙ্গে বিশ্বরূপ দর্শন করে তিনি হলেন কৃতকৃতার্থ।

ভগবান কৃপা করেই কখন কখনও তাঁর এ সব লীলার কথা নিজে প্রকাশ করেন জনসমাজে। কিন্তু হায়! বিষয়বুদ্ধি দিয়ে মানুষ কি করে বুঝবে তাঁর অপ্রাকৃত লীলামাহাত্ম্য। ভ্রমাত্মকী বুদ্ধি পদে পদে করে বিভ্রান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন, 'ভগবানের শরণাপন্ন কি হওয়া যায় গো? মহামায়ার এমনই কান্ড, হতে কি দেয়?'

শৈশব থেকে কতবার যে গৃহ-দেবতা শ্যামসুন্দর গোস্বামীপ্রভুর কাছে প্রকাশিত হয়েছেন, খেলাধূলা করেছেন, খাবার চেয়ে খেয়েছেন, আপৎকালে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর আবার ঈশ্বরলাভের জন্য এই ব্যাকুলতা কেন? হিন্দুসমাজ ছেড়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করারই কি সার্থকতা ছিল? উপবীত ত্যাগেরই বা কি প্রয়োজনীয়তা? আবার হিন্দুসমাজে ফিরে আসারই কি যৌক্তিকতা?

গোস্বামীপ্রভু সদ্‌গুরুর অবতার। অবতার পুরুষের লীলাধারা পুষ্টির জন্য লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে আদর্শ পুরুষরূপে মনুষ্যসমাজকে আকর্ষণ করাই চিরা-

চরিত প্রথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বলেছেন—

যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণম্‌ কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

মহাজন যেরূপ আচরণ করে থাকেন, জনসাধারণ তারই অনুকরণ করে থাকে। তিনি তাঁর কার্য ও ব্যবহার দ্বারা যা প্রতিপন্ন করেন, লোকসমাজ তা-ই অনুসরণ করে। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' বৈষ্ণব সাহিত্যেও আছে, 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারও সেই একই কথা বলেছেন, 'সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।' সাধন ছাড়া সাধ্যবস্তু কেহই পেতে পারেন না। এই সাধ্যবস্তুটিই বা কি এবং কি করে সাধন করে তা লাভ করা যায়, কোন সামর্থী নিজের জীবনে তা না দেখালে সাধারণ ধর্মার্থীর যথার্থ পথ অবলম্বন দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যদি কোন ব্যক্তি যথারীতি সাধন-ভজন করে ভগবদ্‌দর্শন লাভ করে লোকসমাজে ঘোষণা করেন যে, শ্রীভগবান আছেন এবং তিনি তাঁকে দর্শন করেছেন, তাহলে ধর্মার্থীর প্রাণে আশার সঞ্চার হয় এবং তাঁরা সাধনে প্রেরণা ও উৎসাহ পান এবং তাঁদের মাঝে অনেকেই আশায় বুক বেঁধে অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য সকল রকম পার্থিব দুঃখ বরণ করতে এমনকি প্রাণপাত করতেও কুণ্ঠিত হন না। সাধন-সিদ্ধ মহতের জীবনই প্রেরণার উৎস।

তত্ত্ববিদেরা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকেই যথার্থ তত্ত্ব বলে থাকেন। এই একই তত্ত্ব আবার জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি এই তিন প্রকার সাধনের ফলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান এই ত্রিবিধ প্রকারে সাধকের নিকট অভিব্যক্ত হন।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান তিন তাঁর রূপ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২২।৫

ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে গোসাঁইজী নানা পথ অবলম্বন করেছেন। পরাধর্মই শ্রেষ্ঠ। পরাধর্মের জন্য অপরাধর্মের বিধি-নিষেধ বিসর্জন দিতে হয় নানাক্ষেত্রে। ব্রহ্মভাব লাভ করার জন্য তাই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে তিনি আপনার বংশের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পর্যন্তও তুচ্ছ করেছিলেন।

অন্তপর্ব

সার্বভৌম ধর্মের আশ্রয়ে ॥ দিব্যলীলা

১২৯৪ হইতে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ
১৮৮৭ হইতে ১৮৯৯ খৃস্টাব্দ

স্বর্ণময়ী দেবীর চলা-ফেরায় মস্তিষ্ক-বিকৃতির আর কোনও লক্ষণই নেই। তিনি ঢাকায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১২৯৪ সালে, অগ্রহায়ণ মাসেই মাকে নিয়ে গোস্বামীপ্রভু ঢাকায় পৌঁছেন। পৌঁছার পরদিনই স্বর্ণময়ী দেবী রান্নায় লেগে যান। হাঁড়িতে ফোঁড়ন দিয়ে, সব্জি ছেড়ে তিনি জল ঢালেন; ছ্যাঁৎ করে উঠতে সিদ্ধ হবার আগেই হাঁড়ি নাবিয়ে ফেলেন। রান্না ভাল হয় নি বলার জো নেই।

গোসাঁইজী নবকুমারবাবুকে স্মিত হাস্যে জিজ্ঞাসা করেন, 'আজ বুঝি মা রাঁধছেন? তা হলেই হয়েছে!' মন্তব্য শুনে মা এসে একেবারে ছেলের সামনে উপস্থিত হলেন। হেসে হেসে তিনি বলেন, 'হ্যাঁরে বিজয়, অত বড় হয়েছিস কার রান্না খেয়ে? মুক্তকেশী ভাদুড়ী গিন্নির, না আমার?' গোসাঁই হাসেন। ব্রাহ্মসমাজ ছাড়ার পর ঢাকার শিষ্যেরা হন মনমরা; আর কি তাঁকে ঢাকায় ধরে রাখা যাবে? ঠাকুর মাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, এই যা ভরসা। তাঁরা সবাই মিলে উপায় উদ্ভাবন করেন ঢাকায় একটি আশ্রম করে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা যায় না? এর চেয়ে আর যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব কি হতে পারে? অর্থের ব্যবস্থা? প্রত্যেকে এক মাসের আয়ের টাকা দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন। ছয় হাজার টাকা চাঁদা স্বীকৃত হয় সেই বৈঠকে। আট মাসের মধ্যেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাতলা খাঁ গলির গৃহে এতদিন থাকা সম্ভব নয়। একরামপুরে দোতলা বাড়ী দেখা হয়, সঙ্গে খালি জায়গা রয়েছে। গোস্বামী মহাশয় ভক্তদের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। গেণ্ডেরিয়ার জঙ্গলে তিনি আশ্রমের জন্য তিন বিঘা আয়তনের একটি স্থান মনোনয়ন করেন; একরামপুরের বাড়িটি মাঘ মাস থেকে ভাড়া করা হয়। প্রভু আশ্রিতজনদের সঙ্গে ঐ গৃহে উঠে যান। এখানে আসার পরই আনন্দমোহন বসু একদিন তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করেন। প্রীতিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পর বসু মহাশয় গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, 'কিসে প্রকৃত ধর্মলাভ হয়, আর শান্তি মিলে?' গোসাঁইজী বিনীতভাবে তাঁকে বলেন, 'যদি যথার্থ ধর্ম চান তাহলে অন্তর্মুখী দৃষ্টি করুন, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করুন। ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালীন এক ভক্ত বৈষ্ণবের কথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়ে আমি নিজে বড় উপকৃত হয়েছি।'[১] প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও এই গৃহে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

একদিন এক ভদ্রলোক এসে দোতলায় উঠে প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে চান। গোসাঁইজী তখন সমাধিস্থ। ভক্তদের বারণ সত্ত্বেও তিনি দেখা করতে অগ্রসর হন, কিন্তু পরনের ধুতিতে পা জড়িয়ে তিনি পড়ে যান ও বিফলমনোরথ হয়ে চলে যান। সমাধি ভাঙ্গতেই কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে গোস্বামীপ্রভু বের হন; ডাঃ বিহারী মালাকারের বাড়ী গিয়ে তাঁরা পৌঁছেন। বাড়ীতে উৎসব, সংকীর্তন চলছিল। মালাকার মহাশয় হাতে স্বর্গ পান—গোসাঁইজী এবং আর সব ভক্তজনকে অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভিতর নিয়ে এসে সকৃতজ্ঞচিত্তে বলেন, 'আজ আমার গৃহে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব। সকালে বড় আশা করে আপনাকে বলতে গিয়েছিলাম, এখানে যেন আজ আপনার চরণধূলি পড়ে; বলা আর হয় নি। দয়াল আমার, অন্তরের

---

১. নবকুমার বাগচী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীবিজয়কথামৃত', প্রথম সংস্করণ, পত্রাঙ্ক ৩৮১

আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন।' এই বলে তিনি তাঁকে সাষ্টাঙ্গ দেন।

মাঘ মাসের শুক্লাসপ্তমী, অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি এসে পড়ে। গোসাঁইজী একরামপুরের বাড়ীতে ধুলট উৎসব সম্পন্ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

নবকুমারবাবু কোন কাজে শ্রীধর ঘোষকে নিয়ে সূত্রাপুরের দিকে গিয়েছেন। পথ চলতে চলতে সেখানে দেখেন এক স্বর্ণকারের দোকানের বাইরে বসে এক বাবাজী সুমধুর কীর্তন করছেন। বাবাজী অন্ধ; বাড়ী তাঁর শ্রীহট্টে, সঙ্গে বৃদ্ধা পিসি। তাঁদের বড় ভাল লাগল বাবাজীর গান। গোস্বামীপ্রভুকে শোনাবার জন্য তাঁরা একরামপুরের গৃহে তাঁদের নিয়ে আসেন। বাবাজীরও ভাল লেগেছে। বাবাজী উৎসাহিত হয়ে গোস্বামীপ্রভুকে বলেন, খোল-করতাল তিনিই যুগপৎ বাজাতে পারেন; পিসি দোহারের কাজ করেন ও মন্দিরা বাজান। দুই-চারজন দোহারের অতিরিক্ত লোক পেলে, অভিসার থেকে কুঞ্জভঙ্গ সাতদিনেই তিনি গেয়ে যেতে পারেন। বিহারী মালাকার তখন সেখানে ছিলেন। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বাবাজী, এখানকার সবাই গাইয়ে-বাজিয়ে লোক, আপনার কোনই অসুবিধা হবে না।' বাবাজী ব্রতী হলেন। শান্তিপুরে প্রতিপদ থেকে সপ্তমীর দিন পর্যন্ত উৎসব হয়। সেইদিন থেকে এখানেও তেমনি ব্যবস্থা হল। যথারীতি সেইদিন রাত্রেই অধিবাস উৎসব হল।

তিন প্রভুর আসন সাজান হয়। খালি জায়গায় খাটান হয় শামিয়ানা, চাঁদোয়া। প্রতিপদ থেকেই কীর্তন জমে উঠে। অভূতপূর্ব লোকসমাগম হয়। বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, স্ত্রী-পুরুষে চাতাল, আঙ্গিনা, এবং শেষে পথও ভরে যায়। প্রভুর থেকে থেকে 'হরিবোল' হুঙ্কারে আসর কেঁপে ওঠে। তাঁর ভাবাবেগে উদ্দণ্ড নৃত্যে দর্শক ও শ্রোতারা সম্বিৎ হারিয়ে ঢলে পড়েন। বাবাজীর মধুর কণ্ঠে হয় যেন সুধাবর্ষণ। ভাবের নেশা তিন-চার দিন অনেকেরই থেকে যায়। অল্প বয়সের বালক-বালিকারাও বাদ পড়ে না। অষ্টমীর দিন প্রাতে নগর-সংকীর্তনে বের হয়ে ধুলি ছুঁড়তে ছেলে-বুড়া কেউ-ই কম যায় না। পথে লোক ধরে না। গোসাঁইজী আঙ্গিনা থেকে বের হয়ে বাবাজীকে নগর-সংকীর্তনের গান ধরতে বলায়, তিনি গান ধরেন—

হরি বলব মুখে, যাব সুখে ব্রজধাম।
কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম॥
এ নাম শিব জপেছেন পঞ্চমুখে।
নারদ করে বীণায় গান॥
এবার গুরু-নামে দিয়ে ডঙ্কা—
রাধা-নামে দাও বাদাম।
কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম॥

রাজপথে পদক্ষেপ করেই গোস্বামীপ্রভু সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ধুলিতে গড়াগড়ি দিয়ে উঠেই মুঠ্ মুঠ্ ধুলি নিয়ে 'জয় সীতানাথ, জয় সীতানাথ' বলে হুঙ্কার দিতে দিতে চারদিকে ছুঁড়তে থাকেন। যার গায়েই এই ধুলি পড়ে, তারই মধ্যে অপরূপ ভাবের সঞ্চার হয়। প্রভু টলতে টলতে চলেন—রাজপথ লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। কত যে সংকীর্তনের দল এসে জোটে! এই মহাসংকীর্তন সূত্রাপুর, ফরাসগঞ্জ, বাংলাবাজার, পটুয়াটুলি, শাঁখারিবাজার, লক্ষ্মীবাজার ঘুরে একরামপুরের আশ্রমবাটির দিকে অগ্রসর হয়। প্রাণমাতান শত-শত খোল-করতাল-ধ্বনি ও

তারকব্রহ্ম নামের সিংহনাদে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। প্রভু হেলে-দুলে দুই বাহু তুলে, ভাবরসে তন্ময় হয়ে নামামৃত বিলিয়ে চলেন। উভয়পার্শ্বের গৃহের স্ত্রী-পুরুষ আনন্দে মেতে ওঠে। মেয়েরা উলুধ্বনি করেন, বাতাসা লুঠ দেন; যেদিকে প্রভুর দৃষ্টি পড়ে লোকসমুদ্র ভাবতরঙ্গে ভাসে। ঢাকা শহরের উপর দিয়ে সেদিন হরিনামের বন্যা বয়ে যায়।

বেলা তিনটায় একরামপুরে ফিরে এলে বাবাজী আবার গান ধরেন—

নগর ভ্রমণ করে আমার গৌর এল ঘরে।
আমার নিতাই এল ঘরে—
ধেয়ে গিয়ে শচীমাতা গৌর কোলে করে॥

এই অভিনব কীর্তন সম্বন্ধে পরে গোস্বামীপ্রভু মন্তব্য করেন, 'স্বর্গ থেকে দেবতারা এসে কীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন।' অশ্বিনীকুমার মিত্র নামে একটি তের-চোদ্দ বছরের ছেলের ভাবের ঘোর কাটে না—উৎসবের পরও 'কৃষ্ণ কৈ', 'কৃষ্ণ কৈ', 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলে পথে-পথে বেড়ায়। প্রভুর কাছে সাধন পেয়ে সে অপ্রাকৃতভাবে আত্মহারা হয়ে পড়ে, পড়াশুনা ছেড়ে দেয় এবং শেষটায় পিতার শাসনপীড়নে বাড়ী ছেড়ে পালায়। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরমোহনের সব উষ্মা গিয়ে পড়ে গোস্বামীপ্রভুর উপর, ইনিই যত অনর্থের মূল। কচি কচি ছেলেদের কি দোষ? এমন শিক্ষা ওঁকে দিতে হবে যাতে আর যেন কোন ছেলেকে তিনি না বিগড়ান। সঙ্গে দুইজন গুণ্ডা ভাড়া করে নিয়ে যান তিনি একরামপুর আশ্রম-বাড়ী। নীচে ওদের অপেক্ষা করতে বলে তিনি একা যান প্রভুর ঘরে। গোসাঁইজী তখন যোগাসনে সমাসীন, ধ্যান-নিমীলিত নেত্র। গণ্ড বেয়ে পড়ছে অবিরল অশ্রুধারা। কোথায় ভেসে যায় হরনাথের দুরভিসন্ধি! অনুশোচনায় হরনাথ লুটিয়ে পড়েন প্রভুর পায়ে, কেঁদে কেঁদে বলেন, 'প্রভো, পাতকী-উদ্ধারই তোমার কাজ। এই দুরাশয়কে শ্রীচরণে আশ্রয় দাও।' তিনিও সাধন পেলেন।[১]

মাঘোৎসবের দিন (১২৯৪) অপরাহ্ণে রজনীবাবু, আনন্দবাবু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মেরা একরামপুরে গোসাঁইজীর সঙ্গে দেখা করে বলেন, তাঁর মুখে উপাসনার বাণী শুনতে তাঁরা এসেছেন। উপাসনার ব্যবস্থা হয়, ঠিক ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী মত গোস্বামীপ্রভু সেদিন প্রার্থনা করেন।

ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারী রজনীবাবু প্রায়ই সকাল-বিকাল, দুবেলাই এসে গোসাঁইজীর আসনের পাশে বসে থাকেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যায়। একদিন মনোরঞ্জনবাবু তাঁকে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেই ফেলেন, 'আপনাদের মতের অমিল সত্ত্বেও এভাবে প্রায় রোজই এসে অশ্রুমোচন করেন! দুয়ের মধ্যে কোন সংহতি খুঁজে পাই নে।' রজনীবাবু অকপটে জবাব দেন, 'ওঁর সঙ্গ যে কি ভাল লাগে তা বলে বোঝাতে পারব না, এ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাই নে।'

১৫ মাঘ, মাঘীপূর্ণিমায় হরিচরণ চক্রবর্তীর দেশের বাড়ীতে গোসাঁইজী যাবেন। তের তারিখ কুলদাকান্তও বাড়ী যাচ্ছেন বলায়, গোস্বামীপ্রভু তাঁকে বলেন, 'তোমাদের দেশে ইছাপুরায় পরের দিন আমরাও যাব। মধ্যাহ্নে আহার করে এস, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।'

পরদিন সারদাকান্ত ছোট ভাই কুলদাকে বলেন, 'গোসাঁইর সঙ্গে না গেলে

---

১. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকারের কাছে শোনা।

বুঝি বাড়ী যাওয়া হয় না? এই সকালের গয়নার নৌকায় আজই চলে যা।' জবরদস্ত ছোটদার হুকুম তাঁকে তামিল করতে হয়। গয়নার নৌকায় উঠে তাঁর কান্না পায়; মনে-মনে গোসাঁইকে তিনি প্রণাম করে বলেন, 'ছোটদার কথায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি গয়নার নৌকায় আজই বাড়ী চলেছি, আমার জন্য আপনি অপেক্ষা করবেন না। আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করবেন।'

উৎসবের দিন সকালবেলায় কুলদাকান্ত আধঘণ্টার পথ হেঁটে হরিচরণবাবুর গৃহে পৌঁছে গোস্বামীপ্রভুকে প্রণাম করতেই তিনি বলেন, 'তুমি যে গতকাল সকালে গয়নার নৌকায় বাড়ী চলে এলে, তা আমি তখনই জানতে পেরেছিলাম।' কোন লোক গিয়ে গোসাঁইজীকে এ সংবাদ দিয়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা করায় গোসাঁইজী বলেন, 'না, তা নয়।'

এদিকে মহোৎসবের বাজনা বেজে ওঠে। গোসাঁইজী মহাপ্রভুর বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। দাঁড়িয়ে উঠে করজোড়ে সতৃষ্ণ নয়নে তিনি মহাপ্রভুর দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর আপাদমস্তক থর-থর করে কাঁপতে থাকে। বাউল-বৈষ্ণবেরা গোসাঁইজীর প্রাণস্পর্শী ভাব দেখে মহোৎসাহে কীর্তন শুরু করেন। কয়েকবার কীর্তনের তালে তালে তুড়ি দিয়ে গোস্বামীপ্রভু লাফিয়ে উঠে বাঁ হাতে লালকে ধরে নাচতে থাকেন। তাঁর স্পর্শে ভাবাবিষ্ট হয়ে লাল লম্ফপ্রদান করে এক পাশে সরে দাঁড়ান। গোসাঁইজী লালের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে মল্লবীরের মত বাহু দোলাতে থাকেন। লালও তাঁর দিকে দৃষ্টি রেখে উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু করেন। গোসাঁইজী ভীষণ হুঙ্কার দিয়ে বাঁ হাত মুষ্টিবদ্ধ করে, আর ডান হাতের তর্জনী লালের দিকে বাড়িয়ে ছুটতে থাকেন। লাল তখন বাঁ হাত ঢালের মত রেখে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে পিছু হটেন; তারপরই আবার 'জয় নিতাই,' 'জয় নিতাই' বলে নেচে নেচে গোসাঁইজীর দিকে এগিয়ে যান। গোস্বামীপ্রভুও তখন 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলে প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে লালের দিকে এগিয়ে আসেন। এইভাবে একে অপরের দিকে নৃত্যরত অবস্থায় ছোটাছুটি করতে লাগলেন। এদিকে ভাবাবেশে শ্রীধর তাঁদের পরিক্রমা করে নেচে চলেছেন, তারপর হঠাৎ এক-সময় তিনি জ্বলন্ত ধুনুচি নিয়ে গোসাঁইজীর আরতি করতে থাকেন। মহা-হুলুস্থুল পড়ে যায়। আত্মবিস্মৃত হয়ে দর্শকেরা 'হরিধ্বনি' করতে থাকেন; কয়েকজন সম্বিৎ হারিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন গায়কেরা গান ধরেছেন—

কি শুনি কি শুনি সিংহরব রে নদীয়ায়।
নিত্যানন্দ বাজায় ভেরী, ভোঁ-ভোঁ, ভোঁ-রব করি,
হুঙ্কারিয়া শ্রীঅদ্বৈত বগল বাজায় রে নদীয়ায়;
জগা বলে, মাধাভাই, পালাবার আর স্থান নাই,
সংসার ঘেরিল হরিনাম রে নদীয়ায়।
শ্রীচৈতন্য মহারথী, নিত্যানন্দ সারথি;
শ্রীঅদ্বৈত যুদ্ধে আগুয়ায় রে, নদীয়ায়।[১]

লাল গোসাঁইর চরণে লুটোপুটি খান; গোস্বামীপ্রভুও হুঙ্কার দিয়ে হরিধ্বনি করে সংজ্ঞাহীন কলেবরে লুটিয়ে পড়েন। 'ভূমৌ স্খলিতপদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।' শ্রীধরও মূর্ছিত। কেউ যাতে প্রভুর চরণ স্পর্শ না করে, এই উদ্দেশ্যে হরিচরণবাবু

---

[১] কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ', প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ৬৯।

ও কুলদাকান্ত কাপড় দিয়ে তাঁর চরণযুগল ঢেকে রাখেন। এমনিভাবে গোস্বামীপ্রভু যখন যেখানে গেছেন সেখানেই ভাবে, প্রেমে, নামের প্রসাদে সকলে এক লোকোত্তর আনন্দে ডুবে গেছেন—গোলোক-বৈকুণ্ঠ নেমে এসেছে ধরায়। ইছাপুরায় কয়েকদিন অবস্থান করে গোস্বামীপ্রভু ঢাকায় ফিরে আসেন।

কামিনী বসুর কন্যা শৈবলিনী প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখায়। ইংরেজীতে মেয়েটির আবৃত্তি শুনে লেডী বীডন (Lady Beadon) মুগ্ধ হন। শৈবলিনীকে কলেজে ভর্তি করার জন্য গোস্বামীপ্রভুর অনুমোদন চাইলে তিনি বলেন, 'কলেজে ভর্তি না করে সংস্কৃত পড়ান ভাল।' গোসাঁইজী নিজেই তাকে সংস্কৃত পড়ান। থৈপাড়ার রাধাগোবিন্দ দত্তের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সঙ্গে শৈবলিনীর বিয়ের প্রস্তাব দেন গোস্বামী মহাশয়। এই বিষয়ে বারদীর ব্রহ্মচারীজীর মত চাইলে তিনি অন্যত্র সম্বন্ধ স্থাপন করতে বলেন। তাঁর মতে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন রোগা, কন্যার স্বাস্থ্য ভাল; এতে ভবিষ্যতে অকল্যাণ ঘটতে পারে। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা শুনে কন্যাপক্ষ এই বিবাহে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন; অনেকে এই পাত্রের নিকট কন্যা সম্প্রদানে আপত্তি জানান। ব্রহ্মচারীজী অপরপক্ষে আর একটি ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ অনুমোদন করেন। কন্যার মার পিত্রালয় যদিও বারদী এবং শৈশব থেকে ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি গুরুর ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোন কাজ করতে প্রস্তুত নন। তিনি ছিলেন যথার্থ গুরুগতপ্রাণা। গোসাঁইজীর কথার উপর কোন কথাই উঠতে পারে না বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি গুরুর নির্দেশমতই বিবাহ দিবেন, তাতে যা হবার হবে। পাত্রপক্ষ থেকে দাবী-দাওয়ার কথা উঠলে, গোস্বামী মহাশয় বিরক্ত হয়ে বলেন, 'এ তো বাজারের আলু-পটল-মূলা কেনা-বেচা নয় যে দরাদরি হবে।' গোস্বামীপ্রভুর এই মন্তব্য শুনে পাত্রের অভিভাবক বিশেষ লজ্জিত হয়ে পড়েন, পরে গোস্বামী মহাশয়ের উপরই সব ভার ছেড়ে দেন।

ফাল্গুন মাসে (১২৯৪), হুগলী জেলায় পাত্রপক্ষের গ্রামের বাড়ী থৈপাড়াতেই বিয়ের ব্যবস্থা হয়। বিয়ের হাটবাজার করতে গোসাঁইজী মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়কে কলিকাতা পাঠান। কেনা-কাটা শেষ হলে তাঁর হাতে মাত্র চারটি পয়সা উদ্বৃত্ত থাকে। মহেন্দ্রবাবু তখন অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। তিনি এতে আর কিছু না হয়, চার পয়সার দুধ কিনে খাবেন মনে করলেন এবং এজন্য দোকানে ঢুকবেন এমন সময় এক সাধু এসে তাঁর কাছে হাত বাড়ালেন। পয়সা কয়েকটি তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সাধুর হাতে তুলে দিলেন, দুধ খাওয়া আর হয়ে উঠল না। থৈপাড়া ফিরে যেতেই গোসাঁইজী মৃদু হেসে মহেন্দ্রবাবুকে বলেন, 'দুধ না খেয়ে পয়সা চারটা বুঝি, দান করে দিলেন? তা ভালই করেছেন।'

'হ্যাঁ, তাই দিলেম, তা এর ভিতর কোন রহস্য আছে নাকি?' সহাস্যে জিজ্ঞাসা করেন মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়। গোসাঁইজী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঐ দুধ খেলে আপনার কলেরা হত। তাই আমার এক গুরুভাইকে পাঠালাম আপনার কাছ থেকে পয়সাগুলি নিয়ে নিতে। তিনি তখন আপনার কাছেই ছিলেন, গঙ্গাতীরে। তাঁর পয়সার কোন প্রয়োজন ছিল না।'[১] বিয়েতে পুরোহিত উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও গোস্বামীপ্রভু নিজে পৌরোহিত্য করেন।

---

১. জগবন্ধু মৈত্র-প্রণীত 'প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', পৃ ৩১০

বিয়ের কয়েকদিন পর একদিন দুপুরে প্রসাদ পাবার পর গোসাঁইজী ভক্তদের নিয়ে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় শুরু হয় এক শক্তির খেলা। ঘুমন্ত অবস্থায় যোগজীবনের চলে প্রাণায়াম। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও উপলব্ধি করেন এক বিচিত্র শক্তির খেলা। গোস্বামীপ্রভু বলে উঠেন, 'যাক, একটা ভাবনা গেল।' নগেনবাবু স্পষ্ট বুঝতে পারছেন বিশেষ একটা কিছু সংঘটিত হয়ে গেল, কিন্তু সেটা যে কি তা বুঝতে পারছেন না, তাই জিজ্ঞাসু ভাবে তাকিয়ে আছেন গোসাঁইজীর দিকে। গোস্বামীপ্রভু বললেন, 'মহাপুরুষেরা একত্র হয়ে ভগবানের কাছে ভারতের কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন। তিনি এত উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হলেন, অমনটি আর পূর্বে কখনও দেখি নি। নক্ষত্রমণ্ডল আরও উজ্জ্বল হল। পর্বতসকল আন্দোলিত হল, সমুদ্র উদ্‌বেলিত হল। ভগবান প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'শীঘ্রই দেশের দুর্গতি দূর হবে।' নগেনবাবু এবার জিজ্ঞাসা করেন, 'মহাপ্রভু উপস্থিত ছিলেন কি?' গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তিনিই অগ্রণী।'

শৈবলিনীর বিয়ের পর ঢাকা ফেরার পথে গোস্বামীপ্রভু সপরিবারে কয়েকদিন কলিকাতায় ১৮ কৃষ্ণদাস পাল লেনে ছিলেন। এই গৃহে অনেকেই গোস্বামী মহাশয়ের কাছে সাধন পান। ধামরাই গ্রামের হরিমোহন চৌধুরী সন্ন্যাসের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তিনি তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। গৃহে সুন্দরী স্ত্রী ও শিশুপুত্র। গোস্বামীপ্রভু তাঁকে সন্ন্যাস দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হরিমোহনের পীড়াপীড়িতে সন্ন্যাস দেন। তাঁকে সন্ন্যাস দিয়ে তিনি কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। ধাতুদ্রব্য তাঁর স্পর্শ বারণ, খাদ্যদ্রব্য পাতায় আহার, পানীয় হাতে রেখে পান, গৃহস্থের গৃহে একরাত্রির বেশী বাস নিষেধ করে দেন। তবে গুরুভাইদের গৃহে এই নিষেধ প্রযোজ্য নয়; কারণ সংসারী হলেও তাঁরা উদাসীন। তাই তাঁদের গৃহস্থ মনে করা ঠিক নয়। এই পথের গৌরব যেন তিনি কোনভাবে নষ্ট না করেন, তার জন্যই এত বিধিনিষেধ আরোপ করলেন গোস্বামীপ্রভু। ঐ সময় দাতামাই নামে পরীসিদ্ধা এক মুসলমান রমণী কলিকাতায় ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় কয়েকজন অনুগামী নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে যান। তিনি প্রভুকে সমাদর করে নিজের আসনের একপাশে বসান। দাতামাই তখন পাটালিগুড় কামড়িয়ে খাচ্ছিলেন; তা ভেঙ্গে তিনি গোসাঁইজীকে দেন। গোস্বামীপ্রভু তা নিজে নিলেন। সঙ্গে করে প্রভু সন্দেশ নিয়ে গিয়েছিলেন, তা দাতামাইকে দেওয়া হয়। ঐ সন্দেশ গোসাঁইজী দিলে তিনি তা তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। পরে খানিকটা গাঁজা নিয়ে দাতামাই গোস্বামীপ্রভুর মুখে গুঁজে দেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, তা গজা হয়ে যায়। শান্তিসুধার তখনও বিয়ে হয় নি; গোসাঁইজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'শান্তির বিয়ে কবে হবে?' দাতামাই বলেন, 'আর বেশি দেরী নেই; বর সঙ্গেই রয়েছে।' গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গীদের মধ্যে জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ও গিয়েছিলেন।

ঢাকা ফিরে আসেন গোস্বামী মহাশয় ২৬ চৈত্র (১২৯৪) সায়াহ্নে। এইদিনই ঢাকা ও বিক্রমপুরে দুই-তিন মিনিট সময়ের মধ্যে এক বিপর্যয় ঘটে গেল। প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিবায়ু এই অঞ্চলের উপর দিয়ে নিদারুণ বেগে বয়ে যায়। নদী থেকে জলস্তম্ভ উঠে আকাশে গিয়ে মেশে। প্রলয়ঙ্কর শব্দে আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ে। ঐ সময় গোস্বামীপ্রভু আসন ছেড়ে বাইরে এসে করজোড়ে ছলছল চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন মহাকালী ও মহাবীর দিগন্ত কাঁপিয়ে আগুনের গোলা

চারদিকে ছুঁড়ছেন, যেন প্রলয়ের সংহারমূর্তি! কালীর অনুচারিকারা চারদিক লণ্ডভণ্ড করে পেছনে পেছনে ছুটছেন। গোস্বামীপ্রভু প্রার্থনা করেন, ‘জয় মা কালী! জয় মা কালী! দয়া কর দয়াময়ী! প্রসন্ন হও মা, প্রসন্ন হও। জয় মহাবীর! জয় মহাবীর! মা, রক্ষা কর। মহাবীর শান্ত হও। তোমার ত্রিশূল সম্বরণ কর, মা। আমার বক্ষে আঘাত কর মা। মহাবীর! ও-সব অগ্নিগোলা আমার বুকে ছোঁড়। এঁদের বাঁচাও! সকলকে দয়া কর, ক্ষমা কর, রক্ষা কর।’ এক অদ্ভুত জলদগম্ভীর কণ্ঠের প্রার্থনায় প্রকৃতি যেন স্তব্ধ হয়ে পড়ল।[১] গোস্বামীপ্রভুর প্রার্থনায় প্রলয়-দেবতা শান্ত হলেন সত্য, কিন্তু চোখের পলকে যা ঘটে গেল, তা বুদ্ধির নাগালের বাইরে। যেখান দিয়ে এই ঘূর্ণিঝড় বইল, সে-সব জায়গায় দালান-কোঠার রঙ হয়ে গেল আগুনে পোড়া বাড়ীর মত। মাঠে-ময়দানে দূর্বাঘাস যেন জ্বলে পুড়ে গেল। কত শিশু, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ এই ঝড়ের কবলে পড়ে অক্ষত রইল, অথচ কত শক্ত-সমর্থ লোক বিধির বিধানে প্রাণ হারাল। তাছাড়াও বিচিত্র কত সব ঘটনা যে ঘটেছিল, তা বিশ্বাস করতে মন চায় না। আশ্চর্য ব্যাপার সব, মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ পার হতে উত্তর পারে, বহু দালান-কোঠার উপর দিয়ে, শহরের মাঝামাঝি স্থানে নর্ম্যাল স্কুলের দোতলায় একজন পঁয়ষট্টি বছর বয়স্কা বৃদ্ধাকে অক্ষত দেহে এনে ফেলেছে। ‘ঢাকাপ্রকাশ’ ছাপাখানার একটি আড়াইমনী ভারি টেবিল একটি অপরিসর দ্বারযুক্ত গৃহের ভিতর থেকে পাঁচ গজ দূরে আর একটি গৃহের মধ্যে এনে ফেলেছে; অথচ টেবিলটির কোন অঙ্গহানি হয় নি, এমন কি তাতে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি। এক বাড়ী থেকে সরাসমেত একটি মুড়িভরা কলস তিনশ গজ দূরে আর এক বাড়ীতে এসে পড়েছে, অথচ মুড়ি যেমনটি ছিল তেমনই আছে। একটি যুবতীর স্তনদ্বয় নিপুণ হাতে ক্ষুরে কাটার মত সমান করে তুলে নেওয়া হয়েছে; অথচ শরীরের আর কোথাও কোন ক্ষতের চিহ্ন নেই। একটি এক হাত লম্বা, আধা ইঞ্চি ব্যাসের বাঁশের কঞ্চি একটি সুপারী গাছকে এপিঠ-ওপিঠ বিদ্ধ করে রয়েছে, বহু চেষ্টা করেও কঞ্চিটিকে বের করা যায় নি। কত নৌকা যে ডুবেছে! আবার দুই-একটি নৌকা ছাদের উপরও আশ্রয় পেয়েছে! গৃহস্থ বাড়ীর পুকুরে পর্যন্ত কত লোক মরে ভাসছে। ঢাকার নবাব গনি মিঞা সাহেবের বিলাস-মহলটি ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

দুষ্কৃতের দমন করবার জন্যই ভগবান এমনি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অবতারণা করেন, এতে অনেক নিরীহ লোকেরও ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয় সন্দেহ নেই, তবে তা কখনই জগতের কল্যাণের প্রশ্নে বড় ক্ষতি বলে মনে করা হয় না। সাধু-মহাত্মারা জগত-কল্যাণে এমন অবস্থা যেমন সাদরে গ্রহণ করেন, তেমনি আবার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কল্যাণ-কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনাও জানান। বস্তুত গোস্বামীপ্রভুর প্রার্থনার ফলেই যেন এইদিন অনেকে রক্ষা পেল। জড়শক্তিতে ভগবৎ-ইচ্ছায় চিৎ-শক্তি যুক্ত হলে, নিতান্ত অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে, সেদিনের ঘটনা যেন তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠার জীবন্তমূর্তি, শরণাগতির বিগ্রহ গোস্বামীপ্রভু। তিনি বার বার এই কথাই বলছেন যে, সত্যই ধর্ম; আর গুরুকরণ

---

১. অমৃতলাল সেনগুপ্ত-প্রণীত ‘আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী’, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৬৮

ব্যতীত ধর্মলাভ হয় না। এই উপদেশটি অনেকের মনে ক্রিয়া করেছে, অনেক ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্ম অনুগামী ও সহযোগিবৃন্দ একে একে তাঁর নির্দেশমত যোগসাধনে দীক্ষা নিয়ে জীবনে কৃতকৃতার্থ হয়েছেন।

কাকিনীয়ার রাজা মহিমারঞ্জনও মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন এবার গোসাঁইজীর নিকট থেকে যোগসাধন-দীক্ষা নেবেন। ইতিপূর্বে কোকিলেশ্বরের দীক্ষাপ্রসঙ্গও তাঁর বাবার মুখে শুনেছেন এবং তারপর থেকেই তিনি মনকে দীক্ষা নেবার প্রশ্নে প্রস্তুত করে তুলেছেন, কিন্তু গোসাঁইজী এ ব্যাপারে নীরব থাকায় সাধন নেওয়া হয়ে উঠে নি। এবার তাই (১২৯৫ সালের বৈশাখ মাসে) মহিমারঞ্জন সপরিবারে গোস্বামীপ্রভুকে কাকিনীয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়ে ঢাকায় তাঁর একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। গোসাঁইজী আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সপরিবারে গোস্বামীপ্রভু এবং ভক্তদের মধ্যে শ্রীধর ঘোষ, পণ্ডিত মহাশয়, মনোরঞ্জনবাবু ও নবকুমারবাবুকে নিয়ে কাকিনীয়া যাত্রা করেন। এতে ব্রাহ্মভক্তগণ প্রমাদ গণেন। উত্তরবঙ্গের রাজা মহিমারঞ্জনের মত একজন ব্রাহ্ম দিকপাল গোসাঁইজীর যোগসাধন-দীক্ষা গ্রহণ করলে তাঁহাদের বিষম ক্ষতি হবে। এজন্য তাঁরা রাজা মহিমারঞ্জনকে প্রভাবান্বিত করবার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করেন। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত গোসাঁইজীর কয়েকটি বক্তৃতা সংগ্রহ করে ও উপদেশ ছেপে তাঁরা রাজা মহিমারঞ্জনের নিকট পাঠান, যাতে তিনি প্রথম থেকেই গোসাঁইজীর প্রতি প্রতিকূল ভাবধারা পোষণ করতে পারেন এবং গোসাঁইজীর কাকিনীয়া যাত্রা সকল দিক থেকে বিফল হয়। কিন্তু ফল হল বিপরীত। বিচক্ষণ মহিমারঞ্জন সমস্ত অবস্থা বুঝতে পারলেন। গোসাঁইজীর বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের অপচেষ্টা বিফল হল। ধর্মের জয় অনিবার্য, মহিমারঞ্জন ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হবেন না। গোসাঁইজী কাকিনীয়ায় এলে তিনি সমস্ত অবস্থা তাঁকে জানিয়ে দেন। সমস্ত কথা শুনে হাসলেন গোসাঁইজী, আবার দুঃখও পেলেন সমধিক। বিচিত্র এঁদের পন্থাবলম্বন! দুঃখের সঙ্গেই বললেন গোসাঁইজী, 'আমি নিজের অস্ত্রে নিজে কাটা যাই। বস্তুত আমি যখনই যা সত্য বলে বুঝি তখন তা বলি, এবং সেমতে চলি।' রাজা মহিমারঞ্জন সপরিবারে এবার গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন পান। আরও অনেকে এ সময় যোগসাধনে দীক্ষিত হয়।

একদিন গোস্বামীপ্রভু কাকিনীয়ার কালীবাড়ী গিয়েছেন; সঙ্গে রয়েছেন মহিমারঞ্জনবাবু এবং অন্যান্য শিষ্য ও ভক্তরা। বিগ্রহ দর্শন করেই গোসাঁইজী সমাধিস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সমাধি ভাঙলে মহিমারঞ্জনবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি এতক্ষণ কি দর্শন করছিলেন?' গোসাঁইজী হেসে উত্তর করেন, 'মৃন্ময়ীর মধ্যে চিন্ময়ী দর্শন করে আমি এক অপরূপ লোকে চলে গিয়েছিলাম।' কাকিনীয়ায় একদিন উপাসনার সময় গোস্বামীপ্রভু উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন, 'এখানে অবিশ্বাসী কেউ রয়েছেন, তাই আজ আর ভাবের স্ফুরণ হচ্ছে না। হরিনাম কর।' কীর্তনান্তে রাজ-জামাতার ভগিনীপতি প্রভুপাদের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলেন, 'প্রভো, আমিই সেই অবিশ্বাসী। আপনি আজ উপাসনার সময় বলেছিলেন, 'পরমেশ্বর তোমাকে দেখিতেছি।' আমার মনে তখন উদয় হয়, যিনি ভগবানকে দর্শন করেন তিনি আবার কি করে কথা বলেন? শুনেছি তখন তাঁর অবস্থা বোবার স্বপ্ন দেখার মতন।' গোসাঁইজী তাঁকে বলেন, 'উপাসনার সময় কি বলেছি, আমার স্মরণ নাই। তবে আপনি অবিশ্বাসী নন। যদি তা-ই হতেন, তাহলে নিজে

কখনও তা স্বীকার করতেন না। উপাসনার সময় যখন ভগবান প্রকাশিত হন, তখন প্রথম অবস্থায় কথা বলা যায়। প্রকাশ আর একটু ঘন হলে কথার স্বর গদ্‌গদ হয়। পরে ঘনরূপে প্রকাশিত হলে কথা বন্ধ হয়ে যায়।' এই ভদ্রলোকটিও এবার গোসাঁইজীর কাছে সপরিবারে সাধন পান।

মনোরঞ্জনবাবু কয়েকবারই গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গে কাকিনীয়া গিয়েছেন। প্রতিবারই তিনি লক্ষ্য করেছেন রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার গোবিন্দবাবুর প্রতি গোসাঁইজীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্ত নেই। কৌতূহল বশে একদিন তিনি গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা, দেখা হলেই গোসাঁইজী আপনার প্রতি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কেন?' গোবিন্দবাবু হেসে বলেন, 'আমিও একদিন অবাক হয়ে গোস্বামীপ্রভুকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করি। তাঁর উত্তর শুনে আমি প্রকৃতপক্ষে স্তব্ধ হয়ে পড়েছিলাম। অসামান্য এ কৃতজ্ঞতাবোধ। উত্তরে গোসাঁইজী বলেছিলেন, "বাগ-আঁচড়ায় যখন ছিলাম, খামের অভাবে চিঠি লিখে কাগজ মুড়ে আঠা লাগিয়ে চিঠি ডাকে দিতাম। কিন্তু আঠার অভাবে অনেক সময় চিঠি ডাকে দেওয়া হয়ে উঠত না। এই সময় আপনার কাছ থেকে আমি এক চিঠি পাই। কাগজ মুড়ে তা ভাঁজ করে চারকোণার সংযোগ-স্থানে স্ট্যাম্পটি আপনি লাগিয়েছিলেন। আপনার চিঠি দেখে কৌশলটি শিখে নিলাম। ফলে আঠার অভাব আর জীবনে বোধ করি নাই। এতে যে কি উপকার হয়েছে তা আর কি বলব!"' কাকিনীয়া হতে গোস্বামীপ্রভু সহযাত্রীদের নিয়ে কামাখ্যা যাত্রা করেন। রাজা মহিমারঞ্জনের জামাতা রমণীবাবুও তাঁর সঙ্গে যান। নৌকায় কুড়িগ্রাম গিয়ে ট্রেনে ধুবড়ী হয়ে, আষাঢ় মাসের (১২৯৫) গোড়ার দিকে গোসাঁইজী কামাখ্যায় পৌঁছেন। রাজাবাহাদুরের পাণ্ডার বাড়ীতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়। পাহাড়ে উঠেই তিনি কামাখ্যা মায়ের মন্দিরে গিয়ে দর্শন ও পূজাদি করেন। পরদিন তিনি যান ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে। এই উভয় ক্ষেত্রেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রকাশিত হয়েছিলেন গোসাঁইজীর কাছে; সবার অলক্ষ্যে চলেছিল ভাবের আদান ও প্রদান। গোসাঁইজী অতিশয় তৃপ্ত ও পুলকিত। উভয় দিনই বড় আনন্দে কাটল সকলের। পুরাণে আছে, দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে সতীর প্রাণহীন দেহ কাঁধে নিয়ে শিব যখন প্রলয় নাচন শুরু করেন, তখন তাঁকে প্রকৃতিস্থ করার উদ্দেশে বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে সতীদেহ খণ্ডবিখণ্ড করেন। একান্ন খণ্ডে তা বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে দেবীর কোন অঙ্গ পড়েছে, সেইখানেই একটি পীঠস্থান হয়েছে। একান্নপীঠের এইভাবে উৎপত্তি হয়েছে। কামাখ্যা পাহাড়ে পড়েছিল দেবীর যোনি। তাই কামাখ্যাকে বলা হয় যোনিপীঠ। পুরাণমতে অম্বুবাচীর সময় ধরণী রজস্বলা হন এবং এঁর নিদর্শন এখানে মেলে। এই কয়েকদিন কামাখ্যা মন্দিরে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত রাত্রে কারও প্রবেশাধিকার নেই। ৭ আষাঢ়। এইদিন থেকেই অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি। গভীর রাত্রে ভাবাবিষ্ট হয়ে গোসাঁইজী মন্দিরের দিকে ছুটে যান। সশস্ত্র প্রহরী কি ভেবে সসম্ভ্রমে তাঁকে পথ ছেড়ে দেয়। নিঝুম রাত্রির থমথমে আঁধারে মন্দিরের অভ্যন্তরে 'ববম্ বম্' ধ্বনি করে দেবীপীঠে তিনি সাষ্টাঙ্গ দেন; অনুভব করেন পিচকারীর ধারার মত তরল পদার্থে তাঁর সর্বাঙ্গ সিক্ত হচ্ছে। তিনি ঘরে ফিরে দেখেন তাঁর বসন-ভূষণ যথার্থই দিব্য রক্তরাগে রঞ্জিত।

গৌহাটির উকিল, ধামরাই-নিবাসী দীননাথ সেন সবান্ধব গোসাঁইজীকে আমন্ত্রণ করে তাঁর গৃহে নিয়ে যান। একদিন নৌকা করে তাঁরা উমানন্দ-ভৈরব

দর্শন করেন; আর একদিন দর্শন করেন বশিষ্ঠ-আশ্রম। গৌহাটি হতে প্রভুর পরিবারবর্গ ও কয়েকজন শিষ্য স্টীমারে গোয়ালন্দ হয়ে ঢাকায় ফিরেন। গোসাঁইজী, পণ্ডিত মহাশয়, শ্রীধর ও রমণীবাবু কাকিনীয়ায় ফিরে যান। রাজা মহিমারঞ্জনের প্রবল ইচ্ছা গুরুকে নিয়ে তিনি তীর্থভ্রমণে বের হবেন; কিন্তু হঠাৎ মহিমারঞ্জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। গোস্বামীপ্রভু তাঁকে অনেক করে বুঝিয়ে এবারের মত তীর্থভ্রমণের বাসনা পরিত্যাগ করান। মহিমারঞ্জন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলে গোসাঁইজী কাকিনীয়া থেকে কলিকাতা হয়ে ঢাকা যাত্রা করেন। ৪ ভাদ্র, ১২৯৫ গোসাঁইজী একরামপুর আশ্রমগৃহে পোঁছেন।

গেণ্ডেরিয়ায় আশ্রম-সঞ্চার

বুধবার, ১৪ ভাদ্র, ১২৯৫ সালে জন্মাষ্টমী তিথিতে গেণ্ডেরিয়া-আশ্রম সঞ্চারিত হয়। আশ্রমের গোড়াপত্তন হয়েছিল ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে, বিরল-বসতি এলাকা হতেও বিস্তর ব্যবধানে, গেণ্ডেরিয়ার শ্বাপদসঙ্কুল বিটপীশ্রেণীবেষ্টিত বনানী-প্রান্তে। আশ্রমের সীমা নির্দেশ করে গুল্ম-তরুরাজি। কোন প্রাচীর নেই, নেই আর কোন আবেষ্টনী। চারখানি খড়ের ঘর, আর একটি পাকা কোঠা সবে উঠেছে; কুঞ্জবাবুর তত্ত্বাবধানে প্রাচীন আমগাছের পূর্ব-উত্তর কোণে ভজনকুটির প্রস্তুত হয়েছে; এর পরিমাপ পূব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য দশ হাত, প্রস্থ আট হাত। চৌচালা ঘর, ছনের ছাউনী। দক্ষিণে মাঝামাঝি একটি মাত্র দরজা; ভিতরে উত্তর ও দক্ষিণের দেওয়ালের বিপরীত দিকে আড়াআড়ি দুইটি একই আয়তনের গবাক্ষ, দেড় ফুট উঁচু আর এক ফুট চওড়া। দরজার পূবধার ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণব্যাপী একটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে বিভক্ত হয়েছে দুইটি প্রকোষ্ঠ। উত্তরপ্রান্তে চার ফুট উঁচু আর দুই ফুট চওড়া চৌকাঠহীন ও পাল্লাহীন একটি দরজা। দিনের বেলায়ও ছোট কুঠরীতে বাইরের আলো প্রবেশ করে না। ঐ ঘরেরই দক্ষিণ দেওয়াল-সংলগ্ন উত্তর-মুখী আসন। সম্মুখে ধুনি। পশ্চিম দিকের ছোট ঘরটিতে প্রভুর বসবার আসন। ঘরের ভিত্তি ও প্রাচীর সবই মাটির। আশ্রমের ঘরগুলির অবস্থান—পূবের ভিটিতে একখানা ঘর, পশ্চিমের ভিটিতে কোঠাঘর, ভাণ্ডার ও রান্নাঘর; দক্ষিণের ভিটির ঘরখানি বেশ বড়; একটি পাতকুয়া এবং একটু দূরে পায়খানা। নবনির্মিত আশ্রমের পূব দিকে কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় এবং পশ্চিম দিকে রাধারমণ গুহ মহাশয় জমি সংগ্রহ করে বসতবাটি নির্মাণ শুরু করেছেন।

১৩ ভাদ্র অধিবাস-উৎসব। এইদিনই গোসাঁইজী সপরিবারে একরামপুরের বাড়ী ছেড়ে আশ্রমে আসেন। গোস্বামীপ্রভু আসতেই মুহুর্মুহুঃ উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে খোল-করতাল বেজে ওঠে। সংকীর্তনে ব্রাহ্মোরাও অনেকে এসেছেন। কীর্তন শেষ হলে একটি ধামাভরা বাতাসা মাথায় ঠেকিয়ে প্রভু 'হরিবোল, হরিবোল' বলে লুট দেন। অরক্ষিত উন্মুক্ত পরিবেশে, যেন সেই ঋষিযুগের সাধন-কাননে বসবাস করতে এলেন গোসাঁইজী। সঙ্গে সহধর্মিণী, শ্বশ্রূমাতা, পুত্র এবং দুইটি কন্যা; ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে নবকুমারবাবু, পণ্ডিত মহাশয়, লাল ও শ্রীধর ঘোষ। লাল বয়সে নবীন হলেও প্রভুর কৃপায় বেশ উঁচু অবস্থা। বয়স পনর-ষোল; তখনই দৃষ্টি গিয়েছে খুলে। ভূত ভবিষ্যৎ যাকে যা বলেন, তা-ই ঠিক হয়। অতীত

জীবনের অনেকের এমন সব গুহ্য কথা বলেন, যা শুনে সকলের তাক লেগে যায়। সাধারণ কথায়ও লালের এক অসাধারণ শক্তি। যোগজীবন ঘরে বসে পড়াশুনা করেন, আর লাল গেণ্ডারিয়ার জঙ্গল থেকে অদ্ভুত এক শব্দ করেন। যোগজীবনের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়, তিনি ছুটে যান লালের কাছে।

১৪ ভাদ্র ভোরবেলাতেই অনেক হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব এসে কীর্তনে যোগ দেন। কয়েকজন মুসলমান ফকিরও আসেন। এক মহামিলনের যেন উদ্বোধন-উৎসব শুরু হয়। উৎসাহের অন্ত নেই। ভিতরে ও বাইরে দলে দলে সংকীর্তন হচ্ছে। বেলা বারটায় সংকীর্তন শেষ হয়, গোস্বামীপ্রভু হরির লুট দেন। অনেকে চলে যান। যাঁরা রইলেন, তাঁদের অন্নপ্রসাদের ব্যবস্থা হল।

আশ্রমে এসে প্রথম প্রথম গোস্বামীপ্রভুর বসার জায়গার কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। প্রাতে চা পানের পর তিনি কখনও কখনও পূবের ঘরে, কখনও বা সাধন-কুটীরের পশ্চিম প্রকোষ্ঠে, আবার কোনও দিন বা আমগাছের নীচে আসনে বসে দিন কাটিয়ে দিতেন। অপরাহ্ণে দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে পূবমুখী হয়ে বসে আলাপ করতেন। সাধন-কুটীরের বড় ঘরটিতে গোস্বামীপ্রভু অনেক সময় আগন্তুক-দের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতেন। পুরুষদের প্রায় সকলেরই সাধন এইখানে হত। পূর্বে মেয়েদের এই ঘরে যেতে নিষেধ ছিল না। অনেক স্ত্রীলোক এখানে সাধনও পেয়েছেন কিন্তু পরে এই ঘরে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়।

আশ্রমের কোঠাঘরে সকন্যা যোগমায়া দেবীর থাকার ব্যবস্থা হয়। গোস্বামী-প্রভুর বিশ্রামের আসনও এই কোঠাঘরে। সন্ন্যাসের পর গুরু ব্রহ্মানন্দ পরমহংস-দেবের আদেশে গোসাঁইজী পরিবারের মধ্যে বসবাস করলেও তিনি তাঁর সন্ন্যাসধর্ম অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। যোগমায়া দেবী গোস্বামীপ্রভুকে গুরু ও ইষ্টভাবে সেবাপূজা করতেন। প্রভুপাদের দৈনন্দিন কার্যের তিনি সহায় ছিলেন। শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ চাকের মৌমাছির মত গোস্বামীপ্রভুকে ঘিরে থাকতেন। যোগমায়া দেবী বাৎসল্যভাবে তাঁদের সমাদর করতেন। নিজে রান্না করে সকলের আহারের ব্যবস্থা করতেন, তাঁদের উচ্ছিষ্ট সংস্কার করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে আশ্রমের গৃহাদি সম্মার্জন, রন্ধন, পরিবেশন, শিষ্যদের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি নিত্য-কর্মের সকল ভার স্বেচ্ছায় তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে সূর্যোদয়ের পূর্বে রোজই আশ্রমের প্রাঙ্গণ ঝাড়ু দিয়ে তিনি নিজে গোবরজল ছিটা দিতেন। পরে অবশ্য শিষ্য-শিষ্যারা এসব কাজ স্বেচ্ছায় কর্তব্যজ্ঞানে করতেন।

প্রত্যহ ভোরে স্নান করে লোকচক্ষুর অন্তরালে ফুলচন্দন দিয়ে তিনি গোস্বামীপ্রভুর পাদপূজা করতেন ও সাষ্টাঙ্গ দিয়ে তাঁর শ্রীমুখে বাল্যভোগের প্রসাদ তুলে ধরতেন। গোসাঁইজীও স্বহস্তে তাঁকে চন্দনের ফোঁটা দিতেন। অনেক-দিন উভয়েই সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। রাত্রে গোস্বামীপ্রভু আসনে বসে সারারাত নামে ডুবে থাকতেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে যোগমায়া দেবী প্রভুর আসনের পাশে ঘুমিয়ে পড়তেন। আবার কখনও বা নিজের আসনে বসে নাম করতেন। প্রয়োজন মত গোস্বামীপ্রভুর সেবা করতেন। আসক্তির মূল নাশের নাম সন্ন্যাস। অন্তরে আসক্তির ছিটেফোঁটা থাকলেও সন্ন্যাসী বলা যায় না। ফল পাকলে যেমন তা বোঁটা থেকে আপনিই খসে পড়ে, প্রকৃত সন্ন্যাসেও তেমনি আসক্তির বিনাশ হয়। বস্তুত গোস্বামীপ্রভু শাস্ত্র ও সদাচারের মর্যাদা দিতেই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। গোসাঁইজী

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমার কাছে যোগজীবনও যা, একটি পথের কুকুরও তা।' প্রকৃতপক্ষে মাতা শ্বশ্রূমাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং আত্মীয়স্বজন তাঁর সকলেই ছিলেন; কিন্তু তাঁরাই যে তাঁর নিজের লোক আর সব পর, এ ভাব তাঁর কথাবার্তায় বা কার্যকলাপে কখনও প্রকাশ পায় নি। আসনে বসে তিনি দিবারাত্রি যোগসাধন করেছেন, আর পাশে স্ত্রী বসে বা শুয়ে রাত্রি যাপন করেছেন; এ-দ্বারা তিনি যে সার্থক বা সামর্থী সন্ন্যাসী ছিলেন, তারই নজির রেখে গেছেন।

সাধন-কুটীরের উত্তর দিকের প্রাচীরের বাইরের দিকে নিজ হাতে তিনি খড়িমাটি দিয়ে ত্রিকোণ নিশান এঁকে তার উপরে লিখেছিলেন, 'ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।' এর তাৎপর্য, মহাপ্রভুর ধ্বজাই তিনি বহন করে চলেছেন। আর সাধন-কুটীরের বড় ঘরের উত্তরের প্রাচীরের ভিতর দিকে খড়িমাটি দিয়ে তিনি স্বহস্তে লিখেছিলেন—

এইছা দিন নাহি রহেগা।
১. আত্মপ্রশংসা করিও না। ...
২. পরনিন্দা করিও না।
৩. অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।
৪. সর্ব্বজীবে দয়া কর।
৫. শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।
৬. শাস্ত্র ও মহাজনদের আচরণের সহিত যাহা মিলিবে না, তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।
৭. নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।

ভিতরের দিকে লেখার রহস্য, এইসব সাধারণের জন্য নয়। যাঁরা যথার্থ ধর্মার্থী, যাঁরা বহিরঙ্গ-বিলাসী নন, যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্মুখী, এইসব তাঁদের উদ্দেশ্যেই লেখা।

একদিন আশ্রমের আমগাছতলায় বসে গোসাঁইজী বলেছিলেন, 'উপদেশ শুনে কি হবে? শুধু শুনে গেলে কিছুই হয় না। জীবনে উহা পরিণত করতে হয়। ইচ্ছা করলেই সব উপদেশ মত চলা যায় না, সত্য। অনেকের ভাল হতে ইচ্ছা আছে, চেষ্টাও আছে; কিন্তু পেরে ওঠে না। সকল রিপুর উপর সকলের সমান আধিপত্য নাই, এ খুব সত্য কথা। কিন্তু সত্য কথা তো লোকে ইচ্ছা করলেই বলতে পারে; তাই বা করে কই? সত্য কথা, সত্য ব্যবহার, সত্য চিন্তা সকলেরই প্রয়োজন। এ তিনটি অভ্যস্ত হলে আর বড় উৎপাত থাকে না। ধর্মার্থীগণের প্রথমে এই তিনটি অভ্যাস করে নিতে হয়। পরে সবই সহজ হয়ে আসে। এই তিনটি আগে অভ্যাস কর, সব উৎপাত শান্তি হয়ে যাবে।'

আশ্রম-সঞ্চারের পরদিন দুপুরে ঢাকা শহরে এক কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক ধনীগৃহে এসে সাহায্য প্রার্থনা করেন। গৃহস্বামী তাঁকে চলে যাওয়ার কথা বলার পরও বার বার একই কথা বলায় ধনী গৃহস্বামীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি ব্রাহ্মণপ্রার্থীকে ক্রোধের বশে জুতাপেটা করেন। প্রতিবেশিগণ এই গর্হিত আচরণের সমালোচনা করে বলেন, 'দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সামান্য কিছু দিয়ে বিদায় করে দিলেই হত! নিজে পাদপ্রক্ষালন করে ব্রাহ্মণের সম্মান করেছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ধনের এত গর্ব ভাল না, এতে অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।' ধনী গৃহস্বামী তখন ভীত হয়ে ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা চান ও তিনশত টাকা সাহায্যও দেন।

ঘটনাটি শুনে গোস্বামীপ্রভু মর্মাহত হন। তিনি দুঃখ করে বলেন, 'এমন দানের সার্থকতা নাই। এ গরু মেরে জুতাদানের সামিল। স্বকর্ম্মফলভুক পুমান্।' তারপরই যেন করুণায় বিগলিত হয়ে সাধন-কুটীরের প্রাচীরে লিখে রাখেন, 'এইছা দিন নাহি রহে গা।' এই কথা কয়েকটির ভিতর রয়েছে ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনের অসার পরিচর্যা থেকে বিরত থাকার তাৎপর্যময় ইঙ্গিত। কি আছে এ মানবজীবনের যদি তা সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয়; যদি জগতের কল্যাণ-সাধনে তা ব্যাপৃত না হয়? পরমানন্দের স্বাদ গ্রহণ করাই তার মুখ্য লক্ষ্য; সে অমৃতের পুত্র। অমৃতময় পরম পিতার সঙ্গে মিলনই তার একমাত্র কাম্য হলেও, প্রকৃতপক্ষে আরো এক পরম অভয়বাণী ও আশীর্বাদ রয়েছে এই কথা কয়েকটির মধ্যে; তা যেন মানুষকে অহরহ বলছে, তুমি ধূম্রাচ্ছাদিত বহ্নি, তোমার মধ্যে অগ্নির প্রকাশ একদিন না একদিন হবেই। সেই ঋষিকণ্ঠের প্রতিধ্বনি—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

হে অমৃতের সন্তানেরা, তোমরা শোন। জ্যোতির্ময় লোকে তোমাদের স্থান। আমি সেই স্বয়ং প্রবল অবিদ্যার অতীত বিরাট পুরুষকে জেনেছি।

এই বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ এক পরম বিস্ময়। মানবশিশুকে ভগবান অসহায়, অসম্পূর্ণ, দুর্বল করে সৃষ্টি করেন; কিন্তু তার মধ্যে রাখেন এক পরমাশক্তি, যাতে সে আপনাকে বিকশিত করতে পারে। মানবদেহের গড়ন চতুষ্পদী জন্তুর অনুরূপ না হলেও মানব তাদের মত করে চলতে পারে কিন্তু তা না করে প্রকৃতিগতভাবেই সে দুই পায়ে ভর দিয়ে চলতে শিখে, তার মহিমা প্রকাশ পায় পশুপ্রকৃতির বিলোপসাধনপথে। তার বুভুক্ষু হৃদয় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয় জীবধর্মের পরিপূর্ণতার জন্য। দুর্লভ এই মানবজন্ম। শাস্ত্রে আছে, চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করার পর হয় মানবজন্ম। মানবের প্রথম দশ জন্ম কাটে প্রকৃতির কোলে লালিত অজ্ঞ আদিবাসীদের মধ্যে। প্রথমে বিষয়-জ্ঞান আসে, তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হয় অনেক পরে। প্রবৃত্তির সঙ্গে তখনই শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। পরমপিতার সঙ্গে মিলনের জন্য তার মহাপ্রাণ গুমরে কাঁদে; মেলায় হারান শিশুর অবস্থা তখন তার—অন্তরে চলে মৌন প্রার্থনা, 'পিতা, অনিত্যের মধ্যে পড়ে আছি। অন্ধকার বিভীষিকা থেকে তোমার জ্যোতির্ময় লোকে আমায় নিয়ে চল। মৃত্যুর করাল-কবল থেকে তোমার অমৃতলোকে আমায় নিয়ে যাও।'

অভয়বাণী শুনিয়েই গোস্বামীপ্রভু ক্ষান্ত হন নি। পরমপিতার সঙ্গে মিলন কি করে ত্বরান্বিত হয় তার গূঢ় রহস্যও উদ্ঘাটন করেছেন সাতটি অমূল্য উপদেশের মাধ্যমে। এগুলি যে মহৎ-জীবন লাভের শাশ্বত সোপান, তা তিনি তাঁর নিজের জীবনেও প্রত্যক্ষ করে দেখেছেন। কিভাবে এইসব আয়ত্ত করতে হয়, ক্রম-অনুসারে তিনি তার গুরুত্ব দিয়েছেন। পরমপিতা ও পরমবস্তু লাভ করার সঙ্কল্প নিলেই হবে না; সেজন্য চাই ত্যাগ, তিতিক্ষা, চরিত্রগঠন। পরমপিতার নির্দেশিত ও চিহ্নিত পথেই করতে হবে আমাদের চরিত্রগঠন। তিনি ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ-গুণের তারতম্যে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বভাবের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য। রজোগুণের প্রাধান্যে আত্মপ্রশংসা ভাল লাগে। সত্ত্বগুণ যত বাড়ে, রজোগুণ তত হ্রাস

পায়। যদি নিজেদের দোষ না দেখে তা ঢেকে রেখে আত্মপ্রবঞ্চনা করি তাহলে চরিত্রগঠন হবে কি করে?

তাই গোস্বামীপ্রভুর প্রথম নির্দেশ—আত্মপ্রশংসা করিও না। আত্মপ্রশংসা করলে ভগবান দূরে সরে যান। তাঁর দিকে এগিয়ে যাবার প্রধান অবলম্বন, অন্তর্মুখী দৃষ্টি। কেউ যদি সুখ্যাতি বা নিন্দা করে তাহলে ধীর-স্থিরভাবে বিচার করে দেখতে হয়। প্রশংসায় উল্লসিত হতে নেই। স্বার্থবুদ্ধি নিয়েই লোকে নিন্দা বা সুখ্যাতি করে। নিন্দা যদি অমূলক না হয়, তবে আত্মশোধনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়; আর নিন্দা যদি মিথ্যা, অলীক হয়, তথাপি নিজের কাছে খাঁটি থাকতে হয়। পদে পদে যদি আত্মবিশ্লেষণ করে আমরা চলি, তাহলে দিন দিন ভগবানের দিকে এগিয়ে যাই। আত্মপ্রশংসা আত্মোন্নতির পথ আগলে থাকে। প্রভু এ বিষয়ে আরও বলেছেন, 'সর্বদা নিজেকে ছোট ভেবো, কারও অপেক্ষা কোন বিষয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে কর না। নিজেকে ছোট বলে না জানা পর্যন্ত হাজার সাধন-ভজন, চেষ্টা-তপস্যায়ও কিছু হবে না।' যিনি ধর্মপথে অগ্রসর হন, সন্তান-সম্ভবার ন্যায় তাঁর লক্ষণগুলি আপনা থেকে প্রকাশ পায়।

তাঁর দ্বিতীয় নির্দেশ—পরনিন্দা করিও না। মানুষের প্রতিটি শ্বাসে ধ্বনিত হয়, 'হং' আর প্রশ্বাসে 'সঃ'। দুই মিলে হয় 'হংস'। হাঁসের প্রকৃতিতে একটি বৈশিষ্ট্য—জলমিশ্রিত দুধ থেকে অনায়াসে সে শুধু দুধটুকু গ্রহণ করে। ভগবান আমাদের জীবন-ধারণের প্রতিমুহূর্তে যেন আমাদের সতর্ক করে বলছেন, 'হংস-স্বভাব হও, অপরের শুধু গুণ দেখবে।' প্রভু সরল ভাষায় এই স্পষ্ট উপদেশটি দিয়েছেন। আরও বলেছেন, 'মনুষ্যের সহস্র দোষ থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে যেটুকু গুণ তাহাই ধরিয়া তাহার প্রশংসা করিতে হইবে। সরল হৃদয়ে লোকের প্রশংসা করিলে ঈশ্বরের উপাসনার কাজ হয়, গুণকীর্তন করিলে নিজের পাপতাপ পলায়ন করে, শান্তি, আনন্দ আগমন করে। পরনিন্দা করিলে নিজের সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া নরকভোগ হয়। পরনিন্দা মহাপাপ—কাহাকে হত্যা করা হইতেও অধিক পাপ। হত্যা করিলে একবারেই মৃত্যু হয়, পরনিন্দা করিলে লাঞ্ছনা করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করান হয়। পর-নিন্দুকের হৃদয় এত অন্ধকার যে ভগবান তথায় বাস করিতে পারেন না। যার নিন্দা করা যায় তার পাপ নিন্দুককে সংক্রামিত হয়।' পরনিন্দা যারা করে তাদের মধ্যে নিন্দিত ব্যক্তির পাপ কিভাবে প্রবেশ করে এ প্রসঙ্গে একটি আখ্যায়িকার প্রচলন আছে। কোন রাজা কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হয়ে লক্ষ্য করেন যে, রানী, মন্ত্রী, আত্মীয়স্বজন তাঁকে এড়িয়ে চলছেন। এজন্য রাজা খুব মনমরা হয়ে আছেন; ভাবছেন, এ জীবনের কোন সার্থকতা নেই, তাঁর পক্ষে জীবন ত্যাগ করাই ভাল। তাই, একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে দূর বনান্তরে গিয়ে দেহে পাথর বেঁধে ডুবে মরার সংকল্প করলেন। সংকল্প-মত কার্যও করতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় পেছন থেকে এক সন্ন্যাসী তাঁকে ধরে ফেলে বললেন, 'আত্মহত্যা মহাপাপ। তুমি এক বছর আমার কথামত চল, তাহলেই তোমার রোগ ভাল হয়ে যাবে। তুমি একটি ঘর নির্মাণ করাও যাতে দিনের বেলায়ও আলো প্রবেশ করতে না পারে; তার ভিতর তুমি থাকবে এবং কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবে না। কেবল তোমার বিধবা যুবতী মেয়েটি তোমার ঘরে যাবে এবং সেই তোমার সেবা-যত্ন করবে। এক বছর পরে এসে আমি যখন তোমাকে ডাকব, কেবল তখনই তুমি বের হয়ে আসবে। এই এক বছর তুমি শ্রদ্ধাসহকারে একটি

নাম-সাধন করবে। নামই তোমার নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবেন। ভগবান অবশ্যই তোমাকে রোগমুক্ত করবেন।' এই বলে সন্ন্যাসী রাজাকে একটি নাম-সাধনে দীক্ষা দিলেন। রাজার মনে আশার সঞ্চার হল; তিনি তাঁর রাজ্যে ফিরে গিয়ে রানীর উপর রাজ্য-পরিচালনার ভার দিলেন, এবং সন্ন্যাসীর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে থাকলেন। এইভাবে দিনের পর দিন কাটে। এদিকে রাজা ও রাজ-কন্যাকে নিয়ে নানা ধরনের কুৎসা রটতে শুরু করল। লোকের মুখে নিত্য নূতন মুখরোচক আলোচনা। এমনিভাবেই এক বছর কেটে গেল। একদিন হঠাৎ সেই সন্ন্যাসী এলেন। এসেই তিনি রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। মন্ত্রী বললেন, 'তিনি তো কারও সঙ্গে দেখা করেন না; একটি কুটিরে একাকী আজ এক বছর রয়েছেন।' রাজার কুটিরটি কোথায় সন্ন্যাসী তা জেনে নিলেন। তারপর সেই কুটিরের কাছে গিয়ে রাজাকে ডেকে বললেন, 'আমি তোমার গুরু এসেছি, তুমি বাইরে এস।' রাজা বাইরে এলেন, তাঁর দেহে রোগের কোন চিহ্নই নেই। সকলে তো অবাক! কি করে এমন অসম্ভবও সম্ভব হল? সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন রাজা। সন্ন্যাসীর কৃপাতেই তিনি রোগমুক্ত হয়েছেন। জীবন সম্পর্কেও তাঁর ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। তিনি নিন্দা-স্তুতির ঊর্ধ্বে উঠে এসেছেন। জীবনকে যথার্থরূপে জানতে পেরেছেন। এ সবই সম্ভব হয়েছে একমাত্র গুরুকৃপা এবং তাঁরই প্রদত্ত নাম-সাধন দ্বারা। সন্ন্যাসী পরমস্নেহে রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'নিন্দুকেরা তোমার সমস্ত পাপ গ্রহণ করে তোমার রোগমুক্তির সহায় হয়েছে। তুমি তাদের ক্ষমা কর। ভগবান তোমার সাধন-নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি স্বধর্মনিষ্ঠ হয়ে আবার রাজকার্য পরিচালনা কর ও শান্তি লাভ কর।'

পরনিন্দা ভয়াবহ। তা বলে কারও দোষ দেখিয়ে দেওয়া পরনিন্দা নয়; পিতা যেমন পুত্রের দোষ দেখিয়ে দেন তার সংশোধনের জন্য, তেমনি দোষ দেখিয়ে কাউকে সংশোধন করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে কিছু বলা নিন্দা নয়; কিন্তু কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য দোষারোপ করা নিন্দা হয়ে দাঁড়ায়। এসব থেকে মুক্ত থাকাই আদর্শ মানবজীবনের লক্ষ্য।

প্রভুর তৃতীয় নির্দেশ—**অহিংসা পরমোধর্মঃ**। এ তত্ত্বটি সুপ্রাচীন। বুদ্ধদেবের নিকট তা প্রকাশ পেয়েছিল। তিনিই এর তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবন করেছিলেন। কেবল জীবহত্যা করলেই যে হিংসা হয়, তা নয়। রিপুর তাড়নায় আপন স্বার্থে জীবহত্যা করলে তা হিংসা হয়। অপরের অশুভ-কামনা করাও হিংসা। কারও প্রাণে আঘাত দেওয়া হিংসা। হিংসা অন্তর থেকে দূরে হলে হিংস্র জন্তুরাও অনিষ্ট করে না। অন্তঃকরণ থেকে হিংসা নষ্ট হলে ছারপোকা, মশা, পিঁপড়ে প্রভৃতিও দংশন করে না। পূজা-অর্চনা করেও যদি অন্তরে হিংসা থাকে, তাহলে ধর্ম হয় না। ভগবানকে পেতে হলে হৃদয়কে হিংসাশূন্য করতে হবে। 'ভগবান সর্বঘটে আছেন; কায়মনোবাক্যে কাহাকেও কখন উদ্বেগ দেব না। কেউ গালাগালি করলে, মারধর করলে, এমন কি সর্বনাশ করলেও তার অমঙ্গল কামনা করব না'—এমন সংকল্প নিয়ে চললে হৃদয় আপনা হতে হিংসাশূন্য হয়। অহিংসা না হলে ধর্ম হয় না।

চতুর্থ নির্দেশ—**সর্বজীবে দয়া কর**। 'জীবে দয়া ও নামে রুচি'—স্বয়ং মহাপ্রভু কলির জীবকে উদ্ধার করার জন্য এই তত্ত্বটি প্রচার করেছেন। গীতায় ভগবান

বলেছেন, ‘সর্বভূতানাং হৃদ্‌দেশে, অর্জ্জুন, ঈশ্বরস্তিষ্ঠতি।’ ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। জীবকে হিংসা করলে ভগবানকেই কষ্ট দেওয়া হয়। হিংসাবৃত্তি যত হ্রাস পায়, দয়াবৃত্তির তত উন্মেষ হয়। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, সব কিছুর সেবার ভিতর দিয়ে দয়াবৃত্তির হয় বিকাশ। ‘জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।’ দয়ায় হৃদয় পবিত্র হলে, তা ভগবৎ-প্রেমে ভরপুর হয়ে ওঠে।

প্রভুর পঞ্চম নির্দেশ—শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর। ঋষিগণ ধ্যানে যেসব তত্ত্ব লাভ করেছেন, ধর্মার্থীদের কল্যাণের জন্য তা তাঁরা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ধর্মের যথার্থ দিকটি ধরে দেবার ক্ষমতা ছিল ঋষিদেরই। শাস্ত্র অভ্রান্ত এই বিশ্বাস হলে শুভবুদ্ধির উদয় হয়। শাস্ত্র, সদাচার ও মহাজনদের আচরণ মেনে চললে ঠকতে হয় না। যাঁরা শাস্ত্র মেনে চলেন, তাঁরা দেবতা। যাঁরা নিজের বুদ্ধিতে চলেন তাঁরা অসুর। শাস্ত্র, ঋষিবাক্য, সদাচার, মহাজনদের উপদেশ-আচরণ, এ সব ভিন্ন আর সব অসার। ঋষিদের মতে মোক্ষলাভের দ্বার চারটি—

সন্তোষঃ যেদিন যা জোটে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। কারও মনে কোন উদ্বেগ না দেওয়া, কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা না করা এবং ভগবানই একমাত্র দাতা, একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। এই সন্তোষকেই মোক্ষের সিংহদ্বার বলা হয়।

শমঃ যাই ঘটুক না কেন, তাতে অধীর না হওয়া। সরলতাই ইহা লাভের উপায়।

বিচারঃ সংসারে কোন্ বস্তু নিত্য আর কোন্ বস্তু অনিত্য তা বিচার করে, আত্মবিশ্লেষণ করে চলতে হয়।

সৎসঙ্গঃ যাকে দেখলে বা যার সঙ্গ করলে, বা যা পাঠ করলে বা শুনলে ভগবানের কথা স্মরণ ও মননে আসে, তাই সৎসঙ্গ।

শাস্ত্রে বিশ্বাস হলেই শুভবুদ্ধির উদয় হয়। ঋষিদের শ্রদ্ধা করতে হয়। তাঁদের আশীর্বাদেই শাস্ত্রে বিশ্বাস হয়। শাস্ত্র ও মহাজনদের বিধানমতে চলতে পারলেই ভগবৎ-চরণ লাভ করা সম্ভব হতে পারে। গোস্বামীপ্রভু বলেছেন, ‘যদি শাস্ত্র মান, তাহলে—

গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

গঙ্গা হতে চারশত ক্রোশের মধ্যে গঙ্গা বলে যেখানে স্নান করবে তাতেই উদ্ধার হয়ে বিষ্ণুলোক গমন করবে, এরূপ যার বিশ্বাস, সে নিশ্চয়ই তা লাভ করে। ঋষিবাক্যে যত শ্রদ্ধা-ভক্তি হবে ততই শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম হবে; জানবে, ঋষিবাক্যই সার।’ যেখানে স্বার্থত্যাগ, সেখানেই ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধা-ভক্তি মানুষকে নিঃস্বার্থ করে গড়ে তোলে।

প্রভুর ষষ্ঠ নির্দেশ—শাস্ত্র ও মহাজনদিগের আচরণের সহিত যাহা মিলিবে না, তাহা বিষবৎ ত্যাগ করিবে। শাস্ত্র অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজন। ঋষিদের পদানুসরণ ভিন্ন গতি নেই। শাস্ত্রে আছে, আহারের সূক্ষ্মাংশ থেকে মন গঠিত হয়। আহারের সঙ্গে ধর্মের নিকট-সম্বন্ধ, কারণ শরীর ও আত্মা একত্র আছেন। যদৃচ্ছা চললে পদে পদে বিভ্রান্তি আসে। যাঁরা শাস্ত্র মেনে চলেন, তাঁদের অচিরেই দেব-

দুর্লভ জীবন লাভ হয়। কোনও সাধুর আচরণও যদি শাস্ত্রবিরোধী হয়, তবে তাঁর কথামত না চলে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হয়।

সাধুর লক্ষণ কি? সাধু আত্মপ্রশংসা করেন না, পরনিন্দা করেন না, অপরের বিশ্বাস নষ্ট করেন না; সর্বজীবে দয়া করেন। তিনি বৃথা সময় নষ্ট করেন না; ভগবৎ-স্মরণ. মনন, কীর্তন, অর্চন ও সাধুসেবা—এই সব নিয়ে তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। গোস্বামীপ্রভু প্রত্যহ কয়েকজন মহাত্মাকে স্মরণ করতেন—

১. নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজী
২. কাশীর ত্রৈলঙ্গস্বামী
৩. অযোধ্যার মাধোদাস বাবাজী
৪. গয়ার গম্ভীরনাথ বাবা
৫. মেছুয়াবাজারের সন্ন্যাসী
৬. দার্জিলিংয়ের লামা সন্ন্যাসী
৭. ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী

এই সাতজন ছাড়াও চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সন্ন্যাসীকেও তিনি নিত্য স্মরণ করতেন। পরে প্রকাশ পায়, তিনিই বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

প্রভুর সপ্তম নির্দেশ—নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ। ধর্মার্থীদের কাছে অহঙ্কার অভিমানের মত আর শত্রু নেই। রিপুগুলির দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত হতে না হতে লোকে সাধু না বললে অভিমানের উদ্রেক হয়। কারও মুখে অপরের গুণকীর্তন শুনলেও হয় প্রাণে জ্বালা। কুল, মান, বিদ্যা, ধনের অভিমান সহজে যায় না। দর্পহারী ভগবান দর্প চূর্ণ করেন। রাজসূয় যজ্ঞে দ্রৌপদীর অভিমান হয়। তিনি ভেবেছিলেন, নারীকুলে তাঁর সমকক্ষ আর কে আছেন? রাজসভায় লাঞ্ছিতা অপমানিতা হয়ে যখন তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর মত অসহায় আর কেউ নেই, তখনই শুধু ভগবান লজ্জার গ্লানি থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। গদাধর দক্ষিণেশ্বরে মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন বলেছিলেন, 'কৈবর্তের অন্ন কি করে খাব?' এখানেই তাঁকে শেষ পর্যন্ত পূজারী হতে হয়। ব্রাহ্মণত্বের অভিমান দূর হতে তাঁরও লেগেছিল ছাব্বিশ বছর। কুলের অহঙ্কারে কুল-নাশ, মানের অহঙ্কারে মান-নাশ, বিদ্যার অহঙ্কারে বিদ্যা-নাশ, ধনের অহঙ্কারে ধন-নাশ, পুত্রের অহঙ্কারে পুত্র-নাশ। তিনি কাউকে ছাড়েন না।

'কাম ছাড়ব, ক্রোধ ছাড়ব, লোকে সাধু বলবে'—এ অভিমান সবচেয়ে বড় শত্রু। দিনে দশবার স্ত্রী-সঙ্গ করেও যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে. তাহলেও উদ্ধার হতে পারে। কিন্তু ঊর্ধ্বরেতা হয়ে যদি অহঙ্কার কর, তাতে কিছুই হবে না। দুর্বাসা ঊর্ধ্বরেতা ছিলেন। শেষে তাঁর সর্বনাশ হয়েছিল।

অভিমান অনেক টাকা থাকলে হয়, অনেক বিদ্যাতে অভিমান হয়, অনেক ধর্মেতে তপস্যার অভিমান হয়। এ অভিমান সহজে নষ্ট করা যায়। কিন্তু আর এক প্রকার অভিমান আছে। নির্ধন মনে করেন ধনী তাকে ঘৃণা করেন, সুতরাং তিনি তাঁকে ঘৃণা করবেন। ঐরূপ মূর্খ বিদ্বানের এবং পাপী ধার্মিকের প্রতি অভিমান করেন। অভিমানের মত সাধকের এমন শত্রু আর কিছু নেই। মহাপ্রভু অভিমান-শূন্য হবার উপায় বলে গেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরুরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥

তৃণ হতেও অবনত ও বৃক্ষ থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, অভিমান ত্যাগ করে অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করবে ও শ্রীহরির কীর্তন করবে। গোস্বামীপ্রভুরও এই কথা। তিনি বার বার বলেছেন, 'দীনহীন বিনীত হওয়া অপেক্ষা ভগবানকে লাভ করার আর সহজ উপায় নাই।

'আমি ছোট, ক্ষুদ্র,এই যদি হয় তাহলেই হল। আমি সকলের ছোট।

'দীনতা ভিতরের বস্তু। উহা হৃদয়ে এলে হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হয়। দীনতা এলে নিজেকে হীন বলে বোধ হয়।

'নীচু না হলে হয় না। যে বলে, "আমি বড়" সে নীচ হতে নীচ, ছোট হতে ছোট।'

আশ্রম-স্থাপনে রাধারমণ গুহ ও কুঞ্জবিহারী ঘোষের চেষ্টার তুলনা হয় না। আশ্রমে আসার কিছুদিন পর থেকেই ঘড়ির কাঁটার মত সব চলত। প্রভু শৌচক্রিয়া থেকে পাঠ, পূজা, কীর্তন, সাধন-ভজন, আহার, সব যথানিয়মে সমাপন করতেন। প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে তিনি পাখীর জন্য চাল ছড়িয়ে দিতেন। তারপর তিনি চা পান করতেন। আশ্রমের বাইরে উত্তরদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ। প্রভু সকালে সেখানে বেড়াতেন।

বাল্যভোগের পর কুঞ্জবিহারী ঘোষ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও নরোত্তম দাসের প্রার্থনা পাঠ করে কর্মস্থলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতেন। প্রভু তারপর মধুর স্বরে গুরুমুখী ভাষায় 'গ্রন্থসাহেব' ও তুলসীদাসের হিন্দি রামায়ণ রামচরিতমানস ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন। বেলা এগারটায় পাঠ শেষ করে তিনি স্নানে যেতেন। তারপর অতিথিদের সঙ্গে সশিষ্য প্রসাদ পেতেন: বিশ্রামান্তে আমতলায় প্রায়ই প্রভু সমাধিসাগরে ডুবে যেতেন। অপরাহ্ণে ধর্মপিপাসুরা এসে তাঁর উপদেশ শুনতেন। সন্ধ্যায় কীর্তন হত। কীর্তন শেষ হলে শিষ্যদের নিয়ে সাধন-বৈঠকে বসতেন। রাত্রি সাড়ে নটায় আহার করে কোঠাঘরে গিয়ে আসনে বসতেন। রাত তিনটা অবধি ঐ অবস্থায় নামের আশ্রয়ে থেকে ঘণ্টাখানেকের জন্য গা-টানা দিতেন, কিন্তু কিছুদিন পর থেকে তাও তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন।

আশ্রম চলে পরিপূর্ণ আকাশবৃত্তির উপর নির্ভর করে। প্রভু একদিন বলছিলেন, 'কভী ঘি দুধ ছানা, ঔর কভি চানা ভি মানা।' আশ্রমবাসীর সংখ্যাও নগণ্য নয়। তার উপর অতিথি-অভ্যাগত লেগেই আছে। তথাপি কোন প্রকার যাচঞা বারণ। পুরোপুরি অযাচকতা। স্বেচ্ছায় যে যা দিতেন নবকুমারবাবু তাই দিয়েই আশ্রমের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতেন। আশ্রমে পাচক ছিল না। যোগমায়া দেবীকেই একাজ করতে হয়। অবশ্য তাঁকে তাঁর মা মুক্তকেশী দেবী ও শিষ্যেরাও সাহায্য করতেন। প্রথম প্রথম নবকুমারবাবু মুক্তকেশী দেবীর ফর্দ অনুযায়ী ধারে জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন। হাতে অর্থ এলে তিনি ধার পরিশোধ করে দিতেন। গোস্বামীপ্রভু একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি আশ্রমের জন্য কখনও ধারে জিনিসপত্র আনেন?' তিনি সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করলে গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'এইরূপ আর কখনও করবেন না। ভগবানের দিকে নিঃস্পৃহভাবে তাকান ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই।' সেইদিন থেকে ধারে আনা বন্ধ হয়। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এসেছেন। গোস্বামীপ্রভু একদিন তাঁকে আশ্রমে প্রসাদ পেতে বলেন, আর যোগজীবন বলেন, 'সেইদিন আমি নিজে আপনার জন্য রান্না করব।' নির্ধারিত দিনে নগেনবাবু এসেছেন। এদিকে চাল-ডাল সবই

বাড়ন্ত! অতিথিসৎকার কি করে হবে? গোস্বামীপ্রভুর মুখে ও ব্যবহারে উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। বেলা তখন প্রায় বারটা। এমন সময় একটি লোক ঝুড়ি করে চাল, ডাল, তরিতরকারী, চিনি প্রভৃতি আরও নানারকম খাদ্যসামগ্রী এনে বলে 'আনন্দ মাস্টারের বাড়ী থেকে পাঠিয়েছেন।'

গোস্বামীপ্রভু নগেনবাবুকে হেসে বলেন, 'এই আপনার সিধা এল।' তারপর তাঁকে সব খুলে বলেন। যোগজীবন গোসাঁই রান্না করেন। পরিতৃপ্তি সহকারে সকলে প্রসাদ পান।

একদিন আমতলায় ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা গোস্বামীপ্রভুর কাছে প্রকাশিত হয়ে তাঁকে বর দেন। তাঁরা তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, 'শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব তোমার কাছে প্রকাশিত হউক।' প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলে ইসারায়। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ দিব্যজ্যোতিতে অনবদ্য রূপে তাঁর কাছে প্রকাশিত হন। শাস্ত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য মুহূর্তে হয় উদ্‌ঘাটিত। শাস্ত্রের প্রতিটি তত্ত্ব তাঁর কাছে প্রকাশ পায়। তিনি বলেছেন, 'শাস্ত্রের প্রতিটি বর্ণ অভ্রান্ত ও জীবন্ত। হিন্দুশাস্ত্র, বাইবেল ও কোরাণের মধ্যে কোথাও কোন বিরোধ নাই। কেবল অধিকারী ভেদে উপদেশ।' আরও বলেছেন, 'বৃক্ষশাখায় কলকণ্ঠ বিহঙ্গ যেমন সারি বেঁধে বসে, নড়েচড়ে, খেলা করে, শাস্ত্রের অক্ষরগুলিও তেমনই প্রাণবন্ত। তাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলে।'

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার আট-ন দিন পর একদিন গোস্বামীপ্রভু 'প্রারব্ধ ও পুরুষকার' সম্বন্ধে বলেন, 'সংসারে সকলেই প্রারব্ধের অধীন। যে-ই যত চেষ্টা কর না কেন, প্রারব্ধ কার্যের গতি কেহই রোধ করতে পারবে না। পুরুষকার দ্বারা প্রারব্ধের উপর আধিপত্য অসম্ভব। লোকে পুরুষকারে সাময়িক উপকার পেতে পারে বটে; কিন্তু চিরকাল পারে না। ব্রহ্মচারী মহাশয় পুরুষকারের প্রভাবে প্রারব্ধ কর্ম অতিক্রম করে সাধনের চতুর্থ অবস্থাও পেরিয়ে গিয়েছিলেন; অবশেষে নির্বিকল্প সমাধি স্থানে পৌঁছে আবার ঠেকে ফিরে এলেন। পরে তিনি নাস্তা খেয়ে, ক্ষেত নিড়ায়ে, শূকর তাড়ায়ে কতকাল কাটালেন। অবস্থায় না পড়লে এসব কথা বুঝা যায় না। প্রারব্ধের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শাস্ত্র দুটি উপায় বলেছেন—বিচার ও অজপা-সাধন। যখনই যা কিছু করবে বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে করবে। উঠা, বসা, স্নানাহারাদি যাবতীয় কার্য নিষ্কামভাবে বা বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হলেই শীঘ্র প্রারব্ধ কর্ম শেষ হয়ে যায়। আর শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করলে আরও সহজে হয়।'

আশ্বিন মাসের (১২৯৫) মাঝামাঝি গোস্বামীপ্রভু একদিন আহারপ্রসঙ্গে কুলদাকান্তকে বললেন, 'কারও আকাঙ্ক্ষার বস্তু, লোভের বস্তু, তাকে না দিয়ে খেলে অনিষ্ট হয়। কোনও তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে এক আসনে বসে আহার করলেও অনিষ্ট হয়; এমন কি একস্থানে বসে খেলেও হয়। আহারের বস্তুতে তমোগুণীর দৃষ্টি পড়লেও ক্ষতি হয়। এসব বিষয়ে যখন দৃষ্টিটি খুলে যাবে, পরিষ্কার দেখতে পাবে ওসব লোকের দৃষ্টিমাত্র আহারের বস্তুতে কীটাণু পড়ে। এ সকল পূর্বে তো কিছুই বুঝতে পারতাম না। মানতামও না। কিন্তু প্রত্যক্ষ হলে আর অবিশ্বাস করি কিরূপে? আহারের বস্তুতে লোকের সংস্পর্শে ও দৃষ্টিতে বিশেষ অপকার করে। দরজা বন্ধ করে আহার করা এখনও অনেক ব্রাহ্মণের নিয়ম আছে। তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি আহারে পড়লে উহা ভোগে লাগে না, নষ্ট হয়। এজন্য দরজা বন্ধ করে ভোগ প্রস্তুত করারও নিয়ম আছে।

ভাবদুষ্ট, স্পর্শদুষ্ট ও দৃষ্টিদুষ্ট বস্তু আহার করলে ক্ষতি করে, দেবতাকে দিলেও অপরাধ হয়। আহারের দোষে অনেক প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি হয়, ওতে সমস্ত রিপুরই উত্তেজনা জন্মে। এইজন্য এইসব বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হয়।' প্রভু দ্বিপ্রহরে অন্ন ও রাত্রে রুটি প্রসাদ নিতেন।

শান্তিসুধার বিয়ের প্রস্তাব আসে নানা জায়গা থেকে। সম্পদশালী, সম্ভ্রান্ত একটি পরিবার—পাত্র সুশ্রী, সুশিক্ষিত। পাত্রপক্ষের খুব আগ্রহ। মুক্তকেশী দেবীর আনন্দ ধরে না। প্রভুর পরিবারের অভিপ্রায়, এ প্রস্তাব ছাড়া ঠিক নয়। কিন্তু বাদ সাধেন গোসাঁইজী নিজে। তাঁর সম্মতি নেই। তাহলে সুপাত্র কে? প্রভু বলেন, 'কেন, জগদ্বন্ধু? ছেলেটি সবদিকে ভাল।' এতে কারও অন্তরের সমর্থন মেলে না। জগদ্বন্ধু মৈত্রের বাড়ী ফরিদপুর জিলায় রুকুণী গ্রামে। বি.এ. পর্যন্ত তিনি পড়েছেন। দীক্ষা পেয়ে এক বছর ধরে প্রায়ই গুরুর কাছে এসে থাকেন। ওজর আপত্তি ওঠে। বি.এ. পাশও নয়। সংসার চলবে কি করে? বাপ-ঠাকুরদাও কিছু রেখে যান নি। এর উপর বোন রয়েছে একটি বিয়ের উপযুক্ত। সব জেনেশুনে এখানে কন্যাদান মানে শান্তিকে অতল জলে ভাসিয়ে দেওয়া।

প্রভু ওঁদের বলেন, 'তোমরা দেখছি সব বিষয়ীর মত কথাবার্তা বলছ। কেউ কারও ভরণপোষণ করে না। ভগবান কর্তা, তাঁর ইচ্ছায়ই সব হয়। যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সকলের ব্যবস্থা করেন, শান্তিসুধার ভারও তাঁরই হাতে। তিনি যে ব্যবস্থা করেন, তাই যথার্থ কল্যাণকর। আর আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জগদ্বন্ধুই শান্তির যোগ্য পাত্র। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হলে শান্তি সুখী হবে। অন্যত্র শান্তির কষ্টের অবধি থাকবে না। তাছাড়া জগদ্বন্ধুর সঙ্গে আমার শুধু এ-জন্মের সম্বন্ধ নয়।'

তথাপি কারও মুখে কথা নেই। প্রভু তখন বলেন, 'গুরুদেব, মহাপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু সকলেই সর্বতোভাবে জগদ্বন্ধুর সঙ্গে শান্তির বিয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। জগদ্বন্ধু মহাপ্রভুর সময় কে ছিলেন, জান? রায় রামানন্দ। এর পরও যদি শান্তির বিয়ে অন্যত্র দিতে চাও, আমার আর বলার কিছু নাই।' এর উপর আর কি কথা? জগদ্বন্ধুর সঙ্গে বিয়েতে সকলে সম্মতি দেন। যোগমায়া দেবী বলেন, 'জগদ্বন্ধুর বোনটিও সুলক্ষণা শুনেছি। জীবনের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করা কি সম্ভব?' গোসাঁইজী বলেন, 'আলাপ-আলোচনার পূর্বে যোগজীবনের সম্মতি নাও।' যোগমায়া দেবী বলেন, 'আপনার যখন মত আছে আমার আর কোন ভাবনা নাই। জীবনকে আমি রাজী করাব।' যোগজীবন নিজের বিয়ের আলাপ শুনেই বেঁকে বসেন। দিদিমার কাছে তিনি কৌমার্যের সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। মা তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি তাঁকে বলেন, 'হ্যাঁ রে জীবন, বিয়ে করলে কি ধর্ম হয় না? তোর বাবার সঙ্গ করেও কি তোর এ ধারণা? তাঁর মত ধার্মিক আর একজন দেখা দিকিনি!' যোগজীবন বলেন, 'বাবার সঙ্গে কি কোন তুলনা হয়? তাঁর কথা আলাদা। তাঁর দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার এক কণা পেলে উৎরে যাই!' যোগমায়া দেবী গম্ভীর হয়ে বলেন, 'বিয়ে করলে তোর ধর্মকর্মের কোন ব্যাঘাত হবে না।' যোগজীবন নীরব থাকেন। মা বুঝেন তাঁর কথা বিকায় নি। বলেন, 'কি চুপ করে রইলি যে?'—'আমি বিয়ে করব না।' যোগমায়া দেবীর মধ্যে দেখা যায় ভাবান্তর। তেজের সঙ্গে ছেলেকে তিনি বলেন, 'এবার এসেছি তোর জন্য! আবার কি আসব তোর বিয়ে দেখতে? আমার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিস না। বিয়ে কর।

আমি সব ব্যবস্থা করছি।' মা এমনভাবে কথা কয়েকটি বললেন যে, যোগজীবনের আর কিছু বলার রইল না। মুক্তকেশী দেবী মাতাপুত্রের কথাবার্তা শুনে প্রভুর কাছে গিয়ে আদ্যন্ত সব বিবৃত করে বলেন, 'মনে হয় যোগমায়ার পূর্বজন্মের স্মৃতি জেগেছে! ও কে ছিল?' প্রভু তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'আপনার কি ধারণা?' তিনি জামাতা ও গুরুকে বলেন, 'শুনেছি, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মনে সাধ ছিল তাঁর একটি ছেলে হয়। কিন্তু মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেওয়ায় তাঁর সেই সাধ অপূর্ণ রইল। তবে কি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যোগমায়া কায়া ধরে আমাদের ধন্য করেছেন?' শাশুড়ীর প্রশ্নে প্রভুর ওষ্ঠে হাসির রেখা ফুটে।[১] যোগজীবন রাজী হয়েছে শুনে গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'রাসের সময় আমি শান্তিপুর যাব। তখন মার মতামত জানব। জগদ্বন্ধুকে লিখে দিচ্ছি, সে যেন আমার সঙ্গে শান্তিপুরে দেখা করে।' কার্তিক মাসে (১২৯৫) গোসাঁইজী শান্তিপুরে যান। সঙ্গে লাল ও পণ্ডিত মহাশয়। জগদ্বন্ধুবাবু শান্তিপুরে এসে মিলেন।

রাসের মেলা—ঘরে ঘরে উৎসব; প্রতি গৃহে বিগ্রহের কি অপরূপ সাজ-সজ্জা! একদিন প্রভু সশিষ্য রাসের মেলা দেখতে যান। একটি তাঁবুর বাইরে ঘণ্টা বাজে। এক পয়সা দর্শনী দিয়ে লোক ভিতরে যায়। প্রভুও যান। একটি মানুষ দেখান হয়—পিঠ একদম পাথর। হাত, মুখ ও পেট স্বাভাবিক। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অনামিকা স্পর্শ করে যেন অবিরাম ইষ্টনাম জপ করছেন। নেপালের পাহাড়ে এঁকে পাওয়া গিয়েছিল। পাখির ন্যায় কণ্ঠস্বর। একটি মাত্র কলা তাঁর খাদ্য। সপ্তাহে দুদিন সামান্য মলত্যাগ হয়। প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ অবস্থা কেন?' তিনি তাঁর কপাল দেখান। বের হয়ে এসে প্রভু বলেন, 'ইনি ভজনশীল সাধু। গুরুতর কোন অপরাধে এই দশা। এই দেহে আর কিছু হবার নয়, সামনের জন্মে তিনি সিদ্ধিলাভ করবেন।'

স্বর্ণময়ী দেবী শান্তিসুধার ও যোগজীবনের বিয়ের উভয় প্রস্তাবই অনুমোদন করেন। গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে একই দিনে দুই বিয়ে স্থির হয়, ২৬ ফাল্গুন, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ। জগদ্বন্ধু বিয়ের কয়েকদিন পূর্বে বসন্তকুমারীকে নিয়ে আশ্রমে পৌঁছবেন। কুঞ্জ ঘোষের বাড়ীতে বসন্ত থাকবে। স্বর্ণময়ী দেবী বলেন, 'বিয়েতে আমি যাব না। বিয়ের পর জোড়া দম্পতিকে শান্তিপুর নিয়ে আসবে শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করাতে।'

জগদ্বন্ধু কলিকাতা যান। সপ্তাহখানেক বাদে গোসাঁইজী ঢাকার পথে কলিকাতা এসে নগেনবাবুর কাঁসারিপাড়ার বাসায় ওঠেন। গৃহকর্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবীর ইচ্ছা হয়, একদিন কৃষ্ণগোপালের ভোগ রাঁধেন। গোসাঁইজীকে বলতেই তিনি বলেন, 'ভগবানের ভোগ রান্নার ইচ্ছা হয়েছে, এ তো খুব ভাল কথা।' নগেনবাবু তখন কলিকাতায় ছিলেন না। মণি মজুমদার ও বৃন্দাবনবাবু ভোগসামগ্রী এনে দেন। ভোরে স্নান করে নগেনবাবুর স্ত্রী চাল ধুতে গিয়েছেন, শোনেন প্রতিটি চাল থেকে 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' ধ্বনি উঠছে। ডেগচিতে চাল টগবগ করে ফুটে 'হরিবোল, হরিবোল' বলে। কড়াতে সব্‌জী সাঁতলাতে 'হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ' রব। ছুটে গিয়ে মাতঙ্গিনী দেবী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ সবের তাৎপর্য কি?' গোসাঁইজী বলেন, 'আপনি কৃষ্ণগোপালের ভোগ রান্না করছেন, তাই দেবতারা মিলে আনন্দে হরিধ্বনি করছেন। আপনার দিব্যশ্রুতি আজ খুলেছে। তাই এ সব

---

[১] গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকারের মুখে শোনা।

শুনছেন।' ভোগ লাগিয়ে গোসাঁইজীকে তিনি বলেন, 'কি আজ রেঁধেছি, জানি না, চারদিকে অবিরাম "হরিবোল, হরেকৃষ্ণ" শুনে আমি আর আমার মধ্যে ছিলাম না।' প্রভু বলেন, 'কৃষ্ণগোপাল আজ এখানে আহার করবেন জেনে, স্বয়ং গোলোকের লক্ষ্মীদেবী এসে তাঁর রান্না করেছেন। এর আস্বাদ হবে অপূর্ব।'

ভোগের থালা এনে গোস্বামীপ্রভুর আসনের সামনে রেখে মাতঙ্গিনী দেবী ধূপধুনা দেন। প্রভু সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। মাতঙ্গিনী দেবী থালা থেকে প্রসাদ নিয়ে গোসাঁইজীর মুখে ধরেন। ভাবে আবিষ্ট হয়ে গোসাঁইজী বলেন, 'ঐ ভোগের জন্য জগন্নাথদেব এসেছেন! ঐ যে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র! ঐ শ্রীগৌরসুন্দর! ঐ শ্রীনিত্যানন্দ! ঐ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র! এ প্রসাদের তুলনা নাই! যে পায় সে ধন্য। সব দেবতারা এসেছেন প্রসাদ পেতে!' মাতঙ্গিনী দেবী দেখেন, ঘরময়, আনাচে-কানাচে অবধি, দিব্য মাথার সারি! ঘরের ভিতর শিষ্য, ভক্ত যাঁরা ছিলেন তাঁরা এসে প্রভুর মুখে প্রসাদ তুলে ধরেন। তিনিও ওঁদের দেন। মাতঙ্গিনী দেবীর চোখে পড়ে একখানা গৌরবর্ণ হাত ঐ থালা থেকে প্রসাদ তুলে ধরে। 'এ কার হাত' বলে তিনি চীৎকার করে ওঠেন। প্রভু বলে ওঠেন, 'মহাপ্রভুর'। নগেন্দ্রগৃহিণী সম্বিং হারিয়ে প্রসাদের থালের উপর পড়ে লুটোপুটি খান। ভাবের বন্যায় সব মেতে ওঠেন। কেউ কেউ নিজেদের সর্বাঙ্গে প্রসাদ মাখেন। প্রভু মাতঙ্গিনী দেবীকে নাম শোনান। তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে, গোসাঁইজী তাঁকে বলেন, 'আপনি পুণ্যবতী বলেই এসব দেখেছেন, শুনেছেন। গৌরসুন্দরের হাত দেখা কি কম সৌভাগ্যের কথা!' চার-পাঁচদিন কলিকাতায় থেকে অগ্রহায়ণ মাসের (১২৯৫) মাঝামাঝি গোস্বামীপ্রভু গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে ফিরে আসেন।

এই সময় কুলদাকান্ত লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দর্শন করতে বারদী গিয়েছিলেন। তাঁর কথাবার্তা কেমন যেন বিভ্রান্তিকর! গোসাঁইজীর উপরও তিনি ক্ষুব্ধ। কুলদাকান্তের কাছে তিনি মন্তব্য করেন, 'গোসাঁই দেশ-বিদেশে আমাকে মহাপুরুষ বলে প্রচার করে আমার সর্বনাশ করলে! পঁচিশ বছর এই বারদীতে বেশ ছিলাম। এখন উদয়াস্ত রোগীর গোঙানি আর মামলা-মোকদ্দমা। এইজন্য কি আমি এখানে আছি? শালা অন্ধ মুরুক্ষু! কচি কচি ছেলেগুলিকে যোগশিক্ষা দিচ্ছে, আর বলে "পরমহংসজী, পরমহংসজী"!' কাউকে বলছেন, 'কামের যন্ত্রণা হয়েছে, রমণ করবি —তোর কি জুটে না? নিবৃত্তি? প্রবৃত্তিমার্গে চলতে চলতে তোর কর্মই তোকে নিবৃত্ত করবে।' গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কুলদাকান্ত তাঁকে সব খুলে বলেন। তাঁর মুখে ওই সব কথা শুনে প্রভু বলেন, 'এখন তোমাদের যে-ই ব্রহ্মচারীর নিকট যাবেন, তিনি একবার নাড়াচাড়া করবেন। আমাকে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "মুনি-ঋষিদের কল্‌জে তুই শেয়াল-কুকুরগুলিকে বিলাচ্ছিস্।" আমি বললাম, "যেমন পরমহংসজী আদেশ করছেন, তেমনই আমি করছি।" তিনি বললেন, "আচ্ছা, আমি একবার বেশ করে দেখব।" এখন তাই তিনি ওই রকম আরম্ভ করেছেন। এতে তোমাদের আর কি? আমাকেই তিনি পরীক্ষা করছেন। তিনি বলেছিলেন, "তোর নাড়িভুঁড়ি আমি টেনে বের করব।" এখন তাই করছেন। যত পারেন, করুন। তবে তোমরা এখন তাঁর কাছে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কথা সকলকে বলে দেওয়া ভাল।'

তাঁর বড়দাদা হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে ঐ সময় একখানি চিঠি পেয়ে কুলদাকান্ত ভেঙ্গে পড়েন। হরকান্ত তাঁকে লিখেছেন, 'দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে

গোস্বামী মহাশয়ের কৃপার উপর তাকিয়ে ছিলাম, এই সময় একদিন শ্রীযুক্ত রামানন্দস্বামী (ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়) ফয়জাবাদ এসে আমাকে পূর্বে কিছু না বলে গুপ্তার ঘাটে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে কানে একটি নাম দিয়ে বললেন, “আমি তোমাকে দীক্ষা দিলাম, এই নাম জপ কর।” চিঠি পড়ে কুলদাকান্ত কেঁদে ফেলেন। গোসাঁইজী তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেন, ‘তুমি দুঃখ কর না। তোমার দাদাকে আমার কাছে আসতেই হবে। তোমার দাদা তোমাকে পশ্চিমে যেতে লিখেছেন, যাওয়াই উচিত। তোমার শরীর ভাল নয়; স্কুলে পড়ে কি হবে? বিদ্যালাভই উদ্দেশ্য। সেটি হলেই তো হল। অনেক বড় বড় লোকের কথা শোনা যায়—মিল প্রভৃতি—যাঁরা স্কুলে পড়েন নাই। তোমার দাদাকে এই সাধনের ভিতরের কথা কিছু বল না। তাঁকে আমাদের সাধনের ভিতরে আনতে চেষ্টা কর না। রামকুমারবাবুকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা কর, তিনি ভাল লোক। আমাদের এ সাধনে সকলকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে বলে। রাস্তার মুটে-মজুরকেও ভক্তি করবে। অবিচারে যিনি যত ভক্তি করতে পারবেন, তাঁরই তত উপকার।’

মুঙ্গেরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে কুলদাকান্ত গুরুকে প্রণাম করে বলেন, ‘এতকাল আপনার কাছে ছিলাম, এখন কোথায় কি অবস্থায় পড়ি, কখন কি করে ফেলি!’ প্রভু তাঁকে বলেন, ‘তুমি তো এখন গর্ভস্থ সন্তান। তোমার আর চিন্তার কি আছে? মা যেমন গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা টের পান, সন্তান নড়াচড়া করলে অমনই বুঝতে পারেন, গুরুও সেই প্রকার শিষ্যের সমস্ত অবস্থা, সমস্ত চেষ্টা সর্বদা জানতে পারেন। সন্তান যতকাল ভূমিষ্ঠ না হয়, ততকাল তার কোন ক্ষমতাই থাকে না। মা যা কিছু আহার করেন, তারই একটু রস নাড়ীর ভিতর দিয়ে সন্তানের দেহে সঞ্চারিত হয়। শুধু তাতেই গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টি হতে থাকে। সেইরূপ গুরু যা কিছু লাভ করেন, শিষ্য শুধু তারই অংশ প্রয়োজনমত পেতে থাকে। গুরুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যেরও উন্নতি। তারপর ছেলে ভূমিষ্ঠ হ’লেও মা-ই তাকে আহার দেন; প্রয়োজনীয় সব জোগাড় করে মা-ই তাকে লালন-পালন করেন। যে পর্যন্ত তার চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়ার তেমন ক্ষমতা না জন্মে, ততকাল মা তাকে চোখের আড়াল করেন না, সর্বদা চোখে চোখে রাখেন। শিষ্য সিদ্ধ অবস্থা লাভ করলেও সদ্‌গুরু তাকে ছাড়েন না, গুরু তাকে তখনও শিশুর মত কোলে করে থাকেন, সর্বদা সকল বিষয়ে গুরু শিষ্যের সুবিধা দেখেন।’

একটু থেমে আবার গোসাঁইজী বলেন, ‘এখন তোমার মার গর্ভে না জন্মালে কোন ছেলে আর বাঁচবে না, তার অসুবিধা হবে, অকল্যাণ ঘটবে, এরূপ যদি মনে কর, তা ঠিক হবে না।....ভিন্ন ভিন্ন মার গর্ভে সন্তান জন্মে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক, ভগবানের এই ইচ্ছা। সাম্প্রদায়িক ভাব রেখ না।’ কুলদা জিজ্ঞাসা করেন, ‘গুরুতে তেমন নিষ্ঠা না জন্মান পর্যন্ত অন্য সাধুর সঙ্গ করা কি ভাল?’ গোসাঁইজী বলেন, ‘অন্য ভেবে সঙ্গ করবে না। এক গুরুশক্তিই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রয়েছে। রক্তাধারে রক্ত থাকে, তাই বলে কি শরীরের অন্য স্থানে রক্ত নাই? রক্তাধার থেকে রক্ত সঞ্চারিত হয়ে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। সমস্ত বিশ্বব্যাপী এক গুরুশক্তি। সঙ্কীর্ণভাবে বড় অনিষ্ট হয়।’[১] কিন্তু সকল গন্ডী ছাড়া বড় কঠিন। অন্যত্র তিনি বলে-

---

১. কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত “শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ”, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পত্রাঙ্ক ১১৫

ছিলেন, নিজের সাধনে নিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত অন্য সাধুর সঙ্গ করা অনুচিত। আরও বলেছিলেন, সদ্গুরুর নিকট থেকে সাধন লাভ করার পর আর অন্য সাধুর সঙ্গ করার প্রয়োজন হয় না।

আশ্রমে প্রথম ধুলট ও পরিণয়োৎসব।

গোস্বামীপ্রভু অনাসক্ত যোগী, অকৃত্রিম বৈরাগ্যের অনির্বাণ শিখা। সাধনরাজ্যের ফল্গুপ্রবাহ তাঁর কৃপা-সাপেক্ষ। বৈরাগ্যের ছোঁয়াচ লেগে ঘটে চিত্তশুদ্ধি—কলির কলুষ-ক্ষালন; কাঠাম যেমন তেমনই থাকে। চোটপাট, কাটাকুটির বালাই নেই। জগাই-মাধাই-দৌরাত্ম্যের ঘটে ইতি। ঐ খোলে প্রকাশ হয় সুজন, বিনয়ী, সোনার মানুষ। অসুরের মধ্যে হয় দৈবীপ্রকাশ। এই বৈচিত্র্য ঘটাতে হতে হয় তাঁকে কখনও কুসুম থেকে মৃদু আবার কখনও বা বজ্র হতে কঠোর; থাকে না ঝাঁঝ-ঝলসানি; বীর্যের কাজ চলে বিচিত্র মনোহর ভঙ্গিমায়। পদকর্তার পদে ঐ তত্ত্ব পায় প্রকাশ—

রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে,
অসুরেরে করিলে সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিলে, প্রাণে কারও না মারিলে,
চিত্তশুদ্ধি করিলে সবার॥

প্রভু ধীর, স্থির। শিষ্যদের কণ্ঠী নেই, শিখা নেই, মালা নেই, ঝোলা নেই, তিলক নেই, বেশভূষার বালাই নেই। তাঁদের চাল-চলনই আলাদা। গোসাঁইজী ভেলকি-বাজির ধার ধারেন না। রক্ত-মাংসের শরীরে অণু-পরমাণুর পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষকে নূতন ছাঁচে গড়া তাঁর কাজ। তিনি নিজে বলেছেন, 'আমাদের কোন প্রচার নয়, শুদ্ধ ভক্তি। "Mission নয়, devotion." প্রচারের আমরা ধার ধারি না। ভক্তিলাভ আমাদের লক্ষ্য।' গোসাঁইজীর আঁচ খানিকটা মেলে তাঁর শিষ্যদের থেকে। ওঁদের অবস্থাও বাইরে থেকে বোঝা ভার। অল্প দিনের মধ্যে সাধন-প্রাপ্তদের কারও কারও মধ্যে দেখা যায় বিচিত্র ভাব। আবার কারও মধ্যে প্রকাশ পায় অলৌকিক শক্তির খেলা, আর কারও মধ্যে অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য ফুটে ওঠে। সঙ্কীর্তনে ওঁদের ভাবোচ্ছ্বাস অভিনব ও স্বতন্ত্র। তাঁরা সাধন-ভজনে তৎপর, সত্যনিষ্ঠ, প্রফুল্লচিত্ত ও বিনয়ী। বুজরুকীর কিছু নেই। গুরুভাইদের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসার নেই তুলনা। বয়সের ব্যবধান, মান-মর্যাদা, পদাধিকার ভুলে ছেলে-বুড়া, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সতীর্থদের এমন অমায়িক অন্তরঙ্গতা, বড়-একটা দেখা যায় না। উদ্বেগ-অশান্তির মধ্যেও দেখা হলে গুরুভাইদের ক্লেশ যেন ঘুচে যায়। ধ্যানে বসে কত অভাবনীয় তথ্য তাঁদের কাছে প্রকাশ পায়।

১৫ পৌষ, ১২৯৫ কলিকাতায় কুলদাকান্তের সঙ্গে মিলেন এসে সতীর্থ বিধুভূষণ মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত আর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গুরুর খুঁটিনাটি খবর নেন ওঁরা; গোসাঁই-প্রসঙ্গ চলে। সতীশবাবু রগড় করে বলেন—

গোসাঁইজীর কথা অমৃত সমান।
কুলদাকান্ত ভাই ভণে, শুনে পুণ্যবান॥

তারপর তিনি অকপটে বিবৃত করেন তাঁর নিজের জীবনের এক গোপন ঘটনা—

'গোসাঁইজী আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছেন তার আঁচ পাবে এতে। সাধন পেয়ে ভাবি, যা হোক, এবার রিপুর দৌরাত্ম্য থেকে তো রেহাই পাব! কিন্তু কয়লার ময়লা যায় না। কামের উৎপাত যেন আরও বেড়ে যায়, টাল সামলান হয় দায়। গোসাঁইজীর উপর গিয়ে পড়ে সব রাগ। নাম করতে বসি, এমন সব মুখ তখন উঁকি-ঝুঁকি মারে যে, নাম যায় কোথায় তলিয়ে। উত্তেজনায় হই দিশেহারা। মনে মনে তখন ঠিক করি, "গোসাঁইর কাছে গিয়ে আর কি হবে? ভূতের বেগার খাটাই সার!" পাশের ঘর থেকে কানে ভেসে আসে গোসাঁইজীর কণ্ঠে স্পষ্ট আহ্বান, "সতীশ আমার মাথায় একটু তেল মেখে দিয়ে যাও না।" অভিমানের ঝাঁঝে তেজের সঙ্গে বলি, "আমি পারব না।" যন্ত্রচালিতের মত তথাপি এগিয়ে যাই। গিয়ে দেখি মৃদু হেসে তিনি ধীরে ধীরে বলেন, "রাগ কর কেন? মাথাটা আমার জ্বলে যাচ্ছে। একটু তেল মেখে দেবে, এস না!" এক কুশ তেল নিয়ে তাঁর মাথায় দেই। তেল কখনও তিনি মাখেন না, অথচ বারবার বলেন, "দাও দাও, মাথাটা ঠান্ডা হচ্ছে।" হঠাৎ যেন আমি কেমন হয়ে যাই, শরীর রোমাঞ্চিত হতে থাকে, কাঁপুনি শুরু হয় সর্বাঙ্গে। দেখি, জীবনে যে সব তরুণীর উপর কখনও কু-ভাব হয়েছে তারা সব একে একে কামোন্মত্ত হয়ে আমার দিকে ছুটে এসে পাশ কাটিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে, উৎকণ্ঠায় আর লজ্জায় মনে মনে বলি, "ধরণী দ্বিধা হও।" গোসাঁইজী তখনও বলেন, "দাও, বেশ করে দাও, যতটা তেল আছে কটোরায়, বেশ করে ধীরে ধীরে মেখে দাও।" খানিক বাদে তিনি শুধান, "সবটা তেল শুষে গেছে? তাহলে যাও।" নেশায় বিভোর হয়ে এ সব দেখি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখার মত। গোসাঁইজীর কথায় চমক ভাঙ্গে। ঐ দিন থেকেই আমার কামভাব গেছে; কখনও যে ছিল তা কল্পনাও করতে পারি না।' গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করে তাঁরা চারজনে মিলে তুলসীদাসের দোঁহা আবৃত্তি করেন—

সদ্‌গুরু পায়ে, ভেদ বাতায়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তব্ কয়লাকা ময়লা ছুটে যব্ আগ্ করে পরবেশ॥

সতীশবাবুর দীক্ষা হয় ঢাকা ব্রাহ্ম প্রচারক-নিবাসে ঠিক এক বছর পূর্বে। ঢাকা জিলার বাকড়া গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ী। এণ্ট্রান্স ও এফ.এ. পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পেয়েছিলেন। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় বি.এ. পাশ না করেই তিনি শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তিনি বড় খামখেয়ালি ছিলেন। প্রথম জীবনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ছিলেন মনোমুখী। ইলিশ মাছ খেতে ইচ্ছা হলে মাসভর ইলিশ মাছই খেলেন, কিছুদিন ভাতে-বেগুনে। এক মাস শুধু পিঠে খেয়ে রইলেন, আবার কিছুদিন কেবল ঘি-ভাত। প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম হয়ে তিনি পৈতে ফেলে দেন। ছাত্রেরা তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। তাঁর চরিত্র ছিল বালকের মত।

মুঙ্গেরে বরদাকান্ত কথায় কথায় বলেন, 'কি করি বল তো কুলদা, প্রাণে যে শান্তি পাই না!' কুলদাকান্ত বলেন, 'গোসাঁইজীর আশ্রয় নিলে, আর তাঁর কথামত চললে অন্তরে অশান্তি আসে না।' বরদাকান্ত বলেন, 'তিনি কি আর আমার মত লোককে দীক্ষা দিবেন?' 'লিখেই দেখুন না!' উত্তর আসে, 'আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।'

স্ত্রীর অকালমৃত্যুতে শোকে দিশেহারা হয়ে মদ ধরেন পি. বসু। শোক যায় ছুটে, কিন্তু একে একে কয়েকটি উপসর্গ এসে জুটে। প্রভুর এক শিষ্যকন্যার সঙ্গে তাঁর

আবার বিয়ে হয়। কয়েক দিন যেতে না যেতে নবপরিণীতার সঙ্গে হয় ছাড়াছাড়ি। কথাটা গোসাঁইজীর কানে আসে। বসুসাহেব মাতাল হয়ে একদিন প্রভুর কাছে উপস্থিত। তাঁকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাকে আপনি সাধু বানাতে পারেন?' গোসাঁইজী বলেন, 'তা পারি, কিন্তু আমার কথামত চলতে হবে।'—'তা নিশ্চয় চলব।'—'পঞ্চমকার ছাড়তে হবে।'—'তা ছাড়ছি, আপনি সহায় হবেন।' সাধন পেয়ে হন তিনি সোনার মানুষ। শ্বশুর-পরিবারের সঙ্গে ঘটে সম্প্রীতি। স্ত্রীর সঙ্গে হয় নূতন করে পরিচয়।[১]

গাঁয়ের লোক ব্যবধান রেখে চলে ভয়ে আর সঙ্কোচে। নামের সঙ্গে স্বভাবের গরমিল—এ হেন প্রসন্নকুমার গুহঠাকুরতা ঢাকা আসেন বরিশাল থেকে। অপরাহ্নে জ্ঞাতিখুড়া রামকৃষ্ণ গুহঠাকুরতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'গেন্ডেরিয়া যাবে গোসাঁইজীকে দর্শন করতে?' রাজী হন দেশে ফিরে গোসাঁইগণের কাছে ঠাট্টা-তামাশা করবেন—এই অভিপ্রায়ে।

আমতলায় গোসাঁইজী ধ্যানস্থ। যিনি আসেন তাঁকেই সাষ্টাঙ্গ দেন। প্রসন্ন গুহঠাকুরতা দেখেও দেখেন না; ফিরে যেতে তিনি উস্‌খুস্‌ করেন। খুড়া বলেন, 'এখনই কীর্তন আরম্ভ হবে। খানিকক্ষণ খোল বাজিয়ে যাও না।' কথাটা মনঃপূত হয়; মনে মনে ভাবেন, 'খোলের মার একটু দেখিয়ে যাই।' কীর্তন জমে ওঠে। উদ্দন্ড নৃত্য করতে করতে গোসাঁইজী এলিয়ে দেন তাঁর প্রকান্ড দেহ প্রসন্ন গুহঠাকুরতার পিঠের উপর। বুকে মৃদঙ্গ, পিঠে গুরুভার—পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ধুনের উপর ধুন তুলেন। কীর্তন শেষ হতে না হতে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে বিদায় হন। খাড়া হয়ে তখনও হাঁটতে পারেন না। গোসাঁইজী যেন তখনও কাঁধে ভর করে আছেন।

দোতলায় প্রসন্নবাবুর শোবার ঘর। ঘুম নেই চোখে। ঢং ঢং করে ঘড়িতে দুটা বাজে। গোসাঁইজীর কাছে যাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। তর সয় না। ভাগ্নে পাশের ঘরে সপরিবারে নিদ্রিত। ঐ ঘরের ভিতর দিয়ে নীচে যাবার পথ। কি করেন? চোখে পড়ে পাশের দরজা ঘেঁষে গাছের মোটা ডাল। ডাল বেয়ে তিনি নীচে নেমে আশ্রম-মুখো ছুটেন। চোর ভেবে চৌকিদার পেছন নেয়। গোসাঁইজীর ঘরে প্রদীপ জ্বালা; সামনে আসন পাতা। মৃদু হেসে প্রভু আহ্বান জানান। তখনই তাঁর সাধন হয়।[২]

শরৎকামিনী বসু ছিলেন যোগমায়া দেবীর অন্তরঙ্গ ভক্ত-সহচরী। তিনি বলেছেন, 'মাঠাকুরাণীর সঙ্গে গোপনে সাধনে বসে তাঁর শ্রীঅঙ্গে কত সময় সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ দেখে ভয়ে, বিস্ময়ে অভিভূত হতাম। তিনি তখন একটি একতারা নিয়ে গান করে ভাব-সংবরণ করতেন।' যোগমায়া দেবী পতিপূজা, পতিসেবা ও পতির অনুগত হয়ে তাঁর প্রিয় কার্য সম্পাদনকেই তাঁর সাধন-ভজনের প্রধান উপাচার বলে গ্রহণ করেছিলেন। যোগমায়া দেবীর মধ্যে কখনও কখনও যোগৈশ্বর্যের প্রকাশ ঘটত। তিনি তা গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

প্রভু একদিন মধ্যাহ্নে সশিষ্য প্রসাদ পেতে বসবেন, এমন সময় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দশবারোজন সঙ্গী নিয়ে আশ্রমে আসেন। আশ্রমবাসীদের সংখ্যাও

---

১. শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকারের খাতা থেকে।

২. ঐ

পনর-ষোল। কালবিলম্ব না করে যোগমায়া দেবী সকলকে বসিয়ে দেন এবং স্বহস্তে প্রসাদ পরিবেশন করেন। পরিতৃপ্তির সঙ্গে তাঁরা ভোজন সমাপন করেন। বিশ্রাম করতে গিয়ে গোসাঁইজী বলেন, 'মনে হয়েছিল, অতিথিদের সঙ্গে প্রসাদ পেতে বেশ বিলম্ব হবে! এতগুলি লোকের প্রসাদের ব্যবস্থা তখনই কি করে করলে?' যোগমায়া দেবী নীরব থাকেন। বারবার প্রশ্ন করায় সসঙ্কোচে তিনি বলেন, 'আপনার ইচ্ছায়ই এ সম্ভব হয়েছে। গুরুকৃপায় কি না হয়? আমার হাত-পা শীর্ণ ও দুর্বল। বেশী খাটতে পারি না।' যোগজীবন গোস্বামী তখন ওখানে ছিলেন। প্রভু বলেন, 'দেখ্ যোগজীবন, তোর মাকে আমার থেকে আলাদা মনে করিস্ না। ওঁকে ভিন্ন মনে করলে আমাকে বুঝতে পারবি না!'

সস্ত্রীক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা আসেন আশ্রমে। সন্ধ্যার পূর্বে গুরুর কাছে বরিশালের খবরাখবর বলছেন, এমন সময় বৃদ্ধা এক মহিলা, বুকভাঙ্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে গোসাঁইজীকে প্রণাম করে বলেন, তাঁর ছেলে উকিল। কোর্ট থেকে ফিরার সঙ্গে সঙ্গে সে নির্জীব হয়ে পড়েছে—হাত-পা নাড়তে পারে না, কথা বলতে পারে না, মুখই খুলতে পারে না, অথচ সম্বিত রয়েছে পুরোপুরি। ভদ্রমহিলা কাতর হয়ে আরো বলেন, 'এর একটা বিহিত করুন, প্রভো।' গোসাঁইজী বলেন, 'মনোরঞ্জনবাবু, আপনি একবার যান তো ওঁর সঙ্গে।' যেতে যেতে মনোরঞ্জনবাবু ভাবেন, 'এঁরা আমার জানাশোনাও না, তাছাড়া আমি ডাক্তার-কবিরাজ নই। হোমিওপ্যাথিও কোনদিন করি নি—আমাকে পাঠাচ্ছেন কেন? তবে আমি উপলক্ষ্য। বৃদ্ধার কপাল ভাল। রোগী নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে—গোসাঁইর যখন কৃপাদৃষ্টি পড়েছে।'

রোগীর সম্মুখে উপস্থিত হতেই মনোরঞ্জনবাবুর খেয়াল হয়—'সম্মোহনের (hypnotism-এর) চর্চা করি, তাই হয়ত গোসাঁই আমাকে পাঠিয়েছেন। রোগীকে দেখেই তাঁকে তেজের সঙ্গে তিনি বলেন, 'আপনার তো কিছুই হয় নি! উঠে বসুন দিকিনি।' উকিলবাবু মন্ত্রচালিতের মত উঠে বসেন।

'ক্ষুধা লেগেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ বড় ক্ষুধা পেয়েছে।'

'কি খেতে ইচ্ছা হয়? চা, হালুয়া?'

'হ্যাঁ।'

ওঁর জন্য ও-সব তৈরী করে তিনি আনতে বলেন। আর কোন উপসর্গ নেই। তাঁর সঙ্গে মনোরঞ্জনবাবুর অনেক কথাবার্তা হয়। উকিলবাবু চা ও খাবার খান। মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে নীচে নেমে তাঁকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'গোসাঁইর ইচ্ছায়ই আপনি সেরে উঠেছেন।'

ঐদিন থেকে মনোরঞ্জনবাবুর মধ্যে hypnotism-এর অদ্ভুত শক্তি দেখা যায়। এই অলৌকিক শক্তির প্রভাবে কত যে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোককে তিনি নিরাময় করেছেন! প্রভু তাঁকে পাঁচটি নির্দেশ মেনে চলতে বলেন—১. অর্থ উপার্জনের চেষ্টা না করা ভাল। ২. কারও কাছে থেকে অর্থ বা দ্রব্য যাচ্ঞা না করা শ্রেয়। ৩. কারও কাছে অভাব না জানান ভাল। ৪. স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ কোন সাহায্য করলে তা প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন নয়। ৫. গয়া, গিরিডি, পচম্বা, বৈদ্যনাথ, ভাগলপুর, হাজারিবাগ, যেখানে ভাল মনে হয়, থাকতে পারেন। স্বামী-স্ত্রীর সাধন হয়েছিল দেড় বছর ব্যবধানে। মনোরমা দেবী পরে পান। দীক্ষার

কিছুদিন পরে নাম করতে বসলেই মনোরমা দেবী সমাধিস্থ হয়ে দশ-বার ঘণ্টা থাকতেন। এমন দিনও গিয়েছে যে, এক নাগাড়ে বত্রিশ ঘণ্টা সমাধিস্থ হয়ে তিনি কাটিয়েছেন। আর এমনই ভগবৎকৃপা, দুধের শিশুও সমাধি অবস্থায় কখনও মার কোল পাবার জন্য কাঁদে নি। সংসারের অসচ্ছলতা মনোরমা দেবীর সমাধির কখনও বিঘ্ন ঘটায় নি। কত পরকে যে তিনি আপন করেছেন। বহু অনাত্মীয় তাঁদের গৃহে ঠাঁই পেয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই এই গৃহকে মনে করতেন তাঁদের নিজের বাড়ী। প্রতিবেশী ও সমসাময়িক লোকের কাছে মনোরমা দেবী ছিলেন এক বিস্ময়। সমাধি-অবস্থায় কত নরনারী তাঁকে দর্শন করতে এসে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁকে প্রণাম করেছেন। তাঁর সম্পর্কে প্রভু বলেছিলেন, 'প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও কিভাবে ভগবানকে ডাকতে হয় মনোরমা এই দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য জগতে এসেছেন।'

বিক্রমপুরের তেওহাটা গ্রামে রাজকুমার দত্তের বাড়ী। কালব্যাধিগ্রস্ত ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বারদীতে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে। ব্রহ্মচারী ক্রুদ্ধ হয়ে অকথ্য ভাষায় তাঁকে গালিগালাজ করেন। 'শালারা আমায় তোরা কি পেয়েছিস? আমি বদ্যি না ধন্বন্তরী? কবিরাজ দেখাতে পারিস না? প্রারব্ধের ভোগ খণ্ডাবে কে?' রাজকুমারবাবু বিনীতভাবে বলেন, 'ওর ব্যারাম বদ্যি-কবিরাজের নাগালের বাইরে। কত জীবন্মৃতকে আপনি নবজীবন দিয়েছেন।' তথাপি তিনি নির্মম কণ্ঠে বলেন, 'এখানে কিছু হবে না। তোর গুরু তো যোগীরাজ। তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারিস না?' ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায়, নিরুপায় দত্ত মহাশয় নৌকা ছাড়তে বলেন ঢাকামুখো।

গেণ্ডেরিয়ায় আমতলায় ধরাধরি করে অস্থিচর্মসার ভাইপোকে নিয়ে রাখেন সমাধিস্থ গুরুদেবের আসনবেদীর নীচে। ধ্যান ভাঙ্গতেই চোখ মেলে মুমূর্ষু রোগীকে দেখে তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়, 'আহা, এর কি কষ্ট!' তখনই রোগী সুস্থ হয়ে উঠে বসে। পরমহংসজী গোসাঁইর কাছে প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'তুমি এ কি করছ? তাহলে তোমার কাছে লোক তো ভবরোগ সারাতে আসবে না।' গোসাঁইজী বলেন, 'রোগীর দশা দেখে, সে ভাল হয়ে যায় আমার ওরূপ ইচ্ছা হয়েছিল বটে, কিন্তু আমি তো কোন শক্তি প্রয়োগ করি নাই; প্রার্থনাও করি নাই।' গুরু বলেন, 'তোমার সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিতেই যে রোগ ভাল হয়। আর কখনও অমন কর না।'

নৃত্যগোপাল গোস্বামী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। তিনি আসেন গেণ্ডেরিয়ায়। প্রভু তখন আমতলায় ধ্যানে। নেপাল গোসাঁই মনে মনে প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা করেন, 'তুমি আর রামকৃষ্ণ যদি অভিন্ন হও, তাহলে কৃপা করে আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও।' সমাধিস্থ অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে আগন্তুকের মাথায় প্রভু তাঁর একটি পা তুলে ধরেন। তারপর একটি কথাও না বলে নিজের আসনে গিয়ে বসেন।

নৃত্যগোপালবাবু বলেন, 'এই ঘটনায় আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। দ্বিধা-সংশয় মুহূর্তে দূর হয়। তখন তাঁর কাছে সাধন পেয়ে ধন্য হই।'

শ্রীধরের পাগলামিতে আশ্রমবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। কথাটা গোসাঁইর কানে যায়। তিনি তাঁকে আশ্রম থেকে চলে যেতে বলেন। শ্রীধর আর কি করেন? সারাদিন বনে বনে ঘুরেন। আর রাত্রির অন্ধকারে আশ্রমের এক কোণে এসে আশ্রয়

নেন। যোগমায়া দেবী পণ্ডিত মহাশয়কে দিয়ে প্রত্যহ শ্রীধরের আহার পাঠান। এক রাত্রে প্রভুর সঙ্গে হয় শ্রীধরের চোখাচোখি। তিনি বলেন, 'শ্রীধর এসেছ? বেশ হয়েছে।' ঐদিন থেকে আবার শ্রীধরের আশ্রমবাস।

সাধন-কুটিরের ছোট ঘরে গোসাঁইজী পঞ্চমুণ্ডাসন করেন। ভক্তদের মনে আসে স্বস্তি। আসন ছেড়ে প্রভুর গেণ্ডেরিয়া ছাড়া সম্ভব নয়! যিনি ইচ্ছাময়, যাঁর ইচ্ছায় সবই হয়, তিনিই অচিরে করেন উপায় উদ্ভাবন। একদিন ঐ আসনে প্রভু বসে আছেন এমন সময় প্রকাণ্ড এক সাপ জঙ্গল থেকে এসে তাঁকে মিনতি করে বলে, 'পূর্বজন্মে সিদ্ধিলাভের মুখে অভিশপ্ত হয়ে সর্পযোনিপ্রাপ্ত হয়েছি। সিদ্ধ আসনের পাশে থাকতে পেলে উদ্ধার হয়ে যাব। আপনি আমায় দয়া করুন।' সাপের করুণ কাহিনী শুনে প্রভু তাকে অনুমতি দেন। একটি ইঁদুর ওখানে গর্ত খুঁড়ে ছিল। সাপ তাতে আশ্রয় নেয়। প্রয়োজন মত বাইরে যায়, সাপের দুধ-কলা পাশে রাখার ব্যবস্থা হয়। আশ্রমবাসীরা পরে একে ভয় পেতেন না।

আসন, ধুনি জুড়ে ওঠে উইয়ের ঢিপি। উপর দিকে দিন দিন বাড়ে। ছনের চাল পর্যন্ত উঠলে ঘর বাঁচান দায়। কুঞ্জ ঘোষের মুখে বিবরণ শুনে প্রভু স্তূপের উপর হাত চাপা দিয়ে একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকেন। ঐদিন থেকে ঊর্ধ্বগতি স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে এই আসন আর ব্যবহারের উপযোগী থাকল না।

গেণ্ডেরিয়া আশ্রমের পূর্ব ও পশ্চিম দুদিকে কুঞ্জবিহারী ঘোষ ও রাধারমণ গুহের গৃহের বরাবর গোসাঁই-শিষ্যেরা জমি কিনে বাড়ী করেন। এঁদের মধ্যে আছেন কুঞ্জলাল নাগ, শশীমোহন বসু, সতীশচন্দ্র গুহ, চন্দ্রকুমার দত্ত, আরও অনেকে। আশ্রমের দক্ষিণেও প্যারীমোহন বসু অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গে বাড়ী করেন। গোসাঁইজীকে কেন্দ্র করে এই প্রতিবেশী ভক্তমণ্ডলী যেন একই পরিবারের শাখা-প্রশাখা। তাঁদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, রেষা-রেষি, সব কিছুই গোস্বামী-প্রভুকে নিয়ে; তাঁদের বিষয়-আশয়, সংসার, পারিবারিক মান-মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বিষয়ী নন। প্রভুর পুণ্য প্রভাবে আশ্রম ও ভক্তমণ্ডলীর গৌরবে গেণ্ডেরিয়ায় যেন নেমে এসেছে স্বর্গের সুষমা; আশ্রম হয়েছে মহাতীর্থ। লোকসমাগম দিন দিন বাড়ে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে হয় লোকের ভিড়, সাধু-ভক্তদের আনাগোনা। আবার কেউ বা আসেন আত্মপ্রচারের অভিপ্রায়ে। আশানন্দ বাউল আর তাঁর দাদা আসেন রোজই। প্রভুর কাছে এসেও ওদের দু ভাই-এর মধ্যে হয় কথা-কাটাকাটি, কোন্দল। ধর্মার্থীদের এসব ভাল লাগে না। কিন্তু প্রভুর ধৈর্যের তুলনা নেই। গোসাঁইজীকে কেউ প্রশ্ন করলে, আশানন্দ উত্তর দিতে চাইতেন। প্রশ্নকর্তা এতে ক্ষুব্ধ হতেন। প্রভুর শিষ্যেরা একদিন দুভাইর কোন্দলের কথা উল্লেখ করে গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কি এতে অস্বস্তি বোধ হয় না?' গোসাঁইজী বলেন, 'ভগবৎ কৃপায় মানুষের এমন অবস্থা হতে পারে যখন কানের কাছে ঝগড়া, বিবাদ, অবান্তর কথা আর এমন কি, ঢাক-ঢোল অহরহ বাজলেও উদ্বেগ বা অশান্তি হয় না।'

এক সময় দেখা যায় নির্দিষ্ট সময়ের অনেক বেশী সময় গোসাঁইজী পাঠে নিযুক্ত থাকেন। অন্তরঙ্গ ভক্ত একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি এত বেশী সময় এখন পাঠ করেন কেন?' তিনি বলেন, 'বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যই পাঠ বেশী করি, নইলে আত্মস্থ হয়ে পড়ি। এই অন্তর্মুখী আকর্ষণকে লঘু করার উদ্দেশ্যেই আমাকে সাবধান হতে হয়।'

প্রভু প্রায়ই সমাধিস্থ থাকেন। মধ্যে মধ্যে সাধন-কুটিরের দ্বার ভিতর থেকে বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। লোকে মনে করে তাঁর শরীর বুঝি ভাল না। একদিন অন্তরঙ্গদের উদ্বেগ লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'অসুস্থ বলে দ্বার বন্ধ করি না। সূক্ষ্মদেহে অন্যত্র যখন যেতে হয় তখনই ওই রকম করি।'

আশ্রমে যেমন পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান তিনি প্রবর্তন করেছিলেন, গৃহী-শিষ্যদেরও প্রত্যহ তা পালন করার জন্য তিনি উপদেশ দেন। একে তিনি ধর্মের ভিত্তি বলেছেন। পঞ্চযজ্ঞ বলতে বুঝায়—১. **দেবযজ্ঞ**—নিত্য উপাসনা, প্রার্থনা, পূজা; ২. **ঋষিযজ্ঞ**—শাস্ত্রাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ; ৩. **পিতৃযজ্ঞ**—শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি ও পিতৃপুরুষদের স্মরণ করে দান; ৪. **প্রাণিযজ্ঞ**—পশুপক্ষীদিগকে আহার দান ও বৃক্ষাদিকে জল দান ও ৫. **আত্মযজ্ঞ**—মানুষকে দান ও সাহায্য।

দেখতে দেখতে পৌষ-সংক্রান্তি (১২৯৫) এসে যায়। ভোর না হতে বাইরে থেকে দলে দলে কীর্তন এসে আশ্রম ঘুরে যায়। আশ্রমবাসীরা ও ভক্তেরাও কীর্তন করেন। প্রভুর শিষ্য-প্রতিবেশীরা আশ্রমে কত রকম পিঠে পাঠান। শিষ্য-পরিবারের মধ্যে এ নিয়েও প্রতিযোগিতা। কে কত সুস্বাদু পিঠে বানিয়ে আশ্রমে পাঠাতে পারেন। পূর্বের রাত্রি জেগে মেয়েরা আশ্রমের জন্য শুদ্ধভাবে পিঠে বানিয়েছেন। আলাদা করে তারপর বাড়ীর ছেলেপিলেদের জন্য বানিয়েছেন। কত রকমের সেই পিঠা—পাটিসাপ্‌টা, আলুর পিঠা, মুগের পিঠা, গোকুল পিঠা; স্বাদে সব অতুলনীয়। বাল্যভোগের প্রসাদ পেতে পেতে প্রভু পিঠার প্রশংসা করেন, 'মায়েরা যেন তাঁদের স্নেহ ঢেলে রেখেছেন।' তাঁদের ত্যাগ ও সেবাবৃত্তির তারিফ করেন। 'ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সেবাই নারীকে মহীয়সী করে।'

গোসাঁইজী কথায় কথায় তখন বলেন, 'মাঘী সপ্তমীর তো বেশী দেরী নাই। এবার কি 'ধূলট' করা সম্ভব?' ভক্ত-শিষ্যেরা বলেন, 'এবার তো সেই অন্ধবাবাজী নেই। সাতদিন ধরে উৎসব চালাবার কীর্তনীয়া কোথায়?' প্রভু বলেন, 'এ কি একটা কথা হল? তাঁর কীর্তন তো তিনিই করবেন।' ধূলটের প্রস্তুতি শুরু হয় ঐদিন থেকেই। বাড্ডানগরের রসময় দাশ গোসাঁইজীর সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'প্রভো, চতুর্থী থেকে সপ্তমী পর্যন্ত চারদিন আমি আমার দলবল নিয়ে গাইব। প্রথম তিন দিন আমি অন্যত্র গাইব বলে পূর্বেই কথা দিয়ে ফেলেছি।' প্রভুর শিষ্যেরা বলেন, অধিবাস থেকে এই কয়েকদিন আমরা চালিয়ে নেব। অধিবাসের পূর্বদিন শ্রীহট্ট থেকে অন্ধবাবাজী এসে উপস্থিত। রায়সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার তাঁকে পাঠিয়েছেন। ভক্তদের আনন্দ ধরে না। তাঁরা বলেন, 'রসময় দাশকে জানিয়ে দেওয়া ভাল—আমাদের কীর্তনীয়া এসে গেছেন।' প্রভুর কানে একথা যেতেই তিনি বলেন, 'তা কি হয়? ও'র সঙ্গে যেমন ব্যবস্থা হয়েছে তেমনই তিনি গাইবেন।' ডাক্তার বিহারী মালাকার এসে গোসাঁইজীকে বলেন, 'প্রভো, আপনার অনুমতি পেলে বাবাজীকে দিয়ে চারদিন আমার বিগ্রহের কাছে কীর্তন করাতে চাই। অষ্টমীর দিন ভোরে নগর-সংকীর্তনে বের হবার পূর্বেই আমরা আশ্রমে এসে পৌঁছে যাব।' প্রভুপাদ সম্মতি দেন।

যথারীতি অধিবাস হয়। বাবাজীর কীর্তনে পড়ে শতকণ্ঠে বাহবা। আশ্রম মেতে ওঠে। চতুর্থী থেকে রসময় দাশ এসে আসর জমান। তিনি সুললিত কণ্ঠে সুরদাস, তুলসীদাস, সুন্দরদাস ও মীরাবাইর ভজনগান পরিবেশন করে শ্রোতাদের অভিভূত করেন। আশ্রমে লোক ধরে না। রাত দুটা অবধি প্রভু আসরে থাকেন।

অষ্টমীর দিন বেলা আট ঘটিকায় নগর-সংকীর্তন বের হয়। পূর্ববারের সেই গান। প্রভু পথে নেমে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে গড়াগড়ি করেন। তারপর দুহাতে ধূলিমুঠি নিয়ে 'জয় সীতানাথ, জয় সীতানাথ' বলে চারদিকে ছুঁড়তে থাকেন। শক্তিসংযুক্ত ধূলির সংস্পর্শে গায়ক ও দর্শকদের মধ্যে হয় অপূর্ব ভাবের সঞ্চার। তাঁরাও হুঙ্কার ও গর্জন করে নেচে নেচে চলেন। কত কীর্তনের দল এসে পথে সমবেত হয়। মৃদঙ্গ ও করতালের ধ্বনি চারদিক কাঁপিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। পথের পাশে, দোতলায় ও ছাদে মেয়েদের ভিড়। ঘন ঘন উলুধ্বনি হয় ও বাতাসা, নকুলদানা ও সন্দেশ লুঠ দেওয়া হয়। প্রবল ভাবের বন্যা ঢাকা শহরকে মাতিয়ে তোলে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, মুটে-মজুর, ধনী-দরিদ্র, যিনি যে অবস্থায় ছিলেন দিশেহারা হয়ে ধূলি ছুঁড়তে থাকেন। ছয় ঘণ্টা ধরে নগর পরিক্রমা করে সংকীর্তনের দল আশ্রমে ফিরে আসে।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিরাম খোল বাজান। কীর্তন শেষ হলে গোসাঁইজীকে তিনি সাষ্টাঙ্গ দিতেই তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করে বলেন, 'সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করে মহাপ্রভু যে আনন্দ পেয়েছিলেন আজ আপনাকে স্পর্শ করে আমিও ওইরূপ আনন্দ পাচ্ছি।' এইবার ধূলটের দিন ঢাকা শহরের অনেকেই প্রভুর কাছে সাধন লাভ করে ধন্য হন।

ধূলটে জ্ঞান দত্ত এসেছিলেন তাঁর নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে। শৈবলিনী শান্তিসুধার বান্ধবী। শান্তির বিয়ের পর শৈবলিনীর ফেরার কথা। মামা কুঞ্জ নাগের গৃহে হয়েছিল শৈবলিনীর থাকার ব্যবস্থা। ধূলট উৎসবের পর জ্ঞান দত্ত কর্মস্থলে ফিরে যেতে চাইলে প্রভু বলেন, 'শৈবলিনীকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।' এই নির্দেশে সকলেই হন স্তম্ভিত। তাঁরা রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য গোসাঁইজীকে ধরেন। তিনি বলেন, কুঞ্জবাবু যেখানে বাড়ী করেছেন সেখানে সিপাহি-বিদ্রোহের সময় কয়েকটি লোকের ফাঁসি হয়েছিল; ওরা প্রেত হয়ে ওখানে আছে। শৈবলিনীর উপর ওরা বিরক্ত হয়ে আমাকে জানিয়ে গেল, 'একে এখান থেকে না সরালে আমরা ওঁর অনিষ্ট করব।' এ-কথা শুনে শৈবলিনীকে যেতে কেউ আর বাধা দেন না।

পরশুরামকে গোসাঁই-শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি বুড়ামানুষ। ধামরাই থেকে এখানে এলেন কি করে?' পরশুরাম বলেন, 'ঢাকায় এলাম গয়নায়। কাউকে চিনি না। আশ্রম কোথায় জানি না। পথঘাট সবই অচেনা। কোন্ দিকে যাব ভাবছি, এমন সময় কাল একটি মেয়ে, দশ-এগার বছর হবে বয়স, এগিয়ে এসে আমায় বললে, 'গেণ্ডেরিয়া যাবে তো এস।' আশ্রম দেখিয়ে বললে, 'ঐ যে আশ্রম যাও ওখানে।” আর তাঁকে দেখলাম না। তখন খেয়াল হয়, ও কি যে-সে মেয়ে! শ্যামা মা ছাড়া আর কে? আশ্রমে ঢুকে দেখি আমার মাধবকে।' গোসাঁই-শিষ্যেরা এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখানে এলেন কেন?' উত্তরে বললেন পরশুরাম, 'আজ্ঞে, জানতে পারলাম মাধব গেণ্ডেরিয়ায় আছেন।' প্রভুকে পরশুরাম মাধব বলে ডাকেন। যখন তখন "মাধব আমার দয়াল" বলে স্তব-স্তুতি করেন। "দয়াল মাধব" আমাকে ঘর-ছাড়া করে তাঁর দুর্লভ চরণে ঠাঁই দিয়েছেন। তাঁর কৃপা ছাড়া কি সাধ্য তাঁর নাম করি?' আশ্রমবাসীদের কাছে এ-সব কথা বলে তিনি কেঁদে হন আকুল। নামানন্দে ডুবে থাকেন তিনি দিনরাত। নবকুমারবাবুরা প্রসাদ পাবার সময় পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ডাল কেমন হয়েছে?' চমকে উঠে তিনি উত্তর দেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ,

কিষ্টনাম বড় মিঠা।'

সেই নির্ধারিত দিনটি আসে—ছাব্বিশে ফাল্গুন, (১২৯৫)। গেন্ডেরিয়ায় যোগজীবন-বসন্তকুমারী ও জগদ্বন্ধু-শান্তিসুধার পরিণয় উৎসব। জোড়া বিয়ে, অথচ পরিবেশ থেকে বুঝা ভার। বরং মনে হয় আশ্রমের মাঙ্গলিক উৎসব—মুহুর্মুহুঃ উলু ও শঙ্খধ্বনি। কীর্তন ও হরিকথার আসর। ধূপধুনার সুবাস। পরশুরাম আছেন। গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড় থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন রঘুবরদাস বাবাজী। রমণার ফকিরসাহেব, আলিজান ফকির, ব্রাহ্মসমাজের অনেকে এসেছেন। কলিকাতা থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই উপলক্ষে উপস্থিত। দূরদূরান্ত থেকে এসেছেন গোসাঁইর অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা।

আড়ম্বর নেই, জাঁকজমক নেই। ঢোলের বাজনা নেই। সানাইর ললিত আলাপ নেই। এ যেন ঋষিযুগের আত্মায়-আত্মায় মিলনের প্রস্তুতি।

যেখানে অনেক আড়ম্বর
সেখানে বড় সংকীর্ণ
অন্তরে প্রবেশের পথ,
সেই মায়ায় ঘেরা
মনের বাইরে থাকে
জগন্নাথের রথ।[১]

সকলেই ভেবেছিলেন, হিন্দুমতে বিয়ে হবে। কিন্তু প্রভু বলেন, 'ব্রাহ্মণের একটি সংস্কারও যোগজীবনের নেই। জগদ্বন্ধুও নানা অনাচার করেছেন। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া এঁদের হিন্দুমতে বিয়ে হতে পারে না। আর তার সময়ই বা কোথায়?'

ব্রাহ্মপদ্ধতিতে বিয়ে হয়। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন যোগজীবনের বিয়েতে আর রজনীকান্ত ঘোষ শান্তিসুধার বিয়েতে। রজনীবাবুকে নিয়ে কথা উঠতেই প্রভু বলেন, 'আমি তাঁকে ব্রাহ্মণ বলেই জানি।' বিবাহমণ্ডে গোসাঁই উপস্থিত থেকে যোগজীবনকে এক বছরের জন্য ব্রহ্মচর্য দেন। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী সারগর্ভ উপদেশ দেন। এখানে আধুনিক কিছু পদ উদ্ধৃত করলাম।—

কে অন্ধ?—যে মহৎ জীবনকে করে না অনুসরণ।
কে বধির?—যে শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য করে লঙ্ঘন।
কে মূর্খ?—ঈশ্বরকে ভুলে যে সুখের অন্বেষণে ঘোরে।
কে কূপমণ্ডুক?—যে আছে ক্ষুদ্র আমি-তোমার এই স্বার্থের গণ্ডীর ভিতরে।
কে দরিদ্র?—যে সাড়ে তিন হাত শরীরে করে বাস।
কে বন্ধ?—যার রয়েছে যত বেশী উপাধির ফাঁস।
কে অজ্ঞান?—ঘটি, বাটি, মাটির মায়ায় যে ভগবানকে হারায়।
কে ঘাতক?—যে মন থেকে মনে ঘৃণা বিদ্বেষ কুৎসার বীজ বোনে, আনন্দের আলো নিভায়।
কে পাপী?—যার মধ্যে সুন্দর হবার নেই সাধনা।
কে হীন?—যে করে অন্যের অহিত কামনা।
কে হীন বণিক?—যে প্রেমের হাটে যায় কিছু বেচা-কেনার প্রত্যাশায়।

---

[১] শ্রীমৎস্বামী পরমানন্দ সরস্বতী-প্রণীত 'অক্ষর' কাব্যগ্রন্থ হইতে।

কে প্রেমিক?—আত্মদানের আনন্দে যে নিজেকে নিঃশেষে বিলায়।

ঈশ্বরে যার মন।
সহজ তার জীবন॥

যারা ধর্মের কথা শোনে, বলে, কাজে করে না কিছু।
দুর্ভাগ্য বহুরূপে বন্ধুর মত ঘোরে তাদের পিছু পিছু॥

কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি মানুষের জীবন।
যার অভ্যাস সুন্দর, সে পায় দেবতার আসন॥

বৃক্ষের সৌন্দর্য তার পত্র, পুষ্প, ফলে—
মানুষ সুন্দর হয়, সত্য, প্রেম, ত্যাগের অনলে॥[1]

পরাহে উভয় বিবাহ রেজিস্ট্রি হয় কেশববাবুর চেষ্টায় প্রবর্তিত ১৮৭২ সনের ৩ আইনে। ঐদিন সকালে 'শ্রীনাম' কীর্তনে দিব্যভাবপ্রবাহে সকলে হন অভিভূত। নাম-মদিরায় মত্ত হয়ে গোস্বামীপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করে 'হরিনামে'র হুঙ্কার দিতে দিতে সমাধিস্থ হয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে স্থাণুর মত স্থির হয়ে দাঁড়ান। যোগমায়া দেবী তখন রাধাভাবে বিভোর হয়ে মেয়েদের কপালে 'রুলি' দিতে দিতে প্রভুর নিকটে এলে বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয় আবেগভরা কণ্ঠে 'জয় রাধারানী, জয় ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন। এই মর্মস্পর্শী ধ্বনি শুনে যোগমায়া দেবী গোস্বামীপ্রভুর বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হয়ে যান। মুক্তকেশী দেবী ও কুঞ্জ ঘোষের শাশুড়ী গোসাঁইর বাঁ হাত যোগমায়া দেবীর বাঁ কাঁধে সন্তর্পণে তুলে ধরেন ও তাঁর ডান হাতখানা প্রভুর ডান কটিদেশে রাখেন। এই সময় সুকণ্ঠ গায়ক চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় গান ধরেন—

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে—আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নইলে শুধুই মদন॥
শুক বলে—আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে—আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নইলে পারবে কেন বল॥
শুক বলে—আমার কৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরপাখা।
শারী বলে—আমার রাধার নামটি তাহে লিখা,
নইলে শুধু পাখীর পাখা॥

গান বড় জমে ওঠে। মহাভাবের আবেশে সকলে অভিভূত হয়ে পড়েন। চিন্তাহরণবাবুর গান শেষ হতে না হতে মাতঙ্গিনী দেবীর মধ্যে গোপীভাবের স্ফুরণ হয়। তিনি জলভরা কলসী কাঁখে নিয়ে অভিনব নৃত্যের ভঙ্গিতে জীবন্ত যুগলবিগ্রহের পরিক্রমা করে, উভয়ের চরণজোড়া ধুয়ে মুছে আবার নেচে নেচে গান—

---

[1] শ্রীমৎস্বামী পরমানন্দ সরস্বতী-প্রণীত 'অক্ষর' কাব্যগ্রন্থ হইতে।

হরি বলব আর মদনমোহন হেরব গো।
আমি যাবো ব্রজেন্দ্রপুর, গোপীপায় হব নূপুর,
আমি রাঙা পায়ে রুনুঝুনু বাজব গো।
তোমরা সব ব্রজবাসী, আমায় কর এ আশিষ,
আমি নিতুই নিতুই শ্যামের বাঁশি শুনব গো॥

গান শুনে শ্রোতাদের মধ্যে হয় বিচিত্র ভাবসঞ্চার; ঘন ঘন উলুধ্বনি হয়, আর 'রাধে রাধে গোবিন্দ' রব উঠে। লুটিয়ে পড়েন পরশুরাম প্রভুজীর পায়। তাঁর সর্বাঙ্গে পুলক, কম্পন, শিহরণ, আর গন্ড বেয়ে বিগলিত ধারা। তিনি বলেন, 'গোসাঁই, তুমি ধরা পড়ছ। তুমি মাধবরে লগে লগে লইয়া বেড়াও। কি বাহারের চূড়া! কি সুন্দর বনমালা! আ মরি, মরি!' বারবার তিনি প্রভুর পদধূলি নিয়ে সর্বাঙ্গে মাখেন। প্রভু ও যোগমায়া দেবীর সম্বিত ফিরে আসে।

কীর্তনান্তে শুরু হয় অন্ন-মহোৎসব। সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা। আহ্বান-আপ্যায়নের কেউ অপেক্ষা রাখেন না। আসনের ধার ধারেন না। একটু স্থান সংকুলান হলেই হল। মাটির উপরই বসে পড়েন। স্বার্থবুদ্ধির লেশ নেই। অপরের প্রীতির জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। দিনভর পংক্তিভোজন চলে। সন্ধ্যার পর আশ্রমবাসী ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে নগেনবাবু ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম আহারে বসেন। দই পূর্বেই নিঃশেষ। নগেনবাবু শিবনাথবাবুকে রগড় করে বলেন, 'দই না খেয়ে উঠছি না আজ।' গোসাঁইর কানে যেতেই তিনি যোগমায়া দেবীকে গিয়ে বলেন, 'দেখত কোনও হাঁড়িতে একটু দই আছে কিনা!' যোগমায়া দেবী একটি ভান্ড এনে দেন, তাতে দুইজনের উপযোগী দই রয়েছে। পংক্তিতে তখন শতাধিক লোক। কাপড় দিয়ে হাঁড়ি ঢেকে গোসাঁই দই পরিবেশন করতে থাকেন। অপূর্ব স্বাদ! সকলেই আরও চান। প্রভু দিতে থাকেন, যে যত চান। যাঁরা পূর্বে বসে দই পান নি তাঁরাও এসে অঞ্জলি ভরে দই নেন। তারপর চলে দধি-মহোৎসব। দই-এর উপর গড়াগড়ি।

প্রসাদ পাবার পর গা-হাত-মুখ ধুয়ে নগেনবাবু প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কিভাবে আজ সম্ভব হল?' গোসাঁই বলেন, 'আপনারা যোগৈশ্বর্য তো বিশ্বাস করেন না। পরমহংসজী সামান্য মাত্র আপনাদের দেখালেন।'

শ্যামসুন্দর দর্শন, শান্তিপুরে নবদম্পতী, পরে কলিকাতায় অবস্থান

চৈত্র মাসে (১২৯৫) গোস্বামীপ্রভু যান রামপুরহাট। সঙ্গে মহেন্দ্র মিত্র ও শ্যামাকান্ত পন্ডিত। তাঁদের আগমনে ভাবের বন্যা বয়ে যায়। গ্রামবাসীরা বিষয়-কর্ম ছেড়ে মেতে ওঠে কীর্তন-মদিরায়। একদিন সংকীর্তন-পরিক্রমা বের হয়; এক সাধু এসে যোগ দেন। তিনি প্রভুকে ঘিরে অপূর্ব নৃত্য করেন আর পথে গড়াগড়ি দেন; হরিলুটের পর আর মিলে না তাঁর হদিস্। পূর্বে রামপুরহাটে কেউ কখনও তাঁকে দেখে নি। রামপুরহাট থেকে গোসাঁই যান শান্তিপুর। যোগজীবন আর শ্রীধর আসেন ঢাকা থেকে।

প্রচন্ড গ্রীষ্ম। রোদের এমনই তেজ যে, বেলা হতে না হতে পথ-ঘাট তেতে ওঠে। প্রত্যুষে আঁধার থাকতে গোসাঁই শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে প্রাণায়াম

করেন। ঊষার অস্পষ্ট আলোয় গঙ্গার অপরূপ শোভায় মন-প্রাণ ভরে ওঠে। শীতল সমীরে শরীর হয় স্নিগ্ধ। অবগাহন স্নান করে রোদের তাপ বেশী না হতে তাঁরা গৃহে ফিরেন। বাল্যভোগের সঙ্গে চা পান করেন, তারপর নিত্যপাঠ শুনেন। মধ্যাহ্নে শ্যামসুন্দরের ভোগের প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করেন, অপরাহ্ণে ভাগবত পাঠ করেন। একদিন মহেন্দ্র মিত্র ছাড়া সেখানে দ্বিতীয় শ্রোতা নেই। তিনি পরে সতীর্থদের বলেন, 'কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুম ভাঙ্গতে দেখি গোসাঁই পাঠ বন্ধ করে আমাকে বাতাস করছেন। ইচ্ছা করে পাশ ফিরে শুয়ে থাকি। ভাবি, এমন সৌভাগ্য আমার! বাপ সোহাগ কচ্ছেন, করুন না! ঘাম মজতেই ফের তিনি পাঠ শুরু করেন। তখন উঠে বসি।'

দেখতে দেখতে ১২৯৬ সালের নববর্ষ আসে। বৈশাখের এক শুভদিনে যোগমায়া দেবী আসেন শান্তিপুরে—সঙ্গে মা, শান্তিসুধা, বসন্তকুমারী, প্রেমসখী ও জগবন্ধু। নবদম্পতিদের নিয়ে আতাবুনিয়া গোসাঁই-বাড়ীতে কয়েক-দিন ধরে চলে আনন্দ-উৎসব।

এই সময় একদিন ঘর্মাক্ত কলেবরে বাগেরহাট থেকে রেবতীমোহন সেন আসেন গোস্বামীপ্রভুর কাছে। গোসাঁই হাতপাখা নিয়ে নিজের হাতে তাঁকে বাতাস করেন। যোগমায়া দেবী সরবৎ এনে দেন। এঁটো গ্লাস তিনি নিজের হাতে নিয়ে যান। ঢাকায় কুলদাকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন রেবতীমোহন; তিনি সুগায়ক। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে কতদিন এসে গোস্বামীপ্রভুকে কীর্তন শুনিয়েছেন। তাঁর গানে গোসাঁইও অভিভূত হয়ে পড়েন। সাধন পাবার পর কুলদাকান্ত ভাবেন, রেবতী-মোহনও প্রভুর কাছে সাধন যদি পান তাহলে বেশ হয়। এক বছর কেটে যায়। তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে কুলদাকান্ত এ-বিষয়ে তাঁকে কিছু বলেন না। একদিন পথে দুজনের দেখা হলে রেবতীমোহন তাঁকে গোস্বামীপ্রভুর সাধন নিয়ে নানা প্রশ্ন করেন। তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করে কুলদাকান্ত গোসাঁইর কাছে সাধন নিতে তাঁকে পীড়াপীড়ি করেন। রেবতীবাবু বলেন, 'দীক্ষা নিতে আমারও খুব ইচ্ছা আছে, তবে আরও কিছুদিন দেখে-শুনে নিতে চাই। আর আমি দীক্ষা নিতে চাইলেই কি তিনি দিবেন?' এই কথাবার্তা ১২৯৪ সালের মাঘ মাসে হয়। এর পরই রেবতীবাবু ঢাকা ছেড়ে যান। তিনি এবার এসে গোসাঁইর কাছে সাধন প্রার্থনা করেন। ঐ সময় শান্তিপুরেই সাধন হয়। তখন তিনি বাগেরহাটে পনর টাকা বেতনে পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন।[১]

চাঁদিনী রাত। ছাদের উপর নামানন্দে ডুবে আছেন প্রভু। জগবন্ধু গোসাঁইর চোখে পড়ে, প্রভুর জটার উপরে এক সাপ বসে আছে, উদ্ধত ফণা। ছুটে যান তিনি নীচে। মুখ-চোখ ফ্যাকাসে। কথা ফুটে না মুখে। যোগমায়া দেবী শুধান, 'কি হয়েছে, বাবা যোগীন?' ভীত শঙ্কিত যোগীন বলেন, 'কাকা মহাশয়ের মাথার উপর প্রকান্ড এক গোখরা সাপ। কি করি কাকীমা?' কোন অধীরতা প্রকাশ না করে যোগমায়া দেবী বলেন, 'ভয় নেই বাবা। ওঁর গায়ে, মাথায় মধ্যে মধ্যে সাপ ওঠে। কোন অনিষ্ট করে না।' ছাদে ফিরে গিয়ে তিনি দেখেন সাপ তখনও মাথার উপর; গোস্বামীপ্রভু যেন জীবন্ত মহাদেব! সাপটি খানিকবাদে নেমে চলে যায়।

একদিন অপরাহ্ণে শান্তিপুরের দু মাইল উত্তরে অদ্বৈতপ্রভুর তপস্যার স্থান

---

[১] প্রভুপাদ শান্তিসখা গোস্বামীর নিকট শ্রুত। রেবতীবাবু নিজে তাঁকে বলেছেন।

বাবলায় যান গোস্বামীপ্রভু সংকীর্তনের দল নিয়ে। চৌদ্দটি মাদল ও করতাল-জোড় নিয়ে বহু ভক্ত যান সঙ্গে। বাড়ীর কুকুর ‘কেলে’ও চলে। এর স্বভাব অসাধারণ। সে কোনদিন আমিষ বা উচ্ছিষ্ট খেত না। শ্যামসুন্দরের মন্দির সে নিত্য পরিক্রমা করত। খোল-করতালের ধ্বনি শুনতে পেলেই সে এসে হাজির হত। মধ্যে মধ্যে তার অশ্রু কম্পন হত। প্রভু বলেন, ‘কেলেকে দিয়ে কোন বিশেষ কাজ হবে।’ এবার বাবলায় গিয়ে এক জায়গায় সে মাটি খুঁড়তে থাকে। প্রভুর কাছে বারবার গিয়ে কি যেন বলতে চায়। কোদাল সংগ্রহ করে ঐ স্থানটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটি পিতলের বড় হাঁড়ি বের হয়। এর ভিতর অদ্বৈতপ্রভুর নাম খোদাই করা একজোড়া খড়ম, একটি মাটির করোয়া ও পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। প্রভু পাদুকা মাথায় নিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন, কেলেও অচৈতন্য। বহু সময় নাম শোনাবার পর কেলের চৈতন্য ফিরে আসে। গোসাঁই তাকে বুকে জড়িয়ে বলেন, ‘যে কার্যের জন্য তুমি এসেছিলে আজ তা সম্পন্ন হল। এখন তুমি গঙ্গালাভ কর।’ পরদিন প্রাতে শান্তিপুরে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে দেখা যায় এক হাঁটু জলে কেলের মৃতদেহ ভাসছে। প্রভু নিজের হাতে গঙ্গাতীরে কেলের দেহ সমাহিত করেন।

কলিকাতার শিষ্যেরা মিলে ৫০।১ সুকিয়া স্ট্রীটে ছোট একখানা দোতলা বাড়ী ভাড়া করেন চার মাসের জন্য। প্রভুর শিষ্যা, রাখালবাবুর কন্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ। তাঁরই আগ্রহে বাড়ী ভাড়া করা হয়। বাড়ী ভাড়ার সব টাকাটা তিনি মিটিয়ে দেন আগেই। আষাঢ় মাসে (১২৯৬) গোসাঁই সপরিবারে কলিকাতা এসে ঐ বাড়ীতে ওঠেন।

১২৯৬ সালে ঝুলন-পূর্ণিমার দিন এই গৃহেই প্রভু ডোর-কৌপীন আর বহির্বাস ধারণ করেন। ঐদিন থেকে তিনি নিজের হাতে চিঠিপত্র লেখা ছাড়েন। পুত্রবধূ বসন্তকুমারীরও ঐ দিনটিতে সাধন হয়। এই বাড়ীতে আরও অনেকে তাঁর কাছে সাধন পান। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা সহোদরা স্বর্ণকুমারী দেবীও এখানেই প্রভুর কাছে সাধন পেয়েছিলেন। কুলদাকান্তের মেজদা বরদাকান্তও কলিকাতায় এসে এই গৃহেই সাধন লাভ করেন।

কলিকাতায় বেশ গরম। বর্ষার কোন লক্ষণই নেই। যোগমায়া দেবী সারাদিনের পরিশ্রমের পর গোসাঁইকে রাতভর বাতাস করেন, কখনও বা অবশ দেহ ঘুমের চোখে এলিয়ে দেন তাঁর আসনের পাশে। ধ্যান ভাঙতেই গোসাঁই যোগমায়া দেবীর মাথা তুলে ধরেন সন্তর্পণে তাঁর হাঁটুর উপর। গোসাঁইর দেহ থেকে সময় সময় এক অপূর্ব মধুর ধ্বনি শোনা যায়। বৃন্দাবনবাবু তা নিজের কানে শোনার জন্য গভীর রাতে আসন-ঘরে চুপিচুপি প্রবেশ করেন। সাষ্টাঙ্গ দিয়ে কান পেতে থাকেন। প্রভু খানিক বাদে মাথা খাড়া করে বলেন, ‘কি বৃন্দাবন? শুনলে তো!’

‘হ্যাঁ, অভিনব ধ্বনি। বড়ই মধুর। এমনটি জগতে বিরল। এ কিসের ধ্বনি, প্রভো?’ ‘একে অনাহত ধ্বনি বলে। সাধকদের ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থান থেকে এ ধ্বনি বের হয়। এ এত মধুর যে, সাপও এতে আকৃষ্ট হয়ে শরীর বেয়ে মাথায় ওঠে।’

সত্যকুমার গুহঠাকুরতার দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাঁর সহধর্মিণী যোগমায়াও সাধন পাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। স্বামীকে বার বার তিনি অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি বলেন, ‘সময় হলে গোসাঁই নিজেই দিবেন। আমি তাঁকে বলব না।’ যোগমায়া কি আর করেন, একদিন কাউকে না জানিয়ে ঠিকানা সংগ্রহ করে

প্রভুর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করে চিঠি লিখেন। ঝুলনের পূর্বে এই বাসায়ই সেই চিঠি আসে। প্রভু স্বহস্তে লিখে পাঠান—'মা, যাঁদের স্বামী এই সাধন পেয়েছেন, তাঁরাও এই সাধন পাবার অধিকারী, তুমি এলেই সাধন পাবে।' চিঠি পেয়ে যোগমায়া গুহঠাকুরতার আনন্দ আর ধরে না। পিতার সম্মতি নেই; সাধন নিয়েছেন বলে তিনি জামাতার প্রতি অপ্রসন্ন। পূজায় শ্বশুরবাড়ী যাবার নাম করে যোগমায়া ভাশুরের বাসায় যান। সত্যকুমারকে পীড়াপীড়ি করে ধরে তাঁকে নিয়ে কলিকাতা গিয়ে সুকিয়া স্ট্রীটের এই বাড়ীতে ওঠেন। স্থানাভাব দেখে সত্যকুমার মেসে ওঠেন। যোগমায়া দেবী, প্রেমসখী ও বসন্তকুমারীর ঘরে সত্যকুমারের স্ত্রীর থাকার ব্যবস্থা করেন। গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'পূজায় শ্বশুরবাড়ী থাকবে বলে যখন বাবাকে বলেছ, তখন পূজায় দেশের বাড়ীতে যাওয়া ভাল।' চতুর্থ দিনে তাঁকে বরিশাল ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। তারপর বলেন, 'বাপের মনে দুঃখ দিয়ে সাধন নেওয়াও ঠিক হবে না। তাছাড়া শুভ সময়ও এর মধ্যে দেখছি না।' সত্যকুমার-জায়া মরমে মরে যান। দশ মাসের সন্তানটির মুখে ভাত দেবার জন্য গোসাঁইকে ধরেন। 'যাবার দিনেই হবে' বলে প্রভু বলেন। যোগমায়া দেবীর হাতে ফুল-চন্দন সন্দেশের থালা দেখে প্রেমসখীকে জিজ্ঞাসা করেন নবাগতা, 'মা-ঠাকুরাণীর হাতে এ-সব কেন?' তিনি বলেন, 'মা বাবাকে পূজা না করে কিছু গ্রহণ করেন না।' যোগমায়া গুহঠাকুরতা সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে এই গুরুপূজা দেখেন। যোগমায়া দেবী সাষ্টাঙ্গ দিতেই উভয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন।

যাবার দিন, ভোর চারটায় যোগমায়া গুহঠাকুরতার খোঁজ পড়ে। তখনই সাধন হবে। শৌচ থেকে এসে কাপড় বদলাতে বদলাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে গোসাঁইর কথা তাঁর কানে যায়, 'হল না, হল না, সময় বয়ে গেল—কাপড় ছাড়ার প্রয়োজন নেই।' দিশেহারা হয়ে সত্যকুমারের স্ত্রী প্রভুর পাতা আসনে গিয়ে বসে পড়েন। গোসাঁইকে প্রণাম করারও সময় হয় না। ঐ মুহূর্তেই নাম দিয়ে প্রভু প্রাণায়াম দেখিয়ে দেন। নামের অর্থ বুঝিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে কিভাবে জপ করতে হবে প্রভু দেখিয়ে দেন। বিধি-নিষেধ সত্যকুমার থেকে জেনে নিতে বলেন তাঁকে। স্বামী এসে সব শুনে বলেন, 'তোমার সৌভাগ্যের তুলনা নেই।' যোগমায়া দেবী মিষ্টান্ন ভোগ দেন। তা দিয়ে গোসাঁই সত্যকুমারের কন্যার মুখে ভাত দেন। আকারে-ইঙ্গিতে বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে জানাজানি হয় বসন্তকুমারী, প্রেমসখী ও যোগমায়া গুহঠাকুরতাকে প্রভু একই নাম দিয়েছেন।

এই সময় পূর্ববাংলার এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন প্রার্থনা করে কলিকাতা আসার অনুমতি চান। তিনি বলেন, 'আসতে কি বাধা? তবে আমার এখানে তাঁর কোন প্রয়োজন নাই।' শিষ্যেরা ভদ্রলোকটির নানা সদ্‌গুণের সুখ্যাতি করেন। প্রভু তাঁদের বলেন, 'যাঁদের সাধন পাবার কথা, তাঁরা ঠিকই পাবেন। এরূপ কেউ যদি আমার কাছে না-ও আসেন, আমি নিজে তাঁর কাছে গিয়ে দীক্ষা দিয়ে আসব।'

এই গৃহে একদিন শান্তিসুধার দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রভু বলেন, 'শান্তি, বল্ তো তুই কি চাস্—ঐশ্বর্য না ফকিরি? যা চাইবি, তা-ই পাবি! যদি ঐশ্বর্য চাস্ তাহলে তোর অতুল ধন-দৌলত হবে। এতে ধর্মলাভে সামান্য বিলম্ব হবে। তুই যে অবস্থা লাভ করতে চাস্ তা পেতে বছর বার বেশী লাগবে।' তিন বার তিনি এই প্রশ্ন করেন। তিন-তিন বারই শান্তিসুধা বলেন, 'আমি ঐশ্বর্য চাই

না বাবা, ফকিরি-ই চাই।' গোসাঁই বলেন, 'তোর নাম ফকিরি-খাতায় লিখা হল।'

আকাশে মাথা উঁচু করা বাড়ি
বারান্দায় দাঁড়ানো দামী গাড়ি—
মোটা টাকার অঙ্ক জমার খাতায়
দিন-রাত কাটে মসৃণ সুখের বাসায়।
এই নিয়ে বড় হয় না মানুষ।
এতে বাড়ে অকারণ অভিমান, অহংকার
বহু থেকে, বিরাট থেকে হয় সে বিচ্ছিন্ন
অন্ধ অহংকারের কূপে
জীবন হয় নিরানন্দ জীর্ণ
মানুষ বড় হয় ত্যাগে ও প্রেমে, তার মহৎ গুণে,
আত্মার সম্পদে শ্রদ্ধার আসন পায় অন্যের মনে।[১]

নানকপন্থী এক সাধু আসেন প্রভুকে দর্শন করতে। কথায় কথায় বলেন, তিনি করকোষ্ঠী করতে জানেন। শান্তিকে ডেকে পাঠান গোসাঁইজী। তাঁর হাতের রেখা বিচার করে সাধু বলেন, 'তোমার কয়েকটি ছেলে হবে, মা।' শান্তি অপ্রতিভ হয়ে বলেন, 'সন্তান আমি চাই না। পুত্রে আমার প্রয়োজন নেই।' গোসাঁই বলেন, 'ও কথা বলিস না, শান্তি। জানিস এবার দৌহিত্র দ্বারা আমার বংশ রক্ষা পাবে।' একথা শুনে সকলে হন বিমর্ষ। এই গৃহেই একদিন সমাধিস্থ অবস্থায় প্রভু বলে ওঠেন, 'খ্রীস্টানের ন্যায় বিশ্বাসী, বৈষ্ণবের ন্যায় ভক্ত ও মুসলমানের ন্যায় নিষ্ঠাবান হও।'

রামকৃষ্ণদেবের অনুগত শিষ্য ছিলেন ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত। তিনি ছিলেন নরেন্দ্রনাথের (পরবর্তী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের) আত্মীয়। তিনিই রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। পরমহংসদেবের দেহরক্ষার পর তাঁর চিতাভস্ম সংগ্রহ করে মানিকতলায় কাঁকুড়গাছিতে স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে তিনি সমাধি-মন্দির নির্মাণ করান। তিনি প্রভুকে এসে ধরেন—তাঁকে একদিন ওখানে নিয়ে যাবেন। পরের রবিবার সশিষ্য গোসাঁই যাবেন বলে কথা দেন। রামবাবু যানের ব্যবস্থা করে তাঁকে নিয়ে যান। ওখান থেকে প্রভু ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে যাবেন বলে স্থির করেন।

রামকৃষ্ণদেব গোসাঁইর কাছে প্রকাশিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। আর কারও চোখে পড়ে না। ফিরার সময় রামকৃষ্ণদেব গোসাঁইকে বলেন, 'আজ আর সমাজে যেও না। বেঙ্গল থিয়েটারে গিয়ে "প্রভাস-মিলন" দেখ, আনন্দ পাবে।' রামবাবু এসব কথা প্রভুর মুখে শুনে আনন্দে হন আত্মহারা। তিনি বলেন, 'ঠাকুর তাহলে কৃপা করে এখানে রয়েছেন।'

শিশিরকুমার ঘোষের ভাগ্নে রঞ্জনবিলাস রায়ের সাধন হলে গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'যে বস্তু আপনাদের দেওয়া হল তা ময়রার দোকানের রসের শিরার মত। শিরা যেমন জিলাপি, অমৃতি, পান্তুয়া, রসগোল্লা, গজা, সব কিছুতেই চলে—ঐরূপ সকল সম্প্রদায়ের লোকই স্বধর্মে থেকে এই সাধন নিতে পারেন।'

জগদ্বন্ধুবাবুর ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ায় শান্তিসুধাকে নিয়ে তিনি দ্বারভাঙ্গা

---

[১] শ্রীমৎস্বামী পরমানন্দ সরস্বতী-প্রণীত 'অক্ষর' কাব্যগ্রন্থ হইতে।

যাত্রা করেন। ঐখানে তিনি শিক্ষক ছিলেন।

বহুদিন রোগভোগের পর শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একেবারে মরণাপন্ন। চিকিৎসায় সুফল হয় নি। একদিন মৃত্যুর লক্ষণ সব প্রকাশ পায়। তিনি কাতর হয়ে বলেন, 'আমার মৃত্যু আসন্ন; একবার গোসাঁইকে শেষ দর্শন করার বড় সাধ হয়।' রাত দুটায় কুঞ্জ গুহঠাকুরতা ছুটে এসে প্রভুকে খবর দেন। তিনি বলেন, 'শ্রীশকে গিয়ে বল কোন ভয় নাই। সে ভাল হয়ে যাবে।' শ্রীশ আরোগ্যলাভ করেন।

এর পরই কুঞ্জবাবুকে জ্বরে ধরে। গঙ্গাস্নান করে ফিরার পথে কুঞ্জ গুহঠাকুরতাকে দেখে প্রভু জিজ্ঞাসা করেন, 'কে চিকিৎসা করেন?' তিনি নামজাদা এক চিকিৎসকের নাম করেন। গোসাঁই বলেন তাঁকে, 'ডাক্তারের সাধ্য নাই তোমার রোগ সারান। দেখলে না শ্রীশের রোগ কেউ সারাতে পারল না। নামের আশ্রয় নিয়ে পড়ে থাক।' অচিরে কুঞ্জবাবু ভাল হয়ে উঠেন।

নামের আগুন নাশে পুঞ্জীভূত অমঙ্গল রাশি;
অন্তর-অঙ্গন ওঠে আনন্দের আলোয় উদ্ভাসি।[১]

প্রভুপাদ এই সময় একদিন জোড়াসাঁকো গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সঙ্গে যান নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত, কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতা, বৃন্দাবন মজুমদার ও পণ্ডিত মহাশয়। মহর্ষি গোসাঁইকে সমাদর করে পাশে বসান এবং নগেনবাবু ও শিষ্যদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি শান্তিনিকেতনে আশ্রম-প্রতিষ্ঠা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে তিনি বলেন, 'গোসাঁইকে নিয়মাবলী পড়ে শোনাও।' প্রিয়নাথবাবুর পড়া শেষ হলে প্রভু মন্তব্য করেন, 'ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী কোন সাধুর শান্তিনিকেতনে থাকার ব্যবস্থা হয় নাই। যাতে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সাধুরা আপন আপন বিশ্বাস-মতে সাধন-ভজন করতে পারেন—এই রকম হলে আশ্রমের উদ্দেশ্য সার্থক হয়; বাংলাদেশে ওরকম আদর্শের কোন প্রতিষ্ঠান নাই।' এই উদার প্রস্তাব শুনে মহর্ষি বলেন, 'সাধু, সাধু, অতি সুন্দর কথা। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ট্রাস্টিগণ এতে সম্মত হবেন না।' দেবেন্দ্রনাথ এই মহৎ অনুরোধ একেবারে উপেক্ষা করেন নি। পৌষ-মেলার নিয়মাবলীতে সকল সম্প্রদায়ের সাধুসমাগমের ব্যবস্থা থাকে।

এর কিছুদিন পর শান্তিনিকেতন আশ্রম-প্রতিষ্ঠা-উৎসব হয় বোলপুরে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত থাকেন। তিনি ফিরে এসে গোসাঁইকে বলেন, 'ভাণ্ডারে পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য থাকা সত্ত্বেও দূর-দূরান্ত থেকে আগত শত শত লোক অভুক্ত ফিরে যায়; খাবার চেয়েও পায় না।' এই বৃত্তান্ত শুনে প্রভু মর্মাহত হয়ে বলেন, 'ভাণ্ডারে যথেষ্ট খাদ্যবস্তু থাকা সত্ত্বেও উৎসবে আগত ক্ষুধার্ত লোকেরা খেতে পায় না—এ কি রকম কথা? আমি থাকলে ভাণ্ডার লুঠ করে বিলিয়ে দিতাম।' নগেনবাবু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন, 'পরের ভাণ্ডার লুঠ করতেন?' প্রভু সহানুভূতি-মাখা তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলেন, 'লোকে ক্ষুধায় ক্লেশ পাবে ক্ষুধার সামগ্রী সম্মুখে রেখে, আপনি কি বলতে চান আমি চুপ করে বসে দেখব?'

---

১. শ্রীমৎস্বামী পরমানন্দ সরস্বতী-প্রণীত 'অক্ষর' কাব্যগ্রন্থ হইতে।

কুলীনগ্রামের রামানন্দ বসু, ওরফে সত্যরাজ খান। মহাপ্রভু তাঁকে দিয়েছিলেন জগন্নাথদেবের পট্টডোরী জোগাবার অধিকার। তাঁরই দশম বংশধর হরিদাস বসু ছিলেন বোলপুরের নামকরা উকিল—ব্রাহ্মভাবাপন্ন। লর্ড সত্যপ্রসন্ন সিংহের ভাগ্নি সুশীলা গেছেন রায়পুর। স্বামী যাবেন বিলাত। হঠাৎ সুশীলাকে কেমন যেন মনে হয়। আর কেউ যেন তাঁর ভিতর থেকে কথা বলে। স্বামী, হেমেন্দ্রনাথ সুশীলাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান। হরিদাসবাবুও সেখানে গিয়ে মিলেন। কোর্ট তখন বন্ধ। সুশীলাকে দেখে মনে হয় যেন পথভোলা কোন দেববালা। তাঁর হাত ধরে বৃত্তাকারে বসে করেন ওঁরা ব্রহ্মোপাসনা। সুশীলা মধ্যে মধ্যে ফিরে আসেন নিজের মধ্যে।

এক রজনীতে সুশীলাকে কথাবার্তায় বিজ্ঞ ও মার্জিত বোধ হচ্ছিল। তাঁরা কিছু অনুমান করে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?' সুশীলা নিরুত্তর।

—'কেন এঁর উপর ভর করেছেন?'

—'আপনাদের কল্যাণের জন্য।'

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। হেমেনবাবু হরিদাসবাবুকে ডেকে পাঠান। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল সুশীলারই আহ্বান। হরিদাসবাবু কাছে গেলে তাঁকে বলেন, 'আপনি যোগসাধন করুন, আপনার কল্যাণ হবে।' 'আপনি-ই শিখান'—সুশীলার উদ্দেশে হরিদাসবাবু বলেন। উত্তর আসে—যাঁরা দেহে নেই তাঁদের যোগ শিখাবার নিয়ম নেই। আপনি পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছ থেকে যোগসাধন নেন। তিনি এখন রয়েছেন কলিকাতায়—৫০।১, সুকিয়া স্ট্রীটে।

সুশীলা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে যান। মধ্যে মধ্যে শুধু এই সাধু-আত্মাটির আবেশ হয়। হেমেনবাবু সস্ত্রীক ফিরে যান কলিকাতায়। হরিদাসবাবুকেও কলিকাতা যেতে হয় তাঁর কাজে। হেমেনবাবুর অনুরোধে হরিদাসবাবু তাঁর বাড়ীতেই ওঠেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও আসেন ঐদিন ঐ বাসায়।[১] সে সময়টা ১২৯৬ সালের আশ্বিন মাস; আলাপ হয় সুশীলার কথা। হরিদাসবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন সুশীলা, 'বিজয়কৃষ্ণের কাছে গেলেন না?' পরাহ্নেই যান তিনি সুকিয়া স্ট্রীটের ঠিকানায়। বৃন্দাবন মজুমদার সিঁড়ি দেখিয়ে উপরে তাঁকে গোসাঁইর ঘরের সন্ধান বলে দেন। দোতলায় উঠে দেখেন, মৃগচর্মের উপর হাতে ঠেস দিয়ে অর্ধশয়ান প্রকাণ্ড দেহ, মাথায় জটা-ভার—মনে হয় যেন চিত্রপটের মহেশ্বর মূর্তি। প্রভু আগন্তুককে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি চান?' ব্যবহারিক ঢঙে হরিদাসবাবু বলেন, 'আপনার কৃপা।' গোস্বামীপ্রভু প্রশ্ন করেন, 'সাধন নেবেন?' হরিদাসবাবু উত্তর দেন, 'হ্যাঁ।' যদিও সাধনের কোন আগ্রহ তাঁর ছিল না, তথাপি তিনি ঐ রূপ বলেন। গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'আমার গুরুজীর অনুমতি ছাড়া হবে না।'

—তিনি এখন কোথায়?

—মানস-সরোবরে। আচ্ছা, আপনি পাশের ঘরে গিয়ে একটু বসুন। পাশের ঘর থেকে শোনা যায় গোসাঁইর উদাত্তকণ্ঠে 'জয় গুরু, জয় গুরু!' মিনিট দুই পরে তিনি হরিদাসবাবুকে ডেকে পাঠান, এবং তাঁকে বলেন, 'আজই রাত আটটায়

---

১. হরিদাস বসু-প্রণীত 'মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা', ২য় সংস্করণ, পত্রাঙ্ক ২৩

আসবেন।'

সন্ধ্যার পূর্বে হরিদাসবাবু মনে মনে স্থির করেন, 'অচেনা জায়গা। আগামী দিন বরং সকালবেলা যাব।' সাধন নেবার সময়ের উপর গুরুত্বের কথা তাঁর জানা নেই। পরদিন বেলা আটটায় গিয়ে তিনি উপস্থিত। বিরক্ত হয়ে তাঁকে গোসাঁই ফিরিয়ে দেন। হরিদাসবাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। ঐ দিনই হরিদাসবাবু বোলপুরে ফিরে যান। কয়েকদিন বাদে ফের আসতে হয় তাঁকে কলিকাতা। আদেশের ভঙ্গিতে সুশীলা বলেন, 'আজই যান গোসাঁইর কাছে; যদি তিনি অমত করেন তাহলে বলবেন, অঘোরনাথ গুপ্ত পাঠিয়েছেন।' হরিদাসবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'সাধু অঘোরনাথ?' ফিক করে হেসে ওঠেন সুশীলা। কি আর করেন, হরিদাসবাবু ঐ দিনই আবার যান সুকিয়া স্ট্রীটের সেই বাড়ীতে। প্রভুকে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বলেন, 'আপনি আবার কেন?' হরিদাসবাবু বিনীত হয়ে বলেন, 'সাধু অঘোরনাথের নির্দেশে এসেছি।' একথা শুনে গোস্বামীপ্রভু হেসে বলেন, 'আচ্ছা খবর পাবেন যথাসময়ে।'

বোলপুর ফিরে যাবার কয়েকদিন পর তিনি যোগজীবন গোস্বামীর চিঠি পান। 'আগামী কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে আপনার সাধন হবে।' ২ কার্ত্তিক হরিদাসবাবু কলিকাতা এসে দেখা করেন। ৩ কার্ত্তিক, ১২৯৬ সালে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি সাধন পান।

কাশী ও ফয়জাবাদ হয়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা

পাঁচ মাস হয়ে যায় এ বাড়ীতে। বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে। মণি মজুমদারকে গোসাঁই বলেন, 'কম ভাড়ায় একটি বাড়ী দেখ। খোলার ঘর হলেও হয়।' পরদিন ভোরে গোসাঁই শ্রীধরকে সঙ্গে নিয়ে বের হন। সবাই ভাবেন গোসাঁই গেছেন বুঝি বা বেড়াতে। দশটা বেজে যায়। খবর আসে গোসাঁই শান্তিপুর চলে গিয়েছেন। 'ঠাকুরমার বাড়াবাড়ি কিছু নয় তো?' সতীর্থরা অনুমান করেন। বাড়ী ভাড়া সমেত বাজার-দেনা মোট আশি টাকা চুকিয়ে দেন পশুপতি মুখোপাধ্যায়। ঐ দিনই বাড়ী খালি করে যোগমায়া দেবী, যোগজীবন ও কুঞ্জ গুহঠাকুরতাকে নিয়ে শান্তিপুর যাত্রা করেন। সঙ্গে মুক্তকেশী দেবী, বসন্তকুমারী, কুতুবুড়ী। স্বর্ণময়ী দেবীর তখন টাল সামলান দায়। উৎকট উন্মাদ অবস্থা। পায়খানা করে কখনও বা ঘরের মেঝেতে, কখনও বা প্রাচীরে লেপেন। যোগমায়া দেবী নিজের হাতে সব পরিষ্কার করেন। রোজ রোজ এই অনাচার সহ্য হয় না মুক্তকেশী দেবীর। তাই দু কথা তিনি শোনাতে ছাড়েন না। স্বর্ণময়ী দেবী ক্ষেপে ওঠেন। প্রভু আসনে উপবিষ্ট থেকেই বলেন, 'মাকে দোতলায় আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। মার সেবাশুশ্রূষা আমিই করব।' যোগমায়া দেবী তাঁকে বলেন, 'আমি থাকতে তা সম্ভব নয়। মা যে কেন গায়ে পড়ে কথা বলেন? দেখতে পাচ্ছেন উনি কেমন অস্বাভাবিক!'

স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী ঐ সময় গোসাঁইর কাছে প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'এখনই তুমি কাশী চলে যাও। ওখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে অযোধ্যায় যেও। ওখানে দেখা না হলে শ্রীবৃন্দাবনে হবে।' প্রভু তাঁর গুরুর এই আদেশের কথা ব্যক্ত না করে যোগমায়া দেবীকে বলেন, 'আমি এখনই কাশী চলেছি; রেলভাড়ার জন্য আটটি টাকা দাও।' এ কথা শুনে যোগমায়া দেবী যেন আকাশ থেকে

পড়েন। তিনি নানা ওজর-আপত্তি তুলেন। কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন। এর পর যোগমায়া দেবী বলেন, 'তাহলে আমিও যাব।' প্রভু উগ্রমূর্তি ধারণ করে ট্রাঙ্কের উপর দণ্ডদ্বারা মৃদু আঘাত করেন। যোগমায়া দেবী চাবির গোছা তাঁর সামনে রেখে বলেন, 'বাক্সটি ভাঙবেন না।' আটটি টাকা নিয়ে তখনই রাণাঘাট অভিমুখে তিনি রওনা হন। খেয়া পার হবার সময় মাঝির হাতে একটি টাকা দিয়ে বলেন, 'একটু পরেই একজন বাবাজী এসে আমার খোঁজ করবেন; তাঁকে এই টাকাটি দিয়ে বল, তিনি কাশী গেছেন। আপনাকেও যেতে বলেছেন।'

শ্রীধর কি এক কাজে বের হয়েছিলেন। বাড়ী ফিরে শুনেন প্রভু কাশী রওনা হয়েছেন। মুহূর্ত অপেক্ষা না করে তিনিও রাণাঘাটের দিকে ছুটেন। নদীর ঘাটে পৌঁছামাত্র পাটনী তাঁর হাতে একটি টাকা দিয়ে বলে, 'একজন সাধু এটি দিয়ে গেছেন আপনাকে দিতে। আর আপনাকে কাশী যেতে বলেছেন।' নদী পার হয়ে শ্রীধর রাণাঘাট স্টেশনের দিকে ছুটেন। পৌঁছে দেখেন তিনি ট্রেনের এক বেঞ্চে গোসাঁই বসে আছেন। প্রভু বলেন, 'তুমি কলিকাতা গিয়ে কুঞ্জদের ওখানে উঠ। টাকা জোগাড় করে কাশী যেও। ব্যস্ত হবে না। আমার সঙ্গে ওখানে দেখা হবে।' টাকা জোগাড় করে পরদিনই শ্রীধর কাশীর গাড়ী ধরেন। সাত-আট দিনে স্বর্ণময়ী দেবী প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠেন। যোগজীবন গোসাঁই মা, দিদিমা, বোন ও স্ত্রীকে নিয়ে কলিকাতা এসে উমেশ দত্তের গৃহে উঠেন। কুঞ্জ গুহঠাকুরতা ও বিধুভূষণ মজুমদার যোগমায়া দেবীর কাশী যাবার ব্যবস্থা করেন। মুক্তকেশী দেবী, প্রেমসখী ও বসন্তকুমারীকে তাঁরা উভয়ে গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে নিয়ে রেখে আসবেন বলে স্থির করেন। এই সময় যোগমায়া দেবীর একখানি ফটো তোলা হয়। ঐ আলোকচিত্রেরই প্রতিলিপি এখন পাওয়া যায়। যোগজীবন ও কয়েকজন গুরুভ্রাতা যোগমায়া দেবীকে নিয়ে কাশীর গাড়ী ধরেন। ঐ রাত্রেই কুঞ্জবাবু ও বিধুবাবু গুরুপরিবারের অন্যদের নিয়ে ঢাকা যাত্রা করেন। কর্মক্ষেত্রে যাবার পূর্বে কুঞ্জবাবু বরিশালে দেশের বাড়ীতে যান; লালকে নিয়ে যান সঙ্গে। একদিন সত্যকুমার গুহঠাকুরতার গৃহে গিয়ে লাল নানা প্রসঙ্গ করেন। লাল তখন পুরোপুরি জাতিস্মর। সত্যকুমার যান শৌচে। সত্যকুমারের সহধর্মিণীকে লাল বলেন, 'পূর্বজন্মে তোমার স্বামী আর আমি ছিলাম অন্তরঙ্গ সুহৃদ। যদিও গুরু-শিষ্য। তুচ্ছ এক ব্যাপার নিয়ে হয় আমাদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও উত্তেজনা। একে আরকে করি অভিসম্পাত—আবার জন্ম নিতে হবে। উভয়েই ছিলাম বাক্‌-সিদ্ধ। কর্মভোগ দুজনেরই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মাথা ঠাণ্ডা করে শলাপরামর্শ করি, জন্ম যখন নিতেই হবে তখন একই গুরুর শিষ্য হব। স্বল্পায়ু হব; আর, একজন দেহ রাখলে অপরজনও আর বেশী দিন দেহে থাকবে না।' সত্যকুমার ফিরে এলে এসব কথার শেষটুকু কানে যেতেই লালকে বলেন, 'কেন এ-সব কথা প্রকাশ করলে?'[১]

শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেবার লালের অসামান্য এক শক্তি ছিল। তাঁর কথা শুনে মনে হত যেন পৃথিবীর সকল ধর্মের তত্ত্বেই তিনি ওয়াকিবহাল। বরিশালে এক পাদ্রীসাহেবের সঙ্গে তিনি হিব্রু ভাষায় বাইবেল আলোচনা করে বিস্ময় উৎপাদন করেন।

---

১. শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর শিষ্যা যোগমায়া গুহঠাকুরতার খাতা থেকে।

বরিশাল থেকে নোয়াখালি গেছেন লালবিহারী; সতীর্থ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয় সেখানে। পথের পাশে মসজিদের 'অ-ঘেরা' প্রাঙ্গণে বসে তাঁরা সংসঙ্গ করেন। ইমাম এসে বাধা দিয়ে বলেন, 'এখানে গল্পগুজব করবেন না।' লালজী উর্দুতে বলেন, 'ভগবানের কথা আলোচনায় মস্‌জিদের গৌরব বাড়ে বই কমে না।' ইমাম বলেন, 'কোরাণে নিষেধ আছে কাফেরকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেওয়ার; আলোচনার তো কথাই ওঠে না।' আরবী ভাষায় কোরাণশরীফের 'বয়েত' আবৃত্তি করেন লাল। কি নিখুঁত উচ্চারণ। উর্দুতে ব্যাখ্যা করে বলেন, 'কোরাণে নাস্তিককেই "কাফের" বলা হয়েছে।' লালের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে ইমাম তাঁকে কুর্নিশ করেন।

কাশী পেঁছে গোসাঁই কাকিনীয়ার রাজাবাহাদুরের ছত্রে ওঠেন। মানিকতলার মাতাজী তখন অগস্ত্যকুণ্ডে এক বাড়ীতে ছিলেন। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে ও বিনীত অনুরোধে প্রভু ছত্র ছেড়ে তাঁর ওখানে যান। শ্রীধর, যোগমায়া দেবী, যোগজীবন, হরিমোহনের থাকার ব্যবস্থা মাতাজী সানন্দে তাঁর আস্তানায়ই করেন। মাতাজী আহার ত্যাগ করেছিলেন। জল পর্যন্ত নিতেন না। তথাপি প্রফুল্লচিত্তে দশ-বার জন লোকের প্রসাদের সব ব্যবস্থা তিনি করতেন। তাঁর আন্তরিকতায় ও পীড়াপীড়িতে এক মাস গোসাঁই কাশীতে থাকেন। ময়মনসিংহের জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহরায় তাঁর গ্রামবাসী শ্রীনাথ রায়ের সঙ্গে স্বামী কৃষ্ণানন্দের আশ্রমে গিয়ে জানতে পান, তাঁর গুরুদেব গোস্বামীপ্রভু কাশীতে এসে অগস্ত্যকুণ্ডে রয়েছেন। ঐদিন স্বামীজীর উপস্থিতিতেই কাশীবাসী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালীরা গোস্বামীপ্রভুর সন্ন্যাসী-বেশের করেন বিরূপ সমালোচনা। অথচ স্বামীজী কোন প্রতিবাদই করেন না। জ্ঞানবাবুর মনে হয় একজন সদ্‌গৃহীও তো এ-ক্ষেত্রে নীরব থাকতে পারেন না! সাধারণ গৃহী আর সাধুতে তাহলে কি পার্থক্য? এ তো শুধু পরনিন্দা নয়, সাধুনিন্দা। ওখান থেকে বের হয়ে অগস্ত্যকুণ্ডে গিয়ে তিনি গোসাঁইকে দর্শন করেন। কয়েকদিন পর স্বামীজীর নেতৃত্বে কাশীতে এক ধর্মসভার অধিবেশন হয়। আমন্ত্রিত হয়ে অসুস্থ দেহে গোসাঁইজী সভায় উপস্থিত হলে স্বামী কৃষ্ণানন্দ তাঁকে অভিবাদন করে সন্ন্যাসীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের পুরোভাগে বসান। হরিমোহন, যোগজীবন, শ্রীধর ও জ্ঞানেন্দ্রনাথও গুরুদেবের সঙ্গে গিয়েছিলেন। সভার কাজ সম্পন্ন হলে গোসাঁইজী শরীর ভাল নয় বলে উঠতে চান। স্বামীজী এসে অনুরোধ করেন, 'দয়া করে যখন এসেছেন, আর একটু থেকে যান। এখনই সংকীর্তন হবে।' জ্ঞানবাবু মনে মনে প্রার্থনা করেন, 'ঠাকুর কীর্তন শেষ করে যান।' খোল-করতাল বেজে উঠতেই প্রভু উঠে দাঁড়ান এবং মত্ত সিংহের মত হুঙ্কার দিয়ে কীর্তনে নাচেন। তাঁর অপ্রাকৃত দেহে সাত্ত্বিক লক্ষণ সব প্রকাশিত হয়। ভক্তির পূত-বিগ্রহ ও মহাভাব স্বচক্ষে দর্শন করে যাঁরা পূর্বে অশালীন সমালোচনা করেছিলেন তাঁরাই আবার বিমুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন, 'এমন মধুর প্রাণস্পর্শী নৃত্য জীবনে আর কখনও দেখি নি, এমন সাত্ত্বিক-ভাব যে হতে পারে তাও কখন ভাবি নি। আমরা নিজেরা ঋষিপথ-ভ্রষ্ট বলে মহতের অবমাননা করতেও কসুর করি নি।' কীর্তন শেষ হলে একে একে তাঁরা প্রভুর পদধূলি নেন। তাঁরাই তখন বারবার প্রভুর জয়ধ্বনি করেন।

একদিন গোসাঁই সন্ধ্যার কিছু পরে বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতি-দর্শনে যান। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তিনি আরতি দেখেন। দর্শনার্থীর ভিড়। আরতির ঘণ্টা-

ধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর সর্বাঙ্গে শুরু হয় কম্পন, শিহরণ। তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'ব্যোম ভোলা, ব্যোম ভোলা,' বলে নাচতে থাকেন। চারদিকে ওঠে হর্ষধ্বনি। তাঁর নৃত্যের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তজ্জন্য পাণ্ডারা স্থান করে দেন। শ্রীধর ও হরিমোহনও তাঁর উভয় পার্শ্বে নাচেন। গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন ও স্পর্শনের জন্য সেদিন থেকে মন্দিরে পড়ে হুড়োহুড়ি।

আর একদিন ভিড়ের মধ্যে মন্দিরের এক কোণে দাঁড়িয়ে বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখে গোসাঁইজী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। তাঁর দু চোখ থেকে তখন পিচকারীর ধারার মত অশ্রুধারা বিশ্বনাথের উপর গিয়ে পড়ে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে সেদিন আনন্দের আবেগে আরতি নির্দিষ্ট সময় থেকে আধ ঘণ্টা বেশী হয়। এর পর থেকে প্রভু কবে আবার আরতি-দর্শনে যাবেন, জানার জন্য রোজই সকালে বাঙ্গালীটোলাবাসীরা খোঁজ নিয়ে যেতেন। একদিন গোসাঁই সমাধিস্থ হয়ে বিশ্বনাথের উপর পড়ে যান। ঐদিন দর্শন হয় না। সেদিন গভীর রাত্রে বিশ্বনাথ তাঁর কাছে উপস্থিত হন।

একদিন গোসাঁই মহাত্মা বিশুদ্ধানন্দ স্বামীকে দর্শন করতে যান। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ সন্ত। রাজা-রাজড়া অনেকেই তাঁর অনুগত শিষ্য। স্বামীজী প্রভুপাদকে সাদরে আপন আসনে বসিয়ে বহুক্ষণ শাস্ত্রীয় আলোচনা করেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি অগস্ত্যকুণ্ডে ফিরেন। ফিরার কিছু সময় পর স্বামী বিশুদ্ধানন্দের এক শিষ্য এসে প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। গোসাঁই বলেন, 'আমি তো তাঁকে দর্শন করতে আজ গিয়েছিলাম। এই তো কিছু সময় হল ফিরেছি।' আগন্তুক বলেন, 'আমি তখন আশ্রমে ছিলাম না। কাজে গিয়েছিলাম বাইরে। ফিরামাত্র গুরুজী বলেন, "তোমার বড় দুর্ভাগ্য, তুমি এক বাঙ্গালী মহাত্মার দর্শন পেলে না। বহু সাধু-সজ্জন জীবনে দেখেছি, ওঁর মত আর কোথাও দেখি নি। তিনি অগস্ত্যকুণ্ডে আছেন, তাঁকে এখনই দর্শন করে এস।" তারপর খুঁজে খুঁজে এখানে এলাম।'

একদিন প্রভু কাশীর একপ্রান্তে এক বাগানবাড়ীতে গিয়ে দেখেন একটি কুটীর তালাবন্ধ। মালি বলল, 'সাধুবাবা রাত্রে ফিরেন। লোকে বড় জ্বালাতন করে বলে দিনের বেলা তিনি জঙ্গলে গিয়ে সাধন-ভজন করেন।' গোসাঁই নিজের নাম ও ঠিকানা দরজায় লিখে রেখে ফিরলেন। পরদিন আলখিল্লা-পরিহিত তেজঃপুঞ্জ-কলেবর এক সাধু অগস্ত্যকুণ্ডে এসে গোসাঁইকে প্রণাম করে আলিঙ্গন করেন। ইনিই সাধু দ্বারকাদাস—প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত। সব ছেড়েছুড়ে দীনহীন কাঙ্গালের মত তিনি বাস করেন। ওঁর নাম ছিল দ্বারকানাথ পাল। নিবাস ছিল বাঁশবেড়ে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসার ত্যাগ করেন। প্রভু আর যে কয়েকদিন কাশী ছিলেন প্রায়ই তিনি আসতেন। শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনায় প্রকাশ পেত তাঁর গভীর জ্ঞান। তিনিও বলতেন, শাস্ত্র অভ্রান্ত। তাঁকে দর্শন করার জন্য গোসাঁইজীর আস্তানায় ভিড় হত।

গোসাঁই তান্ত্রিক সাধক পূর্ণানন্দ স্বামীকেও দর্শন করেন। একদিন যোগজীবন তাঁর কাছে গেলে তিনি সস্নেহে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোর কি এখনও পৈতে হয় নি?' যোগজীবন বলেন, 'না।'। 'তাহলে আগামী দিন ভোরে আসিস, আমি তোর পৈতে দেব।' যোগজীবন মা-বাবাকে একথা বলায় তাঁরা সানন্দে

সম্মতি দেন। পরদিন তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে যোগজীবনকে গায়ত্রী-মন্ত্র দেন এবং উপবীত পরিয়ে দেন।

অগ্রহায়ণের (১২৯৬) অর্ধেক কেটে যায়। গুরুর দর্শন না মিলায় গোসাঁই স্থির করেন এবার অযোধ্যা যাবেন। এই সময় একদিন হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন কাশীতে তাঁকে দর্শন করতে। প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে তিনি বলেন, 'কুলদার চিঠিতে জানলাম আপনি এখানে রয়েছেন; তাই তিন দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি।' হরকান্তবাবু ফয়জাবাদ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক; গোসাঁইকে দর্শন করে তাঁর মনে হয়, আগের সেই প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যেন নেই—আকৃতি-প্রকৃতিতে যেন স্বয়ং মহাদেব। ভক্তিতে মন তাঁর ভরে ওঠে। ছুটি ফুরিয়ে যায়। তথাপি ফিরে যেতে মন সায় দেয় না। প্রণাম করে তিনি বলেন, 'ফয়জাবাদ থেকে অযোধ্যায় গিয়ে দর্শনাদি করার অসুবিধা হবে না। সকলকে নিয়ে আমার বাসায় উঠবেন, আমি সব ব্যবস্থা করে আপনাদের অপেক্ষায় থাকব।' প্রভু কথা দেন। কয়েকদিন পরই গোসাঁই ফয়জাবাদ পৌঁছেন; সঙ্গে যোগমায়া দেবী, যোগজীবন, শ্রীধর, হরিমোহন, দেবেন্দ্র চক্রবর্তী, মহেন্দ্র মিত্র, মানিকতলার মা ও তাঁর স্বামী ব্রজবাবু।

সকালে প্রভু শৌচে গেছেন, পাশের বেলগাছ থেকে এক অশরীরী আত্মা তাঁর পথ আগলে দাঁড়ায়। কান্নাকাটি করে বলে, 'আপনি এখানে আসবেন জেনে বার বছর ধরে প্রতীক্ষা করছি, আমার একটা বিহিত করুন।' তিনি বলেন, 'আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

হরকান্তবাবুকে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর শালগ্রাম দিয়েছিলেন। ঘরের এক কোণে তিনি তা রেখে দেন। প্রভু ঐ ঘরে যেতেই নারায়ণ প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'এঁরা আমাকে অভুক্ত রেখেছে।' গোসাঁই মিষ্টি দেন। হরকান্তবাবুকে বলেন, 'হাসপাতালে যাবার পূর্বে কাপড়-চোপড় ছেড়ে নারায়ণকে রোজ তুলসী, চন্দন ও মিষ্টি দেবেন।' আর একদিন অযোধ্যা থেকে বিগ্রহ দর্শন করে ফিরে প্রভু আলখিল্লার পকেট থেকে পেড়া, বরফি বের করে শালগ্রামের সামনে ধরতেই নারায়ণ তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেন। প্রভু বলেন, 'এখানে বামনদেব রয়েছেন।'

অযোধ্যা যাবার পথে একদিন ট্রেন থেকে গোসাঁই রানুপালীর ময়দানে অভূতপূর্ব রাজবেশে রামসীতার দর্শন পান। ঐদিন সরযূতে স্নান করে উঠতেই জননী জানকী প্রকাশিত হয়ে প্রভুপাদকে হনুমান-গৌরী, রঙমহল ও রামসীতার মন্দিরে নিয়ে যান।

গোসাঁই মাধোদাস বাবাজীর আশ্রমে যান। বাবাজী তখন দেহে নেই। তাঁর সঙ্গে তাঁর গভীর প্রেম ও প্রীতি ছিল। কথাপ্রসঙ্গে প্রভু বলেন, 'আমার সঙ্গে একই পাত্র থেকে তিনি আহার করেছিলেন। 'গ্রন্থসাহেব' তিনিই আমাকে পাঠ করতে বলেন।' নারায়ণদাসজীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি তখন মাধোদাস বাবাজীর গদীতে। তাঁর জন্ম হয় বাবাজীর বরে। একটি স্ত্রীলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, দু-বেলা বাবাজীর আশ্রম ঝাট দিত। একদিন তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে মাধোদাস বাবাজী তাঁকে বর দেন, 'মা, তোমার একটি সন্ত পুত্র হবে।' স্ত্রীলোকটি কাতর হয়ে বলেন, 'বাবা, আমি বিধবা।' বাবাজী বলেন, 'সবই গুরুজীর ইচ্ছা। সন্ত-লোকের কথা তো ব্যর্থ হবার নয়। তবে তোমার কোন অনিষ্ট হবে ন। পাঁচ বছর বয়স হলে ছেলেটিকে আমার কাছে দিয়ে যেও।' সেই

ছেলেই নারায়ণদাসজী।

গোসাঁই সিদ্ধ মহাত্মা মণিবাবার আশ্রমে যান। তাঁকে পেয়ে মণিবাবা আনন্দের আতিশয্যে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়েন। সম্বিত ফিরে এলে হাত জোড় করে বলেন, 'কৃপা করকে দর্শন দিয়া, অউর হমারা রহ্‌নেকো প্রয়োজন ক্যায়া! আপ হমারা স্থানপর রহিয়ে, হম্ দেহ ছোড় দেতে।'

পরমহংসজী অযোধ্যায় গোসাঁইর কাছে প্রকাশিত হয়ে নির্দেশ দেন, 'এক বছর তৈলধারার ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে বাস কর আর প্রত্যহ একটি তত্ত্ব লাভ না করা অবধি আসন ছেড়ে উঠবে না।' ঐদিনই ফয়জাবাদ পৌঁছে প্রভু বলেন, 'আর তো দেরী করা যায় না। এবার শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করি।' হরকান্তবাবু বলেন, 'আরও দুটি দিন দয়া করে থাকুন।'

হরকান্তবাবুর বাসায় তাঁর এক সঙ্গী ছিল। নাম দেবেন্দ্র পাল। ও'র 'শক্তি চুরি আর বশীকরণ' জানা ছিল। হরকান্তবাবু মাহিনার টাকা দেবেন্দ্রের হাতে তুলে দিতেন আর সে খুশিমত ব্যয় করত। কোন হিসাব দিতে হত না।

গোসাঁইর আসনের পাশে হরকান্তবাবুর বিছানা। প্রভু রাত্রে আসনে বসে আছেন, হরকান্ত ঘুমিয়ে আছেন। দেবেন্দ্র হরকান্তের বুকে রাত আড়াইটায় এক চাপড় মারে। হরকান্তের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাঁর ভিতরটা যেন নিস্তেজ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গোসাঁই হুঙ্কার দিয়ে উঠেন, 'অবিশ্বাসীর সংসর্গ হতে সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!!'

প্রভুর এই হুঙ্কার-ধ্বনি শোনামাত্র হরকান্তের মধ্যে অভূতপূর্ব এক শক্তির খেলা শুরু হয়। তিনি বলেছেন, 'মনে হতে লাগল ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাড়ী-ঘর, দালান-কোঠা পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে পারি।' দেবেন্দ্র তখনই ঘর থেকে বের হয়ে যায়। হরকান্তবাবু পরে বলেন, 'ফয়জাবাদে আহারের সময় গোসাঁইর পাশে বসতাম।' মাছ খাই শুনে তিনি বলেন, 'আপনি স্বচ্ছন্দে খান, এতে আমার একটুও অসুবিধা হয় না।' রান্না হত একই ঘরে। আহারের সময় হরকান্তবাবুর মুখে এক রকম শব্দ হত। প্রভু বলেন, 'শব্দ করা ভাল নয়।' হরকান্তবাবু গোসাঁইকে বলেন, 'কাশীর ও অযোধ্যার সাধুদের দেখলেন, এখানে ল্যাঙ্গাবাবাকে দেখবেন না?' পরদিনই যান তিনি তাঁকে দর্শন করতে।

ফয়জাবাদ ক্যান্টনমেণ্টের পাশে সরযূর কূলে সমতল ভূমি থেকে ত্রিশ-চল্লিশ হাত উপরে মাটির টিলা। তার উপর উন্মুক্ত আকাশের নীচে ল্যাঙ্গাবাবার আসন। সরু একটি খাল—আসনমঞ্চটিকে পরিখার মত ঘিরে সরযূর সাথে ফের মিলেছে। খালের জল স্ফীত হয়ে একবারে আসন ছোঁয়-ছোঁয়। বাবাজী তাঁকে বিনীতভাবে বলেন, 'মায়ী, ইধর মাৎ আয়ী।' জল তখন আসন ভাসায় আর কি! বিরক্ত হয়ে তখন ল্যাঙ্গাবাবা বলেন, 'এ্যাঁ, এইছা? বন্ধ হো যায়ী।' সেই থেকে খালটিতে তেমন জল আর নেই।

একবার বাবাজীর আসনের ঢিবি লক্ষ্য করে গোরা সৈন্যেরা টার্গেট প্র্যাকটিস করবে বলে স্থির হয়। ওরা এসে বাবাজীকে ধরে তিনি যেন অন্যত্র উঠে যান; কিন্তু তিনি তাদের বলেন, 'বাচ্চা লোগ তুম্‌হরা খেল্ তুম্‌লোগ্ কর। ম্যায় আসন ছোড়কে নেহি জায়েগা।' মহড়া শেষ হলে কর্ণেল ক্রলি টুপি খুলে বার-বার ল্যাঙ্গাবাবাকে কুর্নিশ করেন। প্রভু এ কাহিনী শুনে বলেন, 'কামানের গোলায় ও'র কি হবে?'

সেদিন গোসাঁইকে তাঁর আসনে পেয়ে ল্যাঙগাবাবার আনন্দ ধরে না। আবদার করে বলেন, 'বাবা, আজ এখানে রাত্রি বাস করতে হবে। দয়া করে যখন এসেছ, আজ একসঙ্গে থাকব।'

গোসাঁই সম্মত হন। তাঁর সঙ্গে যোগজীবন, হরিমোহন, দেবেন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীধর রাত্রিবাস করবেন বলে স্থির হয়। দেবেন্দ্র পালও গিয়েছেন সঙ্গে। সে থাকতে চাইলে ল্যাঙগাবাবা বলেন, 'না, না, তুমি না।' দেবেন্দ্র পাল ছাড়া আর সকলে থেকে যান। বাড়ী ফিরে যে ঘরে গোসাঁইর আসন সেখান বসে হরকান্তের কাছে কুৎসা গায় দেবেন্দ্র। সে বলে, 'যেমন গোসাঁই, তেমনই ঐ ল্যাঙগাবাবা। এ কয় আমায় দেখ, ও কয় আমায় দেখ। দুজনের দৌড়ই আমার জানা আছে। একবার তোমার গোসাঁইকে একটু নাড়া-চাড়া দিয়ে দেখব।' দেবেন্দ্রর আস্ফালন থামে না, হরকান্ত বুঝেন—সবই ফাঁকা। তথাপি মুখ ফুটে কিছু বলেন না।

এদিকে চড়ায় মোটা চালের ভাত আর রশুন দেয়া ডাল দিয়ে বাবাজী অতিথি সেবা করেন। পরদিন ভোরে সশিষ্য ফিরে আসন-ঘরে প্রবেশ করেই গোসাঁই বলেন, 'এখানে সাধু-নিন্দা হয়েছে। আর থাকা চলবে না। তোমরা সকলে আসন তোল।' তারপর আসনে বসে দেবেন্দ্র পালের দিকে তাকিয়ে তেজের সঙ্গে তিনি বলেন, 'এঁদের জানতে তোর ঢের দেরী। কতটুকু বুঝিস? কি জানিস? হয়েছে কি? কিছুই না। অনেক ঘোরপাক খেতে হবে। অনেক ভোগ রয়েছে। তুই আবার কি নাড়াচাড়া করবি রে?' মুখখানা হাঁড়ি করে দেবেন্দ্র ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

চা পানের পর মহাদেব, কালী ও মহাবীরকে কে, কিভাবে গতরাত্রে দর্শন করেছেন তা বিবৃত করেন। প্রভু বলেন, 'ল্যাঙগাবাবার প্রার্থনায়ই তাঁরা এসে দর্শন দেন। তিনি তোমাদের খুব কৃপা করেছেন। তাঁর আশ্চর্য শক্তিপ্রভাবে চড়াতে শীতের রাত্রে সামান্য শীত বোধ করলাম না; এটি বড় সহজ কথা নয়।' হরিমোহন বলেন, 'চারদিকে খোলা-মেলা, মাথার উপর স্বচ্ছ, অগণিত নক্ষত্রখচিত আকাশ, কিন্তু গায়ে একখানি কম্বলও রাখতে পারলাম না, গরম বোধ হল।' যোগজীবন বলেন, 'আমরা যেন উষ্ণ বাতাসের কুণ্ডলীর মধ্যে ছিলাম।' ঐ দিনই ওঁরা সব ফয়জাবাদ ছাড়েন।

কানপুরে প্রভু শিষ্যদের নিয়ে মন্মথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে উঠেন। চা পানের পর শ্রীধর আর হরিমোহনের কাছে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফুটে ওঠে—'এক পিশাচ হরকান্তবাবুকে গিলতে চাইছে।' তাঁরা গোসাঁইকে গিয়ে বলতেই গোসাঁই তাঁর দন্ড নিয়ে ভূমিতে আঘাত করে বলেন, 'যাক্, এখন নিশ্চিন্ত।' তারপর জানা যায়, ঠিক ঐ সময় ফয়জাবাদে দেবেন্দ্র তার শক্তি হারিয়ে নির্বিষ আশীবিষের মত নির্জীব হয়ে 'উন্মাদে'র মত বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে যায়; আর ঐ বাড়ীমুখো হয় নি।

১২৯৬ সালের পৌষের মাঝামাঝি প্রভু শ্রীবৃন্দাবন পৌঁছেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন যোগমায়া দেবী, যোগজীবন গোস্বামী, মহেন্দ্র মিত্র, শ্রীধর, হরিমোহন ও দেবেন্দ্র চক্রবর্তী।

দামোদর ব্রজবাসী মথুরা জংসনে গোস্বামীপ্রভুকে বিশেষভাবে ধরেন। তিনি প্রভুকে বলেন, 'আমার ঠিকানা "দাউজী"র কুঞ্জ, গোপীনাথবাগে। ওখানে থাকারও সুব্যবস্থা। দোতলা দালানে থাকবেন। দাউজীর ভোগের প্রসাদ সকলে দু বেলা পাবেন। আপনার হাতে টাকা-পয়সা না থাকলেও অসুবিধা হবে না। যখন পরে হাতে টাকা আসবে তখন দিলেই হবে। আমার ওখান থেকে বিগ্রহ-দর্শনেরও খুব সুবিধা। গোবিন্দ, গোপীনাথ তো একবারে হাতের নাগালে।' প্রভু সম্মত হন। দামোদর পাণ্ডার বিনীত আহ্বানে সশিষ্য তিনি উঠেন দাউজীকুঞ্জে।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই দামোদর ব্রজবাসী যেন দায় সারেন। যা খেতে দেন তা কারও রুচে না। এ নিয়ে শিষ্যদের সঙ্গে হয় তাঁর কথা-কাটাকাটি। প্রভুর কানে যেতেই তিনি আশ্রিতদের বলেন, 'তোমরা দামোদরকে কিছু বল না। দাউজী জাগ্রত ঠাকুর, তিনি সবই দেখছেন; যা করার তা তিনিই করবেন।'

ত্রিপুরাকুঞ্জ থেকে এক পরাত লাড্ডু আসে প্রভুর উদ্দেশ্যে। ছয়টি লাড্ডু ওঁদের দিয়ে তাঁর নিজের অন্দরমহলে দামোদর সব পাঠিয়ে দেন। গোসাঁইজী শুনে বলেন, 'তিনি তাঁর পুত্র-কন্যাদের নিয়ে পাবেন; তা বেশ তো!' প্রভুর নামে মানি-অর্ডার আসামাত্র দামোদর এসে ফর্ম সই করিয়ে নেন। টাকা যা আসে নিজেই রাখেন। বিনিময়ে সিকি অংশও ব্যয় করেন না।

মথুরা হাসপাতালের ডাক্তার মনোমোহন দাশ প্রভুর আশ্রিত। মথুরা-বৃন্দাবনের লোকেরা তাঁকে খাতির করেন। ত্রিপুরাকুঞ্জের কামদারকে তিনি চিঠে লিখেন সশিষ্য প্রভুপাদের চার-পাঁচজনের থাকার ও প্রসাদের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করে। শ্রীধরের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে গোস্বামীপ্রভু ধুনিতে তা দিয়ে মন্তব্য করেন, 'রাধারানীর স্থানে এসে আহারের জন্য অনুরোধ-উপরোধ কেন? যদি আহার না জুটে, মাধুকরী করা যাবে।'

প্রভু যোগমায়া দেবীকে অনুরোধ করে বলেন, 'গুরুজীর ইচ্ছা নয় তুমি শ্রীবৃন্দাবনে থাক। গেণ্ডেরিয়া তোমার অবিলম্বে ফিরে যাওয়া ভাল। কুতু ও বসন্ত রয়েছে ওখানে। তোমাকে ছেড়ে কুতুর খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমার জন্য ভেব না, একটি বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

এদিকে এলাহাবাদে এক সওদাগরী অফিসে যোগজীবনের একটি কাজ জোটে—দু-তিন দিনের মধ্যে যোগদানের নির্দেশ। যোগমায়া দেবী, যোগজীবন ও মহেন্দ্র মিত্রকে নিয়ে এলাহাবাদ যাত্রা করেন। ওখান থেকে মহেন্দ্রবাবুকে নিয়ে তিনি গেণ্ডেরিয়া যান।

শ্রীবৃন্দাবনের নামে যিনি উতলা হয়ে পড়েন, যিনি ব্রজের ধূলি মাথায় নিয়ে কত দিন আনন্দাশ্রু মোচন করেছেন, ব্রজবাসী বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ হলে ব্রজের খুঁটিনাটি খবর সাগ্রহে শুনেছেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সেই ব্রজধামেই গোসাঁই এসেছেন। এখানে ব্রহ্মরজঃ পাবার আশায় বিদেহী বৈষ্ণব মহাত্মারা বৃক্ষলতা-গুল্ম হয়ে বাস করেন। কি তাঁর আনন্দ! কালের নির্মম পদক্ষেপে ব্রজসুন্দরের লীলাস্থলী যুগান্তরে প্রায় নিশ্চিহ্ন ও বিলীন হয়ে গিয়েছিল। দেবকীনন্দন আবার কলিপাবনাবতার 'অন্তর্কৃষ্ণবহির্গৌর' শচীনন্দনরূপে আবির্ভূত হয়ে ব্রজের তীর্থগুলি প্রকট করেন। মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীরূপ, সনাতন,

শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ গোস্বামী ও দাস রঘুনাথ—এই 'ছয় গোসাঁই' ও অন্যান্য গৌর-পরিকরেরা শাস্ত্র ও ঐশীশক্তির প্রভাবে পাঁচক্রোশব্যাপী রাসস্থলীর সাড়ে তিন ক্রোশ প্রকট করতে সমর্থ হন। অবশিষ্ট যমুনায় অবলুপ্ত। শাস্ত্রে আছে, দ্বাপরে বাসুদেব আবির্ভূত হলে দেবগণ তাঁকে দর্শন করে সমগ্র ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেছিলেন। মধুবন, বেহুলাবন, কাম্যবন, তালবন, কুমুদবন, বেলবন, ভাণ্ডীরবন, লৌহবন, শ্রীবন, মহাবন, খাদিরবন ও ভদ্রবন—এই দ্বাদশটি বন নিয়েই চৌরাশি ক্রোশব্যাপী সেই ব্রজমণ্ডল। এখানেই নন্দসুত ও গোপবালকদের লীলাস্থলী। সাড়ে তিন ক্রোশী রাসস্থলীতে ছয় গোসাঁই বাসস্থান মনোনীত করে সেবা স্থাপন করেন। ঐখানেই জনপদ ও শহর গড়ে ওঠে। শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান দেবালয়গুলি তাঁদের এবং অন্যান্য বৈষ্ণবদের কীর্তি। শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী—গোবিন্দ, সনাতন গোস্বামী—মদনমোহন, শ্রীজীব গোস্বামী—রাধা-দামোদর, ও গোপাল ভট্ট—রাধারমণ বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাছাড়া লোকনাথ গোস্বামী—গোকুলানন্দ, মধু পণ্ডিত—গোপীনাথ ও শ্যামানন্দ গোস্বামী—শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

গোপাল ভট্টের রাধারমণ বিগ্রহের প্রকট কথা কাল্পনিক কাহিনীর থেকেও রোমাঞ্চকর। এক ভক্ত শেঠজী শ্রীবৃন্দাবনে এসে বিগ্রহদের পরাবার জন্য স্বর্ণালঙ্কার দেন। গোপাল ভট্টকেও তিনি অলঙ্কার দেন বিগ্রহের জন্য। ভট্টঠাকুরের ভাবনার শেষ নেই। তাঁর শালগ্রামকে কি করে এই অলঙ্কার পরাবেন? মহাপ্রভুর নির্দেশে ঐ শালগ্রামের তিনি সেবা করে আসছেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান ভক্তের বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। পরদিন ভোরে তাঁর ঠাকুরঘরে গিয়ে শালগ্রামের দিকে তাকিয়ে তিনি চোখ ফিরাতে পারেন না। অপূর্বশ্রী এক বিগ্রহ শালগ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সন্দেহের যাতে কোন অবকাশ না থাকে, সেজন্য পেছনে শালগ্রামটি যুক্ত রয়েছে। এখনও তিনি ঐভাবে আছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে আট হাজার দেবালয় আছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রজবাসীদের গৃহে গৃহে বিগ্রহ। বঙ্কুবিহারী তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর বিগ্রহ। লালাবাবু, বর্ধমানের মহারাজা এবং বাংলার ভক্তধনী অনেকেই শ্রীবৃন্দাবনে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাছাড়া, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিত্তশালী লোক বহু মন্দির এখানে স্থাপন করেছেন। শাহাজীর দেবমন্দির মর্মর-পাথরের। জয়পুরের মহারাজা মর্মর-প্রস্তরে এক সুন্দর দেবালয় স্থাপন করেছেন। মথুরার শেঠদের মন্দির এখানে সর্বাপেক্ষা জাঁকজমকপূর্ণ। তাঁদের দেবালয়ে একটি স্বর্ণস্তম্ভ আছে। মীরাবাইর মন্দিরেও শান্তির পরিবেশ। ছয় গোসাঁইর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন এক বিশেষ আকর্ষণ। তাছাড়া, বঙ্কুবিহারী, রাধাবল্লভ ও কিশোরীবল্লভও আকর্ষণীয় বিগ্রহ।

উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত হলেও শ্রীবৃন্দাবনধাম মহাপ্রভুর পার্ষদ ও পরিকরবর্গ দ্বারা সঞ্জীবিত ও সংগঠিত বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এখানে বেশী। এমন কি এইখানে প্রচলিত ভাষার মধ্যেও বাংলার প্রাধান্য অবিসংবাদিত। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামীগণ বৈষ্ণবসমাজে প্রধান। এই দুই বংশের শাখা কয়েক পুরুষ ধরেই শ্রীবৃন্দাবনে বসবাস করেন ও দেবালয়গুলি পরিচালনা করেন। তাই বৈষ্ণবসমাজেও তাঁদের অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা।

গোস্বামীপ্রভুর ব্রজধামে পৌঁছার খবর পেয়েই গৌরকিশোরদাস বাবাজী

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। পূর্বাশ্রমের নাম গৌরশিরোমণি। ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নির্দেশে যখন গোসাঁই প্রথম শ্রীবৃন্দাবন গিয়েছিলেন, তখনই হয় তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তিনি শান্ত-দান্ত সুপণ্ডিত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর নিষ্কিঞ্চন ভাব; বিড়াল-কুকুরকেও তিনি ভগবদ্‌জ্ঞানে প্রণাম করতেন, অপরের দোষে গুণ দেখা ছিল তাঁর স্বভাব। একবার এক বৈষ্ণব মহাত্মার পতন হয়। বৈষ্ণব বাবাজীরা এক কুঞ্জে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে দেখেন, তিনিও উৎসবে উপস্থিত। বৈষ্ণবেরা তাঁকে দেখে বলে ওঠেন, 'আমরা কিন্তু এক পঙ্‌ক্তিতে বসে ওঁর সঙ্গে প্রসাদ পাব না।' গৌরকিশোরদাস বাবাজী ওঁদের বলেন, 'আপনারা এ সব কি বলছেন? তিনি ইচ্ছা করেই ওই রকম করেছেন। তাঁর মত মহাত্মাও ঐরূপ করলে লোক-চক্ষে কেমন হেয় প্রতিপন্ন হন, এই শিক্ষা আমাদের দেবার জন্যই তিনি অমন করেছিলেন। আর আমার জীবনে কি করেছি, তাও একবার দয়া করে শুনুন।' বৈষ্ণবেরা কানে হাত চেপে বলেন, 'প্রভো, আপনি থামুন; আর কিছু বলতে হবে না। আমরা এক সঙ্গে বসব। আর কখনও ওঁর প্রতি আমরা কঠোর হব না।' ব্রজধামে সকলে গৌরকিশোরদাস বাবাজীকে বৈষ্ণব-চূড়ামণি পরমহংস জেনে শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গে দিন দিন তাঁর অন্তরঙ্গতা বাড়ে। উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। প্রত্যহ তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। গোসাঁইকে তিনি মনের সব কথা খুলে বলেন। তাঁর স্ত্রী দেশ থেকে এসে তাঁর কুঞ্জে ওঠেন। ব্রজবাসীরা তা নিয়ে কানাঘুষা করে। প্রভুকে তিনি বলেন, 'আমার তো ভেদবুদ্ধি নেই; আর সকলে যদি আমার কুঞ্জে এসে থাকতে পারেন, তাহলে তাঁর থাকায় কি-ই বা বাধা?' গোস্বামীপ্রভু সায় দিয়ে বলেন, 'লোকের কথায় কি আসে যায়?'

মহাপ্রভু কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন—

> চব্বিশ বছরের শেষে যেই মাঘ মাস।
> তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।৩।২

সন্ন্যাসের পূর্বে মহাপ্রভু তাঁর মস্তক মুণ্ডন করালেন। আর কখনও কেশ কর্তন করান নি। সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ মাস পরে শ্রীচৈতন্যদেবের জটার উল্লেখ আছে। বিগ্রহে কৈশোর-মূর্তি কল্পনা করাই এ দেশের রীতি। অদ্বৈতাচার্যের যে দাড়ি ছিল তা শুধু করচায় নয়, অনেক প্রাচীন পদেও পাওয়া যায়, কিন্তু শান্তিপুরে অদ্বৈতবিগ্রহে এই কারণেই দাড়ি নেই। মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দদাসের উক্তি থেকে প্রমাণ হয় যে, মহাপ্রভুর মাথায় জটা ছিল।

> কখন তামিল বুলি গোরারায়।
> কভু বা সংস্কৃত বলি শ্রোতারে মাতায়॥
> এইরূপে হরিনাম করিতে করিতে।
> অজ্ঞান হইয়া প্রভু লাগিল নাচিতে॥
> এলাইয়া জটাজূট খসিল কৌপীন।
> ধূলায় ধূসর অঙ্গ যেন অতি দীন॥[১]

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের সময় দণ্ড গ্রহণ করেছিলেন, যা নিত্যানন্দপ্রভু ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি গৈরিক, কৌপীন ও বহির্বাস ধারণ করেছিলেন। মহাপ্রভুর মালার ঝোলা

---

[১] গোবিন্দদাসের করচা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত (১৯২৬), পত্রাঙ্ক ৫১

ছিল না। যদি তা থাকত, তাহলে পরিব্রাজনের সময় অবশ্যই সেই ঝোলা সঙ্গে নিতেন। কিন্তু তিনি নির্দেশ দিলেন—

কৌপীন বহির্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এইমাত্র॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।৭।৩৫

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও গোস্বামীপ্রভুর ধর্মের মধ্যে কোনও অমিল বা গরমিল ছিল না। তথাপি ব্রজধামের বৈষ্ণবেরা গোসাঁইজীর বেশ, দীক্ষাদান ও সাধন-প্রণালী নিয়ে তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, তাঁর পন্থা মহাপ্রভু থেকে স্বতন্ত্র। গোস্বামীপ্রভু ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে উপবীত ত্যাগ করেছিলেন বলে অদ্বৈত-বংশীয় জ্ঞাতিরা তাঁকে বধ পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীর বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। গোসাঁই পরে ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে এলেও জ্ঞাতিদের মধ্যে অনেকে তাঁর উপর ক্ষুব্ধ থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনে তাঁর জ্ঞাতিরা তাঁকে আচারভ্রষ্ট ম্লেচ্ছ বলে মনে করতেন।

ব্রজধামে পৌঁছার কয়েকদিন পরই সশিষ্য গোসাঁইজী যাবেন গোবিন্দজী দর্শনে।[1] খবর পেয়ে শ্রীমন্দিরের পরিচালক ও সেবায়েতের বৈঠক বসে বাবাজীদের উপস্থিতিতে। ওঁরা মন্তব্য করেন, 'এমনি মন্দিরে আসবেন? আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করলেন না, অনুমতি নিলেন না! অদ্বৈত-পরিবারের কুলাঙ্গার, জাতনাশা! কত লোককেই না ক্ষেপিয়েছেন! এতকাল অনাচার করে এখন আবার গৈরিক পরে ব্রজধামে এসেছেন! তাঁকে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করতে দিয়ে আমরা কি এখানকার পবিত্রতা নষ্ট করব?' বৈষ্ণব বাবাজীরা সমবেত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'তা কখনই হতে পারে না; আমরা বাধা দেব।' সেবায়েত উৎসাহ পেয়ে বলেন, 'শুধু বাধা দিলে ওঁর কি হবে? বেশ অপমান করে বিদায় করতে হবে। উপর থেকে ওঁর মাথায় গোবর-জল ঢেলে দিলে কেমন হয়?' এ নিয়ে চলে শলাপরামর্শ। জনকয়েক নিরীহ বৈষ্ণব ছাড়া আর সকলে ষড়যন্ত্র করে যাঁর যাঁর কুঞ্জে যান ফিরে।

প্রভু ছিলেন সত্য, সরলতা ও বিনয়ের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর অভিমান ও প্রতিষ্ঠা-বোধ বিলীন হয়েছিল। 'অভিমানং মদ্যপানং, গৌরবং রৌরবম্, প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা।'

রাত্রে গোবিন্দজীর মন্দিরের সেবায়েত স্বপ্নে দেখেন—বলদেবজী বরাহ-মূর্তি ধরে তাঁর বুকের উপর উঠে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, 'এত বড় তোর দুঃসাহস! গোসাঁইকে অপমান করবি! জানিস ইনি কে? যে গোবিন্দজীর পূজার ভার তোদের উপর, সেই গোবিন্দ ও গোসাঁই অভিন্ন!'—

এত বলি সেই মূর্তি হল অন্তর্ধান।
বক্ষঃস্থলে নখচিহ্ন রাখিয়া প্রমাণ॥[2]

রাতারাতি প্রভু-সন্তান গৌরকিশোরদাস বাবাজীর কাছে উপস্থিত হন এবং অকপটে সব স্বীকার করেন। তাঁর শরীরের নানাস্থানে বরাহের নিষ্পেষণের চিহ্ন দেখান। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন তাঁকে 'এখন আমার কি করণীয় দয়া

---

[1] শ্রীমদ্ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ', ২য় খণ্ড, ২য় সং, পত্রাঙ্ক ৬৬

[2] অমিয়কুমার সান্যাল-প্রণীত 'শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণলীলামৃত', প্রথম সংস্করণ, পত্রাঙ্ক ১৭১

করে বলে দিন।' বাবাজী মহাশয় তাঁকে বলেন, 'প্রভো, আপনারা বড় দুঃসাহস করেছিলেন; এরূপ কল্পনায়ও অপরাধ হয়। রাত্রি প্রভাত হলে আপনি নিজে গোস্বামীপ্রভুর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সমাদর করে তাঁকে শ্রীমন্দিরে নিয়ে আসুন। ভোরে প্রভু-সন্তান তা-ই করেন। বিগ্রহ দর্শন করে গোসাঁইজী ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়েন। বাবাজীরা তাঁর এই অবস্থা দেখে মুগ্ধ হন। লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে তাঁরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। সেবায়েত ভোগের প্রসাদ দিয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করেন। তাঁরা সকলে মিলে প্রভুকে দাউজীকুঞ্জে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসেন। এই একটি ঘটনায় ব্রজের বৈষ্ণবসমাজে ওঠে গোসাঁইয়ের জয়-জয়কার। তিনি ওখানকার বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু হলে কি হয়? সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের মধ্যে খুব বেশী। ভেক না নিলে এখানে বাস করাই শক্ত হয়ে ওঠে। অন্য সাধুদের এঁরা আমলই দেন না; এমন কি সাধু বলেই মনে করেন না। আর, মালা-তিলক না থাকলে অপবিত্র মনে করেন। গোসাঁইজী যাতে গৈরিক ত্যাগ করেন, তার জন্য তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। গৌরকিশোরদাস বাবাজীকে দিয়েও তাঁকে বারবার অনুরোধ করিয়েছিলেন। একদিন গোসাঁই তাঁর সঙ্গে ভাগবত পাঠ শুনতে গিয়েছেন এক কুঞ্জে, একজন উপর থেকে ড্রেনের জল খানিকটা গোবর গুলে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ফেলেন। পাশে গৌরকিশোরদাস বাবাজী বসেছিলেন। সবটাই ওঁর মাথায় পড়ে। তিনি সবই বুঝলেন। গোসাঁইকে তিনি বলেন, 'দেখলেন প্রভো, এদের কান্ড? চলুন, এ স্থানে আর থাকতে নেই।' ওঁরা দুজনে তখনই চলে আসেন। বৈষ্ণববেশ না থাকলে এখানকার বাবাজীরা এমনধারা ব্যবহার করে থাকেন। গোসাঁইজী বলেছেন, 'শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা একদিন এসে বিনীতভাবে বলেন, "প্রভো, আপনি তিলক ধারণ করলে আমাদের বড় আনন্দ হবে।"' তিনি নূতন রকমের এক তিলক উদ্ভাবন করেন—মুসলমানের চাঁদ, খ্রীস্টানের ক্রুশ, হিন্দুর ত্রিশূল ও চক্র এতে থাকে। গৌরকিশোরদাস বাবাজী বলেন, 'প্রভো, শাস্ত্রানুমোদিত তিলক না করে অন্য রকম তিলক যদি আপনি করেন, তাহলে লোকে শাস্ত্র মানবে না।'

ঐ দিন নিশীথরাত্রে গোসাঁইজীর কাছে অদ্বৈতপ্রভু প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'তিলকে তোমার প্রয়োজন নেই। যদি একান্তই করতে চাও তাহলে আমি যেমন করি অমনটি কর।' গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি নিজে তিলক করছি, দেখুন হয় কি না!' তিনি তখন ধুনির ভস্ম আর কমন্ডলু থেকে জল নিয়ে তিলক করেন। দেখে অদ্বৈতপ্রভু বলেন, 'ঠিক হয়েছে।' পরদিন গৌরকিশোরদাস বাবাজী তাঁকে দেখেই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রভো, এই তিলক আপনাকে কে দেখিয়ে দিল?' সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি রজে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদেন।

কীর্তনবিলাসী মহাপ্রভু হরিনাম প্রচারের জন্য বলেছিলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

নাম-সংকীর্তনে কৃষ্ণপ্রেমোল্লাস আস্বাদন করে রায় রামানন্দকে তিনি বলেছিলেন উৎফুল্ল হয়ে—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥

আনন্দাম্বুধিবর্ধনম্ প্রতিপদম্ পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্বাত্মস্নপনম্ পরং বিজয়েতে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥

—যা মনরূপ দর্পণকে মেজে-ঘষে পরিষ্কার করে, সংসাররূপ দাবানলকে নিভিয়ে দেয়, জ্যোৎস্নাধারার মত মঙ্গল যা সর্বত্র ছড়ায়, বিদ্যারূপ বধূর যা জীবনস্বরূপ, যা আনন্দ-সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে, পদে পদে যাতে অমৃতের পূর্ণ আস্বাদন মিলে, যা মান-প্রাণকে তৃপ্তি-ধারায় সিঞ্চিত করে, সেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন সর্বত্র জয়লাভ করে।

গোস্বামীপ্রভুর কর্ণে শ্রীভগবানের নামকীর্তন করত মধুবর্ষণ। কৃষ্ণসংকীর্তন ছিল তাঁর কাছে হৃৎকর্ণরসায়ন। নাম-মাধুর্যের সার্থক বিকাশ হয়েছিল গোসাঁইর মধ্যে।

প্রভু শৌচে গিয়েছেন। দাউজীকুঞ্জের পাশ দিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে যায় সংকীর্তন-দল। ধ্বনি কানে যেতেই তিনি ভাবসাগরে ডুবে যান। ঐ অবস্থায় আত্মহারা হয়ে ছুটে গিয়ে কীর্তনে যোগ দেন। তাঁকে পেয়ে কীর্তনীয়ারা মেতে উঠেন। তাঁর হুঙ্কারের ভাবতরঙ্গে প্রেমোন্মাদ হয়ে কেউ বা হাসে, কেউ বা নাচে, কেউ বা কাঁদে।

নাম সংকীর্তনে হয় সর্বানর্থনাশ।
সর্ব শুভোদয়, কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥

কীর্তন শেষ হলে প্রভু হরিলুঠের বাতাসা নেন। কুঞ্জে ফিরে তাঁর খেয়াল হল, জলশৌচেরও অবকাশ পান নি। তবে কি কীর্তনের দলকে তিনি অশুচি করেছেন? গৌরকিশোরদাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হলে তাঁর কাছে ঘটনাটি বিবৃত করে তিনি বলেন, 'এখন এর কি প্রতিকার?' বাবাজী বলেন, 'প্রতিকার আবার কিসের? তাঁরা সকলে ধন্য হয়েছেন আপনার উপস্থিতিতে। ঠিকই হয়েছে, প্রভো। আপনি যে ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হয় নি। ব্রহ্মজ্ঞান না হলে তো ভক্তির অধিকারী হয় না। আপনার কাছে বিষ্ঠা-চন্দনে তফাৎ নেই—তা-ই আজ প্রমাণ করেছেন এই ঘটনার ভিতর দিয়ে।'

ভোর রাত্রে প্রভু বের হন মন্দির-পরিক্রমায়। কয়েকজন বৈষ্ণব চলেন কীর্তন করে, ক্ষিপ্রগতিতে; পিছনের দিকে তাকিয়ে গোসাঁইজীকে দেখে ওঁরা থামেন। প্রভু কাছে গেলে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ দেন। তিনি বুঝেন, এরা সব প্রেত। ওরা ওদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তাঁকে জানায়, অহোরাত্র বৃশ্চিকদংশন-জ্বালায় ওরা কষ্ট পাচ্ছে; তারা মালা জপে, নাম করে, কীর্তন করে; অথচ যন্ত্রণার লাঘব হয় না। 'এই দশা ওদের কি করে হল?' প্রভু জিজ্ঞাসা করেন। অকপটে বলে ওরা, 'আমরা গোবিন্দ-মন্দিরের সেবক ছিলাম। রাধাগোবিন্দের ভোগসামগ্রী সেবায় লাগার পূর্বেই রক্ষিতাদের মন পাবার জন্য ওদের দিয়ে দিতাম। যে পরিমাণ দেবসম্পত্তির অপব্যবহার আমরা করেছি তা পূরণ করে না দেওয়া অবধি আমাদের লাঞ্ছনা-দুর্গতির শেষ নেই। দেশে আমাদের জায়গা-জমি-সম্পত্তি রয়েছে; বংশধরেরাও আছে; তাদের আপনি কৃপা করে জানালে একটা বিহিত হয়। ওরা যদি মন্দিরের পরিচালকদের কাছে টাকাগুলি জমা দেয়, তাহলে আমরা রেহাই পাই।' তারা প্রভুপাদকে অর্থের পরিমাণ আর নাম-ঠিকানা সব বলে দেয়। গোসাঁইজী তাদের বংশধরদের কাছে চিঠি লিখান।

একদিন যমুনার তীরে বেড়াতে বেড়াতে কালীদহের কাছে যেতেই একটি

প্রেত এসে গোসাঁইজীকে বলে, ‘প্রভো, আমাকে বাঁচান। আমার শরীর জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। মন্দিরে পূজারী ছিলাম। বিগ্রহের অর্থ নিজের ভোগ-বিলাসে ব্যয় করেছি। তাই আমার এই দুর্গতি। আপনি কৃপা করে আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে দিন। পনর শত টাকা আমার ভাইপোর কাছে রেখেছিলাম। সে কিছুই করে নি। টাকাগুলি আদায় করে ঐ মন্দিরে বিগ্রহ-সেবায় অর্ধেক ব্যয় করে বাকীটা আমার শ্রাদ্ধ ও বৈষ্ণব-সেবায় লাগালে আমার সদ্‌গতি হয়।’ মন্দিরের অবস্থান, তার নাম ও ভ্রাতুষ্পুত্রের ঠিকানা সে বলে যায়। দয়ালপ্রভু ঐ মন্দিরে গিয়ে তখনকার পূজারীকে সব খুলে বলেন। তিনিও অর্থ আদায় করে প্রেতের অভিপ্রায় অনুযায়ী সব করেন।

আর একদিন গোস্বামীপ্রভু অবগাহন করতে যমুনায় যান। কয়েকটি প্রেত তাঁকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে বলে, ‘প্রভো, আমাদের বড় কষ্ট, আপনি কৃপা করে আমাদের উদ্ধার করুন।’ তিনি তাদের বলেন, ‘গুরুজীর হুকুম ছাড়া আমার কিছু করার উপায় নাই।’ ওরা তখন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রভু স্নান করে উঠতেই তাঁর গায়ের জল মাটিতে পড়তে না পড়তে তারা চেটে চেটে পান করে। প্রভু পরে নিজে বলেছেন, ‘গা দিয়ে জল বেয়ে পড়ে। প্রেতেরা কাড়াকাড়ি করে তা চেটে খায়। সবিস্ময়ে দেখি ওদের সূক্ষ্ম দেহ জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে, আর দিব্যরথ এসে ওদের নিয়ে যায়।’

সায়াহ্নে প্রভু একাকী বেড়াতে যান রাধাবাগে। নিরালায় কলকণ্ঠ বিহঙ্গের কাকলী আর ময়ূর-ময়ূরীর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, প্রাণ-জুড়ান প্রাকৃতিক পরিবেশ। তন্ময় হয়ে যান গোসাঁই। অজানা আলোড়নে চোখের পাতা মেলে বিস্ময়ে-পুলকে দেখেন সম্মুখের বৃক্ষটির চিহ্নটুকুও নেই! ঐখানে জটাজুটধারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু দাঁড়িয়ে আছেন। গোস্বামীপ্রভু তাঁকে সাষ্টাঙ্গ দেন। মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করে বসান। কথা ফুরায় না। বিকাল হতেই রাধাবাগ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। রোজ যাওয়া হয়ে ওঠে না। গুরুদেবের আদেশ—একটি তত্ত্ব প্রকাশ না হওয়া অবধি আসন ছাড়া সম্ভব নয়। যেদিন পূর্বাহ্নে তত্ত্বলাভ হয়, ঐদিনই ঘটে এই সংগোপন-মিলন। গোসাঁইর মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে গৌরকিশোরদাস বাবাজী উৎফুল্ল হয়ে বলেন, ‘প্রভো, আপনি তাঁর দর্শন পান, এতে অবাক হবার কিছু নেই।’ কিন্তু দুজন বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী—ললিতাদাস আর তার বোন আড়ি পেতে ওঁদের কথাবার্তা শুনেন। বাবাজী মন্তব্য করেন, ‘গাছ হয়ে আছেন মহাপ্রভু! কালে না আর মত কি শুনব? এ সবই বায়ুর কাজ।’ বৈষ্ণবী সায় দেন।

পরের দিন মহাপ্রভু প্রকাশিত হয়ে এঁদের মন্তব্যের উল্লেখ করে বলেন, ‘ঐ পাষণ্ড অবিশ্বাসী শূল ব্যথায় কাতর হয়ে তিন দিনের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে।’ দণ্ডোক্তি শুনে দয়াল গোসাঁই তাঁকে অনুরোধ করে বলেন, ‘ভগবন্, ঐ হতভাগ্য অজ্ঞের কি সাধ্য আপনার মহিমা বুঝে? এবারটি ওকে ক্ষমা করুন।’ মহাপ্রভু তাঁকে বলেন, ‘যে পাষণ্ড মহতের অমর্যাদা করে, ধর্মরক্ষার জন্য তার প্রতি নির্মম ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি! ধর্মদ্রোহীকে ক্ষমা করতে নেই।’ সেই বাবাজী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে তিন দিনের দিন মারা যায়।

একদিন রাধাবাগ দিয়ে যাবার সময় গোস্বামীপ্রভুর চোখে পড়ে একটি গাছ দুলে দুলে কাঁপতে থাকে! ঝড় নেই, বাতাস নেই, সর্‌সর্ আওয়াজ। প্রভু দাঁড়িয়ে গাছটির দিকে লক্ষ্য রাখেন। গাছটি মিলিয়ে যায়। একজন বৈষ্ণব ঐ

স্থানে প্রকাশিত হয়ে প্রভুপাদকে সাষ্টাঙ্গ দেন। তারপর তিনি বলেন, 'আমি ব্রজরজের প্রত্যাশায় এখানে বৃক্ষরূপে আছি।' কথাবার্তা শেষ হলে তিনি বৃক্ষদেহে রূপান্তরিত হন।

শিঙ্গারবটে নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামীদের বাস। তাঁদের ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায় দুটি বকুলগাছ ছিল। আঙিনার মাঝামাঝি জায়গায় বলে উৎসবে গাছ দুটির জন্য অসুবিধা হত। গৃহস্বামী গাছ দুটি কেটে ফেলার জন্য মজুর নিয়োগ করেন। ঐ রাত্রেই তিনি স্বপ্নে দেখেন, এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি করজোড়ে তাঁকে বলছেন, 'দয়া করে আমাদের শ্রীবৃন্দাবন-বাস ঘুচাবেন না। আমরা বিশ্বনাথের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনে বাস করার অধিকার পেয়ে বারাণসী থেকে এসেছি।' গাছ আর কাটা হল না।

একজন বৈষ্ণব বাবাজী গোস্বামীপ্রভুকে বলেন, তাঁর কুঞ্জের একটি বর্ধিষ্ণু বৃক্ষ আট-নয় বছর পরে রাতারাতি শুকিয়ে যায়। তিনি গাছটির বড় সেবা-যত্ন করতেন। রাত্রে বাবাজী স্বপ্ন দেখেন, একজন তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারী তাঁকে বলছেন, 'আমি বহু বর্ষ ধরে তোমার কুঞ্জে বৃক্ষদেহ ধারণ করে নিরুদ্বেগে ছিলাম; কিন্তু আজ একটি বৈষ্ণব যুবতী অশুচি হয়ে কামের বেগে বারবার আমাকে জড়িয়ে ধরে। তাই আমি এখনই অন্যত্র চলে যাচ্ছি।' ভোরে বাবাজী দেখেন গাছটি শুকিয়ে গেছে।

এক কুঞ্জের একটি সুন্দর গাছ কেটে ফেলবেন বলে কুঞ্জের কর্তা স্থির করেন। ঐদিন রাত্রে বৈষ্ণববেশধারী এক ব্রাহ্মণ তাঁকে স্বপ্নে বলেন, 'আমি তোমার কুঞ্জে বহুদিন ধরে আছি। বৃক্ষটি কেটে আমাকে রজস্পর্শ থেকে বঞ্চিত কর না। যদি আমার কথা উপেক্ষা করে গাছটি কেটে ফেল তাহলে আবার আমাকে জন্মাতে হবে। এতে তোমার কল্যাণ হবে না। তুমি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। এই স্বপ্ন অমূলক নয়—এইটুকু তোমাকে বুঝাবার জন্য আগামী দিন প্রত্যুষে আমি একবার গাছটির নীচে দাঁড়াব। পরদিন পণ্ডিতজী সত্যিই একজন ব্রাহ্মণকে দেখেন। তথাপি গাছটিকে তিনি কাটিয়ে ফেললেন। মজুররা ঐদিনই কলেরা হয়ে মারা গেল। পণ্ডিতজীর স্ত্রী-পুত্রাদিও কিছুদিনের মধ্যে ঐ ব্যাধিতে মারা যান। দর্শনশাস্ত্রে বিদ্বান বলে পণ্ডিতজীর খ্যাতি ছিল, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে তিনি হাবা হয়ে গেলেন।

প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামীর শিষ্য রাধাকুণ্ডবাসী নিত্যানন্দদাস বাবাজী বলেন, 'একদিন নগরকীর্তনে বের হয়ে পরিভ্রমণের সময় হাড়াবাড়ীর নিকটে যেতেই একটি বৃক্ষের অভূতপূর্ব নৃত্য দেখে দর্শকেরা হন বিস্ময়াবিষ্ট। গোস্বামীপ্রভু ভাবে বিভোর হয়ে নাচেন। আর, গাছের ডালপালাগুলি তালে তালে দোলে। প্রথমে মনে হয়েছিল হয়ত বানরের দল গাছে বসে ডাল নাড়ছে। কিন্তু দেখা গেল তা নয়। কোন প্রাণীই ওতে নেই। গাছের ডালগুলি আপনা হতে কীর্তনের তালে তালে একবার উপরে ওঠে, আবার নামে। এই সংকীর্তন-দলে গোসাঁইজীর সঙ্গে গৌরকিশোরদাস বাবাজী, রাধিকানাথ গোস্বামী ও রাজর্ষি বনমালী রায় ছিলেন।

একদিন অদ্বৈতবংশাবতংস নীলমণি গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে গোসাঁইজী ভিন্ন আসনে বসলে গৃহস্বামী বলেন, 'একি বিজয়কাকা! আমার সঙ্গেও দেখি তোমার পর-পর ভাব! তুমি যে আমাদের বংশের পরশমণি! তুমি

ব্রাহ্ম হয়েছিলে বলে যাঁরা এখনও তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছেন তাঁদের বড় দুর্ভাগ্য; তাঁরা এখনও বুঝতে পারেন নি যে, তুমি অদ্বৈতবংশতিলক।' এই বলে তিনি তাঁর হাত ধরে তাঁকে নিজের আসনের পাশে বসালেন। পরে তিনি সকলকে বলেন, 'পঞ্চক্রোশী পরিক্রমায় বের হই। সঙ্গে ভক্তির ভাণ্ডারী বিজয়কাকা। ভাবে তিনি বিভোর, মন্থরগতি। খানিক দূর এগিয়ে শুনি সুললিত কণ্ঠে অদ্ভুত কীর্তন। এমন সুর-তাল-লয়-সংযুক্ত ভজনগান জীবনে আর কখনও শুনি নি। বিজয়কাকার সঙ্গে থাকায়ই এই সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি কীর্তন লক্ষ্য করে ছুটেন, আমরাও পিছু পিছু যাই। দিব্যদর্শন এক মহাত্মা মগ্ন হয়ে কীর্তন করছেন; আমরা কাছে যেতেই সব বন্ধ হয়ে যায়। বাবাজী অদৃশ্য হয়ে যান। ঐ স্থানে শুষ্ক এক কান্ড। বিজয়কাকা লাঠি দিয়ে গুঁড়ির চারদিকে মাটির মধ্যে গর্ত খুঁড়েন। পরদিন গিয়ে দেখা যায় কান্ডের চিহ্ন নেই। গর্তগুলো ঠিকই আছে।'

পরিক্রমণের সময় কাম্যবনে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনে গোস্বামীপ্রভু এদিক-ওদিক গায়কের খোঁজ করেন; কাউকে দেখতে না পেয়ে সানুনয়ে তিনি বলেন, 'অলক্ষ্যে কে এমন মধুর ভজন করছেন, দয়া করে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করুন।' তখন একটি গাছ জটাজূট নিয়ে এক মহাপুরুষের অবয়ব ধারণ করে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ান। প্রভু তাঁকে প্রণাম করেন। তিনি গোসাঁইজীকে বলেন, 'এখানে যতগুলি বৃক্ষ দেখছেন, সকলেই এক-এক-জন বৈষ্ণবমহাত্মা। শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নিত্যলীলা দর্শন করার জন্য আমরা এভাবে আছি।'

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—'ভাগবতগণ তরু, গুল্ম, লতা, ঔষধি হয়ে ব্রজবাস আকাঙ্ক্ষা করেন।'

আসাম মহোচরণরেণু জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবী শ্রুতিবিমৃগ্যাম্‌॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৭।৫৪, উদ্ধবস্তোত্র

উদ্ধব বলেছেন, 'পরাধর্ম ও একান্ত আপনজন পরিত্যাগ করে বেদবেদ্য গোবিন্দচরণ সেবা করেছেন গোপীজন। শ্রীবৃন্দাবনের তরু, লতা, গুল্ম ও ঔষধি এঁদের চরণরেণু পেয়ে ধন্য হয়েছে। আমার আকাঙ্ক্ষা আমি যেন সেই বৃক্ষরাজির একটি হতে পারি।' ব্রজের বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য—পত্রগুলি নিম্নমুখী। রজঃ পাবার জন্য সব সময় যেন উদ্‌গ্রীব। গোসাঁইজী বলেছেন, 'ব্রজের ধূলি ব্রহ্মবস্তু। রজঃ লাভের আশায় বৃক্ষ, লতা, গুল্মরূপে মহাপুরুষেরা ব্রজে বাস করেন। এমন কি ব্রহ্মাদি দেবতারাও বৃক্ষ-লতারূপে শ্রীবৃন্দাবন-বাসের আকাঙ্ক্ষা করেন।'[১]

একদিন বাঙ্গালী এক ভদ্রলোক শ্রীবৃন্দাবনে এসে গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন করে বলেন, 'প্রভো, দেশে ব্রজ-রজের যে কত মাহাত্ম্য শুনেছি। কিন্তু এখানে কিছুই অনুভব হল না। এই ধামের মহিমার কথাও অনেক শুনেছি কিন্তু অন্যান্য তীর্থের সঙ্গে তুলনায় কোন পার্থক্য বুঝি না।' গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'একবার রজে গড়াগড়ি দিন।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে গড়াগড়ি দিয়ে বলেন, 'কই ? কিছুই তো বুঝি না।' প্রভু বলেন, 'ও রকম নয়। জামা, গেঞ্জি খুলুন; এবার দিন।' খালি গায়ে গড় দিতেই তাঁর প্রাণ গলে হু হু করে ওঠে। কেঁদে-কেটে হন তিনি

---

১. দ্বারিকানাথ রায় গোস্বামীপ্রভুর মুখে শুনেছিলেন।

আকুল। প্রভুপাদ বলেন, 'শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। ধামের মাহাত্ম্য বুঝতে হলে সেখানের যে বিধি-ব্যবস্থা রয়েছে তা মেনে চলতে হয়। তা প্রতিপালন না করলে সে স্থানের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। এই ধামের মাহাত্ম্য বুঝতে হলে—১. হিংসা ত্যাগ করতে হয়। ২. পরনিন্দা ত্যাগ করতে হয়। ৩. বৃথা কালক্ষেপ করতে নাই। ৪. অনিবেদিত বস্তু আহার করতে নাই। ৫. সর্বদা সাধন-ভজন নিয়ে থাকতে হয়। এসব নিয়ম রক্ষা করে কিছুকাল চললেই এ ধাম যে কি ধীরে ধীরে তা টের পাওয়া যায়। দু-পাঁচ দিন এখানে থেকে যাঁরা চলে যান তাঁরা এ-স্থানের মাহাত্ম্য কিরূপে বুঝবেন? অন্তত একটি বছর রুটিন করে থাকলে একটা প্রভাব বুঝা যায়। কোন তীর্থে গিয়ে তীর্থগুরু বরণ না করলে তীর্থ-দর্শন নিষ্ফল হয়।'

গোসাঁই একদিন গৌরকিশোরদাস বাবাজীর কুঞ্জে যেতেই তিনি বলেন, 'প্রভো, আজ কয়েকজন বৈষ্ণব এসে বলেন, "শ্রীবৃন্দাবনে এক জায়গায় শ্যামাপূজা হচ্ছে—আমাদের ওখানে যেতে কোন বাধা-নিষেধ আছে কি?" আমি ওঁদের বলি, "শ্যামাপূজা মায়ের আরাধনা, আর আমরা করি মধুর ভাবের সাধনা। সন্তানের মায়ের পূজার অধিকার সর্বাবস্থায়। গোপীরা কি করে কৃষ্ণ পেয়েছিলেন—বনে গিয়ে কাত্যায়নীর পূজা করে তো? তাহলে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনায় বৈষ্ণবদের শ্যামাপূজায় বাধা কোথায়?"' গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীধর ঘোষ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করে প্রভুপাদকে শোনান। তারপর প্রভু নিজে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। একটি বুড়া বানর আসে রোজ পাঠের সময়। প্রভুর মুখের উপর দৃষ্টি রেখে পাঠ শুনে। খাবার দিলেও পাঠ শেষ করার পূর্বে সে খায় না। আর আর বানরেরা সোরগোল করলে সে কটমট করে তাকায়—ওরা ভয় পেয়ে পালায়। গোসাঁই আদর করে তাকে 'বুড়ো' বলে ডাকেন। একদিন তাকে বলেন, 'বুড়ো, তোমাদের একজন আমাদের একটি ঘটি নিয়ে গিয়েছে।' তাঁর কথা শুনেই সে ছাদে গিয়ে চারদিকে তাকায়। তিন-চারটি বাড়ীর ব্যবধানে একটি ছাদে ঘটি সমেত একটি বানরকে দেখে বুড়ো কিচির-মিচির করে ওঠে। ভয়ে সে ঘটি ফেলে ছুটে। তখন বুড়ো ঘটিটি এনে প্রভুর পাশে রাখে।

আর একটি ছোট বানর প্রভুর বড় প্রিয়। সকালে আসনে বসতেই সে এসে হাজির হয়। প্রভু রাত্রিতে প্রসাদ পাবার সময় এর জন্য একখানি রুটি রেখে দেন। আদর করে তিনি তাকে কৃষ্ণদাস বলে ডাকেন। খাবার না পাওয়া অবধি প্রভুর বহির্বাস ধরে সে টানাটানি করে, কখন বা ঘাড়ে উঠে বসে।

একদিন তেতলার ঘরে একটি বানরশিশু ঢুকে। না দেখে পরিচারিকা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। পরদিন ভোর না হতে দলে দলে বানর এসে ছাদে জমে। কার সাধ্যি ছাদে যায়? চেঁচামেচি শুনে গোসাঁই নিজে ছাদে ওঠেন। তিনি ওদের বলেন, 'তোমাদের একে ইচ্ছে করে কেউ বন্ধ করে নাই; সে যে কখন ঘরের ভিতর ঢুকেছিল তা কেউ লক্ষ্য করে নাই। এখনই ওকে বের করে দিচ্ছি।' প্রভুর কথা শুনে ওদের চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে যায়। ঘরের দোর খুলে দিলে ওরা তাকে নিয়ে যায়।

অপরাহ্ণে এক-একদিন বিশেষ আমন্ত্রণে নীলমণি গোস্বামীর গৃহে সশিষ্য গোসাঁইজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনতে যেতেন। প্রভু বলতেন, 'তাঁর মত এত

সুন্দর পাঠক বিরল। গ্রন্থপাঠের সময় ওঁর ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও ভক্তি যেন আপনা থেকে প্রকাশ পায়। এ রকম অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আজকাল বড় শোনা যায় না।'

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন সমস্তিপুরে শিক্ষকতা করতেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হেঁটে রওনা হন গুরুর কাছে শ্রীবৃন্দাবনে। এক সাধুর সঙ্গে আলাপ হয় পথে। সিদ্ধাই জেনে তাঁর অনুগত হয়ে চলেন। তাঁর মাথায় একদিন ভারী এক বোঝা চাপিয়ে দিলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এই বোঝা পূর্বে কে বইত?' সাধু বলে ফেলেন 'ভূতে।' সতীশ তখন বুঝেন এর ভূত-সিদ্ধি। তখনই তিনি বোঝাটি ছুঁড়ে ফেলে ছুটতে থাকেন। সাধুর বাসন-পত্র ভেঙ্গে তচ্‌নচ হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে সতীশকে চিমটা দিয়ে তিনি মারতে থাকেন। সমনে এক কুয়া দেখে নিরুপায় হয়ে সতীশবাবু তাতে লাফিয়ে পড়েন। কুয়াটি ছিল শুক্‌না। সাধু ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। দূর থেকে একটি লোককে কুয়ায় পড়ে যেতে দেখে রাখালেরা এসে তাঁকে ওঠায়। একটি গাছের নীচে সতীশ আশ্রয় নেন। জনমানবশূন্য প্রান্তর। জ্বরে কাতর হয়ে অনাহারে তিন দিন ওখানে তিনি পড়ে থাকেন। চারদিনের দিন জ্বর ছাড়ে। গুরুদেবকে স্মরণ করে গাছটির কাছে আহার প্রার্থনা করতেই একটি সুস্বাদু ফল তাঁর কাছে পড়ে। তাতেই তাঁর ক্ষুধা মিটে। কয়েকদিন পর তিনি শ্রীবৃন্দাবন পৌঁছেন। সতীশ বলেন, 'এর পর সেই সিদ্ধাইকে আর দেখি নি।' প্রভু বলেন, 'ওকে আর দেখবে কি? ঐদিনই সে সব হারিয়েছে। ওর সিদ্ধি-ঋদ্ধি সব ছুটে গেছে। এখন পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিন-রাত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে।'

প্রভুপাদ বলেন, 'সতীশ, তোমার পিতার প্রেত তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছে; তুমি শাস্ত্রবিধিমত শ্রাদ্ধ কর, এতে উভয়েরই কল্যাণ হবে।' সতীশ বলেন, 'উপবীত ফেলে ব্রাহ্ম হয়েছিলাম। যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ কি করে হবে?' প্রভু বলেন, 'কেন? পৈতে নাও।' সতীশ তর্ক করেন, 'কয়গাছি সুতা পরার কি সার্থকতা? উপবীতের তেমন যদি শক্তি থাকত তাহলে কি কখনও ফেলতে পারতাম?' প্রভু তেজের সঙ্গে বলেন, 'বটে! উপবীতের শক্তি নাই? ঐভাবে পাও নাই, তাই! তেমন ব্রাহ্মণে যদি উপবীত দিতেন, সাধ্য ছিল ফেল? দেখতে চাও উপবীতের গুণ? আচ্ছা, আমিই তোমায় পৈতে দিচ্ছি!' এই বলে তিনি তাঁকে উপবীত পরিয়ে দেন। ফেলে দেবার চেষ্টা করতেই তাঁর হাত বেঁকে অসাড় হয়ে যায়। পরে তিনি কুলদাকান্তকে বলেন, 'ঠাকুর পৈতে পরিয়ে দিতেই আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। ভিতর হতে আপনা-আপনি গায়ত্রীমন্ত্র চলল। সর্বাঙ্গে কম্পন-শিহরণ। উপবীতের কি যে শক্তি পূর্বে কখনও ভাবতেও পারি নি।' সতীশবাবু গৈরিক নেন। প্রভু তাঁকে বলেন, 'এ কি! সতীশ, এখনই গৈরিক ছাড়।' সতীশ জিজ্ঞাসা করেন, 'গৈরিক পরার আবার বিধি-নিষেধ আছে নাকি?' গোসাঁইজী বলেন, 'গৈরিক, ভস্ম, দণ্ড, কমণ্ডলু, চিমটা এ-সবের এক-একটি বিশেষ অবস্থা আছে। অবস্থা লাভের পূর্বে ধারণ করলে ঘোরতর অপরাধ হয়। শাস্ত্রে আছে, ভগবতীর রজঃ হতে গৈরিক হয়েছে। একে ভগবান-বস্ত্র বলে। ভগবান নারায়ণের এই বসন—দেব-দেবী, মুনি-ঋষি, যোগী-মহাপুরুষদের বড় আদরের জিনিস; এর যথাযথ মর্যাদা দিতে না পারলে ভয়ানক অপরাধ হয়। গৈরিক বসনে একবিন্দু বীর্যপাত হলে অভিশাপ লাগে।' সতীশ তখন গৈরিক ত্যাগ করেন।

একদিন দাউজীর কুঞ্জে আসেন তিনজন সাধু। প্রভুপাদ তাঁদের সমাদর করে

বসান; ভূমিষ্ঠ হয়ে তিনি তাঁদের প্রণাম করেন। তাঁরা বিনীতভাবে প্রভুকে তাঁর আলখিল্লা খুলতে অনুরোধ করেন। তাঁরা তখন অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে প্রভুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন। গোসাঁইজীর কাছে বিদায় নিয়ে তাঁরা বের হলে সতীশবাবু তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনারা এতক্ষণ কি দেখলেন?' তাঁরা উত্তর করেন, 'অবতারের লক্ষণগুলি। ওঁর উপরই এবার লোক উদ্ধারের আর ধর্ম সংস্থাপনের ভার।'

শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর পাঁচ মাস কেটে যায়। ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

যোগমায়া দেবীর শ্রীবৃন্দাবনে গমন

দেহত্যাগের পূর্বদিন শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুপাদের কাছে গিয়ে লোকনাথ ব্রহ্মচারী উপস্থিত হলেন। সারারাত তিনি ছিলেন গোসাঁইর কাছে। প্রভুকে তিনি বলেন, 'আমি দেহ ছেড়ে যাচ্ছি। তুই বারদীতে আমার আসনে গিয়ে বস্।' গোসাঁই বলেন, 'আমি ব্রত নিয়ে আছি, এক বছর এখানে থাকতে হবে। সাত মাস এখনও বাকী। এই ধাম ছেড়ে এখন আমার যাবার উপায় নাই।' তাঁকে আরও দেহে থাকার অনুরোধ গোসাঁই করেন না। বরং তিনি বলেন, 'আপনার কথায় লোক বড় বিভ্রান্ত হয়।' ব্রহ্মচারী বলেন, 'যার যেমন সংস্কার, সে তেমন বুঝে; আমি কি করব? আমি কি আবার ওদের জন্য নূতন করে ভাষা শিখ্ব?' প্রভু তাঁকে বলেন, 'আপনি কেন এদের বলেন বেশ্যাগমন কর, ব্যাভিচার কর, ব্রহ্মের মুখে হাগি, মুতি।' তিনি বলেন, 'ও হরি! এই কথা! শালারা মুরুক্ষু। যারা শাস্ত্রবিধিমত স্ত্রী-সঙ্গ করতে পারে না, তাদের বলি তাহলে ব্যাভিচার কর, বেশ্যাগমন কর। আমি অন্য স্ত্রী-গমন করতে বলেছি? শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণই তো ব্যাভিচার। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে নিজের স্ত্রী-গমনও বেশ্যাগমন। এক ব্রাহ্ম এসে একদিন আমাকে বলেন, 'জগৎ ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম সর্বত্র।' আমি বলি, 'বটে! তাহলে ব্রহ্মের মুখে আমি হাগি-মুতি। তুই যদি ঠিকই বুঝিস্ ব্রহ্ম সর্বত্র, তাহলে কোথায় আর হাগা-মুতার স্থান?' প্রভু বলেন, 'কিন্তু আপনার কথার হেঁয়ালি না বুঝে এদের যে সর্বনাশ ঘটে।' ব্রহ্মচারী বলেন, 'তাহলে আমার চলে যাওয়াই ভাল।' গোসাঁইজী বলেন, 'আপনার যা ইচ্ছা তা-ই করুন।' লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দেহত্যাগের পর শ্রীবৃন্দাবনে গোসাঁই-শিষ্যদের মধ্যে খুঁটিনাটি নিয়ে কথা হয়।

একজন শ্রীধরকে বলেন, 'তুমি নাকি ব্রহ্মচারীকে ঘাস খেতে দিয়েছিলে? বল না ভাই কি হয়েছিল, তোমার মুখেই শুনি!' শ্রীধর বলেন, 'সে অনেক কথা। আমাদের গুরুভাই মানিকদহের জমিদার বিপিন রায়ের হল যক্ষ্মা। এলেন গোসাঁইর কাছে। তিনি অনুমতি দিলে বারদী যাবার ইচ্ছা। সাধন পাবার পূর্ব থেকে ওখানে তাঁর যাতায়াত। গোসাঁই অনুমতি দিয়ে বলেন, 'শ্রীধরকে সঙ্গে নিও।' আরও কয়েকজন গুরুভাই জোটেন। বিপিনবাবুর বজরায় গিয়ে উঠলাম। জ্যৈষ্ঠ মাস—বিপিনবাবু বেছে-বেছে সেরা সুরমা ফজলী কিনেন চারটি, ব্রহ্মচারীকে নিজের হাতে দেবেন বলে। তাছাড়া, তরী-তরকারী, সন্দেশ-মিষ্টি, আরও কত কি নিলেন। নিজেদের খাবার জন্যও এক ঝুড়ি ফজলী আম ও

আলাদা সন্দেশ-মিষ্টি নিলেন। আমাকে নিয়েই বিপিনবাবুর যত ভয়! কি জানি, যদি ফজলী আম চারটি সাবাড় করি! পথে হাট পড়ায় তিনি বজরা থামান। সবাই মিলে আরও কি সওদা করবেন! আমাকেও ডাকেন, 'শ্রীধর চল।' আমি তখন বসে নাম করছি। ইসারা করে বোঝালুম 'যাব না।' বিপিনবাবু বললেন, 'আম খেতে ইচ্ছা হলে ঝুড়ি থেকে বের করে যত খুশি খেও।' দৃষ্টির বাইরে ওরা যেতে না যেতে এক বৃদ্ধ আসেন চারটি ছেলে নিয়ে। আম চারটি ওদের হাতে তখন আমি তুলে দেই। বজরায় ফিরার পথে ওদের হাতে ঐ আম দেখে বুঝেন তাঁরা, এ আমার কীর্তি। আট আনা পয়সা ওদের দিয়ে তাঁরা আমগুলি ফিরিয়ে আনেন। রাগে তাঁরা গজ-গজ করেন। কীর্তন শুরু করি চড়া সুরে। বিরক্ত হয়ে একবার বলে ফেলি, 'ব্রহ্মচারীর কথায়ই দিয়েছি। ওঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।' তখন সন্ধ্যা হয়-হয়, আলো জ্বালার জন্য পলতে প্রয়োজন। একজন ঠারে-ঠোরে দেখান আমার ঝোলা। যখনই কোন সাধু মহাত্মার সংস্পর্শে এসেছি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি পুরান কৌপীন বা বহির্বাসের টুকরা; ওসব দিয়েই ঝোলা ভরতি। বিপিনবাবু ঝোলায় হাত দিতেই আমার মাথা গরম হয়ে উঠল। ওঁর উরুতে তখন সজোড়ে কামড়ে ধরি। বিপিনবাবুর কি চীৎকার —যেন খুন করে ফেলছি! আমার পিঠে পড়ে দুমদাম কিল, চড়; বৈঠে পাটাতনের আঘাত—তারপর কামড়ের পর কামড়। তখন এক লাফে নদীতে পড়ি; সাঁতার জানি না। ওঁরাও সব লাফিয়ে পড়ে আমায় তোলেন। ভোরে নৌকা পৌঁছে বারদীর ঘাটে। ওঁরা আমাকে ফেলে জিনিসপত্র নিয়ে চলে যান। মনে মনে ভাবি, আমি কি নেই? কচি ঘাস, কল্‌মী ডাটা দেখে ওগুলি জড় করে, কৌপীন পরে বহির্বাস দিয়ে আঁটি বাঁধি। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সামনে রেখে বলি, 'খা, খা।' তিনি ঘাসের খুব সুখ্যাতি করেন। পরিচারিকাকে ডেকে তিনি গরুকে দিতে বলেন। গুরুভাইরা হাসেন। আমি ওদের লক্ষ্য করে বলি, 'এই বুদ্ধিটুকুও নেই? জান না?—'গো-ব্রাহ্মণহিতায়চ।' আম চারটি ব্রহ্মচারীকে দিলে তিনি ওঁদের জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা আবার এগুলি কোথায় পেলে?'

বিপিনবাবু ব্রহ্মচারীকে তাঁর ব্যাধির কথা খুলে বলেন। ব্রহ্মচারী বলেন, 'শ্রীধরই তো তোমার উরুতে কামড়িয়ে রোগ সারিয়ে দিয়েছে। শ্রীধর বল তো ওদের সব খুলে।' তখন আমি বলি, 'তোমরা বাজারে যেতেই ব্রহ্মচারী মহাশয় এসে বলেন, 'আম চারটি এই চারজন ঋষি-কুমারকে দিয়ে দে।' খানিক বাদে আবার এসে বলেন, 'বিপিনের উরুতে কামড়ে রক্ত নিয়ে আয়।' খামকা কি করে কামড়াই? ঝোলায় হাত দিতেই সুযোগ মিলে। তারপর দেখি কীর্তন করে গোসাঁই আসছেন। তখন লাফ দিয়ে পড়ি কীর্তনের দলে। নদীতে পড়ে চুবনির পর চুবনি। ফেরার পথে বিপিনবাবুর কি তোয়াজ। আমি বলি 'পিরীতে আর প্রয়োজন নেই।'

এই কাহিনী শুনে সকলে আবার শ্রীধরকে ধরেন, 'শ্রীধরদা তুমি নাকি ব্রহ্মচারীর গায় লেংটি ছুঁড়ে মেরেছিলে আর তিনি তোমায় কুকুরের বমি খাওয়ালেন!' শ্রীধর বলেন, 'ছুঁড়ব না? আমার সামনে গোসাঁইর নিন্দা আর আমি তা সহ্য করব?' 'তাই তো বলি, কি হয়েছিল, বল।' শ্রীধর বলেন, 'ঐবার বারদী গেছি; উঠেছি কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের বাড়ী। সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি, আর বিকালে ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়ে বসি। তিনি খুব আদর-যত্ন করেন। সেদিন

ঘরভরা লোক। আমি গিয়ে বসতেই বলেন, "আরে শ্রীধর, এতদিন গোসাঁইর কাছে থেকে কি পেলি বল তো! যে নিজে অন্ধ সে আলোর মর্ম কি বুঝে? গোসাঁই আবার তোকে কি পথ দেখাবে? ওঁকে ছেড়ে আমার কাছে এসে থাক দিকিনি ছয় মাস—তোকে ব্রহ্মজ্ঞানী করে দেব, ঊর্ধরেতা করে দেব।" আমার মাথাটা অমনি গরম ছিল। ব্রহ্মচারীর কথা শুনে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। লাফিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে বলি, "ওরে শালা ব্রহ্মচারী! শালার বেটা লোকনাথ! আমার গুরুকে বলছিস অন্ধ! এই তুই মহাপুরুষ? এই দেখ্—তোর মত কত গণ্ডা মহাপুরুষ আমার এক-এক গাছি লোমে ঝুলছে"—বলেই ব্রহ্মচারীর গায়ে বহির্বাস আর লেংটি ছুঁড়ে মারি। ব্রহ্মচারী তখন দাঁড়িয়ে আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বলেন, "সাবাস্ বেটা! ঠিক বলেছিস! তোর অবস্থা দেখে বড় আনন্দ হল। এখন ঠাণ্ডা হ।" এই সময় একটি কুকুর বাইরে দরজার কাছে বমি করছিল। ব্রহ্মচারীর কি খেয়াল হল। আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, "ঐ বমি খেতে পারিস?" আমারও কেমন রোখ চেপে গেল। গোসাঁইকে স্মরণ করে হাত দিয়ে তুলে দেখি চমৎকার সুবাস! মুখে দিয়ে দেখি ক্ষীর-চিড়া-মাখা। কি স্বাদ! গোসাঁইর কৃপা! বমি কি মানুষ খেতে পারে? আরে রাম, রাম! তখন ব্রহ্মচারী আমাকে আসনের পাশে বসিয়ে পরিচারিকাকে খাবার দিতে বলেন। আমাকে বলেন, "চল্, আজ একসঙ্গে আমরা খাই। তোর যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। গুরুতে নিষ্ঠা জন্মালে কি আর কিছু বাকী থাকে?"'

শ্রীবৃন্দাবনে কয়েকদিন থেকে হরিমোহন (স্বামীজী) বেরিয়ে পড়েন পদব্রজে। মাঘ মাসে (১২৯৬) হাজির হন ভাগলপুর। কুলদাকান্ত ওখানে তখন তাঁর ভগ্নীপতি মথুরবাবুর গৃহে। হরিসভায় সংকীর্তনে স্বামীজীর ভাবাবেশ দেখে ওখানের এক উকিলবাবু মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর গৃহে নিয়ে যান। ঐখানেই তিনি আসন পাতেন। একদিনের বেশী কোন গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁর থাকার নিয়ম নেই। গুরুর নির্দেশ তাঁর মনগড়া যুক্তিতে তিনি উপেক্ষা করেন। তিনি বলেন, 'আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার বাধা-নিষেধ কি?' একটি নিয়ম-লঙ্ঘনের সঙ্গে দশটিতে শিথিলতা আসে। কয়েকদিন যেতে না যেতে তিনি ছুটে আসেন মথুরবাবুর গৃহে, উকিলবাবুর গৃহ থেকে আসন উঠিয়ে। কুলদাকান্তকে বলেন, 'ভাই, আমার সর্বনাশ হয়েছে। সন্ন্যাসের সঙ্গে ঠাকুর কৃপা করে যে অবস্থা দিয়েছিলেন, তা এখানে আসার পর ছুটে গেছে। তিনি বলেছিলেন, "নিয়ত নাম কর; নামেই সব হবে।" কিন্তু ইষ্টনামের চেয়েও সংকীর্তনের দিকে আমার ঝোঁক বেশী। কীর্তনের লোভেই গুরুবাক্য ও সন্ন্যাসের বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করেছি।' ঢাকা কলেজে মথুরবাবুর ছাত্র ছিলেন হরিমোহন। ঐখানেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। তিনি মথুরবাবুর ছেলেদের পড়ান। বাকী সময় সাধন-ভজনে কাটে। মথুরবাবু পঁচিশ টাকা করে মাসে তাঁর স্ত্রীর নামে মনি-অর্ডার করে পাঠান। মহাবিষ্ণু যতি, ভক্তকবি ও গায়ক। তিনি মথুরবাবুর অফিসে কাজ করেন। আর তাঁর গৃহেই থাকেন। ফাল্গুন মাসে লালবিহারী এসে মিলেন। তিনি ওঁদের বলেন, 'শ্রীবৃন্দাবনে গোসাঁইর সঙ্গে ছিলাম। একদিন তোমাদের কথা উঠতেই প্রাণটা তোমাদের দেখবার জন্য অস্থির হল, তখনই না বলে হেঁটে চলে এসেছি, একবস্ত্রে।' একদিন 'পাতঞ্জল দর্শন' হাতে নিয়ে কুলদাকান্ত হিমসিম খাচ্ছেন দেখে লাল হেসে তাঁকে বলেন, 'ও কি হচ্ছে? এভাবে কুল-

কিনারা মিলবে না! গোসাঁই প্রসন্ন হলে তাঁর কৃপায় সরস্বতীর বরপুত্র হতে কতক্ষণ?'

কুলদাকান্তের হাত থেকে গ্রন্থখানা নিয়ে মাথায় ঠেকান লালবিহারী। তারপর তাঁর কাছে আবার ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, 'তুমি এর যে কোন পাতা থেকে জিজ্ঞাসা করদিকিনি!' কুলদাকান্ত প্রশ্ন করে যান। টীকা-টিপ্পনীসহ যেমন মীমাংসা আছে লালের উত্তরের সাথে হুবহু মিলে যায়। কুলদাকান্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভাই, তোমার এই অদ্ভুত শক্তি কি করে সম্ভব হল?' সখা লালবিহারী বসু বলেন, 'শুধু গুরুকৃপায়। আমার বিদ্যার দৌড় তো তোমার অজানা নয়—শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ অবধি, ব্যস্‌। সতীর্থেরা এক-একজন বিদ্যার জাহাজ। বক্তা, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষক, উকিল, মুন্সেফ, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট আরও কত কি! সংকীর্তনে গোসাঁইর সঙ্গে মল্লবেশে নাচি দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন। স্নেহ ঢেলে কথা বলেন। ওঁদের সংস্পর্শে এলে নিজের দৈন্য আরও ফুটে ওঠে। ইংরেজিতে ওঁরা যখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতেন তার একবর্ণও বুঝতাম না, হাবার মত বসে থাকতাম; আফশোষ করতাম মনে মনে 'নীরেট মুর্খই রয়ে গেলাম।'

'কানপুরে হাকিমদা সুরেশ সিংহের সঙ্গে একদিন তাঁর পড়ার ঘরে বসে গল্প করছি। মনোবিজ্ঞানের একখানি ইংরেজি বই থেকে তর্জমা করে আমাকে তিনি বুঝাচ্ছিলেন; হঠাৎ অন্দরমহলে তাঁর ডাক পড়ে। বইখানা তখন হাতে নিয়ে গোসাঁইকে স্মরণ করে বলি, "ঠাকুর, তুমি না ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! আমাকে বিদ্যা দাও।" মাথার ভিতরটা কেমন যেন মুচ্‌ড়ে ওঠে। গ্রন্থখানির সব মীমাংসা যেন আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে! ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে! সুরেশদা ফিরে এসে সহানুভূতিমাখা ভঙ্গীতে বলেন, "কি দেখছ ভাই ফ্যাল ফ্যাল করে?" বলি তাঁকে, "গোসাঁইর কৃপায়, দাদা, সারা বইখানার কোথায় কি আছে আমি বলতে পারি। যে কোন পাতা থেকে প্রশ্ন করে দেখুন।"

'সিংহ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন। হুবহু বলে যাই। সবই যেন কণ্ঠস্থ। হাকিমদা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, "ভাই, ঠাকুর তোমার উপর খুব প্রসন্ন; তাঁরই অহৈতুকী কৃপায় এ সম্ভব হয়েছে।" ঐদিন থেকে যে কোন বিষয়ে আমার জানবার ইচ্ছা হয়, গোসাঁইর কৃপায় তখনই জানা হয়ে যায়।'[১]

কুলদাকান্ত একদিন লালকে নিয়ে যান ভাগলপুরের প্রৌঢ় থিয়োসোফিস্ট পার্বতী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তপোবন-সদৃশ আবাসে। গুরুবাদ নিয়ে আলোচনা। 'গুরুকরণ ছাড়া ভগবদ্‌দর্শন হয় না।' এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেন লাল—সংস্কৃত, পালি, তিব্বতী, আরবী, হিব্রু এবং আরও নানা ভাষার ধর্মশাস্ত্র থেকে ব্যাখ্যাসমেত মূল অনর্গল আবৃত্তি করে। একমাত্র সদ্‌গুরুর এক পলকের দৃষ্টিসঞ্চারে, একটি অঙ্গুলি-সংকেতে, অথবা মুহূর্তের ইচ্ছাশক্তিতেই অনুগত শিষ্যের অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবৎ-ভক্তি সঞ্চারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়—লাল ইহাই পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত তন্ময় হয়ে শুনেন জ্ঞানী পার্বতীবাবু। যুবক

---

[১] শ্রীমদ্‌ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ', ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পত্রাঙ্ক ১৫৯-১৬১

লালের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে আর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে হন তিনি অভিভূত। বয়সের ব্যবধান ভুলে লালকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তিনি বলেন, 'আমাকে উদ্ধার করতেই আপনার এখানে আগমন। আপনি আমাকে দয়া করুন।' লালবিহারী স্বামীজীর পেছনে লেগে থাকেন। সন্ন্যাসের নিয়ম মেনে চলতে জিদ্ করেন। গোসাঁইর আদেশ পালনে স্বামীজীর গাফিলতি দেখলে লাল ছেড়ে কথা বলেন না। স্বামীজীর এসব গা-সহা হয়ে গেছে। শুধরানের কোন তাগিদ নেই। মনোমুখী চালচলন। লালও নাছোড়বান্দা। না শুনে বাপু যাবে কোথায়? লাল দৈবশক্তি প্রয়োগ করেন। রাত একটার সময় স্বামীজী শুধু কৌপীন পরে গঙ্গার চড়ার দিকে ছুটেন। দুদিন ধরে মথুরবাবু খোঁজাখুঁজি করেন। লাল বলেন, 'খুঁজে কি হবে? তিনি গোসাঁইর কাছে চলেছেন শ্রীবৃন্দাবনে। বড় বাড়াবাড়ি করছিলেন। উপায়ান্তর না দেখে এই ব্যবস্থা করেছি।' লাল মথুরবাবুকে বলেন, 'আভিচারিক ক্রিয়ায় তাঁর স্ত্রীর অকালমৃত্যু ঘটেছে। আরও অনেক গুহ্য কথা তিনি তাঁকে বলেন যা মথুরবাবু ছাড়া আর কারও জানা ছিল না। ফাল্গুন মাসের শেষ দিকে (১২৯৬) একদিন কাউকে কিছু না বলে লালও উধাও হন। কুলদাকান্তকে তিনি তিনটি অনুরোধ করে যান—১. ডায়রী লিখা ছেড় না। ২. সাধন ছেড় না। খুব নাম কর। তুমি সন্ন্যাসী হবে। ৩. গুরুদেবের কৃপা ছাড়া কিছুই হবার জো নেই। গুরুতে একনিষ্ঠ হও। তাঁর সঙ্গ করতে চেষ্টা কর।

কুলদাকান্তের শরীর-মন ভেঙ্গে পড়ে। গুরু-দর্শনের জন্য তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। কুলদাকান্তের এলাহাবাদ পর্যন্ত একখানি সেকেন্ড ক্লাশের ট্রেনের টিকেট জুটে যায়। ঐদিনই মথুরবাবু থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেন। ২০ আষাঢ়, ১২৯৭, তিনি দাউজীকুঞ্জে পৌঁছে দেখেন স্বামীজী যথার্থই গোসাঁইর কাছে এসে পৌঁছেছেন। লালের বাহাদুরি আছে!

এলাহাবাদের চাকরী যোগজীবনের পোষায় না। কয়েকদিন পরই তিনি গেণ্ডেরিয়ায় গিয়ে হাজির হন। ওদিকে ঢাকায় ফিরে যোগমায়া দেবীর আর দিন কাটে না। দাউজীর কুঞ্জে প্রসাদের যা ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন তাতে তাঁর গলা দিয়ে কিছু নামতে চায় না। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে পতি ও গুরুর ধ্যানেই থাকেন তিনি দিবারাত্রি। গেণ্ডেরিয়ার দুরন্ত মশায় রাত্রে মশারীর নীচে পর্যন্ত থাকেন না। রাই-উন্মাদিনীর অবস্থা। মা বুঝান, শিষ্য-শিষ্যারা বুঝান; তাঁর এই বিরহবিধুর ভাব বাইরের লোকে কি করে বুঝবে! এই কয়েকটি মাস মনে হয় যেন অনন্তকাল! একদিন রাত্রে আসনে বসেছেন। দেখেন গোসাঁই সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেন, 'এই তো আষাঢ় মাস, দেখতে দেখতে একটি বছর শেষ হবে। জান তো ব্রত নিয়েছি। আর তোমার এ সময় শ্রীবৃন্দাবনে না আসাই শ্রেয়ঃ। আমার জন্য ভেব না। তবে একান্তই যদি আসতে চাও তাহলে আর কি করি!' পণ্ডিত মহাশয়কে যোগমায়া দেবী সংগোপনে এই দর্শনের কথা বলেন। পরদিনই আর কাউকে কিছু না বলে কুতুবুড়ী আর যোগজীবনকে নিয়ে ঝুলনের পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে তিনি পৌঁছবেন স্থির করেন। শিষ্য-শিষ্যাদের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর আমার যেন ব্রজরজঃ লাভ হয়। তোমাদের এখানে মন্দির উঠবে।' কলিকাতা পৌঁছে তিনি নগেনবাবুর বাসায় যান কিছু সময়ের জন্য। মাতঙ্গিনী দেবী পীড়াপীড়ি করেন কয়েকটি দিন ওঁর ওখানে থাকতে। তাঁকে বলেন, 'দ্বারভাঙ্গায় দু-তিন দিন শান্তির বাসায় থেকে

যেতে হবে। কলিকাতায় দেরী হলে ঝুলনের পূর্বে পৌঁছা যাবে না।' মাতঙ্গিনী দেবীর চোখে তখন ভেসে ওঠে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের দৃশ্য। জগদ্বন্ধুবাবু দ্বারভাঙ্গায় শিক্ষকতা করেন। শান্তি সন্তানসম্ভবা। যোগমায়া দেবীর ভগ্নীপতি ক্ষেত্রনাথ বাগচী দ্বারভাঙ্গায় ডাকঘরে কাজ করেন। তিনি তখন ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছিলেন। তাঁর সঙ্গেই যোগমায়া দেবী শান্তিসুধাকে কলিকাতা পাঠান আর তিনি কুতুবুড়ী ও যোগজীবনকে নিয়ে ঐ দিনই শ্রীবৃন্দাবন রওনা হন। ২২ আষাঢ়, (১২৯৭) শনিবার দাউজীকুঞ্জে পৌঁছে তাঁরা শুনেন, গোসাঁইজী কুলদাকান্ত ও স্বামীজীকে নিয়ে বের হয়েছেন। ঐদিন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব-তিথি উদ্‌যাপন। গোপীনাথের মন্দিরে সংকীর্তন মহোৎসব। মন্দিরে প্রবেশ করার পূর্বে নগরকীর্তন আসছে দেখে প্রভু সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। তাঁকে ঘিরে পথে কীর্তন হতে থাকে। তাঁকে ওখানে পেয়ে বৈষ্ণব-বাবাজীদের কি উল্লাস! তিনি 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলে উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করতে করতে পথে পড়ে গড়াগড়ি দেন। ব্রজের রজঃ সর্বাঙ্গে মেখে আবার ওঠেন। প্রভুর হুঙ্কারে ও গর্জনে বাবাজীরা উন্মত্ত হয়ে পড়েন। শ্রীধর এই সময় যোগজীবনকে নিয়ে উপস্থিত হন। প্রভুর ঢুলু-ঢুলু নেত্র দেখে যোগজীবনও মত্ত হয়ে ওঠেন। গোপীনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে গোসাঁইজী সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। যোগজীবনও সম্বিত হারান। তাঁরা যখন কুঞ্জে ফিরে আসেন তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। যোগমায়া দেবীর আগমনে শিষ্যেরা খুশি। প্রভু দু-চার কথায় আশ্রমের খবর নিয়ে আসনে গিয়ে বসেন। ঐদিন থেকে দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরে প্রভুপাদ, মাঝের ঘরে শ্রীধর, স্বামীজী, সতীশ ও কুলদাকান্ত এবং পূর্বের ঘরে যোগমায়া দেবী, কুতুবুড়ী ও যোগজীবনের থাকার ব্যবস্থা হয়।

পরদিন যমুনায় স্নান করে এসে কুলদাকান্ত প্রভুপাদের আসনের কাছে বসে নাম করেন। পিত্তশূলের দুঃসহ বেদনা। গোসাঁইর সমাধির বিঘ্ন না ঘটে! দম বন্ধ করে ধীরে ধীরে তিনি নিঃশ্বাস ফেলেন। হঠাৎ দু-তিনবার গা ঝাড়া দিয়ে প্রভুর সমাধি ভাঙ্গে। তিনি ছল-ছল চোখে কুলদাকান্তকে বলেন, 'উঃ! তোমার বড় ক্লেশ তো! আচ্ছা, তোমায় আর ভুগতে হবে না।' তখন থেকে এতদিনের ব্যথা-বেদনার চিহ্নটুক নেই।

শনিবার থেকে মঙ্গলবার দিন পর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে যোগমায়া দেবীর কোন কথাবার্তা আর নেই। এই কয়েকদিন যোগমায়া দেবীর অবস্থা যেন জীবন্মৃত। গোসাঁই তাঁকে শ্রীবৃন্দাবনে না আসার জন্য বারবার বারণ করে লিখেছেন, কিন্তু প্রভুর শরীরের অবস্থার কথা জেনে তিনি না এসে থাকতে পারেন নি; অথচ এখানে পৌঁছে তিনি ভয়ে ভয়ে রয়েছেন। প্রভুর কাছে যান না, বসেন না—সারাদিন নিজের ঘরে বসে থাকেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কারও সঙ্গে কথাও বলেন না। সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামার সময় প্রভুর দেহের হাল দেখে তাঁর রক্ত হিম হয়ে যায়! দারুণ গ্রীষ্ম—গোসাঁই দিনরাত বারান্দায় আসনে বসে। কুলদাকান্ত দু-তিন হাত দূরে বিছানা পাতেন রাত্রে। মঙ্গলবার রাত্রি এগারটায় যোগমায়া দেবী সাহসে ভর করে প্রভুর আসনের কাছে বসে বাতাস করতে থাকেন। রাত তিনটা নাগাদ প্রভুর সমাধি ভাঙ্গতেই তিনি তাঁকে বলেন, 'শান্তির ছেলেপিলে হবে, বুড়া ঠাকরুণের শরীর ভাল নয়, বসন্ত ছেলেমানুষ; এই অবস্থায় তুমি কি করে এলে?' যোগমায়া দেবী আস্তে আস্তে বলেন, 'সর্বকালে সকলের ব্যবস্থা যিনি

করেন। তিনি তো রয়েছেন, তিনি-ই করবেন।' গোসাঁই বলেন, 'তা নিশ্চয়ই। তথাপি তোমার ফিরে যাওয়া ভাল।' যোগমায়া দেবী বলেন, 'আপনার শরীরের যা অবস্থা হয়েছে! আপনাকে ফেলে আমি যাব না। তীর্থ করতে আমি এখানে আসি নাই। আপনিই আমার সর্বতীর্থসার; আপনি শুধু আমার পতি নন, গুরুও। আপনার সেবাই আমার ধর্ম। আমার আর কিছুই প্রয়োজন নাই।' প্রভু তখন তেজের সঙ্গে বলেন, 'আমি যে আশ্রম নিয়েছি, তুমি আমার সঙ্গে থাকলে সে আশ্রমের মর্যাদা হানি হয়। তোমার শ্রীবৃন্দাবন থাকতে হলে অন্যত্র গিয়ে থাক; এই কুঞ্জে থাকতে পারবে না। এতে তুমি যদি জেদ কর, আমি অন্যত্র চলে যাব। উত্তরকুরুতে চলে যাব।' এইভাবে কথাবার্তায় রাত ভোর হয়।

পরদিন বুধবার, ২৬ আষাঢ়, ১২৯৭, ভোরে যথাসময়ে প্রভু শৌচে যান। শ্রীধর, স্বামীজী, সতীশ ও যোগজীবন যমুনায় যান স্নানে। কুলদাকান্ত নীচে কুয়ার পাশে মুখ ধোন; যোগমায়া দেবী জিজ্ঞাসা করেন, 'যমুনায় যাবে না, কুলদা?' 'হ্যাঁ, মা। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?' যোগমায়া দেবী বলেন, 'তুমি যাও। আমি পরে যাব। তোমার ঘটিটি দাও তো।' কুলদাকান্ত ঘটি এগিয়ে দেন, কিন্তু পর মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে তিনি দেখেন মাঠাকরুণ নেই। নিমেষের মধ্যে কোথায় গেলেন? কি করেই বা গেলেন? স্নান করে ফিরে এসেও কুলদা তাঁর সন্ধান পান না। একে একে সকলে ফিরে আসেন যমুনা থেকে। তন্ন তন্ন করে তাঁরা খোঁজেন যমুনার ঘাটে, তীরে ও আশেপাশে। পথ-ঘাট তিনি চিনেন না। একা কখনও বের হন নি। বেলা একটায় গিয়ে প্রভুকে জানাতেই তিনি সহজভাবে বলেন, 'কোথায় আর যাবেন? তালাস করে দেখ। যমুনার তীরে দেখেছ?' একটু পরেই গোসাঁই মৃদু হেসে বলেন, 'তাঁকে এখন আর খুঁজে পাবে না। পরমহংসজী তাঁকে নিয়ে গেছেন। গতরাত্রে যখন তাঁকে অন্যত্র থাকতে বলি, তিনি রাজী হলেন না। অনেক বুঝায়ে বললাম, কিছুতেই সম্মত হলেন না। তখন আমি পরমহংসজীকে স্মরণ করলাম। তিনি তখনই আমাকে বলেন, "এজন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কোনও চিন্তা নেই। কালই ওঁকে নিয়ে যাব।" তিনি ওঁকে নিয়ে গেছেন, খোঁজ করা বৃথা। পরমহংসজী সূক্ষ্ম শরীরে এসেছিলেন, তাঁকে দেখবে কি করে? যোগীরা ইচ্ছামাত্র স্থূল দেহকে সূক্ষ্মে পরিণত করতে পারেন। সূক্ষ্মকে স্থূল করতে পারেন। শরীরকে পঞ্চভূতে মিলায়ে মুহূর্তমধ্যে ওঁকে নিয়ে গেছেন।' ৩০ আষাঢ় (১২৯৭) ভোরে অসময়ে দামোদর এসে হাজির। গোসাঁইজীকে প্রণাম করে তিনি কেঁদে কেঁদে বলেন, 'বাবা, দাউজী হম্‌কো বহুৎ মারা হ্যায়।' সর্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্ন। দাউজী তাঁকে স্বপ্নে শাসন করে বলেছেন, 'পাজি, পাষণ্ড, তোর এত সাহস! ভাল করে ভোগ দিস না! গোসাঁই খেতে পারেন না, তাঁকে ক্লেশ দিচ্ছিস্‌। আজ তোকে ছাড়ব না।' তাঁর গাল, মুখ ফোলা। প্রভুজী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'দামোদর, তুমি ভাগ্যবান। দাউজী মহারাজ তোমাকে শাসন করেছেন—এ তো তোমার মহাভাগ্য। ভক্তি করে তাঁর সেবা-যত্ন কর। তিনি তোমার কোন অভাব রাখবেন না।'[১]

১ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১২৯৭ কুতুবুড়ী বলেন, 'আজ মা আসবেন; যখন নীলমণি

---

[১] শ্রীমদ্‌ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পত্রাঙ্ক ২৬

দাদার ওখানে ভাগবত পাঠ শুনছিলাম তখন আমার পাশেই ছিলেন; তিনিই বলেছেন।' সন্ধ্যায় অনঙ্গ বৈষ্ণবী এসে দামোদরকে খবর দেয়, 'তোমাদের মা-গোসাঁই আছেন আমাদের কুঞ্জে। কখন কিভাবে এলেন, কেউ দেখে নি।' প্রভুকে খবর দিতেই তিনি যোগজীবনকে গিয়ে নিয়ে আসতে বলেন। দাউজীকুঞ্জের পর দুখানা বাড়ী ছেড়েই বৈষ্ণবীর কুঞ্জ। দামোদর যান যোগজীবন ও শ্রীধরের সঙ্গে। যোগমায়া দেবীর পরনে গৈরিক বসন। তিনি এসে প্রভুকে প্রণাম করেন। গোসাঁই হৃষ্টচিত্তে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। প্রভুই তাঁকে গেণ্ডেরিয়ায় সন্ন্যাস দিয়ে গৈরিক দিয়েছিলেন। তখন দুদিন গৈরিক পরেও ছিলেন। লোকের চোখে পড়ে বলে তিনি তা তুলে রেখেছিলেন। আশ্রমবাসীরাও গোপন রেখেছিলেন।

যোগমায়া দেবী প্রভুর প্রসাদের ভুক্তাবশেষ পেয়ে বারান্দায় তাঁর আসনের কাছে বসে বাতাস করেন।

যোগজীবন ও শ্রীধর, মাঠাকরুণ কি করে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন জানতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। যোগমায়া দেবী প্রভুকে বাতাস করতে করতে বলেন—'পরমহংসজী পাঁচজন মহাপুরুষ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, এক-একজন ছয়-সাত হাত উঁচু। সকলের মাথায় পাগড়ী। তাঁরা আমাকে যমুনায় নিয়ে গেলেন। স্নানের পর আমাকে কোথায় কিভাবে নিয়ে গেলেন কিছুই স্মরণ নাই। দেখি পাহাড়ে রয়েছি। বড় চমৎকার স্থান। আমার রক্ষকরূপে ঐ পাঁচজন মহাপুরুষকে পরমহংসজী নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরা সব সময় আমার কাছে কাছে থাকতেন। আমি ইচ্ছামত বেড়াতে পারতাম। সে স্থান-মাহাত্ম্য এমন যে সেখানে মনে কোন উদ্বেগ স্থান পায় নাই। বড়ই আনন্দ ও শান্তিতে ছিলাম। তাঁরাই আবার আমাকে এখানে এনে রেখে গেলেন।'

শ্রীধর, কুলদাকান্ত, যোগজীবন সকলেই ভয়ে ভয়ে আছেন—মা-ঠাকরুণকে না প্রভু অন্যত্র থাকতে বলেন! প্রভুপাদ বলেন, 'গুরুজী আমাকেও সূক্ষ্ম শরীরে নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেন, তারপর মন্দার পর্বতে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি আমাকে ঊর্ধরেতা করে দেন। ওঁর জন্যেও বললাম। ওঁকেও তিনি সেই অবস্থা দিলেন। পরে আমাকে বলেন, 'তুমি তো সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়েছ। তুমি পাহাড়-পর্বতেই থাক আর বাড়ী-ঘরেই থাক—সর্বত্রই তোমার অবস্থা এক প্রকার। ওঁকে তুমি এখানেই রাখ; ভালই হবে।" গুরুদেবের আদেশ মতই আবার ওঁকে আনা হয়েছে। না হলে আমিই উত্তরকুরুতে যাব মনে করেছিলাম।'

১২ শ্রাবণ, (১২৯৭) কুলদাকান্তকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দেন প্রভু। তাঁর নাম হয় কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।

যোগমায়া দেবী নিজের হাতে সকলের আহারাদির ভার নেন। টাকা-পয়সা পূর্বে যেমন আসতো তেমনই আসে। অথচ কোন কিছুরই অভাব নেই। ভাণ্ডার সব পরিপূর্ণ। নিত্য নয়-দশজন দুবেলা প্রসাদ পান। তাছাড়া নিমন্ত্রণাদি লেগেই থাকে। যোগমায়া দেবী ছোট একটি পিতলের হাঁড়িতে মাত্র একবার অন্ন রাঁধেন। পাত্রটিতে এক সেরের বেশী চাল ধরে না। ডাল, ব্যঞ্জন পাঁচ-ছয় রকম। ছোট একটি কড়াতে প্রস্তুত করেন। পাত্র ছোট হলেও অন্ন বা ব্যঞ্জন দুবার কখনও তিনি রাঁধেন না। কুড়ি-পঁচিশজন লোক প্রসাদ পেলেও না। প্রেমসখী ভোগ রান্নার সময় মাকে সাহায্য করেন। ঐ ঘরে আর কারও যাবার অনুমতি নেই। রান্নার পর তিনি দাউজীর ভোগ লাগান। ভোগ সরিয়ে সমস্ত প্রসাদ রসুই ঘরে রাখা হয়।

ঐখানেই আহারের ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্ন-ব্যঞ্জন দ্বারা তিনি স্বহস্তে পরিবেশন করে সকলকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান। মা ও মেয়ে সকলের পরে প্রসাদ পান। প্রসাদের কি সুস্বাদ! একদিন প্রসাদ পাবার পর কুলদানন্দ যোগমায়া দেবীর কাছে বসতেই তিনি বলেন, 'কুলদা, শীঘ্রই তোমায় দেশে যেতে হবে।'

—মা, ভবিষ্যতের সব ঘটনা কি আপনার নিকট প্রকাশ পায়?

—সবই কি আর প্রকাশ পায়? বিশেষ বিশেষ ঘটনা জানা যায়। আর পাঁচ-সাত দিনের ঘটনা সব সময়ই প্রকাশ পায়। তারপর তিনি বলেন, 'শান্তিকে আমার নামে একখানি চিঠি লিখে দাও। আমার যা কিছু সবই শান্তির। গেণ্ডেরিয়া আশ্রম শান্তিরই। সে যেন ঐখানেই স্থির হয়ে থাকে।' চিঠি লিখা হলে যোগমায়া দেবী তাতে স্বাক্ষর করেন।

একদিন লালের প্রসঙ্গ উঠতে যোগমায়া দেবী বলেন, 'লালের ভিতর অনেক আশ্চর্য শক্তি দেখেছি।' কুলদানন্দ সায় দিয়ে, ভাগলপুরে কি কি দেখেছেন সে-সব খুলে বলেন। প্রভু সব কথা স্থির হয়ে শুনে বলেন, 'পুনঃ পুনঃ লালকে এ সব করতে নিষেধ করেছি। কিছুতেই শুনে না। এরপর ঠেকে শিখবে।' কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী বিস্মিত হয়ে বলেন, 'কেন? আপনি নাকি আমাদের কারও কারও ভার তাঁর উপর দিয়েছেন। তাঁদেরই কল্যাণ করতে সে সাধ্যমত চেষ্টা করে।' প্রভু শুনে বলেন, 'সে কি? এ-সব তুমি কি বলছ? পরিষ্কার করে বল। লাল তোমাকে যা বলেছেন, ঠিক তা-ই বল।' কুলদানন্দ বলেন, 'লাল আমাকে পূর্বেও একবার বলেছিলেন, এবারও ভাগলপুরে বলেন, "গোসাঁই বৃদ্ধ হয়েছেন। এতগুলি লোকের বোঝা আর কতদিন তিনি বইবেন? তাই আমাদের তিন জনের উপর সকলের ভার তিনি দিয়েছেন। কতক শ্যামাকান্ত পণ্ডিতের উপর, কতক বিহারী নামে অবাঙ্গালী সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতার উপর, আর অবশিষ্ট আমার উপর।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কার ভাগে পড়েছি?" লাল বলেন, "তুমি আমার ভাগে আছ।"' প্রভু এ-সব কথা শুনে বলেন, 'বটে এতটা হয়েছে? বড় বেশী বেড়েছে। মহাপুরুষদের কৃপায় সামান্য একটু সর্ষপ-বিন্দু পেয়েই অভিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। খুব শীঘ্রই ঐ কণাটুকু তুলে নিলে সে যে নিজে কি, তখন বেশ বুঝবে। থাম।' এই বলে আসনে থেকেই প্রভু একবার একটু ডানে আবার বামে নড়লেন। তখনই মনে হল আজ প্রলয় ঘটল। লালের সর্বনাশ হল। আর নিস্তার নেই।

লাল (কল্যাণবিহারী বসু) বয়সে তরুণ হলেও গোস্বামীপ্রভুর অহৈতুকী কৃপায় তিনি অসাধারণ এক দুর্লভ অবস্থায় উন্নীত হয়েছিলেন। প্রভুর কৃপাসাপেক্ষ এই অতীন্দ্রিয় বিদ্যা আয়ত্ত করেও লাল এর যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারেন নি। লালকে সত্যভ্রষ্ট জেনে, গোসাঁইজী তাঁর এই জাতিস্মর ও শক্তিধর শিষ্যের প্রতিও অনুকূল ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। গোস্বামীপ্রভু মায়াতীত পুরুষ। তাঁর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব নেই। লোকোত্তর মহাজনদের অন্তর বজ্রের চেয়েও কঠোর আবার কুসুম অপেক্ষাও কোমল।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহিবিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥

একদিন গৌরকিশোরদাস বাবাজী গোস্বামীপ্রভুকে একান্তে পেয়ে সংগোপনে

বলেন, 'প্রভো, আমি রাধারানীর কৃপায় অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনলীলা-দর্শনের অধিকার পেয়েছি। কখনও কখনও লীলারস সম্ভোগও করি। কিন্তু স্থায়ী হয় না। এই দুঃখে দিবানিশি আমার প্রাণ হু-হু করে। শাস্ত্রে আছে সদ্‌গুরুর কৃপা না হলে শ্রীবৃন্দাবনের মধুরলীলায় প্রবেশ-অধিকার স্থায়ী হয় না। আমি জেনেছি আপনিই সদ্‌গুরুরূপে ভাগ্যবানদের কৃপা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাকে এ বস্তু দিয়ে কৃতার্থ করুন।' তাঁর আকুতি দেখে প্রভু নীরব থাকেন।

গ্রীষ্মে শ্রীবৃন্দাবনে একে অসহ্য গরম, এর উপর মশা। সন্ধ্যা হতে না হতে মশার যে কি দৌরাত্ম্য! প্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসেন তাঁর মশারী ছিল। কয়েকদিন পর রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) জ্বর শুনে তাঁকে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ে তাঁর মশারী নেই। কুঞ্জে ফিরে চারটি পেরেক, সুতলি ও নিজের মশারী নিয়ে রাখাল মহারাজের উপর নিজের হাতে তিনি টানিয়ে দিয়ে আসেন।

যোগমায়া দেবী সারারাত এখন তাঁকে বাতাস করেন। এদিকে কুতু মশার কামড়ে বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করে। কুতু একদিন প্রভুকে বলেন, 'বাবা, শ্রীবৃন্দাবনে হিংসা করতে নেই; কিন্তু মশা তাড়াতে গিয়ে যে হিংসা হয়ে যায়।' প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই মশা মারিস্‌ নাকি!' কুতু বলেন, 'আপনার কি মশার কামড় লাগে না?' প্রভুপাদ ঘাড় নাড়েন। তারপর বলেন, 'এখন আর লাগে না। প্রথম খুব লাগত। একদিন মশা তাড়াতে হাতের উপর হাত বুলাতে গিয়ে দেখি হাত ভরতি মশা। তখন আর কি করি! তাড়াতে গেলেই শত শত মরে! হাত-পা না নেড়ে স্থিরভাবে থাকি। সারারাত এত রক্ত খেল যে ভোরে শরীর অবশ বোধ হল। কিন্তু তাতে উপকারই হল। আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হত। সেদিন থেকে আর জ্বর নাই, মশার কামড়ও আর লাগে না। আর সইতে না পারলে মশাকে বলতে পারিস্‌ না, "আমাকে কামড়াবে না।"' 'মশা কি আর কথা শুনবে?' প্রভু বলেন, 'শুনবে না? আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, "মশা, তোমরা কুতুকে কামড়াবে না।" এর পরে যদি কামড়ায় আমাকে বলিস।' ঐদিন থেকে আর একটি মশাও তাঁকে কখনও কামড়ায় নি।

শ্রীবৃন্দাবনে আহারের পর এঁটো হাতে সকলে রজঃ মাখেন। উচ্ছিষ্ট মুখে রজঃ ডলেন। প্রভুপাদ বলেন, 'শ্রীবৃন্দাবনে মাটি বলতে নাই, রজঃ বলতে হয়। ব্রজের রজঃ বড় পবিত্র। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের মাটির সঙ্গে এর তুলনা হয় না। উচ্ছিষ্টাদি এই রজঃ সংস্পর্শে শুদ্ধ হয়। শ্রীবৃন্দাবনে জল অপেক্ষা রজঃই অধিক পবিত্র।'

প্রভুর সঙ্গে অপরাহ্নে সকলে বের হয়ে মদনমোহন দর্শন করে যমুনার তীরে যান। একটি প্রাচীন বৃক্ষের নীচে তাঁরা বসেন। প্রভু বলেন, 'এটি সেই বহু প্রাচীন কেলি-কদম্বের গাছ। প্রবাদ আছে, এই গাছের উপর উঠেই শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমনের সময় যমুনায় লাফিয়ে পড়েছিলেন। এতে আপনা-আপনি 'রাধাকৃষ্ণ', 'রাম রাম', 'রাধাশ্যাম' এই সব নাম দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হয়ে রয়েছে। পাণ্ডারা যাত্রীদের থেকে অর্থ আদায়ের জন্যও কখনও কখনও লিখে রাখেন; কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় কোন্‌টি স্বাভাবিক, কোন্‌টি নকল। পাণ্ডারা অর্থোপার্জনের লোভে এ-সব স্বাভাবিক বস্তুর নকল করতে গিয়ে মূল জিনিসের উপর লোকের সন্দেহ সৃষ্টি করেছেন। এ-সব মহা অপরাধ।' তারপর তিনি বলেন, 'এক কাজ কর, গাছের যে সকল পুরু ছাল শুকিয়ে একটা দিক ছেড়ে গিয়ে আলগা হয়ে

গেছে, তারই ভিতর চেয়ে দেখ। সেখানে তো আর লিখতে পারবে না।' সত্যি সত্যি দেখা যায়, 'রাধাকৃষ্ণ', 'রাম রাম' বৃক্ষের শিরায় লেখা হয়ে আছে। উঁচুতে শাখা-প্রশাখায় ডালে-ডালে সুস্পষ্ট অক্ষর দেখা গেল। সে-সব স্থানে কারও পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।

একদিন সকালে প্রভু কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে ডেকে বলেন, 'কয়েকদিন হরিমোহন মথুরায় মনোমোহনের বাসায় জ্বরে কষ্ট পাচ্ছেন। তোমাকে দেখতে চান। আজই গিয়ে দেখে আসা ভাল।' সতীশও সাথী হন। শ্রীধর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। তিনি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ওঁদের ঘুরপাক খাইয়ে নিয়ে চলেন। একটি বটগাছ দেখিয়ে তিনি বলেন, 'প্রণাম করে দেখ। এটি গোসাঁই আবিষ্কার করেছেন।' বৃক্ষটির সর্বাঙ্গে দেবমূর্তি, গোড়ার দিকে স্পষ্টরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব, গণেশের মূর্তি আপনা-আপনি হয়ে আছে। ফিরে এসে কুলদানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই বৃক্ষটি কি আপনিই প্রথম বের করেছিলেন? ঐ সব মূর্তিতে সিঁদুরের ফোঁটাও দেখতে পেলাম।' প্রভু বলেন, 'পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার সময় ঐ গাছটি দেখি। তখন পর্যন্ত গাছটির দিকে কারও লক্ষ্য পড়ে নাই। যাঁরা সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের ঐ গাছে দেব-দেবীর মূর্তি দেখাতেই তাঁরা প্রচার করে দেন। এখন পান্ডারা ঐ গাছটি দেখিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে প্রণামী নেন। সিঁদুরও পান্ডারাই দিয়েছেন।' কুলদানন্দ বলেন, 'গাছটি অদ্ভুত! শুনলাম ঐ সব দেব-দেবীরা না কি প্রকৃতপক্ষে ঐ গাছটি আশ্রয় করে আছেন।' প্রভু বলেন, 'আরে বাপু, কত দেব-দেবী, ঋষি-মুনি এই শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ পাবার জন্য লালায়িত। এ স্থানে প্রতিটি রজঃকণায় মহাবিষ্ণু রয়েছেন।'

প্রভুপাদের অনুমতি নিয়ে যোগজীবন গেছেন ভাগলপুর, চাকরীর চেষ্টায়। মথুরবাবু তাঁকে যেতে লিখেছিলেন। হরিমোহন সুস্থ হয়ে মথুরা থেকে ফিরেছেন। তিনি ভাগলপুরে ফিরে যেতে উদ্‌গ্রীব। কুলদানন্দকে বলেন, 'বেশ ছিলাম ওখানে! কী যে ভূত ঘাড়ে চাপল—এখানে চলে এলাম। দুর্মতি আর কাকে বলে! ধর্ম-কর্ম তো সব জায়গায়ই হতে পারে। দেহের ক্লেশ আর সহ্য হয় না। আত্মীয়-স্বজনের কাছে থাকাই নিরাপদ। শরীর একটু সবল হলেই ভাগলপুর যাব।' কথায়-কথায় প্রভুর কানে এসব গেলে তিনি বলেন, 'তীব্র বৈরাগ্য না জন্মালে কর্মের শেষ হয় না। জোর করে কি আর কর্ম শেষ হয়? হরিমোহনকে পূর্বে পুনঃ পুনঃ এ-সব কর্ম শেষ করে নিতে বলেছিলাম। এখন দেখ, সন্ন্যাস নিয়ে অনুতাপ পর্যন্ত করলেন। এই অনুতাপে ওর সবই তো নষ্ট হয়ে গেল। এখন দস্তুরমত কর্মটি শেষ করে না এলে কিছুতেই হরিমোহন স্থির হতে পারবেন না। কিছুই আর হবে না।' প্রভুর মন্তব্য শুনে স্বামীজী শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগের সঙ্কল্প করেন।

প্রভু কুলদানন্দকে বলেন, 'তুমিও কিছুদিন ফয়জাবাদ গিয়ে হরকান্তের কাছে থেকে এস।' সতীশকে বলেন, 'তোমারও দেশে ফিরে পিতার শ্রাদ্ধ করা উচিত, আর মায়ের সেবা করা ভাল।' সতীশ প্রভুকে ছেড়ে যেতে রাজী হন না।

সন্ধ্যার পূর্বে একদিন সকলকে নিয়ে যমুনায় গিয়ে প্রভু চীরঘাটে একটি গাছের নীচে বসেন। অপর পারে বেলবাগের দিকে তাকিয়ে প্রভু সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। কুঞ্জে ফিরে এলে কুতুবুড়ী এক ঘটি জল নিয়ে আসেন পিতার পা ধুয়ে দিতে। গোসাঁইজী বাধা দিয়ে বলেন, 'আরে থাম। বিড়ালের গু পাড়িয়েছি, পায়ে

এখনও লেগে আছে। ওর হাতে গন্ধ লাগবে।' কুতু পা ধুয়ে দিতে দিতে বলেন, 'আপনার পায়ে লাগার পরও কি আর গন্ধ থাকে?' কুতু জিজ্ঞাসা করেন, 'আজ সমাধির সময় কেন বলে উঠলেন বাবা, "ডুববে না, ডুববে না?" এই কথা কাকে বলেছিলেন?' প্রভু বলেন, 'আর কাকে বলব? যমুনাতীরে গিয়ে বসতেই কৃষ্ণ নৌকা নিয়ে এলেন। আমাকে বলেন, "ওঠ! একবার যমুনায় 'বাচ' খেলি গিয়ে।" কৃষ্ণের কথায় নৌকায় ওঠলাম। কৃষ্ণ গলুইয়ের উপর ছিলেন। মাঝ-যমুনায় নৌকা নিয়ে গলুইটি জলের ভিতর চেপে ধরলেন, নৌকা তখন ডুবে ডুবে। নৌকায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন। আমিও দেখলাম নৌকাখানা ডুবু-ডুবু। তখন মনে হল কৃষ্ণ ভয় দেখাচ্ছেন। গলুই দিয়ে জল উঠলে কৃষ্ণই আগে ডুববেন। তাই সকলকে বলেছিলাম, "ভয় নাই, ডুববে না, ডুববে না—এ সব কৃষ্ণের চালাকী।"'

কুতুবুড়ী একদিন প্রভুকে বলেন, 'বাবা, এখানে এসে গেণ্ডেরিয়ায় আমাকে চিঠি লেখেন নাই কেন?' প্রভুপাদ বলেন, 'তুই তো সব সময়ই আমাকে দেখতে পেতি। তোকে আবার চিঠি লিখব কি?' কুতু বলেন, 'দেখতে পেয়েছি বলে কি চিঠি লিখতে নেই?' গোসাঁই বলেন, 'দেখতে পেলে, কথা শুনতে পেলে আর চিঠির কি প্রয়োজন?' কুতু উত্তর দেন, 'দেখতে পেতাম ঠিকই কিন্তু কথা তো সব সময় শুনতে পেতাম না।' প্রভু বলেন, 'সব সময় কথা শুনলে কি আর ভাল লাগত?'

সেদিন কালীদহে মেলা। প্রভুপাদ বের হন সকলকে নিয়ে। যেতে যেতে মেয়েরা পেছনে পড়েন। মেলায় পৌঁছার পূর্বে একটি লোকের দিকে তাকিয়ে গোসাঁই থমকে দাঁড়ান। পরনে তাঁর কৌপীন আর মলিন জীর্ণ বহির্বাস। আকৃতি দীর্ঘ ও শীর্ণ। সর্বাঙ্গে রজঃ। মুটে-মজুরের মত দেখতে, কিন্তু চোখে অসাধারণ জ্যোতি। একশত গজ দূর থেকে নাচতে-নাচতে পাশ কাটিয়ে যান। তাঁর সম্বন্ধে প্রভু বলেন, 'ওঁরা লোকালয়ে বড় আসেন না। হিমালয়ের উপরেই থাকেন। নীচে বড় নামেন না। যখন আসেন, এরূপ ছদ্মবেশেই তীর্থাদি ভ্রমণ করে চলে যান; তাঁর পা দুটি ভূমি থেকে আধ হাত উপরে ছিল, রজে তিনি চরণ স্পর্শ করেন নাই। পূর্বে আর একবার এই মহাত্মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।' কুলদানন্দ বলেন, 'তিনি তো দাঁড়ালেনও না। আপনার সাথে কোন কথাও তো হল না।' প্রভু বলেন, 'যা কিছু বলার সবই বলেছেন। আকারে-ইঙ্গিতে-দৃষ্টিতে—নানা উপায়ে তাঁরা কথা বলে থাকেন।' কুলদানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, 'ওঁর সঙ্গে পূর্বে কোথায় পরিচয় হয়েছিল?' প্রভু বললেন, 'কয়েক বছর আগে এই পরমহংসটি, একজন হঠযোগী সাধু ও আমি কৈলাসে যাবার সঙ্কল্প করে যাত্রা করলাম। অনেক দূর পাহাড়ের পথে চলে চলে একটি খুব উঁচু পর্বতে গিয়ে পৌঁছলাম। একটি লোক এসে আমাদের বাধা দিয়ে বললেন, "ঐ পাহাড়ের উপর যেতে হুকুম নেই। ওখানে উঠলে মানুষ পাথর হয়ে যায়।" বহুদূরে তিনটি মানুষ দেখিয়ে তিনি বলেন, "ঐ দেখুন ওরা সব পাথর হয়ে গেছে।" ঐ পাহাড়ে উঠবার পথে খোদাই করা অক্ষর আছে—"অত্র অগ্রে ন গচ্ছন্তি।" পাহাড়ের ঐ প্রকার অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাবার সময় ঐ সাবধান বাণী লিখে গিয়েছিলেন পাছে কেহ ঐ পথে চলে বিপন্ন হন। হঠযোগ আমার অভ্যাস নাই এই ভেবে আমি ফিরে এলাম, কিন্তু ঐ সন্ন্যাসী দুজন ফিরলেন না। ভগবান আশুতোষ কৃপা করে

আমাকে কৈলাসে নিয়ে যান। ঐ সন্ন্যাসীদ্বয় আমাকে ওখানে দেখে যেন আকাশ থেকে পড়েন।'

প্রভুপাদের শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতির সময় যমুনার তীরে একটি সমাধির ভগ্নস্তূপের মধ্যে একখানি অস্থি দেখা যায়, তাতে দেবনাগরী হরফে তারকব্রহ্ম নাম লেখা। গৌরকিশোরদাস বাবাজী খবর পেয়ে প্রভুকে নিয়ে দেখতে যান। গোসাঁই বলেন, 'এটি এক সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মার অস্থি। শ্বাস-প্রশ্বাসে তিনি গুরুদত্ত মন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

জপ করতেন। সেই নাম শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হয়ে অস্থি পর্যন্ত স্পর্শ করেছে।' সমারোহে সংকীর্তন করে আবার এটি সমাধিস্থ করা হয়।

দাউজীকুঞ্জে একদিন এক সন্ন্যাসী এসে গোস্বামীপ্রভুকে নিভৃতে বলেন, 'বহুদিন সাধন-ভজন করে আমি একটি সিদ্ধমন্ত্র পেয়েছি। ইহা দ্বারা ইচ্ছামাত্র যে কোন বস্তু মিলে। দেহরক্ষার পূর্বে মন্ত্রটি আপনাকে শিখিয়ে দিতে চাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এই শক্তি ধারণ করার লোক আর পেলাম না।' প্রভু বিনীত হয়ে বলেন, 'আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। এতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।' কিন্তু কে তাঁর কথা শুনে? সাধু মন্ত্রটি বলে বিদায় নেন। একদিন গোবিন্দজীর প্রসাদী মালা ইচ্ছা করে প্রভু মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন। এক বাবাজী এসে তখনই গোবিন্দজীর একগাছি প্রসাদী মালা তাঁর হাতে এনে দেন। আর কখনও তিনি এই মন্ত্রের ব্যবহার করেন নি।

শ্রীবৃন্দাবনে একটি সাধুর সঙ্গে গোসাঁইজীর পরিচয় হয়। একদিন তিনি গোস্বামীপ্রভুকে বলেন, 'আগামীদিন সকালে আমার ওখানে আপনি একা আসবেন; আপনাকে বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করাব।' প্রভুর পাশে বসে তিনি জপ করতে থাকেন। গোসাঁইরও শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম চলে। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখেন সুন্দর পরিষ্কার চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। দর্শনে কোন ভাব-ভক্তি হল না। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম—কোন চিহ্নই নেই। গোসাঁই ঐ মূর্তির দিকে তাকিয়ে নাম করতেই থর-থর করে এক প্রেত মাটিতে পড়ে চিঁ-চিঁ করে চীৎকার করতে থাকে, বিষ্ণুমূর্তি অদৃশ্য হয়। সাধু তখন কাতর হয়ে বলেন, 'ছোড় দিজিয়ে মহারাজ।' 'তুম্ প্রেত সিদ্ধ হো?' 'হ্যাঁ।' 'তুমি লোককে এভাবে ঠকাও কেন?' 'আপনি অনুসন্ধান করে দেখুন আমি এর থেকে একটি পয়সাও নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করি না। অর্থ দ্বারা লোকহিতের জন্য পুকুর ও ইন্দারা করি। পথ-ঘাট ঠিক করে দেই আর দুঃখীদের সাহায্য করি। আর এমন লোক থেকে অর্থ নেই, যারা মদ ও মেয়েমানুষে অর্থের অসদ্ব্যবহার করে।' ফিরার সময় সাধু খুব কাতর হয়ে অনুরোধ করেন, 'যতদিন আপনি শ্রীবৃন্দাবনে থাকেন কাকেও আমার প্রেতসিদ্ধির কথা বলবেন না।' প্রভু বলেন, 'সাধুটি লোক ভাল ছিলেন এবং উদ্দেশ্য ভাল ছিল।' প্রভুজী বলেন, 'এবার শ্রীবৃন্দাবনে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তিনি খাঁটি সোনা অতি সহজে প্রস্তুত করতেন। তাঁর উপর তাঁর গুরুর আদেশ ছিল শুধু সাধুসেবার জন্য তিনি যেন সোনা বানান। একদিন দাউজীকুঞ্জে এসে প্রভুপাদকে তিনি বলেন, 'একজন সাধুকে আমার প্রক্রিয়াটি শিখাতে হবে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আপনাকে শিখাব'—এই বলে একটি তামার পাতে একটি পাতার রস দিয়ে তিনি আগুনে ফেলে দিলেন। পাঁচ-সাত মিনিট পরে আগুন থেকে তুলতেই

উৎকৃষ্ট সোনা হল। প্রভু তাঁকে বলেন, 'এ-সব শিখে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই বিদ্যা আপনি জানেন বলে কত লোক আপনার পিছনে সর্বদা লেগে আছে! এ-সব উৎপাতে কি প্রয়োজন? একমুঠ চাল ভগবান দিবেনই, তখন আর এ-সবে কি দরকার?' শিষ্যদের তিনি বলেন, 'এ-সব শিখতে নাই। শিখলে ধর্ম-কর্ম চুলায় যায়।' ভগবানের কৃপা যাঁরা লাভ করতে চান—এ সব তাঁদের কাছে বিষম প্রলোভন। এ সমস্ত প্রলোভন উপস্থিত হলে থু-থু দিয়ে অগ্রাহ্য করতে হয়।'

চৌরাশী ক্রোশ ব্রজের সিদ্ধমহান্ত কাঠিয়াবাবার শিষ্য অভয়নারায়ণ রায় শ্রীবৃন্দাবনের পথে স্বপ্ন দেখেন তাঁর গুরু তাঁকে বলছেন, 'চল্‌ তুম্‌কো এক আসল মহাত্মা দর্শন করায়েংগে।' এই বলে তিনি তাঁকে দাউজীকুঞ্জে নিয়ে যান। এই কুঞ্জের নাম তাঁর জানা ছিল না। শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছে দাউজীকুঞ্জে উপস্থিত হয়ে প্রভুকে দর্শন করে তিনি মুগ্ধ হন। কাঠিয়াবাবার কাছে যেতেই তিনি বলেন, 'দেখ স্বপন তো প্রত্যক্ষ হুয়া হ্যায়! ওহি সাচ্চা সাধু। চলো হামভি দর্শনকো আস্তে তুম্‌হরা সাথ যায়েংগে।' এই বলে অভয়বাবুর সংগে তিনি দাউজীকুঞ্জে যান। গোসাঁইজী কাঠিয়াবাবাকে পরম সমাদরে বসান ও ভোজন করান। পরাহ্নে প্রভুও কাঠিয়াবাবার আশ্রমে যান। উভয়ে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটান—কোন কথা হয় না। কুঞ্জে ফিরে এসে ও-কথা উঠায় তিনি বলেন, 'মুখে কথা না বলেও অন্তরে অন্তরে মহাপুরুষেরা কথা বলেন।' একদিন গোসাঁইজী কাঠিয়াবাবাকে প্রণাম করে কাছে বসতেই তিনি প্রভুর জানু স্পর্শ করে বলেন, 'বাবা, হম্‌ আপকা বালক হ্যায়।' গোসাঁইজী তখন তাঁকে আলিংগন করেন।

শ্রীবৃন্দাবনের সাধুদের মাঝে কানাঘুষা হয়। প্রভুপাদ সন্ন্যাসী হয়েও যোগমায়া দেবীর সংগে একই কুঞ্জে আছেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে ঈদৃশ আচরণ শুধু অশোভনই নয়, অনুচিতও। কাঠিয়াবাবার কানেও কথাটি ওঠে। শুনে তিনি বলেন, 'গোস্বামীপ্রভু সামর্থী, ঊর্ধ্বরেতা ও নিষ্কাম পুরুষ। তিনি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।'

শুক্রবার, ১৪ শ্রাবণ, ১২৯৭ জন্মাষ্টমী। শ্রীবৃন্দাবনের মন্দিরে-মন্দিরে ও ঘরে-ঘরে আনন্দোৎসব। প্রভু যান শৃংগারবটে—নন্দোৎসবে। সাথে শ্রীধর, সতীশ, কুলদানন্দ, অভয় রায়, রাখাল মহারাজ ও আরও অনেকে। ব্রজবাসীরা হাঁড়ি হাঁড়ি দধি এনে তাতে হলুদ মিশিয়ে সকলের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেন। এতে সকলেরই আনন্দ। সংকীর্তনে বাবাজীরা নেচে নেচে পিচ্ছিল প্রাংগণে একজনের উপর আর একজন পড়েন। শ্রীধরের সর্বাংগে দধি-হরিদ্রা। তিনি ব্রজবাসীদের সংগে মেতে ওঠেন। গোস্বামীপ্রভু ভাবাবেশে ছোটাছুটি করেন এবং সমাধিস্থ হয়ে পড়ে যান। তিন ঘণ্টা পরে সমাধি ভাঙলে যমুনায় স্নান করে প্রভু কুঞ্জে ফিরেন।

বনপরিক্রমা ও যোগমায়া দেবীর ব্রজধামপ্রাপ্তি

দ্বাদশটি বন নিয়ে চৌরাশি ক্রোশব্যাপী ব্রজমণ্ডল। পূর্বে সমগ্র ব্রজস্থলীই ছিল উদ্ভিদপূর্ণ। শ্রীবৃন্দাবনের একাংশে দেবালয়গুলি গড়ে উঠেছে। পথ-ঘাট হবার পর লোকসমাগম-হেতু পৌরসংস্থার উদ্ভব হয়ে শহরে পরিণত হয়েছে।

তথাপি এই অংশে নিকুঞ্জবন ও নিধুবন প্রাচীরবেষ্টিত হয়ে শোভা পায়। আর অবশিষ্টাংশ পূর্বের ন্যায়ই আছে। এ সব বনভূমির মধ্যে অবস্থিত প্রান্তরে ও পাহাড়ে যশোদানন্দন ব্রজবালকদের সঙ্গে গোচারণে যেতেন। প্রকৃতির নিভৃত কুঞ্জে তিনি গোপীদের সঙ্গে লীলারস সম্ভোগ করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কংস-কারাগারে আবির্ভাবের সময় দেবতারা সমগ্র ব্রজভূমি পরিক্রমা করেছিলেন। মহাপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামীপাদগণ এর পুনঃ প্রবর্তন করেন। প্রতি বছর জন্মাষ্টমীর পরবর্তী একাদশী তিথি থেকে পরের দ্বাদশী তিথি পর্যন্ত সতের দিন ধরে এই পরিক্রমা চলে। রামানুজ ও নিম্বার্ক-বৈষ্ণবসমাজে দেড় মাস ধরে চলে এই পরিক্রমণ।

এই বনবিহার উদ্‌যাপিত হয় মহাসমারোহে। শত শত ধর্মার্থী একই সময়ে সমবেতভাবে শুরু করেন এই বনযাত্রা। এ যেন চলন্ত বনমহোৎসব; হাট, বাজার, দোকান, পুলিশী ব্যবস্থা সবই যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে চলে।

গোস্বামীপ্রভু সতীশ মুখোপাধ্যায় ও রাধাকুণ্ডবাসী বেণীমাধব ব্রজবাসীকে নিয়ে পরিক্রমায় বের হন। 'জয় রাধে, জয় রাধে' ধ্বনি করে যাত্রীরা মথুরার দিকে অগ্রসর হন। দুদিকে ফাঁকা প্রান্তর তাই প্রারম্ভে রোদে পথশ্রান্তি হয়। মথুরায় পৌঁছে যাত্রীরা ভূতেশ্বর মহাদেব, জন্মস্থলী, ধ্রুবটিলা, বিশ্রামঘাট দর্শন করেন। পরদিন তালবন, মধুবন, কুমুদবন অতিক্রম করে শান্তনুকুণ্ডে তাঁরা পৌঁছেন। বনের ছায়া, পাখীর কূজন, ভক্ত-সমাবেশ, নামগান মিলে মনমাতান পরিবেশ সৃষ্টি করে। কত নাম-না-জানা বিচিত্র রঙের ফুল ফুটে রয়েছে গাছে। কুমুদবনে সরোবরে ও শান্তনুকুণ্ডে অসংখ্য পদ্মফুল। কুণ্ডের মাঝে উঁচু টিলা—এর উপর মন্দির; রাধাকৃষ্ণের জীবন্ত বিগ্রহ। এখানে একজন গোপবধূ ফল ও বরফি নিয়ে গোস্বামীপ্রভু ও তাঁর সঙ্গীদের সেবা করেন। বিশ্রাম করে বেহুলা বনে পৌঁছতে দিনের আলো ম্লান হয়ে যায়। এখানেই সকলের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা। পরদিন ঊষাযাত্রা করে রাধানামের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে যাত্রীদল রাধাকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হন। পথে পড়ে সূর্যকুণ্ড। চারধাম পর্যটন করে অদ্বৈতপ্রভু এখানে অবগাহন-স্নান করেছিলেন। মধ্যাহ্নে সকলে রাধাকুণ্ডে পৌঁছেন।

যোগমায়া দেবী ও কুতুবুড়ী শ্রীধরকে নিয়ে এখানে এসে 'ধুনীঘরে' প্রভুর অপেক্ষায় ছিলেন। গোসাঁইজী এক শীতের সময় এখানে বেণীমাধব ব্রজবাসীর গৃহে কিছুদিন ছিলেন। দিন-রাত তখন ধুনী জ্বালাতে হত—এমনই ছিল শীতের প্রকোপ। তখন থেকে নাম হয় ধুনীঘর। উত্তরকালে প্রভুর স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রভুর শিষ্য-প্রশিষ্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বেণীমাধব কোঠাবাড়ী নির্মাণ করেন। বেণীমাধব ও তাঁর পুত্র যুগলকিশোরের মৃত্যু হলে তাঁদের ঋণের দায়ে ধুনীঘর বিক্রয় হয়। পরে যোগজীবন গোস্বামীর শিষ্য নোয়াখালি দালালবাজারের জমিদার শচীন্দ্রকুমার রায় ও সত্যকুমার রায় ঐ বাড়ীটি কিনে আর একটি কোঠাঘর, রান্নাঘর ও শৌচাগার করে দেন। তাঁরা প্রভুর আসন-স্থানে তাঁর পট রেখে নিত্য ধূপ-দীপাদির ব্যবস্থা করে যুগলকিশোরের পুত্র ছন্নুলালের উপর দেখাশোনার ভার দেন। তখন থেকে তার নাম হয় ধুনী-আশ্রম।

দ্বাপরের রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড মাটির নীচে চাপা পড়ে ধানক্ষেতে পরিণত হয়েছিল। গৌরসুন্দর রসিকশেখর রাধারমণ ও কৃষ্ণবিনোদিনীর এই বিলাসস্থলী দুটি উদ্ধার করেছিলেন। গোস্বামীপ্রভু প্রেমবিগলিতচিত্তে রাধাকুণ্ডে ও শ্যামকুণ্ডে

স্নান করে কুন্ড দুটি পরিক্রমা করেন। রাধাকুন্ডের তীরে রঘুনাথদাস গোস্বামীর ভজন-কুটীর ও কবিরাজ গোস্বামীর সাধন-কুটীর। কবিরাজ গোস্বামীর কুটীর দেখে গোসাঁইজীর হৃদয় ভাবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এই সেই পুণ্য কুটীর যেখানে দিনের পর দিন বসে কৃষ্ণদাস কবিরাজ অসাধ্যসাধন করেছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত তিনি এখানেই সম্পাদন করেন। অষ্ট সখীদের পৃথক পৃথক কুন্ডও এখানে আছে। লীলাস্থলী ও বিগ্রহাদি দর্শনের পর সকলে গোবর্ধনে রওনা হন। রাধাকুন্ড থেকে যোগমায়া দেবী, কুতুবুড়ী ও শ্রীধর পরিক্রমায় যোগ দেন এবং শেষ অবধি ছিলেন। রাধাকুন্ডে প্রভুর শিষ্য ভারতপণ্ডিত ছিলেন। তিনিও সঙ্গে যান।

গিরিগোবর্ধনের পথে কুসুমসরোবর-তীরে উপনীত হয়ে যাত্রীগণ রাত্রি-বাসের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এই অবকাশে প্রভুপাদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনের জন্য গোবর্ধনের দিকে অগ্রসর হন। একটি গোফার বাইরে মনুষ্যাকৃতি একটি কঙ্কাল তাঁকে ইসারায় আহ্বান করছেন দেখে তিনি তাঁর কাছে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখেন একজোড়া চোখ ও জিহ্বা ছাড়া তাঁর সবই কঙ্কাল। তিনি গোস্বামীপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে বলেন, 'ভগবানের লীলাদর্শন ও নাম-কীর্তন করার জন্য এই দুটি ইন্দ্রিয় এখনও আছে। এক একটি ইন্দ্রিয়ের বাসনা চরিতার্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার এক একটি করে অঙ্গ খসে পড়েছে। আজও একটি বাসনা পরিতৃপ্ত হল।[১] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভুকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। অদ্বৈতপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে আমার খুব সৌহার্দ্য ছিল।' বছরে তিনি একবার "হরিবোল" ধ্বনি করেন—তা এত উচ্চনাদে করে থাকেন, যা সাত-আট মাইল দূর থেকেও লোকে শুনতে পায়। প্রভু একবার সাত মাইল দূর থেকে এ ধ্বনি শুনেছেন। কিংবদন্তী আছে, ভগবানের দুই অবতারের মধ্যে পূর্ব অবতারের একজন পার্ষদ যোগাযোগ রক্ষার জন্য দেহে থাকেন। লীলার এটি অব্যর্থ নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে সখা শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করে ভান্ডীর বনে একটি গোফায় সমাধিস্থ হয়ে ছিলেন। তিনি অভিরাম গোস্বামী এই নাম পরিগ্রহ করে গৌরসুন্দরের সঙ্গে মিলিত হন।

কুসুম সরোবরে রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই যাত্রীরা প্রস্তুত হন। ঊষায় তাঁরা গোবর্ধন পরিক্রমণে বের হন। পথে বড় পদচিহ্ন দেখে ব্রজবাসীরা বলেন, 'এ বাল দাউজীর পা।' যাত্রীরা বলেন, 'বালকের পা এ কি করে হয়?' প্রভু বলেন, 'ঠিকই বলেছেন এঁরা। এই পদচিহ্ন মহাপ্রভুর।' দানাঘাটে পৌঁছে তাঁরা সেই পাথর দেখেন, যাতে বসে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করতেন। মহাপ্রভু যা স্পর্শ করে কেঁদে-কুটে হয়েছিলেন আকুল। যাত্রীরা গোবিন্দকুন্ডে পৌঁছে মাধবেন্দ্রপুরী-প্রতিষ্ঠিত গোপালের মন্দির দর্শন করে এগিয়ে যান।

পূর্বে মাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন;
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যেথা গোবর্ধন।

---

[১] অমৃতলাল সেনগুপ্ত-প্রণীত 'আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', ৪র্থ সংস্করণ—পত্রাঙ্ক ৩১০-৩১১

প্রেমে মত্ত, নাহি তাঁর রাত্রিদিন জ্ঞান;
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।৪।২০-২১

প্রভুপাদ ধীরে-সুস্থে চলেন, পুরী গোসাঁইর সঙ্গে তাঁর রসের সম্বন্ধ। তিনি অদ্বৈতপ্রভুর মন্ত্রগুরু; ঈশ্বরপুরীরও, যিনি মহাপ্রভুকে গয়াতে দীক্ষা দিয়েছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমের ভাণ্ডারী। এখানেই বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ অযাচক উপবাসী পুরী মহারাজকে নিজে হাতে করে দুধের ভাণ্ড এনে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তন্দ্রার ঘোরে পরিচয় পান, ইনি স্বয়ং গোপাল। তাঁকে গোপাল বলেন, 'যবনের ভয়ে সেবক আমাকে নিবিড় নিভৃত কাননের ভিতর রেখেছিল। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে, শীত-গ্রীষ্মে ঐখানে পড়ে আছি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তোমার প্রতীক্ষায়।' পুরী মহারাজ গোবর্ধনের উপর মন্দির করে গোপালকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সাধন-আসন ও সমাধি নিকটেই। রাধিকাপ্রসাদ বাবাজী নামে একজন সিদ্ধ মহাত্মা চল্লিশ বছর ধরে কাছেই আসন করে আছেন। তিনি গোস্বামীপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে বলেন, 'আপনাকে দর্শন করে ধন্য হলাম।' এখানে প্রভুর ভাবের কপাট খুলে যায়। তাঁর শ্রীঅঙ্গে মহাভাবের লক্ষণগুলি একে একে প্রকাশ পায়। সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপে। ভূমিতে পড়ে তিনি গড়াগড়ি দিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রয়েছে—নামের প্রভাবে মহাপ্রভুর হস্ত-পদ কূর্মের ন্যায় দেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হত। আবার কখনও বা সম্প্রসারিত হয়ে দীর্ঘবাহু হতেন। গোস্বামীপ্রভু প্রচার-বিরোধী ছিলেন; ফলে, তাঁর মহাজীবনের বহু ঘটনাই এখন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নি। গোবিন্দকুণ্ডে মহাভাবের সময় প্রভুর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বলে শোনা যায়। যোগমায়া দেবী, শ্রীধর, সতীশ, বেণীপ্রসাদ ও রাধিকাপ্রসাদ বাবাজী এ অবস্থা যাতে লোকের দৃষ্টিগোচর না হয় এই উদ্দেশ্যে তাঁর সর্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করে নাম কীর্তন করেন। ধীরে ধীরে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।[১] শ্রীক্ষেত্রে পরে নামের ক্রিয়ার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে গোসাঁইজী বলেন, 'নাম শ্বাসে-প্রশ্বাসে হলে যখন ঐ নাম প্রতি শিরায় শিরায় চলতে থাকে, তখন হাত, পা, নাক, কান, চোখ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিতরের দিকে টেনে নেয়। ঐ অবস্থার প্রারম্ভেই সতর্ক না হলে আর নাম এ সময়ে একেবারে ছেড়ে দিলে বিষম সঙ্কটে পড়তে হয়। ঐ অবস্থায় হাত-পা একেবারে পেটের ভিতর চলে যেতে পারে। আবার অন্য প্রকারও হয়। নামটি অস্থি, মজ্জা, মাংসে—প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যখন হতে থাকে—তখন হাত-পা-জানু প্রভৃতি শরীরের সন্ধিস্থলের গ্রন্থিসকল খসে যায়, একেবারে আলগা হয়ে পড়ে, হাত-পা লম্বা হয়ে যায়। তেমন মত হলে হাত-পা এমন কি মাথাটি পর্যন্ত শরীর হতে ছুটে পড়ে। আবার ধীরে ধীরে ঠিক ঠিক স্থানে এসে লেগে জুড়ে যায়। এ সব শুধু কথা নয়, নিজে দেখেছি।'

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অস্থি-সন্ধি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বা মূল দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে আবার সংযুক্ত হবার ঘটনা কোন গ্রন্থে নেই। এ সব গোস্বামীপ্রভুর নিজের জীবনে ঘটেছিল বলেই তাঁর মন্তব্য থেকে মনে হয়। কিন্তু সাধারণের

---

১. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য দ্বারিকানাথ রায় প্রমুখাৎ শ্রুত।
নবকুমার বাগচী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীবিজয়কথামৃত', ১ম সংস্করণ, পত্রাঙ্ক ৪২৭

পক্ষে এ সব ধারণা করা সম্ভব নয় বলে লোকসমাজে এ সব ভাব প্রকট হতে দেন নি। আর একদিন তিনি বলেছিলেন, 'ভাবনিধি মহাপ্রভুর শরীরে যে এ সব অবস্থা প্রকট হতে পারত না, তা নয়, তবে তিনি ঐসব সংবরণ করে রাখতেন; কারণ শেষের দিকে ভাবপ্রাবল্যে তাঁর মধ্যে যা প্রকাশ পেত তাতেই ভক্তগণের বুক ফেটে যেত।'

গোবর্ধন পরিক্রমা করে প্রভু সঙ্গীদের নিয়ে মানসীগঙ্গা, যশোদাকুণ্ড, হরদেওজী, গুলালকুণ্ড, সাক্ষীগোপাল ও রূপসরোবর দর্শন করে অলকগঙ্গায় উপনীত হন। এখানে যোগমায়া দেবীর চোখে পড়ে এক বৃহদাকার হনুমান। সঙ্গীদের নানাভাবে দেখাতে চাইলেও তাঁরা দেখেন না শুনে তিনি বিস্মিত হন। প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'ইনি স্বয়ং মহাবীর। অলক্ষ্যে থেকে বনযাত্রীদের সঙ্গে পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁদের রক্ষা করেন। যাঁদের তৃতীয় চক্ষু খুলেছে তাঁরাই এঁকে দেখতে পান।'

অলকগঙ্গা থেকে যাত্রীদল আদি-বদ্রি হয়ে কাম্যবনে আসেন। এখানে তাল-লয়-যুক্ত অপূর্ব ভজন শুনে গোসাঁইজী গায়কের কাছে বিনীত হয়ে প্রার্থনা করতেই একটি গাছ মিলিয়ে গিয়ে ঐ স্থানে এক মহাপুরুষ প্রকট হয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

কাম্যবন থেকে যাত্রীদল বিমলাকুণ্ড হয়ে লুক্‌লুকিকুণ্ডে পৌঁছেন। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র এই স্থানটিতে তাঁর সখাদের সঙ্গে চোখ বেঁধে লুকোচুরি খেলতেন। অতঃপর তাঁরা লঙ্কাকুণ্ড অতিক্রম করে চরণপাহাড়ীতে উপনীত হন। চরণপাহাড়ীতে পাথরের গায় গোষ্ঠবিহারী, ব্রজবালকদের ও ধেনুদের পায়ের ছাপ, ধ্বজা, বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নও স্পষ্ট। শ্যামসুন্দরের মধুর মুরলীধ্বনিতে কঠিন পাষাণ পর্যন্ত গলে যেত। বাঁশী নীরব হলে আবার কঠিন হয়ে যেত, এতে এই তথ্যেরই প্রমাণ হয়। প্রভু এই পদচিহ্নে ভূমিষ্ঠ হয়ে বারবার প্রণাম করেন আর চোখের জলে ভাসেন; তখন তাঁর কাছে গোষ্ঠলীলা প্রকট হয়। তারপর এসে পৌঁছেন সকলে কদমখণ্ডী। গোষ্ঠবিহারী গোপসখাদের নিয়ে যখন গোষ্ঠে যেতেন তখন ক্ষুধার্ত হয়ে সকলে মিলে দুগ্ধ পান করতেন আবার পিপাসার্ত হলে কুণ্ড থেকে জলপান করতেন। তাঁরা ব্রজভূমির কল্পবৃক্ষ থেকে এই উদ্দেশ্যে ঠোঙার মত 'দোনা' যাচ্ঞা করে জলপাত্রের পরিবর্তে ব্যবহার করতেন। কদমখণ্ডীতে একটি গাছের কাছে গোস্বামীপ্রভু 'দোনা' যাচ্ঞা করেন। তখন মুহূর্তের মধ্যে দোনায় দোনায় গাছটি ভরে ওঠে। শচীনন্দনকে দেখেও ব্রজের গাছ এমনি করে তাঁর অভ্যর্থনা করেছিল—

ফল ফুলে ভরে ডাল পড়ে প্রভুর পায়।
বন্ধু যেন বন্ধু দেখি ভেট লঞা যায়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।১৭।১৯১

কদমখণ্ডী থেকে একটি ময়ূর নেয় প্রভুর সঙ্গ। যে-সব স্থানে তিনি বিশ্রাম করেন, ময়ূরটি আশে-পাশে তরুশাখায় বা ভূমিতে বসে পেখম তুলে নাচে। চৌদ্দ-পনর ক্রোশ পথ সে সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল।

এই পথ-পরিক্রমায় বনস্থলীর অপূর্ব শ্রী। সবুজে সবুজে চারদিক ছেয়ে, মধুগন্ধ সমীরণ অলিকুলকে মাতাল করে তুলে। ঝিঁঝি পোকার ঐকতান, বিহঙ্গের কাকলি, গাছে ও লতায় রঙ-বেরঙের ফুল। প্রভু মনোহর প্রাকৃতিক শোভা সম্ভোগ করে মানগড়ে এসে পৌঁছেন।

এখানে নূপুরের বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। যশোদাদুলাল সখাদের নিয়ে বনে-বনে নেচে-গেয়ে ধেনু চরাতেন। কল্পবৃক্ষের কাছে সখাদের জন্য নূপুর চেয়ে নিতেন। তা পায়ে লাগিয়ে চলাফেরা করলে নূপুরের ধ্বনির ন্যায় ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হয়। এর পর তাঁরা লৌহবন অতিক্রম করে মহাবনে উপস্থিত হন। নন্দ মহারাজের বাড়ী এই স্থানের দ্রষ্টব্য। যাত্রীরা এখানে রাত্রি যাপন করে ভোরে ব্রহ্মাণ্ডঘাটে পৌঁছে স্নান করেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মৃত্তিকা ভক্ষণ করে জননীকে মুখমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিলেন বলেই এই নাম। অনন্তর দধিমন্থন স্থান, যমলার্জুন ও গোকুল দর্শন করে যমুনা পার হয়ে শুক্লাদশমীতে তাঁরা মথুরা পৌঁছেন ও একাদশীতে পরিক্রমা শেষ করে শ্রীবৃন্দাবন পৌঁছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চৌরাশি ক্রোশ পরিক্রমার পাঁচ ক্রোশ তখনও বাকী। পরদিন দ্বাদশী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনের লীলাস্থলী দর্শন করার পর পরিক্রমা পূর্ণ হয়।

গৌরকিশোরদাস বাবাজী প্রভুর বিরহে কাতর হয়ে পড়েন। পরিক্রমার দিনগুলি যেন কাটে না। এখন তাঁকে পেয়ে আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু হায়! বাবাজী মহাশয়ের ঘটে ব্রজধামপ্রাপ্তি। তাঁর কুঞ্জে ভাণ্ডারা ও মহোৎসবে প্রভু মহাভাবে বিভোর হয়ে সংকীর্তনে নৃত্য করেন। ঐ রজনীতে গোসাঁইজীর কুঞ্জে এসে গৌরকিশোরদাস বাবাজী অনুনয় করে বলেন, 'প্রভো, কৃপা করে এখন আমাকে প্রেম-ভক্তি দিন। করুণাময় প্রভু দ্বিরুক্তি না করে তখনই তাঁকে সাধন দেন। কয়েকদিন বাদে বাবাজী মহাশয় জ্যোতির্ময় তনুতে আবার গোসাঁইজীর কাছে প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'প্রভো, আপনার কৃপায় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। রাধারাণীর নিত্যলীলা দর্শনের অধিকার আপনার জন্য আমি পেয়েছি।'

পরিক্রমা প্রসঙ্গে প্রভুপাদ বলেন, 'সঙ্গে সঙ্গে বাজার চলে, আবার পথের স্থানে স্থানে আড্ডাও আছে। সেখানে সমস্ত জিনিসই জোটে। যাঁরা গৃহস্থ, তাঁরা আড্ডায় গিয়ে প্রয়োজন মত জিনিস খরিদ করে আহারাদি করেন। আর সাধুরা লুটপাট করে খাবার সংগ্রহ করে নেন। পরিক্রমার সময় গ্রামে গ্রামে ব্রজমায়ীরা দধি-দুগ্ধাদি ভারে ভারে একখানি ঘরে সাজিয়ে রাখেন। পরে অন্য ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। সাধুরা গিয়ে এ-ঘর ও-ঘর করে দধি-দুগ্ধ খুঁজে বের করেন। সেই সময় ব্রজমায়ীরা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে হাতে ঠেঙ্গা নিয়ে তাড়া করতে থাকেন। সাধুরা দধি-দুগ্ধাদি লুটপাট করে হাঁড়ি, পাতিল ভেঙ্গে দৌড় মারেন। ইহাতে ব্রজমায়ীদের বড়ই আনন্দ। তাঁরা এ সময়ে রাখাল-বালক-সহ শ্রীকৃষ্ণের দধি চুরির কথা মনে করে সেই ভাবেই মুগ্ধ হয়ে থাকেন। চুরি করে বা জোর করে এরূপ লুটপাট করে কেউ কিছু নিলে ব্রজমায়ীদের যে আনন্দ তা আর বলবার নয়। এই আনন্দ করবার জন্যই তাঁরা প্রতিদিন কত চেষ্টা করে দধি-দুগ্ধ, মাখনাদি নানা সুখাদ্য বস্তু ঘর ভরে সাজিয়ে রাখেন। যে সকল সাধুরা লুটপাট করেন না, আসনেই থাকেন, ব্রজমায়ীরা তাঁদের নিকট গিয়ে বাৎসল্য ভাবে কত গালি দেন। হাত ধরে টেনে বাড়ীতে নিয়ে যান। সাধুদের গলা জড়ায়ে ধরে কত আদর করে, ঘরে যা থাকে স্বহস্তে সাধুদের মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ান। ব্রজমায়ীদের এ-সব ভাব দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ব্রজের পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায় এখনও সেই ভাবই বর্তমান। বেলা শেষ হলে ব্রজমায়ীরা উৎকণ্ঠিত প্রাণে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কতক্ষণে রাখাল বালকেরা গরু নিয়ে ফিরবে, তা-ই দেখেন। চেনা-অচেনা জ্ঞান নাই। ঘরের ভাল

ভাল জিনিস দিয়ে কত আদর করে রাখাল বালকদের খাওয়ান। রাখালগণের আসতে একটু বিলম্ব হলে স্নেহভরে তাদের কত গালাগালি করেন। ব্রজের পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায়, ব্রজমায়ীদের ভিতর এখনও পূর্বের সেই ভাব, সেই অবস্থা সমস্তই রয়েছে।

‘শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম—সেখানে সকলই অদ্ভুত। শ্রীবৃন্দাবন-ভূমির বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, সমস্তই অন্য প্রকার। অন্য কোন স্থানের সহিতই উহার তুলনা হয় না। সেখানকার সমস্ত বৃক্ষেরই শাখাপত্রসকল নিম্নমুখী। অনেক স্থানে বড় বড় বৃক্ষসকল লতার মত রজঃসংলগ্ন হয়ে আছে। দেখলে পরিষ্কার মনে হয়, সাধু, বৈষ্ণব মহাত্মারাই ব্রজরজঃ পাবার জন্য বৃক্ষাকারে আছেন। আপনা আপনি বৃক্ষে দেব-দেবীর মূর্তি পরিষ্কাররূপে উদ্ভব হচ্ছে। “রাধাকৃষ্ণ” “হরে কৃষ্ণ” প্রভৃতি নামের অক্ষর আপনা-আপনি বৃক্ষে উৎপন্ন হচ্ছে। কোথাও “রা” কোথাও “কৃ” মাত্র হয়ে আছে। বৃক্ষের শিরায় শিরায় এ-সব স্বাভাবিক অক্ষর দেখে বড়ই আশ্চর্য হয়েছি।

‘কালীদহের উপরে বহু প্রাচীন একটি কেলিকদম্বের বৃক্ষ আছেন—তাঁর শাখা-প্রশাখায় “হরে কৃষ্ণ”, “রাধাকৃষ্ণ” নাম পরিষ্কাররূপে লেখা রয়েছে। যার ইচ্ছা হয় যেয়ে দেখে আসতে পারেন। বনপরিক্রমার সময়ে একদিন একটি বনের ধারে বসে আছি, সম্মুখে একটি গাছের পাতা দেখে হাত তুলে নিলাম; চেয়ে দেখি, দেবনাগরী অক্ষরে “রাধাকৃষ্ণ” নাম পাতাটির শিরায় শিরায় লিখা রয়েছে। একটু অনুসন্ধান করতেই বৃক্ষটিকে পেলাম। তখন গাছটিকে ভারতপণ্ডিত মহাশয়, সতীশ প্রভৃতি যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন সকলকে ডেকে দেখালাম। সকলে একই প্রকার নাম বৃক্ষের পাতায় পাতায় দেখতে পেলেন। অনুসন্ধান করলে সেখানে এরূপ অনেক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায়।

‘পরিক্রমার সময় আর একদিন একটি বনের ভিতর উপস্থিত হয়ে শুনলাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ বনের কদম্ববৃক্ষের পত্রে “দোনা” প্রস্তুত করেছিলেন। এখনও ভগবান সেই লীলার নিদর্শন সময় সময় ভক্তদের দর্শন করান। আমরা বনের ভিতর প্রবেশ করে “খুঁজে খুঁজে” হয়রান। দোনা কোন বৃক্ষেই দেখতে পেলাম না। পরে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করে কাতরভাবে সকলে বসে আছি, চেয়ে দেখি সম্মুখেই একটি কদমগাছের পাতা দোনার মত দেখা যাচ্ছে। নিকটে যেয়ে দেখি বৃক্ষের সমস্ত পাতাগুলিই দোনার আকার। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, সকলেই বৃক্ষের পাতায় পাতায় দোনা দেখলেন।

‘চরণপাহাড়ীতে গিয়ে দেখলাম, পাহাড়ের প্রস্তরে গরু-বাছুর এবং মনুষ্যের অসংখ্য পদচিহ্ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে বংশীধ্বনিতে সমস্ত বৃন্দাবন মুগ্ধ হত সেই মধুর বংশীরবে এক সময়ে ঐ পাহাড়ও দ্রবীভূত হয়েছিল। সেই সময়ে ধেনু, বৎস ও রাখালবালকগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঐ পাহাড়ে ছিলেন, সকলেরই পদচিহ্ন ঐ প্রস্তরে অঙ্কিত হয়ে পড়ত। আজও সে-সকল চিহ্ন পাহাড়ে পরিষ্কার রয়েছে। দেখলেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উহা কখনও মানুষের খোদা নয়। ওরূপটি মনুষ্যের দ্বারা কখনও হতে পারে না।’

এক শ্রোতা মন্তব্য করেন, ‘শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম স্বীকার করি, কিন্তু ওখানের লোকগুলি বড় ভয়ানক। যাত্রীদের কাছে টাকার হদিস পেলে আর উপায় নেই।’ শুনে প্রভু বলেন, ‘টাকার জন্য ব্রজবাসীরা নরহত্যাও করেন, এরূপ

ঘটনা কয়েকটি শোনা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁরা যথার্থ ব্রজবাসী কিনা বলা কঠিন। আগ্রা, দিল্লী, জয়পুরাদি নানা স্থানের লোক তিন-চার পুরুষ থেকে ব্রজভূমে বাস করছেন। তাঁরাও ব্রজবাসী বলে পরিচয় দেন। লোকেও তাঁদের ব্রজবাসী বলে জানেন। শ্রীবৃন্দাবনের পল্লীগ্রামে ঘুরলে যথার্থ ব্রজবাসীদের সরলতা, উদারতা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। যে সকল ব্রজবাসী যাত্রী-যজমানদের উৎপীড়ন করে টাকা আদায় করেন তাঁরা ঐ টাকাদ্বারা কি করেন তাও দেখতে হবে। বনপরিক্রমার সময়ে সহস্র সহস্র সাধু, বৈষ্ণব ও যাত্রীদের ভরণ-পোষণ তাঁরাই তো করে থাকেন। অর্থ তাঁরা জমা করেন না; তোমাদের থেকে নিয়ে তোমাদেরই সেবা করেন। পূর্বে ব্রজবাসীরা অর্থের অভাবে, অর্থের অনটনে কোথাও ঘোরাঘুরি করতেন না। যাত্রীর উপরেও তাঁদের কোন উপদ্রব ছিল না। তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। আমাদেরই দুর্ব্যবহারে এখন তাঁদের এই দুর্দশা।

'ব্রজবাসীরা ভাঙ আর লাড্ডু পেলে আর কিছু চান না। ওতেই তাঁদের আনন্দ। লালাবাবু তা দেখে তাঁদের খুব ভাঙ ও লাড্ডু খাওয়াতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁদের সব লিখিয়ে নিলেন। এখনও ব্রজবাসীরা অনেক দুঃখ করে বলেন, "লালাবাবুই আমাদের শেষ করেছেন।" পরে ভগবানের কৃপায় লালাবাবুর বৈরাগ্য এল।'

একদিন প্রভু রাধাকুণ্ডবাসী জগদীশ বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। প্রভুকে দেখে বাবাজী খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। কেউ কেউ তখন মন্তব্য করেন, 'ইনি ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন।' জগদীশ বাবাজী ওঁদের বলেন, 'কোকিলের "ছা" কাকের বাসায় থাকে। বসন্ত-সমাগমে ঐ ছানাই পঞ্চম সুরে তান ধরে। প্রভুরও সেই অবস্থা।'

কুতুবুড়ী একদিন পিতাকে বলেন, 'বাবা, আমার এমন হয় কেন? সব সময় থেকে থেকে মনে হয়, যা কিছু দেখি, শুনি, করি—সবই মিথ্যা, সবই যেন স্বপ্ন।' প্রভু বলেন, 'তোর খুব সৌভাগ্য। যথার্থই এ সব কিছুই নয়। সমস্তই মিথ্যা। স্বপ্ন তো বটেই। এ-সব স্বপ্ন বলে জানলেই তো হল—আর কি?' আর একদিন কুতুবুড়ী বলেন, 'অনেক সময় দেখি একটি খোকা আমার পেছনে পেছনে ঘুরে।' প্রভু তাঁকে গোপালের একটি ছবি এনে দেন। কুতু তাঁর নিত্য পূজা করেন।

১ ভাদ্র, ১২৯৭; পরিক্রমা শেষ করে প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে ফিরে আসার পর শিষ্যেরা অনেকে গুরুদর্শনে আসেন। রথ দেখা ও কলা বেচা দুই-ই হয়। প্রভু আবার রুটিন ধরে চলেন—সেই নিত্যতত্ত্ব লাভ, বিগ্রহ দর্শন ও পরিক্রমণ। কামিনী বসু ও শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও আসেন। একদিন শ্রীধরের হয় মাথা-গরম। কামিনীবাবু তাঁকে ধমক দিয়ে বলেন, 'সাবধান! বাড়াবাড়ি করলে মার খাবে।' শ্রীধর তখনই ছুটে বের হন। একেবারে থানায় গিয়ে হাজির। দারোগাবাবুকে বলেন, 'বাংলা মুল্লুক থেকে এক খুনে ডাকাত আমাদের কুঞ্জে চড়াও করেছে। তাকে পাকড়ান, নইলে আমাদের রক্ষা নেই।' দারোগাবাবু শ্রীধরকে সাথে নিয়ে কুঞ্জে আসেন। শ্রীধর কামিনীবাবুকে দেখিয়ে সোৎসাহে বলেন, 'হিয়া সো ডাক্‌কু—ইস্‌কো পাকড়াইয়ে।' কুঞ্জের সকলে শ্রীধরকে পাগল বলায় দারোগাবাবু চলে যান। গোসাঁইজী সব শুনে শ্রীধরকে ডেকে বলেন, 'কামিনীবাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চাও।' শ্রীধর বলেন, 'মারতে যে চায় সে ডাকাত নয়? ডাকাতকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া অপরাধ? এজন্য আবার ডাকাতের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে?

আমি পারব না।' প্রভু বলেন, 'তাহলে এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ কর।' শ্রীধরও সক্রোধে বলেন, 'এমন সঙ্গে আমি থাকি না।' এই বলে তখনই তিনি বের হয়ে যান। খানিক বাদে ফিরে এসে তিনি গোসাঁইর পা জড়িয়ে ধরেন। প্রভু তাঁকে বলেন, 'শ্রীধর! গিয়েছিলে, তবে আবার ফিরে এলে কেন?' শ্রীধর কেঁদে কেঁদে বলেন, 'কি করব? ছেড়ে যে থাকতে পারি না!' গোসাঁই ছল-ছল চোখে শ্রীধরের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তারপর বলেন, 'তবে গিয়ে ক্ষমা চাও।' অমনি শ্রীধর কামিনীবাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চান।

প্রভুর নির্দেশে কামিনীবাবু সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন। নিয়মিত বিগ্রহ দর্শন করেন। কয়েক মাস শ্রীবৃন্দাবন-বাসের পর দেশে ফিরার তাগিদ আসে বারবার। ফিরে যান। প্রভু দুঃখ করে বলেন, 'কামিনীবাবু যদি আর কয়েকটা দিন থেকে যেতেন তাহলে তাঁর একটি বিশেষ অবস্থা লাভ হত।'

যোগমায়া দেবী ২৯ কার্ত্তিক (১২৯৭) তাঁর এক ভক্তকে শ্রীহস্তে শ্রীবৃন্দাবন থেকে একখানি পোস্ট-কার্ড লিখেন। পোস্ট-কার্ডটি একটি কার্ড-বোর্ডে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ফ্রেমে বাঁধান হয় বলে কার কাছে চিঠিখানা লেখা হয়েছিল জানা যায় নি। চিঠিখানি এইরূপ ছিল—

তোমার কার্ড পাইয়া সকল জ্ঞাত হইলাম। সময় ২ অভাব হয় তাহা না হইলে বুঝা যায় না। যে অবস্থায় পড় না কেন, নাম করিতে ভুলিবে না। ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত কার্য করিলে সফল হইবে। আমি ছোট কন্যাটি আর দুইজন পুরুষ আছেন। গোঃ মহাশয় কহিয়াছেন আগামী চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে হরিদ্বারে মেলা। এখানে ফাল্গুন হইতে চৈত্র (?) পর্য্যন্ত মেলা। এ সকল দর্শন করিয়া ওদিকে রওনা হইবেন। যোগজীবন কার্য্যের চেষ্টায় ভাগলপুরে। কার্য্যটি হইবার আশা নাই। শান্তিসুধা ও মা বৌমা ঢাকায় আশ্রমবাড়ীতে আছেন। শান্তিসুধার পৌষ মাসে দশ মাস হইবে। সেখানে সকলে বড় ভাল না। গোঃ মহাশয় শারীরিক একপ্রকার ভাল আছেন। নিজ কার্য্য করেন। আগামীতে তোমাদের কুশল দিয়া সুখী করিবে। আমার আশীর্ব্বাদ লইবে। ভগবান যে অবস্থায় রাখিয়াছেন তাহাই আছি। আমার নানাপ্রকার চিন্তায় মন সর্ব্বদা অস্থির। ভগবান কৃপা করিয়া শান্তির সন্তানাদি হইলে অনেক স্থির হইতে পারি। ভেবে কোন ফল নাই, অথচ স্থির হইতে পারি না।

আশীঃ যোগমায়া।

২২ পৌষ (১২৯৭) রাত্রিতে প্রভু হঠাৎ বলে উঠেন, 'তোমরা শঙ্খধ্বনি কর, আনন্দ কর।' পরদিন ঢাকা থেকে টেলিগ্রামে খবর আসে—ঐ সময় শান্তিসুধার একটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়। গোসাঁই তার নাম রাখেন—'দাউজী' আর যোগমায়া দেবী রাখেন 'বৃন্দাবনচন্দ্র'।

শান্তিসুধার পুত্রসন্তান জন্মের সংবাদ পেয়েই ঐ ভক্তটিকে যোগমায়া দেবী একখানি পোস্ট-কার্ড লিখেন। চিঠিটি এইরূপ ছিল—

২৩ পৌষ
বৃন্দাবন।

কল্যাণবরেষু,

তোমার কার্ড পাইয়া সকল জ্ঞাত হইয়াছি। শান্তির সংবাদ না পেয়ে ভাবিত ছিলাম। অদ্য টেলিগ্রাফ পাইলাম, একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। তাহারা ভাল আছে। গোঃ মহাশয় ভাল আছেন। এখানে অত্যন্ত শীত। এইজন্য আমার একটু

বাতের ন্যায় হইয়া সময় ২ কষ্ট হয়। আর সকলে ভাল। গোঃ মহাশয় কহিতেছেন ফাল্গুনের অর্দ্ধেক শেষতক হরিদ্বারে রওনা হইবেন। সেখান থেকে একত্রে (?) দেশের দিকে গমন করিবেন।

তোমাদের সকলের কুশল দিয়া সুখী করিবে। ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।

আশীঃ
যোগমায়া

এদিকে গোস্বামীপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-বাসের বছর পূর্ণ হয়। তাঁর ফিরার সময় আগত জেনে মুক্তকেশী দেবী শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যোগমায়া দেবীর সঙ্গে এতদিন কখনও তাঁর ছাড়াছাড়ি হয় নি। অশ্বিনী বৈরাগী, মনোহরা দেবী আর কয়েকজন গুরু-ভাই-বোনের সঙ্গে তিনি শ্রীবৃন্দাবন পৌঁছে কন্যার সাথে এসে মিলেন।

মাঘ মাসের (১২৯৭) শুরুতে এক রজনীতে কয়েকজন মহাপুরুষ এসে গোসাঁইকে ধরেন, 'আজ মুক্তিনাথে উৎসব; আমরা ওখানে চলেছি, আপনিও চলুন।' প্রভু প্রস্তুত হন। যোগমায়া দেবী তাঁকে ধরেন, 'আমাকেও নিয়ে চলুন।' গোসাঁই বলেন, 'তুমি কি করে যাবে? আমরা যাব সূক্ষ্ম দেহে।' যোগমায়া দেবী বলেন, 'আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে নিয়ে যেতে পারেন। আমার অবস্থাও খুলে দিতে পারেন।' প্রভু তাঁকে বুঝান, 'অবস্থা লাভ করলে তুমি আর সংসারে থাকতে চাইবে না। মায়া-মোহ সব ছুটে যাবে। ব্রহ্মানন্দে তখন ডুবে থাকবে।' যোগমায়া দেবীর একই কথা, 'আমি যাব, আমার ব্যবস্থা করুন।' পরমহংসজী তখন কৃপাপরবশ হয়ে প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'ওঁর সময় হয়েছে।' এই বলে তিনি অধ্যাত্ম-রাজ্যের দ্বার খুলে দেন। সকলে মিলে তাঁরা মুক্তিনাথ যান। উৎসব-শেষে গোস্বামীপ্রভু ও যোগমায়া দেবী শ্রীবৃন্দাবনে ফিরে আসেন। যোগজীবনও এর মাঝে ভাগলপুর থেকে ফিরে এসেছেন।

এইবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলা। কুম্ভের পথে বৈষ্ণব-সাধুদের জমায়েত শ্রীবৃন্দাবনে। ছ-সাত হাজার সাধু এসে মিলেছেন। অসময়ে আসন ছেড়ে প্রভু মেলার দিকে যান। সাধুদের মাঝ দিয়ে চলেন। থমকে দাঁড়ান গিয়ে এক সাধুর সামনে। তাঁকে শুধান,

মহারাজ, আজ আপকো সেবা হোয়া?
নেহি।
কাল হুয়া থা?
নেহি।
পরশু?
নেহি।
কেত্না রোজ্‌সে এইছা হাল?
সাত রোজ হোয়গা।

কুঞ্জে ফিরে ঐ সাধুর কাছে তিনি জিনিসপত্তর পাঠান। ভক্তেরা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'দিনের পর দিন কেন তিনি অনাহারী?' প্রভু উত্তরে বলেন, 'তিনি কারও কাছে যাচ্ঞা করেন না। এ কয়েক দিন তাঁকে কেউ কিছু দেয় নাই।'

দেখতে দেখতে ফাল্গুন মাস এসে যায়। গোসাঁই গেণ্ডেরিয়া ফিরবেন।

পথে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখবেন। যোগমায়া দেবীকে সব গুছিয়ে নিতে বলেন। প্রভুর কথা শুনে যোগমায়া দেবী বলেন, 'আমি এই ধামেই থাকব। আর কোথাও যাব না।' তাঁর কথার মধ্যে কেমন যেন দৃঢ়তা—আর এক সুর। যিনি প্রভুর বিরহে ব্যাকুল হয়ে বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও এখানে ছুটে এসেছেন, যিনি জীবনে কখনও স্বেচ্ছায় তাঁর থেকে দূরে থাকতে কল্পনাও করেন নি, কর্তব্যের খাতিরে তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র থাকতে যাঁর চিত্ত বেদনায় ক্লিষ্ট হত, তাঁর মুখে আজ এ কি কথা!! গোসাঁই বলেন, 'আমরা সব চলে গেলে তুমি কাকে নিয়ে থাকবে?' যোগমায়া দেবী বলেন, 'এই দেহটা নিয়েই যত গোল। এটিকে ছাড়লেই সব সমস্যার সমাধান হয়।' প্রভু বলেন, 'তোমার বৃদ্ধা মা রয়েছেন। কুতুবুড়ী আছে। তুমি চলে গেলে তাঁদের ভারী কষ্ট হবে। তাঁরা শোকে কাতর হয়ে পড়বেন।' যোগমায়া দেবী বলেন, 'এই সংসারে কে কার মা, কে কার মেয়ে? যতদিন মায়ার আধিপত্য ততদিনই এসব মায়ার সম্বন্ধ।' পতিপ্রাণা সতী যোগমায়া দেবী শ্রীবৃন্দাবন ছেড়ে অন্যত্র যেতে নারাজ। তিনি তাঁর জীবনবল্লভ গোস্বামীপ্রভুকে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র হতে অভিন্ন জেনে লীলায় প্রবেশ করে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-সাগরে ডুবে আছেন। পতি-বিরহের আশঙ্কা আর নেই। দেহে থাকার আর কি সার্থকতা? প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে তিনি বলেন, 'আপনি আমাকে নিত্যলীলা সম্ভোগ করার অনুমতি দিন।' প্রভু মৌন থাকেন। যোগমায়া দেবী তখন পঞ্জিকা খুলে দেখেন, হাতের কাছে শুভ দিন হল ১০ ফাল্গুন, ১২৯৭, মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী—নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব তিথি। মধ্যে মাত্র চারটি দিন। তিনি মনঃস্থির করেই ঐদিনই মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হন।

১০ ফাল্গুন (১২৯৭) ভোর থেকেই শুরু হয় তাঁর ভেদ-বমি। গোসাঁই মধ্যাহ্নে প্রসাদ পেয়ে অন্য দিনের ন্যায় আজও সাধুদর্শনে বের হন। সন্ধ্যায় যোগমায়া দেবী নিত্যলীলায় যুক্ত হন। তাঁর তিরোধান প্রসঙ্গে প্রভু বলেন, 'শ্রীবৃন্দাবনে এলে আর তিনি ফিরবেন না জেনেই ওঁর আসার পূর্বে নিষেধ করে বারবার চিঠি লিখেছি কিন্তু তা তিনি শুনলেন না। আমার শরীর অসুস্থ জেনে তাড়াতাড়ি শ্রীবৃন্দাবনে চলে এলেন। তাঁকে তখন ঢাকা পাঠাতে কত কৌশল করলাম কিন্তু কিছুতেই গেলেন না। দেহত্যাগ যেদিন হবে তা পূর্বেই জেনেছিলেন। দুবার দাস্ত হতেই শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ল। ঐ সময়ে পরমহংসজী আমাকে বললেন, "তুমি অবিলম্বে কুঞ্জ হতে অন্যত্র চলে যাও; তুমি কাছে থাকলে ওঁকে নেওয়া যাবে না। দেহত্যাগ হয়ে গেলে কুঞ্জে এস।" আমি গুরুজীর কথামত অমনি আসন থেকে উঠলাম। পাশের ঘরে উনি ছিলেন। একবার দেখে যাই, মনে করে ঐ ঘরে গেলাম। তিনি সবই বুঝেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ঐ সময়ে কাছে থাকি। তাই হাত ধরে টেনে পাশে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু গুরুদেবের আদেশমত আমি আর অপেক্ষা না করে কুঞ্জ হতে বের হয়ে গেলাম। পরে তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে জেনে কুঞ্জে ফিরে এলাম।' প্রভু ফিরে এসে দেখেন, বারান্দায় শবদেহ রেখে কান্নাকাটি চলেছে। যোগজীবনকে গোসাঁই ডেকে বলেন, 'এতক্ষণ মৃতদেহ রেখেছিস কেন? যমুনার তীরে নিয়ে গিয়ে সংস্কার কর।' এই বলে কোন দিকে না তাকিয়ে তিনি আসনে গিয়ে বসেন। কোন বৈলক্ষণ্য নেই। যোগজীবন গোস্বামী, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর, অশ্বিনী বৈরাগী কেশীঘাটে নিয়ে মাঠাকুরাণীর পবিত্র দেহ অগ্নিসাৎ করেন। প্রভুর অভিপ্রায়

অনুযায়ী যোগজীবন গোসাঁই তিনখন্ড অস্থি সংগ্রহ করেন। একখানি তিনি শ্রীবৃন্দাবনেই যমুনায় সমাহিত করেন। অপর দুখানি হরিদ্বার ও গেন্ডেরিয়ার জন্য রাখেন। শবদেহ নিয়ে যাবার পর কুতুবুড়ী ও মুক্তকেশী দেবী কান্নায় ভেঙে পড়েন। কুতুকে সান্ত্বনা দিতে প্রভু কুতুর পিঠে হাত রাখতেই, সে 'উঃ' 'উঃ' করে ওঠে। একটু পরে দেখা যায় তাঁর পিঠে প্রভুর পাঁচটি আঙুলের দাগ—আগুনে পোড়া ফোস্কার মত। বিরহাগ্নিতে প্রভুর দেহ এতই উত্তপ্ত! ঢাকায় কুঞ্জবিহারী ঘোষকে প্রভু চিঠি লিখেন—

ওঁ হরিঃ

শ্রীবৃন্দাবন
দাউজীর মন্দির, গোপীনাথবাগ।

কল্যাণবরেষু,

গত ১০ ফাল্গুন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী তাঁহার চির-প্রার্থনীয় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোক ইহাকে মৃত্যু বলে; কিন্তু একবার বিশ্বাস নয়নে চাহিয়া দেখ, যোগমায়া আজ সখীবৃন্দের মধ্যে কি অপূর্ব শোভা-সৌন্দর্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বলিবে যে, সে যেন শোক না করে; ইহা শোকের ব্যাপার নহে—বহু সৌভাগ্যে মনুষ্য ইহা প্রাপ্ত হয়। আগামী ২১ ফাল্গুন তাঁহার নামে মহোৎসব হইবে। তাহার পর আমরা ঢাকা যাত্রা করিব।

শ্রীমতী শান্তিসুধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চায়, তবে আনন্দ-উৎসব করিয়া যেন দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে খাওয়ায়।

মা শান্তি, শোক করিও না, আনন্দ কর। যতশীঘ্র পারি আমরা ঢাকা যাইব।

আশীর্বাদক—
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

রামকৃষ্ণ গুহ ও রাজকুমার দত্ত যোগমায়া দেবীর এই সংবাদ পেয়ে শ্রীবৃন্দাবনে এসে প্রভুর সঙ্গে মিলেন।

যোগমায়া দেবীর দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গোস্বামীপ্রভু এক প্রত্যাদেশ শুনেন, 'গেন্ডেরিয়া আশ্রমে যোগমায়ার অস্থি সমাধিস্থ করে তার উপর "নামব্রহ্মে"র মন্দির প্রতিষ্ঠা কর।' দৈববাণী শুনে প্রভু এদিক-ওদিক তাকান। নিত্যানন্দপ্রভু তখন প্রকাশিত হয়ে আদেশ করেন, 'মন্দির প্রতিষ্ঠা করে "নামব্রহ্মে"র পূজা প্রচার কর।' গোসাঁইজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'নামব্রহ্ম-পটে কি থাকবে?' আকাশে সোনার লেখায় দেবনাগরী হরফে তখন ফুটে ওঠে—

ওঁ হরিঃ

নামব্রহ্ম

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

নিত্যানন্দপ্রভু তারপর বলেন, 'কলিতে নামব্রহ্মের পূজা ও আচার্য পূজা ঘরে ঘরে হবে।'

২১ ফাল্গুন (১২৯৭) যোগমায়া দেবীর তিরোভাব মহোৎসবে বৈষ্ণবেরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পূর্বের বৈরীভাব আর নেই। গোস্বামীপ্রভুর ভাব ও বিনয় দেখে তাঁরা সকলে মুগ্ধ। যোগমায়া দেবীর তিরোধানে তাঁদের মনে যেন লাগে স্বজনবিয়োগ-ব্যথার ছোঁয়াচ। প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ছেড়ে যাচ্ছেন শুনে

তাঁরা ব্যথিত। ভাণ্ডারার পরেই গোসাঁইজী হরিদ্বার রওনা হন। সঙ্গে কুতুবুড়ী, বুড়া ঠাকরুণ, যোগজীবন, পণ্ডিত মহাশয়, অশ্বিনী বৈরাগী, রামকৃষ্ণ গুহ, শ্রীধর, রাজকুমার দত্ত ও বেণীপ্রসাদ ব্রজবাসী এবং আর আর শিষ্য-শিষ্যারা। ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে গঙ্গাতীরেই একটি পাণ্ডার বাড়ী পাঁচ দিনের জন্য ভাড়া করা হয়। প্রভু ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে উপস্থিত হয়ে যোগজীবন গোস্বামীকে দিয়ে যোগমায়া দেবীর একখানি অস্থি গঙ্গাগর্ভে যথাশাস্ত্র সমাহিত করান। গঙ্গাস্নান করে শ্রীধরের তর্পণাদি করতে বিলম্ব দেখে আর সকলে তাঁদের আস্তানায় ফিরে যান। তর্পণের সময় যোগমায়া দেবীর উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিতে গিয়ে শ্রীধর শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি শিশুর ন্যায় রোদন করতে থাকেন। তিনি বিলাপ করে বলেন, 'মা, আজ তুমি কোথায়? কেঁদে কেঁদে তোমার সাড়া পাই না। দয়াময়ী মা, দয়া ভুলে কেমন করে থাক? কত আশা ছিল গোসাঁইকে নিয়ে, তোমাকে নিয়ে সকলে আনন্দ করে ফিরব গেণ্ডেরিয়ায়, পাষাণী জননি! তুমি রয়ে গেলে! গর্ভধারিণী মায়ের কথা মনে নেই। প্রথম সাক্ষাতেই তুমি মায়ের স্থান জুড়ে বসেছিলে! এখন যে আমি চিরতরে মাতৃহারা! কে, মা, তোমার এই পাগল ছেলের বায়না যোগাবে?'

আচমকা জলের মধ্যে দেখা যায় আলোড়ন! যোগমায়া দেবী দিব্যদেহে শ্রীধরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'শ্রীধর, কেন তুমি ধৈর্যহারা হয়ে কাঁদছ? আমি মরি নাই। আমার নশ্বর দেহকে তোমরা যমুনাতটে ভস্মীভূত করে পঞ্চভূতে লয় করে দিয়েছ সত্য, কিন্তু প্রয়োজনবোধে এখন আমি সর্বত্র যেতে পারি। আমার জন্য শোক কর না। তুমি গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করছ—এ তোমার অজ্ঞানতা ও মূঢ়তা। সদ্‌গুরু মনুষ্য নন—স্বয়ং ভগবান। কাশীতে তোমাকে একটি করঙ্গ কিনে দিয়েছিলাম। করঙ্গ শীতল বারির প্রতীক। জলপান করে দেহ শীতল হয়। ঐরূপ এমন বাক্য বলবে যাতে কারও মনে কষ্ট না হয়। তোমার গুরু ও আমাকে অভিন্ন ভাবলে ভক্তি কি জানতে পারবে। তুমি সাধু হতে চেষ্টা করবে।' এই বলে তিনি অদৃশ্য হন।

কুম্ভে একদিন প্রভু সাধুদর্শনের অভিপ্রায়ে মেলার ভিতর দিয়ে চলেছেন। জনতা ভেদ করে ছুটে আসেন নেংটি-পরা শৈলবাসী এক সন্ন্যাসী। নেচে নেচে গোসাঁইকে তিনি প্রদক্ষিণ করেন। আর বারবার বলেন, 'আজ মেরা মিলারে মিলা।' সজল চোখ, উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল। হঠাৎ তিনি মিশে যান জনস্রোতে। কোথা হতে এলেন, কোথাই বা গেলেন—তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মিলে না হদিস্—এই নাম-না-জানা সাধুর।

আর একজন সাধু একেবারে নিরাবরণ। প্রভুর সম্মুখে এসে স্থাণুর ন্যায় অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। প্রেমাশ্রুতে তাঁর বুক ভেসে যায় আর সর্বাঙ্গে কম্পন-পুলক! গদ্‌গদভাবে তিনি বলেন, 'আজ ম্যায় ধন্য হোয়া! আজ হম্ কৃতার্থ হোগয়ে। মেরা সব পূরণ হো গিয়া।' শ্রীধর তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চান। তিনি তাঁকে বলেন, 'অহো ভাগ্ তোমলোগনকা! ভগবানকো সঙ্গ লাভ কিয়া। দর্শন হি দুর্লভ হ্যায়! হামেসা পিছু পিছু রহ্‌না। উন্‌কা সঙ্গ কভি নেহি ছোড়্‌না। ধন্য হো গিয়া।' গোসাঁই ওঁদের সম্বন্ধে পরে বলেন, 'এঁরা কদাচিৎ লোকালয়ে আসেন। পাহাড়ে জঙ্গলে লোকচক্ষুর অন্তরালে "নাম"কে আশ্রয় করে তাঁরা ডুবে থাকেন। এঁদের দেখে মনে হল, কতকালের যেন পরিচয়—

আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ।'

আর একদিন কনখলে সাধুদর্শনে প্রভু বের হয়েছেন। সঙ্গে যোগজীবন গোসাঁই, পণ্ডিত মহাশয়, শ্রীধর, অশ্বিনী বৈরাগী, রামকৃষ্ণ গুহ, রাজকুমার দত্ত ও বেণীপ্রসাদ ব্রজবাসী। এক বৈষ্ণব বাবাজী প্রভুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে গান ধরেন—

যাঁদের হরি বলতে নয়ন ঝরে
ঐ দেখ তাঁরা দুই ভাই এসেছেরে।

শ্রীধরেরা বাবাজীর সঙ্গে যোগ দেন। ভাবের বন্যা ছড়িয়ে পড়ে। হরিনামের জয়ধ্বনিতে চারদিক কেঁপে ওঠে। প্রভুর অপূর্ব নৃত্য দেখে ও 'নামে'র মাদকতা উপলব্ধি করে সাধু-মহাত্মারা হন বিস্ময়ে অভিভূত। এমন প্রাণ-মাতান কীর্তন, অভিনব নৃত্য-উচ্ছ্বাস, স্বতঃস্ফূর্ত ভাববিকাশ—সবই তাঁদের কাছে মহাবিস্ময়। বেণীপ্রসাদ ব্রজবাসীর এই সময় চোখে পড়ে গোসাঁইজীর বুকের উপর উজ্জ্বল সোনালী রঙে দেবনাগরী হরফে 'নামব্রহ্ম'।

মেলায় একদিন গোস্বামীপ্রভু 'তিন প্রভুর' কথা নিয়ে সাধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন, এমন সময় মিতভাষী প্রাচীন এক গুজরাটি সাধু তাঁকে বলেন, 'বাবা, বাংলা মুল্লুকসে এক আদমি হমারা গুজরাটমে গিয়াথে', উনকা মোকাম নদীয়া শান্তিপুর থা। উনকা নাম কমলাক্ষ মিশ্র। উনকী গীতা মেরা পাছ হ্যায়।' কি উপায়ে তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন, এই প্রশ্ন করায় তিনি গোসাঁইজীকে হঠযোগের কয়েকটি প্রক্রিয়া দেখিয়ে বলেন, 'আমার আর তেমন কি বয়স হয়েছে! হিঙ্গুলাজে একজন সাধু এখনও দেহে আছেন যিনি দ্বাপর যুগের লোক। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে স্বচক্ষে দেখেছেন, যখন তাঁরা দেহ ধারণ করেছিলেন। এখন তিনি একেবারে অথর্ব হয়ে আসনেই থাকেন। তাঁর চোখের পাতা ঝুলে পড়ায় দেখতে পান না, কিছু দেখতে হলে হাত দিয়ে চোখের পাতা তুলে ধরে দেখেন।

মেলায় সেবার তিন লক্ষ ধর্মার্থীর সমাগম হয়েছিল। সাধু-সন্ন্যাসীদের আসন পড়ে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে—গঙ্গার চড়ায় ও কনখলে। মাসাধিককাল ধরে দিবানিশি হরিনাম কীর্তন, হরিকথা আলাপন, সৎ-প্রসঙ্গ। অপরূপ সেই পরিবেশ।

প্রকৃত তত্ত্বদর্শী মহাত্মা জগতে বিরল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন, 'কোটিতে গুটি।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মনুষ্যাণাম্ সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাম্ কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ দু-একজন সিদ্ধির পথে অগ্রসর হন। আর যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে দু-একজন আমার স্বরূপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন। প্রভু বলেন, 'এবারের মেলায় এসেছেন মাত্র তিনজন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ। আর সকলে বেশভূষা, সম্প্রদায় ও মতামত নিয়ে ব্যস্ত। এই তিনজনের একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "সাধুরা এত কঠোরতা করেও তত্ত্বলাভ করেন না কেন?" তিনি উত্তর দেন, "বাবা, আমি ক্ষুদ্র কীট। আমি কি জানি!" বারবার অনুরোধ করায় বলেন, "এখন কেহ বড় ভগবানকে চান না। মান-মর্যাদা, বুজরুগি, মহান্তগিরি চান—তা তাঁরা পান। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।"' হরিদ্বারে পাঁচদিন

কাটিয়ে মাঠাকুরাণী ব্যতীত আর সকলকে নিয়ে, প্রভু ১৩ চৈত্র, ১২৯৭ গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে পৌঁছেন।

গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে শ্রীশ্রীনামব্রহ্মের মন্দির প্রতিষ্ঠা

দু বছর গোস্বামীপ্রভু গেণ্ডেরিয়া-ছাড়া। তাঁর আসার খবর পেয়ে কলিকাতা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ থেকে শিষ্যেরা ও দীক্ষার্থীরা এসে আশ্রমে ভিড় করেন। আশ্রমে শোকের ছায়া; যোগমায়া দেবীর শ্রীবৃন্দাবন-প্রাপ্তি আর ঐ সময়ে লালের বিষপানে আত্মহত্যায় সকলেই বিমর্ষ। প্রভুর আগমনের সংবাদে মরাগাঙ্গে বান ডাকে। ১৪ চৈত্র, ১২৯৭ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ আশ্রমে পৌঁছে শুনেন যে, পূর্বদিন প্রভু আশ্রমে এসে গেছেন। ঐ দিনটি থেকেই দীক্ষাস্রোত। কুঞ্জবিহারী ঘোষ, রাধারমণ গুহ, শশীবাবু, সতীশবাবুর গৃহ-ভর্তি আশ্রমের আগন্তুক। আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরে ঢালা বিছানা; আর দু-দিকের বারান্দায় চাটাই মাত্র বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা। ধনী-দরিদ্র-ইতর-বিশেষ নেই। যে যেখানে পারেন দেহটা টানা দেবার ব্যবস্থা করে নেন। পাকা কোঠাবাড়ী ছেড়ে, সুখ-শয্যা উপেক্ষা করে জঙ্গলের মধ্যে গেণ্ডেরিয়ায় দুরন্ত মশার উপদ্রবের মাঝে সব এসে জুটেছেন। না আছে বিছানা, না আছে মশারী—থাকলেও প্রয়োজনবোধ নেই, চাটাইর উপর বাহু-উপাধান। কথাবার্তায়, চলাফেরায় অস্বস্তির লেশমাত্র নেই; অনাবিল আনন্দে সকলে অভিভূত। ভোর না হতে, খোল-করতাল বেজে ওঠে; কয়েকজন ঝাড়ু-হাতে আশ্রম পরিষ্কার করেন, কেউ গোবর-জল ছিটান; হাঁক-ডাক নেই, চেঁচামেচি নেই। আমতলা, আসন-কুটীর, আর সব স্থান লেপে-মুছে সংস্কার করেন আগন্তুক শিষ্যেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। এখানে উঁচু-নীচু, ধনী-নির্ধন বিচার নেই। সকলেই প্রভুর সন্তান। আশ্রমটি সকলেরই একান্ত আপনার। সূর্যোদয়ে আশ্রম-প্রাঙ্গণ ঝক্‌মক করে।

সকাল সাতটায় চা-পানের পর কুঞ্জবিহারী ঘোষ ভাবে গদ্‌গদ হয়ে প্রভুর কাছে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। শ্রীগ্রন্থকে প্রণাম করে গৌরচন্দ্রিকা শুরু করতেই কুঞ্জবাবুর কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। তাঁর পুলক-অশ্রু-কম্পনের ছোঁয়াচ লাগে শ্রোতাদের মনে। কুঞ্জবাবুর ভাববিহ্বল কণ্ঠ শুনে প্রভু নিজেও ডুবে যান। কুঞ্জবাবু ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী প্রধানশিক্ষক। ছেলেদের কল্যাণকামনা তাঁর স্বভাব। ছাত্রদের নারায়ণজ্ঞানে তিনি শিক্ষকতা করতেন। আর্থিক উন্নতির সুযোগ পেয়েও তিনি অন্য বিদ্যালয়ে যান নি। বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের দিন বিদায়-মঞ্চে উঠে তিনি ছাত্র ও সহকর্মিদের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। অষ্টমী-স্নানের দিন স্কুল থেকে ফিরার পথে দেখেন হাজার হাজার স্নানযাত্রী চলেছে লাঙ্গলবন্ধে। অমনি তিনি কোট-পেন্টলুন নিয়েই তাঁদের চরণ-ধূলায় পথের মাঝে করেন গড়াগড়ি। গেণ্ডেরিয়া আশ্রমের তিনি ছিলেন অনলস কর্মী। আশ্রমটি ছিল তাঁর মহাতীর্থ।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের স্বরূপ ব্রহ্মের ন্যায়। শ্রীবৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে গোস্বামীপ্রভুর সেই অবস্থা। জীবনসঙ্গিনী দেহ রাখলেন। প্রভুর মধ্যে বৈলক্ষণ্য নেই! নিত্যকর্মে শৈথিল্য নেই! মুক্তকেশী দেবীর 'যোগমায়া' 'যোগমায়া' বলে চীৎকারে

আশ্রমবাসীদের মাঝে কান্নার রোল ওঠে। কিন্তু প্রভুর মুখশ্রীর কোন পরিবর্তন নেই; কোনও ভাবান্তর নেই। একেবারে নির্বিকার। শোক-তাপ তাঁকে স্পর্শ করে না।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ। প্রকৃতির সুখ-দুঃখের সাড়া পড়ে তাঁর অনুভূতিকেন্দ্রে। প্রাণী, উদ্ভিদ, এমন কি যাদের আমরা চেতনাহীন জড়বস্তু বলে থাকি, এদেরও ভীতি, সন্ত্রাস ও উল্লাসে তিনি সচেতন।

সাধনরাজ্যের তুঙ্গে পৌঁছে তিনি ভূমানন্দে থাকেন। ভগবানের নিত্যলীলা তিনি সতত আস্বাদন করেন। স্থান ও সময়ের ব্যবধান তাঁর কাছে ঘুচে গেছে। বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সবই এখন তাঁর কাছে ‘করতলন্যস্ত আমলকবৎ’। তাঁর শ্রীদেহ নামব্রহ্মের মন্দির। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, আসনে-বসনে—এমন কি আশ্রমবৃক্ষে নাম ও নামের প্রতিপাদ্য দেবতার মূর্তি প্রকট হয়ে ওঠে।

একদিন প্রভু কীর্তনের পর নিত্যানন্দপ্রভুর প্রত্যাদেশের কথা শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করেন। এতে তাঁদের উৎসাহের অন্ত নেই। পাকা মন্দির নির্মাণের জন্য ঢাকার শিষ্যেরা চাঁদা তুলতে লেগে যান। নামব্রহ্মের যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করেন ১২৯৮ সালের মহাষ্টমীর দিন। প্রভু বলেন, ‘এর মাঝেই শুভদিন দেখে সাধন-কুটীরে নামব্রহ্মের পূজা শুরু করলে কেমন হয়?’ বৈশাখে (১২৯৮) স্বহস্তে তিনি নামব্রহ্মের পট লিখেন; শঙ্খ, ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ কিনে আনান। সাধন-কুটীরে নামব্রহ্মের নিত্যপূজা ও আরতি শুরু হয়। আশ্রমের দক্ষিণে, পুকুরের উত্তর পাড়ে আমগাছের তিন-চার হাত দূরে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন হয়। রাধারমণবাবু নক্‌সা করান। ভিং খুঁড়তেই দুটি কঙ্কাল বের হয়। প্রভু বলেন, ‘গেণ্ডেরিয়ায় মুসলমান ফকিরদের সাধন-ভজনের স্থান ছিল। বৃক্ষ অবলম্বন করে তাঁরা ছিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। যে দু-চারজন এখনও আছেন তাঁরাও চলে যাবেন।’

কুঞ্জ ঘোষের পরিবার—শিশু হতে বৃদ্ধ সকলেই প্রভুর বড় অনুগত। কথা-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে এই ভক্ত-পরিবারের তুলনা হয় না। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে ফেরিওয়ালার ঝুড়ি থেকে কুঞ্জ ঘোষ একটি পেয়ারা বেছে কিনে তাতে কামড় দিতেই তাঁর মনে হয়, জীবনে এমন সুস্বাদু পেয়ারা কখন তিনি খান নি। ঐ অবস্থায়ই তিনি পেয়ারা নিয়ে ছুটেন আশ্রমে। প্রভুর শ্রীমুখের সামনে পেয়ারাটি ধরে তিনি বলেন, ‘ঠাকুর খেয়ে দেখুন, কি সুস্বাদু!’ প্রভুও বাক্যব্যয় না করে সেই অর্ধভুক্ত উচ্ছিষ্ট পেয়ারাটি খেয়ে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। গুরু-শিষ্যের এই অকপট প্রেম শবরীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়!

এই পরিবারের উপর হঠাৎ এক উৎপাত দেখা দিল। গোসাঁইর আশ্রমে পৌঁছার কয়েকদিন পূর্বে রাত্রিপ্রভাতে একদিন দেখা গেল যে, কুঞ্জবাবুর বাড়ীর আঙ্গিনায় ঘাসের উপর, আনাচে-কানাচে, মায় ঘরের চালে, গাছের পাতায়—সারা বাড়ী জুড়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, যেন ইলশেগুড়ি শোণিত-বৃষ্টি! আশ্রমের গায় এই বাড়ী। অথচ আশ্রমের কোথাও বা অন্যত্র আর কোথাও রক্তের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই! প্রভুর আশ্রমে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জবাবুর গৃহে উপদ্রব ফের শুরু হয়। শুধু তাই নয়, কুঞ্জবাবুর স্ত্রী ও ছেলেও উৎকট জ্বরে বেহুঁস। কুঞ্জবাবুর শাশুড়ী প্রভুর কাছে ছুটে আসেন। অনাছিষ্টির কথা তাঁকে খুলে বলেন। গোসাঁইজী তাঁকে বলেন, ‘দেবতার প্রতি আপনার বিরূপ আচরণেই এ সব ঘটছে।’ বৃদ্ধা নিজে থেকে তখন

বলেন, 'আমি কৃষ্ণনাম করি। কালী এসে কেন উঁকিঝুঁকি মারেন? যখনই নাম করতে বসি, তিনি এসে দাঁড়ান। নামের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাছে আসতে থাকেন; বারবার তাঁকে সরে যেতে বলি, কিন্তু আমার কথা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই নেন না। সেদিন হাতের কাছে ঝাড়ু ছিল তাই ছুঁড়ে মারলাম। তারপর আর তাঁকে দেখি নি। কিন্তু পরদিনই দেখা দিল এই উৎপাত।' প্রভু তাঁর কথা শুনে তেজের সঙ্গে বলেন, 'করেছেন কি? কালী কাঁচা-খেকো দেবতা; তাঁকে আপনি ঝাঁটা ছুঁড়ে মারলেন? লোকে সাধ্য-সাধনা করে যাঁর দর্শন পায় না, কৃপা করে তিনি আপনাকে দর্শন দিলেন, আর আপনি কিনা তাঁকে ঝাঁটা মারলেন!'

—কালী আমার কাছে আসেন কেন? আমার মনে হয়েছিল তিনি আমার সাধন-পথে বিঘ্ন!

—সে কি? কালী কি ভগবান নন? দীক্ষাকালে ভগবানের কোন নির্দিষ্ট রূপের কথা বলা হয়েছিল কি? ভগবান কাকে কিভাবে কৃপা করবেন তা শুধু তিনিই জানেন। ধ্যানের সময় কোন দেবতার রূপ পূর্ব থেকে কল্পনা করতে নাই। শক্তিমন্ত্র, শিবমন্ত্র, কৃষ্ণমন্ত্র সবই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম, সাধন-ভাবের উপরই সব নির্ভর করে। কৃষ্ণমন্ত্র যদি কেউ সাত্ত্বিকভাবে সাধন না করে ঐশ্বর্যভাবে বা রাজসিকভাবে করেন, তাহলে তা-ই হয়ে যায় শক্তিমন্ত্র। আবার কেউ যদি শক্তিমন্ত্র মধুরভাবে বা সাত্ত্বিকভাবে সাধন করেন তবে তা-ই হয়ে যায় কৃষ্ণমন্ত্র।

—এখন উপায়?

—মানসিক করে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থামত কালীপূজা করতে হবে, নচেৎ অকল্যাণ হবে।

কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে যথাশাস্ত্র কালীপূজা হয়। কালীমূর্তি আনা হয়। প্রভুর নির্দেশে কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষু বলি দেওয়া হয়।

১৪ চৈত্র, ১২৯৭; দীক্ষান্তে হাসি-কান্নার ঢেউ ওঠে। গোসাঁইজী সমাধিস্থ। তিনি ঐ অবস্থায় বলেন, 'কত যোগী, কত ঋষি, কত দেব-দেবী আজ সত্যযুগের নিশান হাতে নিয়ে নভোমণ্ডলে আনন্দে নৃত্য করছেন। পঁচিশ জন বৌদ্ধযোগী লামাগুরু এখানে উপস্থিত। সংসারের কল্যাণ করতে আজ এই মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে অবতরণ করলেন।' তাঁর কথা শেষ হলে সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্তা বালিকা, নাম অবলা, প্রভুকে গড় হয়ে প্রণাম করে তিব্বতী ভাষায় তাঁর স্তবস্তুতি করে। মেয়েটি কুঞ্জ ঘোষের সহধর্মিণীর সহোদরা। কুঞ্জবাবুর এগার বছরের ছেলে ফণিভূষণ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করে, 'ওঁর ভিতর কি কোন আত্মা প্রবেশ করেছিল? কি যে বললেন কিছুই তো বুঝলাম না।' প্রভু তাকে বলেন, 'কয়েকজন বৌদ্ধযোগী এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ওর মধ্যে প্রবেশ করে তিব্বতী ভাষায় কত কি বললেন।'

—আপনি কি করে তিব্বতী ভাষার কথা বুঝলেন?

—শুধু বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ কেন—জীব, জড়, উদ্ভিদ, সবার কথাই আমি বুঝি।

কুঞ্জ ঘোষের শাশুড়ী আশ্রমের ঘর লেপতে লেপতে ভাবে বিভোর হয়ে পড়েন। কাদামাখা ন্যাকড়া নিয়ে আমতলায় প্রভুর মুখে ঘষতে ঘষতে গান ধরেন—

যশোদা সাজাতে জানে না ভালো।
তাই তো ঠাকুর, তুমি এত কালো॥[১]

প্রভু নির্বিকার। তাঁর আপাদমস্তক ঐভাবে লেপে কুঞ্জ ঘোষের শাশুড়ী সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে বিড় বিড় করে অবোধ্য ভাষায় কি বলেন। গোসাঁইজী বলেন, তিনি তিব্বতী ভাষায় স্তবস্তুতি করছিলেন। পূর্বে তিনি তিব্বতে জন্মেছিলেন।

প্রভু আমতলায় উপবিষ্ট। তিনি চমকে উঠে বলেন, 'ব্রহ্মচারী দেখত দেখত—ওদের শীগ্‌গির তাড়িয়ে দাও।' চোখে-মুখে ফুটে ওঠে বেদনার অভিব্যক্তি। তিনি বলেন, 'কুঞ্জ ঘোষের আমগাছে পাখিগুলি ভয়ে ছোটাছুটি করছে। কয়েকটি ছেলে ওদের ঢিল ছুঁড়ছে।' কুলদানন্দজী ছুটে যান। তিনি গিয়ে দেখেন শালিখ পাখির নীড় নিশানা করে কয়েকটি বালক ঢিল ছুঁড়ছে। আর পাখিগুলি আর্ত কণ্ঠে এ ডাল ও ডাল করছে। ছেলেদের বারণ করতেই ওরা চলে যায়। ফিরে গিয়ে ব্রহ্মচারী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এত দূর থেকে আপনি কি করে জানলেন?' 'নিকটে আর দূরে কি করবে? যেখানেই যে অবস্থায় থাকি না কেন, আপদে পড়ে কেউ ডাকলে, তা এসে প্রাণে বাজে।' আসনের পাশ দিয়ে তখন এক সারি পিঁপড়া যাচ্ছিল। প্রভু কান পেতে মাথা নাড়েন। ব্রহ্মচারীকে বলেন, 'তুমি পিঁপড়ার জন্য কিছু খাবার এনে দাও না! আটা আর চিনি মিশিয়ে দিলে ওদের খুব আনন্দ।' কুলদানন্দজী জিজ্ঞাসা করেন, 'পিঁপড়ার কথাও কি শোনা যায়?' প্রভু বলেন, 'পিঁপড়া কেন? গাছ, লতা, পাতাও কথা বলে। মনটি স্থির হলে কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, সকলের কথাই শোনা যায়।'

অবেলায় প্রভু একদিন বলেন, 'খাবার কি আছে, নিয়ে এস।' আহারে বসে ক্ষুধা যেন মিটে না। ভক্তেরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'অসময়ে কখন তো প্রসাদ নেন না। পরিমাণও নির্দিষ্ট। অথচ আজ কেন এর ব্যতিক্রম?' গোসাঁইজী তাঁদের বলেন, 'বিদেহী এক মহাত্মা এসেছিলেন ক্ষুধার্ত হয়ে। আমার আহারে তাঁরই পরিতৃপ্তি হয়েছে।' একদিন আশ্রমে আসেন ভদ্রবেশী এক পাঁড় মাতাল। প্রভুর পাশে বসে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। আবেগ সামলাতে না পেরে তিনি ঝুঁকে পড়েন গোসাঁইজীর উপর। তাঁর মাথায় পিঠে প্রভু হাত বুলিয়ে দেন। বমি করে ভাসিয়ে দেন তিনি প্রভুর আসন ও বহির্বাস। সকলেই বিরক্তি প্রকাশ করেন; কিন্তু প্রভুর কোন ভাবান্তর নেই। আগন্তুক চলে গেলে প্রভু হাত-মুখ ধুয়ে বহির্বাস ছেড়ে এসে বসেন। শিষ্যদের তখন তিনি বলেন, 'সংসারে সব জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। হাসি নাই কারও মুখে। তাই, মাতালকেও যখন আনন্দ করতে দেখি, বড় ভাল লাগে। বমিতে কি আসে যায়!' বিষ্ঠা আর চন্দনে তফাৎ নেই গোসাঁইজীর!

শ্যামাচরণ বক্‌সী কুলদানন্দজীকে শুধান, 'এখন কি বলে দেবার সময় হবে আপনার?' যেন আকাশ থেকে পড়েন ব্রহ্মচারী। 'কি বলে দেব?' 'কাল রাত দশটায় ঠাকুর আমাদের বাড়ী এসে বললেন, "ব্রহ্মচারীর কাছে কাল গিয়ে ন্যাসাদি শিখে নিও।"'

পূর্বদিন রাত্রি দশটায় ব্রহ্মচারী প্রভুর আসনের পাশেই শুয়েছিলেন, আর প্রভু আসনে বসে হাসি-গল্প করছিলেন; আসন ছেড়ে তিনি কোথাও যান নি। মনের ভাব গোপন করে ব্রহ্মচারী বলেন তাঁকে, 'আচ্ছা চলুন, ঠাকুরের কাছে গিয়ে,

---

[১] 'মন্দিরে' প্রকাশিত যোগমায়া গুহঠাকুরতার প্রবন্ধ থেকে।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ভাল করে বুঝে নিই।' যেতেই প্রভু বলেন, ব্রহ্মচারি, ওকে ন্যাসের প্রণালী বলে দিও।' ব্রহ্মচারী সেদিন তাঁর রোজনামায় ঘটনাটি উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, 'একই ব্যক্তি একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকট হয়ে থাকেন—সাধু-মহাত্মারা যোগৈশ্বর্য দ্বারা এরূপ করে থাকেন—এর প্রমাণ কোথাও পাই নাই। একমাত্র ভগবানের পক্ষেই এ সম্ভব। ঠাকুরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে প্রবৃত্তি হয় না। যে প্রশ্নে তাঁর ভগবতত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে, তার উত্তরে ঠাকুর আমতা আমতা করতে থাকেন—কখন বা চুপ করে থাকেন।'

রাজকুমার দত্ত মথুরা থেকে প্রভুর ব্যবহারের জন্য নিয়ে আসেন সুন্দর একটি পিতলের কমণ্ডলু। জলপাত্রটি হাতে নিয়ে প্রভু এর সুখ্যাতি করেন পঞ্চমুখে। তারপর মাটিতে রেখে বলেন, 'আমার একটি কমণ্ডলু রয়েছে, এটি নিয়ে অশ্বিনীকে দিন। অশ্বিনীর বোধহয় জলপাত্র নাই।' ব্রহ্মচারী বলেন, 'অশ্বিনীর কমণ্ডলু রয়েছে।' প্রভু বলেন, 'থাকলেও ওটা তাকে দেওয়া ভাল। ওর খুব সাধ হয়েছে এটা নিতে।'

কুলদানন্দজী বলেন, 'শুধু অশ্বিনী কেন? আরও অনেকেরও তো হতে পারে।' প্রভু বলেন, 'হ্যাঁ তা ঠিক। তবে কোন জিনিস দেখে সাধারণভাবে নেবার ইচ্ছা এক, আর তাতে আসক্তি হওয়া স্বতন্ত্র কথা। যার যে বস্তুতে আসক্তি হয় ওতে তার আকৃতির ছাপ পড়ে। স্বচ্ছ বস্তু বা আয়নায় যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তা সাধারণের চোখে পড়ে। সরে গেলে আর থাকে না। কিন্তু ছবি তোলার সময় রাসায়নিক আরকে যে ছায়া পড়ে তা ওখানে আবদ্ধ হয়ে যায়। আসক্তিরূপ আরকেও চেহারা আবদ্ধ হয়ে যায়। চোখ যাঁদের একটু পরিষ্কার হয়েছে, তাঁরা দেখামাত্র বুঝতে পারেন। গোপন কি কিছু রাখা যায়?'

১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি প্রভুর সর্দি-জ্বর হয়। দিন দিন শরীর খারাপ হতে থাকে। ভক্তেরা ডাক্তার আনেন। প্রভু ঔষধ খান না। তিনি বলেন, 'ঔষধে সারবার রোগ এ নয়।' মাসের শেষের দিকে বাড়াবাড়ি। তাপ অত্যন্ত বেশী। ডবল নিমোনিয়া। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন, 'ফুসফুস দুটোই পচে গেছে।' কাশির সঙ্গে চাপ-চাপ রক্ত বের হয়। প্রভু যোগজীবনকে একদিন বলেন, 'আমার দেহান্তে আমাকে সমাধিস্থ করিস। এ-কথা এখন কাউকে বলিস না। আর একটা কথা—গুরুভাইদের ভিতর কখন ছোট-বড় করিস না। এতে গুরুস্থানে অপরাধ হয়।' প্রভুর অসুখের খবর পেয়ে কলিকাতা থেকে ডাঃ নবীনচন্দ্র ঘোষ গুরুভ্রাতা বৃন্দাবন ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে গেণ্ডেরিয়ায় ছুটে আসেন। গুরুর শরীর পরীক্ষা করে তিনি 'হায় হায়' করেন। এই সংকটজনক অবস্থার মধ্যে একদিন সকালে প্রভু বলেন, 'আমার শরীর দই চাইছে, দই নিয়ে এস।' নবীনবাবু বেঁকে বসেন—'দই দিলে আর রক্ষা নেই।' শিষ্যেরা যুক্তি করে কূল পান না। বিধুভূষণ মজুমদার আর রাধারমণ গুহ দুজন বের হন কাউকে কিছু না বলে। দুসেরী দই-এর ভাঁড় এনে তাঁরা প্রভুর হাতে তুলে ধরেন। যথারীতি নিবেদন করে গোসাঁই তা গ্রহণ করেন। তিনি এর পর একেবারে সুস্থ হয়ে উঠেন। পরের দিনই তিনি অন্নপথ্য করেন। নবীনবাবু প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে বলেন, 'আপনি বেদ-বিধির অতীত, চিকিৎসাশাস্ত্র আপনার মহিমার কূল পায় না।' উত্তরে গোসাঁইজী বলেন, 'ঔষধে এ রোগ সারবার নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা রোগ নয়; সাধনপথে দেহের অণু-পরমাণুর পরিবর্তন। এই সময় প্রকৃতিভেদে দেহে এক-

এক রকম ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এভাবে সাধকের ভাগবতী তনু লাভ হয়।'

এবার সুস্থ হয়ে প্রভু নিদ্রা পরিত্যাগ করেন। কেবল ভোরের দিকে পঁচিশ-ত্রিশ মিনিট শুয়ে হাত-পা টানা দেন। শাস্ত্রে আছে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট লোককে নিদ্রায় অভিভূত করতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—'সত্ত্বাজ্জাগরণম্।'

কৃপানাথ মজুমদার ছিলেন দ্বারভাঙ্গা রাজ-স্কুলের প্রধানশিক্ষক। গ্রীষ্মাবকাশে তিনি গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে আসেন। প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'গত পৌষ মাসে কি কোন সাধুর সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছিল?' প্রশ্ন শুনে কৃপানাথবাবু হতভম্ব। ভাবেন, এ খবর তিনি কি করে পেলেন! কৃপানাথবাবু উত্তর দেন, 'হ্যাঁ হয়েছিল।'

—তাঁকে আপনাদের কেমন লাগল?

—খুব ভাল। এমন সৌম্যমূর্তি ও মধুর প্রকৃতি সচরাচর দেখা যায় না।

—কি করে তাঁর দর্শন পেলেন?

—একদিন স্কুলের কয়েকটি ছেলে এসে খবর দেয়, নানকসাহী রাজারাম বাবার সমাধি-মঠে এক সাধু এসেছেন। তিনি আমার এবং গুরুভাই পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, গিরীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও হরিচরণ সেনের খোঁজ করেছেন। আমরা ঐদিনই গিয়ে তাঁকে দর্শন করি।

—কি কথা হল তাঁর সঙ্গে?

—আমাদের দেখেই বলেন, 'আপনারা সদ্‌গুরুর আশ্রিত। আপনাদের দেখে পবিত্র হলাম।' তাঁর পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও মধুর ব্যবহারে আমরা অভিভূত হলাম। তিনি আমার গৃহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে হবিষ্যান্ন পান। ঐদিনই হঠাৎ শ্রীক্ষেত্রে চলে যান।

—আপনারা ভাগ্যবান। আমার গুরুদেব আপনাদের কৃপা করে দর্শন দিয়েছিলেন।

১৪ শ্রাবণ, ১২৯৮ সাল। প্রসাদ পাবার পর প্রভু ধ্যানস্থ। বেলা একটা নাগাদ চম্‌কে উঠেন। শশব্যস্ত হয়ে পশ্চিমের দরজা দিয়ে উত্তর-পশ্চিম আকাশের পানে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর!! কি সুন্দর!!! সোনার রথ কি শোভা! ধন্য! ধন্য!! হলুদ রঙের কত পতাকা উড়ছে। আহা সমস্ত আকাশ আজ হলুদ রঙের উজ্জ্বল ছটায় একেবারে ঝলমল করছে! চারদিকে কত সুন্দরী সুন্দরী দেবকন্যা! দেবকন্যারা চামর নিয়ে ব্যজন করছেন! অপ্‌সরাসকল নৃত্য ও গান করছেন। আহা কত আনন্দ! আজ গুণের সাগর বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আকাশ-পথে সকলে আনন্দ করতে করতে যাচ্ছেন। মহাপুরুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চললেন। হরিবোল, হরিবোল।' বলতে বলতে প্রভু সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। পরে খবর পেঁাছে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেছেন। স্কুল-কলেজ সঙ্গে সঙ্গে ছুটি হয়ে যায়।

সাধন পাবার পর থেকে শ্রীধর গুরুসঙ্গছাড়া বড় হন নি। স্বভাবত তিনি নিষ্ঠাবান, ভজনশীল, গুরুগতপ্রাণ সাধু। আবার মাথা গরম হলে মনে হয় বদ্ধ পাগল। শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনি বেসামাল—সর্বাবস্থায়ই আনন্দে ডগমগ! সদ্য-বিপত্নীক এক ভদ্রলোক আসেন প্রভুর কাছে শান্তির খোঁজে। তিনি এক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক। গোস্বামীপ্রভুর কথায় তৃপ্ত না পেয়ে দক্ষিণের ঘরে লেংটিপরা, কম্বলমোড়া শ্রীধরকে ধ্যানস্থ দেখে তাঁর কাছে গিয়ে

তিনি বলেন, 'বাবাজী, কয়েকদিন হয় আমার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। বড়ই ক্লেশ হচ্ছে। একটু আরাম কিসে পাই, বলতে পারেন?' শ্রীধর প্রভুর ঘর দেখিয়ে বলেন, 'আপনি ওখানে গিয়ে সব খুলে বলুন।' কিন্তু ভদ্রলোক তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন, 'এতক্ষণ তো ওঁর কাছেই ছিলাম। ওসব মামুলি কথা ঢের শুনেছি। আপনি কিছু বলুন।' শ্রীধরের পা হতে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। তিনি বলেন, 'কি করবেন আর, আবার বিয়ে করুন।' আগন্তুক বলেন, 'তা আর হয় না।' শ্রীধর হাত-মুখ নেড়ে বিকৃত সুরে বলেন, 'তাহলে এই করুন গিয়ে।' তাঁর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও কথা শুনে ভদ্রলোক অগ্নিশর্মা হয়ে গোসাঁইর কাছে গিয়ে নালিশ করেন। প্রভু শ্রীধরকে ডেকে পাঠান; তাঁকে বলেন, 'এ কি শ্রীধর! এই ভদ্রলোককে তুমি কি বলেছ?' শ্রীধর বলেন, 'আপনার উপদেশ ভাল না লাগায় তিনি গিয়েছিলেন আমার কাছে, কিসে আরাম পাবেন, তা জানতে। আমি কি আচার্য? আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমি যা করেছি তা-ই বলেছি।'

আশ্রমের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে অবান্তর কথাবার্তা বলেন কয়েকজন শিষ্য। প্রভুর কানে যেতেই তিনি আর আলাদা না বসে সকলকে নিয়ে দক্ষিণের ভিটার চৌচালা ঘরে প্রসাদ পেতে বসতেন। তাঁকে প্রথম পরিবেশন করতে গেলে তিনি বলতেন, 'সকলকে দেবার পর আমাকে দেবেন। যা সকলের কুলাবে না, এমন জিনিস আমাকে দেবেন না।' যারা বেশী খেতে পারেন, তাঁদের উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'আপনারা লজ্জা করে কম খাবেন না। বেশী খেয়ে হজম করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়।' প্রভু এ-সব বিভিন্ন প্রকৃতির শিষ্যদের বুকে নিয়ে আছেন। তাঁদের অশোভন আচরণেও তিনি ধীর, স্থির, শান্ত ও অবিচল। অসাধারণ প্রভুর দয়া ও সহানুভূতি।

যোগমায়া দেবীর দেহরক্ষার পূর্বে প্রভু একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে বলেছিলেন, 'দেখবে অবিলম্বে গেণ্ডেরিয়ায় শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজবে।' তখন কেউ ভাবতেও পারে নি—কি হবে। ২৫ আশ্বিন, ১২৯৮ যোগমায়া দেবীর সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। মন্দিরটি নক্‌সা অনুযায়ী হয় নি। প্রভু বলেন, 'ভগবানের ইচ্ছায় যা হবে তাতে কি মানুষের আর কোন হাত থাকে? নক্‌সামত করতে রাজমিস্ত্রিরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আর এক প্রকার হয়ে গেল। মন্দিরটি অনেকটা বিষ্ণুমন্দিরের মত হয়েছে।'

ঐদিনটি মহাষ্টমী তিথি। যোগমায়া দেবীর অস্থি সমাধিস্থ করে তদুপরি মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। তিন থাকের একখানি আসন প্রস্তুত হয়ে আসে। সর্বোচ্চ থাকে শ্রীশ্রীনামব্রহ্মের পট, মাঝেরটিতে যোগমায়া দেবীর আলোকচিত্র আর নীচের থাকে তাঁর শাঁখা-সিঁদুরের কৌটা রাখা হয়। পূর্বের নামব্রহ্মের পটখানা নষ্ট হয়ে যায়। এই পটখানা এঁকে দেন যশোদাকুমার বসু। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী চণ্ডী পাঠ করে হোম করেন। রাত্রে আরতি করেন প্রেমসখী। তদবধি গেণ্ডেরিয়ায় ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য দিয়ে, শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর ও খোল-করতাল বাজিয়ে নামব্রহ্মের পূজা হয়। প্রভু বলেন, 'ভক্তিই নামব্রহ্মের পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে দিনান্তে একটি প্রণাম করলেও নামব্রহ্মের পূজা হয়। মন্দিরের দ্বার দুদিন বন্ধ থাকলেও ক্ষতি নাই। দুর্বল কলিজীবের জন্য এই সহজ সরল ব্যবস্থা।'

যোগজীবন পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রেখে নামব্রহ্মের

পূজা করালে কেমন হয়?' প্রভু বলেন, 'এই পূজায় জাতি-বর্ণ বিচার নাই। নামব্রহ্মে নিবেদিত অন্ন মহাপ্রসাদতুল্য। দীক্ষিত হীনবর্ণের লোকের নিবেদিত ও স্পৃষ্ট হলেও ক্ষতি নাই। ব্রাহ্মণ যদি অবজ্ঞা করে তা গ্রহণ না করেন, তাহলে প্রত্যবায়ভাগী হবেন।' এই বলে তিনি মহানির্বাণতন্ত্র তৃতীয় উল্লাস থেকে নামব্রহ্মের পূজাবিধি উল্লেখ করেন—

ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যম্ সদ্রূপায় নমোনমঃ॥ ৭৪

তুমি পরম ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমি পরম আত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি গুণাতীত, তোমাকে নমস্কার। তুমি শাশ্বত সদ্‌স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।

পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জনে।
সর্বত্র সর্বকালেষু, সাধয়েদ্ ব্রহ্মসাধনম্॥ ৭৭

পরব্রহ্মের পূজায় আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। সকল সময় সকল স্থানেই ব্রহ্মসাধন হতে পারে।

অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তোবাপি বুভুক্ষিতঃ।
পূজয়েৎ পরমাত্মানম্ সদা নির্মলমানসঃ॥ ৭৮

স্নাত বা অস্নাত থেকে, ভুক্ত বা অভুক্ত হয়ে সর্বাবস্থাই সশ্রদ্ধচিত্তে পরমাত্মার পূজা করা যায়।

অনেন ব্রহ্মমন্ত্রেণ ভক্ষ্যপেয়াদিকঞ্চ যৎ।
দীয়তে পরমেশায় তদেব পাবনং মহৎ॥ ৭৯

গুরুদত্ত মন্ত্রে যে-কোন খাদ্য বা পানীয় বস্তু পরব্রহ্মে নিবেদিত হয়, তা-ই শুদ্ধ হয়ে যায়।

গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌচ স্পৃষ্ট দোষোঽপি বর্ততে।
পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে॥ ৮০

গঙ্গাজলে ও শালগ্রাম-শিলায় স্পর্শদোষ হতে পারে, কিন্তু নামব্রহ্মে নিবেদিত অন্নজলাদিতে স্পর্শদোষের সম্ভাবনা নেই।

নাত্র বর্ণ বিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদি বিবেচনম্।
ন কালনিয়মোঽপ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈবচ॥ ৮২

এই মহাপ্রসাদ ভোজনে জাতি-বিচার নেই, উচ্ছিষ্টাদি বিচার নেই। এতে কালাকাল বিবেচনা নেই। শৌচাশৌচও বিচার নেই।

আনীতম্ শ্বপচেনাপি শ্বমুখাদপি নিঃসৃতম্।
তদন্নং পাবনং দেবি, দেবানামপি দুর্লভম্॥ ৮৪

হে দেবি! যদি নামব্রহ্মে নিবেদিত অন্ন চণ্ডালে নিয়ে আসে, এবং কুকুরের মুখ থেকে পড়ে, তথাপি তা পবিত্র ও দেবদুর্লভ।

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বাপ্যন্যপাতকৈঃ।
সকৃৎ প্রসাদগ্রহণাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮৬

যদি মহাপাতকীও একবার মাত্র এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে, তাহলেও সে সব পাপমুক্ত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

ন মিথ্যাভাষণম্ কুর্য্যাৎ ন পরানিষ্টচিন্তনম্।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জয়েৎ॥ ১০২

ব্রহ্মমন্ত্র-উপাসক কখন মিথ্যাকথা বলবেন না। কল্পনায়ও অপরের অনিষ্ট চিন্তা

করবেন না। পরস্ত্রীগমনও সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবেন।

প্রভু বলেন, 'নামব্রহ্ম পূজার একটি বৈশিষ্ট্য যে এতে সেবাপরাধ নাই। কিন্তু লোক-দেখান ভাব যেন এর মধ্যে প্রবেশ না করে।' অব্রাহ্মণ হয়েও কুঞ্জবিহারী ঘোষের পুত্র ফণিভূষণ প্রভুর নির্দেশে আশ্রমে নামব্রহ্মের পূজার ভার নিয়েছিলেন। মহানির্বাণতন্ত্রে প্রথম ছটি অধ্যায় প্রণবযুক্ত ব্রহ্মনামের বা নামব্রহ্মের পূজার কথা নিয়ে। তাছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতেও রয়েছে—

ইতি মূর্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্তিমমূর্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপুরুষং সম্যগ্‌দর্শনঃ পুমান্॥

এইরূপ মূর্তির উল্লেখ করে অপ্রাকৃত মন্ত্রমূর্তি যজ্ঞপুরুষের যিনি ভজনা করেন তাঁর পূজা সার্থক। শ্রীমদ্ভাগবতে আরও আছে—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যালেখ্য চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধাস্মৃতা॥

প্রতিমা আট রকম। তার মধ্যে 'লেপ্যা' (লিপ্‌+ণ্যৎ+আপ্‌) যা লিপিবদ্ধ করা যায় তাও একটি; আর আলেখ্য (আঙ্‌—লিখ্‌+ণ্যৎ) যা সর্বতোভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়—অর্থাৎ চিত্র—তা আর একটি। 'প্রণব'কে পরব্রহ্মের প্রতীক বলা হয়েছে—গীতায় ও মাণ্ডুক্যোপনিষদে।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম —গীতা
প্রণবোহি পরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতম্—মাঃ উপ.

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর উক্তি—

প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি।
প্রণব হইতে সর্ববেদ জগতে উৎপত্তি॥ ২।৬।১৫৮
কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার
নাম হইতে হয় সর্বজগত নিস্তার॥ ১।১৭।১৯
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ রূপ॥ ২।১৭।১২৭

শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশে অদ্বৈতপ্রভুর উক্তি—

ধর্ম প্রবর্তন হেতু লহ হরিনাম।
নামব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ॥
যৈছে ভগবানের শক্তি অনন্ত চিন্ময়।
তৈছে নামব্রহ্মের শক্তি নিত্যসিদ্ধ হয়॥

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর সময় থেকে নামব্রহ্মের পূজার সূত্রপাত হয়। কিন্তু তা অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; জনসাধারণ্যে প্রচার হয় নি। শ্রীপাট অম্বিকা-কালনায় সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে এবং সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের পাটবাটীতে বহুদিন থেকে নামব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে একখণ্ড নিমকাঠে কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এবং সপ্তগ্রাম পাটে একখানি প্রস্তরফলকে চার যুগের চারটি তারকব্রহ্ম নামই খোদিত হয়ে বিগ্রহের ন্যায় অর্চিত হন।

নিত্যানন্দপ্রভু গোস্বামীপ্রভুর নিকট যা প্রকাশ করেছিলেন, তা আলাদা হলেও

মূলত একই নামব্রহ্ম। তবে তা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও সকল প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্য। এখানে 'ওঁ হরিঃ' এই পরব্রহ্ম-মহামন্ত্র ব্রহ্মের প্রতীক বা প্রতিমা এবং 'হরের্নাম' শ্লোকটি ঐ প্রতিমার পিঠাসন-স্বরূপ।

প্রভু বলেছেন, 'কালী, দুর্গা, শিব, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, আল্লা, খোদা, গড্ সবই হরিনাম।' ব্রহ্ম অনাদি-অনন্ত। তাঁর অসংখ্য পূজারী। তাঁদের পূজার মন্ত্র অসংখ্য হওয়াই সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'নামব্রহ্ম' সর্ব দেবতার প্রতীক বিগ্রহ। সুতরাং নামব্রহ্মের ব্যাপক প্রতিপাদ্য হল—'হরিঃ ওঁ' বা 'ওঁ হরিঃ।' বলা যায়, নামব্রহ্ম—ওঁ হরিঃ (যেখানে ওঁ যে কোন বীজের প্রতিপাদ্য আর হরিঃ যে কোন দেব-দেবীর নাম)।

মহানির্বাণতন্ত্রে উক্ত পূজাপদ্ধতিতে সংকীর্ণতা এতটুকু প্রশ্রয় পায় নি। এতে নামব্রহ্ম পূজার মূল কথা—সাম্য, মৈত্রী, সৌভ্রাত্র ও উদারতা। ছুঁৎমার্গের স্থান এখানে নেই।

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলেছেন, ব্রহ্মবিদ্ বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তি—এই তিনটি স্তর আয়ত্ব করে পরা নামক স্তরে পেঁছেন। তখন থেকে তাঁর এক অভূতপূর্ব অবস্থা। তাঁর কাছে আর গোপন কিছুই থাকে না। তিনি সকল রকম নাদ ও সকল ভাষায় ব্যক্ত কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেন। মনুষ্য, প্রাণী, উদ্ভিদ, সকলই তখন সুহৃদ। সুখ-দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। শোকতাপ তাঁকে অভিভূত করে না। নিকট-দূর তাঁর কাছে সমান হয়ে পড়ে।

পূজায় কোর্ট বন্ধ। বর্ধমানে এসেছেন হরিদাস বসু ব্রাহ্ম উৎসবে। গোসাঁইর কথা উঠায় মনটা কেমন করে উঠে। ঐখান থেকে তিনি ঢাকায় ছুটেন। পথ-ঘাট জানা নেই; ঢাকায় প্রভু কোথায় থাকেন জানেন না। অলক্ষ্যে কে যেন হাতছানি দিয়ে তাঁকে গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে নিয়ে পেঁছায়। তাঁকে দেখেই গোসাঁই যোগজীবনকে বলেন, 'দুদিন ধরে ইনি কিছু খান নি, শীগ্গির ব্যবস্থা কর।' আশ্রমের জলখাবার আর আহারের ঘটা দেখে তিনি হতভম্ব। সুগন্ধ চিকন চাল, ছানার ডাল্না, ডাল, ভাজা, ক্ষীর, সন্দেশ। গোসাঁই রোজ পাঁচ-ছ সের চাল পাখিদের জন্য ছড়িয়ে দেন। অথচ এদিকে আয়ের কোন সংস্থান নেই। আজগুবী সব কাণ্ড! শ্রীধর উৎসাহের সঙ্গে বলেন, 'আমরা রাজার বেটা—পেট ভরে খাই আর বন ভরে হাগি। রোজই আমাদের এইরূপ।' গোস্বামীপ্রভুকে হরিদাসবাবু বলেন, 'আপনার আশ্রমে দেখি ষোড়শোপচারের ব্যবস্থা। এই জিহ্বা-লাম্পট্য সাধন-ভজনের অনুকূল নয়।' হরিদাসবাবু তখন মনে-প্রাণে ব্রাহ্ম। রুজী-রোজগার ভাল। গোসাঁইজীর আসন-ঘরের দেয়ালে যশোদা ও গোপালের ছবি দেখে তিনি মনে মনে বলেন, 'ইনি একেবারে পৌত্তলিক হয়ে গেছেন।' রেশমের কাছি দিয়ে বেঁধে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার দারুমূর্তিকে রথে উঠান হয়। এই মনোহর কাছি আবার তাঁদের মালারূপে ব্যবহৃত হয়। একে পট্টডুরী বলে। মহাপ্রভু হরিদাসবাবুর পূর্বপুরুষকে এই পট্টডুরী যোগানের ভার দিয়েছিলেন বংশপরম্পরায়। হরিদাসবাবু ব্রাহ্ম হবার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রভু তাঁকে বলেন, 'পট্টডুরী দিতে হয়।' হরিদাসবাবু পরিহাস করে বলেন, 'কাঠের ঠাকুরকে রশি দিয়ে বেঁধে কি হবে? যশোদা গোপালকে বাঁধতে পেরেছিলেন কি? ভগবানকে প্রেমের ডোরেই বাঁধতে হয়।' প্রভু আর কোন কথা বলেন না এ নিয়ে। 'ভালি গোরাচাঁদের আরতি বণি'—আশ্রমে এই কীর্তন শুনে হরিদাসবাবু প্রভুকে গিয়ে বলেন, 'শ্রীচৈতন্য

পরমভক্ত। তাঁকে ভগবানের আসনে বসাবার কি সার্থকতা?' পরদিন তিনি নববিধান সমাজের খোঁজ-খবর নেন। প্রভু শ্রীচরণ চক্রবর্তীকে সঙ্গে যেতে বলেন। আশ্রমে কয়েকদিন থেকে কার্ত্তিক মাসের (১২৯৮) মাঝামাঝি হরিদাসবাবু বোলপুর ফিরে যান।

গেণ্ডেরিয়ায় একদিন শ্রীধর কীর্তনের শেষে উত্তরীয় দিয়ে প্রভুর গলদেশ আঁট করে ধরে বলেন, 'প্রভো, বলুন আপনি আমাকে কখন চরণ-ছাড়া করবেন না। আমার এই মিনতি আপনার ব্রহ্মাণ্ডের কাছে; তিন সত্য করে বলুন, নইলে আজ ছাড়ব না।' অবাক কাণ্ড! শ্রীধর বেপরোয়া। ভক্তেরা তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করেন। প্রভু ওঁদের নিষেধ করেন। ছলছল চোখে তিনি বলেন, 'তাই হবে, শ্রীধর, তাই হবে। অনন্তকাল তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।' শ্রীধর সাষ্টাঙ্গ দেন।

১৮ কার্ত্তিক, ১২৯৮, প্রভু হঠাৎ বলে ওঠেন, 'মাকে দেখতে কাল আমি শান্তিপুর যাব। যার যার ইচ্ছা আমার সঙ্গে যেতে পার।' নয় জন শিষ্য প্রস্তুত হলেন। শ্রীধর বাতে কাবু। চলা-ফেরা সম্ভব নয়। যাবার ভাড়া তাঁর হাতে দিয়ে তিনি বলেন, 'শ্রীধর, এই তোমার পাথেয় রইল। ভাল হয়েই আমার কাছে যেতে পারবে।' ২০ কার্ত্তিক তাঁরা সকালবেলা বাড়ী পৌঁছে দেখেন, স্বর্ণময়ী দেবী পথ পানে চেয়ে প্রতীক্ষা করছেন। মাকে সাষ্টাঙ্গ দিতেই প্রভুর চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। মা জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই যে এখন এলি!' প্রভু বলেন, 'তুমি যে সেদিন "বিজয় বিজয়" বলে আমায় ডেকেছিলে, তা আমি শুনেছিলাম। তাই তো এলাম।'

মায়ের গায়ে প্রহারের চিহ্ন। উন্মাদ অবস্থায় সেদিন বে-সামাল হলে প্রহার করা হয়েছিল; তখন তিনি 'বিজয় বিজয়' বলে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। গোস্বামীপ্রভুর শান্তিপুর পৌঁছার খবর পেয়ে ২৩ কার্ত্তিক, রবিবার কলিকাতা থেকে কয়েকজন শিষ্য আসেন। দুপুরে প্রসাদ পাবার পর প্রভু সকলকে নিয়ে অদ্বৈতপ্রভুর ভজনস্থান বাবলায় রওনা হন। ওখানে পৌঁছে তিনি বলেন, 'স্থানের প্রভাব বড় চমৎকার। একটু স্থির হয়ে বসে নাম করলেই বুঝতে পারবে।' আধঘণ্টাখানেক নাম করার পর সকলের কাছে মুহুর্মুহু শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ও খোলকরতাল-সমেত সংকীর্তনের ধ্বনি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরও নাম করার সঙ্গে মনে হয়, কীর্তন যেন দু-এক মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছে যাবে। কিন্তু নাম ছেড়ে উঠতেই কীর্তনের ধ্বনি বহুদূরে চলে যায়—তারপর একেবারে মিলিয়ে যায়। গোস্বামীপ্রভু তখন ওঁদের বলেন, 'ছেলেবেলায় প্রায়ই আমি বাবলায় আসতাম; এই সংকীর্তন শুনতাম। তখন একবার এদিক একবার ওদিক ছোটাছুটি করতাম। তোমরা স্থির হয়ে বসে নাম করলেই ক্রমে ওতে আরও যোগ দিতে পারতে। এই সংকীর্তন সাধারণ কীর্তন নয়। তোমরা খুব ভাগ্যবান। মহাপ্রভুর সংকীর্তন-ধ্বনি শুনেছ।'

এক সপ্তাহ পরেই রাস। শান্তিপুরের রাস প্রসিদ্ধ। প্রভু বলতেন, 'ঢাকার জন্মাষ্টমী, শ্রীবৃন্দাবনের দোলযাত্রা, অযোধ্যার ঝুলন ও শান্তিপুরের রাসযাত্রা দেখবার জিনিস। এর তুলনা আর কোথাও নাই। এ-সব উৎসবে যাঁরা যোগ দেন, তাঁদের সব অশান্তি-উদ্বেগ নষ্ট হয়ে চিত্ত প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।' সন্ধ্যার পর উৎসব দেখতে সকলে বের হন। সকল বিগ্রহেরই সাজের আজ পরিপাটি। কোথাও শ্যামসুন্দর, কোথাও রাধাগোবিন্দ, কোথাও রাধারমণ, কোথাও গোবিন্দ, মদনমোহন—শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন ভাবমূর্তি। গোস্বামীপ্রভু প্রথমে গৃহদেবতাকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে, অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। দশ-বার মিনিট এভাবে থেকে

আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, বড় রাস্তায় গিয়ে রাসযাত্রা দর্শন করেন। রাত্রে শ্যামসুন্দরের কৃপালীলার কত খুঁটিনাটি নিয়ে গল্প করেন।

রাস উপলক্ষে এক গৃহে কীর্তনীয়া নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রাগান। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসেছেন। কোকিলকণ্ঠ নীলকণ্ঠের ভাব-তাল-লয়-যুক্ত কীর্তন শুনে প্রভুর ভাবসিন্ধু উথলে ওঠে। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রকাশ পায়। তা দেখে নীলকণ্ঠের কি উদ্দীপনা! গোস্বামীপ্রভু ভাবাবেশে নৃত্য শুরু করেন। শিষ্যদের মাঝে ভাবের স্রোত ছড়িয়ে পড়ে। নীলকণ্ঠ তখন প্রভুকে আরতি করেন। এমন সময় কয়েকজন গোসাঁই চীৎকার করে বলে উঠেন, 'এঁরা বড় গোলমাল করছেন, এঁদের বসিয়ে দাও।' নীলকণ্ঠ তখনই গান বন্ধ করে বলেন, 'যেখানে ভাবের সমাদর নেই, ভক্ত, মহাপুরুষের মর্যাদা নেই, সেখানে আমি গান গাই না। সেখানে থাকাও আমি অপরাধ মনে করি।' এই বলে তখনই আসর ছেড়ে তিনি চলে যান; প্রভুও সশিষ্য স্বগৃহে ফিরেন।

৭ অগ্রহায়ণ গোস্বামীপ্রভু স্টীমারে কলিকাতা আসবেন—এই খবর আসে। অচিন্ত্যবাবু, মণিবাবু, বৃন্দাবনবাবু, আরও অনেক শিষ্য আহিরীটোলাঘাটে এসে অপেক্ষা করেন। রাত্রি দশটা পর্যন্ত স্টীমারের কোন খোঁজ না পেয়ে তাঁরা আপন আপন গৃহে ফিরে যান। বেশ রাত করে স্টীমার আসে। নেমেই প্রভু শিষ্যদের নিয়ে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চোরবাগানের গৃহে উঠেন। নগেনবাবু ও মাতঙ্গিনী দেবী আট-দশ জনের আহারের ব্যবস্থা করে গোস্বামীপ্রভুর প্রতীক্ষা করছিলেন। স্বর্ণময়ী দেবীও সীতানাথ গোস্বামীকে নিয়ে ছেলের সঙ্গে কলিকাতা আসেন। নগেনবাবু সারদাকান্ত ও কুঞ্জ গুহকে বলেন, 'গোসাঁই আকাশপথে আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, তাতেই আমি পরিষ্কার বুঝলাম তিনি আমার এখানে আসছেন। আমিও প্রস্তুত হলাম। তিনি সোজা আমার বাসায়ই উঠলেন।'

পরদিন গোস্বামীপ্রভুর আগমন-বার্তা জেনে এই গৃহে এত ভক্ত-সমাবেশ হয় যে লোক আর ধরে না। প্রভুর শিষ্য সুরেশচন্দ্র দেব ঐদিনই বার দিনের ছুটি নিয়ে বৈদ্যনাথ যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ কয়েকটা দিন তাঁর গৃহে থাকার জন্য প্রভুকে অনুরোধ করেন। গোস্বামীপ্রভু ঐ দিনই মস্‌জিদবাটী স্ট্রীটে সুরেশবাবুর বাড়ীতে চলে যান সঙ্গীদের নিয়ে।

শ্যামবাজার তেমাথার মোড়ে বাড়ী ভাড়া

প্রভুর এক শিষ্য দিন আনেন, দিন খান; তাঁর বড় সাধ গুরুকে কিছু দেন। দুআনা পয়সা নিয়ে একদিন তিনি বাড়ী থেকে বের হন; সকাল সাতটা থেকে বেলা দুটো অবধি ঘুরে ঘুরে খাবার কিনেন। অনাহারে ক্লান্ত দেহে যখন প্রভুর স্থানে পৌঁছেন তখন প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে। এই তুচ্ছ নগণ্য সামগ্রী অবেলায় তাঁকে কি করে দেন? মনে মনে ভাবেন শ্রদ্ধার জল-তুলসীও তো ভগবান সাগ্রহে গ্রহণ করেন। আশায় বুক ভরে ওঠে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই আসন থেকে ছল-ছল চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে প্রভু আগন্তুকের নাম ধরে ডেকে বলেন, 'ওহে, খাবার কি এনেছ? শীগ্‌গির নিয়ে এস।' হাতের ঠোঙাটি গুরুর হাতে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শিষ্যটি লুটিয়ে পড়েন তাঁর পায়। প্রভু অসময়ে কিছুই নেন না। কিন্তু ঐদিন ভরা-

পেটে ও-সবই নিঃশেষ করে তিনি খাবারের প্রশংসা করেন বারবার।

মস্‌জিদবাটীর বাসায় দুদিন যেতে না যেতে এমন ভিড় শুরু হয়, স্থান-সংকুলান হয় না। অফিস-আদালত ছুটির পর শিষ্যেরা গৃহে না ফিরে সোজা এখানে চলে আসেন। বাড়ী ফিরে যাবার নামও তাঁরা করেন না। সামান্য জলযোগ করে থেকে যান। ভোরে বাড়ী ফিরে কাজে বের হন। দিনের পর দিন এরূপ চলে। ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। প্রভুর সঙ্গলাভের জন্য কি যে আকুতি, কি যে অদ্ভুত তাঁর আকর্ষণ!

একদিন সকালে উনুন ধরাবার ঘুঁটে নেই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার বের হন ঘুঁটের খোঁজে; সরকারী পদস্থ কর্মচারী তিনি। সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। দেরী হলে প্রভুর না অসুবিধা হয়—তাই নিজে ছুটেন। খুঁজতে খুঁজতে গোয়াবাগানে গিয়ে সন্ধান পান। এত ভোরে মুটে পাওয়া ভার। কি আর করেন? ঘুঁটের ঝুড়ি নিজের মাথায় তুলে নেন। এদিকে পরনে জুতা, মোজা, গরমকোট ও শাল। তা নিয়ে ছুটে চলেন। আর একদিন প্রভুর প্রসাদীপাতা ফেলতে গিয়ে বৃন্দাবনবাবু তা চিবিয়ে খান। শ্রীচরণ চক্রবর্তীকে প্রভু একটি বড় বাড়ী দেখতে বলেন। শ্রীচরণবাবু মুক্তিফৌজ (Salvation Army) সম্বন্ধে একখানা বই লিখেছেন। কথায় কথায় তিনি গুরুকে বলেন, 'ওঁরা ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করেন, পথ থেকে নিরাশ্রয় রোগীদের নিয়ে গিয়ে সেবা-যত্ন করেন।' তাঁদের সহিষ্ণুতা ও সেবাপরায়ণতার কথা শুনে গোস্বামীপ্রভু কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, 'পরের দুঃখে যাঁদের প্রাণ কাঁদে, তাঁরা তীর্থস্বরূপ, তাঁদের দর্শন করলেও লোক পবিত্র হয়।' শ্রীচরণবাবু সোৎসাহে বলেন, 'আপনাকে দেখলে জেনারেল বুথ খুব খুশি হবেন। যাবেন আজ ওঁদের ওখানে? আমি তাহলে ব্যবস্থা করি।'

ঐদিনই বেলা দুটায় গোসাঁই কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে মুক্তিফৌজ দেখতে যান। তাঁরা রওনা হলে পোস্টাফিসের ডেপুটি কণ্ট্রোলার ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী উমাচরণ দাশ এসে গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন নেবার অভিপ্রায় ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের কাছে ব্যক্ত করেন। এ নিয়ে তিনি প্রভুর সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলতে চান। ব্রহ্মচারী বলেন, 'দুটা থেকে তিনটার মধ্যে সচরাচর তাঁকে নির্জনে পাওয়া যায়।' ডাঃ নবীন ঘোষ সেদিনই কুলদানন্দকে বলেন, 'তুমি হরকান্তকে আজই লিখে দাও সে যেন সাধন নিতে আসে। ঠাকুরকে জানাবার প্রয়োজন নেই।' নবীনবাবু আর হরকান্তবাবু ছিলেন সহপাঠী। কুলদানন্দ ঐদিনই বড়দাদাকে সাধন নিতে আসবার জন্য চিঠি লিখেন।

পরিচারিকা এসে স্বর্ণময়ী দেবীকে বলে, 'মা-ঠাকরুণ, আজ একটু তাড়াতাড়ি আমাকে ছুটি দিতে হবে। ছেলেটির জ্বর। গিয়ে ওকে দুধ-সাবু খেতে দেব।'

—তোর ঘরে কি দুধ আছে?

—না, মা, আমরা গরীব মানুষ; দুধ জোগাড় করে নেব।

—দুধ তোকে আজ আর কিনতে হবে না—আমি দিচ্ছি।

ঘরে যা দুধ ছিল, তার সবটুকুই তিনি দিয়ে দেন। প্রভুর এক শিষ্যা তাঁকে বলেন, 'ঠাকুরমা, এ কি করলেন! এই দুধ যে আপনার ছেলের জন্য ছিল।' স্বর্ণময়ী দেবী বলেন, 'আমার ছেলের দুধের অভাব হবে না। তার দুধ নেই শুনলে দেখবি কয়জন ছুটে! ঝি গরীব মানুষ; তার না আছে পয়সা, না আছে লোকজন; ওকেই দিতে হয়। যা, যা, আর বকিস না।'

একদিন ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন আসেন। গোস্বামীপ্রভু তাঁকে সমাদর করে বসান। বিদ্যারত্ন মহাশয় বিনীত হয়ে বলেন, 'নিরিবিলি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই।' ঘরে আর যাঁরা ছিলেন সকলেই বের হয়ে যান।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের জোরে কথা বলার অভ্যাস। তাঁর কথা বাইরে থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। তিনি বলেন, 'একদিন ব্যাসদেবের দর্শন পেলাম। তিনি আপনার কাছ থেকে গৈরিক বস্ত্র নিয়ে আপনার উপদেশ মত চলতে বললেন। দয়া করে আমাকে গৈরিক দিন, আর কিভাবে চলতে হবে তা বলে দিন।' গোস্বামীপ্রভু তাঁকে বলেন, 'মঠ-মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ দর্শন করে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে প্রণাম করলে কল্যাণ হয়। সত্যকে লক্ষ্য করে সরলভাবে চললেই সব হয়। গৈরিক ধারণ করলে বীর্য ধারণ করতে হয়—শাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা আছে, নইলে বড় অনিষ্ট হয়।' ব্রহ্মচারীকে প্রভু নির্দেশ দেন তাঁর একখানা বহির্বাস নিয়ে আসতে। বিদ্যারত্ন মহাশয়কে তিনি তা দেন।

কয়েকজন গুরু-বোনকে নিয়ে একদিন অপরাহ্নে আসেন মাতঙ্গিনী দেবী। সন্ধ্যা-কীর্তনের পর প্রভু প্রসাদ পেয়ে এলে তিনি একতারা বাজিয়ে গান ধরেন। ভাবে বিভোর হয়ে গোসাঁইজী 'জয় রাধে, জয় রাধে, হরিবোল, হরিবোল' বলতেই চারদিকে কান্নার রোল উঠে। কয়েকজন সম্বিত হারিয়ে গড়াগড়ি দিতে থাকেন। নগেন্দ্রবাবুর ছেলে মণীন্দ্রনাথ বলেন, 'ঐ সময় গোসাঁইর ভিতর থেকে প্রবল এক শক্তি এসে আমাকে অভিভূত করে ফেলে। মনে হল, তিনি শক্তি সঞ্চার করে আমাকে কৃপা করলেন।' রাতটি এভাবে মহানন্দে কাটে।

বেশ শীত পড়েছে। প্রভুর পায়ে বাতের ব্যথা। নবীনবাবু আর বৃন্দাবনবাবু পরামর্শ করে একটি বড় সাইজের ফ্লানেল-ট্রাউজার কিনে এনে বলেন, 'ঠাকুর এটি আপনি পরুন।' তিনি কখনও প্যাণ্ট পরেন না। তথাপি তাঁদের তৃপ্তির জন্য পরে আট-দশ মিনিট পরে খুলে ফেলে বৃন্দাবনবাবুর হাতে দিয়ে বলেন, 'তুমিই পর, তুমি পরলেই আমার পরা হবে।' তিনিও দ্বিরুক্তি না করে পরে ফেলেন। কিন্তু দশ-বার মিনিট যেতে না যেতেই খুলে ফেলে বলেন, 'আমার সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করছে। এর থেকে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ আমার শরীরে প্রবেশ করছে।' মুহুর্মুহু তাঁর শিহরণ হয়, এবং শরীর অবসন্ন হয়ে আসে। অনেকক্ষণ তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। ঐদিনই সন্ধ্যার পর প্রভু বৃন্দাবনবাবুর বাড়ী যান; ফিরে এসে বলেন, 'বৃন্দাবন, তোমার বাড়ীটি তো বেশ। ওখানে গিয়ে আমার শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল; ইচ্ছা হল একবার মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দেই। বাড়ীটি কি সুন্দর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন!' বৃন্দাবনবাবু বলেন, 'বাড়ী পরিষ্কার হউক আর যাই হউক, এখন ভূতের জ্বালাতনে বাড়ীতে টেকা দায়! সাধন নিয়ে আর কিছু হউক না হউক, ভূতে কিন্তু বিশ্বাস হয়েছে।' গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'শুধু ভূতে কেন? যা সত্য ও-সবে ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস হবে। সবইতো উড়িয়ে দিতে বসেছিলে!'

দুই বন্ধু—দুজনই শিক্ষক ও আদর্শবাদী। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম.এ. পাশ করে ওকালতি শুরু করেন কলিকাতা হাইকোর্টে। কয়েকদিন পরই বুঝেন মক্কেলের অসত্য উক্তির উপর নির্ভর করে অনেক সময় মামলা লড়তে হয়। ওকালতি ঐদিনই ছাড়েন যদিও রুজী-রোজগার ভাল হচ্ছিল। হাতে রোজগারের যা টাকা ছিল তা-ও তিনি গঙ্গায় ফেলে দেন। এরপর বেছে নেন শিক্ষাবিদ্ ও সাংবাদিকের পেশা। আর মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রদের নৈতিক

চরিত্র কি করে গঠন করা যায় সেদিকে লক্ষ্য। সতীশচন্দ্র অনীশ্বরবাদী আর মহেন্দ্রনাথ শুধু ঈশ্বর-বিশ্বাসী নন, গুরুবাদীও। তাহলেও দুজনে একই সঙ্গে একই ঘরে ছিলেন ঝামাপুকুরে। ছেলেদের স্বদেশহিতৈষী, উন্নত-চরিত্র মানুষ করে গড়ে তোলার দিকে সতীশবাবুর ঝোঁক। আর মহেন্দ্রবাবু প্রায় রোজই ছুটেন —অবকাশ পেলে দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তাঁর শ্রীমুখ থেকে শুনতে কি যে ভাল লাগে! তাঁর কথা শুনেন আর বাড়ী ফিরে নোট করেন। কিন্তু সতীশবাবু একটি দিনও যান না শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। মহেন্দ্রবাবুর চেষ্টার ত্রুটি নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার খুঁটিনাটি নিয়ে ঘরে আলোচনা হয়। সতীশবাবু অনড়, নির্বিকার। এই মহেন্দ্রবাবুই শ্রীম, মাস্টার মহাশয়, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত সংকলন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রাখেন। পাঁচ বছর কেটে যায়। অকৃতদার সতীশবাবুকে ইদানীং ভবানীপুরে বাড়ী ভাড়া করে মা ও বোনকে নিয়ে থাকতে হয়। মহেন্দ্রবাবু তখনও ঝামাপুকুরে সেই ঘরটিতেই আছেন। সুবিধে হলেই সতীশবাবু যান। ঐদিনটি রবিবার বা কোন পর্ব উপলক্ষে ছুটি। সতীশবাবু শৌচে যান। এই নিত্যকার্যে তাঁর বেশ খানিকটা সময় লাগে। দিগন্তজুড়ে মেঘ-গর্জনের ন্যায় গুরু-গম্ভীর এক দৈববাণী তিনি শুনেন—'আমি আছি।' শৌচাগার থেকে শৌচান্তে বের হয়ে এসে মা ও বোনকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কি এখন মেঘের ডাক শুনেছ?' উত্তর পান, 'না তো।'

তখনই ছাতা হাতে নিয়ে সতীশবাবু বের হন। ঝামাপুকুরে গিয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সব খুলে বলেন। তাঁকে তাঁর অভিপ্রায়ও জ্ঞাপন করেন—'কত দিন তো সাধুর কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছ! আজ আমাকে কোনও সাধুর কাছে নিয়ে চল।' মাস্টার মহাশয় উৎসাহিত হয়ে বলেন, 'খুব ভাল কথা, এক সাচ্চা সাধুর কাছে আজ তোমাকে নিয়ে যাব।' উভয়ে এক সঙ্গে আহার করেন। তারপর বেলা দুটায় বের হয়ে মস্‌জিদবাটি স্ট্রীটে শ্রীম, গোস্বামীপ্রভুর কাছে তাঁকে নিয়ে যান। প্রভু তখন আগন্তুকদের কত রকম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। সতীশবাবু তন্ময় হয়ে তাঁর কথা শোনেন। তাঁর মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনে তিনি মুগ্ধ হন। মনোরঞ্জনবাবু সতীশবাবুর পরিচয় করে দেন। আসর ছেড়ে উঠতে মন চায় না। সন্ধ্যা-কীর্তনে গোস্বামীপ্রভুর অশ্রু, কম্প, পুলক দেখে সতীশবাবু স্তব্ধ হয়ে যান। রাত নটা বেজে যায়। উঠার নাম নেই। রাখাল রায়চৌধুরী মহেন্দ্রবাবুকে বলেন, 'এখানে এখন সাধন-বৈঠক বসবে। এতে সাধনের বাইরের লোকের থাকার নিয়ম নেই।' তখন ওঁরা প্রসাদ নিয়ে প্রভুকে প্রণাম করে বিদায় নেন।

কয়েকদিন এই বাড়ীতে থেকে গোসাঁই-জননী সীতানাথ গোস্বামীকে নিয়ে শান্তিপুর ফিরে যান। শান্তিসুধা ও দাউজীর অসুস্থতার সংবাদ আসে। যোগজীবন দ্বারভাঙ্গা গিয়ে ওঁদের নিয়ে আসেন। বৃন্দাবনবাবুর বাড়ীতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়। এদিকে মসজিদবাটি স্ট্রীটের বাড়ীর গৃহকর্তা সুরেশবাবুর ফিরার সময় হয়ে আসে। শ্যামবাজারে তেমাথার মোড়ে কান্তি গোয়ালার বাড়ীর তেতলার খবর নিয়ে আসেন শ্রীচরণবাবু। নবীনবাবুর বাড়ীর মুখোমুখি। বড় একটি হলঘর আর ছোট দুখানা ঘর। শৌচাগার মাত্র একটি। ভারী দিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা। রাজপথ থেকে তেতলার সিঁড়ি। কয়েকজন শিষ্য বলেন, এখানে উঠতে-নাবতে গোসাঁইর বড় কষ্ট হবে। কিন্তু বেশীর ভাগের ইচ্ছা, ঠাকুর ঐখানেই থাকেন। একজন মুখ ফুটে বলে ফেলেন, 'ওঁর কি কষ্ট? কষ্ট হবে আমাদের। উনি তো

সেই আসার দিন উঠবেন, আর সেই যাবার দিন নাববেন।' নবীনবাবু বলেন, 'ভাই-বোনেরা আমার এখানে এসে শৌচ-স্নানাদি সেরে যেতে পারেন।' তাঁরই আগ্রহে ঐ বাড়ীর তেতলা ভাড়া হয়। ১৬ অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ গোস্বামীপ্রভু কান্তি গোয়ালার শ্যামবাজারের বাড়ীতে উঠে আসেন। এখানে এসে অপরাহ্ণ চারটা থেকে ছটা পর্যন্ত সময় নির্দিষ্ট করে রাখেন তাঁদের জন্য যাঁরা বাইরে থেকে আসবেন।

একদিন দার্শনিক মহাপণ্ডিত মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আসেন। উভয়ের মধ্যে হয় অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা। তিনি গোস্বামীপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হয়?' প্রভু বলেন, 'ছাত্রদের উপরই দেশের কল্যাণ নির্ভর করে। আর্যঋষিরা ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে ছাত্রদের বীর্যধারণ ও সত্যরক্ষা অভ্যাস করায়ে দিতেন। আজকালের শিক্ষার ধারা তা নয়। এজন্য শিক্ষালাভ করেও ওরকম ফল হয় না। ছেলেরা এসে প্রায়ই আমাকে বলে, "আমরা কু-অভ্যাস থেকে কি করে রেহাই পাব? ছেলেবেলায় বাপ-মা, শিক্ষক বা অভিভাবকেরা কখনও বুঝায়ে দেন নি যে, বীর্যরক্ষা না করা অনিষ্টকর। ও বিষয়ে সাবধান হতে কখনও চেষ্টা করি নি। এখন বুঝি, ওতে আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। কিন্তু কি করব? অনেক দিনের কু-অভ্যাস চেষ্টা করেও ছাড়তে পারি না।"' বাস্তবিক ছোট ছোট ছেলেদের এ বিষয়ে কোন শিক্ষা না থাকায় ভয়ংকর ক্ষতি হয়। আমাদের দেশে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, তাঁরা যদি ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশেন, যাতে ছেলেরা সব কথা তাঁদের নিঃসংকোচে খুলে বলে এবং তাঁরা যদি এসব কু-অভ্যাসের পরিণাম কি ভয়াবহ, এ বিষয়ে ছেলেদের মনে একটা সংস্কার জন্মায়ে দেন, তাহলেই তাদের এবং দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে। যে শিক্ষা সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং যার উপর ব্যক্তিগত জীবনের ও দেশের সব কল্যাণ নির্ভর করছে, সম্প্রতি দেশে আর সেই শিক্ষা নাই। হিমালয়ে একবার এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম; তিনিও বলেছিলেন, "একমাত্র সত্য ও বীর্যরক্ষা করলেই দেশের কল্যাণ হবে।"' প্রভুর মুখে এসব কথা শুনে ব্রজেনবাবু বিশেষ অভিভূত হন।

ব্রজেনবাবু চলে গেলে শিষ্যদের সঙ্গে গোসাঁইজীর ব্রজমায়ীদের সম্পর্কে কথা হয়। প্রভু বলেন, 'নিতান্ত সাধারণ অবস্থায়, গরীব-দুঃখী পাড়াগেঁয়ে ব্রজমায়ীদেরও ভগবানের প্রতি যেরূপ একটা স্বাভাবিক স্নেহমমতা, বাৎসল্যভাব দেখা যায়, বহু সাধন-ভজনেও তা লাভ করা দুঃসাধ্য। গোবিন্দজীকে তাঁরা এখনও সেইভাবে দেখেন। দলে দলে ব্রজমায়ীরা দধি-দুগ্ধ-মাখনাদি ভাঁড়ে ভাঁড়ে নিয়ে সমস্ত রাস্তা নৃত্য ও গান করতে করতে গোবিন্দজীর মন্দিরে এসে উপস্থিত হন; নিজের কোলের ছেলেটিকে মা যেমন আদর করেন ঠিক তেমনি কত কথা জিজ্ঞাসা করেন, গায়ে হাত বুলায়ে দেন, চুমা খান, নিজের পায়ের ধূলা হাতে নিয়ে গোবিন্দজীর কপালে, মাথায় দেন এবং আশীর্বাদ করেন; গোবিন্দজীকে দেখতে দেখতে বাৎসল্যভাবে একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁকে তাঁরা ঠিক যেন ঘরের ছেলে মনে করেন। এমনটি আর কোথায়ও দেখা যায় না।' তারপর বলেন, 'ব্রজমায়ীদের সকলেরই তো আর এক প্রকার ভাব নয়। ভজন তো কত প্রকারের—কেহ বা নানাপ্রকার বেশ-ভূষা করে, অলঙ্কারাদি পরে, এক-একবার নিজের দিকে তাকান—নিজেরই রূপ নিজে দেখে, ভাবে বিভোর হয়ে পড়েন; এ অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েও অনেক সময় তাঁরা পড়ে থাকেন। কেউ বা দু-ঘণ্টা ধরে মুখই মুছেন। তিলকই কতবার করছেন আর মুছছেন! পছন্দমত হয়ে গেলে আয়নাতে

একবার নিজের মুখখানি নিজে দেখে একেবারে অবশাঙ্গ হয়ে ঢলে পড়েন। তিন-চার ঘণ্টা আর সংজ্ঞাই থাকে না। শরীরে কত প্রকার ভাবেরই খেলা হয়ে থাকে। কেহ বা একখিলি পান মুখে দিয়ে চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে তাই চিবাচ্ছেন। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, ভাবে ডগমগ; অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সমস্তই এককালে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা যান। সাধারণ লোকে এ-সকল ভাব, এ-সকল অবস্থা কি প্রকারে বুঝবে? এ-সকল ভজনই বা কি প্রকারে জানবে? দেহদ্বারা ভগবানের ভজন, এ যে কত মধুর, তা যিনি করেন তিনিই জানেন। শ্রীবৃন্দাবনে এ-সব ভাবেই ভগবানের উপাসনা; ঐশ্বর্যভাবে উপাসনা বড় দেখা যায় না। স্থানের প্রভাবই এমন চমৎকার যে, একটা সাধন-ভজন নিয়ে থাকলেই চিত্তে আপনা-আপনি এ-সকল ভাব ও ভক্তি উদয় হয়ে থাকে।'

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন আছেন চৌরঙ্গী ও পার্ক স্ট্রীটের সংযোগস্থলে এক বাড়ীতে। তাঁর শরীর ভাল নয়, কানে ভাল শোনেন না, চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা; ভগবদ্‌ধ্যানে অনেকক্ষণ ডুবে থাকেন। গোস্বামীপ্রভু কলিকাতা এসেছেন শুনে তাঁকে দেখার বড় ইচ্ছা হয়। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে দিয়ে তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। প্রিয়নাথবাবু এসে বিনীতভাবে গোসাঁইজীকে বলেন, 'মহর্ষি আপনাকে কি বলার জন্য বড় উৎসুক হয়ে আছেন।' প্রভু তাঁকে বলেন, 'আমার পরম সৌভাগ্য যে তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন।' প্রিয়নাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, 'তিনটা থেকে পাঁচটার মধ্যে গেলে মহর্ষির সুবিধা হয়।' শুনে প্রভু বলেন, 'আগামী রবিবার, ২১ অগ্রহায়ণ, (১২৯৮) বেলা তিনটায় গিয়ে পৌঁছব।' গোস্বামীপ্রভু চোদ্দ-পনরজন শিষ্য নিয়ে ঐদিন নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছেন। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁদের সাদর-সম্ভাষণ করে উপরে হলঘরে নিয়ে যান। আরাম-কেদারায় দেহখানি এলিয়ে দিয়ে বসে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। গোসাঁই তাঁর চরণে মাথা রেখে প্রণাম করে কেঁদে ফেলেন। মহর্ষির মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়ে ওঠে। তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে গদ্‌গদভাবে গোস্বামীপ্রভুর উদ্দেশ্যে বলেন, 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়, গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।' মহর্ষির সর্বাঙ্গে মুহুর্মুহু শিহরণ। বিগলিত অশ্রুধারায় তাঁর বুক ভেসে যায়। ভাবের আতিশয্যে হয় কণ্ঠরোধ। মহর্ষি গোসাঁইকে পাশের চেয়ারে বসান, শিষ্যেরা বেঞ্চে বসেন। খানিকটা সামলে নিয়ে, নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মহর্ষি বলেন, 'আমার অন্তরের কথা কেউ বুঝে না, তাই কাউকে বলি না। আজ তোমাকে প্রাণের কথা বলে একটু হালকা হব। ভক্তি দিয়েই তাঁকে পেতে হয়। তাঁর দয়ায়ই শুদ্ধ হয়। পুরুষকার ফাঁকা কথা। তাঁর কৃপায় নির্ভর করাই সার কথা।' বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। তিনি শিশুর ন্যায় রোদন করে অধীর হন। গোস্বামীপ্রভুর সৌম্যমূর্তি থেকে প্রেমভক্তির স্নিগ্ধ রশ্মি যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহর্ষির চারু-গণ্ডদ্বয় আর শুভ্রশ্মশ্রু অশ্রুসিক্ত হয়ে প্রভাত-কিরণে শিশির-স্নাত কমলের ন্যায় অপরূপ শোভা ধারণ করে। প্রভু বারবার 'জয়গুরু, জয়গুরু' বলতে থাকেন। মহর্ষি কেঁদে কেঁদে অধীর হয়ে পড়েন। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে, শান্ত হয়ে চোখ-মুখ মুছে মহর্ষি ধীরে ধীরে বলেন, 'যেখানে ভগবানের কৃপাধারা পড়ে পূর্ব থেকেই তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন—এই চারটি যুগপৎ না হলে হয় না। তোমাতে এর চারিটিরই পূর্ণ সমাবেশ। অদ্বৈতপ্রভুর বংশে তোমার জন্ম, সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছ—তাঁর কৃপায় যথার্থ শিক্ষা পেয়েছ, তারপর ভগবদ্‌-

ইচ্ছায় সাধন-ভজন যতটা সম্ভব তা করেছ। সর্বোপরি ভগবদ্ কৃপা যথেষ্ট পেয়েছ—তুমিই ধন্য।' তিনি প্রভুর আরও স্তুতিবাদ করতে থাকেন। গোসাঁই বাধা দিয়ে বলেন, 'আমি আপনার বালক। আপনিই তো আমাকে হাতে ধরে মানুষ করেছেন। আপনিই তো আমার গুরু।' মহর্ষি মৃদু হেসে বলেন, 'গুরু তো বটেই; তবে সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরুমহাশয়ের সামিল। ক, খ শিখতে হলে প্রথম যেমনটি গুরুমহাশয়ের কাছে শিখতে হয়, ও-রকমটি। পরে ঐ ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পেয়ে ঐ গুরুমহাশয়কেও শিখাতে পারেন। পাঠশালার গুরুমহাশয়কে এ অবস্থায় গুরু বললে যেমনটি হয়, তোমার বলাও ঠিক ঐরূপই হচ্ছে।' গোসাঁইজী মহর্ষিকে প্রণাম করে উঠে বলেন, 'আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন।' মহর্ষি প্রতিনমস্কার করে বলেন, 'তোমাকে আমি আশীর্বাদ করতে পারি না। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হউক।' প্রভুর শিষ্যদের তিনি আশীর্বাদ করে বলেন, 'তোমাদের মঙ্গল হবে। গোসাঁইকে তোমরা কখনও ছেড় না। ইনি তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।' ওখান থেকে বের হয়ে শ্রীচরণবাবু প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'শুনেছি সদ্‌গুরুর কৃপা না হলে আস্তিক্য বুদ্ধি ও আত্মার এমন উন্নত অবস্থা হয় না! মহর্ষির তাহলে এই অবস্থা হল কি করে?' গোসাঁই বলেন, 'মহর্ষির উপর সদ্‌গুরুর কৃপা হয় নাই—এ-কথা কে বললে?' শ্রীচরণবাবু সরে পড়েন। শ্যামবাজারের বাসায় পৌঁছে প্রভুকে একান্তে পেয়ে যোগজীবন জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবা, মহর্ষি কবে সদ্‌গুরুর কৃপা পেলেন।?' গোসাঁইজী বলেন, 'আমার গুরুলাভের পর গয়া থেকে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক দুরবস্থার কথা আমাকে অকপটে বলে এর প্রতিকার জানতে চান। আমি বলেছিলাম তাঁকে, 'গুরুজীকে জানাব।' মহর্ষির কাছ থেকে ফিরে এসে পরমহংসজীকে তাঁর কথা সানুনয়ে বলি। এর পরেই এক মহাপুরুষ দৃষ্টিদ্বারা মহর্ষির ভিতরে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। মহাপুরুষের কৃপার পর হতেই মহর্ষির অবস্থা খুলে গেছে। ভগবদ্ধ্যানে মহর্ষির সমাধি হয়।'[১]

এদিকে প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীচরণ চক্রবর্তী তখনই আবার মহর্ষির কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর উপর গুরুকৃপা সম্পর্কে গোস্বামীপ্রভুর মন্তব্য জ্ঞাপন করেন। শ্রীচরণবাবুর কথা শুনে মহর্ষি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'গোসাঁই যা বলেছেন তা যথার্থ। একদিন হিমালয়ে নির্জন জায়গায় বসে ধ্যান করছি, হঠাৎ চেয়ে দেখি অপূর্ব এক জ্যোতি আমার উপর এসে পড়েছে। মুখ একটু সরিয়ে নিয়ে দেখি কাছের পাহাড় থেকে এক মহাপুরুষ আমার পানে চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখের কি জ্যোতি! জাহাজের সার্চলাইটের মত তা এসে আমার উপর পড়ল। আমার তখন রোমাঞ্চ হতে লাগল। শাস্ত্রে ধর্মতত্ত্বের কত কিছু পড়েছিলাম। কিন্তু ঐদিনটি থেকে ও-সব উপলব্ধি করতে থাকি।'[২]

---

১. শ্রীমদ্ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ', ৩য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃ ১৬১।

২. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য অমৃতলাল সেনগুপ্ত-প্রণীত 'প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৩৫৫-৩৫৬ ও শ্রীমদ্ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ', ৩য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃ ১৬০।

২৩ অগ্রহায়ণ (১২৯৮) গোসাঁইজী কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে জয়কালী দর্শন করতে কালীঘাট যান। মন্দির সেদিন লোকে গিজগিজ করে। পাণ্ডা ভিড় ঠেলে প্রভুকে বিগ্রহের মুখোমুখি নিয়ে যান। গোসাঁইর দু-চোখ বেয়ে ঝরে বিগলিত ধারা। সর্বাঙ্গে থরহরি কম্পন। বাইরে এসে রোয়াকে বসলে দলে দলে লোক এসে তাঁকে প্রণাম করেন। তিনি তখন ভাবাবেশে বলেন, 'জগন্নাথদেবের আকৃতির সঙ্গে জয়কালীর খুবই সৌসাদৃশ্য। মার কত দয়া! সকলকেই মা কৃপা করছেন।' তখন আলুলায়িতকেশা, ছিন্নবসনা বৃদ্ধা এক কাঙালিনী এসে গোস্বামীপ্রভুকে অভিবাদন করে বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে মহাবিষ্ণুর স্তব আবৃত্তি করেন। তারপর প্রভুকে প্রণাম করে তিনি বলেন, 'বাবা, আজ আমার সার্থক দিন।' একটি পয়সা তিনি প্রভুর হাতে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে যান। পয়সাটি মাথায় ঠেকিয়ে গোসাঁই মহেন্দ্র মিত্রের হাতে দিয়ে তাঁর মেয়ের কাছে সযত্নে রাখতে বলেন।

নিকটবর্তী বটগাছের নীচে কয়েকজন সাধু বসে ছিলেন। তাঁদের সেবার জন্য কয়েকটি টাকা গোসাঁই তাঁদের হাতে দিয়ে বলেন, 'এইজন্যই ভগবান আমাকে আজ এখানে এনেছেন।' বাড়ী থেকে আসার সময়ই টাকা কয়টি তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। সন্ন্যাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—তাঁদের অযাচকবৃত্তি, দুদিন আহার নেই। অল্প সময় ওখানে থাকার পর প্রভু হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। ফেরার পথে সকলে ভিখারিণীর আবৃত্তির প্রশংসা করে বিস্ময় প্রকাশ করলে গোসাঁই বলেন, 'ইনি মায়ের সঙ্গিনী। মা ব্যস্ত ছিলেন বলে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে পাঠিয়েছেন।' গাড়িতে প্রভুর জ্বর এল। সন্ধ্যা-কীর্তনের সময় তিনি সুস্থ হলেন। রাত্রিতে কথায় কথায় বলেন, 'ভাবাবেশে থাকলে বা অন্যমনস্ক থাকলে, কখনও স্পর্শ করতে নাই। স্পর্শ করতে হলে তিনবার ডেকে তাঁকে জানায়ে স্পর্শ করতে হয়। হঠাৎ কেউ স্পর্শ করলে তার অসাত্বিক ও ভাবদুষ্ট চিন্তাধারা দেহে সঞ্চারিত হয়, তখন শরীরটা আগাগোড়া যেন জ্বলে যায়। এই নিয়ম সাধারণের জানা নাই বলে অনেক সময় অনেক উৎপাতে পড়তে হয়।'

দুদিন বাদে বেলা দুটা নাগাদ রামকুমার বিদ্যারত্ন এসে গোসাঁইজীকে বলেন, 'রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর বড় আগ্রহ, একবার তাঁর গৃহে আপনি পদার্পণ করেন। তিনি শুনেছেন, আপনার কোন আয় নেই—একেবারে আকাশবৃত্তি; এদিকে আবার বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রসন্তান সব সময়ই আপনার আশ্রয়ে আছেন। এইসব কথা শুনে তাঁর বড় আকাঙ্ক্ষা হয়েছে আপনাকে তিনি একলক্ষ টাকা দেন। এই অর্থ যদি আপনি গ্রহণ করেন তাহলে তিনি কৃতার্থবোধ করবেন। আপনি দয়া করে যেদিন তাঁর ওখানে যাবেন ঐদিনই আপনার হাতে টাকাটা তিনি নিজে দিতে চান।' বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা শুনে গোসাঁই কেঁদে ফেলেন। তাঁর শ্রীমুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে তিনি বলেন, 'ঠাকুর মহাশয়কে বলবেন—আমার যা যখন যথার্থ প্রয়োজন, কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করে ভগবান তা দিয়ে থাকেন। একটি কানাকড়িরও অভাব রাখেন না। তাঁর দুয়ারে দীনহীন কাঙ্গাল হয়ে তাঁর নাম নিয়ে যেন পড়ে থাকতে পারি—ঠাকুর মহাশয়কে এই আশীর্বাদ করতে বলবেন। ওই টাকা যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে আমার বড় অনিষ্ট হবে; আর বড়লোকের বাড়ী যেতে আমার বড় ভয় হয়।' এই উক্তি শুনে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আর বাক্যস্ফুরণ হল না। তিনি গোস্বামীপ্রভুকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

বিকার-জ্বরে আর পেটের অসুখে শান্তিসুধা দেবী শয্যাগত। বৃন্দাবনবাবুর বাড়ী থেকে তাঁকে এখানে আনা হয়েছে। দেখা-শোনার ও সেবা-যত্নের লোকের অভাব। রোগিণীকে পায়খানায় উঠে যেতে হয় বারবার। বমি করেন নালায় গিয়ে। দিন দিন শরীর আরও খারাপ হয় আর মেজাজটি খিটখিটে। সারদাকান্ত এম.এ. পরীক্ষা দেবেন। গুরুদর্শনে একদিন শ্যামবাজার এসে শান্তিসুধাকে দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। অসুস্থ অসহায় গুরুবোনের শুশ্রূষায় করেন তিনি আত্মনিয়োগ। গু, মূত, বমি কাচেন। সকলে বলে, 'সাধু, সাধু।' তাঁর সেবায় মুগ্ধ হয়ে গোসাঁই একদিন বলেন, 'মায়ের মত দরদ দিয়ে রোগীর প্রাণে যা চায়, তা বুঝে সেবা-শুশ্রূষা করা সারদাই পারেন। ওঁর মরমী সেবায় মন-প্রাণ শীতল হয়ে যায়। এক ঘটি জলও যখন সারদা দেন, তাও যেন দেন সারা মন-প্রাণ ঢেলে। এমনটি দেখা যায় না।' সারদাকান্তের সুখ্যাতি শুনে কেউ কেউ ভাবেন, 'আমরাও যদি এমন সেবা করতে পারতাম, তাহলে ঠাকুর প্রসন্ন হতেন।' প্রভু ঠিক সেই মুহূর্তে বলে ওঠেন, 'স্বার্থ ও অভিমানে যে সেবা, সে আর এক ধরনের। দরদ দিয়ে যে সেবা, তা-ই ঠিক-ঠিক সেবা। সে কি আর চেষ্টা করে হয়? না, সবার হয়?'

এই সেবার কথা বলতে গিয়ে সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রোজনামায় লিখেন, 'বমি কাচতে গিয়ে "ওয়াক ওয়াক" করে ঠাকুরের সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁরই কৃপায়, তাঁরই নামের মহিমায়, রোগিণীর সামান্য সেবা-যত্ন আমার মত আনাড়ির পক্ষে সম্ভব হয়েছে। হায়! হায়! নিজের কোন ক্ষমতাই নেই! রোগীর সেবাটুকু পর্যন্ত গুরুদেবের কৃপাসাপেক্ষ।'

দিন নেই, রাত নেই, প্রভু আসনে আসীন। ভক্তেরা চান গুরুর পদসেবা করতে। তিনি তাঁদের বলেন, 'আমার পা টিপে, আমাকে বাতাস করে, আমার পায়ে তেল মেখে ধর্মলাভ হবে, এ-কথা যেন কেউ মনে না করেন।' ভক্তেরা কানে নেন না। মহেন্দ্রবাবু একদিন বিছানায় পড়ে ছট্ফট করেন। কুঞ্জ গুহ ও সারদাকান্তকে তিনি বলেন, 'মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।' ওঁরা উভয়েই দায় সেরে প্রভুর কাছে যান। তাঁর পায়ে ওদিন হাত দিতেই গোসাঁই বলে উঠেন, 'আমার পা টিপতে হবে না। সরে যাও এখান হতে।'

২৮ অগ্রহায়ণ, রবিবার, (১২৯৮) হরকান্তের সাধন হল। তাঁর দীক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'নাম পেয়েই কেমন যেন হয়ে গেলাম। আমার শরীর মধুময় হয়ে উঠল। গোসাঁইকে মনে হল সাক্ষাৎ মহাদেব। প্রাণায়াম করার অবকাশ পেলাম না। সারাদেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ। সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলাম। গোসাঁই ধরে ফেলেন।' যৌবনে হরকান্ত ব্রাহ্মধর্মের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। গোসাঁইর সঙ্গে তখন থেকে পরিচয়। এই গৃহে কয়েকদিন অন্তরই সাধন হতে থাকে। কত লোক যে সাধন পান। পঞ্চাশ-ষাটজন লোক রয়েছেন এই বাড়ীতে। নবীন ঘোষ ও চন্দ্রমণি দেবী সব জিনিসপত্র জোগান। গোসাঁই একদিন বলেন, 'এঁদের জন্য এ বাড়ীতে আমার আর থাকা হবে না।' শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করেন, 'কাদের জন্য?' তিনি বলেন, 'নবীন ঘোষ আর চন্দ্রমণির জন্য। হাতে যা ছিল তা সব খরচ করেছেন, এখন আবার ধার করে জোগাচ্ছেন। কেন বাপু, এ-সব? নবীনবাবু মৃদু হাসেন। চন্দ্রমণি দেবী বলেন, 'টাকা তো আপনারই। আপনিই তো জোগাচ্ছেন।'

ওদিন থেকে শুরু হয় রাজসূয়। নবীনবাবুদের আর জিনিসপত্র আনার প্রয়োজনই হয় না। ঝাঁকা ঝাঁকা জিনিস আসে। কোথা থেকে কিভাবে আসে তা

বুঝাই যায় না। যাঁরা আসেন তাঁরাই প্রসাদ পান আকণ্ঠ। পাচক রাখতে হয়। দু-তিনশ লোক রোজ প্রসাদ পান। ঐ গৃহে এরপর গোস্বামীপ্রভু যতদিন ছিলেন নিত্য উৎসব চলে। ডাঃ নবীন ঘোষ ছিলেন কৃতী চিকিৎসক। তিনি সিভিল সার্জন হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী কয়েকটি সন্তানের অকালমৃত্যুতে শোকে উন্মাদ হয়ে যান। স্ত্রীর অসুখ নিয়ে বারবার বদলি হওয়ায় তিনি সরকারী উচ্চপদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। নিজে একটি ডিস্পেনসারী করে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করতেন। তিনি কখনও মিথ্যাকথা বলতেন না। ১২৯৩ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ তিনি সাধন পেয়েছিলেন। একদিন তিনি গোসাঁইকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘স্থূলদেহে যুগলমূর্তি দর্শন করতে পারি কিনা?’

—হ্যাঁ, কিন্তু দর্শন হলে আপনার দেহ থাকবে না।

গুরুতে ছিল তাঁর অবিচল ভক্তি। আর গুরুভ্রাতাদের প্রতি ছিল স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা। এই বাড়ীতে প্রভুর থাকাকালীন তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য ও আহ্নিক শেষ করে, অবসর বুঝে ফুলচন্দন দিয়ে গোসাঁইকে পূজা করতেন। তাঁর সম্মুখে বসে অশ্রু, কম্প, পুলকে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তেন। প্রভু তাঁকে বাধা দিতেন না। শুধু বলতেন, ‘পায়ে তুলসী দেবেন না।’ গোসাঁই যখন ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, কেশববাবুর চরণপূজার বিরোধিতা তিনিই করেছিলেন। কোন মানুষকে ভগবানের স্থানে বসান ব্রাহ্মধর্মবিরুদ্ধ। সুতরাং ব্রাহ্মধর্মবাদের নৈতিক কারণে তিনি অসত্য নিবারণের জন্য খাঁটি ব্রাহ্ম হয়ে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণের প্রতিবাদ করেছিলেন। আবার প্রভু যখন গুরুলাভ করে শাস্ত্র ও সদাচার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হলেন, তখন তিনি ঋষি-পন্থার অনুগামী। তখন তাঁর কাছে গুরুই ভগবান। ‘ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ, পূজামূলং গুরোর্পদম্।’

এখন তিনি আর ব্রাহ্ম নেই—সনাতনী। ব্রাহ্ম হয়ে তিনি উপবীত ত্যাগ করেছিলেন; সন্ন্যাস নেবার পূর্বে প্রায়শ্চিত্ত করে যথাশাস্ত্র উপবীত আবার গ্রহণ করেন। আবার শিষ্য সতীশ মুখোপাধ্যায়কেও নিজেই উপবীত দিলেন। তিনি যখন সদ্গুরুরূপে ব্রতী হলেন, তখন শিষ্যদের অধিকারও ক্ষুণ্ণ করেন নি। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি চরণপূজার অনুমতি দিয়েছিলেন। গোস্বামীপ্রভুর আচরণে তাই কোন অসামঞ্জস্য ছিল না।

নবীনবাবু বলেন, ‘এ কি! বাসিকাপড়ে খাবার কিনে আনলেন, ঠাকুরের সেবায় তো এ-সব লাগবে না।’ বৃন্দাবনবাবু হন বিব্রত ও লজ্জিত। কথাটি গোসাঁইর কানে যায় দুদিন বাদে। মৃদু হেসে তিনি বৃন্দাবনবাবুকে বলেন, ‘তুমি ডাক্তারবাবুর কাছে ঠকে গেছ। তিনি তাঁর ভাবে বলেছেন। তুমি ছাড়লে কেন?’ কি জানি, আপনি যদি গ্রহণ না করেন! এই ভয়েই তো আমি চুপ করে গেলাম।’ ‘আমি না খেলে তুমি ছাড়বে কেন? গাল টিপে খাইয়ে দিলেই পারতে!’

গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন পেয়ে শিষ্যদের অবস্থার উন্নতি দেখে লীলাচঞ্চল দেবতারা হন দিশেহারা। কালী, দুর্গা, শিব, বিষ্ণু এসে গোসাঁইকে অনুরোধ করেন—‘আমাদের পূজা যাতে লোপ না হয় এই ব্যবস্থা কর।’ প্রভু অবাক হয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, ‘কেন? আমি কি লোপ করছি?’ দেবতারা বলেন, ‘না, তা নয়, তুমি যাঁদের সাধন দিচ্ছ, তাঁরা যদি করেন।’[১] এই বাড়ীতে যাঁদের

---

[১] শ্রীমদ্ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত ‘শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ’, ৩য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃ ১৮৬।

সাধন হল, তাঁদের গোসাঁই উপদেশ দেন যথারীতি। তদুপরি আরও বলেন, 'যাঁর যেটি দেশগত, সমাজগত, বংশগত রীতিনীতি, তা যথাসাধ্য বজায় রেখে সাধনপথে চলবেন।'

গোসাঁই একদিন গভীর রাতে কথাপ্রসঙ্গে শিষ্যদের বলেন শ্রীবৃন্দাবনে তাঁর অবগাহনের পর কয়েকটি প্রেত কি করে উদ্ধার পেল। পরদিন প্রভু যখন শৌচ থেকে ফিরেন, মহেন্দ্র মিত্র জোর করে তাঁর চরণামৃত নিয়ে আসেন। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, দেবেন্দ্র সামন্ত, মহেন্দ্রবাবু এবং আর যাঁরা পেলেন, সকলেই বিস্মিত হন চরণামৃতের সৌরভে। কলের জল, অথচ এত সুগন্ধ! গোসাঁই কখনও গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করেন না।

১ পৌষ, ১২৯৮ সাল। বেলা সাড়ে নটায় রামদয়ালবাবু পূজার সব উপকরণ নিয়ে আসেন। তিনি প্রভুর চরণপূজা করেন। গোসাঁইর গলায় মালা পরিয়ে দেন, বুকে দেন তুলসী-চন্দন; তারপর পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি করেন। বারবার শঙ্খ-ধ্বনি হতে থাকে। মেয়েরা করেন উলুধ্বনি। প্রভু সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। রামদয়াল-বাবু পুষ্পাঞ্জলি দেন। পরে ঘরে যত শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন, একে একে সকলেই প্রভুর চরণে ফুল দিয়ে প্রণাম করেন। তারপর সকলেরই অপূর্ব ভাবাবেশ—ঘণ্টা-খানেক ধরে বেশির ভাগ শিষ্য-শিষ্যাই সম্বিতহারা!

আসনময় ফুল-দূর্বা। আর-আর দিন শৌচে যাবার পূর্বে প্রভু আসন ঝেড়ে রোদে দিতে বলেন, কিন্তু ঐদিন এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেন নি। কুলদানন্দ ভাবেন, গোসাঁইর বুঝি খেয়াল নেই। আসনটি পরিষ্কার করতে হাত দিতেই দুটি প্রাচীরের ব্যবধানে শৌচাগার থেকে প্রভু সজোরে বলে উঠেন, 'ওহে আসন নেড় না। থেমে যাও, থেমে যাও, ফোঁস্ করবে?' তাঁর শ্রীদেহে যেন সুতার টান পড়ল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করেন, 'কলিকাতা শহরে তেতলার উপর সাপ কি করে এল?' প্রভু বলেন, 'বাস্তুসাপ প্রায় সকল পুরান বাড়ীতেই আছে; কলিকাতা-ই কি আর অন্যত্রই বা কি? কিছুকালের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে আসন করে বসলেই নিকটবর্তী বাস্তুসাপ আসনের নীচে এসে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে।'

৪ পৌষ (১২৯৮) কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতার মা, বোন এবং স্ত্রী কুসুমকুমারী সাধন পান। কুসুম দীক্ষামন্ত্র পেয়েই সম্বিত হারান—সারাদিন থাকে নেশাখোরের মত ঢুলু-ঢুলু অবস্থা। এই বাড়ীতে কি আহারের ব্যবস্থা, কি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা, কি দীক্ষার্থীর থাকার বন্দোবস্ত—সবই নিখুঁতভাবে চলে। বৃন্দাবন মজুমদার, মণীন্দ্র মজুমদার, ডাঃ নবীন ঘোষ, চন্দ্রমণি দেবী ও সারদা দেবীর নিরলস সেবায়ই এ-সব সম্ভব হয়েছে। মেয়েরা সুচারুভাবে রান্নার দিকটা সামলান। হঠাৎ আবার স্বর্ণময়ী দেবী শান্তিপুর থেকে এখানে আসেন। প্রভুর অ-ব্রাহ্মণ শিষ্যাদের রান্নাঘরে দেখে তিনি ক্ষেপে যান। তাঁদের স্বর্ণময়ী দেবী বলেন, 'আরে, এ কি? তোরা এখানে কেন? তোরা এঁটো মুক্ত করবি। এ-ঘর থেকে বের হ।' ঠাকুরমার পাগলামি তাঁদের অজানা নেই। তাঁর কথা তাই তাঁরা কেউ গায়ে মাখেন না, তাঁর সব অত্যাচারকে ভাবেন রঙ্গরস। ওঁদের কুটনা-বাটনা সব তিনি ফেলে দেন। খোসাসমেত তরকারি কুটে আধসিদ্ধ করে রাখেন, ডাল-চাল সিদ্ধ না হতেই নাবিয়ে ফেলেন। রান্নার যা ছিরি—গলাধঃকরণ দুঃসাধ্য। সকলেরই পাতে ভাত, ডাল, তরকারি পড়ে থাকে। এ-সব দেখে তিনি ছেলেকে গিয়ে বলেন, 'ওরে বিজয়! বলদিকিনি আমি কেমন রাঁধি?' গোস্বামীপ্রভু হেসে বলেন, 'কেন

মা? তা-কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়? ঠিক যেন জগন্নাথের ভোগ! ওঁরা সব কেমন খাচ্ছেন?’ স্বর্ণময়ী দেবী উত্তর দেন, ‘খাবে কি? ওঁদের কি ভক্তি আছে? আমরা হলাম শান্তিপুরের গোসাঁই! আমাদের হাতের রান্না দেবতারা খান। আমরা বাপু, তেল-ঘিও দেই না, আর বাটনা-কুটনারও ধার ধারি না। সাদা জলে সিদ্ধ করি! তারই কত স্বাদ!’ প্রভু বলেন, ‘জগন্নাথের রান্না সাদা জলেই তো হয়।’ প্রভুর শিষ্যেরা রগড় করে বলেন, ‘ঠাকুরমা, হেলায় কি শ্রদ্ধায়, যেন-তেন-উপায়েন, এই প্রসাদ এক গ্রাস তল করতে পারলেই হল, একেবারে নিশ্চিন্দি! সারাদিন আর কিছু খেতে হয় না।’

স্বর্ণময়ী দেবী একদিনের জিনিস অন্যদিন রাখেন না। প্রতিদিনই ভাণ্ডার উজাড় করেন। প্রচুর পরিমাণে রান্না—পথের কাঙ্গালি-দুঃখীদের তিনি ডেকে এনে খাওয়ান। বাধা দিলে বলতেন, ‘তোরা মানুষ না পশু, মানুষকে না দিয়ে কি কখনও মানুষে খায়? সে তো শিয়াল-কুকুরেই করে। ভগবান একমুঠো দয়া করে দিলে, তা হতে এক গ্রাসও অন্যকে দিতে হয়। ভগবানের দান—যার প্রয়োজন, তারই জন্য; পুঁজি করার জন্য নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা গোসাঁই বাড়ীর বউ; আজকের যা এল তা হল, কালকে শ্যামসুন্দর আছেন।’ ভাণ্ডার-ঘরে প্রভু প্রসাদ পান। তাঁর আহারান্তে তাঁর উদ্বৃত্ত শিষ্যেরাই বেটে খান। ঝি আসা অবধি থালা পড়ে থাকে। একদিন অপরাহ্নে হঠাৎ ঐ ঘরে ঢুকে বাসন পড়ে আছে দেখে ঠাকুরমা বাড়ী তোলপাড় করেন। তিনি চেঁচিয়ে বলেন, ‘এ কি অনাচার! এঁটো বাসন ভাঁড়ারে! ইঁদুর, বিড়াল, আরসোলা, কত কি এ-ঘরে আসে। এ-ঘরের জিনিস কি করে ঠাকুরের ভোগে লাগবে?’

ভোর-কীর্তন শেষ হতেই স্বর্ণময়ী দেবী ছেলের সামনে এসে বলতেন, ‘ওরে বিজয়, নে পেন্নাম কর।’ প্রভু অমনি তাঁকে প্রণাম করে পদধূলি মাথায় নেন আর ছোট শিশুটির মত চোখের পলক না ফেলে মার পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকান। গোসাঁই একদিন বৃন্দাবনবাবুকে বলেন, ‘মা যখন এসে দাঁড়ান, মার প্রতিটি লোমকূপে ব্রহ্মজ্যোতি ফুটে বের হয়, আমি দেখতে পাই।’ শিষ্য-শিষ্যারা মিলে একদিন স্বর্ণময়ী দেবীকে ধরে বসেন, ‘ঠাকুরমা, আমাদের ঠাকুরের জন্মকথা শোনান। লোকের মুখে তো কত কি শুনি!’ তিনি তাঁদের বলেন, ‘লোকে কি জানে? সকলের জন্ম যেমন হয়, ওর জন্ম তো আর তেমনটি নয়। আর তা বললে বিশ্বাস-ই বা করতে পারবি কি করে? ওঁর বাবা তখন ব্রহ্মচর্য করতেন। শান্তিপুর থেকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন হাতেতে, বুকেতে, হাঁটুতে কাঁথা বেঁধে। ও-রকম আর কাউকে যেতে শুনেছিস? বিজয় যখন আমার পেটে—উদয়াস্ত সূর্যরশ্মিতে রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের দর্শন পেতাম।’ ঠাট্টা করে তিনি ওঁদের বলতেন, ‘তোরা তো কচুবুনো গোসাঁইর শিষ্য।’ ওঁরাও ছাড়বার পাত্র নন। তাঁকে বলেন, ‘আপনি কি আর জায়গা পেলেন না? কচুবনে গিয়ে প্রসব করলেন!’ স্বর্ণময়ী দেবী বলেন, ‘তখন যে শিকারপুরের বাড়ী বরকন্দাজে ঘিরে ছিল। বাড়ী ছেড়ে সকলে পালাল। ঝড়-বৃষ্টি, তুফান, যাব কোথায়? গিয়ে কচুবনে বসলাম; খানিক বাদে দেখি বিজয় কোলে বসে আছে। প্রসববেদনা তো হয় নি। আগে বুঝব কি করে?’ ওঁরা বলেন, ‘আচ্ছা ঠাকুরমা, আপনি নাকি আঁতুড়ঘরে ঠাকুরকে বিষ খাইয়ে দিয়েছিলেন! মা হয়ে পূতনার মত কি করে বিষ খাওয়ালেন?’ স্বর্ণময়ী দেবী বলেন, ‘রাম! রাম! তোরা কি বলদিকিনি! তা কি কখন হয়? ছেলের ঠাণ্ডা লেগেছিল।

আমি মুসব্বর ভেবে মালিশের ঔষধ খাইয়ে দিয়েছিলাম। তাতে আফিং ছিল। কাল হয়ে গিয়েছিল, তাতে আর ওর কি হল? ভগবানই দয়া করে রক্ষা করলেন।' একদিন এই বাসায়ই তিনি ছেলেকে বলেন, 'বিজয়, তুই আর সব তীর্থে যাস, শ্রীক্ষেত্রে যাস না।' শিষ্যেরা তাঁকে এ কথার তাৎপর্য কি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, 'ও যে শ্রীক্ষেত্র থেকে এসেছে। একবার ওখানে গেলে আর কি সে ফিরে আসবে? ওটি যে ওঁর স্থান।'

৩ পৌষ (১২৯৮) গেন্ডেরিয়া থেকে খবর আসে যোগজীবনের স্ত্রী গর্ভপাত হয়ে বিকার-জ্বরে শয্যাগত; অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রভুর শিষ্য ডাক্তার প্রসন্ন মজুমদারের চিকিৎসায় তিনি আছেন। প্রভু যোগজীবনকে ঐদিনই ঢাকা যাবার নির্দেশ দেন। পিতার সঙ্গ ছেড়ে যেতে যোগজীবনের যত ওজর-আপত্তি! তিনি তাঁকে বুঝান, 'স্ত্রীর প্রতি যা একটু কর্তব্য আছে, এ সময়ে গিয়ে শেষ করে নে। আর তোকে স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে হবে না। খুব শীঘ্রই বউ-মা দেহ রাখবেন। এবার তাঁর আর নিষ্কৃতি নাই। তাহলেও যে কয়েকটা দিন আছেন, সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। চিকিৎসাতে দৈহিক ভোগের প্রায়শ্চিত্ত হয়। অবিলম্বে ঢাকা গিয়ে ঐ সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত কর। আমি শীঘ্রই যাচ্ছি।' ঐদিনই যোগজীবন ঢাকা গেলেন। শিষ্যেরা গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'যোগজীবনের স্ত্রীর গর্ভ নষ্ট হল কেন?' গোসাঁই বলেন, 'একজন উন্নত অবস্থার যোগী কর্মবিপাকে পড়ে একটি গুরুতর অপরাধ করে ফেলেন। তাতে অভিশাপ হল, সাতবার গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাই জীবিত অবস্থায় ইনি কখনও ভূমিষ্ঠ হন না। আরও তিনবার ওঁকে গর্ভবাস করে, পূর্বাবস্থা লাভ করতে হবে। যে-সে ক্ষেত্রে ইনি প্রবেশ করেন না। প্রসূতিও এঁর ভূমিষ্ঠ হবার পরই দেহত্যাগ করেন।'

ঢাকা থেকে বোলপুর ফিরে গিয়ে হরিদাসবাবুর অনুশোচনা হয়, পৌত্তলিক গোসাঁইকে গুরুবরণ করে তিনি কি ভুলই না করেছেন! ব্রহ্মোপাসনা তিনি ছাড়েন না। বড়দিনে কাছারী বন্ধ হতেই গোসাঁইর জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে। কি এক অভাবনীয় আকর্ষণ গুরুর জন্য! পরস্পর শুনেছেন গোসাঁইজী শ্যামবাজার তেমাথায় এক তেতলা বাড়ীতে আছেন। পন্ডিত মহাশয়কে চিঠি লিখে তিনি তাঁর অভিপ্রায় জানান। লুপ্‌মেলে হাওড়া পৌঁছে, কি যে বৃষ্টি! বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গেছেন। ঘোড়ার গাড়ি মিলে না। পাল্‌কি ভাড়া করে তেমাথার মোড়ে এসে ঘুরপাক খান। ছাদ থেকে পন্ডিত মহাশয়ের চোখে পড়তেই তিনি নেবে যান। প্রকান্ড তেতলা বাড়ী-ভরতি লোক। গোসাঁইকে বসু মহাশয় প্রণাম করেন। হাত-মুখ ধোবার পর কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী একখানা কলাপাতায় পেস্তা, বেদানা, কিস্‌মিস্‌, আখরোট, ফল-ফলাদি, মেওয়ার নানা রকম সুখাদ্য, রসগোল্লা, ছানাবড়া এনে ধরেন। হরিদাসবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'এত কেন?' ব্রহ্মচারী বলেন, 'খাও হে খাও।' ঘণ্টা দেড়েক পরে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এসে বলেন, 'চলুন, আহার প্রস্তুত।' তিনি বলেন, 'আমার খাওয়া হয়েছে।' নগেনবাবু বলেন, 'ফের খাবেন, আসুন।' আহারে বসে বসু মহাশয়ের চোখ ছানাবড়া! কি নেই? ছানার পোলাও, ছানার কালিয়া, ভাজা, ঝোল, আলুর দম, দই, সন্দেশ, আরও কত কি! রান্নাও সুস্বাদু। হরিদাসবাবু মন্তব্য করেন, 'এমন উপাদেয় খাদ্য কখন খাই নি।' কত লোক যে এমন প্রসাদ পান, তারও হিসাব নেই। হরিদাসবাবু পাঁচ-ছ দিন ছিলেন। রোজই

এ রকম ব্যবস্থা। গোস্বামী মহাশয়ের মা স্বপাক আহার করেন। একা হলেও আট-ন জনের রান্না তিনি করেন।

প্রভু হরিদাসবাবুকে বলেন, 'ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করবেন—প্রথমে শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়ে, তারপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।' বসু মহাশয় গ্রন্থ দুখানা কিনে নেন।

বেলা নটা থেকে গোসাঁইর কাছে লোকের ভিড়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কত কি প্রশ্ন! না আছে প্রভুর ক্লান্তিবোধ, না ঘটে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি। গোসাঁইকে একদিন হরিদাসবাবু বলেন, 'আমরা ওকালতি করি, অর্থের বিনিময়ে কথা কই। তা সত্ত্বেও মক্কেল যদি কখনও অবান্তর কিছু বলে তাহলে বিরক্তি বোধ করি। অথচ এখানে দেখি, আপনাকে অনর্গল এঁরা প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর আপনিও উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। প্রশ্নের ধরন দেখে আমাদের উষ্মা হয়, কিন্তু আপনি একেবারে নির্বিকার। মৃদু হেসে প্রভু তাঁকে বলেন, 'ওসব আমার সয়ে গেছে। ত্রিতাপ জ্বালায় ওঁরা দগ্ধ। ওঁরা কি সব আর গুছিয়ে বলতে পারেন? ওঁদেরই তো এখানে আসার প্রয়োজন বেশী।' বোলপুর ফিরে যাবার দিন হরিদাসবাবু গোস্বামীপ্রভুকে অনুনয় করে বলেন, 'আপনি আর এখানে থাকবেন না। আমাদের ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে।' প্রভু বলেন, 'বৌমার বাড়াবাড়ি। পরশু রবিবার ঢাকা যাব বলে স্থির করেছি।' শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করেন, 'ধর্ম লাভ করতে হলে প্রথমে কি কি বিষয়ে চেষ্টা করতে হয়?' গোসাঁই বলেন, 'ধর্মার্থীদের প্রথমেই **শৌচ, সত্য, ক্ষমা**, ও **শান্তি**—এই চারটি অভ্যাস করতে হয়। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে শারীরিক শৌচ, ঊর্ধ্বরেতা হওয়া, আর গৃহীর পক্ষে শুদ্ধ ঋতুগামী হওয়া—

১. আন্তরিক 'শৌচ'—সরলতা; যথার্থ সরল হলেই অন্তর শুদ্ধ হয়।
২. 'সত্য'—সত্য বাক্য, সত্য ব্যবহার ও সত্য চিন্তা; অসত্যের কোন প্রকার সংশ্রব না রাখা।
৩. 'ক্ষমা'—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, কারও হতে উদ্বেগগ্রস্ত না হওয়া; এবং কারও উদ্বেগের কারণ না হওয়া। এ বিষয়ে মনোযোগ রাখতে হয়।
৪. 'শান্তি'—চিত্তের অবস্থা সর্বদা সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট রাখা; কোন কিছুতে উপেক্ষা বা অপেক্ষা না রাখা। এ-সব নিয়ম ধরে খুব চেষ্টা করতে হয়।

১৭ পৌষ (১২৯৮) সন্ধ্যা-কীর্তনে তিন-চারটি খোল, করতাল একতানে বেজে ওঠে। গোস্বামীপ্রভু আসনে উপবিষ্ট—কখন বা ডাইনে, কখন বা বামে ঢলে পড়ছিলেন। সম্মুখের দিকে দুহাত তুলে 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলতে বলতে আসন হতে উঠে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠে দাঁড়ান। গোসাঁই উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু করেন। শিষ্যেরা মেতে উঠে বাড়ী কাঁপিয়ে তুলেন। গোসাঁইর দেহ যেন খাটো হতে থাকে। 'ঐরে, ঐরে' বলে বালকের মত তিনি হলঘরের এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়ায়ে, উপরের দিকে হাত তুলে, 'জয় রাধে, জয় রাধে' বলতে বলতে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন। শরীর স্থির, অথচ বাহু, বক্ষঃস্থল, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নৃত্যের হিল্লোল। সম্মুখের ও উভয় পার্শ্বের জটাভার থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে খাড়া হয়ে ওঠে। তারপর সম্মুখেরটি সর্প-ফণার ন্যায় সর্ সর্ করে কেঁপে দুলতে থাকে। তখন প্রভুর মস্তকে চন্দ্রের জ্যোতি, দু চোখে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ। অনেকে চীৎকার করে উঠে মূর্ছা যান। গোসাঁই তর্জনী দেখিয়ে বলেন, 'ঐ দেখ, এঁরা সব আমাকে নিতে

এসেছেন; আমি যাই, যাই' এই বলে শ্রীঅঙ্গ এলিয়ে দেন। 'ঠাকুর দেহ ছাড়লেন' বলে কান্নার রোল ওঠে। নগেনবাবু হুঙ্কার দিতে থাকেন, 'দোহাই পরমহংসজী, দোহাই পরমহংসজী' বলে তিনি আবার বলেন, 'কখনও যেতে দিব না, কখনও যেতে দিব না।' অল্পক্ষণ পরেই প্রভু 'জয়গুরু, জয়গুরু' বলে উঠে বসেন। কিছু সময় পরে নগেনবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এঁরা সব কারা এসে আপনাকে টানাটানি করছিলেন? আমাদের তো মনে হয়েছিল আপনি বুঝি চলে গেলেন।' প্রভু বলেন, 'ও রকমই হয়েছিল। গৌরশিরোমণি মহাশয়, যোগজীবনের মা, শ্রীবৃন্দাবনের সখিগণ এবং আরও অনেকে এসেছিলেন। ঐ সময়ে হঠাৎ পরমহংসজী উপস্থিত হয়ে বাধা দিলেন। গুরুজীর ইচ্ছা না হলে কারও চেষ্টাতেও কিছু হবার জো নাই।'

নগেনবাবু গোসাঁইর সঙ্গে নির্জনে কি আলাপ করেন। কুঞ্জ গুহঠাকুরতাকে তিনি পরে বলেন, 'গোসাঁইর কাছে আমার দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলাম, তিনি বললেন, "আপনাকে আমি বন্ধুভাবে দেখি, আপনার আর প্রয়োজন নাই।"'

তিন-চারদিন পর প্রভু ঢাকায় রওনা হন। রাত্রি নটায় ট্রেন। কিন্তু দল-বল নিয়ে তিনি ছটায় শিয়ালদহ পৌঁছেন। সহগামিরা বলাবলি করেন, 'এত পূর্বে স্টেশনে আসার কি সার্থকতা?' গোসাঁই বলেন, 'অনর্থক বাসায় সময় কাটিয়ে পরে অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করার চেয়ে বরং দু-তিন ঘণ্টা পূর্বে স্টেশনে এসে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকা ভাল। আমি কোথাও যেতে হলে ঐরূপই করি। জীবনে তাই কখনও ট্রেন ফেল করি নাই।' নবীনবাবু, মণিবাবু, বৃন্দাবনবাবু, শ্রীচরণবাবু, সারদাকান্ত, দেবেন্দ্র সামন্ত, কুঞ্জ গুহ এবং আরও অনেকে স্টেশনে এসেছিলেন। আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় কারও মুখে হাসি ছিল না। এক-একজন বিষণ্ণ-মূর্তি।

পরদিন ভোরে গোয়ালন্দ পৌঁছে নারায়ণগঞ্জের স্টীমারের ডেকে একখানা বড় কম্বল বিছিয়ে গোস্বামীপ্রভুকে ঘিরে সকলে বসেন! পদ্মা নদী দর্শনে প্রভুর বড় আনন্দ। তিনি বলেন, 'ভাগিরথীর প্রবল ধারাটাই এই পদ্মায় মিলে প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মার হাওয়ায় শরীরের জড়তা নষ্ট হয়। প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সতেজ হয়ে উঠে। জলের অসাধারণ গুণ। আধকোটা চাল বা কাঁচা চিড়া আধসের খেলেও, পদ্মার এক ঘটি জল খেলে তা অনায়াসে হজম হয়ে যায়। পদ্মাতীরবাসী মাঝিরা যেরূপ সবল এবং সুস্থ, এরূপ প্রায় দেখা যায় না। পদ্মার বিস্তৃতি দেখে চিত্তটি প্রশান্ত হয়ে ওঠে।'

খানিক বাদে গোসাঁই ধ্যানস্থ হয়ে পড়েন। বারবার ঢলে পড়েন, আবার মাথা তুলেন। গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা। একজন ইংরেজ যাত্রী—ডেকে পায়চারী করতে এসে গোস্বামীপ্রভুর উপর নজর পড়ে। প্রভুও তখন চোখ মেলেন। ভদ্রলোক কাছে এসে গোসাঁইকে মাতাল মনে করে পরিহাস করে বলেন, 'ক্যায়া জী, দারু পিয়া?' কেৎনা পিয়া?' প্রভু মাথা তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেন, 'হ্যাঁ, দারু পিয়া, বহুত পিয়া। তুমহরা যীশু যো দারু পিতে থে, হম্‌ভি ওহি দারু পিয়া।' এ-কথা শুনে ইংরেজ ভদ্রলোক চমকে উঠে, মাথার টুপি খুলে প্রভুকে বারবার অভিবাদন করে বিদায় নেন।

লোকোত্তর মহাজনদের জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে। বস্তুত অলোকসামান্য ঘটনাবলীই তাঁদের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সকল মহাত্মারা যদিও ঐশ্বর্যের ধার ধারেন না, তথাপি ঐশ্বর্য তাঁদের পেছন পেছন যায়। এই অলৌকিকত্বেরই প্রকাশ ঘটেছিল শ্যামবাজারের বাড়ীতে।

গোসাঁইজী বলেছেন, 'নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। অনেক সময় নিজের ইচ্ছা দেখে মনে হয়, উহা কিছুই নহে। যখন যাহা প্রয়োজন তাহা ভগবদ্-ইচ্ছায়ই সম্পন্ন হয়। যথার্থ যদি শিশুর মত থাকিতে পারি, তাহা হইলে মাতা সর্বদা দৃষ্টি রাখেন। যে ঘটনা ভগবদ্-ইচ্ছায় হয়, সে ঘটনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ভগবানে নির্ভর করিয়া চল, তাহাতে ভয় নাই। তিনি যদি আহার না দিয়া মারিয়াও ফেলেন, তাহাও ভাল। তথাপি সংসারকে সার ভাবিবে না। যদি সংসারে আসিয়া কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাও, সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে নির্ভর কর। লোকের নিন্দা-প্রশংসা শুনিও না। ধীরভাবে ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা কর। গুরুতে নির্ভর কর, সব হইবে। নিজে কিছুই স্থির করিতে নাই। ভগবদ্-ইচ্ছায় নির্ভর করে থাকতে হবে। নিজের হাতে ভার নিলেই কষ্ট।'

তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান তাঁহার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত। জীবকে আর ভাবিতে হয় না।'

গেণ্ডেরিয়ায় আম্রবৃক্ষ ও গোস্বামীপ্রভুর শ্রীদেহ থেকে মধু নিঃসরণ

গোস্বামীপ্রভু গেণ্ডেরিয়ায় এসেছেন; ঢাকার শিষ্যেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। বসন্তকুমারীর এখন-তখন অবস্থা; যোগজীবনের আজন্ম উদাস প্রকৃতি। রোগীর শুশ্রূষায় অপটু। তথাপি তাঁর উপস্থিতিতে বসন্তকুমারী অপেক্ষাকৃত সতেজ হয়ে উঠেন। ২৩ পৌষ (১২৯৮) রোগীর অবস্থা আবার যায় খারাপের দিকে—শ্বাসকষ্ট। প্রভু বলেন, 'দৈহিক সামান্য যা একটু ভোগ আছে, প্রাণায়ামে তা-ই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।' দুদিন পর ডাঃ প্রসন্ন মজুমদার সকালে রোগিণীকে পরীক্ষা করে গোসাঁইজীকে বলেন, 'আপনি ইচ্ছা করলেই তো এঁকে ভাল করতে পারেন।' প্রভু তদুত্তরে বলেন, 'যে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, তাঁকে আর আবন্ধ করা কেন? এই দেবদুর্লভ অবস্থা বহু ভাগ্যে হয়। এঁকে বাঁচাতে অনুরোধ কর না।' প্রসন্নবাবু বলেন, 'তিনদিন ধরে ওঁর বড় শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।' গোসাঁইজী তখন তাঁকে বলেন, 'আর দেরী নাই। সময় হয়ে এসেছে। বুড়াঠাকরুণের উপর ওঁর একটু বিরক্তি আছে, তা কেটে গেলেই হবে।' ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করেন, 'তা আর হবে কি করে?' গোসাঁইজী প্রসন্নবাবুকে বলেন, 'বুড়াঠাকরুণ গিয়ে ওঁকে একটু প্রসন্ন করলেই হয়। এজন্য ব্যস্ত হতে হবে না। এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।' বেলা পড়তে বসন্তকুমারী প্রভুকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তাঁর শয্যাপাশে গিয়ে গোসাঁইজী বসেন। শিষ্যা পুত্রবধূর একখানি হাত নিজের হাতে নিয়ে তিনি হরিনাম করেন; গুরুর কল্যাণস্পর্শে বসন্তের চেহারা বদলে যায়। প্রশান্তির ছাপ পড়ে তাঁর চোখে-মুখে। রোগিণী বলেন, 'বাবা, আর যে পারি না।' প্রভু সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'মা, তোমার ক্লেশের অবসান হল বলে।' সন্ধ্যায় বসন্তকুমারীর বাড়াবাড়ি শুনে মুক্তকেশী দেবী কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, 'বউ, তোর মনে যদি কখনও ব্যথা দিয়ে থাকি, সে-সব ভুলে যা, আমাকে তুই ক্ষমা করিস।' মুক্তকেশী দেবীর আকুল কান্না ও কাতরোক্তি শুনে ছল-ছল চোখে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বসন্তকুমারী সবিনয়ে বলেন, 'দিদিমা! আপনি ঐভাবে বলবেন না। আপনি তো কখনও আমাকে অনাদর করেন নি। আমার কল্যাণের জন্যই তো মধ্যে

মধ্যে আপনি আমাকে সাবধান করেছেন। আপনি আবার ক্ষমা চাইবেন কি?' বসন্তের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে চোখের জল। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জগদ্বন্ধুবাবু, যোগজীবন এবং গুরুভ্রাতাদের সম্মুখে, আঠার বছর বয়স না পুরতে পুণ্যশীলা বসন্তকুমারীর ঘটে মহাযাত্রা। বিমল হাসির রেখায় তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। গুরুভ্রাতারা মিলে তাঁর মরদেহ শ্যামপুর শ্মশানঘাটে নিয়ে যান; যোগজীবন মুখাগ্নি করেন। অগ্নি-সংস্কারের সময় একটি গোলাকার জ্যোতিঃপুঞ্জ চিতা থেকে উঠে তীব্রবেগে অনন্ত আকাশে মিলিয়ে যায়। মৃত্যুর পর বসন্তকুমারী গোস্বামীপ্রভুর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে পিণ্ড পেতে ইচ্ছা করি।' এগার দিনের দিন প্রভু নিজেই শ্রাদ্ধপদ্ধতি দেখে যোগজীবনকে শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়ান, আর যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ হয়। কথায় কথায় গোসাঁই বলেন, 'বসন্ত শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত থেকে হাত পেতে পিণ্ড গ্রহণ করেন। তারপর সূক্ষ্ম দেহটি পরিত্যাগ করে দুর্লভ কারণ-দেহ লাভ করলেন; যোগজীবনের কাছে প্রকাশিত হবার অনুমতি চেয়েছিলেন। আমি বলি, "কি হবে এতে?"' উপস্থিত শিষ্য একজন জিজ্ঞাসা করেন, 'জীব কি অবস্থায় অপর দেহ আশ্রয় করে?' গোসাঁই বলেন, 'বিষয়ে যাঁদের অতিশয় বাসনা রয়েছে, ভোগ-ইচ্ছা যাঁদের অত্যন্ত প্রবল, তাঁরাই দেহত্যাগমাত্র অপর দেহ আশ্রয় করেন।' অপর একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'পিতৃলোকে কারা যান?' গোস্বামীপ্রভু তাঁকে বলেন, 'বিষয় উপস্থিত হলে যাঁরা ভোগ করেন, কিন্তু তা লাভের জন্য তেমন প্রবল স্পৃহা রাখেন না, সাধারণত তাঁরাই পিতৃলোকে যান।' এর পর আবার তাঁরা প্রশ্ন করেন, 'বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মলোক এবং এরও ঊর্ধ্বলোকে জীব কি অবস্থা হলে যায়?' গোসাঁই বলেন, যাঁরা ধর্মমাত্র লক্ষ্য করে, কোনও প্রকার সদনুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করেন, কর্মানুসারে বাসনানুযায়ী এক-এক প্রকার লোক তাঁদের লাভ হয়। আর সব বাসনার মূল পর্যন্ত যাঁদের নষ্ট হয়ে যায়, একমাত্র ভগবানই লক্ষ্য থাকেন, তাঁদেরই ব্রহ্মলোকের অতীত স্থানে গতি হয়। শুধু বাসনা হেতু জীবের ভিন্ন ভিন্ন লোকে গতি হয়।'

আশ্রমবাসী কুকুর-গরু পর্যন্ত প্রভুর আগমনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। দুটি কুকুর ছিল গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে; একটি সাদা ও শিয়ালী রঙ মিশান। এর অভ্যাস ছিল—কেদারার উপর উঠে বসা। এই হেতু কৌতুক করে কুঞ্জবিহারী ঘোষ এর নাম দিয়েছিলেন—'চেয়ারম্যান'। গোসাঁইর প্রসাদ পাওয়া শেষ হতেই সে চেয়ার থেকে নেমে গা ঝাড়া দিত। অলক্ষ্যে থেকে কি করে যে বুঝত প্রভুর প্রসাদ পাওয়া শেষ হয়েছে—সে এক বিস্ময়। তার প্রকৃতি ছিল অসাধারণ। অন্য কুকুরের সঙ্গে সে কখনও মিশত না। একাকী সে পড়ে থাকত। কেউ কাছে গেলে বিরক্ত হত। কখনও সে আমিষ বা উচ্ছিষ্ট আহার করত না। প্রভুর প্রসাদের উপর তার বড় লোভ ছিল।

অপর কুকুরটির রঙ ছিল কাল। ঐ থেকে তার নাম হয় কেলে। আশ্রমে সে এসেছিল একেবারে বাচ্ছা। দিন-দিন এর কীর্তনের প্রতি হয় অনুরাগ। সংকীর্তনের খোল-করতাল যখনই বেজে উঠত, যেখানেই থাকুক না কেন, সে কীর্তনে এসে হাজির হত। প্রভুর কাছে যখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হত, কেলে থাকত নিয়মিত শ্রোতা। একদিন পাঠ শুনতে শুনতে কেলের চৈতন্য লোপ পেল। গোসাঁই বললেন, 'একে নাম শোনাও, এর সমাধি হয়েছে।' কুঞ্জবাবু তার কানের কাছে মুখ রেখে, "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ" নাম শোনাতে শোনাতে তার চৈতন্য ফিরে

আসে। একদিন কীর্তনে কেলের সমাধি হলে প্রভু তার পায়ের ধূলি নিজের মাথায় মাখেন। এবার আশ্রমে আসার পর কেলে একদিন গোসাঁইর আসনের সামনে বসে প্রভুর দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলে। তার উপর প্রভুর দৃষ্টি পড়তেই তিনি বলেন, 'কেলে, এ জন্মে হবে না। তোমাকে সহ্য করে থাকতে হবে, পরের জন্মে উদ্ধার পাবে।' তাঁর কথা শুনে সে চীৎকার করে ওঠে।

আশ্রমে একটি লাল গরু ছিল। তাকে রাঙ্গা বলে সকলে ডাকত। রাঙ্গা ডাকতে ডাকতে তার নাম রাণী হয়ে যায়; ঐ নামেই সকলে ডাকেন। রাণী কখনও গর্ভ ধারণ করে নি, কিন্তু প্রয়োজন মত দোহালে সে সামান্য দুধ দিত। এই কামধেনুটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল; কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে কেউ আশ্রমে এলে সে তাকে তাড়া করে যেত। কীর্তন শুনে সে অভ্যস্ত। অথচ একদিন এক কীর্তনের দল আশ্রমে প্রবেশ করতে না করতে রাণী দড়ি ছিঁড়ে তাদের আক্রমণ করতে গেলে তারা ছুটে বের হয়ে রক্ষা পায়।

গেণ্ডেরিয়ায় প্রাণের সাড়া পড়ে। দলে-দলে চারদিক থেকে লোক আসে। আশ্রমের গাছপালা, জীবজন্তু সব কিছুরই কোন না কোন বৈশিষ্ট্য। সাপ, বাঘ এ-সব হিংস্র প্রাণীর সঙ্গেও যেন প্রভুর প্রাণের যোগাযোগ। গভীর রাত্রে বাঘের পায়ের ছাপ পড়ে আশ্রমের আঙিনায়। ভোরের আলোয় তা চোখে পড়ে। প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'রাতে এক ফকির সাহেব এসেছিলেন বাঘে চড়ে।' ইঁদুর ঘোরাফেরা করে প্রভুর আসনের চারদিকে। তাঁর হাত থেকে খাবার নিয়ে আনন্দে কিচির-মিচির করে চলে যায়। কাক, ফিঙ্গে, চড়ুই, ছাতার, শালিক —এদেরও কি আনন্দ! সাপ থাকে আসন-ঘরে, কখন বা প্রভুর গা বেয়ে মাথায় ওঠে। সাপেরও নিত্য দুধকলা মিলে।

আশ্রমের মাটি রাঙা; মনে হয় গেরুয়া রঙ। প্রভুর নিরাসক্ত মনের প্রভাব সর্বত্র। শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় এখানে বৃক্ষপত্র নিম্নমুখী। গোসাঁইর পদধূলি পাবার জন্য যেন লালায়িত। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা এসে আলাদা আলাদা তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে প্রভুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। অকপটে তাঁকে তারা গোপন কথা বলে। তিনিও ওদের আলোর পথের সন্ধান দেন। রাতে কয়েকদিন ধরে আশ্রমে চোর আসে। ওদের প্রবেশমাত্র গোসাঁই হেঁকে উঠেন—'রাধে রাধে, জেগে আছি হে।' কি মুস্কিল! চোর কি করে? ওদিক আর মাড়ায় না।

শিশির-ভেজা ঘাসের উপর ঝিলমিল করে প্রভাত-রবির কিরণ। শৌচে যাবার পথে এই অনুপম শোভায় আত্মস্থ হয়ে প্রভু এলিয়ে পড়েন ঘাসের উপর।

গোসাঁইর হঠাৎ হয় জ্বর। শেষ পর্যন্ত নিমোনিয়া। কুঞ্জ ঘোষকে প্রভু বলেন, 'ডাক্তার ডেক না। আমি কোন ঔষধ নেব না। যখন জ্ঞান থাকে তখন একটু করে আমানির জল (পান্তাভাতের জল) দিও মুখে।' মণি মজুমদার ও নবীন ডাক্তার এলেন কলিকাতা থেকে। কান্ড-কারখানা দেখে ডাঃ নবীন ঘোষের চক্ষু স্থির। দু তিন দিনে গোসাঁই সেরে উঠেন। নবীনবাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে এ-সব কথা বলতেই তিনি বলেন, 'গোসাঁইর বাক্য, কার্য, চেষ্টা সবই অপরূপ। আপনাদের সৌভাগ্য, তাঁকে গুরুরূপে পেয়েছেন। নীরবে শুধু দেখে যান।'

আমতলায় গোস্বামীপ্রভু সমাধিস্থ। চমকে উঠে তিনি কুলদানন্দজীর খোঁজ করেন। কুলদানন্দ এলে বলেন, 'জগদ্বন্ধু কুলগাছটি কাটতে গেছেন। দেড়হাত উপরে যেন কাটেন।' মৈত্র মহাশয়ের কাছে গিয়ে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায়

কাটবেন?' জায়গাটি দেখাতেই তিনি জ্ঞাপন করেন গোসাঁইজীর নির্দেশ। এতে দুটি বড় ডাল বেঁচে যায়। এবং মূলগাছটি রক্ষা পায়। জগদ্বন্ধুবাবুর চিহ্নিত স্থানে কাটলে, গাছটির মৃত্যু ছিল অবধারিত।

আর একদিন পাঠ শুনতে শুনতে শিউরে উঠেন গোসাঁই। ব্রহ্মচারীকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলেন, 'চারাগাছটি খেয়ে ফেলছে। সাত গ্রাস খেলে তাড়িয়ে দিও।' কুলদানন্দজী ছুটে যান, দেখেন একটি কাঁঠালচারার পাতা চিবায় ছাগলে। সাত গ্রাস খেতেই তাড়িয়ে দেন। তখন না তাড়ালে হত গাছের দফা রফা। ফিরে এসে তিনি প্রভুকে জানান। গোসাঁই বলেন, 'যার যা আহার, তা সে খেতে শুরু করলে কমপক্ষে সাত গ্রাস খেতে দিতে হয়। তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়। তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের একটি পাতাও নড়ে না। তিনিই সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন। বুড়ি রোদে বড়ি শুকাতে দেয়। আকাশে মেঘ জমেছে দেখে, কাতর হয়ে প্রার্থনা করে, "রোদ দাও, ঠাকুর।" ঐদিকে আবার মেঘ দেখে কৃষকের প্রাণ নেচে ওঠে। গদ-গদভাবে সে প্রার্থনা করে, "জল দাও, দয়াল, চারাগুলি যে শুকিয়ে যাচ্ছে।" তিনি রোদ হয়ে বুড়ির বড়ি শুকান, আর জল হয়ে চাষার শস্য জন্মান। তিনি বুড়িরও আবার চাষারও।'

আশ্রম-ভাণ্ডারে কিছু না থাকলেও ধারে সওদা নিয়ে আসার উপায় নেই। প্রভুর নির্দেশ, 'আমার আকাশবৃত্তি। ভগবান যেদিন যেমন দেন, আমি তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। কিছু না দিলেও তাঁরই দয়া মনে করি। আপনারা কখনও আশ্রমের জন্য ধার করবেন না। শিশু, রোগী, গর্ভবতী, ও নিতান্ত অশক্ত বৃদ্ধের জন্যই ধার করা যায়। আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁদের এই নিয়মের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে চলা উচিত।' শিষ্যেরা বলে থাকেন, 'ঠাকুরের আশ্রয়ে থাকতে কোন অসুবিধাই গায়ে লাগে না।' কিন্তু আহারের হের-ফেরে এবং ছোটখাট তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এঁদের মাঝে কয়েকজন ঝগড়া-ঝাঁটি করে গোসাঁইর উপরও কটাক্ষ করেন। আবার এক-একজনের আশ্রমের প্রসাদে কি নিষ্ঠা! শ্যামাচরণ বক্সি গৃহে ফিরার সময় কণামাত্র প্রসাদ পেয়ে থরহরি কাঁপতে থাকেন। আফিংখোরের মত তাঁর চোখ বুজে আসে। মাত্রায় একটু বেশি হলে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। একদিন তিনি বলেন, 'প্রসাদ পেলেই কেমন এক নেশা হয়; নামে মনটিকে আবিষ্ট করে ফেলে।' এই সম্পর্কে একদিন গোসাঁইকে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করেন, 'সাধন পেয়ে দেখি, অনেকেই উপদেশ মত চলতে চেষ্টা করেন—আবার কেউ এলোপাতাড়ি মনোমুখী হয়ে চলেন। কারও সামান্য ত্রুটিতে আপনি কঠোর শাসন করেন, আবার কেউ কেউ বা গুরুতর অপরাধ করেও বুক ফুলিয়ে চলেন—ওঁদের আপনিও কিছু বলেন না!' প্রভু বলেন, 'মানুষের প্রকৃতি দেখে, অবস্থা বুঝে তাকে চলতে দিতে হয় ও চালাতে হয়। সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা নয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবক তিনটি লোক একই ঘরে জ্বরে পড়লে আরোগ্যের জন্য একমাত্র কুইনাইন সকলের পক্ষে ব্যবস্থা করলে সব সময়ে চলে না। কারও কুইনাইনে উপকার হতে পারে, আবার কারও মৃত্যুও হতে পারে। রোগ এক হলেও, রোগের হেতু এবং রোগীর শরীরের অবস্থাদি বুঝে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। একই অবস্থা লাভ করতে বা একই দোষ ত্যাগ করতে হলে, এক-একজনের এক-এক ভাবে চলা আবশ্যক হতে পারে। যার যেটি, সে সেটি নিয়ে থাকবে; অন্যের কিসে কি হচ্ছে, তা দেখবার প্রয়োজন কি? আর দেখেই বা কি বুঝবে? তোমার মত না চললে কারও কিছু

হবে না, মনে করা অত্যন্ত ভুল।' কুলদানন্দজী গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলেই কি সকলের একই অবস্থা লাভ হবে?' প্রভু বলেন, 'হ্যাঁ, তা হতেই হবে। কোন একটি স্টেশনের টিকেট করে দশটি লোক গাড়িতে চেপে বসলে, জেগে থাক বা ঘুমিয়ে থাক, ঝগড়া-বিবাদ করে বা তাস-পাশা খেলে সকলেই এক স্থানে পেঁাছবে।' তখন প্রশ্ন করা হয়, 'তাহলে আর আদেশ বা নিয়মাদি পালন করে কি লাভ?' প্রভু বলেন, 'লাভ খুব আছে। যাবে সকলেই এক স্থানে, তবে কেউ পাল্‌কিতে বসে, আবার কেউ বা পাল্‌কি ঘাড়ে নিয়ে—পার্থক্য এইমাত্র।'

জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ প্রভুকে বলেন, 'আমরা রোজই কত না অপরাধ করছি, তার উপর আরও একটি গুরুতর অপরাধ করে যেন আরও বিপন্ন হচ্ছি!' গোস্বামীপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি রকম?' কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় তাঁকে সবিনয়ে বলেন, 'আপনি যে বিধি-নিষেধ দিয়েছেন, তা পালন করা বড় কঠিন। আমাদের রাশি-রাশি অপরাধের উপর, গুরুতর অপরাধ গুরুর নির্দেশ লঙ্ঘন।' 'তুমি এ সম্বন্ধে কি ভেবেছ?' গোসাঁইজী তাঁকে প্রশ্ন করেন। কুঞ্জবাবু বলেন, 'আমি এক সমন্বয় করে নিয়েছি।' প্রভু জিজ্ঞাসা করেন, 'কি?' নাগ মহাশয় সবিস্তারে গুরুকে বলেন, 'আপনার বিধি-নিষেধগুলি সহজ মনে হলেও তা পালন করা বড় কঠিন। যদি তা পালন করতে পারি, তাহলে জীবন্মুক্ত হয়ে যাব। আপনিও জানেন একদিনে আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হবে না। আমাদের সম্মুখে আপনি এ-সব বিধি-নিষেধ দ্বারা আমাদের লক্ষ্য স্থাপন করে দিয়েছেন। ঐ লক্ষ্যে পেঁাছতে আমরা কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হই, ইহাই আপনার অভিপ্রায়। তা না হলে কল্যাণ না হয়ে, আমাদের অকল্যাণই হবে।' গোসাঁই শুনে বলেন, 'ঠিক, ঠিক, তা-ই ঠিক।' ব্রহ্মচারী বলেন, 'সাধ্যমত চেষ্টা করে স্বভাবের একটি দোষও তো তাড়াতে পারি না। কি করি?' প্রভু বলেন, 'স্বভাবের দোষ কি কেহ ইচ্ছামাত্র ত্যাগ করতে পারে? নিষেধ-বর্জন আর বিধিমত-অনুষ্ঠান, এর মধ্যে নিষেধ-বর্জন থেকে বিধিমত-অনুষ্ঠানই সহজ। বিধিমত-অনুষ্ঠান করতে করতে নিষিদ্ধ বিষয়-গুলি আপনা-আপনি ধীরে ধীরে ত্যক্ত হয়ে আসে। নিয়মগুলি প্রতিপালন করে চলতে চেষ্টা কর। দোষ সমস্ত আপনিই যাবে।' কুলদানন্দজী তখন গোসাঁইজীকে বলেন, 'যে-সব নিয়ম পালন করে চলতে বলেছেন, তা তো ঠিকমত পারি না।' প্রভু বলেন, 'চেষ্টা করে যাও; পার না পার সেদিকে লক্ষ্য রেখ না। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তা কি সহজে লোকে করতে পারে? এজন্য বার বছর সময় দিয়েছেন। বার বছরের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হয়ে আসে। দু-চারবারের চেষ্টায় ফল না পেলে, হাত-পা ছেড়ে দিতে নাই। যতদিনে ঠিক না হয়, ততদিনই চেষ্টা রাখতে হয়।' ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করেন, 'যে সকল বিধিনিষেধ বলে দিয়েছেন, তা না পারলে কি আপনি অপরাধ গ্রহণ করেন?' গোস্বামীপ্রভু সস্নেহে তাঁকে বলেন, 'কিছু না; আমি তো কতই বলব, সবই কি আর একেবারে ঠিকমত করতে পারবে? তাহলে তো সিদ্ধ-ই হলে। যতটা পার, করে যাও। চেষ্টা করেও যদি না পার, কোনও অপরাধই হবে না। ইচ্ছা করে একটা অনিয়ম না করলেই হল। হঠাৎ যা হয়ে পড়ে, তা নিজে করলে মনে কর কেন? সবই ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে হয়। তিনিই সব করছেন, তিনিই সমস্ত করায়ে নিচ্ছেন —এটি বুঝলেই শান্তি। যথার্থ পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম, আমরা কিছুই তো বুঝি না। ছোটবেলা হতে দেখে-শুনে একটা ভালমন্দের সংস্কার মাত্র দাঁড়ায়ে

গেছে। বাস্তবিক তত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন। লোকের কাছে লজ্জায়, লোকের ভয়ে, আমরা কতকগুলি কার্য করি না; মনে করি পাপ। যথার্থই ও-সব পাপ কিনা, ঠিক বলা যায় না। পাপ-পুণ্য সকলেরই এক-একটা স্বরূপ আছে, সেটি দর্শন হলেই পাপ কি, পুণ্য কি, লোকে ঠিক বুঝতে পারে। কোনও কার্যে পাপ বোধ হলে, তা কি সে আবার করতে পারে? এখন যা পাপ-পুণ্য মনে করছ, সমস্তই একটা সংস্কার মাত্র। সুখ, দুঃখ, পাপ-পুণ্য, এ সমস্তই সংস্কার। সংস্কার জিনিসটাই মিথ্যা। বিচার দ্বারা এটি বুঝে শান্ত হতে চেষ্টা কর। স্বভাবে যার যে সংস্কার আছে তার সেটি প্রকাশ হবেই। তবে শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করলে, দেহ-মন নির্মল হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন দৈহিক, মানসিক, কোন প্রকার সংস্কারই আর থাকে না।'

ব্রহ্মচারীকে আর একদিন গোসাঁই বলেন, 'বলা-কওয়ার আর কি আছে? কাজ করে যাও। একটি স্থায়ী অবস্থা হঠাৎ তো মহাত্মারা দেন না। সিংহের দুধ সোনার পাত্রে না রাখলে নষ্ট হয়ে যায়। মহাত্মারা পাত্রটি ঠিক করে নিয়ে বস্তু দেন। এখন যদি তোমাকে অবস্থা দেওয়া হয়, তোমার অনিষ্ট করা হবে। ঊর্ধ্বরেতা হলে তুমি কাউকেই গণ্য করবে না। ঐ অবস্থা লাভ হলে তুমি স্থির থাকতে পারবে না। ঐ ঐশ্বর্যতে সমস্ত সংসার তুমি ছারখার করবে, সর্বনাশ করবে। অভিমানটি নষ্ট হলেই ও-সব ঐশ্বর্যলাভ নিরাপদ। এখন কাজ করে যাও। ও-সব দিকে খেয়াল রেখ না। সব দিকে ঠিক হওয়া দু-একদিনের কর্ম নয়।'

প্রভু আরও বলেন তাঁকে, 'মানুষের সঙ্গে ব্যবহার তার প্রকৃতি বুঝে করতে হয়। যদি কেহ নিজের প্রকৃতিমত চলাতে কারও কিছু অনিষ্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু অন্যের অনিষ্ট করা তার অভিপ্রায় না থাকে, তাহলে শান্তভাবে তাকে তা বুঝায়ে দিতে হয়। যতটা সম্ভব তার ভাবে মিশে, তার পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হয়। আর যদি দেখা যায়, সত্য সত্যই কোন প্রকার দুরভিসন্ধিতে মতলব করে কেহ একটা অত্যাচার করেছে, তাহলে তাকে শাসন করতে হয়। অনেক সময় সদভিপ্রায়ে মানুষ কাজ করে, অথচ তাতে কারও অনিষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে দোষী বলা যায় না। ভুল-ভ্রান্তি তো লোকের হয়েই থাকে। সময় হলে সে নিজেই তা আবার বুঝতে পারে। সমস্ত কার্যেই খুব ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়। ধৈর্যের অভাবেই যত বিরোধ।'

১৮ বৈশাখ, ১২৯৯ সাল; ঐদিন ছিল অক্ষয়-তৃতীয়া। এই পুণ্যাহতে সত্যযুগের প্রবর্তন ও যব উৎপন্ন হয়েছিল। অনেকের ঐদিন সাধন হয়। কোঠা-ঘরে এর ব্যবস্থা হয়। প্রভুর আসনের সম্মুখে ডান পাশে তুলসীর টব ও ধূপধুনা। তাঁর উভয় পার্শ্বে কম্বল-আসনে উপবিষ্ট দীক্ষার্থীরা—একদিকে পুরুষ, অপর দিকে স্ত্রীলোক। দীক্ষাপ্রার্থী হলেই গোসাঁই দীক্ষা দিতেন না। যাঁদের জন্য এই দীক্ষা নির্দিষ্ট আছে, তাঁরাই শুধু পেতেন; বহুজন তাঁর কাছ থেকে কৃপালাভে বিমুখ হতেন। চরিত্রবান, প্রতিষ্ঠাবান অনেকে যাচ্ঞা করে তাঁর কাছে দীক্ষা পান নি; আবার বহু হীনচরিত্র নর-নারী তাঁর কাছে সাধন পেয়ে ধন্য হয়েছেন। দীক্ষার সময় তিনি পূর্বে স্থির করে দিতেন। দীক্ষার্থীদের আকুতি কাকুতি-মিনতি, কান্নাকাটি ও শিষ্যদের অনুরোধ-উপরোধ, পাত্র ও সময় নিরূপণে কখনও ব্যতিক্রম ঘটায় নি। স্নান, উপবাস, নববস্ত্র পরিধান, লৌকিক কোন উপচার প্রভুর কৃপাসাধনের অঙ্গ ছিল না। দীক্ষার আনুষঙ্গিক হিসাবে গুরুদক্ষিণা ও বস্ত্রাদি

প্রদান বারণ ছিল। গোসাঁই কোনক্ষেত্রেই ঐসবের প্রশ্রয় দেন নি। তিনি দীক্ষাকে 'সাধন' এবং দীক্ষামন্ত্রকে 'নাম' বলতেন।

দীক্ষাদানের পূর্বে নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হয়ে মগ্নাবস্থায় প্রভু সুর করে শ্লোক আবৃত্তি করতেন। তারপর 'জয়গুরু, জয়গুরু, জয় শচীনন্দন' বলে গুরুগম্ভীর স্বরে বলতেন, 'তোমাদের কি সৌভাগ্য! সপার্ষদ মহাপ্রভু উপস্থিত; রাধাগোবিন্দও কৃপা করে এসেছেন।' সাধনপ্রার্থীদের এই উপদেশ দিতেন—

১. 'সর্বদা সত্য কথা বলবে ও সত্য আচরণ করতে চেষ্টা করবে। সত্যই পরমেশ্বরের স্বরূপ। সত্যই মানুষের স্বভাব। বুদ্ধি ও সঙ্গদোষে এর বিপর্যয় ঘটে। সত্যরক্ষা করতে হলে মিথ্যা কল্পনা, বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ করতে হয়। না হলে সত্য বলা যায় না। নিরপেক্ষ না হলে সত্য বলা যায় না। জিজ্ঞাসিত না হয়ে কথা বলতে নাই। পরিমিতভাষী হবে। কারও নিন্দা কর না। পরনিন্দা মহাপাপ। নরহত্যা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ। পরনিন্দা আত্মার কুষ্ঠব্যাধি।

২. 'বীর্যধারণ করবে। বীর্যরক্ষা না হলে সত্য প্রতিপালন হয় না। গৃহীরা শাস্ত্রানুযায়ী ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস করবেন। অযথা যারা বীর্য নষ্ট করেন, তাঁরা পিতৃ-মাতৃঘাতী। স্বামী স্ত্রীকে ভগবতী মনে করে মর্যাদা দেবেন; আর স্ত্রী স্বামীকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করবেন। শুধু ঋতুরক্ষার জন্য স্ত্রী-সংসর্গ বিধি। এরূপ হলেই সংসার সুখের হবে।

৩. 'শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করতে চেষ্টা করবে। ইহাই আমাদের সাধন। প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন ফেলা হচ্ছে, নেওয়া হচ্ছে, তেমন এর প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্বদা নাম করবে। হঠাৎ একেবারে এ-সব হয় না। বারবার চেষ্টা করে উঠে-পড়ে এ কয়েকটি বিষয়ে স্থির হতে হবে। চেষ্টা থাকলে এক সময় এ-সব হবেই।

৪. 'মাংস, উচ্ছিষ্ট ও মাদক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে। মৎস্য আহারে নিষেধ নাই, বিধিও নাই; যার যেমন ইচ্ছা। উচ্ছিষ্ট সর্বদা ত্যাগ করবে। মাতাপিতা পরমগুরু; তাঁদের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট নয়; প্রসাদজ্ঞানে উহা গ্রহণ করলে উপকারই হয়।

৫. 'কোন প্রকার দলে বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ থাকবে না। যেখানে পরমেশ্বরের নাম, যেখানে ধর্মের কোন প্রকার অনুষ্ঠান, সেখানেই ভক্তিপূর্বক নমস্কার করবে। সকল ধর্মার্থীদেরই আদর করবে; কোন সম্প্রদায়কেই অনাদর করবে না। আমাদের কোন দল বা সম্প্রদায় নাই।

৬. 'স্ত্রীলোক হতে সর্বদা সাবধান থাকবে। তাদের সঙ্গে এক ঘরে সাধন করবে না।

৭. 'যথাসাধ্য পরোপকার করবে। যাঁরা গৃহী, তাঁরা খুব আদরের সঙ্গে অতিথি সৎকার করবেন। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা সকলেরই যাতে তৃপ্তি হয়, ঐদিকে গৃহীর দৃষ্টি থাকবে। কোন রকম হিংসা করতে নাই। একটি বৃক্ষের পাতাও বিনা প্রয়োজনে ছিঁড়তে নাই। কাকেও উদ্বেগ দেবে না।

৮. 'লোকের বিশ্বাস নিয়ে পরিহাস করবে না।

৯. 'সর্বজীবে দয়া কর। পরদুঃখে সহানুভূতি করবে। পরসুখে সুখবোধ—

এটি বড় কঠিন। এজন্য সেবা করতে হয়।

১০. 'প্রাণায়াম কুম্ভকাদি সব বাহ্য। ইহা সাধন নয়। সাধনের সহায় মাত্র।

১১. 'সব রকম কল্পনা, এই সাধনের পরিপন্থী। এই নামই স্বয়ং পরমেশ্বর। নাম করতে করতে যখন যা প্রকাশিত হবে, তা সম্মান করবে, প্রণাম করবে। যার যেভাবে সিদ্ধি হবে, এই নাম হতেই হবে। ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান যত রূপে প্রকাশিত হয়েছেন, হচ্ছেন এবং হবেন, সবই এই নাম হতে।'

উপদেশ দিয়ে প্রভু সস্নেহে বলতেন, 'গুরুদেব কৃপা করে তোমাদের এই নাম দিচ্ছেন' বলে প্রণব-যুক্ত একটি মন্ত্র দু-তিন বার উচ্চারণ করে বলতেন, 'ইহা শ্বাস-প্রশ্বাসে অবিরাম জপ করবে।'

নাম পেয়ে সদ্য দীক্ষাপ্রার্থীদের মধ্যেও বিচিত্র ভাবপ্রাবল্যের প্রকাশ হত। হাসি, কান্না, আনন্দোচ্ছ্বাস এক-একজনের এক-এক রকম। ঐদিন সাধন দেবার পর গোস্বামীপ্রভু সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমাদের এই সাধন পূর্বে আর কখনও গৃহস্থদের মধ্যে ছিল না। গৃহস্থদের এই সাধন লাভ করা এবারই প্রথম। যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসীদের মধ্যেই এই সাধনের প্রচলন ছিল। কেউ ইচ্ছা করলেই অমনি এ-সাধন লাভ করতে পারতেন না। বর্তমান সময়ে সংসারের দুরবস্থা দেখে কয়েকজন মহাপুরুষ জীবের কল্যাণের জন্য সংসারীদের মধ্যেও প্রার্থী হলেই, এই দুর্লভ সাধন দিয়েছেন। যাঁদের এই সাধন দেওয়া গেছে, তাঁরা কেহই নিয়ম মত এই সাধন করছেন না। এ পর্যন্ত একটি লোকও প্রস্তুত হল না। তাই কিছুকাল পর্যন্ত কি অবস্থা দাঁড়ায় তা দেখবেন। যাঁদের আশা দেওয়া গেছে, মাত্র তাঁরাই এ-সাধন পাবেন। এ-বছর নূতন আর কেহ সাধন পাবেন না; এখন এরূপ আদেশ হল। সাধন পেয়ে যদি কিছুই করা না হয়, তবে এ-সাধন নেওয়া কেন? বৃথা মুনি-ঋষিদের আদরের সাধনপথ কলুষিত করা হয় মাত্র। কাহারও সাধনে নিষ্ঠা নাই। আমাদের সাধনে বেশি কথা নাই—মাত্র তিনটি কথা। যিনি এই তিনটি কথা রক্ষা করছেন, তিনিই সাধন করছেন। অহিংসা, সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—এই তিনটিই এখন আমাদের সাধন। যদি কেহ ঈশ্বর না মানেন, নাম সাধন না করেন, কিন্তু এই তিনটি গুণ অবলম্বন করে চলেন, তাঁকে আমি ধার্মিক মনে করি। "আস্তিকই" হউন আর "নাস্তিকই" হউন, মূল কথা এই তিনটি গুণ থাকা চাই। তারপর প্রেমভক্তির কথা; সে অন্য প্রকার। সেজন্য আর চেষ্টা করতে হবে না। মনুষ্যের যা কর্তব্য—এই তিনটি লাভ হলেই হয়ে গেল। এই তিনটির একটিতেও যদি শিথিলতা হয়, তাহলে সংকীর্তনে ভাবোচ্ছ্বাসই হউক, আর নামে অশ্রুপাতই হউক—কিছুই নয়।'

১০ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯ সাল, রাত্রি এগারটা। আশ্রমে মিটিমিটি আলো জ্বলে। ঝিঁঝি-পোকার একঘেয়ে আলাপে বৈচিত্র্য আনে, শিবাদলের হুক্কাহুয়া রব আর সারমেয়ের বেসুরো খবরদারি। আশ্রমে আসেন কয়জন সাধু অতিথি—প্রেমানন্দ ভারতী, রামকৃষ্ণদেবের কৃপাপাত্র স্বামী শিবানন্দ, আরও কয়জন বাঙালী সাধু। এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত বি.এ., এম.এ. পাশ। পূর্বাশ্রমে কেউ বা ছিলেন পদস্থ রাজকর্মচারী। গোসাঁই কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর উপর দেন এঁদের রান্নার ভার। আশ্রম-ভাণ্ডারে সবই বাড়ন্ত। কয় মুঠা চাল, আধমুঠা ডাল, গোটাকয় লঙ্কা আর নুন মাত্র সম্বল। না অছে ঘি বা মশলা বা আর কিছু; সাদা জলে নুন-লঙ্কা ফেলে ব্রহ্মচারী ডাল সিদ্ধ করেন। রান্নার পর সতীর্থ অশ্বিনী বৈরাগীকে দিয়ে খানিকটা

চাখিয়ে দেখেন। 'ও হরি! কার সাধ্য মুখে দেয়! একেবারে নুনের আরক!' কি আর করেন? জল দিয়ে ফের জ্বাল দেন; কিন্তু হালে না পান পানি। রাত্রি আড়াইটা বাজে এদিকে। অতিথিরা ক্ষুধায় কাতর। নিরুপায় ব্রহ্মচারী গুরুর শরণ নেন, একান্ত মনে। আকুলভাবে প্রার্থনা করেন, 'ঠাকুর, সাধুরা যেন তৃপ্তির সাথে আহার করেন।' তারপর তিনি ভয়ে ভয়ে পরিবেশন করেন। ডালের অপূর্ব সুস্বাদ ও সুগন্ধের কথা বলাবলি করে সাধুরা পরিতোষ ও তৃপ্তির সঙ্গে করেন আহার সমাপন। উদ্বৃত্ত ডাল আশ্রমবাসীরা খেয়ে একবাক্যে বলেন, 'এমন সুস্বাদু ডাল আশ্রমে কখনও রান্না হয় নি।' কুলদানন্দজী তাঁর রোজনামচায় লিখেন, 'বুঝিলাম, ইহা ঠাকুরের প্রত্যক্ষ কৃপা। তিনি দয়া করে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন।'

বাইরে থেকে আশ্রমে সাধু এসেছেন শুনে হয় ভক্ত-সমাগম; কীর্তন হয় জমজমাট। গোস্বামীপ্রভু কীর্তনে এসে সাষ্টাঙ্গ দিতেই কীর্তনের যেন প্রাণস্পন্দন হয়। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থরথর করে কাঁপতে থাকে। সন্ন্যাসীরা তাঁকে ঘিরে নাচেন। দেখতে দেখতে গোসাঁইর আকৃতি অন্যরকম হয়ে যায়। তিনি 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলে হুঙ্কার দিতে থাকেন। তাঁর উদ্দণ্ড নৃত্যে ও ভাবতরঙ্গে কত জন যে ভূমিশায়ী হয়ে লুটোপুটি খান! তাঁর পদসঞ্চরণের তালে-তালে আশ্রমের গাছ-পালাও নাচে। প্রভু সম্বিতহারা হয়ে মাটিতে পড়ে যান। কীর্তনান্তে তিনি উঠে বসেন। প্রেমানন্দ ভারতী তখন তাঁর পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'শক্তি দিন, প্রভো, শক্তি দিন।' গোসাঁই তাঁর মাথায় হাত রেখে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। তিনিও স্থির হন।

একদিন অভয়নারায়ণ রায় দেখেন, নৃত্যরত গোসাঁইর মুখমণ্ডল থেকে ঠিকরে পড়ছে এক অপরূপ জ্যোতি। আর তাঁর প্রকাণ্ড কলেবর রূপান্তরিত হয়েছে নীলাভ বালগোপাল-মূর্তিতে। সম্বিত হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন অভয়বাবু তাঁর পদতলে। জ্ঞান ফিরে এলে বলেন, 'গোসাঁই আমার মাথায় পা তুলে ধরেন। শিশুর কচি কচি কোমল দুখানা পা। মুগ্ধ হয়ে ভাবি "এ কি অপরূপ দর্শন! কি অভিনব স্পর্শবোধ!" আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, "এই দেখ রাম।" তখন দেখি ধনুর্বাণ-হাতে রাম।'

৭ আষাঢ়, ১২৯৯ সাল। আকাশে মেঘের চিহ্নটুক নেই। খাঁ-খাঁ রোদ। যে গাছটির নীচে বসে গোসাঁই নামে ডুবে থাকেন, সেই আম্রবৃক্ষ থেকে হয় মধুক্ষরণ। ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায়, সারা গাছ জুড়ে মধুবিন্দু, মধুর উৎস। ডেঁয়ে, পিঁপড়া, মৌমাছিতে গাছ ছেয়ে ফেলে। মধ্যাহ্নে প্রসাদ পেয়ে প্রভু ওখানে গিয়ে বসেন। কুলদানন্দ মহাভারত পাঠ করে শোনান। বেলা দুটায় পাঠ শেষ 'হলে গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'আমগাছ থেকে আজ মধুক্ষরণ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ?' আমতলার শুকনা পাতা, তুলসীগাছ ভিজে তেলপানা হয়ে আছে। মিঠা গন্ধে বাতাস ভরপুর। গোসাঁই আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'কি? মধু বলে বুঝতে পারছ?' শ্রীধর ও অশ্বিনী মিত্র তাঁর কথা শুনে এসে শুকনা পাতা চেখে বলেন, 'বাঃ, বেশ মিষ্টি তো! মধুই তো বটে।' ব্রহ্মচারী সোৎসাহে গাছের নীচের ডাল থেকে দুটা তাজা পাতা ছিঁড়ে ফেলেন। গোস্বামীপ্রভু শিউরে উঠে বলেন, 'উঃ! তুমি কচ্ছ কি? ওভাবে কখনও পাতা ছিঁড়তে আছে?' পাতা দুটিতে ঠিক যেন তরল আঠা মাখা। ব্রহ্মচারী চেটে দেখেন, বেশ মিষ্টি। পাতা দুটা টুকরা টুকরা করে তিনি দশ-বার জনকে দেন। সকলেই সায় দেন—'যথার্থ মধু।' কুলদানন্দ প্রশ্ন করেন, 'আমগাছে

আবার মধু হয় কি করে?'"[1] গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'শুধু আমগাছ কেন? যে-সব বৃক্ষের তলায় বহুদিন নিষ্ঠার সঙ্গে হোম, যাগ-যজ্ঞ, সাধন-ভজন, তপস্যা হয়, অথবা যে সকল গাছের নীচে মহাত্মা, মহাপুরুষদের আসন থাকে, সে-সব গাছ মধুময় হয়ে যায়। সময়ে সময়ে ও-সব থেকে মধুক্ষরণ হয়। খুব ভক্তির সঙ্গে পূজা করলে, জলও মধুময় হয়। শান্তিপুরে গঙ্গাজলে একবার মধুপোকা পড়ছে-উঠছে দেখে সন্দেহ হল; জল একটু খেয়ে দেখলাম মিষ্টি, মধুর গন্ধ ও স্বাদ। বহু প্রাচীন নিমগাছ, তেঁতুলগাছ দেখেছি—তা থেকে ঝরণার মত মধু পড়ে। কমণ্ডলু ভরে খেয়েছি, পরে অনুসন্ধানে জেনেছি ও-সব বৃক্ষের তলায় কোন সিদ্ধপুরুষের বা মহাপুরুষের আসন ছিল। শ্রীবৃন্দাবনে একটি নিমগাছ থেকে মধু নিঃসৃত হতে আমি নিজে দেখেছি। ঐ গাছের নীচে একজন অকিঞ্চন ভক্তসাধু সাধন-ভজন করতেন।'

আমগাছ থেকে মধুক্ষরণের কথা চারদিকে জানাজানি হয়। এ কি কখনও সম্ভব? আশ্রম-প্রাঙ্গণে ঢাকা শহর ভেঙ্গে পড়ে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম, নিরক্ষর, পণ্ডিত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী বাদ নেই। নিজের চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা মিলে যেন ষড়যন্ত্র করে! একেবারে আক্কেল গুড়ুম। ভক্তেরা গোস্বামীপ্রভুকে প্রশ্ন করেন, 'এই অঘটন কি করে ঘটেছে? অস্বীকার করার তো জো নেই।' প্রভু বলেন, 'মানুষের মধ্যে যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-গুণপ্রধান লোক রয়েছে, বৃক্ষের মধ্যেও অনুরূপ আছে। শক্তিপূর্ণ নামের প্রভাবে সত্ত্বগুণ-প্রধান বৃক্ষেরও আনন্দরস উথলে উঠে, তখন তারা পুষ্পবর্ষণ ও মধুক্ষরণ করে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে। হরিধ্বনি যতদূর শোনা যায় ঐ বিস্তৃতির মধ্যে, সকল সত্ত্বপ্রধান বৃক্ষেরই এরূপ ঘটতে পারে।'

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

বনলতাস্তরবঃ আত্মনি বিষ্ণুং ব্যজয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতমনো ববৃষুঃস্ম॥ ১০।৩৫।৫

বনলতা ও তরুরাজি ফলপুষ্পমণ্ডিত হয়ে যেন অন্তঃস্থিত বিষ্ণুর ব্যজনপূজনে বৃত। গুরুভার মহীরুহ প্রেম-হৃষ্টমনে স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিপ্রণোদিত মধুধারা বর্ষণ করেছিল।

'মধুমতী সূক্তে'[2] আছে—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধীঃ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

অর্থাৎ বায়ুসমূহ মধুর হয়। সাগর ও নদীসমূহ মধুময় রস ক্ষরণ করে। ঔষধি-সমূহ আমাদের নিকট মধুময় হোক। দিবসযামিনী মধুময় হোক, পৃথিবী মধুময়

---

[1] ১. শ্রীমদ্ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ', ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪৯।

[2] ২. ঋগ্বেদ ১।১।৯০।৬-৯; বৃহদারণ্যক ৬।৩।৬

হোক। পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক আমাদের নিকট মধুময় হউন। বনস্পতি আমাদিগকে সুমিষ্ট ফলদান করুন। সূর্য আনন্দপ্রদায়ক হউন। গাভীসকল আমাদের নিকট সুখপ্রদ হউক।

শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়ায়ও 'মধুমতী সূক্তের' মন্ত্র বলা হয়। ইহা রূপক নয়। যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হলে আকাশ-বাতাস সব মধুময় হয়ে ওঠে; এবং মৃতের তৃপ্তিলাভ ও সদ্‌গতি ঘটে। হিন্দুশাস্ত্র ও ঋষিবাক্য অভ্রান্ত। অধ্যাত্ম-জগতের তত্ত্বকথা শাস্ত্র জুড়ে রয়েছে। কিন্তু ভারতীয়রা এ-সবের কতটুকু মর্যাদা দেন? পরাজ্ঞানের চাবি-কাঠি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কাছে এ-সব তাৎপর্যহীন হেঁয়ালি! শ্রদ্ধায় অ-ধরাও ধরা দেন। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।'

গোসাঁই কুলদানন্দকে বলেন, 'শ্রদ্ধা করে সেবাপূজা করলে বিগ্রহ জীবন্ত হন। তখন তিনি সেবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। মানুষের মত খাবার চান। কোনও প্রকার অনাচার-অত্যাচার হলে বলে দেন। এ-সব কিছুই আশ্চর্য নয়। অনেক-স্থলেই এ-সব দেখা যায়। তোমার দাদার শালগ্রামটিও চমৎকার। তিনি আমার কাছে খাবার চেয়ে নিয়েছিলেন।' পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ আমাদের সংস্কৃতির মূলে কুঠার হেনেছে। ফলে আধুনিক শিক্ষিতের মন সংশয়-মেঘে ঢেকে গেছে।

মধুনিঃসরণের পর আমগাছটির উপর পড়ে সকলের অনুসন্ধানী দৃষ্টি। প্রাচীন গাছটির স্থূল, সুগোল আট-ন ফুট খাড়া কাণ্ড। শাখা-প্রশাখার চারদিকে ভারসাম্য রেখে বিস্তার। পত্র-পল্লব—সতেজ ও জীবন্ত, দৃষ্টি-মনোহর। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের রৌদ্রেও উদয়াস্ত বৃক্ষটির শীতল ছায়ায় বসলে দেহ-মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের চোখে পড়ে—গাছটির গায় জায়গায় জায়গায় বাকলা উঠে আছে এবং তাতে কোনটিতে নিখুঁত ওঁকার আর অবশিষ্টগুলিতে সুপটু শিল্পি-হস্তে নানা দেব-দেবীর মূর্তি যেন খোদাই করে রাখা হয়েছে। শ্রীবৃন্দাবনে যা দেখে-ছিলেন তার অনুরূপ।

পরের দিন, ৮ আষাঢ় (১২৯৯) গোস্বামীপ্রভু প্রসাদ পেয়ে আর আমতলায় যান না। ব্রহ্মচারী পাঠ করতে গিয়ে দেখেন, ঘরে আসনে তিনি ধ্যানস্থ। গোসাঁই তখন চোখ মেলে তাঁকে বলেন, 'আমার মাথাটি একবার দেখ তো! পিঁপড়ায় বড় কামড়াচ্ছে।' ব্রহ্মচারী মহাভারত পাঠের পর রোজই প্রভুর জটা পরিষ্কার করেন; ছারপোকা ও উকুন বেছে ফেলেন। গোসাঁইর কথা শুনে তিনি মনে-মনে ভাবেন, 'পিঁপড়া আসবে কেন? উকুন ও ছারপোকায় বোধহয় কামড়াচ্ছে!' মাথায় হাত দিয়ে দেখেন, জটার গোড়া ভিজে একেবারে চপচপ। সারা মাথায় কে যেন সুগন্ধ তেল ঢেলে রেখেছে! চমৎকার মিঠে গন্ধ! অন্যান্য দিন সামান্য ভিজে থাকত। তাই তিনি ভেবেছিলেন, ঘাম বুঝি! তিনি প্রভুকে বলেন, 'সমস্ত মাথা ভিজে গেছে। ঘাড়ে ও কানে সারি-সারি পিঁপড়া আর বড় সুগন্ধ।' গোসাঁই প্রশ্ন করেন, 'কি রকম গন্ধ?' ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ উত্তরে বলেন, 'পদ্মের মত।' গোস্বামীপ্রভু ব্রহ্মচারীকে বলেন, 'হ্যাঁ, তাই। ঐ গন্ধ পেয়েই পিঁপড়া এসেছে।' জটা বাছতে বাছতে ব্রহ্মচারী দেখেন, সারা মাথা জুড়ে চুলের গোড়ায় সাদা সাদা কি! তিনি প্রভুকে বলেন, 'সমস্ত মাথায় চুলের গোড়ায় পাতলা মোমের মত যেন কি; তোলা যায় না, চুলে জড়িয়ে যাচ্ছে।' গোসাঁই বলেন, 'যা বললে—তাই, মোম। জমাট হয়ে ওরূপ হয়েছে।' ব্রহ্মচারী বলেন, 'কয়েকদিন ধরে দেখছি আপনার মাথা ঘামে ভিজে যায়।' প্রভু বলেন, 'ঘাম নয়, ঘাম তো শুকিয়ে যায়। ঘাম কি জমে মোম হয়?

প্রতিদিন দেখছ, বুঝতে পাচ্ছ না? ও যে মধু।' কয়েকদিন ধরেই ব্রহ্মচারী লক্ষ্য করছেন, কয়েকদিন ধরেই ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে ঘামের মত বিন্দু বিন্দু কি! পাখার বাতাসে শুকায় না। শরীরে প্রচুর তেল মাখলে যেমনটি হয়, তেমন। প্রজাপতি, মৌমাছি প্রভুর মাথার চারপাশে উড়ে বেড়ায়। হাত-পাখার ঝাপটা হাওয়ায় মাথায় ও শরীরে বসতে পারে না। সারি-সারি পিঁপড়াও আসনের পাশে ও উপরে এসে পড়ে। মাঝে-মাঝে ঝেড়ে ফেলতে হয়। ব্রহ্মচারী গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মানুষের শরীর দিয়েও কি মধু নিঃসরণ হয়?' গোসাঁই বলেন, 'হ্যাঁ গাছের যেমন দেখছ, তেমনই।'[1] ঋগ্বেদে আছে—

এষা মধুমতীবিদ্যা সর্বত্র মধুদর্শনাৎ।
স্বশরীরার্ক বৃক্ষোঽপি দৃশ্যতে পুষ্কলং মধু॥ ১।৯০

মধুমতী পরাবিদ্যা এইরূপ যার প্রসাদে সব কিছু মধুময় হয়ে ওঠে। বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল, ক্ষীরধারায় পূর্ণ। ঐরূপ সাধকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্রহ্মদর্শনে মধুক্ষরণ হয়।

সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও আত্মপ্রচারের ঘোর বিরোধী গোস্বামীপ্রভুর জীবনে কখনও কখনও যোগৈশ্বর্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। অবতার ও মহাজনদের জীবনে এ-সব অধ্যাত্ম-বৈশিষ্ট্য। ভক্তেরা ঐশ্বর্যকে হেয় চক্ষে দেখেন। প্রভু বলেছেন, 'ঐশ্বর্য ছায়ার ন্যায় ভক্তজীবনে আসে, কিন্তু ওদিকে ভ্রূক্ষেপও করতে নাই।' কীর্তনে ভাবপ্রাবল্যে সর্পফণার ন্যায় মাথার জটা খাড়া হয়ে যাওয়া, পিচকারীর মত প্রেমাশ্রুধারা ছুটে গিয়ে বিগ্রহের উপর পড়া, শ্রীদেহ থেকে মধু নিঃসরণ ও পদ্মগন্ধ বিকীরণ 'বৈরাগ্যে'র অভিনব প্রকাশ। বৈরাগ্য ষড়ৈশ্বর্যের পরিণত উৎকর্ষ। 'ঐশ্বর্য' কথাটির মধ্যে রজোগুণের একটি নিবিড় যোগ আছে। বৈরাগ্যকে 'ঐশ্বর্য' না বলে 'মাধুর্য' বলে বর্ণনা করলে ভাবের সঙ্গে ভাষার সংহতি থাকে। এতে অর্থসঙ্গতিও বজায় থাকে। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি, অব্যক্ত মহিমা। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য, বীর্য, জ্ঞান, শ্রী, যশ ও বৈরাগ্য। তিনি ইচ্ছামাত্র নিখুঁত করে সৃষ্টি করেছেন—অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাঁর সৃষ্টি এক পরম বিস্ময়! সৃষ্টির সর্বত্র তাঁর ঐশ্বর্য—যা দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত। তাই প্রকৃত ঐশ্বর্যকে মনে করি মামুলি ব্যাপার আর প্রাকৃতিক ঘটনা-প্রবাহের ব্যতিক্রমকে বলি ঐশ্বর্য। বিশ্ব সৃষ্টি করে ভগবান বৈরাগ্যকে আশ্রয় করে আত্মগোপন করে আছেন।

গোস্বামীপ্রভু একদিন সকলের সঙ্গে প্রসাদ পাবার সময় সমাধিস্থ হয়ে বলে উঠেন, 'আহা কি সুন্দর! কি সুন্দর!' আবার আহার শুরু করতেই শিষ্যেরা প্রশ্ন করেন, 'কি সুন্দর?' গোসাঁই বলেন, 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি কত দেব-দেবী, ঋষি-মুনি এসেছিলেন; তোমাদের আহার দেখে কত আনন্দ করে গেলেন!' শিষ্যেরা সমকণ্ঠে বলে উঠেন, 'আমাদের আহার দেখে আনন্দ করার কি আছে?' প্রভু বলেন, 'তা করবেন না? তোমরা কি সাধারণ? তোমাদের যিনি লক্ষ্য, তাঁর চারদিকে কত যোগী, ঋষি, কত দেব-দেবী, কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু, কত শিব রয়েছেন। সেই অন্ত্যবিহীন মহান্ পুরাণ-পুরুষই আমাদের লক্ষ্য।' একটু পরে আবার বলেন, 'এই সাধনপথে চললে ভগবানের অনন্ত বিভূতি,

---

[1] ১. শ্রীমদ্ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ', ৪র্থ খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৫১।

যাবতীয় লীলা, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হতে থাকবে। নৌকায় চলার মত নৌকার দু-পাশে কতই দর্শন করবে। শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে সর্বত্রই প্রণাম করবে। আসক্ত কোথাও হবে না। আসক্ত হলেই সেখানে বদ্ধ হয়ে পড়বে। অগ্রসর না হলে নূতন নূতন দর্শন হয় না। নূতন কোনও অবস্থাও লাভ হয় না।' এই সময়ে আর একদিন মধ্যাহ্নে গোসাঁই ভাবাবেশে বলে উঠেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমারও, তোমারও লীলা নিত্য।' এই বলে দুর্গা-স্তব আবৃত্তি করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। সমাধি ভাঙলে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমারও লীলা নিত্য, এ-কথা কাকে বললেন?' প্রভু বলেন, 'ভগবতী দুর্গা এসেছিলেন। তিনি বললেন, "তুমি কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা নিত্য বল। কেন, আমার লীলা কি নিত্য নয়? দেখ দেখি!" এই বলে তিনি সব পুত্র-কন্যার সঙ্গে প্রকাশ হয়ে আশ্চর্য লীলা দর্শন করাতে লাগলেন। বড়ই চমৎকার। তাই বললাম, "তোমার লীলাও নিত্য।"' পরে আবার বলেন, 'যোগ বড় কঠিন কথা। আমাদের এই পন্থাকে ঠিক যোগ বলে না, যোগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়ে সর্বপ্রথম যে সাধন করেছিলেন, "তপ, তপ" বাণী শ্রবণ করে তিনি যেভাবে তত্ত্ব জানতে চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের এই সাধনাও তাই। আমাদের সাধন সমস্তই ভিতরের ক্রিয়া, বাহিরের কিছুই নয়। **সর্বদা শম, সন্তোষ, বিচার ও সৎসঙ্গ চাই।**' একটু থেমে প্রভু আবার বলেন, 'এই চারটির সঙ্গে আরও চারটি নিয়ম রক্ষা করা কর্তব্য—**স্বাধ্যায়, তপস্যা, শৌচ আর দান।**

১. '**স্বাধ্যায়** শুধু অধ্যয়ন নয়। গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ করাকেও স্বাধ্যায় বলে। ইহাই প্রকৃত স্বাধ্যায়। নাম করতে করতে অবসাদ বোধ হলেই কিছুক্ষণ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে নেবে।
২. '**তপস্যা** এখন থেকেই খুব অভ্যাস করবে। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যত প্রকার তাপ আছে, কিছুতেই যেন চিত্তটিকে বিচলিত না করে। ত্রিতাপের জ্বালা বড় জ্বালা। শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, নিন্দা-প্রশংসাতে মনের অবস্থা যেন একই প্রকার থাকে, ধীরে ধীরে এই অভ্যাস করবে। সকল অবস্থায় ধৈর্যই তপস্যা।
৩. '**শুচি** অর্থ, সকল অবস্থায় বাহ্য ও অভ্যন্তরের পবিত্রতা। মনটিকে যেমন নির্মল রাখতে চেষ্টা করবে, বাইরেও সেই প্রকার খুব পবিত্র থাকবে। বাহ্য পবিত্রতা বিশেষ প্রয়োজন। শরীর পবিত্র না থাকলে অন্তঃশুদ্ধ হয় না। চিত্ত শুদ্ধ না হলে নামে যথার্থ রুচি, ভগবানে শ্রদ্ধা-ভক্তি কিছুই হয় না।
৪. 'প্রতিদিনই কিছু **দান** করবে। দয়া, সহানুভূতি হতেই প্রকৃত দান। প্রতিদিনই কারও না কারও ক্লেশ দূর করতে চেষ্টা করবে। অন্য কিছু না পার, কারোকে অন্ততঃ দুটি মিষ্টি কথাও বলবে—তাও দান। প্রত্যহ এ কয়টি বিষয়ে দৃষ্টি রেখে চললে আর কোনও চিন্তাই নাই।'

ধর্ম আস্বাদন করা যায়। ধর্ম যে কেবল কথার কথা নয় গোস্বামীপ্রভুর জীবন-বেদে দেখা যায় তার স্বতঃপ্রকাশ। মানুষ অমৃতের পুত্র। ধর্মকে আশ্রয় করে সাধনা দ্বারা মানুষ যে পুরাণ-পুরুষকে দর্শন করতে পারে, গোসাঁইজী নিজেই শাস্ত্রের এই নিগূঢ় তত্ত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরব্রহ্মকে লাভ করে তিনি নিজেও মধুময়, অমৃতময় হয়ে উঠেন।

গোস্বামীপ্রভুর সাধনবৈশিষ্ট্য

গোস্বামীপ্রভুর মগ্নাবস্থায় দেবী দুর্গা অনুযোগ করেছিলেন, 'তোমার কাছে কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলাই নিত্য।' এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাঁর কাছে 'কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্।' প্রকৃতপক্ষে গোসাঁই যে সাধন দিতেন, তা ব্রজের রসলীলার। এতে কুরুক্ষেত্র বা দ্বারকার ঐশ্বর্য নেই। পাঞ্চজন্যও নেই, সুদর্শন চক্রও নেই। শ্রীকৃষ্ণ এখানে নন্দদুলাল, মুরলীধর, সুদাম-শ্রীদামসখা, রাই-সোহাগী। তিনি ননীচোরা যশোদা-গোপাল। ব্রজের সহজ সরল গোপ-গোপীদের প্রাণকান্ত—কখন বা রাই-রাজার প্রজা। গোপ-গোপীরা তাঁর শ্রীমুখের কথা শুনে আশ্বস্ত—'শ্রীবৃন্দাবনম্ পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।' অর্থাৎ 'শ্রীবৃন্দাবন ছেড়ে এক পা-ও যাব না।'

সৃষ্টির আদিতে শ্রীমন্ নারায়ণের অনাহত নাদে 'তপ, তপ' প্রত্যাদেশ শুনে ব্রহ্মার মনে আসে জিজ্ঞাসা। তপস্যায় তিনি ডুবে গেলে ওঁকার তাঁর কাছে প্রকাশিত হন—যা হতে তিনটি বর্ণ—অ, উ, ম; তারপর আপনা-আপনি প্রকাশ পায় তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; তিন বেদ—ঋক্, যজুঃ, সামঃ; তিন লোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ; ও তিন বৃত্তি—জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। তন্ত্রে আছে—

> চৈতন্যরহিতামন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলাঃ।
> ফলং নৈব প্রযচ্ছতি লক্ষ কোটি জপৈরপি॥

অর্থাৎ শক্তিবিহীন মন্ত্র বর্ণসমষ্টি বই কিছু নয়। তা লক্ষ-কোটি বার জপেও ফল হয় না। সদ্‌গুরুরূপী ভগবানের কৃপাশক্তি থেকে ব্রহ্মার পরাজ্ঞান স্বপ্রকাশ হল। এই হেতু একে 'অভিধেয়' বা 'নামানুগ' সাধন বলে। আদি-গুরু নারায়ণ আদি-শিষ্য ব্রহ্মাকে এই পথের অভিযাত্রী করেছিলেন। ভগবানকে জানতে হলে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন, এই গুহ্য রহস্য এতে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপ্রভুর কৃপালীলা—**'সম্বন্ধ'**, **'অভিধেয়'** ও **'প্রয়োজন'**—এই ত্রিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—

১. **সম্বন্ধ**—শ্রীকৃষ্ণই অনাদির আদি। তিনিই জীবের সাধ্য; তিনিই জীবের লক্ষ্য। জীব তাঁর নিত্যদাস।
২. **অভিধেয়**—সাধন—নামভক্তি—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির পাথেয়।
৩. **প্রয়োজন**—প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের কাছে ধরা দেন। অতএব 'প্রেম'ই প্রয়োজন বা চাবিকাঠি।

> ভাগবতে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
> চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তাঁর করিয়াছেন লক্ষণ॥
> আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান।
> আমা হইতে সাধন ভক্তি অভিধেয় নাম॥
> সাধনের প্রেমা মূল প্রয়োজন।
> যেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন॥
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২৫।৮৫-৮৭

মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করেন, 'পূর্বাচার্যদের আশ্রমোচিত কার্য পরিত্যাগ করে আপনি কেন অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় কীর্তন, নর্তন করেন?' মহাপ্রভু উত্তর করেন, 'শ্রীপাদ, গুরু আমাকে মূর্খ জেনে কৃষ্ণমন্ত্র দিয়ে বলেন—

নাচ গাও, ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তারো ত্রিভুবন॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৭।৮৯

মহাপ্রভু আরও বলেন—

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঁই, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে, মন্ত্র করিলা পাগল॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৭।৭৮

গুরু বলেন, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ সাধনার মোক্ষই লক্ষ্য, সাত্ত্বিক কর্মের অনুষ্ঠান করে চিত্ত নির্মল হলে মোক্ষলাভ হয়।

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যে বা জপে তার কৃষ্ণে উপজায় ভাব॥
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সে প্রেমা তোমায় করিলা উদয়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৭।৮০, ৮৩

এই যে কৃষ্ণপ্রেম—একে পঞ্চম পুরুষার্থ বলা হয়। 'গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য।' সদ্‌গুরুকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তাঁর কাছ থেকে সব জেনে নিতে হয়। চতুর্বর্গ সাধনায় দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা বিচারের প্রয়োজন হয়, কিন্তু 'অভিধেয় সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার।' সদ্‌গুরুর কৃপাই এই পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমলাভের একমাত্র উপায়। কোন প্রকার স্থান, কাল, পাত্র বা অবস্থার বিচার এতে নেই। পাঁচ বছরের বালক ধ্রুব ও মাতৃগর্ভে প্রহ্লাদ ইহা লাভ করেছিলেন।

গোস্বামীপ্রভুর সাধনের বৈশিষ্ট্য—১. শক্তি সঞ্চার, ২. শ্বাস-প্রশ্বাসে অবিরাম নাম জপ ও ৩. জপগর্ভ প্রাণায়াম। প্রভু বলেছেন, 'ধানের শাঁস চাল। তথাপি তণ্ডুল রোপণ করলে অঙ্কুর উদ্গম হয় না। সতুষ ধান্য হতেই অঙ্কুর জন্মে। সদ্‌গুরু-প্রদত্ত নাম—বর্ণ নয়, শব্দ নয়। এই নামে ভগবানের অনন্ত শক্তি।' শিষ্যের ভিতর এই শক্তি-সঞ্চারই সদ্‌গুরুর সাধন। শ্বাস-প্রশ্বাসই নামের জপমালা। মালাজপ বা করগণনার কথা এই সাধনে নেই। শ্বাসে বায়ু গ্রহণ আর প্রশ্বাসে বায়ু নির্গমন প্রাণকে সঞ্জীবিত করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নাম যুক্ত হলে জীবন্ত শক্তিপূর্ণ নাম দেহাত্মবোধের মূল ছিন্ন করে। ইহাই প্রকৃতিগত সাধনের সিদ্ধি-পথ। ইহা গোস্বামীপ্রভুর সাধনের এক অভিনব পন্থা। দেহশুদ্ধির জন্য জপগর্ভ প্রাণায়ামের ব্যবস্থা। প্রভুর সাধনে প্রাণায়াম নামের অনুগত হয়ে, বাহনরূপে কাজ করে। শ্বাসরুদ্ধ হলে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু প্রাণায়াম ক্রিয়ায় নাম যখন প্রাণকে মহাপ্রাণে নিয়ে যান, তখন দেহের সঙ্গে প্রাণের তেমন সম্বন্ধ থাকে না। তখন অহং-সত্তা নামের আশ্রয়ে নাম-সত্তায় অবস্থান করে।

সবরকম কল্পনা এই সাধনের পরিপন্থী। নাম ও নামী এতে অভেদ। নাম স্বয়ং পরমেশ্বর। গোসাঁই বলেছেন, 'সৃষ্টির আদি থেকে ভগবান যত রূপে প্রকাশ হয়েছেন, হচ্ছেন এবং হবেন—এই নাম থেকেই সব রূপের প্রকাশ হবে। নাম করতে করতে কত রূপের প্রকাশ পাবে। তোমরা প্রণাম করবে, আশীর্বাদ যাচ্ঞা করবে।'

নামকীর্তন প্রচার করে মহাপ্রভু কলির কলুষ ক্ষালন করেছেন। তাঁর প্রেম-বন্যার প্লাবনে গৌর-অনুগতেরা প্রেমভক্তির স্বরূপের আস্বাদন পেয়েছেন।

গোস্বামীপ্রভু বলেছেন, 'তোমাদের সাধন দেবদুর্লভ বস্তু। মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ সাড়ে-তিনজনকে এই বস্তু দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে তখন যাঁরা পান নাই, এবার তাঁরা এই সাধন পেলেন। এঁরা যে নাম পাবেন, তখনই তা ঠিক হয়েছিল।'

অন্যান্য দীক্ষায় গুরুকৃপা ও শিষ্যের পুরুষকার, দুয়েরই প্রয়োজন, কিন্তু গোস্বামীপ্রভুর সাধনে পুরুষকার বলে কিছু নেই। ইহা একমাত্র সদ্‌গুরুকৃপা-সাপেক্ষ। গোসাঁই বলেছেন, 'সদ্‌গুরুর সাধন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।' তিনি আরও বলেছেন, 'অন্যান্য সাধনে যা পাবে, সমস্তই এ সাধনে আছে—অধিকন্তু "প্রেমভক্তি।"'

শ্বাস-প্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম যখন বসে যায়, এবং নামজপের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় না, তখন একে 'অজপা' সাধন বলে। 'অজপা' প্রভুর সাধনের উপলক্ষ। এই সাধনে নামের অনুগমন করা ছাড়া স্বতন্ত্র চলা সম্ভব নয়। নামই সকল প্রশ্নের সমাধান এনে দেন। চারা বীজ থেকে উৎপন্ন হয়ে পাতায়-ফলে-ফুলে বিরাট মহীরুহে যেমন পরিণত হয়, ঐরূপ প্রভুর সাধনে নাম হতে পরতত্ত্বের বিকাশ ও বিস্তার হয়। এই সাধন প্রসঙ্গে গোসাঁই বলেছেন ইহা 'কূর্ম্ম অণ্ড ইব' বেধ দীক্ষা। তন্ত্রে আছে—

যথা কূর্ম্মঃ স্বতনয়ান্ ধ্যানমাত্রেণ পোষয়েৎ।
বেধ দীক্ষোপদেশশ্চ মানসঃ স্যাৎ তথাবিধ॥

অর্থাৎ, কূর্ম যেমন আপন অণ্ডগুলি নদীর তটে, মাটিতে পেড়ে, জলে থেকে মনন-শক্তি প্রভাবে তা ফুটিয়ে তুলে, সদ্‌গুরুও তদ্‌রূপ স্বীয় শক্তিপ্রভাবে শিষ্যগণের পরাজ্ঞানের বিকাশ সাধন করেন।

ফলিত প্রজনন-বিজ্ঞানে দেখা যায়, শুক্রকীটের মাধ্যমে মাতা-পিতার নাক, চোখ, কান, মুখ, চুল, অবয়ব, মেধা ও প্রকৃতিগত স্বভাবাদি সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায়। গোস্বামীপ্রভুর শক্তির বিকাশও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তাঁর দেওয়া সাধনের মাধ্যমে অনুরূপভাবে ঘটে। ভগবানের অনুপম সৃষ্টিরহস্যের ন্যায় সদ্‌গুরুর লীলাও বৈচিত্র্যময়। গোসাঁইজী স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে ছাত্রশিক্ষক-সম্পর্ক নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন, ঐ বিষয়ে তাঁর শিক্ষক, অধ্যাপক, শিষ্যদের তিনি কোনও উপদেশ কখনও দিয়েছেন বলে জানা নেই। পণ্ডিত মহাশয়, কুঞ্জ-বিহারী ঘোষ, কুঞ্জলাল নাগ, কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতা, সত্যকুমার গুহঠাকুরতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পাগলা), শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সকলেই ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক। এই সকল করিৎকর্মা দরদী শিক্ষাব্রতীদের ছাত্রদের প্রতি আচরণে ছিল—অন্তরের যোগাযোগ। তাঁদের আন্তরিকতা ও চরিত্রবলে অভিভূত হয়ে, তাঁদের নির্দেশে ছাত্রগণ করতেন অসাধ্য সাধন।

অশ্বিনীকুমার দত্ত এম.এ., বি.এল. পাশ করে শ্রীরামপুর চাতরায় একটি স্কুলে প্রধানশিক্ষকের কার্যভার নিলেন। এই তরুণ প্রধানশিক্ষককে ছেলেরা মানবে কেন? ইনি আবার কি রকম শিক্ষক? ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করেন, গল্পসল্প করেন, সান্ধ্যভ্রমণ করেন, নৌকাবাচ করেন! অভিভাবকেরা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা কয়েকজন মিলে একদিন অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'ছেলেরা যে সব বিগড়ে যাচ্ছে। আপনার সঙ্গে তারা হাসি-ঠাট্টা করে, খেলা-ধুলা করে, গান

গায়! কি করে আপনি এদের বাগ মানাবেন? এত প্রশ্রয় দিলে হিতে বিপরীত হবে যে!' ওঁদের কথা শুনে অশ্বিনীবাবু হেসে বলেন, 'ছেলেদের দু-চার পাতা পড়া মুখস্থ করাবার কি সার্থকতা? তারা যাতে স্বভাবে সুন্দর হয়, প্রকৃত মানুষ হয়, ওখানেই শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব। আর ছেলেরা তো আমার সঙ্গে খোসগল্প করে না, বাজে গান করে না। তারা আমার সঙ্গে প্রার্থনা-সঙ্গীত করে, নামগান করে—এতে খারাপ কি আছে?' বছর না ঘুরতেই, এই অন্তরঙ্গ মেলামেশায়, ছেলেদের জীবনে ঋষিযুগের ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের প্রভাব এসে পড়ে। পরিণত বয়সে শ্রীরামপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শিবচন্দ্র পালিত অশ্বিনীকুমারের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ওঁর কাঁধে হাত রেখে বেড়াতাম, সময় সময় ঘাড়েও চড়েছি। কিন্তু স্কুলে তাঁর আর এক মূর্তি।' পিতার অভিপ্রায়ে ঐ স্কুল ছেড়ে যখন অশ্বিনীকুমার ওকালতি করতে বরিশাল যান, শ্রীরামপুরের অভিভাবকেরা উপলব্ধি করেন—ছাত্রদের মধ্যে নূতন জীবনের স্পন্দন দিয়ে গেছেন এই নবীন শিক্ষক। বরিশালে পসার জমে উঠতেই মক্কেলের স্বার্থে অসত্য ভাষণ করেছেন বুঝতে পেরে ওকালতি ছেড়ে পিতার অর্থানুকূল্যে তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করেন। এতে ছাত্রদের বিদ্যানুশীলন অপেক্ষা তাদের চরিত্রগঠনে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হত। তিনি ছাত্রদের মূলমন্ত্র করেন 'সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা।' অশ্বিনীবাবু যে সব উপদেশ দিতেন, তিনি নিজে তা আয়ত্ত করে নিতেন। ছাত্রদের সঙ্গে বরাবরই সমবয়স্ক বন্ধুর ন্যায় অন্তরঙ্গভাবে তিনি মিশতেন। অশ্বিনীবাবুর চরিত্রগুণে মুগ্ধ হয়ে নামমাত্র বেতনে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ত্যাগী সহকর্মী এসে জুটেন। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষের বেতন ছিল মাত্র একশ চল্লিশ টাকা।

পরবর্তীকালে ব্রজমোহন কলেজের বিরুদ্ধে সরকারী রোষাভিযোগের তদন্তে বরিশালে এলেন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ মিঃ জেম্‌স্‌ এবং রসায়নের ইংরেজ অধ্যাপক মিঃ কানিংহাম। এই বিদ্যায়তনের কোন ত্রুটি তাঁরা খুঁজে পেলেন না। অধ্যক্ষ জেম্‌স পঞ্চমুখে কলেজটির সুখ্যাতি করেন আর অধ্যাপক কানিংহাম রিপোর্ট দেন, 'ব্রজমোহন কলেজের ন্যায় এমন চমৎকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাংলায় থাকতে ভারতীয় ছাত্রেরা কেন অক্সফোর্ডে যায়, তা আমি বুঝি না।'

শিক্ষকের আদর্শরূপ যেমনটি গোসাঁই মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন, তাঁর শিক্ষক-শিষ্যদের মধ্যে তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রভুর সাধনের এমনই অন্তর্নিহিত শক্তি, শিষ্যদের মধ্যে তাই দিকে দিকে কত আলোকস্তম্ভ!

দেবেন্দ্র সামন্ত একদিন গোস্বামীপ্রভুকে প্রশ্ন করেন, 'সাধনের সময় যাকে যা বলে দেন, ও রকম চলতে না পারলে বা বিপরীত আচরণ করলে কি হবে? বিরুদ্ধাচরণ যদি কেউ করেন, তবে কি তাঁকে ত্যাগ করবেন?' গোসাঁই বলেন, 'যাঁরা উপদেশ মেনে চলেন না, তাঁদের মধ্যে এই শক্তি কিছুদিন চাপা পড়ে থাকে। কাউকে একেবারে ত্যাগ করা হয় না। এ জিনিস যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের ইহা কখনও নষ্ট হয় না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যায়।'

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা বলেন, 'সামান্য সব নিষেধ, যেমন মাংস না খাওয়া, উচ্ছিষ্ট মানা—এ-সব তো মেনে চলতে পারেন।' প্রভু বলেন, 'তাও পারে না। যিনি গুরুর আজ্ঞা পালন করেন, তিনি তো করেনই; আর যাঁর প্রতিপালন করার ইচ্ছা আছে, অথচ দুর্বলতাবশত পারেন না, তিনিও গুরু-আজ্ঞা পালন করেন। এই

সাধন যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা যদি গুরু-আজ্ঞা প্রতিপালন নাও করেন, এমন কি বিরুদ্ধে চলেন, সময়ে তাঁরাও ফল পাবেন, ইহা নিশ্চয়।'

দেবেন্দ্র সামন্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, 'যাঁরা সাধন নিয়ে গেছেন, জীবনে আর কখনও দেখা হয় নি, তাঁদের সকলকে আপনি চেনেন কি?' গোসাঁই বলেন, 'হ্যাঁ, সকলের সঙ্গেই অন্তরের যোগ আছে। প্রত্যেকের জীবনের ভাল-মন্দ যা কিছু ঘটছে, তা চোখে পড়ে।' গোস্বামীপ্রভু বলেছেন, 'সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না, গুরু করেন। সেখানে কালাকাল নাই, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই। যে কোন অবস্থায় যথায়-তথায় একমাত্র ভগবানের কৃপায়ই এ হয়ে থাকে। শিষ্যের দেহ তাঁর দেবমন্দির। ওখানে কোন অনাচার, অপচার হলে সেবক যেমন তা দেখে সংকুচিত হন, দুঃখিত হন, লজ্জিত হন—শিষ্যের কোন দুর্দশা দেখলে গুরু নিজের সেবাপূজার ত্রুটি মনে করে ম্রিয়মাণ হন।'

এবার গেন্ডেরিয়া আসার পূর্বে শ্যামবাজারের বাসায় প্রভাত-কীর্তনে একদিন মেঝেতে গড়াতে গড়াতে গোসাঁই শিষ্যদের পায়ে লুটিয়ে পড়েন। তাঁদের পায়ে মাথা রেখে কেঁদে কেঁদে বারবার বলেছিলেন, 'আমাকে দয়া করুন, আমাকে আশীর্বাদ করুন।' বলতে বলতে প্রভু সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ তাঁর ঐদিনের ডাইরীতে মন্তব্য করেন—

'আহা! তখন ঠাকুরের জটামণ্ডিত মস্তক নগণ্য শিষ্য-পদতলে লুণ্ঠিত দেখিয়া প্রাণে যে কি অবস্থা হয় বলিতে পারি না। ধন্য দয়াল ঠাকুর! আমাদের মত অবাধ্য, কলহপ্রিয়, দুর্বিনীত, দাম্ভিকপ্রকৃতি নিজ-আশ্রিতজনের চরণতলে কাতর হয়ে তিনি লুটোপুটি করেন; এ জগতে এমন আর কে আছেন?'

এবার গেন্ডেরিয়ায় একদিন আশ্রমের পাশে এক বাগানবাড়ীর পুকুরে স্নান করে উঠে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের চোখ পড়ে, আর এক পারে স্নানরতা তিনটি যুবতীর রূপলাবণ্যমণ্ডিত দেহের উপর। চোখ সরাতে তাঁর মন সায় দেয় না। স্নান করে এসে ব্রহ্মচারী গোস্বামীপ্রভুর পাশে বসতেই গোসাঁই ধ্যানস্থ হয়ে বলেন, 'গয়ার পাহাড়ের নিকট চারজন ব্রহ্মচারী, সকলেই পাহাড়ে উঠছেন। দৃষ্টি পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে। পশ্চাতে এক ব্যক্তি বেত হাতে। ব্রহ্মচারীরা পদাঙ্গুষ্ঠ ছেড়ে দৃষ্টি করলেই চটাপট বেত পড়ে। জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "উহারা চতুঃসন—সনকাদি ঋষি; যোগপন্থার প্রথম প্রবর্তক।" যোগ শিক্ষা দেন, নিজেরা না করলে বেত খান। পিছনে থেকে নারদ বেত মারেন—গুরুগিরি কি ভয়ানক! বাবা! আমি কারও গুরু নই। পরমহংসজীই গুরু। তাঁকে আর কে বেত মারবে? তিনি যে ব্রহ্মে যুক্ত—স্বয়ং ব্রহ্ম। তিনিই সব করছেন, আমি কিছুই নই। তিনি-ই সব। তিনি সবই দেখছেন, যে যা কর, সব দেখছেন। ভাল দেখছেন, মন্দও দেখছেন। ফাঁকি দেওয়ার জো নাই। গুরু সমস্তই জানেন; সাবধান।' ধ্যান ভাঙতেই ব্রহ্মচারী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'শিষ্যের অপরাধে গুরুকে বেত খেতে হয়?' গোসাঁই তাঁকে তাঁর পিঠ দেখতে ইসারা করেন; আর মমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকান। কুলদানন্দ প্রভুর পিঠে বেতের দাগ দেখে শিউরে উঠেন। অথচ তিনি ব্রহ্মচারীকে একটু শাসনও করলেন না। তিনি উপলব্ধি করলেন, তিনি স্নানরতা যুবতীদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন বলেই গুরুর এই শাস্তি! গোস্বামীপ্রভু বলেছেন, 'এই দীক্ষা ভগবানের কৃপায় একবার কারও লাভ হলে, আর নিজের কিছু করার থাকে না।

তাঁর জীবনের সমস্ত কার্য, এমন কি প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত, সেই একজনারই ইচ্ছাধীন।'

কুমীরেপোকার আরসোলা ধরার ন্যায় সদ্‌গুরু শক্তিসঞ্চার করে শিষ্যকে নিজের মত করে নেন। আরসোলা যেন শিষ্য, আর কুমীরেপোকা গুরু। আরসোলার সেই ভীতি এখানে নেই। সদ্‌গুরু এখানে শিষ্যকে তদ্‌ভাবে উল্লসিত করে ভগবতী তনু লাভ করান। ইহা এক অভিনব পন্থা। তাই প্রভু বলেছেন, 'সাধন-ভজন যদি তোমাদেরই করতে হবে, তবে আমি কেন দিবারাত্রি আসনে বসে থাকি? তোমরা রাজার বেটা।'

একদিন এক শিষ্য এসে গোসাঁইকে বলেন, 'আমার নাম আসে না, জোর করেও করতে পারি না; আমার কি উপায় হবে?' প্রভু তাঁকে বলেন, 'জোর করে কি কেউ নাম করতে পারে? তোমার কি সাধ্য যে তুমি নাম করবে? গুরুশক্তিতে নাম যখন চলবে, নাম না করে থাকতে পারবে না। তবে নাম করার চেষ্টা কর—শুয়ে, বসে, যা পার করে যাও। একবার পার তো, একবারই। কোন চিন্তা নাই। সব ভার আমার।'

আর একজন গোসাঁইকে চিঠি লিখেন, 'আপনার সাধন বড় কঠিন ব্যাপার। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা এক দুরূহ ব্যাপার। আমার দ্বারা এ-সব সম্ভব নয়। দয়া করে আপনার দীক্ষা আপনি ফেরৎ নেন।' যোগজীবন গোস্বামী চিঠিখানা পড়ে শোনান। প্রভু বলেন তাঁকে, 'লিখে দাও—সদ্‌গুরু দিতেই জানেন, নিতে জানেন না।' গোস্বামীপ্রভু বলেছেন, 'স্ত্রী-পুত্র, টাকা-কড়ি—সংসার নয়। ঈশ্বরে যে বহির্মুখতা—তাই সংসার।' প্রভুর সাধনে একাধারে যোগ ও ভোগ, বিষয় ও বৈরাগ্য, সংসার ও সন্ন্যাস, ভূবিলাস ও চিদ্‌বিলাসের সমন্বয়। গোসাঁই—স্বামী, পিতা, সন্ন্যাসী ও গুরু; দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ পরিবৃত যেন বিশ্বেশ্বর; আবার সর্বত্যাগী যোগেশ্বর শঙ্কর। গোস্বামীপ্রভুর সাধনকে তাই "শিবাচার"ও বলা হয়। তাঁর শক্তিপ্রভাবে তাঁর গৃহস্থ শিষ্যগণের মধ্যেও 'শিবাচার' স্ফুরিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'সংসারের সব কিছু নিয়েই ব্রহ্মে প্রবেশ করা যায়। ধর্ম বাইরে অনুসন্ধানের বিষয় নয়। ইহা আত্মার বৃত্তি-সকলের বিকাশ। বিশ্বাস, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতিতে পরমেশ্বরে যে নিত্যযুক্ত অবিচল অবস্থা—তা-ই ধর্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই।' জনৈক ব্যক্তি গোস্বামীপ্রভুকে তাঁর শিষ্যদের দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—'এঁরা সব বুঝি আপনার শিষ্য?' গোসাঁই উত্তরে বলেন, 'আমরা সকলে ধর্মার্থী, একত্র ধর্মযাজন করি।' প্রভু একদিন তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে বলেছিলেন, 'কেউ যদি আদর করে তোমাদের কিছু খেতে দেয়, তা আমার মুখেই আসে।' গোস্বামীপ্রভুর সাধনকে 'পরা বা প্রেমদীক্ষা'ও বলা হয়। এতে গুরুর ভিতর শিষ্য এবং শিষ্যের ভিতর গুরু বাস করেন। 'প্রেমদীক্ষা' যেন উজান-যমুনা। তুলসীদাস বলেছেন, 'সংসারের লোক "রাম, রাম" জপেন। আর রাম "ভরত, ভরত" জপেন।' শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে বলেছেন, 'বন্ধুর্গুরুরহম্‌, সখে'—সখে, আমি তোমার বন্ধু ও গুরু, দুই-ই। প্রভুর সাধনে কোন গণ্ডী বা সম্প্রদায় নেই। তিনি বলেছেন, 'এই শক্তির ক্রিয়া পাঁচ শ বছর চলবে; আমি রক্তবীজের ঝাড় রেখে গেলাম।' তারপর আবার বলেছেন, 'যাঁরা এই সাধন পেয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই সাধন দিতে পারেন কিন্তু "অহং" ত্যাগ করে। ঐ অবস্থা লাভ হলে স্ত্রী-দেহেরও দীক্ষা দিতে বাধা থাকে না;

যেহেতু ইহা পরাদীক্ষা। আত্মা থেকে আত্মায় এ-ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চারিত হয়। গুরু-কৃপায় অবস্থা লাভ হলে, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোকের পক্ষে এ-সাধনে সাধন দেওয়া স্বাভাবিক।' গোস্বামীপ্রভু আরও বলেছেন, 'গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ কি জান? পরস্পর পরস্পরে আত্মদান। তোমাদের মধ্যে একজন তাঁকে দিয়েই বসে আছেন আর একজন কখন দেবেন, এই অপেক্ষা। শক্তিদান আর আত্মদান একই কথা।'

কপিলদেব, দত্তাত্রেয়, ঋষভদেব সকলেই সদ্‌গুরু ছিলেন। তাঁরা যুগোপযোগী শক্তি সঞ্চার করেছেন। প্রেমভক্তিদাতা সদ্‌গুরু দুর্লভ। গোস্বামীপ্রভুর গুরু—স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী নানকপন্থী ছিলেন। গোসাঁইর তত্ত্বোপদেশ ও গ্রন্থসাহেবের বিষয়বস্তুর মধ্যে তাই সংহতি রয়েছে। গোসাঁই একদিন বলেছিলেন, 'তিন প্রভুর একজন নানকজীকে কৃপা করেন নাই, এ কথা কি করে বল?' 'জপজী'তে আছে, নিত্যানন্দপ্রভু নানকজীকে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। সদ্‌গুরুর কৃপা-প্রসঙ্গে নানকজী বলেছেন—

রমইয়াকে গুণ চেতি পরাণি।
কউন মূল ত কউন দৃসটানি॥

হৃদয়ভরে সেই রমণীয় প্রভুর গান কর। মূল কোথায়? আর তুমি কি দেখছ? নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। প্রভু অমৃত দৃষ্টি দিয়ে তোমার দিকে তাকিয়েছিলেন বলেই তো তুমি ছুটে এসেছ।

পূরা গুরু অখউ যাকা মংত।
অমৃত দৃষ্টি পেখই হোয় সংত॥

যিনি পূর্ণ গুরু, তাঁর মন্ত্র—অক্ষয়। তাঁর অমৃত দৃষ্টি যাঁর উপর পড়ে, তিনি সাধু হয়ে যান। গুরুর স্মরণ-মননে শিষ্য সাধু হয়ে যান।

অপুনে জন্‌কা পরদা ঢাকে।
অপুনে সেবককী সব পর রাখে॥

পক্ষীমাতা যেমন নিজের বাচ্চাদের পাখা দিয়ে ঢেকে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করে, সদ্‌গুরু তেমনই আপন আশ্রিতজনকে করুণার পর্দায় ঢেকে সকল আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

গোস্বামীপ্রভু নিজে প্রতি সন্ধ্যায় নানকজীর একটি ভজন গাইতেন—

হরিসে লাগি রহরে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই॥
ওঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুধন কসাই।
শুয়া পড়ায়েকে গণিকা তারে, তারে মীরাবাই॥
দৌলত দুনিয়া, মাল খাজানা, বেণীয়া বয়েল চড়াই।
এক বাৎমে ধান্ড লাগে, খোঁজ-খবর নাহি পাই॥
এয়সা ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা-বন্দন ঔর অধীনতা, সহজে মিলারে গোসাঁই॥

গুরু নানকজী বলেছেন, 'ভাইসব, হরিনামে লেগে থাক। তোমাদের ভাল না লাগলেও লেগে থাক। বিষয়-রসপুষ্ট বিদ্রোহী মনে, বিপরীত বোধ হলেও, ক্রমে মন বসে যাবে। দীন-দরিদ্র ওঙ্কা তরে গেল, বঙ্কা তরে গেল নামকৃপায়। কসাই সুধনও তরে গেল, পাপ-ব্যবসায়ী গণিকা তরে গেল—এত ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে, মীরাবাইও পার পেলেন নামকৃপায়। তোমরা দীন-দরিদ্র-ই হও, জীবিকার জন্য হীন

ব্যবসা-ই কর, নাম ধরে থাকলে নাম কৃপা করবেন। সকল প্রকার কপটতা পরিহার করে, হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ কর। সেবা, বন্দনা আর অধীনতা তোমাদের সঙ্গী হউক। তাহলে সহজেই ভগবান লাভ করবে।'

গোস্বামীপ্রভু দুঃখ করে বলেছেন, 'পরমহংসজী তিনটি বস্তু আমাকে দিয়েছিলেন। তার দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির অধিকারী কাউকে পেলাম না; তবে এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, সময়ে সকলেরই তা লাভ হবে।'

২৪ শ্রাবণ, ১২৯৯ সাল। মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাবার পর গোসাঁই ভাবস্থ হয়ে বলেন, 'আহা! কি সুন্দর! কি শোভাই না হয়েছে! ঝুলনের সিংহাসনে ভগবতী দুলছেন!' ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায়?' প্রভু বলেন, 'তা কি বলা যায়? চোখে পড়ল, তাই বললাম; বোধহয় ঢাকাতেই।'

পরদিন ঝুলন-পূর্ণিমা। গোসাঁইর একান্ন বর্ষ পূর্ণ হল। আমগাছের নীচে চাঁদোয়া টানান হয়েছে। নামব্রহ্মের মন্দিরও পরিপাটি করে সাজান হয়েছে। ছেলেদের উৎসাহের অন্ত নেই। শিষ্যেরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। আদ্যাশক্তি যোগমায়া দেবীর পট গোসাঁইজীর ছবির বামে ও রাধাকৃষ্ণের পট সুসজ্জিত জলচৌকিতে পাশাপাশি বসিয়ে দোলান হয়। ঘণ্টা তিন ধরে কীর্তন চলে। রাত ভোর না হতে প্রভু বলেন, 'আহা! আমগাছটি বড় কষ্ট পাচ্ছে! যন্ত্রণায় সারারাত আমার কেটেছে।' ফর্সা হলে সকলে আমতলায় যান। এক জায়গা থেকে রস পড়ে। গাছে ঐখানে এক পেরেক আঁটা। চাঁদোয়া টানাবার সময় বসান হয়ে থাকবে। গোসাঁই বলেন, 'শীগ্‌গির পেরেক উঠাও। আর কখন গাছে তোমরা পেরেক বসাবে না।' রক্তের মত লাল রস ঐখান দিয়ে পড়ছিল। গোসাঁই প্রতিদিন সকালে আসন থেকে উঠে পাখিদের জন্য যেমন চাল ছড়িয়ে দেন, ঐরূপ বৃক্ষলতাদির কাছে গিয়ে তাদেরও খোঁজ-খবর করেন। তারা নাকি প্রভুর সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে। উদ্ভিদরাজিও নাকি আপন-আপন বিষয়ে সংবেদনশীল।

গেণ্ডেরিয়ায় আশানন্দ বাউলের আখড়া। এঁর পূর্বাশ্রমের নাম আনন্দচন্দ্র সেন। ঢাকায় তিনি উকিল ছিলেন। একদিন তিনি প্রভুকে কুটীরে একা পেয়ে বলেন, 'গোসাঁই, আমার দশ হাজার শিষ্য। তারা আমাকে অবতার বলে জানে। আপনার কি মনে হয়?' প্রভু বলেন, 'কৈ? কিছুই তো বুঝতে পারি না।' এই বলেই তিনি চোখ বোজেন। আশানন্দ ফিরে যান। পরদিন অপরাহ্নে গোসাঁই এসে আমতলায় আসনে বসতেই ভক্তসমাগম হয়। শ্রাবণের শেষ; থমথমে ভাব। তথাপি স্থানটি বড় শীতল। আশানন্দের এক শিষ্য এসে প্রভুর কাছে বসেন। আচমকা যেন তাঁকে ভূতে পায়! প্রভুকে লক্ষ্য করে তিনি বলে উঠেন, 'শহরে বুঝি আর কল্‌কি জুটে না? তাই জংগলে এসে সাধু সেজেছেন! অদ্বৈতবংশের কুলাঙ্গার! পৈতে ফেলে, জাতি নাশ করে, কত লোককে ক্ষেপিয়ে তুলে ওঁদের সর্বনাশ করেছেন! ব্রাহ্মণকেও আবার দীক্ষা দিচ্ছেন! গোসাঁইরা কে, কোথায়, কবে পৈতা ফেলে দীক্ষা দিয়েছেন?' তাঁর উক্তি শেষ না হতেই গুরুগম্ভীর হুঙ্কার শোনা যায়, 'পৈতে নেই? দশগণ্ডা পৈতে এখনই বের করে দিতে পারি। তুই অন্ধ! তুই কি করে দেখবি?' 'এ কি, এ কি?' বলে চীৎকার করে সুভঢ্যার যদুবাবু মূর্ছা যান। সোরগোলের মধ্যে আশানন্দের সাকরেদটি গা ঢাকা দেন। চৈতন্য লাভ করে যদুবাবু বাড়ী চলে যান। পরাহ্নে এ নিয়ে কথা উঠে। ব্রহ্মচারী গুরুকে বলেন, 'লোকটিকে যা ধমক দিয়েছিলেন, সে কাঁপতে কাঁপতে পালিয়ে গেল। কাউকে ঐভাবে কখনও বলতে

আপনাকে শুনি নি তো!' গোসাঁই বলেন, 'কৈ? আমার তো কিছু মনে পড়ে না। তবে আমার পাশে দাঁড়িয়ে একজন ব্রাহ্মণ কি যেন বলে উঠেন। তোমরা বোধহয় তাঁকে লক্ষ্য কর নাই।' একটু থেমে আবার তিনি বলেন, 'আশ্চর্য! মহাত্মাদের ভিতর দিয়ে কত রকম ঘটনাই না ঘটে! ভগবানের আশ্রিতজনের প্রতি কোন রকম শ্লেষ, বিদ্রূপ হলে তা তাঁরা সহ্য করেন না। মহাজনেরা যখন শাসন করেন, তা এরূপই হয়।' যদুবাবু তখন এসে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, 'লোকটি যখন প্রভুকে উদ্দেশ্য করে আবোল-তাবোল বলছিল, তখন দেখি একজন গৌরবর্ণ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণ প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে লোকটিকে ধমকালেন। তাঁকে দেখেই আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি।' একদিন রাত্রে শান্তিসুধা বলেন, 'বাবা, সনাতনবাবুর আখড়ার বিহারীলালজীর মালপোয়া প্রসাদ পাবার বড় ইচ্ছা হয়।' গোসাঁই বলেন, 'আচ্ছা, বিহারীলালজীকে জানিয়ে দিলাম। আগামী দিন জগবন্ধু বেলা দশটায় গিয়ে যেন আশ্রমের নাম করে প্রসাদ চান।' সেবক আদর করে প্রচুর পরিমাণে মালপোয়া প্রসাদ দিয়ে বলেন, 'আমাদের এখানে দিনের বেলা অন্নভোগ হয়। আজ এক ধনী এসে মালপোয়াভোগের ব্যবস্থা করেছেন।' আশ্রমবাসীরা সকলে তৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পান। শান্তিসুধা বলেন, 'এত সুস্বাদু মালপোয়া আর কখনও খেয়েছি বলে মনে হয় না।'

গোসাঁই কুলদানন্দকে বলেন, 'ব্রহ্মচারী, প্রার্থনা করলেই কিন্তু তা মঞ্জুর হবে, সাবধান।' কুলদানন্দজী একদিন একটি পাকা বেল পান। মনে মনে তিনি ভাবেন, 'বেলপানা ঠাকুরের বড় প্রিয়, ঘোল যদি মিলে, বড় ভাল হয়।' ঠিক তখনই 'দৈ নেবে গো?' হাঁকতে হাঁকতে এক গয়লানী আসে আশ্রমে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করেন—

—ঘোল আছে?
—আছে, কতটা চাই?
—আধ সের।
—ভাঁড় আনুন।

খেয়াল হয় ব্রহ্মচারীর—তাই তো, পয়সা যে নেই। অকপটে তিনি বলেন, 'না গো নিব না। পয়সা নেই।' গয়লানী খানিক দূর গিয়ে ফিরে আসে। ব্রহ্মচারীকে বলে, 'কোথায়, ভাঁড় কোথায়? পয়সা লাগবে না, যত খুশি নিন।' কুলদানন্দ ইতস্তত করেন। গয়লানী বলে, 'না নেবেন তো সব ঘোল ফেলে দেব।' ব্রহ্মচারী পাত্র এগিয়ে দেন। সের দেড়েক ঘোল দিয়ে সে বিদায় নেয়।

গোসাঁইর দেবদুর্লভ সাধনে পূর্ববঙ্গে পড়ে হৈ-চৈ। আশানন্দ বাউলের ঘটে অন্তর্দাহ। শিষ্যকে দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টায় ঢাকার লোকেরা তাঁর পেছনে লাগে। চক্রান্ত করে প্রভুর আহার্য বস্তুতে একদিন আশানন্দের এক শিষ্য বিষ মিশিয়ে দেয়। চার-পাঁচ দিন ভুগে গোসাঁই নিরাময় হয়ে উঠেন। এরপর একদিন আশানন্দের শিষ্য রামচন্দ্র দাস আশ্রমে এসে গোস্বামীপ্রভুকে প্রণাম করে সখেদে বলেন, 'প্রভো, ধর্মলাভের উদ্দেশ্যে কি কুকর্ম করতে হয়? গর্হিত কর্ম যদি ধর্ম হয়, তাহলে অধর্ম কি?' এই বলে তিনি কেঁদে বলেন, 'আমি বড় দুরাচার। আমার ন্যায় মহাপাপীর উদ্ধারের কোন উপায় আছে কি?' তাঁর কথা শুনে গোসাঁই বড় অভিভূত হন। তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই আছে। তুমি অনুতপ্ত; তোমার ভয় নাই। যে পাপ করে, সে যদি অনুতাপানলে দগ্ধ হয় এবং

পাপের কথা অকপটে প্রকাশ করে, ভগবান তাকে অবশ্যই উদ্ধার করেন।' লোকটি চলে গেলে প্রভু বলেন, 'এর সরলতায় আমি বড় মুগ্ধ হয়েছি। জগতে সরলতার বড় অভাব। আজ এই লোকটির কথা শুনে আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেছে।'

গোস্বামীপ্রভুর জননী শ্যামবাজারের বাড়ী থেকে শান্তিপুর ফিরে গিয়েছিলেন। শারদীয়া পূজার পূর্বে তাঁর উন্মাদের পূর্বলক্ষণ নিজেই টের পেয়ে গৃহ-বিগ্রহকে বলেন, 'শ্যামসুন্দর, আমাকে বিজয়ের কাছে রেখে এস।' স্টীমারে তিনি কলিকাতা রওনা হন। একজন সহযাত্রী তাঁকে গুরুচরণ মহালনবীশের গৃহে পৌঁছিয়ে দেন। নবকুমার বাগচী ও যোগজীবন তখন কলিকাতায় ছিলেন। তাঁরা সংবাদ পেয়ে তাঁকে গেন্ডেরিয়া পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। ছেলের সঙ্গে দেখা হতেই একখানা উত্তরীয় তাঁর হাতে দিয়ে বলেন, 'শ্যামসুন্দর এইখানা তোকে দিয়েছেন।'

বানাড়িপাড়ার জমিদার নারায়ণ ঘোষের ছেলে নরেন এই সময় গেন্ডেরিয়ায় গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন পায়। তাঁর বয়স মাত্র চোদ্দ। এই কিশোরের প্রশ্নে গোসাঁই বহু তত্ত্ব প্রকাশ করেন।—

—আমাদের কি পরিত্রাণ হবে?

—হ্যাঁ, হবে।

—আপনি কি সর্বদা আমাদের কাছে থাকেন?

—হ্যাঁ, নাম কর, চোখ খুলে যাবে।

—সাধন নিলে কি রিপুর উত্তেজনা বাড়ে?

—হ্যাঁ, যেমন নির্বাণের পূর্বে আগুন বাড়ে। বেড়েই চিরকালের তরে নিভে যায়।

—রিপুর উত্তেজনা বাড়লে কি উপায়?

—নামের উত্তেজনাও বাড়াতে হয়।

—মহাপ্রভুর ভক্তেরা সকলেই কি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তাঁর কত সহস্র ভক্ত ছিল। সকলেই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন? এ কেমন কথা?

—হ্যাঁ, তাঁরা ভগবানের প্রতি-অবতারকালে সঙ্গে সঙ্গে আসেন। এইভাবে যুগ-যুগ চলবে।

—মহাপ্রভু কি স্বয়ং ভগবান-অবতীর্ণ?

—হ্যাঁ।

—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং নবদ্বীপে মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, যোগমায়া অবলম্বন করে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবান একই সময়ে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করে থাকেন। তা জীবে কি বুঝবে?

—বুদ্ধদেব কি স্বয়ং ভগবান-অবতীর্ণ?

—হ্যাঁ।

—যীশুখ্রীস্ট কি?

—স্বয়ং ঈশ্বর-অবতীর্ণ।

—তিনি মাছ-মাংস খেতেন কেন?

—অজ্ঞবৎ খেতেন। তৎকালীন লোকের আমিষ আহার প্রকৃতিগত ছিল।

—আপনি সকলের কাছে বলতে পারেন যে, ভগবান বুদ্ধ, খ্রীস্ট ও চৈতন্য-

রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন?

—স্বচ্ছন্দে।

—ভগবান যতবার অবতীর্ণ হয়েছেন, তার মধ্যে চৈতন্যলীলাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ?

—হ্যাঁ, এমন লীলা আর হয় নাই।

—বেশি-ই বা কি হল? ভারতের অতি সামান্য অংশে তিনি প্রেমভক্তি বিলিয়েছিলেন!

—না, সেই লীলা শেষ হয় নাই। কেবল তাঁরা কয়েকদিন থেকে, উঁকি মেরে অন্তর্ধান করেছেন। দেখ না, এখন খ্রীস্টানাদি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন মৃদঙ্গ বাজে। এমন দিন আসবে যখন সব মৃদঙ্গময় হবে।

—কলিযুগে ভগবান যতবার অবতীর্ণ হলেন, অন্যান্য যুগে তো এত নহে?

—কলিযুগে অনেক অবতার। আরও অবতীর্ণ হবেন।

—কলিযুগে অবতারের কি কোন বর্ণ-নির্ণয় আছে?

—না, তা কিছু নাই।

—নিত্যানন্দ কি?

—অংশাবতার বলরাম।

—অদ্বৈত কি?

—অংশাবতার মহাবিষ্ণু।

—নিতাই না অদ্বৈত শ্রেষ্ঠ?

—নিতাই, অদ্বৈত ভগবানের অঙ্গ। কেহ ছোট-বড় নয়। উভয়ে সমান।

—নানক কি?

—অংশাবতার।

—অনেকে বলেন, অন্য সাধু-মহাত্মাদের সেবা করার বা তাঁদের সঙ্গ করার প্রয়োজন কি? গুরুকে ভক্তি করলে সব হল। এ কিরূপ?

—যারা অন্য সাধুদের ভক্তি করতে জানে না, তারা গুরুকেও ভক্তি করতে জানে না।

—আপনি নাকি যার যেমন বিশ্বাস, তাকে তেমনই বলে থাকেন?

—না, তা নয়। ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন ঔষধ, আমাশায় তা বিষ।

—প্রেম-ভক্তি লাভ হয় কি করে?

—প্রেম-ভক্তি সহজ নয়। তা কেউ কাউকে দিতে পারে না। কারও কারও সৌভাগ্যে লাভ হয়ে যায়। এখন পড়া-শুনা কর। তোমার পক্ষে পিতৃপূজা, পিতৃ-আজ্ঞা পালনে সব হবে।

—প্রেম-ভক্তি কেউ কাউকে দিতে পারে না?

—না।

—নিত্যানন্দপ্রভু নাকি প্রেম বিতরণ করেছিলেন?

—হ্যাঁ, তিনি পারেন।

—তিনি এখন কোথায়?

—সর্বত্র।

—অদ্বৈতপ্রভু?

—সর্বত্র।

—মহাপ্রভু?

—সর্বময়।

—মাছ খাব কিনা?

—অপরাধ বলে মনে হলে খাবে না।

—আমার খেতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু গুরুজন অসন্তুষ্ট হন।

—তাঁদের কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করবে। পা ধরে বলবে যেন মাছ ছাড়ার অনুমতি দেন।

ঘরে-বাইরে নরেন সকলেরই প্রিয়। তার সরল, সুন্দর স্বভাবে সকলেই মুগ্ধ। বরিশালে সে পড়াশুনা করে। সাধন পেয়ে বাড়ী ফিরে সে দেখে, তার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন সবাই তার উপর বিরূপ। সুশীল, সুবোধ বালকটি স্বগৃহে যেন বিভীষিকা হয়ে উঠে। উপবীতত্যাগী ব্রাহ্মের কাছে কেন সে দীক্ষা নিল? বস্তুত তাঁর প্রহ্লাদের অবস্থা! নিগ্রহের ভয়ে গোস্বামীপ্রভুর একখানা ছবি সে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল। কিশোরের কাছে গোসাঁইকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে একজন উৎসাহের আতিশয্যে সংগোপনে-রক্ষিত ছবিখানি ছুঁড়ে ফেলেন। গুরুগত-প্রাণ নরেনের এতে ঘটে ধৈর্যচ্যুতি। সে ফটোখানা কুড়িয়ে, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করে, 'প্রভো, আমি আর পারি না। আমাকে উদ্ধার কর।' ঐ সময় পূজার ছুটি শেষ হওয়ায় নরেন বরিশালে চলে যায়। ওখানে পৌঁছেই তার কলেরা হয়। তাতেই তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুসময় বানাড়িপাড়ায় শুধু তাদের বাড়ীতে গুড়ি-গুড়ি রক্তবৃষ্টি হয়। নরেন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সুবুদ্ধি ফিরে আসে। নরেন্দ্রের পিতৃব্য যোগেন ঘোষ গোস্বামীপ্রভুর কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেন, 'প্রভো, আপনার চরণে আমরা অসংখ্য অপরাধ করেছি। আমাদের শাস্তিও হয়েছে। আমাদের নয়নমণি নরেনকে আমরা হারিয়েছি। আপনি মহাজন, এ বিশ্বাস যদি আমাদের পূর্বে হত, তাহলে নরেনকে আমরা এভাবে হারাতাম না! তার বিচ্ছেদে আমরা জীবন্মৃত হয়ে আছি। কৃপা করে তাকে যদি একবার আমাদের দেখান তাহলে সাধ মিটিয়ে তাকে দেখি! আপনি ইচ্ছা করলেই তা পারেন।' যোগেনবাবুর চিঠি পড়ে গোসাঁইকে শোনান হয়। তিনি জগদ্বন্ধুবাবুকে বলেন, 'লিখে দাও, নরেন্দ্রকে দেখাবার এখন সুবিধা হবে না। সে ভ্রূণস্থ হয়েছে। তাছাড়া ওকে দেখলে এখন সান্ত্বনা না পেয়ে আরও বেশি ক্লেশ পাবেন।' কয়দিন পর নারায়ণ ঘোষ নৌকাডুবি হয়ে মারা যান। গোসাঁই-শিষ্যদের ধারণা, নরেন পূর্বজন্মে নরোত্তম ঠাকুর ছিলেন।

স্বর্ণময়ী দেবী একাই গেছেন বুড়ীগঙ্গায়, স্নানে। ফিরতে দেরি দেখে সকলেরই হয় অস্বস্তিবোধ। প্রভুও জিজ্ঞাসা করেন, 'মা ফিরেন নাই?' উকিল ললিত গুপ্ত বসে ছিলেন গোসাঁইর কাছে। তিনি খুঁজতে বের হন। 'ঠাকুরমা, ঠাকুরমা' বলে হেঁকে চলেন নদীর দিকে। এক ঝোপের আড়াল থেকে স্বর্ণময়ী দেবী বলে ওঠেন, 'ললিত, আমি এখানে।' তাঁর কথা শুনে ললিতবাবু আশ্বস্ত হয়ে তাঁকে বলেন, 'ঐখানে কি কচ্ছেন? শীগ্‌গির বেরিয়ে আসুন।' স্বর্ণময়ী দেবী তাঁকে বলেন, 'কি করে আসব? আমার পরণে যে কিছু নেই। এক যুবতীকে স্নান করে ফিরার পথে দিয়ে এসেছি। তার গায়ে যে কাপড় ছিল, তা এমনই জীর্ণ, তাতে তার লজ্জা নিবারণ হচ্ছিল না।' ললিতবাবু তাঁর গায়ের চাদর ছুঁড়ে দেন। তা পরে ললিতবাবুর সঙ্গে স্বর্ণময়ী দেবী আশ্রমে ফিরে আসেন। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলেন।[১]

মহেন্দ্র মিত্র ঐদিন রাত্রে গুরুকে বলেন, 'জীবনে কম সাধুর সংস্পর্শে আসি নি, কিন্তু আপনার সমকক্ষ একজনকেও দেখি নি! তবে হ্যাঁ, আপনার চেয়েও দয়ালু একজনকে দেখেছি, যিনি দয়াবৃত্তিতে আপনাকেও হার মানিয়েছেন।' গোসাঁই জিজ্ঞাসা করেন, 'কে তিনি?' মহেন্দ্রবাবু সস্মিত হাস্যে বলেন, 'আমাদের ঠাকুরমা—স্বর্ণময়ী দেবী।' গোস্বামীপ্রভু সজল চোখে বলেন, 'তাঁর দয়ার ছিটে-ফোঁটা পেয়েই আমরা কৃতার্থ হয়েছি। সত্যই তাঁর দয়ার তুলনা নাই। তিনি অনন্য-সাধারণ। কেবল যে মানুষের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে, তা নয়। তাঁর দয়া থেকে ভূত-প্রেতও বঞ্চিত হয় না। অশরীরীদের উদ্দেশ্যে তিনি গর্ত খুঁড়ে খাবার রেখে মাটি চাপা দেন।'

মুক্তকেশী দেবীর সঙ্গে স্বর্ণময়ী দেবীর কথা-কাটাকাটি অদ্ভুত ধরনের। স্বর্ণময়ী দেবী যখন-তখন মুক্তকেশীর পেছনে লাগেন। মুক্তকেশী দেবীকে বলেন, 'মেয়ে মরেছে, এখন আর এখানে কেন? বিজয়ের সঙ্গে এখন আর কি সম্পর্ক? মাতব্বরী আর চলবে না। আমার ছেলের আবার আমি বিয়ে দেব।'

মুক্তকেশী দেবী কাজের চাপে এ-ঘর ও-ঘর করেন। স্বর্ণময়ী দেবী তখন ঐসব কথা বলে পিছনে পিছনে ফিরেন। মুক্তকেশী দেবীর সঙ্গে যখন কথায় পেরে ওঠেন না, তখন নিজের কানে আঙুল দেন। এদিকে আবার মুক্তকেশী দেবী আহারে বসার পূর্বে বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্বর্ণময়ী দেবী ক্ষীর, দই, মিষ্টি, কলা যা জুটে নিয়ে এসে মুক্তকেশী দেবীর সামনে ধরে বলেন, 'বেয়ান, ঝগড়ার সময় ঝগড়া, তা খাবার সঙ্গে কি? নাও এ-সব বেশ করে খাও। আহা! তোমার দুঃখ, ক্লেশ কে বুঝবে? থাকতেও তোমার কেউ নেই। আমি পাগল মানুষ। কখন কি বলি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আমার কথা গায় মেখ না।'

গোস্বামীপ্রভুর জননী স্বর্ণময়ী দেবী ছিলেন এক অলোকসামান্যা মহীয়সী রমণী। তিনি ছিলেন মায়ামুক্ত, সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন করুণার প্রতিমূর্তি। এক কথায় 'দয়াময়ী'।

স্বর্ণময়ী দেবীর তিরোধান ও শেষকৃত্য

পূজার ছুটি হতে না হতে হরিদাসবাবুর মন গুরুসঙ্গ লাভের জন্য উতলা হয়ে উঠে; তিনি ঢাকায় ছুটে আসেন। বুড়ীগঙ্গায় সতীর্থদের সঙ্গে স্নানে যাবার সময় তাঁদের মুখে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য শুনে তিনি প্রতিবাদ করেন। তাঁদের বলেন, 'কেনই বা সমাজে এসেছিলে? এখন গোস্বামী মহাশয়ের রুজি-রোজগার নেই অথচ তাঁর উপর দিব্যি গলগ্রহ হয়ে আছ।'

ও'রাও ছাড়বার পাত্র নন। একজন বলেন, 'মহাশয়, ঢের ব্রাহ্ম দেখেছি। আপনি আর কি করেছেন? পৈতে ফেলতে হয় নি, অসবর্ণ বিবাহ করেন নি, বিধবা-বিবাহও করেন নি! আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে পৈতে ছিঁড়েছি, শুঁড়ির বিধবা মেয়ে বিয়ে করেছি। সাহেব, মুসলমানদের সঙ্গে খানা খেয়েছি। বেশি আর

---

[১] মনোহরপুকুর রোডে বাগানবাড়ীতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্রের মুখে শোনা।

বকবেন না। কিছু দিন সবুর করুন, সব চুরমার হয়ে যাবে। গোসাঁই আপনার দফারফা করবেন।' হরিদাসবাবুও নাছোড়বান্দা। তিনি উত্তর করেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের মত অপদার্থ হলে হয়।'

নবমীপূজার দিন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বলি দেখে হরিদাসবাবুর মন বিগড়ে যায়। গোস্বামীপ্রভু হরিদাসবাবুকে বলেন, 'পট্টডুরী দিতে হয়; পূর্বপুরুষদের ধারা বজায় রাখা ভাল।' হরিদাসবাবুর কানে যায় না যেন। গোসাঁই তাঁকে আমগাছটি দেখিয়ে বলেন, 'দেখুন, কেমন মধু ঝড়ছে।' হরিদাসবাবু বিজ্ঞের মত বলেন, 'পাতা গজাবার সময় এ-রকম হয়ে থাকে।' সতীর্থদের কাছে শুনেন, সাধন-কুটীরে প্রকাণ্ড এক বিষধর সর্প আছে। তিনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার গায় নাকি সাপ উঠে?' গোস্বামীপ্রভু সংক্ষেপে উত্তর করেন, 'হ্যাঁ।' হরিদাসবাবু গুরুকে প্রশ্ন করেন, 'সাপ কেন আপনার গায় উঠে?' গোসাঁইজী তাঁকে বলেন, 'আমার শরীর শীতল বলে; আর ভ্রূর মধ্য থেকে একরকম ধ্বনি বের হয়। তা সাপের বড় প্রিয়।' হরিদাসবাবু আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'শিবের মাথায় কি এরই জন্য সাপ থাকে?' প্রভু বলেন, 'হ্যাঁ।' এই সময় স্বর্ণময়ী দেবীর মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ছেলের ঘরেই মায়ের থাকার ব্যবস্থা হয়। একদিন দুজন নামজাদা ওস্তাদ আসেন গোসাঁইকে বাজনা শোনাতে। ঘরে লোকে লোকারণ্য। বাদ্য শুরু হতেই প্রভুর জননী ছুটে আসেন। স্বর্ণময়ী দেবী বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নাচতে থাকেন। ঘরের এক কোণে রাখা রাধাকৃষ্ণ-মূর্তি তাঁর পায়ে লেগে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। গোসাঁই নিরুদ্বেগ, কোন বৈলক্ষণ্য নেই, প্রশান্ত-বদন। আসর ভাঙতেই লোকজন চলে যায়। প্রভু কুঞ্জবিহারী ঘোষকে বলেন, 'মাকে সাধন-কুটীরে রেখে বাইরে থেকে শিকল এঁটে দাও।' তাঁর এই ব্যবস্থার কথা শুনে হরিদাসবাবু বলেন, 'সাধন-কুটীরে সাপ রয়েছে, যদি কামড়ায়।' প্রভু তাঁকে বলেন, 'মার যা দাপট ও পায়ের চোট, ভয়ে সর্পরাজ গর্ত থেকে বের হতে পারলে হয়! সশঙ্ক রাত্রি যাপন করেন হরিদাসবাবু। ভোর হলে স্বর্ণময়ী দেবীকে অক্ষত দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, গোস্বামী মহাশয় নিন্দা-প্রশংসা, ঘৃণা-লজ্জার অতীত। মায়ের নাচ তাঁর অন্তর স্পর্শ করে নি। কে কি মনে করে, তাঁর মনে উদয় হয় নি। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, সাপ তাঁর মায়ের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

গোসাঁইর দেবদুর্লভ অবস্থার কথা শুনে অভয়নারায়ণবাবুর ভাই হরিনারায়ণ রায় প্রভুকে স্বচক্ষে দর্শন করার ইচ্ছায় গেণ্ডেরিয়া আসেন। গোসাঁই আমতলায় বসে দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় তাঁর মার পাগলামি শুরু হয়। পরনের থানধুতিখানা পাগড়ির মত করে মাথায় বেঁধে উলঙ্গ হয়ে নেচে নেচে তিনি গান ধরেন। প্রভুর ছলছল আঁখি। মার পানে তাকিয়ে নৃত্যের তালে তালে তিনি তুড়ি দিয়ে 'আহা, আহা' করেন। এ দৃশ্য দেখে সকলে স্তম্ভিত। হরিনারায়ণ রায় বলেন, 'ঐ একটি মাত্র ঘটনা থেকে গোসাঁইকে পরখ করে নিলাম। কোন সংশয়ের আর অবকাশ রইল না।'

গোস্বামীপ্রভু তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে রাসপূর্ণিমার দিন থেকে মৌনব্রত নিলেন। ব্রত নিয়ে তিনি কথাবার্তা বন্ধ করে দেন। আকারে, ইঙ্গিতে, ইশারায় বক্তব্য বুঝাতেন। কখনও বা ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতের তেলোতে লিখে দিতেন। প্রশ্নের সমাধান খাতায় লিখতেন। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে

হাততালি দিতেন। আশ্রমবাসীরা কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর ইশারা ও ইঙ্গিত ও অস্ফুট কথা অনুধাবন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। ব্রত নিয়ে প্রভু নিজে কোন চিঠি পড়তেনও না, লিখতেনও না। মৌনী হবার পরই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক থেকে তাঁর কাছে আসে একখানা চিঠি। এতে ছিল ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ কমিটির সভ্যপদে তাঁর যোগ দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ। জগদ্বন্ধুবাবু চিঠির মর্ম পড়ে শোনান। তাঁকেই উত্তর দিতে ইশারা করেন আর কি লিখতে হবে, তারও খসড়া স্বহস্তে লিখে দেন। তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের মধ্যে নেই। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম। সত্য জানবার জন্য সকল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান নিজে করে জানতে হবে। সুতরাং যাগ-যজ্ঞ, মালা-তিলক, জটাজুট, ভস্ম, ব্রত, উপবাস কিছুই অবজ্ঞা করা যায় না। এজন্য তিনি সকল দলেই যোগ দিতে পারেন। সাধারণ বাহ্যবস্তু জানতে কত শিক্ষার প্রয়োজন। ধর্মতত্ত্ব জানতে অধিক শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি মৌনী হয়েছেন, তীর্থাদি ভ্রমণ করেন। সর্বভূতে ভগবদ্‌-অধিষ্ঠান দেখে প্রতিমা প্রণাম করেন। ভগবান বিশেষ প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন, বিশ্বাস করে থাকেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করেছেন। এজন্য তিনি বলেন, 'তফাৎ থাকাই সার কথা।'

অগ্রহায়ণ মাসে (১২৯৯) গোসাঁইর কাছে একখানা চিঠি আসে প্যারীলাল ঘোষের কাছ থেকে। সেই যে কাঁথিতে 'কমলে-কামিনী' দর্শন করে তিনি গোস্বামী-প্রভুকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন থেকে তাঁর মধ্যে এক শক্তির খেলা শুরু হয়। ভগবানকে লাভ করার উদ্দেশ্যে তিনি লোকালয় ত্যাগ করে চিত্রকূটে যান এবং পরে নর্মদা তীরে ওঁকারনাথে পর্বত-গুহায় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। গুরুকরণ ও দীক্ষাগ্রহণে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি লিখেছেন, 'নির্জন পাহাড়-পর্বতে এতকাল সাধন-ভজন, তপস্যা করে কাটালাম; তাতে অনেক উপকার হয়েছে, মৌনী হয়েছি, আহারের পরিমাণ কমেছে, নিদ্রা জয় করেছি, অষ্টপ্রহর একাসনে বসে থাকি। শঙ্কর দয়া করে সময় সময় দর্শন দেন। ব্যাসদেবও কখনও কখনও এসে উপদেশ দেন; কিন্তু যাঁকে পাওয়ার জন্য সব ছেড়ে-ছুঁড়ে এসেছি, তা তো হল না। এখনও আমার ব্রহ্মদর্শন হয় নি। সকলেই বলেন, "সদ্‌গুরুর আশ্রয় না পেলে আর এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবে না।" কি উপায়ে পিতার দর্শন পাব, কৃপা করে আপনি উপদেশ দিন।'

এই চিঠির উত্তরের খসড়া লিখে প্রভু জগদ্বন্ধুবাবুকে ইশারা করে বলেন, 'তোমার নামে প্যারীবাবুকে এই চিঠি দাও।' 'বাহিরে ধর্মলাভের জন্য যাহা প্রয়োজন, সমস্তই হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে পিতার দর্শনে অধিকার জন্মে না। ধ্রুব পঞ্চম বৎসরের শিশু; বনে বনে "পদ্মপলাশলোচন" বলিয়া কাঁদিলেন, তথাপি গুরুকরণ না হওয়া পর্যন্ত ভগবদ্‌ দর্শন পাইলেন না। ঈশা জন-দি-ব্যাপটিস্টের নিকট দীক্ষিত; চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, গুরুকরণ ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন হয় না।

'আহার যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনী হবেন, লোকে সাধু বলিয়া ভক্তি করিবে; উহাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হইবে না। যদি ব্রহ্মদর্শন করিতে চান, তবে অন্তরের সমস্ত পূর্বসংস্কার দূর করুন। কি সত্য, কি অসত্য, তাহা আপনি জানেন না। এখনও পূর্বশিক্ষাকে সত্য মনে করিতেছেন, উহা সত্য নহে। ব্রহ্মদর্শনে যখন

প্রকৃত জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, তখন এক-একটি সত্য জানিতে পারিবেন। গুরুকরণ করিয়া যখন সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়, তখনই দর্শন পাওয়া যায়।

'অন্তরে যে বাসনা আছে, তাহা পাইবেন; ব্রহ্ম পাইবেন না। ধর্মপ্রচার প্রভৃতি বাসনাও ছাড়িতে হইবে। নিজের ইচ্ছায় কোনও কার্য করিবেন না। যতক্ষণ নিজের ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম-সহবাস অনেক দূর। আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মানুষ নিজের চেষ্টায় যতদূর করিতে পারে, আপনি তাহা করিয়াছেন। এখন গুরুকরণ ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। ভগবান সমস্ত কার্য নিয়মে করেন। বাহ্যজগতে কোনও কার্য যেমন অনিয়মে চলে না, সেইরূপ অন্তর্জগৎও নিয়ম ভিন্ন চলে না; ব্রহ্মদর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ, অব্যর্থ নিয়ম। আপনাকে বড় ভালবাসি, এজন্য এত লিখিলাম।'

স্বর্ণময়ী দেবীর মাথার ব্যামো দিন দিন বাড়ে। কখনও চীৎকার, কখনও গালাগাল, কখনও বা তিনি গান করেন। ১৫ অগ্রহায়ণ (১২৯৯) রাত্রে গোসাঁই জানান, 'আজ মার বিষম ফাঁড়া। শ্যামসুন্দর আমাকে আমতলায় থাকতে বলে গেলেন। আজ রাত কাটলে মা আর কিছুদিন টিকে যাবেন।' ব্রহ্মচারী ধুনি জ্বালিয়ে দেন। দুপুর রাতে আসন-ঘরে গিয়ে ব্রহ্মচারী দেখেন, স্বর্ণময়ী দেবী নির্জীব হয়ে পড়ে আছেন। জ্ঞান নেই। ব্রহ্মচারী হাত-পায়ে সেঁক দেন। গভীর রাতে কুলদানন্দ আমতলায় ফিরে এসে দেখেন একটি প্রকাণ্ড কাল সাপ প্রভুর মাথায় উঠে ফণা ধরে আছে। খানিক বাদে আপনা-আপনি নেমে যায়। গোসাঁই ইশারায় বলেন, 'ইনি আসনের জাত সাপ। সুবিধা পেলেই আসেন। জটা বেয়ে মাথায় উঠে কিছুক্ষণ ফণা ধরে থেকে চলে যান।' তারপর গোসাঁইজী জানান, মা এবার বেঁচে গেলেন। ফাঁড়া কাটল।' স্বর্ণময়ী দেবীর সেবারও দেখাশোনার ভার পড়ে ব্রহ্মচারীর উপর। রোগীর কত রকম খেয়ালের হুকুম, তামিল না হলেই চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করেন। ভোরবেলা একদিন স্বর্ণময়ী দেবী ছেলেকে বলেন, 'তোর আসনের সাপ আমাকেও বড় বিরক্ত করে; কাছে এসে ফণা ধরে ফোঁস্ ফোঁস্ করে। চলে যেতে বলি, ভ্রূক্ষেপ নেই। তখন এক চাঁটি মেরে দিলাম। অমনি সুড়-সুড় করে গর্তে ঢুকে গেল। তারপর থেকে আর বড় বের হয় না।' ঘরের মেঝে স্বর্ণময়ী দেবী কফ ফেলে ভরিয়ে রাখেন। ব্রহ্মচারী রাত্রে দু-তিনবার করে পরিষ্কার করেন। ভোর না হতে খাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। শেষরাত্রে ব্রহ্মচারী দু-তিনজনের রান্না করেন। পছন্দ না হলে গালাগাল। একা তিনি খান না; পাড়ার লোকদের প্রসাদ বিলান। ব্রহ্মচারীকে স্বর্ণময়ী দেবী প্রায়ই ধমকান, 'পেট ভরে খাস না; ভাল জিনিস খাস না। মহাপ্রাণকে কষ্ট দিস, শেষে মহাপ্রাণ তোর মুখে লাথি মেরে চলে যাবেন। ব্রাহ্মণের ছেলে সারাদিন না খেয়ে থাকিস। আমার ছেলের এতে অকল্যাণ হয়। যা আশ্রম থেকে চলে যা।' কখনও কখনও আবার তিনি ব্রহ্মচারীর মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

দোল-পূর্ণিমার দিন ছেলেরা নামব্রহ্মের মন্দির সুন্দর করে সাজায়। গোসাঁই তাদের উৎসাহ দেন। দূর-দূরান্ত থেকে ত্রিতাপের জ্বালা নিবারণের অভিপ্রায়ে প্রভুর কাছে কতজন যে ছুটে আসেন! শুরুতে কীর্তন তেমন জমে না। এই সময় অপরাহ্ণে ভাগলপুর থেকে মহাবিষ্ণু যতি আশ্রমে পৌঁছে গোস্বামীপ্রভুকে প্রণাম করেন। বিছানাপত্র ঐখানে রেখেই স্বরচিত গানের পদ ধরে টান দেন—

চল্ লো বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দে, মৃগমদে আজি সাজাব, লো।
আজি মন সাধ সব মিটাব লো॥

গানের প্রথম চরণ শুনে আসন থেকে 'জয় রাধে, শ্রীরাধে' বলে প্রভু লাফিয়ে উঠেন। তারপর মধুর ভাবে মাতোয়ারা হয়ে নাচতে নাচতে মহাবিষ্ণুবাবুকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। চারদিকে কান্নার রোল উঠে। গোসাঁই গায়ককে বলেন, 'গাও, গাও, মধুর করে গাও।' তখন আবার তিনি গান ধরেন—

আজি হোলি খেলবো শ্যাম তোমার সনে।
একেলা পেয়েছি, তোমায় নিধুবনে॥
শুনহে বনমালী, আমরা ভাঙ্গবো তোমার নাগরালি।
কুমকুম মারিব তোমার রাঙ্গাচরণে॥

ঐ সময় চারদিক থেকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সকলে আবির ছুঁড়তে থাকেন। গোসাঁইও 'জয় রাধে, শ্রীরাধে' বলে আবির ছিটিয়ে দেন। রাত্রি প্রায় এগারটায় আসনে বসে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু, 'আজ গান গাইলেন কে?' ভক্তেরা উত্তর দেন, 'ভাগলপুর থেকে মহাবিষ্ণু যতি দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে এসেছেন। তিনি গেয়েছেন।' গোসাঁই সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'আগামী দিন ভোরে তাঁর সাধন হবে, বলে দিও।'

জনৈক শিষ্য প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন্ সময় সাধন করলে মহাপুরুষদের কৃপালাভ করা যায় ও বুঝা যায়?' গোসাঁই বলেন, 'রাত্রি একটার পর মহাপুরুষেরা বের হন। একটা হতে চারটা পর্যন্ত তাঁরা বিচরণ করেন। ঐ সময় সাধনের পক্ষে প্রশস্ত। একটা নির্দিষ্ট সময়ে কিছুক্ষণ ধরে একটা স্থানে বসে কিছুদিন নাম করলে মহাপুরুষদের কৃপা বুঝা যায়। কয়েকবার প্রাণায়াম করে স্থির হয়ে বসে নাম করতে হয়। বিছানায় বসে মশারীর ভিতর থেকে নাম করলেও চলে, কোন ক্ষতি হয় না। নাম করার সময় মহাপুরুষেরা সামনে এসে দাঁড়ান, এবং সাহায্য করেন। তখন তাঁদের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়। ধূপ-ধুনা, গুগ্গুল, চন্দনাদির গন্ধ, কখনও পবিত্র হোম-ধূমের গন্ধ, কখনও বা গাঁজা-লবঙ্গের গন্ধ ও সুগন্ধি ফুলের গন্ধও পাওয়া যায়। কখনও তাঁদের দর্শনে, কখনও বা তাঁদের বাণী শ্রবণেও তাঁদের জানা যায়। নানা প্রকারে মহাপুরুষেরা কৃপা করেন ও নিজেদের পরিচয় দেন।'

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে বিরূপ সমালোচনা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম ও অনুষ্ঠান নিয়ে কথা উঠে। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে আচার্য পদে রাখার বিরোধী। ব্রাহ্মসমাজের কর্মসচিব তাঁকে কয়টি প্রশ্ন করে চিঠি লিখেন এবং নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তাঁকে উত্তর দিতে অনুরোধ করেন। নগেনবাবু চিঠির নকল গোসাঁইকে পাঠান এবং কী উত্তর দেওয়া সমীচীন, তাঁর কাছে জানতে চান। নগেনবাবুর চিঠির নকলপ্রাপ্তির পূর্বেই প্রভু জগদ্বন্ধুবাবুকে দিয়ে পত্রের যথাযথ উত্তর লিখিয়ে নগেনবাবুকে পাঠান। এতে থাকে অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান। এই চিঠিখানা ডাকে দেবার তিন-চারদিন পরে আসে নগেনবাবুর জিজ্ঞাসা-লিপি। প্রশ্নগুলির আনুপূর্বিক মীমাংসা ছিল প্রভুর পত্রে। জগদ্বন্ধুবাবু অবাক হয়ে এ-সব সতীর্থদের বলেন। কৌতূহলী ভক্তদের গোসাঁই বলেন, 'নগেনবাবুর চিঠি পেয়ে যদি উত্তর দিতাম, তাহলে যথাসময়ে তাঁর হাতে পৌঁছত না।' গোস্বামীপ্রভু সাধনরাজ্যের তুঙ্গে অবস্থান করছেন। ভগবানের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা। মণিগ্রথিত

সূত্রের ন্যায় জগতের সবকিছু ভগবানে অনুস্যূত। তাই গোসাঁইজীর অজানা থাকে না কিছুই।

একদিন রাত্রে স্বর্ণময়ী দেবীর বাড়াবাড়ি। ব্রহ্মচারী তাঁকে নিয়ে বিব্রত। রাত তিনটায় শ্রীধর ধুনির পাশে এসে বসেন। গোসাঁই ধুনিতে জল ঢেলে দিয়ে জানান, 'একজন মহাত্মা আমার নিকটে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাপবার জন্য এখানে ধুনি রাখা ঠিক না। ধুনি নির্বাণ কর।" আমি ধুনিতে জল ঢেলে দিলাম।' পরদিন এ নিয়ে কথা হয়।

জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন, 'সাধু-সন্ন্যাসীগণ আসনের সম্মুখে ধুনি রাখেন কেন?' গোসাঁই কখন বা অস্পষ্ট স্বরে বলেন, কখন বা লিখে দেন—'ধুনির সাধন আছে। অগ্নিই ইষ্টনাম। এইরূপ ধ্যান করে কাম-ক্রোধাদি ইন্ধন তাতে আহুতি দেন। ধুনির অগ্নির দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে, খুব তেজের সঙ্গে নাম করতে করতে ইচ্ছাশক্তিদ্বারা অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করতে থাকেন আর কুন্দীসকল কখনও কাম, কখনও ক্রোধ ইত্যাদি কল্পনা করে, নাম-অগ্নিদ্বারা তা দগ্ধ করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ও-রকম একটি কুন্দী ভস্ম না হয়, ততক্ষণ আসন ছাড়েন না, অবিরাম নাম করেন। এক-একটি কুন্দী এভাবে দগ্ধ করতে পারলে তাঁদের আনন্দের সীমা থাকে না। স্পর্ধা করে একে অপরকে বলেন, "ম্যায় দু মণ কুন্দী ফুক দিয়া;" আবার কেউ বলেন, "ম্যায় তিন মণ ভস্ম কিয়া।" শুধু অগ্নিতাপার উদ্দেশ্যে সাধুদের ধুনি নয়। ধুনির সাধন বড়ই উৎকৃষ্ট।' আবার একজন ভক্ত প্রশ্ন করেন তাঁকে, 'সাধুরা যে চিম্‌টা, কমণ্ডলু ও ত্রিশূল ধারণ করেন, তারও কোন সাধন আছে কি?' গোসাঁইজী তখন বলেন, 'সাধুদের এ সমস্তই এক-একটা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। জিহ্বা সংযত হলে চিমটা ধারণের অধিকার হয়। চিমটা ধারণ করে প্রথমেই বাক্ সংযম করতে হয়। কমণ্ডলু ধারণেরও অধিকার আছে। কমণ্ডলু ভরে নির্মল ঠাণ্ডা জল সম্মুখে রেখে সাধক তাঁর শীতলতা, স্থিরতা ও সাম্যভাবের সহিত মনের যোগ রেখে ভগবানের নাম করবেন। তাঁর অন্তর সর্বদাই শীতল জলের মত ঠাণ্ডা থাকবে; কিছুতেই উত্তপ্ত হবেন না। আর চিত্ত সর্বদা অবিকৃত ও সাম্যভাবে পূর্ণ থাকবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ যাঁর করায়ত্ত, তিনিই মাত্র ত্রিশূল ধারণের অধিকারী।' আবার প্রশ্ন করা হয়, 'সাধুরা গায়ে ভস্ম মাখেন কেন?' প্রভু বলেন, 'ধুনিতে সাধুরা হোম করেন; প্রসাদজ্ঞানে বিভূতি নিয়ে সর্বাঙ্গে মাখেন, ঐ ভাবেই অভিভূত থাকেন। গায়ে ভাল করে ভস্ম মাখলে লোম-কূপ সমস্ত বন্ধ হয়ে যায়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা-বাদলে শরীরের উত্তাপ সমান থাকে, তাতে কোন অসুখ হয় না। পাহাড়-পর্বতে এমন গাছ আছে, যার ভস্ম গায়ে মাখলে সাধুদের চোখে দেখা যায় না। স্বচ্ছন্দে হিংস্র জন্তুর মধ্যেও চলাফেরা করেন।' বিস্মিত হয়ে শিষ্যেরা প্রশ্ন করেন, 'এ কি কখনও হয়?' গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'হবে না কেন? খুব হয়। বস্তুর প্রতিবিম্ব চোখে পড়লেই তো তা দেখতে পাবে। এই ভস্ম গায়ে মাখলে চক্ষু তার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে পারে না। সকল বস্তুরই কি প্রতিবিম্ব মানুষের চোখে পড়ে? প্রেতের রূপ কি দেখতে পাও? অথচ কুকুর তা দেখে। অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুকুর সময় সময় লাফিয়ে ওঠে; জনপ্রাণী-শূন্য স্থানে দৌড়িয়ে গিয়ে চীৎকার করতে থাকে। এ-সব লক্ষ্য করে দেখেছ?' শিষ্যেরা এবার জিজ্ঞাসা করেন গোসাঁইজীকে, 'আমাদের চক্ষের দৃষ্টি কি ও রকম হতে পারে না?' প্রভু বলেন, 'হ্যাঁ, খুব পারে। ছটি মাস অবাধে

সন্ধ্যা থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত আলো না দেখে যদি জেগে থাকতে পার, তাহলে চোখ ক্রমে এমন হবে যে, সূক্ষ্ম শরীর অনায়াসে দেখতে পাবে। প্রণালী মত দৃষ্টি-সাধনেও হয়।' শিষ্যেরা পূর্বের প্রসঙ্গ টেনে এনে মন্তব্য করেন, 'কাঠের এমন গুণ যে, তার ভস্ম গায়ে মাখলে দেখা যাবে না, এমনটি কখনও শুনি নি!'। গোসাঁইজী বলেন, 'শুনবে কি? দর্শন, বিজ্ঞানে কতটুকু পেয়েছে? কতটুকুই বা জানে! এই দেখ, এই কাঠ বহু পুরান হয়ে যখন ঘুনঘুনে হয়, এর মধ্যে এক প্রকার কীট জন্মে। কাঠখানা ফুটফুট বিন্দু-বিন্দু ছিদ্রযুক্ত ঝাঁঝরীর মত হয়ে যায়। ঐ কাঠ আগুনে দিলে যেমন দপদপ জ্বলতে থাকে কাঠের ভিতর থেকে, ঐ কীটগুলি বের হয়ে অগ্নি খেতে আরম্ভ করে সে রকম কাঠ পেলে দেখাব। নিজেও পেলে পরখ করে দেখ অগ্নিভুক জীবও আছে। বর্তমান বিজ্ঞানে কি তা স্বীকার করে?'

একদিন অপরাহ্নে অসময়ে গোস্বামীপ্রভুর বড় ক্ষুধা পায়। জগদ্বন্ধুবাবু থালাভরে খাবার এনে ধরেন। গোসাঁই তৃপ্তির সঙ্গে আহার শেষ করে লিখেন, 'এক বিদেহী আত্মা ক্ষুধায় কাতর হয়ে এখানে এসেছিলেন। তাঁর ক্ষুৎ-পিপাসা আমার মধ্যে সংক্রামিত হয়। তুমিও তখনই খাবার নিয়ে এলে। আমি আহার করায় পরলোকবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তি হল।'

চৈত্র অবসান, ১২৯৯ সাল। আকাশে বাতাসে উদাস সুর। বিদায়ের পূর্বাভাস। স্বর্ণময়ী দেবীর শরীর হয় দিন দিন খারাপ। উন্মাদের কোন লক্ষণ নেই। কথা-বার্তায় স্বাভাবিক। অন্তিমকাল আগত বুঝে তিনি বলেন, 'বিজয়, তুই সন্ন্যাস নিয়েছিস। আমার শ্রাদ্ধ করা তোর পক্ষে সম্ভব নয়। ধর্ম নষ্ট করে আমার জন্য যদি কিছু করিস তাতে আমি শান্তি পাব না। তুই আমাকে তিন অঞ্জলি গঙ্গাজল দিস, তাতে আমার অক্ষয় তৃপ্তি হবে।' এই ইচ্ছা যেদিন প্রকাশ করেন, ঐদিনই স্বর্ণময়ী দেবী পরলোক গমন করেন।

মায়ের দেহত্যাগ সম্বন্ধে প্রভু লিখেন, 'আমার মাতাঠাকুরাণী বিধুর কোলে দুধ খাইতেছিলেন, এমন সময় আমাকে ডাকিলেন। আমি গিয়া দেখি এখন বাহিরে নেওয়া কর্তব্য। বাহিরে নিয়া শোয়াইলাম। মুখের সুন্দর শোভা হইল। মনে হইল সমস্ত কষ্ট দূর হওয়ায় যেন শান্তি পাইলেন। ঠিক এই সময়ে আমার পানে তাকাইয়া রহিলেন। চারদিকে হরিনাম হইতেছিল। কেলে-কুকুর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল।'

মায়ের শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে গোসাঁই লিখেন, 'মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর পিতৃলোক মাতৃলোক হইতে পূর্বপুরুষেরা আসিয়া আমাকে বলিলেন, "একাদশ দিবসে যোগজীবন তাঁর শ্রাদ্ধ করিবে; তাঁর নামে দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিবে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে ও দুঃখীকে দান করিবে। অপরপক্ষে গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান করিবে। অপরপক্ষে আশ্বিন মাসে দান—যথাসাধ্য তণ্ডুল, বস্ত্র, জলপাত্র, ফলমূল, খাদ্যবস্তু ইত্যাদি। শাস্ত্রমতে এখন পিণ্ডদান হইতে পারে না। উন্মাদ রোগের সময় যে সকল কর্ম করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত না হইতে মৃত্যু হইয়াছে। এজন্য হয় এক বৎসর পরে কুশপুত্তলিকা করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে অথবা অপরপক্ষে গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান করিতে হইবে। এখন মাত্র তণ্ডুল, বস্ত্র, ভোজনপাত্র, জলপাত্র এবং অন্যান্য বস্তু তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দুঃখীদিগকে দান করিতে হইবে।'

গোস্বামীপ্রভু ১৩০০ সালের বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে যোগজীবন গোস্বামী, কুতুবুড়ী ও মুক্তকেশী দেবীকে নিয়ে কলিকাতা রওনা হন। নবকুমারবাবু তখন

মেছুয়াবাজারে অভয়নারায়ণ রায়ের গৃহে ছিলেন। অভয়বাবু, হরিনারায়ণবাবু, উভয়েই গোসাঁইর কাছে সাধন পেয়েছেন। কাঠিয়াবাবা অভয়বাবুকে গোসাঁইর কাছে সাধন নেবার অনুমতি দেন। গুরুদেব কলিকাতায় আসছেন জেনে তাঁরা নবকুমারবাবুকে ধরেন, তাঁদের গৃহে যেন প্রভু উঠেন। শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেন থামতেই নবকুমারবাবু গোসাঁইকে অভয়বাবুদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তিনি সম্মত হন। অভয়বাবু গাড়িভাড়া করে আনেন। প্ল্যাটফর্মে নামতেই রাখাল রায়চৌধুরী তাঁর মোটর নিয়ে এসে গোসাঁইকে সুকিয়া স্ট্রীটে তাঁর নূতন বাড়ীতে উঠার অনুরোধ জানান। প্রভু তাঁকে বলেন, 'এ যাত্রায় নবকুমারবাবুকে কথা দিয়েছি। পরের বার আপনার ওখানে উঠা যাবে।'

নববিধান সমাজের পেছনে ৯০/৫, মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে তিনি উঠেন। ঐখানে পৌঁছেই প্রভু ছেলেকে বলেন, 'গুরুজী আদেশ করেছেন, গঙ্গার কোমর জলে নেমে মাকে তিন অঞ্জলি জল দিয়ে তর্পণ করব। আর মার শ্রাদ্ধাদি গঙ্গাতীরে তুই করবি।' এগার দিনের দিন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে উপস্থিত হয়ে শিষ্য অচিন্ত্যকুমার চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে কুলপ্রথা অনুসারে যথাশাস্ত্র তিনি শ্রাদ্ধকার্য সামাধা করেন। মায়ের উদ্দেশে গোসাঁই তিন গণ্ডুষ জল দেন। প্রভু লিখেছেন, 'মাঠাকরুণ যোগজীবনের উৎসর্গীকৃত শ্রাদ্ধবস্তু ও আমার প্রদত্ত তিন গণ্ডূষ গঙ্গাজল, আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন।'

অভয়বাবুদের বাড়ীর পাশে অনেকটা খালি জায়গা পড়ে ছিল গোসাঁই-শিষ্যেরা নিজেরা তা পরিষ্কার করে সামিয়ানা টাঙিয়ে কীর্তনের আসর করেন। ভক্ত কীর্তনীয়া মুকুন্দ ঘোষ তাঁর লোকজন নিয়ে পূর্বাহ্ণে আসেন। শ্রাদ্ধান্তে গোসাঁই বাসায় ফিরতেই, মুকুন্দ ঘোষের খোল, করতাল, কাঁসর বেজে উঠে। প্রভু কীর্তনস্থলে এসে ভূমিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠে দাঁড়ান। ভক্তবৃন্দ মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করেন। গোসাঁই ঊর্ধ্বে বাহু তুলে ভাবাবেশে হুঙ্কার করে উঠেন, 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন! হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ কলিজীবের ভয় নাই, ভয় নাই!!' তাঁর হৃদয়স্পর্শী অভয়বাণীতে আসর অভিভূত হয়ে পড়ে। শ্রবণমঙ্গল মধুর কীর্তনে গোস্বামীপ্রভুর সর্বাঙ্গে প্রকাশ হয় কম্পন-পুলক। জটাভার খাড়া হয়ে উঠে। তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য করেন। তাঁর হরিধ্বনিতে আসরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে মহাশক্তি সঞ্চারিত হয়। ভূমিতে পড়ে প্রভু গড়াগড়ি দেন। কীর্তনান্তে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন। কাঙ্গালীদের চাল, ডাল ও পয়সা দেন। শিষ্যেরা এবং অন্যান্যরা আনন্দ করে প্রসাদ পান। ঠাকুরমার দয়া-দাক্ষিণ্য ও ঔদার্যের কথা নিয়ে শিষ্যেরা আলাপ-আলোচনা করেন। গোস্বামীপ্রভুর কাছে ইহলোক পরলোকের আবরণ ঘুচে গেছে। তিনি একদিন লিখেন, 'মা প্রায়ই এসে পরলোকের কত কি খবর দেন।' শিষ্যগণ নানারূপ প্রশ্ন করে, তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করেন পারলৌকিক ব্যাপারে। তাছাড়া প্রভু যেন আনন্দের ফোয়ারা। তাঁর কাছে এসে ভক্ত-শিষ্যেরা নিজেদের হারিয়ে ফেলতেন। তাঁদের বাড়ী-ঘর, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, বিষয়-আশয় যে রয়েছে, সব যেন তাঁরা ভুলে যেতেন। অফিস-ফেরত তাঁরা গুরুদর্শন করতে এসে গৃহে ফিরার নাম করেন না। আহারের ভাবনা নেই। ভক্তগৃহে বাসের সময়, ভক্ত-পরিবারের লোকের ন্যায় হয় তাঁদের প্রসাদের ব্যবস্থা। বাহু উপাধান করে মেঝের উপর একটু জায়গা করে, তাঁদের অবসন্ন দেহ গভীর রাতে এলিয়ে দেন।

অভয়বাবুর গৃহে রোজই ৫০/৬০ জন বাইরের লোক প্রসাদ পান। তাঁর পরিবারের জন্য সপ্তাহে এক মণ চাল আসে। অথচ এই অতিরিক্ত জনসমাগম ও প্রসাদ-বিতরণ সত্ত্বেও জালার চাল হ্রাস পায় না। মেয়েরা গোসাঁইর কাছে গিয়ে এই চমকপ্রদ খবর দিলে, তিনি হেসে ইঙ্গিতে বলেন, 'সবই গুরুজীর কৃপা।'

দুপুরের অবসরে গোস্বামীপ্রভুর দর্শন-মানসে কলিকাতার নানা জায়গা থেকে মেয়েরা আসেন। গোসাঁইর ঘরের দরজা ভেজান। দর্শনার্থীদের ভিড় বেড়ে চলে। নবকুমারবাবুর কৌতূহল হয়, প্রভু কি করছেন দেখা যাক। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেন, 'শ্বেত বিরূপাক্ষমূর্তি গোসাঁইর স্থানে।' 'ববম্ ববম্' বলে বারান্দায় সংজ্ঞাহীন হয়ে নবকুমারবাবু পড়ে যান।

অভয়বাবুর গৃহে কয়েকজনের সাধন হয়। অভয়বাবুর ভাগ্নী সত্যদাসী একেবারে ছেলেমানুষ। যুক্তবর্ণের ধারণা না থাকলেও, বিশুদ্ধ সংস্কৃতে গুরুর স্তবস্তুতি করে। কখনও কখনও সম্বিত হারিয়ে তিন-চার ঘণ্টা নিস্পন্দভাবে পড়ে থাকে। সত্যদাসীর মাতা-পিতা মনে করেন মেয়ের অপস্মার বা মূর্ছা রোগ। তার কথাবার্তায় বুঝা যায়, পূর্বজন্মে এক পাহাড়বাসীর কাছে সে দীক্ষা পেয়েছিল। কথা ফোটার পর থেকে মধ্যে মধ্যে গুরুস্মৃতি হয়। গোস্বামীপ্রভুর এবার কলিকাতায় আসার চার-পাঁচদিন পূর্বে, তাঁর গুরু তাঁকে আদেশ করেন, 'মা, তোমাদের গৃহে একজন মহাত্মা আসবেন, তাঁর কাছে তুমি দীক্ষা নিও।' সত্যদাসী তাঁর পূর্বজন্মের গুরুকে বলেন, 'আপনিই তো রয়েছেন; আবার অন্যত্র দীক্ষা নিতে কেন বলছেন?'[১] তিনি বলেন, 'মা, ইনি সদ্‌গুরু; বর্তমানে তাঁর উপরই দীক্ষার ভার। ইহাই ভগবদ্ বিধান।'

গোসাঁইর কাছে সত্যদাসী তাঁর পূর্বজন্মের গুরুর আদেশের কথা জানিয়ে দীক্ষা প্রার্থনা করলে, প্রভু বলেন, 'মা, তোমার গুরুর আদেশ আমার শিরোধার্য। অবিলম্বেই তোমাকে সাধন দিব।' দীক্ষার সময় সত্যদাসী আসন থেকে ঊর্ধ্বে শূন্যে অবস্থান করেন। গোস্বামীপ্রভু লিখেন, 'সত্যদাসীর মাতাপিতা তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না। কারণ ইঁহারা কখনও এরূপ অবস্থা দেখেন নাই। সংসারের সমস্ত লোক পীড়া বলিয়া চীৎকার করিতেছে। একজন কি দুজন যদি বলে পীড়া নয়, তাহাতে কোন ফল হয় না। তবে রোগ বলিয়া মহাত্মাদিগকে "আরাম করিয়া দিন" বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে অবজ্ঞা করা হয়। মহাত্মাগণ "রোগ নয়" বলিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, সে-কথা না শোনায় লাভ কি? পীড়া কোথায়? জ্বর আছে? ভেদ-বমি কি হয়? উদরে ব্যথা আছে? হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, পাকাশয়, মূত্রাশয়, গর্ভাশয়—এ সম্বন্ধে শারীরিক পীড়া আছে? যদি না থাকে, তবে পীড়া নাম কেন?'

হুগলী জেলার সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্ম মোহিনীমোহন রায় গোস্বামীপ্রভুর কাছে এই গৃহে সাধন পান। তাঁর দীক্ষার বর্ণনা করে মোহিনীবাবু বলেছেন, 'রাত্রি একটার সাধন পাই। পরদিন ভোরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে মনে হয়, সারা শরীর দিয়ে সর-সর করে যেন এক তড়িংপ্রবাহ চলেছে। সে এক অপূর্ব অনুভূতি। সব যেন মধুময়। এক আনন্দ-সাগরে যেন ভাসছি। যেদিকে তাকাই—"আনন্দম্,

---

[১] শ্রীমদ্ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' ৫ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পত্রাঙ্ক ৭৯।

আনন্দম্, পরিপূর্ণানন্দম্।" গাছ, লতা, পাতা, প্রকৃতি, পৃথিবী সবই সোনা হয়ে গেছে। নিজেও মধুময় হয়ে গেলাম। কাক ডাকে—কর্কশ স্বর আর নেই! সবই সুন্দর! পাখি কূজন করে, যেন মধুক্ষরণ হচ্ছে। আনন্দবেগ আর ধারণ করতে পারি না। মধুরং, মধুরং, মধুরং। এই অবস্থা এক মাস ছিল।'

অনেক ব্রাহ্ম মোহিনীবাবুর অবস্থা দেখে গোসাঁইর কাছে সাধনপ্রার্থী হন। ব্যাঘ্রচর্মের শিরোপা পড়ে এক মৌনী সাধু প্রভুকে দর্শন করতে আসেন। তিনি মদ খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তাঁর আহারের সময় প্রভু মদ আনিয়ে দেন। একদিন ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল এসে জানান, তাঁরা ব্রাহ্মসমাজ থেকে নগরকীর্তন বের করে হিন্দু স্কুল পর্যন্ত যাবেন। প্রভুকে নগরকীর্তনে যোগ দেবার জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। গোসাঁই সম্মত হন। সন্ধ্যায় কীর্তন বের হবার পূর্বে তিনি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে সমাজগৃহে পোঁছেন। প্রভুকে কীর্তনের পুরোভাগে রেখে তাঁরা গন্তব্য স্থানে পোঁছেন। ঐখানে সংকীর্তন জমে উঠে। গোসাঁই উদ্দণ্ড নৃত্য করেন ও ভাবাবেশে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, 'ঐ দেখ শচীনন্দন, চোখ থাকে তো দেখ—আহা! কি সুন্দর! কি মনোহর!' কীর্তন আবার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ফিরে যায়। অভয়বাবু ও অন্যান্য ভক্তেরা গোস্বামীপ্রভুকে নিয়ে মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে পড়তেই ডান দিকের পথ ধরেন।

অভয়বাবুর গৃহে বর্ধমানের জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাজরারও সাধন হয়। শ্যামবাজারের বাড়ীতে প্রভুর অবস্থানকালীন তিনি দীক্ষাপ্রার্থী হয়েছিলেন। গোসাঁই তখন তাঁকে কাশী গিয়ে বিশ্বেশ্বর দর্শন, সাধুদর্শন ও গঙ্গাস্নান করতে বলেছিলেন। ঐখানে তিনি শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে দীক্ষা নেন। হাজরা মহাশয় লিখেছেন, 'নৃসিংহ চতুর্দশীর দিন, ভোর চারটায় গোস্বামী মহাশয়ের কাছে সাধন পাই। সাধন পেয়ে ভিতরে এক বৈদ্যুতিক স্রোতের মত অনুভব করি। এতে আমার শরীর অবশ হয়ে যায়। এখন মনে হয় আমার প্রাণের অভাব পূর্ণ হয়েছে। অন্য সাধুর কাছে দীক্ষা নেবার কথা গোস্বামী মহাশয়কে বলায় তিনি লিখে দেন, "তোমার এর প্রয়োজন ছিল, এতে তোমার কল্যাণই হয়েছে।"' তিন সপ্তাহ কলিকাতা থেকে বৈশাখের শেষে প্রভু আবার গেণ্ডেরিয়ায় ফিরে আসেন। মেছুয়াবাজারে যে ঘরে গোসাঁইর আসন ছিল, তা না উঠিয়ে রেখে আসেন। অভয়বাবুর উপর নির্দেশ থাকে ঐ ঘরে যেন কালীপূজার ব্যবস্থা করেন এবং পূজার দিন স্থির করে বলে আসেন। নির্দিষ্ট দিনে অভয়বাবু যথারীতি কালীপূজা করেন। কলিকাতার আনন্দের হাট কিছুদিনের জন্য ভাঙ্গে।

মৌন অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভুলে একদিন গোসাঁই কথা বলে ফেলেন। অনুতপ্ত হয়ে তখনই তিনি নিজের খড়ম নিয়ে আপন পৃষ্ঠদেশে সজোরে আঘাত করেন। প্রভুর আত্মদৃষ্টি ছিল অতন্দ্র। নিয়মের শিথিলতার জন্য তিনি নিজেকেও ক্ষমা করেন নি। ভ্রমবশত নিয়মভঙ্গ হলে কঠোর দণ্ডভোগ করে প্রায়শ্চিত্ত করতেন। উল্লিখিত ঘটনা উপলক্ষ করে তিনি শিষ্যদের উদ্দেশ্যে লিখেন, 'তোমরা আমার বন্ধুর কাজ করলে কৈ? আমি সামান্য কীট। আমার ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। যখনই ত্রুটি দেখবে, বন্ধুভাবে বলবে। যিনি আমার দোষ দেখিয়ে দেন, তিনি আমার পরম বন্ধু।'

গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে অনেক সময় স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা প্রভুর কাছে এসে তাদের গোপন কথা, চারিত্রিক দুর্বলতার কথা তাঁকে অকপটে বলে পরামর্শ চাইত।

যুবক, বৃদ্ধ, নরনারী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই তিনি মাতা, পিতা, গুরু, বন্ধু, সখা, সহায় ও পরম আত্মীয় ছিলেন। তাঁর নিঃস্বার্থ প্রেমের স্পর্শে তিনি সকলকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। গোসাঁইর শেষ জীবনে যখনই যেখানে থাকতেন, ধর্মপিপাসু ব্যক্তিরা তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হতেন। দেশের দুর্গতি দেখে গোস্বামীপ্রভুও কৃপাবিষ্ট চিত্তে তাঁর সাধনের ধন, অকাতরে বিতরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই সাধন-দান প্রসঙ্গে তিনি একদিন লিখেন, 'নিজের প্রিয়তমা সুন্দরী স্ত্রীকে দান করতে লোকের হৃদয় ছিন্ন হয়। তদ্রূপ সাধনের ধন এই বস্তু সাধুরা সহজে দান করেন না; অত্যন্ত গোপনে রাখেন।'

জনৈক শিষ্য তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'তবে এই মুক্তা উলুবনে কেন ছড়াচ্ছেন?' গোসাঁই লিখেন, 'আমি নিজে ত্রিতাপের জ্বালায় ভুগেছি। এর হাত থেকে জগত রক্ষা পায়, এই আশায় তাপিতজনকে এই ধন বিতরণ করছি।'

একদিন একজন অপরিচিত ব্যক্তি আশ্রমে এলে, শান্তস্বভাবা গাভী রানী তাকে তাড়া করে ছুটে যায়। লোকটি যতক্ষণ আশ্রমে ছিল রানী ঐ সময় বড় চঞ্চল হয়ে ওঠে। গোসাঁই এই ঘটনা লক্ষ্য করে লিখেন, 'লোকটি পূর্বজন্মে কসাই ছিল। রানীর জন্মান্তরের সংস্কার জেগেছিল বলেই সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।'

চেয়ারম্যান একদিন গোস্বামীপ্রভুর কাছে গিয়ে অস্ফুট এক বেদনাব্যঞ্জক শব্দ করে। সে কি বলতে চায়, প্রভুকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি লিখেন, 'এবার আমি অন্যত্র গেলে সে আর আশ্রমে থাকবে না, এমন কি আশ্রমের ভিতর প্রবেশ করবে না—এ-কথাটি জানিয়ে গেল।' গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে যোগজীবন গোসাঁই পিতার আসনের পাশে রাত্রে শয়ন করতেন। ভোর চারটায় প্রভু আসনের উপরই শ্রীদেহ আধঘণ্টার জন্য বাহু-উপাধানে টানা দিতেন। গভীর রাত্রিতে সিদ্ধ ফকির ও মহাজনেরা গোসাঁইর কাছে এসে নানা প্রসঙ্গ করতেন।

গেণ্ডেরিয়া আশ্রমকে গোস্বামীপ্রভু 'গুপ্ত শ্রীবৃন্দাবন' বলে অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে প্রকাশ করেছেন। আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল হৃদয়স্পর্শী। আশ্রমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এক আধ্যাত্মিক শক্তি মনকে স্থির ও শান্ত করে দিত। প্রভু একদিন যোগজীবন গোস্বামীকে বলেন, 'এই আশ্রমকে সংসারের আড্ডা হতে দিস না। এখানে বৈষয়িক আলোচনা ও পরনিন্দা যাতে না হয়, ও-দিকে লক্ষ্য রাখিস।' প্রভুর সাধন ছিল অসাম্প্রদায়িক। তাঁর সাধন পেতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ কখনও অন্তরায় হত না। কেম্বেল সাহেব ও শেখ কাসিমুদ্দিন মিঞাকে গোস্বামীপ্রভু সাধন দিয়েছিলেন।

রাধারমণ গুহের ছ বছরের ছেলে—ওয়াইও সাধন পায়। সে পূর্বজন্মে ফকির ছিল বলে গোসাঁই বলেন, তার মধ্যে ছলচাতুরী ছিল না। একদিন সে গুরুকে বলে, 'গোসাঁই, আমার গরুটি দেখ, আমি আসছি।' সারাদিন তার দেখা নেই। প্রভুও সেই স্থান ত্যাগ করেন না। ওয়াইর খোঁজে চারদিকে লোক ছুটে। সে ফিরে এসে বলে, 'আমার খেয়ালই ছিল না, ভুলে গিয়েছিলাম।' গোসাঁই বাইরে থেকে গেণ্ডেরিয়া ফিরলে সে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাঁর আগমনবার্তা জানিয়ে আসত। এমনই ছিল তার উৎসাহ। শৈশবেই তার মৃত্যু হয়।

শ্রাবণ মাসে (১৩০০) গোসাঁই কণ্ঠনালীতে ব্যথা বোধ করেন। মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে। কিছুই খেতে পারেন না। ঢোঁক গিলতে ব্যথা। জলপান করতেও কষ্ট। রামকৃষ্ণদেবের অন্তিম অবস্থার কথা ভেবে সকলে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কর্কট-

রোগ না তো! ঢাকায় তখনও ক্যান্সার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নি। আর একদিনও দেরী করা ঠিক নয়! শ্রাবণেই গোস্বামীপ্রভুকে নিয়ে শিষ্যেরা কলিকাতা রওনা হন। যোগজীবন, শান্তিসুধা, কুতুবুড়ী, মুক্তকেশী দেবী, জগদ্বন্ধুবাবুও সঙ্গে যান। গোয়ালন্দের স্টীমারে ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভুর কাছে প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'গোসাঁই, আপনার গলার ঘা, ও কিছু নয়। কাল কচুর রস নিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেবেন। দুদিন দিলেই সেরে যাবে। এর জন্য কোন ডাক্তার দেখাতে হবে না, চিকিৎসারও প্রয়োজন নেই।'

গোসাঁই অভয়বাবুর বাড়ীতে উঠে কাল কচুর রস লাগিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হন। এদিকে রাখাল রায়চৌধুরী গোস্বামীপ্রভুকে তাঁর বাড়ীতে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিন দিন অভয়বাবুর গৃহে থেকে, সকলকে নিয়ে গোসাঁই ৪১, সুকিয়া স্ট্রীটে রাখালবাবুর ত্রিতল বাড়ীতে চলে যান। দোতলার হল-ঘরে প্রভুর আসন পড়ে। পরমহংসজী আসন ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে তাঁকে বারণ করেন।

একদিন উমাচরণ দাশ আসেন। পূর্বে অভয়বাবুর বাড়ীতে থাকা-কালীন তাঁকে গোসাঁই কথা দিয়েছিলেন, 'আবার এলে আপনার ওখানে যাব।' দাশ মহাশয় তাঁকে বলেন, 'ঠাকুর, আমার ওখানে আপনার পদধূলি পড়বে না এবার?' প্রভু কি করেন? সত্যসন্ধ ভক্তবৎসল গোস্বামীপ্রভুর উভয়সংকট। সত্যরক্ষা না গুরুবাক্য পালন? হ্যাঁ, যাবেন; দিন-ক্ষণ তিনি বলে দেন। উমাচরণবাবুর উৎসাহের অন্ত নেই। টাকা-পয়সার অভাব নেই। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী; কলিকাতার ডেপুটি পোস্ট-মাস্টার জেনারেল। কলিকাতা ও আশে-পাশের গুরুভ্রাতাদের ঐদিন তিনি নেমন্তন্ন করেন। তাছাড়া আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদেরও বাদ দেন না। গুরুর আগমনে তাঁর গৃহে সেদিন মহোৎসব। মুকুন্দ ঘোষের পালা-কীর্তনের ব্যবস্থা হয়। ভক্তসঙ্গে গোস্বামীপ্রভু নির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌঁছেন। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যে গোসাঁই আসরে এসে বসেন। আনন্দের লহরী; মুগ্ধচিত্তে প্রভু পালাগান শোনেন। তারপর তিনি মহাভাবে কীর্তনে উদ্দন্ড নৃত্য করেন। কীর্তনান্তে প্রভুর ১০৫° জ্বর হয়। তাঁর পক্ষে আর থাকা সম্ভব হয় না। উমাচরণবাবুকে ডেকে তিনি লিখেন, 'এখনই আমার আসনে ফিরে যেতে হবে। কেউ যেন প্রসাদ না পেয়ে যান না।' নিজেও করজোড়ে আগন্তুকদের জ্ঞাপন করেন, 'আপনারা পেটভরে প্রসাদ পেয়ে যাবেন। উমাচরণবাবুর ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি নাই।' হরিষে বিষাদ। উমাচরণবাবু মনমরা হয়ে যান। তৃতীয় দিনে প্রভু নিরাময় হন। গোসাঁই বলেন, 'গুরোর্বাক্যম্ সদাসত্যম্। গুরু-আজ্ঞার উপরে সত্যরক্ষার মর্যাদা দিয়েছিলাম। গুরুজী কৃপা করে বুঝিয়ে দিলেন গুরুবাক্য সদাসত্য।' তাঁর পীড়া সম্বন্ধে গোসাঁই বলেন, 'কড়াতে ঘি চাপিয়ে তা ফুটালে যেমন গরম হয়, শরীরটি ঐরূপ দগ্ধ হতে লাগল। নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় দেহ থেকে সরে বসলাম। অমনি মনে হল দেহের ভোগটি করে নিতে হবে। আলগা থাকা ঠিক নয়। তাই আবার শরীরে প্রবেশ করলাম। পূর্বে শরীরের একটু পীড়া হলেই মন খারাপ হত। এখন দেখি, শরীর ও আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। যেমন হিমালয়ের নিকট গেলে শরীরে শীত বোধ হয়, সেইরূপ শরীরে ব্যথা কি পীড়া হলে জানা যায় মাত্র; ভোগ শরীরেই হয়। গুরুবাক্য লঙ্ঘন করে সত্যপালনেও যে অপরাধ, এবার তাহাই বুঝালেন।' পরমহংসজী এরপর আসন ত্যাগ করে অন্যত্র যাবার নিষেধ প্রত্যাহার করেন।

রাখালবাবুর বাড়ীতে অনেকেই সাধন পান। একদিন গৃহস্বামী তাঁর কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুকে সাধন দিতে গোসাঁইকে অনুরোধ করেন। প্রভু তাঁকে বলেন, 'আমার কাছে ওঁদের সাধন হবে না।' রাখালবাবু গুরুকে বলেন, 'কত হীনচরিত্র লোককে আপনি সাধন দিচ্ছেন, আর ওঁরা সদাশয় সচ্চরিত্র ব্যক্তি। তথাপি তাঁরা পেলেন না!' গোসাঁই বলেন, 'কে এই সাধন পাবার যোগ্য তা আপনাদের বুঝা ভার; আমি খাতির করে কাউকে সাধন দেই না। আমার নিজের এতে কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাই। গুরুজীর আদেশে আমি সাধন দেই।' রাখালবাবু একদিন মন্তব্য করেন, 'গোস্বামী মহাশয় লোক দেখে খাতির করেন।' এই কথা শুনে প্রভু লিখেন, 'কি? আমি কি কারও কোন তোয়াক্কা করি? এই যে আপনার বাড়ীতে রয়েছি এর জন্য আপনাকে কোন খাতির করি? কি করে আপনি অমন কথা বলতে পারলেন?' রাখালবাবু মুখ কাল করে ভিতর-বাড়ীতে চলে যান। পরদিন ভোরে গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করে তিনি বলেন, 'গতদিন সারারাত আমার ঘুম হয় নি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, "লোক দেখে দয়া করেন।" কিন্তু মুখ দিয়ে খাতির কথাটি বের হয়ে গেল। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' প্রভু নীরব থাকেন।

মৌন থাকার নির্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও গোসাঁই মৌন ভঙ্গ করেন না দেখে, শিষ্য ও ভক্তেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, 'মৌন থাকতেই ভাল লাগে; কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় না।' প্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথা শোনার জন্য শিষ্যেরা উদ্‌গ্রীব। আবার কেউ কেউ বলেন, 'মৌন অবস্থার কথা এক অপার্থিব সম্পদ।' নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখা খাতা পড়ে বলেন, 'গোসাঁই যদি আরও কিছুদিন মৌন থাকেন, তাহলে ভাল হয়। তিনি মৌনই থাকুন। এই খাতা অপূর্ব গ্রন্থ হবে। এ-সব পড়ে জগতের বিশেষ কল্যাণ হবে।'

বেলা এগারটা নাগাদ একদিন গোসাঁই আসন থেকে উঠে ভিতরে গেলে, মহেন্দ্র মিত্র হলঘর ঝাঁট দিতে থাকেন; রাখালবাবু তাঁকে বারণ করেন। তাঁকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'ঝাড়ুর শলায় মসৃণ মেঝেতে দাগ পড়ছে।' মহেন্দ্রবাবু আপন মনে ঝাড়ু দিয়ে চলেন। গোসাঁইর আসনের নীচ পরিষ্কার করতে শুরু করলে, রাখালবাবু বিরক্ত হয়ে বলে উঠেন, 'কচ্ছেন কি? গোস্বামী মহাশয়ের আসনে লাগছে যে!' চকিতে মহেন্দ্রবাবুর কি যে হল! তিনি বিজ্ঞ ও বিবেচক মানুষ। কিন্তু উন্মাদের ন্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে, হাতের ঝাঁটা দিয়ে, ব্রাহ্মণ-জমিদার সতীর্থ গৃহকর্তাকে সজোরে কয়েক ঘা বসিয়ে, আবার যথাপূর্ব ঝাঁট দিতে থাকেন। রাখালবাবু হতভম্ব! একটি কথা না বলে তিনি হলঘর ছেড়ে চলে যান। আহারান্তে গোসাঁইর কাছে শিষ্যেরা মহেন্দ্রবাবুর অশিষ্ট আচরণের কথা পাড়েন। প্রভু মর্মান্তিক ক্লেশ প্রকাশ করে লিখেন, 'মহেন্দ্রবাবুর ঐরূপ করা অতিশয় অন্যায় হয়েছে। রাখালবাবু ইচ্ছা করলে অনায়াসে দারোয়ানকে হুকুম করে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেন নাই। এতে রাখালবাবুর অসাধারণ ধৈর্য ও স্বভাবের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।'

ভাদ্র মাসে (১৩০০) হরিদাসবাবু আসেন বোলপুর থেকে। স্ত্রীর সাধন হবে। এই সময় হরিদাসবাবুর মধ্যে মধ্যে আত্মদর্শন হত। তিনি দেখতে পেতেন তিনিই যেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আয়নাতে এত স্পষ্ট দেখা যায় না। শরীরের ভিতরও যেন দেখা যায়। গোস্বামী মহাশয় হরিদাসবাবুর মুখে এ-সব কথা শুনে

বলেন, 'সাধন ঠিক ঠিক হচ্ছে।' তাঁর স্ত্রীর সাধন হয়। 'নাম' পাওয়া মাত্র হরিদাসবাবুর স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রাখালবাবুর গৃহেই হরিদাসবাবু আছেন। গোসাঁইর আসনের পাশেই হরিদাসবাবুর বিছানা হয়। রাত্রি এগারটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত পাঁচ-ছবার তাঁর ঘুম ভাঙে। প্রতিবারই তিনি দেখেন গোস্বামী মহাশয় আসনে উপবিষ্ট। ভোরে তিনি গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কি! আপনি একটুও ঘুমালেন না!' প্রভু বলেন, 'দুর্লভ সময় কি ঘুমিয়ে নষ্ট করা যায়?' হরিদাসবাবু মনে মনে ভাবেন,, 'কি প্রবল আকর্ষণে যে এঁর কাছে ছুটে আসি! ইনি নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে। লজ্জা, মোহ, শোক, ভয়, ওঁর কিছুই নেই। ইনি নিদ্রাও জয় করেছেন। কাম-ক্রোধাদি ওঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সব রকম আসক্তির ইনি অতীত। ভগবানে তাঁর একান্ত নির্ভর। মহাপুরুষের সমুদয় লক্ষণই ওঁর মধ্যে আছে। তবে কেনই বা তিনি পৌত্তলিকতা প্রশ্রয় দেন? গৌর-নিতাই, রাধাশ্যাম ভজন করে কি কেউ কখন ধর্মলাভ করতে পারেন?' ঠিক তন্মুহূর্তে গোস্বামীপ্রভু বলে উঠেন, 'যে উপায়েই হউক না কেন, অবস্থা লাভ হলেই হল। অবস্থা লাভই প্রয়োজন।'

রাখালবাবুর গৃহে অবস্থান ও প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যোগদান

রাখালবাবু গোস্বামী মহাশয়ের জন্য একটি পশমের আলখিল্লা প্রস্তুত করায়ে এনে তাঁকে দেন। ঐদিন অপরাহ্ণে এক বৈষ্ণব আর বৈষ্ণবী এসে গোপীযন্ত্র আর মন্দিরা বাজিয়ে গোসাঁইকে গান শোনান। গোস্বামীপ্রভু তাঁদের গান শুনে প্রীত হয়ে ঐ আলখিল্লা, টাকাকড়ি, কম্বল, কমণ্ডলু, এমন কি তাঁর বসার আসনখানি পর্যন্ত ওঁদের দিয়ে নিজে খালি মেঝেতে বসেন।

একদিন শিষ্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাধ হয়, ঠাকুরের চরণধূলি নেন। গোসাঁই আসনে চোখ বুজে আসীন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাত বাড়াতেই প্রভু বলে উঠেন, 'একি? একি? একি করছ? এ-সব গৌড়ীয়া ভাব, আমার পায়ের ধূলি নিতে চাও তো, বেড়াবার সময় যেখানে আমার পা পড়ে, ওখানের ধূলি নিলেই পার।'

আশ্বিন মাসে (১৩০০) গোস্বামীপ্রভুর ঢাকা ফিরে যাবার কথা হয়। খবরটি যোগজীবন গোস্বামী কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়কে চিঠি লিখে জানান। চিঠি যখন পড়া হয়, কেলে উপস্থিত ছিল। তখন থেকে সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তার পিঠে ঘা হয়েছিল। ঐদিন হতে ঘাও শুকাতে থাকে। কয়েকদিন পরে আবার চিঠি আসে—গেণ্ডেরিয়া ফিরতে অনেক দেরী হবে। কেলের ঘা আবার বাড়ে। কয়েকদিন পরে তার মৃত্যু হয়। আশ্রমের পুকুরপাড়ে তার মরদেহ সমাহিত করা হয়।

চেয়ারম্যান আর আশ্রমে থাকে না। আশ্রমের কোন লোককে বাইরে দেখলে তাঁর সঙ্গে আশ্রমের দরজা পর্যন্ত এসে ফিরে যেত, কিন্তু আশ্রমে প্রবেশ করত না।

ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসেন। তাঁদের সঙ্গে গোসাঁইর ব্রাহ্মধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ ও শাস্ত্রসদাচার নিয়ে নানা আলোচনা হয়। প্রভু লিখেন, 'ধর্মের নূতন কথা বলতে সেই ঋষিদেরই শক্তি ছিল। তাঁরা দয়া করে যে সকল ধর্মমত শাস্ত্ররূপে রেখে গেছেন, তা বুঝতে পারি, তেমন ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে তাঁদের উপদেশ যথাযথ পালন করতে ইচ্ছা হয়। এখন শারীরিক, সামাজিক

ও অন্যান্য অনেক কারণে প্রকৃত শাস্ত্র, সদাচারের অনুগত হওয়াও কঠিন বোধ হচ্ছে। ঋষিবাক্যই সার, এখন ইহা বুঝি।'

একদিন এই বাড়ীতে আনন্দমোহন বসু এসে গোসাঁইর সঙ্গে নিরিবিলি অনেক আলাপ করেন। তিনি প্রসন্নচিত্তে বিদায় নিলে, প্রভু লিখেন, 'যাবার সময় তিনি দুঃখ করে বলে গেলেন, 'গোসাঁই, জীবন বৃথা গেল। মনে করতাম, ধর্ম হচ্ছে, কিন্তু এখন দেখি কিছুই হয় নি। এই কষ্ট নিবারণের কি উপায়?' প্রভু তাঁকে কি বলেছিলেন জানা নেই, তবে বসু মহাশয় খুব তৃপ্তি পেয়ে গেলেন, তা তাঁর মুখ দেখে বুঝা গেল।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় রাখালবাবুর বাড়ী এসে গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দুজনে অনেক কথাবার্তা হল। আর কেউ ছিলেন না ঘরে। যাবার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রাখালবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন লাগল গোস্বামী মহাশয়ের কথা?' শীল মহাশয় বলেন, 'সমস্ত ফিলসফির উপর গোসাঁই হেগে দিয়েছেন। কোথায় দাঁড়িয়ে যে তিনি কথা বললেন, কিছুই বুঝলাম না। সেই অগাধ সমুদ্রে প্রবেশ করতেও পারলাম না।'

মনোহরদাস বাবাজী মধ্যে মধ্যে আসেন। ব্রাহ্মসমাজে কীর্তন প্রবর্তন থেকে প্রভুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। বাবাজী সেদিন বিদায় নেবার সময় গোসাঁই তাঁর নূতন মলিদার চাদরখানা তাঁকে দিয়ে দেন। এতে ভক্তদের মনে দুঃখ হয়। প্রভু একদিনও চাদরখানা গায় দেন নি। পরদিন একটি শিষ্য পশমের একখানি সুন্দর চাদর এনে গুরুকে দেন। তিনি সাগ্রহে গায়ে দিয়ে বসেন। অপর দুটি শিষ্য ঐ সময় মন্তব্য করেন, 'এই চাদর কয়দিনই বা আর গায় দেবেন!' তাঁদের কথা শুনে গোসাঁই চাদরখানা ছুঁড়ে ফেলে লিখেন, 'সম্পূর্ণ স্বত্ব ত্যাগই দান। যাকে দেবে সে অগ্নিতে দগ্ধ করলেও দাতা কিছু বলতে পারেন না। কারণ তখন সেই বস্তু আর তাঁর নয়। দাতা যদি মনে করেন, "আমার দ্রব্য আমার অভিপ্রায় মত ব্যবহার করতে হবে", তাহলে একে দান বলে না, গচ্ছিত রাখা বলে। শাস্ত্রে একে "ন্যস্ত বস্তু" বলা হয়েছে। ন্যস্তবস্তু দান করা ও গ্রহণ করা পাপ। তোমাদের মনে এ-ভাব আছে। আমি যাচ্ঞা করি না। যদি আমার কোন ব্যবহারে যাচ্ঞার ভাব প্রকাশ হয়ে থাকে, তাহা আমার অপরাধ সন্দেহ নাই। আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নই। সুতরাং আমার ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। যখনই ত্রুটি দেখবে, তখনই বন্ধুভাবে বলবে। মনে মনে রেখ না। যিনি আমার দোষ দেখিয়ে দেন, তিনি আমার পরম বন্ধু; আমি তাঁকে ভালবাসি। হাজার রসগোল্লা দাও, কাপড় দাও, তাতে ভবি ভুলে না; কেবল দোষ দেখালে ভুলে। ভগবদ্ কৃপায় তোমাদের মঙ্গল হউক।'

আশ্বিন মাসেই (১৩০০) একদিন মনোহরদাস বাবাজী এসে ধরেন, 'প্রভো, দয়া করে এ কাঙ্গালের জীর্ণ আখড়ায় একবার পদধূলি দিতে হবে।' গোসাঁই সম্মত হন। ভক্ত ও শিষ্যেরা পূর্বাহ্নে বাবাজীর আখড়ায় যান। রাখালবাবু তাঁর ল্যাণ্ডো গাড়ি করে গোসাঁইজীকে নিয়ে যান। আখড়ার প্রবেশ পথে দশটি মৃদঙ্গ নিয়ে বৈষ্ণবেরা অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ি পৌঁছামাত্র খোল-করতাল বেজে ওঠে। গোসাঁই গাড়ি থেকে নেমে পথে সাষ্টাঙ্গ দেন। তারপর 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলে হুঙ্কার দিয়ে প্রভু ভাবাবেশে আখড়ার দিকে অগ্রসর হন। গায়ের শাল, মলিদা, বনাত, যাঁর গায়ে যা ছিল, ভক্তেরা গোসাঁইর পথের উপর পেতে দেন। বৈষ্ণবেরা গান ধরেন—

বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে?

বহুক্ষণ কীর্তন হয়। অনেকে সম্বিত হারান। কীর্তনান্তে লুঠ দিয়ে, গোসাঁই বাসায় ফিরেন।

৯ আশ্বিন (১৩০০) রাত্রি সাড়ে দশটায় গোস্বামীপ্রভু মনোরঞ্জনবাবুকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবানীপুরের গৃহে পাঠিয়ে তাঁকে খবর দেন, পরদিন সুকিয়া স্ট্রীটে রাখালবাবুর গৃহে তাঁর সাধন হবে। তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন। মনোরঞ্জনবাবুই নির্দিষ্ট সময়ে তাঁকে নিয়ে আসবেন। সেই যে দর্জিপাড়ায় সতীশবাবু গোসাঁইকে একদিন দর্শন করেন, তারপর আর যোগাযোগ নেই। সতীশবাবু আনমনা হয়ে পড়েন। 'হ্যাঁ, না' কোন উত্তর করেন না। পরদিন মনোরঞ্জনবাবু আসতেই তাঁর সঙ্গে তিনি বের হয়ে পড়েন। ১০ আশ্বিন (১৩০০) প্রভুর কাছে সাধন পেয়ে অধ্যাত্ম নাম-সাধনায় তিনি ডুবে যান। দিন দিন তাঁর গুরুর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। ঐদিন হেমেন্দ্রনাথ মিত্রও গোসাঁইর কাছে সাধন পান।

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী পশ্চিম থেকে ফিরার পথে রাখালবাবুর বাড়ীতে গুরুকে দর্শন করতে আসেন। গোসাঁইর কাছে সর্বদা একজন লোক থাকা আবশ্যক বলে, এ ভার কুলদানন্দের উপরই পড়ে। উনিশ বছর থেকে সাতাশ বছর পর্যন্ত তাঁর আট বছরের ডাইরী 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' নামে পাঁচ খণ্ডে পরে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থপঞ্চক জাগতিক আত্মকেন্দ্রিক কীর্তি-কলাপের ফিরিস্তি নয়। সত্যের দিশারী, অহমিকা ধুয়ে-মুছে, নিজের জীবনের গ্লানির কথা, ভুল-ভ্রান্তির কথা, দুর্বলতার কথা, রিপুর দৌরাত্ম্যের কথা, দুর্দৈবের কথা বর্ণনা করেছেন অবলীলাক্রমে। তাঁর আত্মশক্তির ক্রমবিকাশে গুরুশক্তির খেলার কথাও তিনি বলেছেন অকপটে। জীবন-দেবতার অন্বেষণে অভিযাত্রী লিপিবদ্ধ করেছেন—তাঁর অভিজ্ঞতা—প্রচারের প্রেরণায় নয়, প্রশস্তি পাবার প্রত্যাশায় নয়, প্রতিষ্ঠালাভের প্রবৃত্তিতে নয়—আত্মশোধনের শুচিশুদ্ধ নিরীক্ষায়। আত্মকেন্দ্রিক কৃতিত্ব ও যশোগাথার অনুবৃত্তি এতে নেই।

১২৯৩ সন থেকে ১৩০০ সন বা তাঁর উনিশ বছর বয়স থেকে সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত আট বছরের আধ্যাত্মিক মার্গে উত্থান-পতনের কথা, আত্মশোধনের প্রয়াসের কথা, গুরুবাক্যে নিষ্ঠা ও আনুগত্য লাভের অদম্য অধ্যবসায়ের কথা বলতে বলতে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ হঠাৎ নীরব হয়ে গেছেন। এই অপরিণত বয়সে মানুষ সহজাত বুদ্ধিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকে। কিন্তু আত্মোন্নতির শিখরে পৌঁছে সাতাশ বছর বয়সে ব্রহ্মচারী হয়ে গেলেন স্তব্ধ। কুলদানন্দজী তাঁর দোষ-ত্রুটি, পদস্খলনের কথা অসংকোচে লিখেছেন। রাখালবাবুর বাড়ীতেই গুরুকন্যা কুতুবুড়ীর প্রতি তাঁর মোহ জন্মে। তিনি শ্রীগুরুর কাছে গিয়ে তাঁর দুর্বলতার কথা অকপটে বলেন। তাঁরই কথায় বলি, 'উত্তেজনার প্রবল স্রোত যখন আসিতে লাগিল, তখন নাম-ধ্যান, সাধন-ভজন সমস্তই ভাসাইয়া নিয়া চলিল। তুফানের ঝাপটা যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, উত্তেজনাও আমার তদ্রূপ বাড়িয়াই চলিল। ক্রমে ক্রমে উহা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, ঠাকুরের নিকটও আর বসিতে পারিলাম না। একবার ঘর, একবার বাহির করিতে লাগিলাম। অবশেষে স্থির থাকিতে না পারিয়া ঠাকুরকে বলিলাম, "কয়দিন যাবৎ কুতুর উপরে আমার ভয়ানক

আকর্ষণ আসিয়া পড়িয়াছে, এখন আর বহু চেষ্টাতেও অমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। কখন কি করিয়া ফেলি, বলিতে পারি না। আপনাকে জানাইয়া রাখিলাম।”’

কাম, ক্রোধ, লোভ, অভিমানে তাঁর চিত্তের বিক্রিয়া নিয়ে আর কত সব ঘটনা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন যা অন্যথা প্রকাশের কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

মৌন অবস্থায় একদিন গোস্বামীপ্রভু লিখেন, ‘মনোরঞ্জনবাবুর এখনও “নির্ভরতা” আসে নাই, কিন্তু মনোরমা মার সম্পূর্ণ “নির্ভরের” অবস্থা।’ স্বামী-স্ত্রীর গুরুপ্রেমের কথা শুনলে মনে হয় পৌরাণিক কাহিনী। মনোরঞ্জনবাবুর দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। গুরুকৃপায় সম্মোহনশক্তি-প্রয়োগে কত রোগীকে যে তিনি নিরাময় করেছেন, অথচ কোন পারিশ্রমিক নিবার জো নেই। মুর্শিদাবাদের নবাব বাত-ব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে তাঁর কাছে লোক পাঠান। সুস্থ হয়ে নবাব খুশি হয়ে তাঁকে দশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিতে চাইলে তিনি বিনীতভাবে তাঁকে বলেন, ‘আমার গুরুজীর হুকুম নেই।’ নবাব তাঁর লোককে মনোরঞ্জনবাবুর জন্য ফার্স্ট ক্লাস রেল-টিকেট কিনে দিতে বললে মনোরঞ্জনবাবু তা শুনে বলেন, ‘থার্ড ক্লাসেই আমি যাতায়াত করি।’ মনোরঞ্জনবাবুর পরিবারের সাহায্যের জন্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২) সপ্তাহে তিন ঘণ্টা সাউথ সুবারবন স্কুলে শিক্ষকতা করে মাসে ষাট টাকা পেতেন। এই টাকাটা মনোরঞ্জনবাবুর পরিবারে তিনি খরচ করতেন। আশ্বিন মাসে (১৩০০) গোসাঁইজী যখন রাখালবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন, তখন মনোরঞ্জনবাবু ছিলেন উমাচরণ দাশের ভাই ভগবতী দাশের ভবানীপুরের গৃহে। মিসেস এনি বেসেন্ট ঐ গৃহে এসে মনোরমা দেবীর সমাধি দেখে মুগ্ধ হন।

মনোরঞ্জনবাবুর ছোট ছেলে দেবরঞ্জনের মুখেভাতের দিন স্থির করে দেন প্রভু। হাতে মাত্র মনোরঞ্জনবাবুর তিনটি পয়সা। তথাপি মন মানে না। গুরুকে আমন্ত্রণ করেন আর গুরুভাইদেরও। সতীর্থদের মনোরঞ্জনবাবু বলেন, ‘টাকা-পয়সা না থাকলে কি প্রাণের লোকদের আসতে বলতে নেই? আর কিছু না হোক, পায়ের ধুলি তো পড়বে। ঠাকুরের কৃপা হলে কোন কিছুরই অভাব হবে না।’

উৎসবের পূর্বরাত্রে মনোরঞ্জনবাবুর চোখে ঘুম নেই। কি হবে, রাত্রি প্রভাতে? কোন ব্যবস্থাই যে নেই! মনোরমা দেবী প্রবোধ দেন স্বামীকে—‘এত ভাবছ কেন? গোসাঁইর তো কাজ, তিনিই সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করবেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে থাক।’ ভোর না হতে ভগবতীবাবুর স্ত্রী এসে মনোরমা দেবীকে বলেন, ‘দিদি, উৎসবে যা সন্দেশ, মিষ্টি লাগবে, আমি তার ব্যবস্থা করেছি। ঠাকুরের সঙ্গে গুরুভাই-বোনেরা সব আসছেন, এত আমাদের সকলেরই উৎসব।’ মনোরমা দেবী হাসিমুখে স্বামীকে গিয়ে খবরটি দেন।

তারাকিশোর শর্মাচৌধুরী (পরে সন্ন্যাসজীবনে যিনি সন্তদাস বাবাজী মহারাজ নামে সুপরিচিত) নবকুমার বাগচীর হাতে কুড়ি টাকা দিয়ে বলেন, ‘উৎসবে এই টাকা কয়টা ব্যয় করবেন; কেউ যেন না জানেন—মনোরঞ্জনবাবুও না।’ আরও অনেক টাকা জুটে। ক্যানিং থেকে মনোরঞ্জনবাবুর দিদি দু মণ ভাল দই এবং আরও নানা জিনিস নিয়ে এলেন। উৎসব হল মহাসমারোহে। গোসাঁই ভক্তসঙ্গে কত আনন্দ করেন। এক সাধু এসে হাজির। ‘কারণ’ না পেলে কিছু নেবেন না বলে বায়না ধরেন। মদ আসে। তিনি আবদার করেন প্রভুর হাত থেকে নেবেন।

গোসাঁই তাই দেন। এ নিয়ে ব্রাহ্ম যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কানাঘুষা হয়। গোসাঁই বলেন, 'অতিথির রুচিমত তাঁর আহারের ব্যবস্থা করতে হয়।'

একদিন প্রতাপ মজুমদারের ছোট ভাই প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং তাঁর অভাব-অভিযোগ জানান। তিনি তাঁকে অর্থ সাহায্য করেন। ভদ্রলোক চলে গেলে রাখালবাবু প্রভুকে বলেন, 'লোকটি পাঁড় মাতাল। এখনই গিয়ে আপনার দেওয়া টাকা দিয়ে মদ কিনে খাবে।' প্রভু বলেন, 'আমি তা জানি। জেনেশুনেই ওকে দিয়েছি। এমনই ওর অভ্যাস হয়েছে যে, মদ না জুটলে চুরি করেও তা খাবে। অর্থ পেয়ে চুরি তো করবে না। একটি অপরাধ থেকে তো রেহাই পেল। যথার্থ অর্থীকে এভাবে দিতে হয়। ভগবান বেশ্যারও উপপতি জুটিয়ে তার জীবন রক্ষা করেন।'

বানাড়িপাড়ার কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতার সহধর্মিণী কুসুমকুমারী দেবী। কুঞ্জবাবু হবিগঞ্জে হেডমাস্টার। বরিশালে গাঁয়ের বাড়ীতে মা, দু বোন আর কিশোরী বধূ কুসুম। আচারী বিধবা তিনজন একাহারী। রাত্রে কুসুমের হাঁড়ি চড়াতে মন ওঠে না। শাশুড়ী, ননদিনীদের কথায় দু-চারদিন মুড়ি, মুড়কি চিবান; তাও পরে খান না। ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষ। কোটালিপাড়া থেকে কয়েকটি দুঃস্থ পরিবার আসে ওঁদের গাঁয়। আর সবার আহার শেষ। হাতের কাজগুলি সেরে নিয়ে কুসুম তাঁর ভাত বাড়েন। খিড়কির বাইরে করুণ মিনতিভরা আকুতি —'খেতে দে, মা।' কুসুম তুলে ধরেন বাড়া ভাত। তৃপ্তিতে তাঁর মন ভরে ওঠে। শাশুড়ী, ননদিনী জানতে পারেন না। অনাথারা পায় অকূলে কূল। রাতে মুড়ি-চিড়া খান। পরদিনও এসে ওরা হাজির কুসুমের ঠিক অহারের সময়। ঐদিনও অনাহার, পরের দিনও। শরীরে তা সইবে কেন? দেহ আর চলে না। বাসন নিয়ে ঘাটে যান। মাথা ঝিম্-ঝিম্ করে। ক্ষুধার জ্বালায় তিনি কেঁদে ফেলেন। গোসাঁইর কাছে প্রার্থনা করেন, 'ঠাকুর, তুমি আমার ক্ষুধা নিয়ে নাও।' ক্ষুধাকে ফুল কল্পনা করে অর্ঘ্য দেন তিনি শ্রীগুরুর চরণে। চোখ মেলে দেখেন তাঁর অঞ্জলিভরা সাদা-সাদা ফুল। আর গোস্বামীপ্রভু জলে দাঁড়িয়ে। সকরুণ তাঁর চাহনি। চরণামৃত-জ্ঞানে, দুহাত ভরে আকণ্ঠ তিনি জলপান করেন। ঐ মুহূর্ত থেকে ক্ষুৎ-পিপাসা হয় লয়। আঠার মাস নিরাহার। দুর্বলতার লেশমাত্র নেই। রাখালবাবুর গৃহে গুরুদর্শনে এলে, স্যার নীলরতন সরকার তাঁকে পরীক্ষা করে হন হতবাক। দেহের পুষ্টি স্বাভাবিক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিস্ময়! সন্তান-সম্ভবা হলে গোস্বামীপ্রভু তাঁকে খেতে আদেশ করেন। তখন থেকে ফিরে আসে ক্ষুৎ-পিপাসা। গোসাঁইর কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। সদ্‌গুরুর লীলা![১]

শৌচান্তে সকালে আসনে বসে গোসাঁই গ্রন্থে স্বহস্তে চন্দন দেন। পরে চন্দনের কটোরাতে দুটি আঙ্গুল ডুবিয়ে ঘরের প্রাচীরে টানান দেব-দেবীর ছবিগুলি লক্ষ্য করে প্রভু চন্দন ছিটান। ছবিগুলি আট-ন ফুট উপরে আর ওঁর আসন থেকে পনর-কুড়ি ফুট দূরে। খানিকবাদে চন্দন শুকিয়ে উঠলে দেখা যায়, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, হরগৌরী, কালীদুর্গা সকল ছবিরই চরণে গিয়ে চন্দন পড়েছে। ছবিগুলি এত দূরে থাকা সত্ত্বেও ঠিক চরণে গিয়ে কি করে চন্দন পড়ে, এ এক বিস্ময়! আবার লক্ষ্মণের ছবির গায়ে বা পায়ে এক ফোঁটা চন্দন নেই! গোসাঁইর দৃষ্টি

---

[১] গোস্বামীপ্রভুর শিষ্যা কুসুমকুমারী দেবী (গুহঠাকুরতা) প্রমুখাৎ শ্রুত।

আকর্ষণ করায় তিনি বলেন, 'কি করে পড়বে? লক্ষ্মণ যে ব্রহ্মচারী।'

রজনী প্রভাত হয়-হয়। প্রভু বলেন, 'ব্রহ্মচারি, একটু মিশ্রি দাও তো। তেষ্টা পেয়েছে।' ব্রহ্মচারীর মধ্যে তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। গুরুর আসনের তিন-চার হাত ব্যবধানে থেকেও তাঁরই দেওয়া ব্রহ্মচর্যে কেন ব্যাঘাত ঘটে? দুঃখে, অভিমানে মিশ্রি নিতে উঠেন। প্রভু তাঁকে বলেন, 'খাবার কিছু দিতে গেলে হাত ধুয়ে নিতে হয়। নাও জল নাও।' এই বলে কমন্ডলু থেকে নিজেই জল ঢেলে দেন। কুলদানন্দজীর মনে চলে অন্তর্দাহ। সতীর্থদের কাছে ঘটনাটি বিবৃত করে মনকে হালকা করতে চান। কিন্তু তাঁরা ক্ষেপে উঠেন। তাঁকে বলেন, 'তোমার অমন সেবার জন্যই ঠাকুরের শরীর ভাল থাকে না। শুচিতা মেনে চলবে তো! তোমার হাতে গোস্বামী মহাশয় আর যাতে কিছু না নেন, সেই ব্যবস্থা আজ করব।' ওঁরা গিয়ে গোসাঁইকে সব বলেন। অনুতপ্ত ব্রহ্মচারী ভাবেন, 'প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।' তিনিও গিয়ে গুরুর কাছে দাঁড়ান। তাঁকে প্রভু জিজ্ঞাসা করেন, 'ব্রহ্মচারি, মহেন্দ্রবাবু ওঁরা যা বলছেন, তা কি ঠিক? তুমি কি ওরূপ করেছিলে?' কুলদানন্দজী বলেন, 'হ্যাঁ।' ছলছল চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে গোসাঁই বলেন, 'এখন থেকে তোমার ও হাতে যা আমাকে দেবে, পরম পবিত্র মনে করে আমি তা গ্রহণ করব।' ব্রহ্মচারী কেঁদে হন আকুল। তাঁর রোজনামচায় লিখেন, 'হায়! হায়! আজ আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা হয়! দেখি এমন কোন পাপাচারণই নেই, যা ঠাকুরের স্নেহ, মমতা, দয়া থেকে বিমুখ করে! ধন্য ঠাকুর—এই ঘৃণিত পাষন্ডকে তুমি আপনার বলে গ্রহণ করেছ। তোমার এই দয়া যে আমি সইতে পারি না। জন্ম-জন্মান্তরের সাধন-ভজনে কঠোর তপস্যায় যে অবস্থা মানুষের আয়ত্তে আসে না, আমার জঘন্য কার্যের শাস্তি বিনিময়ে তুমি যে আমাকে ঐ দেবদুর্লভ অধিকারই দিলে! এ কি অদ্ভুত আচরণ!'

মণি মজুমদার অফিস থেকে বাড়ী ফিরে শুনেন, গোস্বামী মহাশয় এসেছিলেন। তাঁর মা বলেন, 'মণি, তোর গোসাঁই যথার্থ নিরাপদ আশ্রয়। তিনি এলে তাঁকে ঠাকুরঘরে বসিয়েছিলাম। ঘর আলো হয়ে যায়। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি, আসন থেকে নেমে বিগ্রহঠাকুর গোসাঁইর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।' মণিবাবুর বিশ্বাস হয় না। গোসাঁইর ওখানে গিয়ে তাঁকে মার বর্ণিত বিবরণ উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করেন, 'এও কি সম্ভব?' প্রভু বলেন, 'মার কথা কি মিথ্যা?'

হেমন্তের মাঝামাঝি; ছুটির দিন। অফিস-আদালত বন্ধ। সকাল থেকে রাখালবাবুর বাড়ীতে ভিড় উত্তরোত্তর বাড়ে। গোসাঁইর চা-সেবনের পর খোল-করতাল বেজে ওঠে। রেবতীমোহন সেন এসেছেন। তাঁর কীর্তন শুনে গোস্বামী-প্রভুর চেহারা আর এক রকম হয়ে যায়। রেবতীবাবুকেও যেন কীর্তনে পেয়ে বসে। গুরুর সৌম্যমূর্তি থেকে প্রেরণা পেয়ে তাঁর কণ্ঠে প্রকাশ পায় কত বিচিত্র সুরলহরী। কি যে তার উন্মাদনা! রেবতীবাবু গান ধরেন—

তব শুভ সম্মিলনে, প্রাণ জুড়াব, হৃদয়স্বামি।
কবে বসিব একান্তে প্রাণকান্ত, তোমায় নিয়ে আমি॥
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, গোপীগণসনে।
তোমার নিত্যপদ সেবি, প্রভো, কৃতার্থ হইব আমি॥

গানের পদ শুনে গোসাঁইর প্রেমবিহ্বল অঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। ঠোঁট ঘন ঘন কাঁপে। বাঁ হাত কটিদেশে রেখে প্রভু নৃত্য করেন মধুর ভঙ্গিমায়। কান্নার রোল ওঠে। বহির্বাস শিরোপরি প্রভু অবগুণ্ঠনের মত ধরেন। তাঁর দীর্ঘ কলেবর

খর্ব হয়ে যায়। লুঠ দেবার মত কি যেন ছুঁড়তে থাকেন চারদিকে। আজ হুঙ্কার নেই, গর্জন নেই, উদ্দণ্ড নৃত্য নেই। ভাবে সব বিভোর। এক পশ্চিমদেশীয় সাধু পথে যেতে যেতে রেবতীবাবুর কীর্তন শুনে থমকে দাঁড়ান। যাবার সময় মন্তব্য করে যান, 'যিনি গান গাইছেন, তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী না হলেও তাঁর কণ্ঠস্বর অসাধারণ! সঙ্গীতশাস্ত্রে আছে, "এরূপ নাদে ভগবান আকৃষ্ট হন।"'

রেবতীবাবুর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেন—

তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী?
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।[১]

প্রভু লিখেন, 'ভগবানের কার্য দেখে লোক এত অভ্যস্ত যে, কেহই ভগবানের প্রশংসা করে না। রবিঠাকুর গান করেন আর লোকে কত প্রশংসা করে। ভগবান কি আশ্চর্য কৌশলে বাগ্‌যন্ত্রের সৃষ্টি করেছেন। তোমার মনের যেমন ভাব হবে, বাগ্‌যন্ত্রে ঐরূপ শব্দ হবে। রাগ-রাগিণীর কোন রূপ নাই—মনের ভাব মাত্র। সেই ভাব মনে আসামাত্র নানা রাগ-রাগিণী কণ্ঠার শিরাতে বাজতে থাকে। নিরাকার ভাব সাকার হয়ে রাগ-রাগিণীতে পরিণত হয়। ইহার প্রশংসা কেহ করে না। কণ্ঠার শিরা কটি মাত্র—তাতে সব সুর প্রকাশ পায়; উচ্চ, নীচ, হ্রস্ব, প্লুত বিবিধ শব্দ ঐ শিরাগুলিতে বাজে।

পরবর্তীকালে একদিন কথাপ্রসঙ্গে কবি, নাট্যকার ও স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আত্মজ শ্রীদিলীপ রায়কে বলেন, 'একবার রেবতী সেনের গান শুনিস। গান কি বুঝবি!' প্রবাসে এরপর রেবতীবাবুর সঙ্গে দিলীপবাবুর সাক্ষাৎ হলে তিনি বিনীতভাবে তাঁর গান শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রেবতীবাবু তাঁকে বলেন, 'আমি তো মানুষের প্রীতির জন্য গান গাই না। তবে কলিকাতায় শীঘ্রই ভগবানের বিগ্রহকে আমি গান শোনাব। তুমি যদি শুনতে চাও, তাহলে ওখানে যেও।' এই বলে তিনি বিগ্রহ-মন্দিরের ঠিকানা এবং তাঁর ভজন গাইবার নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় বলে দেন। গান শুনে দিলীপবাবু মুগ্ধ হন।

প্রয়াগে এবার পূর্ণ কুম্ভ। এই কুম্ভে উপস্থিত থাকার জন্য চারজন মহাপুরুষ গোস্বামীপ্রভুকে বিশেষভাবে ধরেছেন। তাঁরাও আসবেন বলে স্থির করেছেন। লোকালয়ে তাঁরা আসেন না। বদরিকা আশ্রমের শত শত ক্রোশ উত্তরে হিমালয়ের দুর্গম স্থানে তাঁদের বাস। এলাহাবাদের ডাঃ গোবিন্দবাবুকে প্রভু চিঠি লিখান, 'একখানা বড় বাড়ী পৌষ মাসের জন্য যেন ভাড়া করেন।' অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি গোস্বামীপ্রভু, যোগজীবন, শান্তিসুধা, কুতুবুড়ী, মুক্তকেশী দেবী, জগদ্বন্ধুবাবু, মহেন্দ্রবাবু, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ও বিধু ঘোষকে নিয়ে এলাহাবাদ রওনা হন। পথে শোনপুরে হরিহর ছত্রের মেলা দেখে তাঁরা বাঁকিপুরে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এই সময় যোগজীবন গয়া গিয়ে তাঁর ঠাকুরমার পারলৌকিক ক্রিয়া করেন।

প্রভু এলাহাবাদে পৌঁছে দেখেন, সাগঞ্জে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে। দোতলা বাড়ী—ছ-সাতখানা ঘর। উপরের দুখানা ঘরে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হয়। পৌষের প্রথম সপ্তাহে এলাহাবাদে পৌঁছে গোসাঁই বহু শিষ্যকে চিঠি লিখান—মেলায় আসার জন্য। যোগজীবন গোস্বামী মহাশয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

---

১. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখা বিবরণী থেকে।

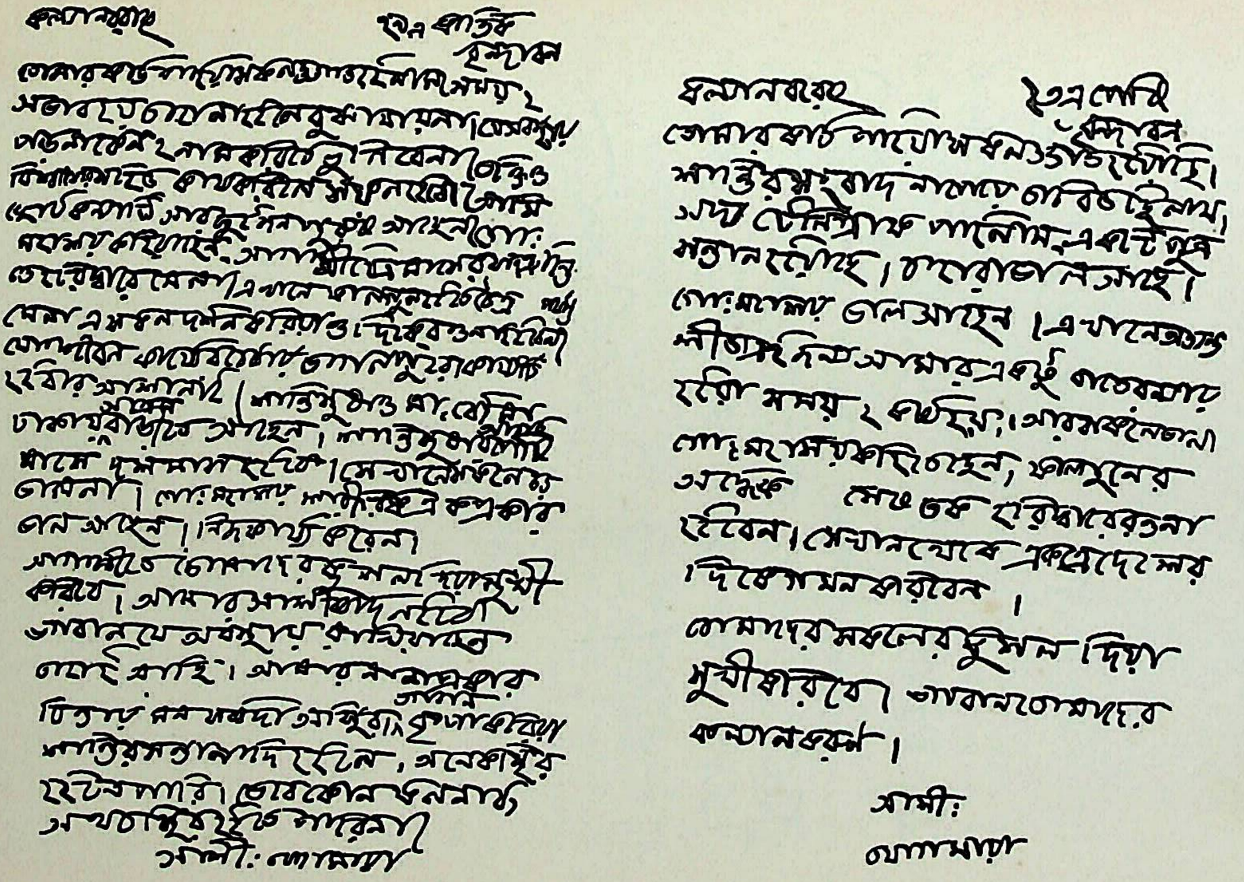

মাতা ঠাকুরাণীর লিখিত দুইখানি চিঠির প্রতিলিপি

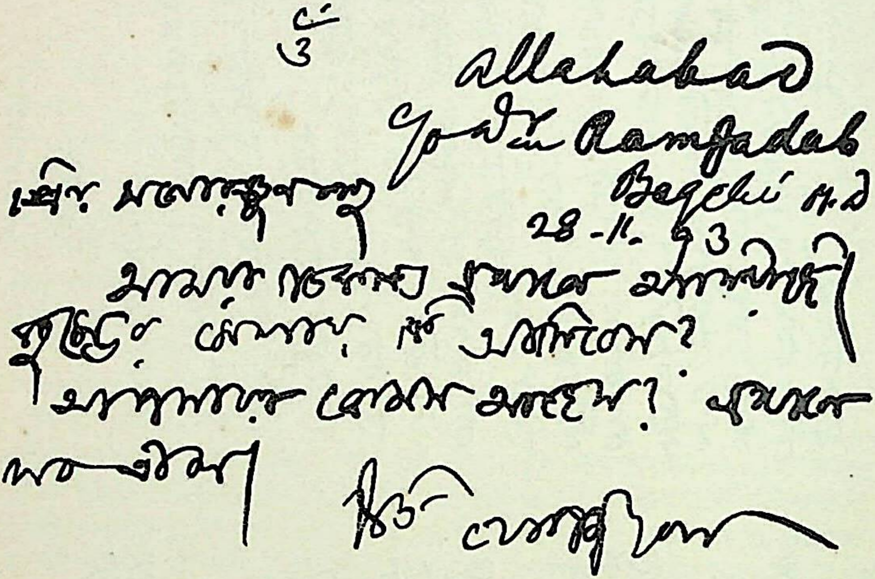

ওঁ

Allahabad
Yodhin Ramgadah
Bagehi M.P.
28-11-93

প্রিয় মনোরঞ্জনবাবু

আমার নববর্ষের সকলকে আশীর্বাদ [illegible] সোনায় [illegible] পাইলেন? আপনাদের কেমন আছেন? সকলকে [illegible]

ইতি যোগজীবন

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়কে লিখিত যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের চিঠির প্রতিলিপি

মহাশয়কে পোস্ট-কার্ডে লিখেন—

Allahabad
C|o. Dr. Ramjadab Bagchi, M.D.
28. 11. 93

প্রিয় মনোরঞ্জনবাবু,

আমরা গতকল্য এখানে আসিয়াছি। কুম্ভের মেলায় কি আসিবেন?

আপনারা কেমন আছেন? এখানে সব ভাল। ইতি—যোগজীবন

ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, কলিকাতা, বর্ধমান থেকে জনচল্লিশ শিষ্য চিঠি পেয়েই চলে আসেন।

সতীর্থ চারজন, রাত নটায় পোঁছেন এলাহাবাদ। প্রভুর ঠিকানা জানেন না। টাঙ্গা ভাড়া করে দু-ঘণ্টা খান ঘুরপাক। অশ্বিনী বৈরাগী সংগীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'শালারা বেকুবের হদ্দ, নইলে ঠিকানাটা অবধি না জেনে কেউ কখন বিদেশে আসে?' কুঞ্জ গুহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই বা না জেনে এলি কেন? তুইও তো কম যাস না!' অশ্বিনী বৈরাগী বলেন, 'আরে, আমি তো সংগে এসেছি।' ঝুলি-ঝোলা নিয়ে কুলদানন্দজী টাঙ্গা থেকে নেমে পড়েন। সারদাকান্ত তাঁকে বলেন, 'নেবে যাচ্ছিস্ যে! গোসাঁইর সন্ধানই তো মিলল না!' ব্রহ্মচারী বলেন, 'গোসাঁই তো সর্বত্র।' টাঙ্গা বিদায় করে পাঁচ-সাত মিনিট হেঁটে চলতেই পাশের বাড়ী থেকে ভেসে আসে গোস্বামীপ্রভুর কণ্ঠস্বর—'আমি এখানে।' একজন দরজা খুলে দেন। গুরুর চরণে ওঁরা লুটিয়ে পড়েন।

হরিদাসবাবুর মেলায় যাবার কোন কথা নেই। সতীর্থ একজন তাঁর কাছে লিখে পাঠান প্রভুর মন্তব্য, 'কত দেশ থেকে কত লোকই না কুম্ভে আসছেন; আর হরিদাসবাবু কি বোলপুর থেকে কেবল টাকাই রোজগার করবেন?' পত্রলেখক ভুলে এলাহাবাদের ঠিকানা লিখেন না চিঠিতে। গুরুকে স্মরণ করে হরিদাসবাবু বের হয়ে পড়েন; মোকামা থেকে পাঞ্জাব মেল ধরে বেলা আড়াইটায় এলাহাবাদ পোঁছেন। প্লাটফরমে নেমেই ভাবেন, 'কোথায় যাই? গোস্বামী মহাশয়কে বিদেশে কেই বা চিনবে?' সম্মুখে দেখেন যোগজীবন গোসাঁইকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হরিদাসবাবু তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি যে এখানে! কাকে নিতে এসেছেন?' যোগজীবন বলেন, 'কেন? আপনাকে। বাবা আমাকে পাঠালেন আপনি এ গাড়িতে আসছেন বলে।' হরিদাসবাবু আপন মনে অবাক হয়ে ভাবেন, আজই এই গাড়িতে যে আসছি, এ-কথা গোস্বামীপ্রভু কি করে জানলেন? তিনি কি দিব্যদৃষ্টিতে সব দেখতে পান?

বাসায় পোঁছে দেখেন প্রাসাদোপম বাড়ী। ঝি, চাকর, পাচক, সবই রয়েছে। খেতে বসে দেখেন সুগন্ধি মিহি আতপান্ন, অড়হর ডাল, নানা রকম তরকারী, ব্যঞ্জন, পায়েস, মিষ্টি! হরিদাসবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, 'বেশ সচ্ছল মনে হচ্ছে তো! এত ধুমধাম!' মুক্তকেশী দেবী বলেন, 'টাকাকড়ি কোথায়?' এ-কথা শুনে হরিদাসবাবু চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি হিসাবি লোক। ভয় হয় সব খরচই না তাঁকে বইতে হয়। গোসাঁইর পায়ে ব্যথা; তিনি ঘোড়ার গাড়িতে বের হন। শিষ্যেরা আরও চার-পাঁচখানা গাড়িতে উঠে বসেন। হরিদাসবাবুকে পর পর দুদিন গাড়িভাড়া মেটাতে হয়। তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। গোসাঁই শিষ্যদের বলেন, 'হরিদাসবাবুর নিকট থেকে গাড়িভাড়া নেবে না। আশ্রমের টাকা থেকে সব দেবে।'

চড়ায় সাধুরা আসতে শুরু করেছেন। গোসাঁই এলাহাবাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানগুলি দর্শন করেন আর মধ্যে মধ্যে চড়ায় সাধুদর্শনে যান।

মহানন্দে গুরুকে কেন্দ্র করে দিনগুলি কাটে। প্রভু সব শিষ্যদের একদিন বলেন, 'এখানে যাঁরা আছেন, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সেবার কাজ নিয়ে থাকা উচিত।' স্বামী দেবপ্রসাদ, রামযাদব বাগচী আর হরিদাসবাবুর উপর পড়ে বাজার করার ভার। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত আর জগদ্বন্ধু মৈত্রের উপর দেন পাকশালার তত্ত্বাবধান। মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলেন, 'আপনি জমা-খরচের হিসাব রাখবেন।' কাউকে তিনি স্নানের জল তুলে জালা ভরতির কাজ দেন। প্রত্যেককে কোন না কোনও কাজের ভার দিয়ে গোসাঁই বলেন, 'আমাকেও একটি কাজের ভার দিন।' সকলে নীরব থাকেন। তখন গোসাঁই নিজেই বলেন, 'আমি ভিক্ষা করে সকলকে খাওয়াব।' এই কথা শুনে হরিদাসবাবু হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচেন। পরক্ষণেই প্রভু শিষ্যদের বলেন, 'আমাকে আপনারা ভিক্ষা দিন।' ভিক্ষায় ১৬০্ উঠল। বিধু ঘোষকে গোসাঁই বলেন, 'আমার আকাশবৃত্তি। তুমি দেখবে একদিনের জিনিস পরের দিনের জন্য ভাণ্ডারে সঞ্চয় যেন না হয়। ভগবান যেদিন যা জুটান তা ঐদিনই নিঃশেষ না হলে, রাত্রি দশটার মাঝে বিলিয়ে দেবে।' হরিদাসবাবু হিসাব করেন, ১৬০ টাকায় আট-দশ দিন চলবে। জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য। এই প্রবাসে কে কাকে চিনে যে ধারে জিনিস দেবে! বোলপুরে তিনি টাকা পাঠাতে চিঠি লিখেন। এদিকে শুরু হয় কাঙ্গালীবিদায়। যে আসে, খালি হাতে যায় না। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হয়ে যায়। অপরাহ্নে সাধুদর্শনে বের হন গোসাঁই। অবশিষ্ট টাকাগুলি সঙ্গে নেন। কেউ বলেন, 'বহুত জাড়া, ধুনিকা লক্ড়ি নেহি হে, কম্বল নেহি হ্যায়, ভজন একদম বন্ধ্ হো গিয়া।' আবার কেউ বলেন, 'পানি পিনেকা লোটা নেহি হ্যায়, বাবা।' প্রভু কাউকে বিমুখ করেন না। আশ্রমে যখন ফিরে আসেন, একটি কানা কড়িও থাকে না তাঁর হাতে। ভোর না হতে কমপক্ষে দশটি টাকা প্রয়োজন।

ভোর চারটায় গোসাঁই ঊষা-কীর্তন করেন। কীর্তন শেষ হতেই ভেজান দরজা ঠেলে, বাইরে নাগরা রেখে, অবাঙ্গালী অচেনা এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁর গায়ে তুলার জামা, পরনে চাপকান, মাথায় পশমের টুপি। গোস্বামীপ্রভুকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে বিনীতভাবে তিনি বলেন, 'মহারাজ, আপ্কা হুকুম হোনেসে, সেওয়াকাওয়াস্তে থুড়া কুছ্ ভেজনে চাতা হুঁ।' গোসাঁই মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। সকাল সাতটা নাগাদ ভারী নিয়ে আসে পর্যাপ্ত ডাল, চাল, ময়দা, আটা, ঘি, চিনি, শাক-সব্জি, দই, সন্দেশ, রাবড়ি, মায় তামাক-টিকে। প্রভু বিধুবাবুকে ডেকে বলেন, 'আমাদের আজকার মত যা প্রয়োজন, তা রেখে বাকিটা কাঙ্গালীদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। উদ্বৃত্ত যেন না থাকে।' হুকুম তামিল হয়।

খোল-করতাল বেজে উঠে পরদিন ভোরে। বিরল পথচারীর পদধ্বনি যখন বাইরে শোনা যায়, ভক্তেরা উৎসুক নয়নে দরজার দিকে তাকান। কীর্তনান্তে আবার সেই পরিচিত কণ্ঠ শোনা যায়—'ধন্য হো গিয়া, মহারাজ। আজভি হুকুম কীজিয়ে।' গোসাঁই অনুমোদন করেন। আশ্রমবাসীরা আকণ্ঠ প্রসাদ পান; কাঙ্গালীরাও। রাত দশটায় যথারীতি ভাণ্ডার শূন্য। তৃতীয় দিন ভোরে সেই আগন্তুকই আসেন, একই প্রার্থনা করেন। প্রভু দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'নেহি, নেহি হোগা। দো রোজ লিয়া—ঔর হোগা নেহি। সন্তন লোকনকা এইছা দস্তুর নেহি হ্যায়।' ভদ্রলোক বিমর্ষ হয়ে

ফিরে যান। বেলা বয়ে যায়। গোসাঁইর আচরণে ও চোখে-মুখে নেই উদ্বেগের লেশ। সাড়ে আটটায় অচেনা এক ভদ্রলোক এসে প্রভুকে প্রণাম করে বলেন, 'আমার গুরুদেব আজ ভাণ্ডারা দিচ্ছেন; তাঁর বিনীত অনুরোধ, আপনার আশ্রমের সকলকে নিয়ে, তাঁর ওখানে আপনি প্রসাদ পান।' এই আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি তাঁর গুরুদেবের নাম করেন আর তাঁর আশ্রমের সন্ধান বলে দেন। প্রভু সম্মত হন। দিনের পর দিন চলে এমনই। কি করে যে কি হয়, বুদ্ধি এর হদিস পায় না।

রেলের মাশুল জোগাড় করে গোসাঁইগণের অনেকেই টিকেট কাটেন এলাহাবাদের। চড়ায় যাবার পূর্বেই গোস্বামীপ্রভুর আস্তানা তাই সরগরম। হরিদাসবাবু একদিন গুরুভাইদের কটাক্ষ করে গোস্বামী মহাশয়ের কাছে মন্তব্য করেন, 'ঝণ্ডুর দল সারাদিন করে গল্পগুজব আর হুঁকো-কলকে নিয়ে করে কোন্দল।' হরিদাসবাবুর এই উক্তি শুনে দয়াল গোসাঁই কেঁদে ফেলেন এবং একটু পরে বলেন, 'এঁরা সব সম্ভ্রান্ত পরিবারের। খাওয়া-পরার অভাব কারও নাই। দয়া করে আমার সঙ্গে আছেন। এঁরাই আমার সাধুসন্ত। এঁদের সঙ্গই আমার তীর্থ। এঁদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না।' সন্ধ্যাকীর্তনে এই ঝণ্ডুর দলের ভাব দেখে হরিদাসবাবু অভিভূত হন। তাঁর মনে হয়, এঁদের জন্ম সার্থক। যারা এঁদের পায়ের একটু ধূলি পায়, তাদের জীবনও ধন্য হয়ে যায়। এঁরা মানুষ নন, দেবতা। তাঁর এই নূতন মাপকাঠিতে আত্মবিশ্লেষণ করে হরিদাসবাবুর মনে হয়, তিনি বড় পশ্চাতে পড়ে আছেন। তিনি মনে মনে ভাবেন, 'ওকালতিই আমার দফা-রফা করেছে। কথা বেচে খাই; দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে গেছে বিকৃত।' মনের কপাট খুলে ধরেন গোস্বামী মহাশয়ের কাছে। অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেন, 'ওকালতি আর করব না।' প্রভু তাঁকে বলেন, 'হরিদাসবাবু, ভগবান যে অবস্থায়ই রাখেন না কেন, সন্তুষ্ট থাকবেন। পাঁকের মধ্যেও তিনি পদ্ম ফুটান। যদি তিনি ধর্ম দিতে চান, তবে নরকের মধ্যেও দিবেন। নতুবা কিছুতেই কিছু হবে না।' হরিদাসবাবু তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'ধর্ম কি, আমি এ পর্যন্ত জানি নি। পরমেশ্বরের উপাসনা ও ধর্মকার্য করলে, পরকালে সদ্‌গতি হয়, এ ছাড়া আর কিছুই জানতাম না। ধর্ম যে ধরা-ছোঁয়ার বস্তু, সম্ভোগ করার জিনিস; ধর্ম যে তাপত্রয় নষ্ট করে জীবন মধুময় করে, সব হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করে, প্রাণের মধ্যে অমৃতধারা ঢেলে দেয়, কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের দাসত্ব মোচন করে, কুপ্রবৃত্তি দূর করে ও সদ্‌প্রবৃত্তি উদ্রেক করে; এ-সব জ্ঞান আমার পূর্বে ছিল না।'

প্রভু একদিন শিষ্যদের নিয়ে নাঙ্গাবাবা পরমহংসজীকে দর্শন করতে গেলেন। সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরে এসে তিনি মন্তব্য করেন, 'নাঙ্গাবাবার কি সুন্দর ভাব! প্রতিটি হরিকথায় কেমন পুলক, শিহরণ!' হরিদাসবাবু তাঁকে বলেন, 'ঠাকুর, আমার সতীর্থদের মধ্যে যে ভাব ও প্রেম দেখি, এর এক কণাও নাঙ্গাবাবার মধ্যে দেখি নি।' গোসাঁই হেসে বলেন, 'এ জিনিস তিনি কোথায় পাবেন? এ যে পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, সাধ্য কভু নয়।"' অশ্বিনী গুহ গুরুভাইদের বলেন, 'সাধুরা দু-একজন প্রশ্ন করেছিলেন আমরা কোন্ সম্প্রদায়ের, কি বলব?' গোসাঁইর কাছে কথাটা উঠতেই তিনি বলেন, 'মধ্বাচার্য সম্প্রদায় বলবে। আদিগুরু নারায়ণ, তারপর গুরুপরম্পরায়—ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব, শুকদেব ও মধ্বাচার্য। মাধবেন্দ্র পুরীও এই ধারায়। তিন প্রভুও এই সম্প্রদায়ের।'

শ্রীমধ্বাচার্য শ্রেণীর বৈষ্ণব চত্বরে—কচ্ছ অঞ্চলের এক সাধু, ডাকরের মহান্ত

সরযূদাস বাবাজী গোস্বামীপ্রভুর শিষ্যদের অনুরোধে আর আগ্রহাতিশয্যে আপনার নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে এক বিঘা জায়গা ওঁদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেন। পছন্দ হয় গোস্বামী মহাশয়ের। গোয়ালিয়রের রাজমন্ত্রী, স্যার দিনকর রাও ওখানে খাটাবার উপযোগী একটি বড় তাঁবু কিনে দেন। মেলা যথারীতি শুরু হবার পূর্বে, প্রভু সাধুদর্শনে প্রায়ই চড়ায় যেতেন। একদিন পুল পার হয়ে চড়ায় যেতেই একটি লোক ছুটে এসে গোস্বামীপ্রভুকে আরতি করতে থাকেন। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁকে প্রণাম করতে গেলে, লোকটি ডিগবাজি খেয়ে দশ হাত দূরে গিয়ে পড়েন। কার সাধ্য তাঁর পাদস্পর্শ করেন! গোসাঁই তাঁর শিষ্যদের বলেন, ‘ইনি একজন মহাপুরুষ, নাম অর্জুনদাস। ইনি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।’ শাস্ত্রের একটি শ্লোক আবৃত্তি করলে, তিনি তদ্‌পরবর্তী শ্লোকসকল আবৃত্তি করে যেতেন। এমন কি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও এভাবে অবলীলাক্রমে তিনি বলে যেতেন। শব্দব্রহ্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছেন বলেই এরূপ সম্ভব। প্রভু আরও বলেন, ‘ইনি ত্রিকালজ্ঞ, ষড়ৈশ্বর্যশালী, দেহমুক্ত মহাপুরুষ। আপন ইচ্ছানুসারে ব্যোমমার্গে সশরীরে যত্রতত্র বিচরণ করতে পারেন। শুধু নিজে পারেন তা নয়, আরও দুজনকে দুহাতে ধরে নিয়ে শূন্যপথে যেতে পারেন। আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন, কাশী, দ্বারকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থস্থান ঘুরায়ে এনেছেন। প্রেমভক্তির দিক দিয়েও ওঁর অবস্থা অসাধারণ। তিনি পঞ্চভাবের যে কোন ভাব ইচ্ছানুসারে সম্ভোগ করতে পারেন।’ গোসাঁই তাঁকে ক্ষ্যাপাচাঁদ বলে ডাকেন। তাঁর বাইরের অবস্থা ‘জড়োন্মত্তপিশাচবৎ’। হরিদাসবাবু মন্তব্য করেন. ‘তাঁর চালচলন পাগলের মত; কথাবার্তা অসংলগ্ন।’ গোস্বামী মহাশয় বলেন, ‘পাগল না সাজলে কি রক্ষা আছে? কিছু ক্ষমতা আছে বলে লোকে টের পেলেই একেবারে ছিঁড়ে খাবে।’ সন্ধ্যার পর সেদিন অর্জুনদাস সাগঞ্জের বাড়ীতে এসে উপস্থিত। জগদ্বন্ধুবাবু পা-ধোয়ার জল নিয়ে এগিয়ে যান। তাঁকে দেখেই তিনি ছোঁ করে পিছিয়ে যান। অবশেষে গোস্বামীপ্রভুর নির্দেশ জেনে পা ধুতে দেন। উপাদেয় আহার্যবস্তু দিয়ে তাঁর সেবা করা হয়। এলাহাবাদের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রভুর ভক্ত, নবদ্বীপের রামযাদব বাগচী গোসাঁইর অনুমতি নিয়ে চড়ায় তাঁর ছাউনীতে বসাবার জন্য পূর্বেই গৌর-নিতাইর মৃন্ময় মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন। মেলায় গৌর-নিতাইর মূর্তি স্থাপন হরিদাসবাবুর মনঃপূত হয় না। তিনি গুরুকে বলেন, ‘আপনি আমাদিগকে মহাপ্রভুর ধর্ম যাজন করছেন; আমাদের বৈষ্ণব-আচার পালন করতে গোড়া থেকে বলে দেন না কেন?’ গোসাঁই বলেন, ‘কিছু বলার কি জো আছে? বললে মাথায় লাঠি মারবেন। যদি বলি, “বিগ্রহ দর্শন করে আসুন।” অমনি বলবেন. “ইট, কাঠ পাথর দেখে কি হবে?” যদি বলি, “তিলক করুন।” অমনি বলবেন, “মাটি লেপে কি হবে?” এজন্য কেবল নাম দিয়েছি, এই নাম থেকেই সব হবে।’[১]

একদিন সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু ব্রজবিদেহী মহান্ত রামদাস কাঠিয়াবাবাজীর ছাউনীতে গিয়ে তাঁকে দর্শন করেন। পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনে উভয়ের সাক্ষাৎ ও সম্প্রীতি হয়েছিল। প্রভু তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি প্রতিনমস্কার করে, ধুনির

---

১. হরিদাস বসু-প্রণীত ‘মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা’ ২য় সংস্করণ, পত্রাঙ্ক—৯৪-৯৫।

পাশে নিজের হাতে আসন পেতে দেন। বাবাজীর তপঃক্লিষ্ট হঠযোগীর দেহ; সারা গায়ে ভস্ম মাখা। বয়সের হিসাব নেই। মাথায় সরু সরু জটা; পরনে কাঠের কৌপীন। তেজঃপুঞ্জ দেহের কি অপরূপ মাধুর্য! মহাজ্ঞানী ও প্রেমিক সাধু ইনি; নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য। বৈষ্ণবেরা এবারের মেলায় তাঁকে নেতা নির্বাচন করেছেন। রামদাস কাঠিয়াবাবার পূর্বাশ্রম পূর্ব-পাঞ্জাবের এক অখ্যাত গ্রাম লোমা-চামারীর এক সচ্ছল ব্রাহ্মণ পরিবারে। শৈশবে মার সঙ্গে গ্রামেই এক সাধু দর্শন করতে তিনি গিয়েছিলেন। সকলেই সাধুকে সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন, প্রণাম করেন দেখে, শিশুর মনে আসে জিজ্ঞাসা। সরাসরি সাধুকে শিশু প্রশ্ন করে, 'আপনাকে কেন সকলে প্রণাম করে ভেট দেন?' তিনি মৃদু হেসে বলেন, 'আমি যে রাম নাম করি, তাই।' শিশু বলে, 'আমি যদি রাম নাম করি, তাহলে আমিও সাধু হব?' যোগীরাজ উত্তর দেন, 'জরুর।' তখন থেকে উঠতে, বসতে, চলতে, খেতে, শুতে, পেয়ে বসে তাঁকে রামনাম। ছ-সাত বছর বয়স। মাঠে পিতার মহিষ দেখতে গেছেন, তাঁর বিশ্রামের অবকাশে। এক সাধু এসে তাঁকে বলেন, 'ম্যায় ভুখা হুঁ।' বালক তাঁকে বলেন, 'আপনি আমার মহিষগুলি একটু দেখুন, আমি ভেট নিয়ে আসছি।' বাড়ী গিয়ে দেখেন সব ঘুমিয়ে আছেন। ভাঁড়ার থেকে ময়দা, ঘি, চিনি ও দুধ এনে সাধুর হাতে তিনি তুলে দেন। তিনি খুশি হয়ে বালককে আশীর্বাদ করেন, 'বাচ্চা তুম যোগীরাজ বন যাওগে।' বালকের মনে হয় কথার কথা। সে বলেই ফেলে, 'তা কি সম্ভব?' সাধু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'মেরা বচন সে তুম জরুর যোগীরাজ হও গে।' ন বছর বয়সে উপনয়নের পর অধ্যয়নের সঙ্গে গায়ত্রীমন্ত্র জপ নিয়ে তিনি মেতে যান। আট-ন বছর গুরুগৃহে শাস্ত্রপাঠ করে গৃহে ফিরেন। গীতায় তাঁর অমোঘ আকর্ষণ। গ্রামের প্রান্তে বটগাছের নীচে বসে তিনি গায়ত্রী জপ করেন। এক লক্ষ বার জপের পর দৈববাণী শুনেন, 'জ্বালামুখী গিয়ে আরও পঁচিশ হাজার জপ সাধন কর। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।' ওখানে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইনিই রামদাসের গুরু দেবদাসজী। কত কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে দেবদাসজী তরুণ এই শিষ্যকে অধ্যাত্ম পথে নিয়ে চলেন। কত কঠোরভাবে পরীক্ষা করেন। কথায় কথায় গালিগালাজ করেন, 'শালা, ভাঙ্গি, চামার, আমার বড় বড় চেলারা সব পালিয়ে গেছে। তোর আস্পর্ধা তো কম নয়।' তারপর যে কি মারধর! জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান, সম্বিত ফিরে এলে, গুরু শিষ্যকে বলেন, 'এবার ভাগ্। কেন আমার কাছে পড়ে আছিস?' রামদাস নাছোড়-বান্দা। তিনি গুরুকে সবিনয়ে বলেন, 'আপনাকে দেখেই সব ছেড়ে-ছুড়ে এসেছি। যদি আপনি চান, আপনার সঙ্গে আর না থাকি, তবে আপনার হাতেই আমার মৃত্যু হউক।'

দেবদাসজী একদিন এই শিষ্যকে বলেন, 'রামদাস, এক জরুরী কাজে আমি বাইরে যাচ্ছি। ফিরে না আসা অবধি, তুমি আসন ছেড়ে কোথাও যেও না।' একদিন, দুদিন করে সাত দিন কেটে যায়, দেবদাসজীর দেখা নেই। রামদাসের আহার নেই, নিদ্রা নেই। সেই যে আসনে বসেছিলেন, ঐভাবে আছেন—উঠার নাম নেই। আট দিনের দিন গুরু ফিরে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বেটা, মলমূত্র ত্যাগ করতে হয় নি?' রামদাস বিনীতভাবে উত্তর করেন, 'না বাবা, আপনার কৃপায় এর বেগই হয় নি?' এরপর হঠাৎ দেবদাসজী দেহরক্ষা করেন। রামদাস কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সাত দিন অনাহারে, অনিদ্রায় কাটে। গুরু প্রকাশিত হয়ে হাত ধরে

তাঁকে টেনে তুলে বলেন, 'এই দেখ, রামদাস, আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি। গুরু কি কখনও মরেন?' শিষ্য রামদাসকে সেদিন বর দেন দেবদাসজী, 'তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। তোমার ভগবদ্ দর্শন হবে। ঋদ্ধি, সিদ্ধি তোমার কাছে সব সময় থাকবে। তুমি বাক্সিদ্ধ হবে।' তারপর চারদিকে তাঁর যোগৈশ্বর্যের কথা প্রকাশ পায়। ভরতপুরে 'সয়লানী' কুণ্ডে তাঁর ভগবদ্ দর্শন হয়। স্বরচিত এক কবিতায় এর উল্লেখ আছে—

রামদাসকো রাম মিলা সয়লানী কা কুণ্ডা।
সন্তন তো সাচ্চা মানে, ঝুটা মানে গুণ্ডা॥

উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের পাদদেশে দেবপ্রয়াগে নির্জন গুহায় তাঁর তপস্যাক্ষেত্র তিনি স্থির করেন। কিন্তু আহারের জন্য কন্দমূলের সন্ধানে এদিক-ওদিক খোঁজা-খুঁজি করতে হয় দেখে, তিনি কানাইয়ার লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে আশ্রম করেন। হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল তারাকিশোর শর্মাচৌধুরীর গুরু ইনি।

সন্ন্যাসীমণ্ডলী হরিদ্বারের ভোলাগিরি মহারাজকে এবারের কুম্ভমেলায় তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেছেন। তাঁর সঙ্গে গোস্বামীপ্রভুর পূর্বে আর সাক্ষাৎ হয় নি। একদিন গোস্বামী মহাশয় ভোলাগিরিবাবার চত্বরে যান। প্রভুকে দেখে গিরিমহারাজ উৎফুল্ল হয়ে উঠেন, যেন কতকালের অন্তরঙ্গ পরিচয়। স্বহস্তে তিনি আসন পেতে গোসাঁইজীকে বসান।

কলিকাতা হাটখোলায় ধূলি-বালি, ইট-সুরকি-চূণের মধ্যে তেজঃপুঞ্জ, কৌপীনধারী, প্রিয়দর্শন, সৌম্যমূর্তি এক সাধু আসন পাতেন। যাঁরা তাঁকে দর্শন করতে আসেন, তিনি তাঁদের বলেন, 'শিব, কালী, কৃষ্ণ, যীশু, বুদ্ধ সকলেই একই পরমেশ্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ।' কে যে তাঁর উপাস্য বুঝা ভার। অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য কিছুই গ্রহণ করেন না। সাধুদর্শনে ভিড় জমে যায়। কেউ কেউ দীক্ষা যাচ্ঞা করেন। তিনি তাঁদের বলেন, 'আগে প্রস্তুত হও। মিথ্যা ছেড়ে সত্যের আশ্রয় নাও। কাউকে কটুবাক্য বল না। আয়ের দশমাংশ দান কর। ঘুম থেকে উঠে মাটি স্পর্শ করে বল, "হে মাতঃ বসুন্ধরে, আমাকে তোমার ধৈর্য দাও।" জল স্পর্শ করে বল, "আমাকে শীতল, পবিত্র কর।" সূর্যকে প্রণাম করে বল, "আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর।" তীর্থে গিয়ে ফল ত্যাগ না করে "কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি ছটি রিপুকে এক এক তীর্থে বিসর্জন দাও।"' তিনি এক স্বভাব-মধুর যোগী। রাত্রিপ্রভাতে একদিন এই সাধুর আর সন্ধান মিলে না। হঠাৎ একদিন যেমন অজ্ঞাতভাবে এসেছিলেন, তেমনি একদিন মুক্ত-পাখির ন্যায় চলে গেলেন। যাঁরা হাটখোলায় তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তীর্থভ্রমণে বের হয়ে, হরিদ্বারে লাল-তারাবাগে তাঁর দর্শন আবার পান। দশনামী সন্ন্যাসীদের গিরিসম্প্রদায়ের তিনি একদণ্ডীস্বামী। পাঞ্জাবে কোটলার খুরদা গ্রামে এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁর জন্ম; নাম ভোলাদাস। মাতা-পিতার দ্বিতীয় পুত্র। ভোলার অগ্রজ, অনুজ উভয়েই সন্ন্যাসী। কুড়ি বছর বয়সে, অজানার আকর্ষণে ঘরছাড়া হয়ে ভোলা কুরুক্ষেত্রের পস্তানা গ্রামে সন্ন্যাসী গোলাপগিরির কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি রাজর্ষি! তাঁর দেড় সহস্র গরু ও পাঁচশত মহিষ। তিনি ভোলাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়ে, নাম দেন নারায়ণগিরি। কিন্তু ভোলাগিরি নামেই তাঁর পরিচয়। গুরুদেবের গোচারণ ও নিত্যপূজার ভার পড়ে এই নবীন সন্ন্যাসীর উপর। কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে গুরু তাঁকে অধ্যাত্মমার্গে নিয়ে চলেন। মাঘের নিশীথ রাত্রে, তুষারপাতের সময়,

গোলাপগিরির কি খেয়াল হয়! তিনি হুকুম করেন, 'ভোলা, এই মুহূর্তে শুধু কৌপীন পরে, আশ্রম থেকে বের হয়ে যা।' নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ভোলা গুরুআজ্ঞা কি করে লঙ্ঘন করেন? আশ্রম-সীমানার বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। তিনি সঙ্কল্প করেন, 'এখানেই মরব, আবার যাব কোথায়?' গোলাপগিরি রাত্রিপ্রভাতে তাঁকে সাদরে আশ্রমের ভিতর নিয়ে আসেন। বার বছর গুরুর কাছে থেকে তিনি সাধন-ভজন ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গোলাপগিরি তাঁকে আশীর্বাদ করেন, 'তোমার ঋদ্ধি, সিদ্ধি লাভ হবে; যোগ ও ভোগ দুই-ই হবে।' গুরুআজ্ঞায় তিনি গৃহে যান মাকে প্রণাম করতে। মাকে সাষ্টাঙ্গ দিতেই তিনি বলে উঠেন, 'বাবা এ কি করলেন, আপনি সন্ন্যাসী হয়ে? আমার গৃহের যে অকল্যাণ হবে।' আত্মপরিচয় গোপন করে ভোলাগিরিবাবা বলেন, 'আমি যে মাতৃজ্ঞানে আপনাকে সাষ্টাঙ্গ দিয়েছি মা, এতে কল্যাণই হবে।' হিমালয়ে গিয়ে গভীর সাধনায় তিনি ডুবে যান। কৃচ্ছ্রসাধনায় দেহ হয় জীর্ণ-শীর্ণ। দেহবুদ্ধি পায় লোপ। অন্ধকার পর্বতগুহা একদিন আলোকে উদ্ভাসিত করে, দেবাদিদেব শঙ্কর তাঁকে দর্শন দেন। হরিদ্বারে তাঁর আশ্রম।

পৌষ মাসের (১৩০০) প্রায় অবসান। চড়ায় গোস্বামীপ্রভুর ছাউনীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে, সাগঞ্জের বাড়ী থেকে একদিন বেলা তিনটায় সশিষ্য প্রভু মেলায় যাবেন স্থির করেন। শান্তিসুধা রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বলেন, 'বাবা, আর আমি সইতে পারি না, হয় আমাকে ভাল করে দিন, না হয় আমার মৃত্যু হউক।' গোসাঁই তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, 'দুই-ই সম্ভব, কিন্তু তাহলে তোকে যে আবার আসতে হবে।' তাঁর রোগ আরও বৃদ্ধি পায়। মুক্তকেশী দেবীর আর সহ্য হয় না। তিনি মেলায় কাঠিয়াবাবার ছাউনীতে ছুটে যান। শ্রীবৃন্দাবনে পূর্বেই হয়েছিল পরিচয়। তাঁকে গিয়ে তিনি বলেন, 'বাবা, শান্তি যে আর সহ্য করতে পারে না। গোসাঁই নির্বিকার।' কাঠিয়াবাবা ধুনি থেকে ভস্ম নিয়ে বলে উঠেন, 'ছুট যা।' ভস্ম তাঁর হাতে দিয়ে বলেন, 'পেটে মালিশ করবে।' গৃহে ফিরে দেখেন, রোগ-যন্ত্রণা আর নেই। শান্তিসুধা সুস্থ হয়ে উঠেন। পাঁচটি ঘোড়ার গাড়ি করে জিনিসপত্র নিয়ে প্রভুর কয়েকজন শিষ্য মেলায় রওনা হন। অন্যান্য শিষ্যেরা হেঁটে যান। সাগঞ্জের বাসায় চাকর, পাচক, ঝি যেমন ছিল তেমনই রইল। রোগী, অসুস্থ শিষ্য ও মেয়েরা রইলেন। মেয়েরা সকালে চড়ায় গিয়ে দিনের বেলায় আবার ফিরে আসতে পারেন। গোস্বামী মহাশয়ের গাড়িতে শ্রীধর, বিধু ঘোষ, মহেন্দ্রবাবু, ব্রহ্মচারী এঁরা কয়েকজন ছিলেন। অন্যান্য গাড়ি মালপত্র নিয়ে পুল পর্যন্ত গেল। প্রভু তাঁর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানগৃহে প্রবেশ করেন। ঐটি একটি আশ্রম; বাইরে থেকে বুঝা ভার। একটি প্রকোষ্ঠে মহাপ্রভুর বিগ্রহ। একজন বৃদ্ধ সাধু বসে ছিলেন। গোসাঁইকে তিনি সাষ্টাঙ্গ দেন। তাঁর সর্বাঙ্গে পুলক, কম্পন। গোস্বামী মহাশয় মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে, সাধুর চরণধূলি নেন। তিনি গোস্বামীপ্রভুকে আলিঙ্গন করে, মহাপ্রভুর বারান্দায় বসান। উভয়েই সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে তিনি গোসাঁইকে বলেন, 'আপনি যে আসবেন, তা মহাপ্রভু আমাকে সকালে জানিয়েছেন। মহাপ্রভু বললেন, "বিজয় আজ আমাকে দেখতে আসবে, তার জন্য প্রসাদ রাখিস।"' তিনি উৎকৃষ্ট লাড্ডু, মালপোয়া এনে দেন। সাধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রভু পুলের দিকে হাঁটতে থাকেন। মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'ইনি কে?' গোসাঁই বলেন, 'ইনি একজন মহাপুরুষ,

নাম মাধোদাস; আমার গুরুভ্রাতা; পূর্বাশ্রম বাংলায়। ত্রিশ বছর ধরে এখানে নির্জনে ভজন করছেন। আসন ছেড়ে কোথাও যান না। শহরের কেউ তাঁকে জানেন না।'

শিষ্যেরা সব পুলের ওপারে চড়ার মুখে প্রতীক্ষা করছিলেন। শহর থেকে ভদ্রলোকেরাও অনেকে এসেছিলেন। গোস্বামীপ্রভুকে দেখে তাঁরা উল্লসিত হয়ে উঠেন। শিষ্যেরা গোসাঁইকে ঘিরে ফেলেন। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে চড়ার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখেন। তাঁর মুখমণ্ডল আরক্তিম ও চোখ সজল হয়ে উঠে। জটাভার উদ্বেলিত। খোল-করতাল বেজে উঠে। এক মহাত্মা ছুটে এসে গোসাঁইকে আলিঙ্গন করে বলেন, 'আও মেরা প্রাণ, আও মেরা প্রাণ।' অনেকে তাঁর পদধূলি নেন। তিনি তাঁদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। পর মুহূর্তে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। প্রভুর শিষ্যেরা মেতে উঠে গান ধরেন—

নামব্রহ্ম নামব্রহ্ম নামব্রহ্ম বল ভাই।
হরিনাম বিনা জীবের আর গতি নাই॥

গোসাঁই উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে চড়ার দিকে অগ্রসর হন। ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে মহা-উল্লাসে নাচেন। বিধু ঘোষ মল্লবেশে ছুটে যান, আবার গুরুর কাছে ফিরে আসেন। শ্রীধর 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলে কম্বল বহির্বাস উড়িয়ে দেন। তাঁবুতে পৌঁছে সংকীর্তন চলে। বেদীতে গৌর-নিতাইর মৃন্ময় মূর্তি বসান। গোসাঁই ঘুরে ঘুরে, রসুই-ঘর, ভাণ্ডার-ঘর, পায়খানা দেখেন। তাঁবুর ভিতর উত্তর দিকে ধার ঘেঁষে তাঁর আসন পাততে তিনি নির্দেশ দেন। সম্মুখে ধুনির কুণ্ড। শিষ্যেরা পুরু করে খড় বিছিয়ে চাটাই পেতে যার যেখানে পছন্দ কম্বল পাতেন। ক্ষ্যাপাচাঁদও গোস্বামীপ্রভুর আস্তানায় একদিকে স্থান করে নেন। মহেন্দ্রবাবু গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে আপনাকে আলিঙ্গন করে আদর করলেন?' তিনি ছলছল নেত্রে বলেন, 'আমার গুরুদেব পরমহংসজী।' আশ্রমের ছয় ফুট দরজায় বড় বড় হরফে লিখা হয়—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কুম্ভমেলায় সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, ১৩০০ বঙ্গাব্দ। জনবিরল সঙ্গম—পুণ্যতোয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মিলনক্ষেত্র। নাম তাই ত্রিবেণী। বার বছর পর পর, এই দিনটিতে, এখানে সর্বভারতীয় সাধুদের বিরাট মেলা বসে। দেবাসুরের মন্থনে, সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হয় অমৃত। সেই অমৃত অসুররা যাতে লাভ করতে না পারে, সেজন্য প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জয়িনী ও হরিদ্বার, এই চারস্থানে পর পর তা লুকিয়ে রাখেন দেবতারা। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর সাধুদের এই মেলা এক মাস যাবৎ চলে। এই মিলন-সভা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। পরিকল্পনা নেই, প্রচার নেই, আমন্ত্রণ নেই, অথচ সাধু-সজ্জনদের কি বিরাট বিপুল সমাবেশ! প্রশ্ন জাগে, কি করে বা এ সম্ভব?

সিদ্ধমহাত্মারা কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি-বিষয়ের আলোচনায় ভগবৎ-প্রসঙ্গে নিয়ত

মগ্ন থাকেন। বহু বিচিত্র বেশভূষাধারী, বহু মত ও পথের হাজার হাজার সাধু-সন্তদের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোন কোলাহল নেই। নেই গোলমাল, নেই গরমিল এতটুকু, যদিও সন্ন্যাসী, উদাসী, বৈষ্ণব, বাউল, শাক্ত, শৈব, কর্তাভজা, রামায়েত. অঘোরপন্থী, কবীরপন্থী, নানকপন্থী, আরও কত সব সাধু-মহাজনেরা মিলেন এসে। ওঁদের দেখলে বুঝা যায়, ধর্মকথা নয়, মত নয়, দল নয়, প্রণালী নয়, সম্প্রদায় নয়। ঠিক ঠিক ধর্মকে আশ্রয় করলে মানুষ হয়ে উঠে সুন্দর, উদার। হয় তার দিব্যজীবন লাভ। রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত আর আলাদা পথ হলেও, সব গিয়ে মিলে একই জায়গায়। ভেদবুদ্ধি যায় তখন মিলিয়ে। সাধু-মহাত্মাদের চাল-চলন দেখে মনে হয়, ওঁরা যেন একই মালায় গাঁথা রঙ-বেরঙের সুগন্ধি ফুল। ওঁরা কার পরে কে স্নান মর্যাদা পাবেন, তাও যেন ছকে বাঁধা। অনুগামীদের নিয়ে মিছিল করে, ওঁরা করেন অবগাহন স্নান। এমন এক সুশৃঙ্খলার মধ্যে এ-সব সম্পন্ন হয়, যা দেখে জিজ্ঞাসা আসে, নির্জন গিরিকন্দরবাসী সাধু-সন্তেরা সৈনিকোপযোগী এ নিয়মানুবর্তিতা মহড়া ছাড়া কি করেই বা আয়ত্ত করেন? ওঁরা যে ছন্দোময়কে আশ্রয় করে আছেন! চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, যাঁর ইঙ্গিতে সৃষ্টির আদি থেকে অনবদ্য তালে তালে চলেছে, যাঁর বিধানে দিনের পর রাত, শীতের পর বসন্ত, যাঁর ইচ্ছায় মহাছন্দে চলছে বিশ্ব, অমোঘ শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সৃষ্টি, তাঁকে আশ্রয় করে যাঁরা আছেন তাঁদের চাল-চলন হয়ে উঠবে ছন্দোময়, এতে আর বৈচিত্র্য কি?

যুধিষ্ঠির বলেছিলেন বিদুরকে, 'তীর্থগুলি পাপী-তাপী সংস্পর্শে মলিন হলে, আপনার ন্যায় ভাগবতের পাদস্পর্শে হয়ে উঠে আবার শুচিশুদ্ধ।' সাধু-সন্তদের অবগাহন স্নানের পর, তাই পুণ্যার্থীদের মুক্তিস্নান।

সঙ্গমের গা ঘেঁষে ইলাহিবাদ কেল্লা। আজও রয়েছে ওখানে সনাতন ধর্মের অক্ষয় বট। পাশে মুনিবর ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম। ঋষিরা 'তীর্থরাজ' বলেছেন প্রয়াগধামকে। অনাদিকাল থেকে দেবতা আর মহাজনেরা উদ্‌যাপন করেন অমৃত-কুম্ভপর্ব। শঙ্করাচার্য অনুগামীদের নির্দেশ দেন, তাঁরা যেন সমবেত হন ঐ চার তীর্থে; আর সব সাধুরাও আসেন। তখন থেকে হয়ে উঠে এ-সব স্থানে স্বয়ং-আহূত অসাম্প্রদায়িক সাধু-সন্তদের মেলা। শুধু পূত অবগাহন এর উদ্দেশ্য নয়; সাধকজীবনে যে-সব সঙ্কট আসে, সাধন-ভজনে যে-সব প্রশ্ন জাগে, সিদ্ধমহাজনদের কাছে তা ব্যক্ত করে, সাধুরা করে নেন ও-সবের সমাধান। আজ-কাল শ্রীধাম শ্রীবৃন্দাবনেও হয় কুম্ভমেলা। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন করেছিলেন এর প্রবর্তন। তখন থেকে কুম্ভে যাবার পথে, বৈষ্ণবেরা ব্রজধামে থেকে যান এক মাস।

কুম্ভে সন্ন্যাসী, উদাসী ও বৈষ্ণবেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আর তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি অসাধারণ। এক-একটি চত্বরে অনুরূপ বেশভূষা, নিয়মনিষ্ঠাসম্পন্ন পাঁচ-সাত হাজার সাধুর জমায়েত। আর বড় চত্বরে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার পর্যন্ত সাধু-সন্ন্যাসীর ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ১৩০০ সালের এই মেলায় বৈষ্ণব-সাধুদের সংখ্যা দুই লক্ষ। তাঁদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে চড়ায়; পাঁচ-ছ মাইল দীর্ঘ জমাট বালি-মাটির চড়া, আধ মাইল জুড়ে। কুড়ি ফুট চওড়া, চার-পাঁচটি উত্তর-দক্ষিণমুখী সমান্তরাল ঋজুপথ, আর পূব-পশ্চিমমুখী সমান ব্যবধানে অনুরূপ পথ উনিশ-কুড়িটি। চত্বরগুলি সব সমকোণী ক্ষেত্র, খোলামেলা। অতি পরিচ্ছন্ন সুন্দর মেলার পরিবেশ। কোথাও একটু আবর্জনা নেই। মেলা পরিষ্কার রাখার জন্য বহু লোক নিযুক্ত।

নিরলস তারা কাজ করে চলে।

সারি সারি কুটীর; তাঁবুও অসংখ্য। সাধু-সন্তদের গুণমুগ্ধ অনুগামীরা নিজেরাও ছাউনী গড়েছেন। আবার অনেক সাধু উন্মুক্ত আকাশের নীচে দিগম্বর হয়ে আসন করে আছেন—মাঘের বরফ-জমা শীতেও একেবারে নির্বিকার।

সন্ন্যাসীদেরও পাঁচ-ছটি চত্বর; কারও পরনে গৈরিক কৌপীন বহির্বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, বিভূতিমণ্ডিত ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, ঊর্ধ্বপুণ্ড্র, মুণ্ডিত মস্তক। আবার কেউ কেউ জটাজূটধারী, মৃগচর্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত। কোন তাঁবুতে শুধু খড় বিছান বা চাটাই পাতা, আবার কোন কোনটিতে দামী গালিচা।

গোস্বমীপ্রভু তাঁর আসন পাতেন চড়ায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর মৃন্ময় বিগ্রহ বসান। সদাব্রত আসে। ধনিকসমাজ সাধুসেবা উপলক্ষ করে মহান্তদের হাতে অর্থ দিলে, তাঁরা তা বিলিয়ে দেন, একেই বলে সদাব্রত।

সকালে চা-পানের পর গোস্বামীপ্রভু বিধু ঘোষকে বলেন, 'আজ মোট ষাটজন প্রসাদ পাবেন।' একদিন তিনি বিধুবাবুকে বলেন, 'আজ দুশ লোকের ব্যবস্থা করেছ, কিন্তু সাধুরা আসছেন চারশর উপর।' কোন দিন আবার পূর্বেই গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'আজ আট শ লোকের ব্যবস্থা কর।' অথচ টাকা পয়সা নিয়ে কথাটি বলেন না প্রভু। বিধুবাবু অকূলপাথারে হাল ছাড়েন না। এমনই প্রত্যহই দেখছেন। ভরাডুবি হয় নি কখন। শত-শত সাধু পংক্তি-ভোজন করেন প্রত্যহই গোস্বামীপ্রভুর ছাউনীতে। গুরু-শিষ্যদের আন্তরিকতায় তাঁরা হন অভিভূত। সংকীর্তনে আকৃষ্ট হন সাধুরা বাঙ্গালীবাবার তাঁবুতে। নাম পড়ে 'ভজন তাঁবু'। গোসাঁইজীর মহাভাব দেখে সাধুরা স্তম্ভিত হন। গৌর-নিতাইর বিগ্রহ পূর্বে তাঁরা দেখেন নি। খোলের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় নেই। গোসাঁইর মাথায় জটাভার, কপালে তিলক, মুখে গোঁফ-দাড়ি; গলায় তুলসী, রুদ্রাক্ষ, বেল ও পদ্মবীজের মালা; পরনে গৈরিক ডোর-কৌপীন-বহির্বাস ও হাতে দণ্ডকমণ্ডলু। শিষ্যদের মধ্যেও বেশভূষার সামঞ্জস্য নেই। কারও গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক; কারও মাথায় জটা, বাসন্তী-বসন, আবার কেউবা মিহি ধুতি, জামা, জুতা, শাল পরে সৌখীন-বাবু। কেউ বা আবার পরেছেন কোট-পেণ্টলুন। গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গে তাঁবুতে রয়েছেন পুত্র, জামাতা ও শিষ্যেরা। দিনের বেলায় থাকেন এসে শাশুড়ী, কন্যা ও শিষ্যারা। প্রাণ-মাতান কীর্তন শুনে আর শিষ্যদের মধ্যে শাস্ত্রবর্ণিত সাত্ত্বিক বিকার দেখে, সাধুরা হন উল্লসিত। গোস্বামী মহাশয়ের সুঠাম কান্তি, আর উদ্দণ্ড নৃত্য দেখতে, সংকীর্তনের সময় তাঁবুতে তিল ধারণের স্থান থাকে না। এক-একদিন তাঁর জটা খাড়া হয়ে যায়; শিষ্যেরা খান ভক্তিরসে হাবুডুবু। গুরু ও শিষ্যদের বিচিত্র বেশ আর দুর্লভ ভাবসমাধি দেখে ওঁরা কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সাধন-প্রণালীই বা কেমন, তার না পান হদিস অন্যান্য বৈষ্ণবেরা। সীতারাম, রাধাশ্যাম বা বিষ্ণুকে ভজনা না করে, অজানা অচেনা বিগ্রহেরই বা তাঁরা আরাধনা করেন কেন? চলে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। তবে গোসাঁইজী যে শক্তিশালী সাধক, এতে ওঁরা নিঃসংশয়। কীর্তনান্তে তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'ওহি ভগবানকা কোন রূপ হ্যায়?' ভক্তেরা বিনীতভাবে উত্তর দেন, 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকা।' সাধুরা একে একে ফিরে যান, যাঁর যাঁর আস্তানায়। ছড়িয়ে পড়ে সারা মেলায় বাঙ্গালীবাবার অপূর্ব ভজন আর ভাবের কথা।

একদিন সকালে চা-পানের পর গোস্বামীপ্রভু আসনে আসীন; প্রৌঢ় এক

সন্ন্যাসী আসেন তাঁর তাঁবুতে। তিনি মহাপণ্ডিত, এই ধারণা সৃষ্টির জন্য বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি থেকে তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে চলেন। ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার প্রকাশ পায় তাঁর আচরণে ও কথাবার্তায়। গোস্বামী মহাশয় দিন-রাত সমাধিতে থাকেন, এ-কথা শুনে তিনি শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লেখ করে বুঝাতে চান, প্রভুর সমাধি উচ্চাঙ্গের নয়। কিন্তু যাঁকে উদ্দেশ্য করে তাঁর এই বিদ্রূপ, বিরস বক্রোক্তি, তিনি অনড় অটল। আর সকলে হয়ে উঠেন অতিষ্ঠ। ঐ সময় পনর-ষোল বছরের একজন গৈরিক কৌপীন-বহির্বাসধারী অবাঙ্গালী বালক-সন্ন্যাসী গোস্বামীপ্রভুর ধুনির পাশে বসেছিলেন। তিনি ঐ প্রৌঢ় সাধুর ধৃষ্টতা দেখে বলে উঠেন, 'য়্যাজী! আব্ চুপ রহে। কিস্‌কো শাস্ত্র বাৎলাতে হো? শাস্ত্র আপ্ কুছ নেহি জান্‌তা হ্যায়!' ঐ অনক সাধু তখন উত্তেজিত হয়ে তাচ্ছিল্যভাবে বলেন, 'ক্যা কহতে? শাস্ত্র ম্যায় নেহি জান্‌তা হুঁ? তুম্‌নে শাস্ত্র কুছ পড়া হ্যায়?' কিশোর-সন্ন্যাসী বলেন, 'ও বাত কাহে পুছতে? সর্বশাস্ত্র হমারা কণ্ঠস্থ হ্যায়।' প্রৌঢ় তখন নিজের উক্তি প্রমাণের জন্য শাস্ত্রবচন আবৃত্তি করতে থাকেন। প্রথম চরণ উচ্চারণ শেষ না হতেই, অবজ্ঞাভরে বালক-সন্ন্যাসী তাঁকে বলেন, 'ব্যস্ হো গিয়া! শাস্ত্র আপ মাৎ কহিয়ে। উচ্চারণ ভি নেহি হোতা হ্যায়! ছন্দ ভি নেহি মালুম হ্যায়! ক্যায়া শাস্ত্র বাত্‌লাতে হ্যায়?' বৃদ্ধ তখন বলেন, 'তুম্‌কো ক্যা মালুম হ্যায়?' বালক-সন্ন্যাসী তখন বলেন, 'আচ্ছা শুন লেও।' এই বলে প্রৌঢ় সাধু যা-যা আবৃত্তি করেছিলেন, তার পূর্ব থেকে শুরু করে শেষ অবধি আবৃত্তি করে এক সুরঝঙ্কার তিনি সৃষ্টি করেন। তাঁর শাস্ত্রানুশীলন, উচ্চারণের ভঙ্গি, ছন্দোবিন্যাস যেন অমৃত বর্ষণ করে। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েন। নবীন-সন্ন্যাসী অতঃপর শাস্ত্র থেকে সমাধির বিভিন্ন সব অবস্থার কথা আবৃত্তি করে প্রমাণ করেন, গোঁসাই সমাধির তুঙ্গ অবস্থায় আছেন। গোশৃঙ্গে সরিষা যে সময়টুকু থাকে, মনুষ্য দেহে ঐ সময়ের জন্যও যদি এই সমাধি হয়, তাহলে দেহ ছুটে যায়। এর উপর আর সমাধি হতে পারে না। তরুণ-সন্ন্যাসীর কথা শুনে সকলে স্তম্ভিত। বিনা বাক্য-ব্যয়ে প্রৌঢ়-সন্ন্যাসী তাঁবু ত্যাগ করেন। পরে কিশোর-সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, প্রভু বলেন, 'ইনি কাশীর ত্রৈলঙ্গস্বামী। এক ব্রাহ্মণ বালকের শবদেহ আশ্রয় করে, সামান্য যে একটু কর্ম বাকী ছিল, তা সম্পূর্ণ করতে তিনি এসেছেন। গঙ্গার উৎস থেকে মোহনা অবধি তিনবার তাঁর পরিক্রমার অভিপ্রায় ছিল; একবার হয়ে গেছে, আর দুবার হলেই হল।'

ক্ষ্যাপাচাঁদ সারাদিন যেখানেই থাকুন না কেন, সন্ধ্যা থেকে রাত্রি সাড়ে তিনটা পর্যন্ত গোসাঁইর সঙ্গছাড়া হন না। তাঁর ধুনির পাশে পড়ে থাকেন। সব ঘুমিয়ে পড়লে পরে, প্রভুর সম্মুখে জোড়হাতে বসে, কত ভাষায় যে তিনি তাঁর স্তবস্তুতি করেন! 'আহা! আহা! বলে আরতি করেন। কখন বা কাঁদেন, কখন বা নাচেন, নাচতে নাচতে বলেন—

তাতা ধাইয়া, তাতা ধাইয়া, তাতা ধাইয়া।
বৃন্দাবনে বংশী বাজে, নাচে কিষণ কানাইয়া॥

এক-একদিন গভীর রাত্রিতে তাঁর আকুল কান্নায় যেন পাষাণ গলে! এই মহাযোগীর কিসের অভাব? কি বস্তুর জন্যে গোস্বামীপ্রভুর কাছে তাঁর এই আকুতি-ব্যাকুতি, আকুলি-বিকুলি?

চড়ায় আসার দিন থেকে গোসাঁই নিদ্রা ত্যাগ করেন, গা টানাও দেন না।

একদিন তিনি শিষ্যদের বলেন, 'এখানে যিনি এক মাস রাত্রি জেগে সাধন করবেন, তিনি ভগবৎ-কৃপা উপলব্ধি করে অদ্ভুত ঘটনাদি প্রত্যক্ষ করবেন।' বিধুভূষণ ঘোষ রাত্রি জেগে সাধন-ভজন করেন, আর সকলে তখন ঘুমিয়ে পড়েন। রাতের পর রাত চলে বিধুবাবুর এই সাধন-নিষ্ঠা। কিছুদিন এভাবে যায়। একরাত্রে বিধুবাবুর মনে হয় তাঁবুটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। তারপর নিবিড় সেই আঁধারে তিনি দেখেন, গোসাঁইর আসনে গোসাঁই নেই; ওখানে জ্যোতির্ময়ী শ্যামা মা দাঁড়িয়ে আছেন! কিছু সময় বাদে মিলিয়ে যান কালী! তাঁর পরিবর্তে সেখানে কৃষ্ণ-বলরাম প্রকাশিত হন। মুহূর্তে হয়ে যান তাঁরা গৌর-নিতাই! তারপর তিনি দেখেন সেখানে গোস্বামীপ্রভু বসে আছেন।' এই অপরূপ দর্শনে বিধুবাবু হন আত্মহারা। গুরুকে গিয়ে তিনি সাষ্টাঙ্গ দেন। প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি দেখলে, বিধু?' বিধুবাবু তাঁর দর্শনের কথা খুলে বলেন। তাঁর কথা শুনে গোসাঁই হাসেন।

মেলায় দিন-দিন গোস্বামীপ্রভুর প্রভাব-প্রতিপত্তি যায় বেড়ে। একে তো বৈষ্ণবদের সেরা স্থানে আসন পেতেছেন; এর উপর অভূতপূর্ব সম্মান। এ-সব অসহ্য হয়ে উঠে পূর্বাশ্রমের বাঙ্গালী এক সতীর্থের কাছে। তাঁর বাড়ী ছিল গুপ্তিপাড়ায়। পূর্ব থেকেই গোসাঁইর উপর ছিল তাঁর পুঞ্জীভূত ক্রোধ। ব্রাহ্মসমাজের দফা-রফা করে, কেমন আবার এখানে জেঁকে বসেছেন! তিনিই প্রভুর বিরোধিতা করেন। তিনি তখন দয়ালদাস স্বামীর সন্ন্যাসী-শিষ্য, নাম স্বামী কৃষ্ণানন্দ। স্বামী কৃষ্ণানন্দ আর একজন বাঙ্গালীকে নিয়ে সন্ন্যাসী-উদাসীদের বলেন, 'আমাদেরও বাঙ্গালী-দেহ; পরদেশীর কাছে অভিনয় ধরা না পড়তে পারে, কিন্তু আমাদের চোখে ধূলি দেওয়া কি এত সহজ? ওঁর নাড়ী-নক্ষত্র আমাদের সব জানা আছে। ইনি বহুরূপী; ক্ষণে ব্রাহ্ম, ক্ষণে সনাতনী, যখন যেমনটি সুবিধে। বেশভূষারই ছিরি দেখুন না! আপনারাই বলুন, ইনি বৈষ্ণব না সন্ন্যাসী? সঙ্গে আবার যোষিৎ, আত্মজ, আত্মজা। আর গৃহীবাবুরা মনোমুখী বেশ নিয়ে ওঁর সঙ্গে একই তাঁবুতে রয়েছেন। আবার নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতকে ভগবান বানিয়ে আসনে স্থাপন করেছেন। এ-সব ভাব-কালি কি করে বিকায়, সাধু-সন্তদের জমায়েতে? বৈষ্ণব-বিরোধী আচরণ করেও, বৈষ্ণব-মণ্ডলীর মধ্যে কি করেই বা তিনি তাঁবু করে আছেন?' সাধুদের মধ্যেও কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগে। সত্যই তো ওঁর বেশ বৈষ্ণবোচিত নয়, সাধন-প্রণালীও অজ্ঞাত, অপরিজ্ঞেয়! মহাত্মাদের চেলাদের মধ্যে এ নিয়ে চলে বিরূপ সমালোচনা। বৈষ্ণব-ছাউনীতে থাকার অধিকারই বা তাঁকে কে দিলেন? যিনি স্থান দিয়েছেন, তাঁর কাছে ওঁরা গিয়ে কৈফিয়ৎ চান। বিষ ছড়িয়ে পড়ে। সদাব্রত বন্ধ হয়ে যায়। চড়া হতে তাঁকে অপসারণের চক্রান্ত বুঝি ফলপ্রসূ হয়ে পড়ে!

গোস্বামীপ্রভুর পরোক্ষে, বৈষ্ণব, উদাসী আর সন্ন্যাসী-মহাত্মাদের বসে এক বিচারসভা। আলোচনার বিষয়ঃ বাঙ্গালী ঐ সাধুর বেশভূষা, সাধন-ভজন শাস্ত্রীয় কিনা, আর বৈষ্ণবগোষ্ঠীর জমায়েতে ওঁকে থাকতে দেওয়া সমীচীন হবে কিনা! এই বিচারসভায় সন্তদের নির্বাচিত নেতারা আসীন। শাস্ত্র-বিশারদ সাধু-মহাত্মারাও যথোচিত আসনে উপবিষ্ট। মহাধিকরণে যেন বিচারপর্বের আয়োজন। স্বামী কৃষ্ণানন্দ অভিযোগ আনেন, 'ইনি যে বৈষ্ণব নন, এর প্রমাণ সুস্পষ্ট। যুগপৎ গৈরিক, তুলসী, রুদ্রাক্ষ আর জটা কমণ্ডলু ধারণ, বৈষ্ণব নিদর্শন বলে কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে কি? গৌর-নিতাই, ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলে

কি আপনারা কেউ কখন শুনেছেন?' উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করেন, 'মেলার বুকের উপর সাধু-সন্তদের সেরা স্থানে বসে, পুত্র-কন্যা, স্ত্রীলোক আর যথেচ্ছাচারী গৃহীবাবুদের নিয়ে বসবাস কি সন্ন্যাসীর লক্ষণ? এ-সব বিগর্হিত আচরণের প্রশ্রয় দেওয়া কি সাধুদের কলঙ্ক নয়?' মহাত্মারা সাধুদের উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেন, 'আর কারও কোনও অভিযোগ আছে?' ভেসে আসে মৃদু গুঞ্জন। কেউ দাঁড়ান না উঠে। তাঁরা এবার জিজ্ঞাসা করেন, 'অভিযোগ-খণ্ডনে কারও কিছু বলার আছে?'

বৈষ্ণব শাস্ত্রবিদ্ প্রৌঢ় সাধু পরমানন্দজী উঠে দাঁড়ান। সৌম্যমূর্তি, সহাস্যবদন। সভামণ্ডল নিস্তব্ধ। দয়ালদাসজীর অভিযোগকারী চেলার মুখে ফুটে উঠে হাসির রেখা। সাধুজনসমাদৃত এই শাস্ত্রকুশলীর মুখে এখনই সকলে শুনবেন, তাঁর অকাট্য যুক্তির সমর্থন!

জলদগম্ভীর স্বরে স্বামীজী বলেন, 'বৈষ্ণবদের প্রামাণ্য গ্রন্থ "পদ্মপুরাণ" পাতাল খণ্ডে আছে, তুলসী, নলিনী আর অক্ষধারণ বৈষ্ণবদের প্রতীক চিহ্ন; এ-সব ধারণ না করলে অপরাধ হয়। আর "হরিভক্তিবিলাসে" রয়েছে, যাঁদের গলায় তুলসী, পদ্ম আর রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে যজ্ঞপুণ্ড্র আর বাহুতে শঙ্খমালা, ঐ সব মহাত্মারা পৃথিবী পরিত্রাণ করে থাকেন।' আসরের দৃষ্টি পড়ে অভিযোগকারী বাগ্‌নিপুণ কৃষ্ণানন্দ স্বামীর উপর।

পঞ্চবটী আশ্রমের সাধুকুল-চূড়ামণি পুরী-সম্প্রদায়ী শাস্ত্রজ্ঞ, স্বামী অমেশ্বরানন্দজী উঠে দাঁড়ান এবার। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'গৌর-নিতাই নবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে পূজিত হন, কৃষ্ণ-বলরামের অবতার রূপে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত এই তত্ত্বের প্রমাণ রয়েছে গ্রন্থদ্বয়ে।' স্বামী কৃষ্ণানন্দের মাথা আরও হেঁট হয়। বৃদ্ধ এক সন্ন্যাসী তাঁকে লক্ষ্য করে অস্ফুট স্বরে বলেন, 'সাধু-নিন্দা কভি নেই কর না আর শোন না ভি নেহি হ্যায়।'

মহাত্মা নরসিংদাস পাহাড়ীবাবা বলেন, 'হম্ সচ্ কয়তেহে, এ বাঙ্গালীবাবা সাক্ষাৎ রামজী হ্যায়, জ্যোতিস্বরূপ হ্যায়।' ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মা অর্জুনদাস এই সভার পূর্ব থেকে সাধু-সন্তদের কাছে বলে বেড়াতেন, 'মহারাজ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হ্যায়; এ বাংলাদেশকো চেতন কিয়া। হম্ যেতনা কুম্ভ দেখা হ্যায়, মহারাজকো দর্শন করকে সব পূরণ ভায়া; এইছা মহাত্মা হম্ কভি নেই দেখা। হম্ উন্‌কা নোকরকা নোকর।' গোসাঁইজীর উদ্দেশ্যে ফের বলেন, 'আহা! মেরী রামজী হো, তুম্‌হরা লিয়ে হম্ ত্রেতাযুগসে পড়া রহা হ্যায়; তিন যুগ হমারা গুজাড় গিয়া; আব তো কৃপা করকে তু হম্‌কো দর্শন দিয়া। আব্ হম্‌কো কৃপা কর; আব হম্‌কো তেহার করলে।' সিদ্ধ হঠযোগী ছোট কাঠিয়াবাবা গোস্বামীপ্রভুর উদ্দেশ্যে বলেন, 'কভ্‌ভি রামজী, কভ্‌ভি গণেশ দেখতা হ্যায়; বড়ী তাজ্জিব কা বাত।' সন্ন্যাসীমণ্ডলীর অগ্রণী শ্রীমদ্ ভোলানন্দ গিরিমহারাজ গোস্বামী মহাশয়কে 'মেরা আশুতোষ' বলে সম্বোধন করে তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন, 'পুত্র-কন্যা ত্যাগ আর যোষিৎসঙ্গ বর্জন সন্ন্যাসীর বিধান বটে, কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাজনেরা বিধি-নিষেধের বাইরে। বিষ পান করেও বিরূপাক্ষ তাই নির্বিকার। গোসাঁইজীর সঙ্গ করে আমি জানি, ইনি সাক্ষাৎ সদাশিব।' ভাববিগলিত কণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেন, 'কুম্ভমে ওহি বাঙ্গালীবাবাকা মাফিক একভি সাধু নেহি হ্যায়।'

বৈষ্ণবশিরোমণি আর বৈষ্ণবমণ্ডলের নির্বাচিত নেতা শ্রীমদ্ রামদাস কাঠিয়াবাবা মহারাজ জমায়েতের সাধুদের লক্ষ্য করে তেজঃদৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, 'গোসাঁইজী তো সাক্ষাৎ মহাদেব হ্যায়—প্রেম্‌কা অবতার। উন্‌কা ললাট মে হামেসা আগ্ ধক্-ধক্ জ্বলতা হ্যায়। য়্যায়সা প্রেমিক, তায়সা হি সামর্থী। ক্যায়া বল্‌তে হো? তুম্‌লুগ্ এয়সা এক আসনপর হরদম বৈঠ্ রহ্ তো। শরীর খান খান হো যায়গা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিনো মিলা করকে বিজয়কিষণ হোয়া। বৈষ্ণবলোকন কা বিচমে ছাউনি কিয়া হ্যায়—ইস্‌মে তো বৈষ্ণবলোকন কা মান বড় গিয়া হ্যায়। বৈষ্ণবলোকনকা বহুৎ ভাগ হ্যায়।'

পরমেশ্বর যাঁর সহায়, মানুষ তাঁকে ছোট করতে পারে না। মানুষের অপচেষ্টা তাঁর গৌরবকে করে আরও উজ্জ্বল, যশকে করে বহু বিস্তৃত।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। মহাত্মাদের সিদ্ধান্ত শুনে বিরোধীরা হন ম্লান, ম্রিয়মাণ। গিরিবাবা আর কাঠিয়াবাবার মন্তব্য সাধুদের অন্তরে করে গভীর রেখাপাত। 'মেরা আশুতোষ', 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিনো মিলা করকে "বিজয়কিষণ"—ও-সব তো হতে পারে না, মনগড়া ফাঁকা কথা। সত্যে সদা প্রতিষ্ঠিত মহাজনের উক্তি—"উনকা ললাটমে হামেসা আগ্ ধক্-ধক্ জ্বল্‌তা হ্যায়" এর অর্থ ইনি তৃতীয় নেত্রবিশিষ্ট সদাশিব। ওঁর দৃষ্টির সম্মুখে পড়লে মুক্তি হয়।' গোস্বামীপ্রভুর স্বরূপের কথা দাবানলের মত অল্প সময়ের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মেলার সবার মুখেই তাঁর জয়ধ্বনি। দলাদলি আর সংকীর্ণতা ভেসে যায়। দুদিন বন্ধ থাকার পর, ফের আসে সদাব্রত। মহাত্মা দয়ালদাসজী স্বামী কৃষ্ণানন্দকে পাঠান গোস্বামী মহাশয়ের কাছে। তিনি তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে ক্ষমা চান। তারপর বিনীতভাবে বলেন, 'গুরুজীর একান্ত অনুরোধ, আপনি আজ সশিষ্য আমাদের ছাউনীতে প্রসাদ পান।' সম্মত হন প্রভু। মহাত্মা দয়ালদাস নানকসাহী গরীবদাস সম্প্রদায়ের সাধু। অজানুলম্বিত বাহু, সুদীর্ঘ শীর্ণকায়, গৈরিকধারী, মুণ্ডিত মস্তক, কণ্ঠে তুলসীর মালা, কপালে গোপীচন্দনের ফোঁটা, সহাস্য বদন। সিদ্ধ অবধূত এই মহাত্মা বার বছর বয়সে, কালার বাঁশির আকর্ষণে, 'জয় রাধে' বলে ঘর ছেড়ে বের হয়েছিলেন।

সশিষ্য গোসাঁই বেলা এগারটায় স্বামী দয়ালদাসজীর ছাউনীতে যান নিমন্ত্রণ রক্ষায়। দয়ালদাসজী করজোড়ে দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করে, গোসাঁইজী ও তাঁর শিষ্যদের সাদর আপ্যায়ন করে বড় একটি তাঁবুতে বসান। প্রভুর অনুমতি নিয়ে, স্বামী কৃষ্ণানন্দের উপর তাঁদের পরিচর্যার ভার দিয়ে, তিনি অন্য কাজে যান; কীর্তন শুরু হয়। ভাবের বন্যা বয়। তিলকধারী একজন সাধু এসে খোল বাজাতে থাকেন। সতীশ মুখোপাধ্যায় (১) ছুটে গিয়ে তাঁর দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এই তিলকধারীর মুখের সামনে ধরে লাফাতে থাকেন, সাধুও সতীশকে দেখামাত্র খোলটি রেখে তখনই চলে যান। কীর্তনের শেষে, সতীর্থরা জিজ্ঞাসা করেন, 'সতীশ, এটা আবার কোন্ ভাবের উদয় হল?' সতীশ হেসে বলেন, 'ভাব দেখালুম আর কোথায়? শালা যে আগেই পালাল। ঐ ভণ্ডই আমার মাথায় সেই ভূতের বোঝা চাপিয়েছিল।' বেলা তিনটায় পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেয়ে সকলে তাঁবুতে ফিরলেন।

সৌম্যমূর্তি এক সন্ন্যাসী এসে গোসাঁইজীর কাছে বারটি টাকা যাচ্ঞা করেন। প্রার্থীকে সবিনয়ে তিনি বলেন, তাঁর হাত তখন একেবারে শূন্য। তাঁর এই কথা

শুনে সাধু বলেন, 'আপনার কি আছে না আছে, ও-সব জানার আমার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু এই জানি, আপনার অক্ষয় ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই।' প্রভু মৃদু হেসে বলেন, 'আপনার প্রারব্ধে নাই, আমি কি করব?' আগন্তুক আত্মহারা হয়ে বলেন, 'আমার প্রারব্ধ? আপনার সাক্ষাৎ সত্ত্বেও আমার প্রারব্ধের জের! বেশ, তাহলে স্বীকার করুন, আপনার দর্শন পেয়েও প্রারব্ধের ভোগ শেষ হয় না!' শাস্ত্রে আছে, 'ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তেচাস্য কর্ম্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' অর্থাৎ পুরাণ-পুরুষকে দর্শন করলে হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়; সর্ব সংশয় ছিন্ন হয় এবং প্রারব্ধ কর্মের অবসান হয়। আগন্তুক গোসাঁইকে সাষ্টাঙ্গ দিতেই তিনি মহেন্দ্রবাবুকে বলেন, 'ইনি যা চান, কারও থেকে নিয়ে এঁকে দিয়ে দেন।' টাকা পেয়ে সাধু চলে যান। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১) মন্তব্য করেন, 'সন্ন্যাসীর বেশ, অথচ অর্থে কি আসক্তি!' গোসাঁই বলেন, 'তোমরা ওঁকে চেন নাই। বাসনা-কামনার লেশমাত্র তাঁর নাই। টাকার জন্য যে আবদার করলেন, ও কিছুই নয়। সাধুর কাছে, সাধু অমন করে থাকেন।' খেলা ভক্ত আর ভগবানের। ভক্তের কাছে স্বেচ্ছায় তিনি ছোট হন। তাই ভক্ত তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন।

গোস্বামীপ্রভু সদ্‌গুরুর অবতার। সাধুমণ্ডলীর মধ্যে এই সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তাই সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের দর্শন-মানসে. তাঁবুতে শত শত সাধু-সন্তের আনাগোনা। তাঁরা প্রত্যেকে একান্তে প্রভুকে কি বলতে চান। অনুগামীদের কাছে গোসাঁই কথায়-কথায় বলেন, 'তাঁবুর পাশে একখানা কুঁড়ে ঘর হলে ভাল হয়।' ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তাঁবুর পাশে উঠে দিব্যি একখানা কুটীর। প্রভুর আসন যায় ওখানে। নূতন কুটীরে সংগোপনে রাতভোর চলে সাধু-সন্ন্যাসীদের সাধন। হাজার হাজার প্রার্থী এভাবে তাঁর কৃপা লাভ করেন।

বিশ্বপতি গোপন থেকেই তাঁর কাজ করে যান। শাস্ত্রে আছে, লোক জানাজানি হলে কর্মের প্রেরণাশক্তি হ্রাস পায়। বিধাতা গোপন বলেই তাঁর সৃষ্টি এত বিশাল, অসীম, অন্তহীন। অরণ্যে, গিরিকন্দরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, গোস্বামীপ্রভুর নাম-না-জানা শিষ্য-প্রশিষ্যদের খবর রাখেন না লোকালয়ের গোসাঁইশিষ্যরাও।

মহাপ্রভুকে কাশীধামে প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসীরা বিদ্রূপ করে বলেছিলেন—

সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালি॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।১৭।১১৬

তারপর তাঁরই কাছে করেন ওঁরা আত্মসমর্পণ। তাঁর পদপ্রান্তে প্রণতি করে প্রশস্তি করেন প্রকাশানন্দ। 'কত অপরাধ করেছি, তোমার নিন্দা করে। তুমি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান; অচিন্ত্য শক্তির আধার। জীবন্মুক্ত সাধকেরও পতন হয়, তোমার নিন্দা-বাদের শাস্তিস্বরূপ। আমার ন্যায় অধমের আর কি কথা! তোমার চরণ আশ্রয় করে এবার রক্ষা পেলাম।' মহাপ্রভু তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের কৃপা করেন।

সবে কহে লোক তরিতে তোমার অবতার।
পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার॥
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমাদের সুখ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।১৫।১১৪-৫

এরই হয় পুনরাবৃত্তি, প্রয়াগে এবারের কুম্ভমেলায়। প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, সাধুদের পরিত্রাণের জন্যও যুগে যুগে লীলা করবেন! কোন্‌ সূত্র ধরে যে কি করেন, তা শুধু তিনিই জানেন।

নরলীলায় তাঁকে চেনা তেমন সোজা কথাটি নয়। দণ্ডকারণ্যের সব ঋষিরাও পারেন নি! পঞ্চবটীর পম্পাসরোবর সংলগ্ন তপোবনের পথ ধরে চলেন জানকী-বিরহ-কাতর শ্রীরামচন্দ্র। ঋষিরা সহানুভূতির সুরে নিজেদের মধ্যে করেন আলাপ-আলোচনাঃ 'আহা! সংসারীর কত জ্বালা! দশরথের বেটা! নিয়তির ক্রূর চক্রান্তে আজ সর্বহারা! দুর্লঙ্ঘ্য প্রারব্ধের জের!' শুধু ওঁদের কয়েকজনের কাছে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায়। 'পরব্রহ্ম রাম' বলে ওঁরা ওঁকে চিনে ফেলেন। আর ঋষি কেন? দেবতারা পর্যন্ত হিমসিম খান তাঁর লীলা-অভিনয়ের অভিনবত্বে।

ব্যোমপথে চলেন সতী-হর সঙ্গে। বনে-বনে বিলাপ করেন শ্রীরাম, 'হা সীতে, হা সীতে' বলে। সমবেদনায় আকাশে মেঘ গুমরে গুমরে উঠে; পাতা বয়ে বারি-কণা ঝরে; শোকের কালছায়া পড়ে, বন-বনান্তে। সশ্রদ্ধ অভিবাদন করেন মহেশ্বর, 'ব্রহ্মণে পরমাত্মনে নমঃ।' দক্ষজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কার উদ্দেশে এই প্রণতি?' দেবাদিদেব দৃঢ়কণ্ঠে তাঁকে বলেন, 'কেন? ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে! ঐ যে রঘুপতি রাঘব রাজারাম!' সতী তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'ইনি ব্রহ্ম? ইনি তো পত্নীবিরহ-কাতর শ্রীরামচন্দ্র। সর্ববিদ্‌ ব্রহ্ম হলে মোহাচ্ছন্ন মানবের ন্যায় কেন অমন হা-হুতাশ?' ভব হাসেন আপন মনে। সতীকে তিনি বলেন, 'আমার কথাটি একবার পরখ করে দেখলে হয় না? জননী জানকীর বেশে ওঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেই হয়!' সতীর সংশয় তথাপি যায় না। তিনি নিঃসন্দেহ হবার জন্য নিজেই সীতার অবয়ব পরিগ্রহ করেন। হুবহু সীতা, শ্রীরামের মুখোমুখি। শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি যে মা এই গভীর বনে আশুতোষ-বিহনে?' ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বিশ্বরূপ দেখান—

ঘটে ঘটে দেখেন তখন দাক্ষায়ণী।
শ্রীরামচন্দ্রের বাঁয়ে জনক-নন্দিনী॥

দ্বাপর-লীলায় ব্রহ্মার হয় সংশয়। যিনি মাঠে মাঠে হৈ-হৈ করে গরু চরান; খেলায় হেরে গোপ-শিশুদের কাঁধে নেন, চুরি করে ভয়ে যেন হন জড়সড়, কি করে ইনি হবেন গোলকবিহারী? গরু, বাছুর, বাঁশি, রশি, পাঁচন, শিঙা আর সব গোপ-বালকদের নিয়ে ব্রহ্মা লুকিয়ে রাখেন পাহাড়ের গুহায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কারসাজি জেনে হাসেন আপন মনে। তখন তিনি নিজেই সব হন। ঘটে ঘটে যে তিনি আছেন, এরই নিদর্শন। বছর ঘুরে আসে। ব্রহ্মা দেখেন, একই ভাবে লীলা চলছে। গুহায় গিয়ে তিনি দেখেন, যেমনটি রেখেছিলেন, তেমনই সব আছে; ফিরে যান তিনি গোঠে। গরু, বাছুর, রাখাল, শিঙা, রশি সবই শ্রীকৃষ্ণময়। শ্রীকৃষ্ণের পায়ে পড়ে ব্রহ্মা করেন কাকুতি-মিনতি। বিনীত হয়ে বলেন তাঁকে, 'প্রভো, আমায় ক্ষমা করুন; আপনার অপার মহিমা, আপনার কৃপাদৃষ্টি বিনা আমরণ অনুসন্ধান আর "নেতি নেতি" বিচার করেও কেউ পান না এর কূল-কিনারা।'

তথাপিত দেব! পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদ লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্‌ মহিম্নো ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।২৮

কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের কথায়—

তাঁর কৃপা নাহি যারে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর না মানে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।১১।৯১

জননী যশোমতীর কাছে গোপ-শিশুরা এসে বলে, 'কানাই মাটি খেয়েছে।' মার নির্দেশে, বালগোপাল করেন মুখব্যাদান। নন্দরানী তাঁর শ্রীমুখের অভ্যন্তরে দেখেন বিশ্বরূপ। ব্রজভূমির একপাশে আপনাকে দেখে, ভীতশঙ্কিত চিত্তে তিনি ভাবেন, 'এ কি স্বপ্ন না মায়া? না আমারই বুদ্ধির বিকার! যাঁর শ্রীমুখ আশ্রয় করে এই বিশ্ব বিরাজ করছে, প্রণাম করি আমি তাঁর দুর্লভ চরণে। গোপবধূ আমি, গোপরাজ নন্দ আমার পতি, শিশু-কৃষ্ণ আমার বালক; ব্রজরাজের সম্পদের আমি কর্ত্রী। গোপ, গোপী, গোধন, সকলই আমার—এই মোহ হতে তিনি আমায় ত্রাণ করুন।' যশোরানীর তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জননীর প্রতি পুত্রস্নেহ-রূপিনী দৈবীমায়া করেন প্রয়োগ। লোপ হয় নন্দরানীর আত্মজ্ঞান। গোপালকে কোলে নিয়ে তিনি স্নেহে হন বিভোর। বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র, ভাগবত, আবেস্তা, বাইবেল, কোরাণ, আর মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসী, সেইণ্ট, ফকির-পীর-দরবেশ, আর সব ভক্তেরা যাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করেন, জননী যশোদা দিব্যজ্ঞান লাভ করেও, তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁর প্রতি পুত্রস্নেহে হন আত্মহারা।

ত্রেতায়, দ্বাপরেই যখন ঐ রকম, কলিতে কি করে লোকে তাঁকে চিনবে? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'নরলীলায় ভগবানকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়, তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রোগ-শোক, কখন বা ভয়—ঠিক মানুষের মত। পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।'

গোস্বামীপ্রভু নিজে বলেছেন, 'যিনি ঠিক ঠিক আমাদেরই মত খানদান, বেড়ান, রোগ-যন্ত্রণায় "আহা, উহু", "গেলামরে, মলামরে" বলে ছটফট করেন, শোকে দিশেহারা হয়ে, "কোথা গেলরে, কোথা গেলে, পাবরে" বলে কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে দেশ-দেশান্তরে পাগলের মত ছুটে বেড়ান, কখন বা ক্ষুধায় কাতর হন, পিপাসায় অস্থির হন, ইনিই সেই সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী আনন্দময়, চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর, ইহা মনে করা কি সোজা কথা?'

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী গুরুকে প্রশ্ন করেন, 'শ্রীরামচন্দ্র তো স্বয়ং ভগবান। তিনি তো সবই জানতেন, সবই পারতেন, তিনি আবার দুর্গাপূজা কেন করলেন?' গোসাঁই বললেন, 'এ যে নরলীলা, এখানে জানা না-জানা, পারা না-পারার কোন কথাই উঠে না। তিনি যদি পূর্ণব্রহ্মের ন্যায়ই সব করবেন, তাহলে আর অবতীর্ণই বা হলেন কেন? ওখানে থেকেই তো সব করতে পারতেন। তাঁর আবার অসাধ্য কি? যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, তিনি মুহূর্তে কি না করতে পারেন? যখন তিনি যে উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হন, তখন ঐরূপই আচরণ করে থাকেন। লীলা-সময়ে আপন মায়ায় স্বেচ্ছায় আপনাকে আচ্ছন্ন রাখেন, গুটিপোকা যেমন আপন সুতায় আপনি হয় আবদ্ধ। তাঁর লীলা কি বুঝবার সাধ্য আছে? শুধু তাঁর কৃপা; সংশয় হয় আবার বিশ্বাস হয়—সবই তাঁরই ইচ্ছায়। তিনি যখন যা করতে আসেন, তা না করে যান না। যাঁদের ধরেন, কখনও তাঁদের ছাড়েন না। তিনি না ধরলে, মানুষের কি সাধ্য যে, তাঁকে ধরে থাকে? তাঁর কৃপাই সার।'

নরলীলায় ভগবানকে মানুষের মত আচরণ করতে হলেও, কর্মের অধীন হয়ে তাঁকে আসতে হয় না। তাঁর আবার প্রারব্ধ কি? জনহিতায় কৃপা পরবশ হয়ে

আসেন তিনি, মায়ার আবরণে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে।—করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ। অজ্ঞতা, দূরদৃষ্টিহীনতা, অসম্পূর্ণতাকে আশ্রয় করেই তিনি নরলীলায় আসেন। আঁধারের ভিতর দিয়ে চলার আদর্শ সৃষ্টি করে, যেতে হয় তাঁকে আলোর পথে। তাঁর আগমন লোক উদ্ধারের তরে। তাই ভোগ-সুখের কোন বালাই থাকে না তাঁর মধ্যে। কিন্তু তাঁর প্রচ্ছন্ন দেবভাব মানবভাবের বহিরাবরণকে ভেদ করে, সময় সময় প্রকাশ করে ফেলে তাঁর চিরন্তন রূপটি। জননী যশোদার ন্যায় তখন হয় তত্ত্বজ্ঞানের উদয়। আবার তাঁরই ইচ্ছায় ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় অমানিশায় সৌদামিনীর ঝলকের মত বিলীন হয় নিমেষে। কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান যুগে যুগে ভক্তের কাছে দেন আপনাকে ধরা। ব্যর্থ হয় ভাগবতের কাছে তাঁর আত্মগোপনের প্রয়াস। ভক্ত ও ভগবানের লুকোচুরি খেলায় ভগবান তাঁর কৃপাবাহুল্যে ভক্তের কাছে স্বেচ্ছায় পরাজয় মেনে নেন। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বড় সুন্দরভাবে এই তত্ত্বটি ফুটিয়েছেন—

> অসুর স্বভাবে কৃষ্ণ কভু নাহি জানে।
> লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥
> আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
> তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৩।৭০-৭১

মহাজনেরা এই হেতু ইহলোক ও দেবলোকের যোগসূত্র।

জীবনে ধর্মকে পরম আশ্রয় করে যাঁরা হন তাঁর শরণাপন্ন, ভগবান কৃপা করে তাঁরই ভাগবত মাধ্যমে তাঁদের কাছে আপনাকে প্রকাশ করেন নরলীলায়। তাই তীর্থরাজ প্রয়াগে, সাধুমণ্ডলীর মধ্যে আপনাকে করেন প্রকাশ। সাধুদের উদ্ধার যে তাঁর আগমনের তিনটি হেতুর প্রধানটি।

> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—শ্রীমদ্ভাগবতগীতা ৪।৮

অর্থাৎ 'সাধুদের উদ্ধারের জন্য, দুষ্টদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'

তিনি স্ব-প্রকাশ। করুণার বশবর্তী হয়ে কখন কিভাবে, কার কাছে তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন, তা শুধু তিনিই জানেন। তাঁর লীলাখেলার বৈচিত্র্যে, কীর্তিকলাপের মাধুর্যে আর অনন্ত মহিমায়, মানুষী-বুদ্ধিতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। মহাকৌশলীর কৌশলচক্র ভেদ করতে, জাগতিক বুদ্ধি অচল, মূক ও ম্লান। তিনি প্রলয়ের অন্তরালে করেন সৃষ্টির বীজ বপন। তিনিই রুদ্র, তিনিই আবার শিব। তাঁরই করুণায় অশুভ ষড়যন্ত্র হয়ে উঠে মাঙ্গলিক উৎসব।

চক্রান্তের মূলে ছিলেন যাঁরা, তাঁরা দেবতারই ক্রীড়নক। মানুষকে নিয়ে অহরহ খেলছেন তিনি এক নিষ্ঠুর খেলা। শ্রীরামের অভিষেক বার্তা আনে মন্থরা। উল্লসিত হয়ে আপনার কণ্ঠের রত্নহার তুলে ধরেন উপঢৌকন, জননী কৈকেয়ী বার্তাবহের উদ্দেশ্যে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নরলীলা বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়! স্তব্ধ হয়ে যায় বুঝি রামায়ণী কথার অমৃতধারা!

ভর করে বসেন সরলা নিরক্ষরা বুদ্ধিহীনা পরিচারিকার স্কন্ধে দেবতা। তাকে কুশলী রাজনীতিজ্ঞা করে তুলেন। ভরে উঠে দশরথ-জায়ার অন্তর বৈমাত্রেয়

ঈর্ষা হলাহলে। মহীয়সী রমণী হন মসীলিপ্ত দেবলোকের গূঢ় চক্রান্তে। আদর্শের শিখর থেকে ঠেলে ফেলেন দেবতা, অসহায় অবলাকে অপযশের গভীর খাদে। স্বামী কৃষ্ণানন্দকে ঐ শাশ্বত যন্ত্রীই যন্ত্র করে আপনাকে করেন প্রকাশ। আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হয়ে উঠে ভাগবতের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাসে। জয় গোস্বামীপ্রভু কি জয়! জয় গোস্বামীপ্রভু কি জয়!! জয় গোস্বামীপ্রভু কি জয়!!!

কীর্তন জমে ওঠে গোসাঁইজীর ছাউনীতে। নিত্যানন্দ-বিগ্রহের গলার মালা গোসাঁইর গলায় পরিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হন এক সাধু। গোস্বামী মহাশয় 'অবধূত, অবধূত বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠেন। কীর্তনান্তে শিষ্যদের তিনি বলেন, 'দয়াল নিতাই এসেছিলেন।' তাঁর উপস্থিতির সময়ে এক শক্তির ক্রিয়া অনুভূত হয়েছিল কীর্তনীয়াদের মধ্যে। বাদকের হস্ত নিষ্ক্রিয় হতে চাইলেও, আপনা-আপনি দ্রুতলয়ে খোল-করতাল বাজছিল। সংকীর্তনও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল।

চড়ায় একরাত্রে জগদ্বন্ধুবাবুর উপর পরিবেশনের ভার পড়ে; খিচুড়ি বারবার চেয়ে নেন সতীর্থরা। তখন চারজন বাকি। সকলেই ক্ষুধার্ত, অথচ হাঁড়িতে একজনের উপযোগী প্রসাদও নেই। গোসাঁই শুনেই বলেন, 'ভাণ্ডটি এখানে নিয়ে এস তো!' যা ছিল, চারটি পাতায় তিনি সমান ভাগে দেন। জগদ্বন্ধুবাবু, ব্রহ্মচারী, মহাবিষ্ণু যতি ও অশ্বিনী বৈরাগী তৃপ্তির সঙ্গে আকণ্ঠ প্রসাদ পেয়ে উঠেন। বিচিত্র সদ্‌গুরুর কৃপালীলা!

একদিন রাত তিনটায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে বিধুবাবু দেখেন অবাক হয়ে, মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে কয়েকজন দিব্যকান্তি যুবক-যুবতী চড়ায় পায়চারি করছেন। স্নান করে তাঁবুতে ফিরতেই গোসাঁই জিজ্ঞাসা করেন, 'বিধু, গঙ্গাতীরে আজ কি দেখে এলে?' বিধুবাবু আদ্যন্ত সব বিবৃত করলে, প্রভু বলেন, 'কুম্ভস্নানে দেব-দেবীরা এসেছিলেন; তাঁদেরই কয়েকজনকে তুমি দেখেছ।'

সকালে চা-পানের পর, প্রায়ই সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু সাধুদর্শনে বের হন। একদিন বৈষ্ণব ছাউনীতে সাধুদর্শন করতে করতে, গঙ্গার তীরে এক সাধুকে দেখে গোসাঁই থমকে দাঁড়ান। তাঁর পরিধানে শুধু কাঠের কৌপীন। গায়ের চামড়া খস্‌খসে; তাতে অসংখ্য চক্র। প্রভুর পানে সাধু অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকেন, আর দরদর ধারায় অশ্রুবর্ষণ করেন। বয়স ত্রিশের বেশি মনে হয় না। কচি ছেলের মত সরল স্নিগ্ধ দৃষ্টি। তাঁবুতে ফিরার সময় গোসাঁই বলেন, 'ইনি একজন সিদ্ধমহাত্মা, রাম উপাসক; ভরতের ভাব নিয়ে আছেন। পাঁচশত বৎসর পূর্বে তিনি দেহকল্প করেছিলেন। সেই দেহই আছে, এর ক্ষয়ও হয় নাই, বৃদ্ধিও হয় নাই, একটি চুল পর্যন্ত পাকে নাই, একটি দাঁতও পড়ে নাই। কোন আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই; পাহাড়েও এই অবস্থায়ই থাকেন।'

এরপর থেকে প্রতিদিন তিনি প্রভুর কাছে দু-তিনবার করে এসে, পাঁচ-ছ মিনিট করজোড়ে তাঁর পানে তাকিয়ে চলে যান। একদিন তাঁকে এর হেতু জিজ্ঞাসা করা হলে সাধু বলেন, 'হিঁয়া হমারা রামজী রয়তে হ্যাঁয়।' একদিন এক সাধু গোস্বামীপ্রভুর আসনের কাছে বসে ধুনি তাপেন। তিনি বালকের ন্যায় বলে উঠেন, 'বড়ি ভূখ লাগা।' গোসাঁই ইসারা করতেই মনোরঞ্জনবাবু বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্‌ এনে দেন। সাধু আস্ত বাদাম মুখে দেন দেখে মনোরঞ্জনবাবু খোসা ছাড়িয়ে বেছে সাধুর হাতে দেন। তিনি তখন মনোরঞ্জনবাবুর কোলে বসে, গলা জড়িয়ে ধরেন। প্রভু বলেন, 'ইনি বরফান দেশ থেকে এসেছেন। কন্দমূল উপ-

জীবিকা। সাধুর নাম নরসিংহদাস পাহাড়ীবাবা।' এই সাধু বলেন, 'ভগবান যখন যেভাবে রাখেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তিনি যে সুখেই রাখবেন, এমন কোন কথা নেই। কভি ঘি ঘনা, কভি মুঠিভর চানা, কভি চানা ভি মানা।'

গোসাঁই একদিন গম্ভীরনাথজীকে দর্শন করতে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই বাবাজী একখানা শতছিন্ন আসন বিছিয়ে দেন। বাবাজীর তপঃসাধনবিশিষ্ট কলেবর, উন্নত নাসা, দীর্ঘ ললাট, পরিধানে কৌপীন, ছেঁড়া একখানা মাদুরের উপর আসীন। দুইজনে নীরবে ভাবের আদান-প্রদান করেন। সেবককে ইসারা করতেই পেস্তা, বাদাম, আখরোট, কাবুলি মেওয়া ও মাটির ভাঁড়ে চা দিয়ে যান। বাবাজী গোসাঁইজীর হাতে ঐসব তুলে দেন। তাঁবুতে ফিরার পথে প্রভু বলেন, 'ইঁনি নাথযোগীদের মহান্ত। হিমালয়ের নীচে এমন শক্তিশালী সাধক আর নাই। ইঁনি পলকে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করতে পারেন। ঐশ্বর্য-পথে অতি কঠোর সাধন করে সিদ্ধ হন, পরে মহাসিদ্ধ অবস্থা লাভ করেন। এখন ইঁনি মাধুর্যে একেবারে ডুবে আছেন। ওঁর সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।'

বেলা একটা নাগাদ তাঁবুতে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এসে গোসাঁইকে অভিবাদন করেন; সাদা গোঁফ-দাড়ি, সাদা পোষাক ও পাগড়ি। সুদীর্ঘ সুস্থ গৌরবর্ণ দেহ। গোস্বামী মহাশয় তাঁকে করজোড়ে ধুনির পাশে বসান। উভয়েই মৌন থাকেন। আধঘণ্টা এভাবে কাটার পরে তিনি গোসাঁইকে প্রণাম করে বিদায় নেন। প্রভু বলেন, 'ওঁর নাম কোথুম ঋষি। ইঁনি এক অসাধারণ মহাপুরুষ। এখানে ছদ্মবেশে এসেছিলেন। ইঁনি কর্ণেল অলকটের গুরু।'

একদিন রাত্রি এগারটায় কোট-পেন্টলুন, টুপি পরে এক আগন্তুক আসেন তাঁবুতে। তাঁকে দেখামাত্র গোসাঁই আসন থেকে উঠে গিয়ে আলিঙ্গন করে আপন আসনে বসান। কত মহাত্মা, পরমহংস আসেন তাঁর কাছে; কাউকে কখন নিজের আসনে তিনি বসান না। আজ কেন এর ব্যতিক্রম? পনর-বিশ মিনিট কথা বলে বৃষ্টির মধ্যেই তিনি বের হয়ে পড়েন। ছাতা এগিয়ে দিলেও নেন না। প্রভু তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন, 'ইঁনি শা সাহেব, জাতিতে মুসলমান; আমার গুরুভ্রাতা। এখন জাতি-বুদ্ধি নাই, পরমহংস অবস্থা। ইঁনি ঐশ্বর্য-পথে চলে সিদ্ধ হয়েছেন। এঁর অসাধারণ শক্তি; ঝড়-বৃষ্টিতে এসেছেন, এক ফোঁটা জল পড়ে নাই গায়, যাবার সময়ও ঐভাবেই গেলেন। আমরা কিভাবে আছি, খবর নিতে এসেছিলেন। এলাহাবাদে তিনি গোপনে আছেন।' আর একদিন গোস্বামী মহাশয় তান্ত্রিক সাধুদের জমায়েতে প্রবেশ করেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক অবধূতের কাছে যান। অবধূত মহাত্মা প্রভুকে দেখেই 'জয় গজানন, জয় গজানন' বলে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। পনর-বিশ মিনিট ওখানে কাটিয়ে ফেরার পথে দেখেন, মুক্তাকাশের নীচে একজন ভৈরবী ধুনি জ্বেলে বসে আছেন। গোসাঁই তাঁর কাছে যেতেই তিনি বলেন, 'আও বাবা গণেশ, আও বাবা গণেশ।' ভৈরবীর সর্বাঙ্গে ভস্মমাখা, যোগাসনে আসীন, বিবসনা, শ্যামাঙ্গী, অপরূপা সুন্দরী। মনে হয় তাঁকে দেখে মাতৃমূর্তি ভগবতী। জটায় তাঁর পিঠ ঢাকা। বারবার তিনি প্রভুকে প্রণাম করেন। চোখের জলে তাঁর গণ্ড ভাসে। কিছুক্ষণ ওখানে থেকে প্রভু বিদায় নেন।

গঙ্গার পার ধরে ফেরার পথে, সেতার হাতে এক দীর্ঘাকৃতি সাধু, দূর হতে প্রভুকে দেখে উন্মত্তের ন্যায় ছুটে আসেন এবং স্তবস্তুতি করে পরিক্রমা করেন। গোসাঁইকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে বলেন, 'প্রভো, আপনার দর্শন পাবার জন্য আপনার

ধ্যান করছি আর ব্যাকুল হয়ে ঘুরছি।' গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'আপনাকে তো কয়দিন ধরে আমি মনে মনে খুঁজছি।' তারপর প্রভু তাঁবুতে চলে আসেন।

একরাত্রে কীর্তনের পর এক সাধু এসে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। পূর্বদিনও তিনি এসে ধুনির পাশে বসেছিলেন। যাবার সময় তিনি নিজের কাঠের করঙ্গটি রেখে, গোস্বামীপ্রভুর কমণ্ডলুটি নিয়ে যান। অথচ প্রভু তা দেখেও নীরব থাকেন। এই সাধুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, গোসাঁই বলেন, 'ইনি সত্যদাসীর পূর্বজন্মের গুরু। বদরিকা আশ্রমেরও উপরে, বহুদূরে বরফাবৃত হিমালয়ের অতি উচ্চ শৃঙ্গে, গোফার ভিতর ইনি থাকেন। সেই স্থানকে সাধুরা বরফান বলেন। ওখানে কন্দমূল একমাত্র খাদ্য। ইনি একজন বহু প্রাচীন মহাপুরুষ। লোকালয়ের কিছুই জানেন না। বহুকাল পরে এবার ইনি লোকালয়ে এসেছেন।'

প্যারীলাল ঘোষ ওরফে মৌনীবাবা। তিনি তাঁর ছোট ভাই কুঞ্জলাল ঘোষকে একখানি চিঠি লিখেন। কুঞ্জলালবাবু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জামাতা। ঐ চিঠির বিষয় বস্তু—মৌনীবাবা গোস্বামীপ্রভুকে গুরুবরণ করবেন স্থির করেছেন এবং কুঞ্জবাবুকে অনুরোধ করেন তিনিও যেন তাঁর কাছে সাধন নিয়ে ধন্য হন। কুম্ভে যাবার পূর্বে, কুঞ্জবাবু মনোরঞ্জনবাবুকে ঐ চিঠিখানা দেখান। মেলায় একদিন এক সাধু এসে, গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করে মৌনীবাবার একখানা চিঠি দিয়ে বলেন, 'আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি এই মেলায় আসবেন বলে স্থির করেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই চিঠিখানা লিখেছেন।' গোসাঁই নিজেই চিঠিখানা পড়েন। মৌনীবাবা গোস্বামীপ্রভুর কাছে দীক্ষাপ্রার্থী। চিঠি পড়ে প্রভু বলেন, 'আমাকে ওঁকারনাথ যেতে হবে।' এ-কথা বলেই তিনি বহুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন। দু-তিনদিন পর ব্রহ্মচারী গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ওঁকারনাথ কবে যাবেন?' প্রভু বলেন, 'তিনি সাধন পেয়ে গেছেন। আর যাবার প্রয়োজন নাই।'

৩০ মাঘ (১৩০০) সংক্রান্তি স্নানের পরই বিদায়ের পালা। সাধুরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে বিদায় নেন; বিষাদের ছায়া। ঐদিন সাগঞ্জের আশ্রমবাড়ী ছেড়ে, দারাগঞ্জে আর এক বাসায় আশ্রমবাসীরা উঠে যান। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে গোসাঁই বলেন, 'মাটির বিগ্রহ সহজেই অঙ্গহীন হয়ে যান। এঁদের ত্রিবেণীতে বিসর্জন করে এস।' ১ ফাল্গুন (১৩০০) বেলা নটায় সশিষ্য প্রভু তাঁবু ছেড়ে শহরে রওনা হন। ক্ষ্যাপাচাঁদকে প্রভু বলেন, 'ইচ্ছা হলে আপনি আমার সঙ্গে আসতে পারেন।' কিন্তু তিনি অন্য কোথায় চলে যান। অথচ পাহাড়ীবাবা গোসাঁইর সঙ্গে তাঁর নূতন আস্তানায় গিয়ে কিছুদিন থাকেন। প্রভু শিষ্যদের সাবধান করে দেন, এঁকে খেতে দেবার সময় সাবধান থাকতে। কারণ কন্দমূল খেয়ে থাকা তাঁর অভ্যাস। সব খাবার তাঁর সহ্য হবে না। মেলায় সস্ত্রীক রামযাদববাবু গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন পান। তাঁদের বিনীত অনুরোধে মেলা থেকে ফেরার পথে রামযাদববাবুর গৃহে দ্বিপ্রহরে সকলের প্রসাদের ব্যবস্থা হয়। রামযাদববাবুর ছোট ভাই বাণীতোষের সঙ্গে প্রেমসখীর (কুতুবুড়ীর) বিবাহ স্থির হয় এবং এলাহাবাদে ১৫ ফাল্গুন (১৩০০) পরিণয় উৎসবের দিন ধার্য হয়। গোস্বামীপ্রভুর এক শিষ্য বাণীতোষের মাকে প্রশ্ন করেন, 'আপনারা নবদ্বীপের গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারের হয়ে কি করে এই সম্বন্ধ করছেন?' বরের মা হেসে বলেন, 'আমাদের পরম সৌভাগ্য ভগবানের আত্মজাকে আমি পুত্রবধূরূপে

পাচ্ছি।' হিন্দুমতে ধুমধামের মধ্যে বিয়ে হয়। বিক্রমপুরের এক ব্রাহ্মণ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন, এবং যোগজীবন বিবাহের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম করেন। সহোদরাকে তিনিই সম্প্রদান করেন।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে যে গ্রহ সমাবেশ ঘটেছিল, এবারও ঠিক তা। ফাল্গুনী-পূর্ণিমার দিন, চন্দ্রগ্রহণও। মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উদ্যাপনের জন্য নবদ্বীপে বিশেষ ব্যবস্থা হয়। গোসাঁই স্থির করেন, ঐ দিনটিতে তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত থাকবেন।

এলাহাবাদ স্টেশনে কলিকাতাগামী এক ট্রেনের কামরায় সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু উঠে বসেন। গাড়ি ছাড়ার পাঁচ-সাত মিনিট পূর্বে, শা-সাহেব এসে গোসাঁইকে শিষ্যদের নিয়ে নিকটবর্তী আর একটি কামরায় গিয়ে বসতে বিশেষ অনুরোধ করেন। গোস্বামী মহাশয় দ্বিরুক্তি না করে তাই করেন। 'এই গাড়ি ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না'—এই বলে শা-সাহেব গাড়ি থেকে নামতে উদ্যত হতেই, গোসাঁই তাঁকে প্রণাম করে পদধূলি নেন। মহেন্দ্রবাবু পাশে ছিলেন। প্রভুর এই আচরণ তাঁর কাছে অদ্ভুত ঠেকে। তিনি চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেন, 'ঠাকুর, একি করলেন? একেবারে সেরে দিলেন নাকি?' গোসাঁই বলেন, 'কি আর করব? পরমহংসজী যে বললেন, "ওঁর সমস্ত শক্তি টেনে নাও, শক্তির অপব্যবহার করছে।"'

মগড়া স্টেশনে আর একটি ট্রেনের সঙ্গে এই ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। যে গাড়িতে তাঁরা পূর্বে উঠে বসেছিলেন, তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। উভয় পার্শ্বের কামরা ভেঙ্গে গেলেও এ গাড়ির কিছু হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পায়ের নীচে প্রভুর চোট লাগে। গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'শা-সাহেবের আশ্চর্য শক্তি!' গোসাঁইর পায়ের নীচে কিভাবে চোট লাগে? মনে হয়, তিনি পা দিয়ে গাড়িখানা স্থির রেখে সংঘর্ষের সকল শক্তি আকর্ষণ করে কামরাটি রক্ষা করেন! গুরু ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী শা-সাহেবকে কেন এই শাস্তি দিলেন? কেন তাঁর শক্তি কেড়ে নিলেন? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শা-সাহেব গোসাঁইজীর কল্যাণকর কার্যই করেছেন!

সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ মহাত্মাদের কার্যকলাপ সর্বোত্তম এবং সকলের কল্যাণের জন্য। শা-সাহেব 'পরমহংস' অবস্থায় উপনীত হয়েও 'প্রতিষ্ঠা' অভিমান থেকে মুক্ত হন নি। তাঁর অজানা ছিল না, গোস্বামীপ্রভু কম সামর্থী বা কম শক্তিধর নন। তথাপি গোসাঁইর শিষ্য ও অনুগামীদের কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে প্রভুকে অনর্থক বিব্রত করে সাধুবিনিন্দিত আচরণ তিনি করেছিলেন। ঐ কামরায় থেকেও তাঁরা বিপদ উত্তীর্ণ হতেন। গোসাঁইজীর 'প্রতিষ্ঠা' সম্পূর্ণ বিলোপ হয়ে গিয়েছিল। সব জেনেশুনেও শা-সাহেবের কথার মর্যাদা দেবার জন্যই তিনি সকলকে নিয়ে অন্য কামরায় গিয়েছিলেন।

নবদ্বীপে দোল-পূর্ণিমা উদ্যাপন, পরে শান্তিপুর হয়ে কলিকাতায়

মণি মজুমদার ও ডাঃ নবীন ঘোষ গোসাঁইর অনুমোদনসাপেক্ষ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের ভাড়াটে বাড়ী ঠিক করেছিলেন। প্রভু ওখানে উঠে, চার-পাঁচদিন থেকে, রাখালবাবুর অনুরোধে তাঁর গৃহেই উঠে যান। দোল-পূর্ণিমা এসে পড়ে। নবদ্বীপ

হরিসভা মহাপ্রভুর আবির্ভাব-উৎসবের আয়োজন করেন। গোস্বামী মহাশয়কে আমন্ত্রণ করা নিয়ে উৎসবের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঘটে মতানৈক্য। বিরোধীদের যুক্তি, ইনি সাতাশ বছর ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন। দুবার পৈতে ছিঁড়েছেন। সমর্থকেরা বলেন, 'মহাপ্রভুও উপবীত ছিঁড়েছিলেন দুবার।' শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে তা বিবৃত আছে—

এ ভব সংসার কাল কেমনে তরিব।
সে নন্দ নন্দনপদ কোথা গেলে পাব॥
ইহা বলি ছিণ্ডিল গলার উপবীত।
কৃষ্ণের বিরহ দুঃখ ভেল বিপরীত॥[১]

ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে।
যথা লাগি পাঙ প্রাণনাথের উদ্দেশে॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
নিজ অঙ্গ-উপবীত ফেলিল ছিণ্ডিয়া॥[২]

সমালোচকেরা বলেন, 'মহাপ্রভু তো ছিঁড়ে ছিলেন কৃষ্ণবিরহে।' সমর্থকেরা বলেন, 'ভগবানকে লাভের জন্যই গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছিলেন।' 'হরিসভা' স্থাপয়িতা, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র, পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় শাস্ত্রবিধি উল্লেখ করে বলেন, 'গোস্বামী মহাশয়ের দেবদুর্লভ অবস্থা। ওঁর প্রতিটি কার্যের সঙ্গে শাস্ত্রের সংহতি রয়েছে। সাধারণ বিধিবহির্ভূত কার্য করা তাঁর পক্ষে অশাস্ত্রীয় নয়। পরাধর্ম লাভের জন্য অপরাধর্ম বিসর্জন শাস্ত্রের বিধান। গোপিনীরা তাই কুল-শীল-মান সব বিসর্জন করেছিলেন। ভগবানের জন্য জাতি, কুল, মান না ছাড়লে, ধর্মের গৌরব কোথায়?' তাছাড়া কুম্ভমেলার সব খবর এসে পৌঁছেছে। সাধুমণ্ডলী তাঁকে কি সম্মানই না দিয়েছেন! উদ্যোগীরা সশিষ্য গোস্বামীপ্রভুকে হরিসভার পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন এবং টোলবাড়ীর কোঠাদালানে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেন।

সংস্কার কি অত সহজে যায়? গোপনে গোপনে চলে পণ্ডিতদের মধ্যে শলা-পরামর্শ। 'জাতনাশা গোসাঁইর সঙ্গে পংক্তিভোজন করে, শেষ বয়সে কি জাত-কুল খোয়াব নাকি?' মহাপ্রভুর সেবায়েত—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতার বংশধরগণ ও নবদ্বীপের গোস্বামীদের অনেকেই গোস্বামীপ্রভু সম্বন্ধে বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। এমন কি রামযাদব বাগচীর আত্মীয়দের মধ্যেও বাণীতোষের বিয়ে নিয়ে দেখা যায় মন-কষাকষি। রুদ্ধদ্বারে এক বৈঠক হয়। ওঁদের মধ্যে যিনি বয়সে, বিদ্যায় প্রবীণ, তিনি বলেন, 'এক কাজ করলে হয় না? আমাদের কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে তাঁর কাছে পাঠালে কেমন হয়? শাস্ত্র-সদাচার সম্বন্ধেই বা তাঁর এখন কি ধারণা? তাঁর সঙ্গে আলাপ করে দেখতে কি দোষ?' মনঃপূত হয় তাঁর কথা। গোস্বামীপ্রভুকে দর্শনমাত্র প্রতিনিধির মন থেকে বিরূপ ভাব চলে যায়। তাঁর সঙ্গে কিছু সময় কথাবার্তা বলার পর তিনি নিঃসংশয় হন; ইনি যথার্থ শাস্ত্রচক্ষু বলে তাঁর প্রতীতি হয়। আর কেবল তাঁর মনে হয়, তাঁরা শুধু অভিমানের বোঝা বয়েই চলেছেন। গোসাঁইকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে তিনি বিদায় নেন। প্রতিনিধি এই পণ্ডিত মহাশয়ের

---

১. লোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল' ৩য় সংস্করণ, পত্রাঙ্ক ১৪০
২. ঐ ঐ ঐ ১৪৪

ছিল জ্যোতিষশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি ফিরে গিয়ে বলেন, 'মহাপুরুষের লক্ষণগুলি তাঁর অঙ্গে স্বচক্ষে দেখে এলাম। তাঁর চরণ স্পর্শ করে, আমার মন-প্রাণ শীতল হয়ে গেছে। এমন মহাজনের সংস্পর্শে যাঁরা আসেন, তাঁরা সকলেই পবিত্র ও ধন্য হন।' তখন পণ্ডিতদের মত পরিবর্তন হয়। গোস্বামীপ্রভুর বিরুদ্ধবাদী নবদ্বীপে আর কেউ রইলেন না। সারা নবদ্বীপ জুড়ে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে উৎসব-উন্মাদনা, ঘরে-বাইরে সকলেই আনন্দে ডগমগ। দিনমণি ঐদিন পশ্চিম গগনে ঢলে পড়তেই নিশিকান্তের উদয়-প্রতীক্ষায় সকলেই উন্মুখ হয়ে উঠেন। গোধূলিতে পথে-পথে চলে সংকীর্তনের দল। শচীসুতকে আহ্বান করে কত রকম শ্রুতিমধুর ও হৃদয়স্পর্শী তালমানলয়-যুক্ত সুললিত পদবিন্যাস! আকাশ-বাতাস ভরে উঠে অবিচ্ছিন্ন শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে। সন্ধ্যা হয় হয়—সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু টোলবাড়ী থেকে বের হয়ে, পথে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে উঠে, 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলে হুঙ্কার দিতে দিতে ভাগীরথীর পথ ধরেন। তাঁকে দর্শন করে জনস্রোতের মধ্যে ভাবের বন্যা বয়। সুরধুনীর তীরে আজ জনসমুদ্র। প্রভু এই জনতার মধ্যেও শিষ্য পরিবৃত হয়ে, অবলীলাক্রমে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে উদ্দণ্ড নৃত্য করেন। সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে সৈকত জলরাশি যেমন ক্ষণিকের মধ্যে সরে যায়, গোসাঁইর গতিভঙ্গিতে এই ঘন জনসমাবেশও পলকের মধ্যে স্থানচ্যুত হয়ে, সশিষ্য গোস্বামীপ্রভুর স্বচ্ছন্দ গমনের পথ করে দেয়। গোসাঁই হাতছানি দিয়ে গৌরসুন্দরকে আহ্বান করেন, আবার যেন হাতের কাছে পেয়ে মধুর ভঙ্গিমায় তাঁর আরতি করেন। তাঁর ভাবগম্ভীর ছন্দহিল্লোলিত কলেবর দর্শনে ভক্তদের মন-প্রাণ উদ্দীপনায় ভরে উঠে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে কত জন যে সম্বিত হারিয়ে ধরাশায়ী হন, আর কত জন যে দিশেহারা হয়ে এক বহিঃশক্তির প্রভাবে কীর্তনের তালে তালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম নৃত্য করে চলেন। এই সময় হরিবোলানন্দ স্বামী নামে এক সাধু ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ছুটে এসে গোসাঁইকে আলিঙ্গন করেন, যেন আজ তাঁর অভীষ্ট দর্শন হল। তাঁর চোখে-মুখে ওই ভাব ফুটে উঠে। মহাভাবে উভয়ে তখন যুগপৎ নৃত্য করেন। লোকেরা বলাবলি করে, 'ওঁরা যেন সাক্ষাৎ গৌর-নিতাই!' গ্রহণ শুরু হতেই 'ঐ দেখ, ঐ দেখ' বলে প্রভু সমাধিস্থ হয়ে যান। চন্দ্রের রাহুকবলমুক্তি অবধি প্রায় তিন ঘণ্টা কাল তাঁর এভাবেই কাটে। এর পর গঙ্গায় নেমে গোসাঁই, ভক্তদের সঙ্গে জলকেলি করে মুক্তিস্নান করেন। স্নানান্তে নূতন কৌপীন ও বহির্বাস পরে, সশিষ্য প্রভু কীর্তন করতে করতে টোলবাড়ীর দিকে অগ্রসর হন। তখনও তিনি ভাবে ডগমগ। বরিশালের গোরাচাঁদ দাস ভাবাবেশে পথের ধূলিতে গড়াগড়ি দেন আর শ্রীধর 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলে উন্মত্ত হয়ে উঠেন। এই সময় ওঁদের দিকে এক ক্ষ্যাপা ছুটে আসে, কাঁধে তাঁর বাঁশের লাঠি। কাছে এসে সে বলে, 'এতদিন কোথায় ছিলি বাপধন? আজ হাতের মুঠায় পেয়েছি, দেখ কি করি!' গোসাঁইর নিরাপত্তার জন্য শিষ্যেরা তাঁর চারদিকে জড় হন। লোকটি কিন্তু লাঠি ছুঁড়ে ফেলে গোস্বামীপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে চলে যায়। পথে একটি চার-পাঁচ বছরের বালক ও অনুরূপ একটি বালিকা ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় খেলা করছিল। ছেলেটি খেলা ফেলে গোস্বামীপ্রভুর কাছে ছুটে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মেয়েটিও ছেলেটির বাঁ-পাশে এসে তাঁর হাত ধরে অপূর্ব ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। কিছু সময় পরে ওরা চলে যায়। গোসাঁই শিষ্যদের বলেন, 'আজ যথার্থ

দোল-পূর্ণিমা দর্শন হল। তোমরা ভাগ্যবান।' পূর্ণিমার রাত্রেই গোসাঁই মহাপ্রভুর মন্দিরে যান। এখানের বিগ্রহ করিয়েছিলেন স্বয়ং মহাপ্রভু, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রীত্যর্থে। বিবাহের রাত্রে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বামীকে বলেছিলেন, 'আজ যে আমার কি আনন্দ! জগৎবাসী যেন এই আনন্দের ভাগ পায়!' গৌরসুন্দর সকৌতুকে নবপরিণীতাকে বলেন, 'বিষ্ণুপ্রিয়ে, তাহলে আমাকে যে তোমার থেকে দূরে থাকতে হবে। তা হোক, আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোমার যখনই ইচ্ছা হবে, অন্তরে আমাকে দেখতে পাবে।' স্বামীর ভাবী-বিরহে কাতর হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বলেন, 'অন্তরে আপনার দর্শন পেলেও আপনাকে ধরা-ছোঁয়া যাবে না। আমার চর্ম চক্ষেও আপনাকে কাছে পেতে চাই।' মহাপ্রভু সুদক্ষ কারিগর দিয়ে স্বীয় দেহের অনুরূপ এই দারুময় বিগ্রহ করান। স্বামীর সন্ন্যাসের পর এই মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যতদিন দেহে ছিলেন, তিনি নিজে পূজা করতেন। মূর্তিটি একেবারে হুবহু মহাপ্রভু। মহাপ্রভুর মন্দিরে এই বিগ্রহের এখনও নিত্য সেবাপূজা হয়ে থাকে।

ঐদিন মহাপ্রভুর মন্দিরে রাতভোর কীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এক দলের পর আর এক দলের কীর্তন চলে। গোস্বামীপ্রভু উপস্থিত হলে, রসিকদাস কীর্তনীয়া তাঁকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে কীর্তন শুরু করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। গোসাঁই 'মঙ্গল হোক' বলে তাঁকে আশীর্বাদ করতেই বাবাজীর মধ্যে দেখা যায় এক অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত শক্তির খেলা। অভিনব হয় তাঁর ঐ দিনের কীর্তন। গভীর রাত্রে প্রভু টোলবাড়ী ফিরে যান।

পরদিন সকালে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিনীত আমন্ত্রণে গোসাঁই তাঁর গৃহে পূর্বদিন প্রতিষ্ঠিত 'নব গৌরাঙ্গ' দর্শনে যান। শ্রীবিগ্রহের পানে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'দেবে, দেবে, আমি বলে দেব; সোনার বালা, নূপুর সবই পাবে।' ওখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের শ্রীমূর্তি দেখিয়ে প্রভু বলেন, 'ঐ দেখ, মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে স্পন্দন।' সবিস্ময়ে তাঁরা দেখেন, বিগ্রহের চোখে পলক পড়ে, আর গলার মালা কেঁপে কেঁপে উঠে। মহেন্দ্রবাবু আত্মহারা হয়ে বালা আর নূপুর গড়িয়ে দেন।

টোলবাড়ী ফিরে আসতেই এক গয়লানী এসে হাজির; মাথায় তাঁর মাঠার ভাঁড়। প্রভুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে তিনি বলে উঠেন, 'ব্রজ ছেড়ে তোরা এখানে কবে এলি? আমি যে তোদের খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি।' এই বলে ওঁদের মাঠা পরিবেশন করে মাঠার পাত্র নিঃশেষ করেন। ঐদিন হরিসভায় সশিষ্য গোস্বামীপ্রভুর প্রসাদ পাবার আমন্ত্রণ হয়। তিনি কীর্তন করে ওখানে যান। অব্রাহ্মণ শিষ্যদের থেকে তাঁর আসন আলাদা করায় প্রভু বলেন, 'ওঁদের সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতেই আমি প্রসাদ পাব।' উদ্যোক্তারা তাই করেন এবং নিজেরাও ঐভাবে বসেন। কথা-প্রসঙ্গে একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত গোসাঁইকে বলেন, 'আপনার শিষ্যদের মধ্যে কীর্তনে যে-সব সাত্ত্বিক ভাব দেখা যায়, তা সচরাচর আর কোথাও চোখে পড়ে না। এরূপ উন্নত অবস্থা লাভ করে তাঁরা বাহ্যপ্রতীক মালা-তিলক ধারণ করেন না কেন?' তিনি বলেন, 'ওঁদের হয়ে আমিই পরি।'

গোস্বামী মহাশয় একদিন শিষ্যদের নিয়ে তপস্বিনী রাইমাতার গৃহে যান। বৃদ্ধা তাঁকে নিজের আঙিনায় উপস্থিত দেখে অভিভূত হয়ে কাঁদতে থাকেন। তারপর তাঁর মধ্যে দেখা যায় ক্ষণে হাসি, ক্ষণে কান্না, নাচ-গান। ভাবাবেশে তিনি

অদ্বৈতপ্রভুর স্তবস্তুতি করে গোসাঁইকে বলেন, 'তুই-ই তো মহাপ্রভুকে এনেছিলি। আচণ্ডালে হরিনাম বিলিয়ে জীব উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিলি!' তারপর তিনি প্রভুকে আরতি করে তাঁকে বসান। ঘরে যা খাবার ছিল, তা এনে তাঁর সম্মুখে এগিয়ে ধরেন। আনন্দে বৃদ্ধা আজ দিশেহারা! চারদিকে ছোটাছুটি করেন; বার্ধক্যের স্থবিরতা নেই! ময়রার দোকানে রসগোল্লা যা ছিল তা আনিয়ে পরিতৃপ্তি-সহ পরিবেশন করেন। ভক্তেরা নামকীর্তন শুরু করতেই তিনি প্রভুর পায়ে লুটোপুটি খান। তাঁর প্রেমভক্তি সেদিন শবরীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

সশিষ্য গোসাঁই একদিন যান শ্রীবাস-অঙ্গনে; এখানে ভেটপ্রথা। দর্শনী না দিলে বিগ্রহ দর্শন করতে দেওয়া হয় না। এই বাধা-নিষেধের কথা শুনে প্রভু মর্মাহত হন। যিনি কাঙ্গাল বেশে দেশে হরিনাম প্রচার করে আচণ্ডালে কোল দিলেন, তাঁরই আবির্ভাব স্থানে, তাঁর লীলা-বিগ্রহ দর্শন করার অধিকার কাঙ্গালের নাই, এ কেমন কথা? প্রভু বিগ্রহ দর্শন না করেই ফিরে যান।

গঙ্গার ওপারে মিঞাপুর গ্রামকে 'মায়াপুর' বলে প্রচারের এক প্রচেষ্টা হয়। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেদারনাথ দত্ত ও জমিদার নফর পালের অর্থানুকূল্যে ওখানেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান বলে সিদ্ধান্ত করে ঐ বছরই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয়। মায়াপুরের উদ্যোগীরা এসে গোস্বামীপ্রভুকে ওখানে নিয়ে যেতে বিশেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি তাঁদের বলেন, 'মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী নবদ্বীপ, অন্যত্র নয়; সুতরাং তাঁর ভিটা অন্বেষণ করে, নবদ্বীপ ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাই না।'

নবদ্বীপের গঙ্গায় এক সময় একটি চড়া পড়েছিল। তাতে অসংখ্য তুলসীবন ও নিমগাছ ছিল। সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী ধ্যানে জেনেছিলেন, ওখানেই মহাপ্রভুর ভিটে ছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নবদ্বীপ দর্শন করে হতাশ হয়ে ফিরার পথে গঙ্গা পার হতে যখন নৌকায় উঠলেন, তখন মধ্যনদীতে গৌর-নিতাইর দর্শন পেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন।

নবদ্বীপ থেকে নৌকা করে গোস্বামী মহাশয় শিষ্যদের নিয়ে শান্তিপুর যাত্রা করেন।

বাঙ্গালী-চরিত্রের এক অনুদার বৈশিষ্ট্য, অপরের স্বীকৃতির পূর্বে, বাঙ্গালী-প্রতিভার মর্যাদা দিতে বাঙ্গালী উদাসীন। সমাদর করা তো দূরের কথা, তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করার থাকে এক আত্মঘাতী প্রয়াস। পরে অবশ্য ওঁদের নিয়েই তাঁরা মেতে উঠেন। গোস্বামীপ্রভুর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। শান্তিপুরের লোকেরা গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি লাঞ্ছনা ও অসম্মান কম করেন নি। কুম্ভমেলায় সাধু-সন্ত দ্বারা গোসাঁইর স্বরূপ প্রকাশের পর, খুঁটিনাটি সব সংবাদ শান্তিপুরে ছড়িয়ে পড়ে। শান্তিপুরবাসীরা তাঁর মহিমা উপলব্ধি করে তাঁকে নূতন করে বরণ করেন। এরপর চলে সম্বর্ধনার পর সম্বর্ধনা। গোসাঁই শান্তিপুর পৌঁছেই অদ্বৈতবংশের বয়োজ্যেষ্ঠ স্ত্রী-পুরুষ সকলের পা ধুয়ে দেন নিজের হাতে।

সত্যকুমার গুহঠাকুরতা কুম্ভে গিয়েছিলেন; গুরুর সঙ্গেই নবদ্বীপ হয়ে শান্তিপুর ফিরেছিলেন। তিনি এখানে কলেরায় আক্রান্ত হন। মুক্তকেশী দেবী রোগশয্যায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সত্যকুমার, বউকে দেখার ইচ্ছা হয়?' তিনি উত্তর দেন, 'এখন নাম ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না।' দুদিন ভুগে ১৪ চৈত্র (১৩০০)

রাত্রি সাড়ে এগারটায় বত্রিশ বছর বয়সে সত্যকুমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর দিন রোগীকে ঘিরে সতীর্থরা অহোরাত্র 'বেড়া-কীর্তন' করেন। অন্তিম সময়ে গোসাঁই সত্যকুমারের শয্যাপাশে উপস্থিত হন। মুমূর্ষুর মুখমণ্ডলে পড়ে প্রশান্তির ছাপ। তখনও পূর্ণ জ্ঞান। তিনি প্রভুর চরণে তাঁর মাথা রাখেন, তারপর দুহাত দিয়ে গুরুর চরণধূলি নিয়ে আপন মাথায় ও বুকে মাখেন; এবং জোড়হাত করে গোস্বামী মহাশয়ের মুখমণ্ডলে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। এই অবস্থায় তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়। রাত্রি দ্বিপ্রহরে কীর্তন করে সত্যকুমারের শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। চিতার আগুনের অপূর্ব শোভা হয়। অগ্নিশিখা উজ্জ্বল হয়ে কখনও নীল, কখন বা পীত আর কখন বা সবুজ হয়। কোন দুর্গন্ধ নেই। অভিনব সুগন্ধি সুবাস চতুর্দিকে অনুভূত হয়। পরদিন সব বিবরণ শুনে গোসাঁই বলেন, 'যাদের উন্নত আত্মা, তাঁদের এ রকম হয়। সত্যকুমারের মৃত্যু বড় সুন্দর, কোটির মধ্যে গুটি। গতরাত্রেই তাঁর জন্ম হয়েছে। গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় নাই। যেই গর্ভে প্রবেশ করল অমনি ভূমিষ্ঠ হল। নদীর ওপারে ধার্মিক ও সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম হয়েছে।'

শাস্ত্রে আছে, অবতার পুরুষের জন্মের অভিনয় হয়। তাঁদের গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। অনেক উন্নত আত্মাও প্রসবের মুহূর্তে প্রবিষ্ট হন। জ্ঞাতি খুড়া রামকৃষ্ণ গুহঠাকুরতা বলেন, 'ওঁর কোষ্ঠীতে ছিল গঙ্গাতীরে কাশীতে বিশ্বনাথের ধামে ওঁর মৃত্যু হবে। সত্যের মা করতেন কাশীবাস। ছোট ছেলের প্রতি ছিল অগাধ স্নেহ। কলেজ ছুটি হলেই সত্য যেত কাশীতে মার কাছে। কিন্তু তাঁকে পেয়ে মার দুশ্চিন্তা বেড়ে যেত। দুদিন যেতে না যেতেই ছেলেকে কাশী থেকে আর কোথাও পাঠাতেন। গঙ্গাতীরে মৃত্যু হল বটে, কিন্তু কাশীতে হল কোথায়?' গোস্বামী মহাশয় এ-কথা শুনে বলেন, 'শান্তিপুর ধাম, মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতপ্রভুর পাট, গুরুগৃহে, গুরুর সম্মুখে সজ্ঞানে তিরোধান; এ কাশী-মৃত্যু নয়?' গুরুমাতা যোগমায়া দেবীর দেহত্যাগের সময় সত্যকুমার শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। গেণ্ডেরিয়ায় ফিরে তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। প্রভুকে তিনি বলেন, 'দেহটি ইচ্ছানুরূপ নাম করতে বড় বিঘ্ন ঘটায়।' গোসাঁই তাঁকে তখন বলেন, 'তোমার এই দেহে আর ইচ্ছানুরূপ নামসাধন হবে না।' তিনি ফের গুরুকে বলেন, 'তাহলে এই দেহে থেকে আর কি হবে? দেহ-পরিবর্তন হলে হবে তো?' প্রভু বলেন, 'তা হতে পারে।' সত্যকুমার প্রার্থনা করেন, 'তবে এ দেহের পরিবর্তন হউক।' মুক্তকেশী দেবী এ-সব কথাবার্তা শুনে 'হায়, হায়' করে উঠেছিলেন। তিনি সত্যকুমারকে বললেন, 'ওরে সর্বনেশে, তোর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা রয়েছে, তুই অমন কথা কি করে বললি?' ঐদিন থেকে সত্যকুমার গুরুসঙ্গ বড় ছাড়েন না। ২ অগ্রহায়ণ (১৩০০) তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কলিকাতা গিয়েছিলেন প্রভুর সঙ্গে কুম্ভে যাবেন বলে। কলিকাতা পৌঁছে দেখেন, গোসাঁই তাঁর পৌঁছার পূর্বেই রওনা হয়ে গেছেন। এলাহাবাদ পৌঁছে স্ত্রীকে মধ্যে মধ্যে সব খবর দিয়ে তিনি চিঠি লিখতেন। মেলা শেষ হবার পর লিখলেন তাঁকে, 'আর চিঠি লিখে দুর্লভ সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা হয় না। তথাপি তোমার প্রীতির জন্য লিখি। আর চিঠি না পেলে কিছু মনে কর না।' কুম্ভে একদিন গোস্বামীপ্রভু শিষ্যদের বলেছিলেন, 'তোমরা সকলে শা-সাহেবকে ভাল করে দেখে রেখ, যখন বিপদে পড়বে, তাঁর চেহারা স্মরণ করলে, বিপদ কেটে যাবে।' সত্যকুমার গুরুকে একান্তে পেয়ে বলেছিলেন,

‘যাঁর চরণে মাথা বিকিয়েছি, তাঁকে ছেড়ে আর কারও কথা ভাবতে পারব না, তা যদি বিপদে একেবারে তলিয়ে যাই, তাহলেও।’ সত্যকুমারের মুখে এ-কথা শুনে গোসাঁই তাঁকে সস্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন। হরিহর নাগ কুম্ভ থেকে শ্রীবৃন্দাবন যাচ্ছিলেন; গুরুভাই সত্যকুমারকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, ‘চল না ভাই, কয়টা দিন ঘুরে আসি।’ সত্যকুমার তাঁকে বলেছিলেন, ‘তা হয় না; আমি আর বেশি দিন নেই। যে কয়টা দিন আছি, ঠাকুরের কাছ ছাড়া হতে চাই না।’

গুরুর সঙ্গে কুম্ভ থেকে কলিকাতায় ফিরে নবদ্বীপ যাবার দিন পদ্মপুকুরে মনোরমা দেবীর সঙ্গে দেখা করে সত্যকুমার বলেছিলেন, ‘কাকিমা, নারকেল কোড়া আর চিড়া খাব।’ সময় সংকীর্ণ বলে তখন হয়ে উঠে না। মনোরমা দেবী এতে দুঃখ প্রকাশ করেন। সত্যকুমার তখন বলেছিলেন, ‘পরে একদিন হবে।’ চৈত্র অবসানে (১৩০০) কলিকাতা ফিরে এসে গোস্বামী মহাশয় রাখালবাবুর বাড়ীতে উঠেন। হরিদাসবাবু আসেন। কয়েকদিন গুরুসঙ্গ করে পণ্ডিত মহাশয়কে নিয়ে তিনি বোলপুর ফিরে যান। শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ভজনশীল। সেই যে ব্রাহ্ম হয়ে উপবীত ফেলেছিলেন, যোগসাধন নিয়েও তা আর গ্রহণ করেন নি; বোলপুরে সাধন-ভজনে তিনি ডুবে যান।

গোসাঁইর কলিকাতা ফেরার কয়েকদিন পর খবর আসে, কুতুবুড়ীর বাড়াবাড়ি নবদ্বীপে, শ্বশুরালয়ে; জ্বর খুব বেশি। রাখালবাবু ও ভক্তদের আগ্রহে কুতুকে কলিকাতায় নিয়ে আসা হয়। জগদ্বন্ধুবাবুকে প্রভু বলেন, ‘কুতুকে তোমরা আর ধরে রাখতে পারবে না; তা বলে তার চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়।’ ডাঃ নীলরতন সরকারের পরামর্শে, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশ, ডাঃ জগদ্বন্ধু বসু ও ডাঃ নবীনচন্দ্র ঘোষ চিকিৎসা করেন।

১৪ বৈশাখ (১৩০১) মনোরঞ্জনবাবু সতীর্থদের নিয়ে সত্যকুমারের আত্মার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে চিড়া-নারকেল মহোৎসব করেন। কুতুবুড়ীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটজনক হয়ে উঠে। ডাঃ বসু উইলসন সাহেবের হোটেল থেকে মুরগীর জুস (Juice) এনে খাওয়াতে চান। প্রভুর অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, ‘দাও।’ কিন্তু কোন ফল হয় না। কুতু ডাক্তারের চিকিৎসার বাইরে। ১৫ বৈশাখ (১৩০১), গোসাঁই নিত্যকর্ম শেষ করে শৌচে যান। ফিরে এসে তিনি গ্রন্থ পাঠ করেন। শান্তিসুধা ও মুক্তকেশী দেবী চীৎকার করে কেঁদে উঠেন। প্রভু যেমন পাঠ করছিলেন, তেমনই করতে থাকেন। পাঠ শেষ হলে তিনি ঊর্ধ্বপানে তাকান। পরে তিনি ব্যক্ত করেন, যোগমায়া দেবী এসে তাঁকে বলেন, ‘কুতুকে নিতে এসেছি. একবার তার কাছে যান।’ তখনই তিনি মুমূর্ষু কন্যার শয্যাপাশে গিয়ে, তার মুখে দৃষ্টি রেখে বলেন, ‘বিধু, একটু কীর্তন কর।’ আর কোনও গায়ক ও বাদক তখন উপস্থিত নেই। আরও দু-তিনজন বিধুবাবুর সঙ্গে যোগ দেন। গোসাঁই যখন বাহু তুলে নাচতে থাকেন, তখন মনে হয়, কি শ্রুতিমধুর সংকীর্তন! প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক। অন্তরীক্ষে কাকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরতি করেন। শোকের চিহ্নমাত্র নেই। শোকগৃহ হয়ে উঠে আনন্দ-নিকেতন। গোস্বামীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হয় অপূর্ব এক জ্যোতি। মনোরঞ্জনবাবু বলেন. ‘গোসাঁইর এমন মধুর কান্তি আর কখন দেখি নি।’ নাচতে নাচতে প্রভু এক পা তুলে ধরেন প্রেমসখীর মাথায়। জগদ্বন্ধুবাবু বলেন, ‘ঠাকুরের লোমকূপ, জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। অন্তরীক্ষে তিনি কাকে ইশারা করেন কুতুকে গ্রহণ করতে।’

মুক্তকেশী দেবী কেঁদে কেঁদে গোস্বামী মহাশয়কে বলেন, 'আপনার মধ্যে কি দয়ামায়ার লেশ নেই! মেয়েটা মরে গেছে আর আপনি নাচেন! এ কি আনন্দের সময়?' প্রভু পরে তাঁকে বলেন, 'দেখি, রাধারানী এসেছেন তাঁর সখিদের নিয়ে। আমার অনুমতি চাইলে, আমি ইঙ্গিত করে কুতুকে নিয়ে যেতে বলি। তার মার কোলে বসে সে তখন চলে যায়।' বিয়ের ঠিক দু মাস পরে কুতুর মৃত্যু হয়। ভক্তেরা বলাবলি করেন, 'জেনেশুনে ঠাকুর যে কেন তড়িঘড়ি করে এই বিয়ে দিলেন!' কথাটি গোস্বামী মহাশয়ের কানে যেতেই তিনি বলেন, 'ওর কল্যাণের জন্যই বিয়ে হয়েছিল; নইলে এই কর্মটুকুর জন্য আবার ওকে আসতে হত। ভোগ একদিনও যা, শত বৎসরও তা।' উমেশ দত্ত প্রশ্ন করেন, 'কুতুকে বাঁচান যাবে না জেনেও, ওকে মুরগীর জুস-ই বা দিলেন কেন? আর চিকিৎসায় এত ব্যয়ই বা করলেন কেন? প্রভু বলেন, 'কুতু যদি আর কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকত, তাহলে মেডিক্যাল কলেজের বড় সাহেবকে 'কল' দিতাম। কারও যেন ধারণা না হয়, সুচিকিৎসার অভাবে তার মৃত্যু হয়েছে।'

উমেশবাবু আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার সন্তানের উপর কি কোন মমতা নেই?' গোসাঁই বলেন, 'না, আমার কাছে যোগজীবন আর পথের মুটের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই।' উমেশবাবু এবার প্রশ্ন করেন, 'কুতুর মৃত্যুতে কি আপনার শোক হয় নি?' প্রভু বলেন, 'শোক তো হয়ই নাই, বরং আনন্দ হয়েছে।' শান্তিসুধা শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'শান্তি, শোক করিস না।' বাবার কথায় কোথায় যায় তাঁর শোক! আসক্তিশূন্যা প্রেমসখী পিতার কাছে মহানন্দে ছিলেন। সংসারে প্রবেশ করেই পিতার কাছে মনে মনে তিনি মৃত্যু প্রার্থনা করেছিলেন।

বরিশালে সত্যকুমারের স্ত্রী যোগমায়া গুহঠাকুরতা পতি-শোকে বড় কাতর হয়ে পড়েন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ। তাঁর পিতা রায় বাহাদুর দ্বারিক দত্ত জামাতার প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। সত্যকুমারের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি যোগমায়াকে বলেন, 'বহু ভাগ্যে সাধু সত্যকুমারের মত জামাই পেয়েছিলাম, কিন্তু পূর্বে তাঁকে চিনতে পারি নি। এখন ভগবান তোমার সহায় হউন।' গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য গোরাচাঁদ দাশ ছিলেন দ্বারিকবাবুর বন্ধু। শোকাভিভূত কন্যাকে গোরাচাঁদবাবুর পরামর্শে, দ্বারিকবাবু গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করার জন্য কলিকাতা পাঠান। রাখালবাবুও দ্বারিকবাবুর বন্ধু। গুরুর চরণে প্রণাম করতেই যোগমায়ার শোকের জ্বালা মুহূর্তে বিলীন হয়। গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'মা, সত্যকুমারের জন্য শোক কর না, তাঁর জীবন ও মৃত্যু সুন্দর।' তিন দিন কলিকাতা থাকার পর প্রভু যোগমায়াকে সন্তানদের কাছে অবিলম্বে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। যোগমায়া রাখালবাবুকে বলেন, 'দেশে গিয়ে কি নিয়ে থাকব? ঠাকুরের একখানি ফটো পেলে বেঁচে যাই।' রাখালবাবু সস্নেহে বলেন, 'মা, ফটো তো তিনি উঠান না। ঐদিন কৃষ্ণনগর থেকে ভাস্কর আনিয়ে তাঁর মূর্তি গড়িয়ে ছিলাম, ঠাকুর তা জানতে পেরে ভেঙ্গে ফেলে বলেন, "আমি সামান্য কীট, আমার ছবি বা মূর্তি কেন?" দেখি, তাঁকে তোমার কথা বলে।'

যোগমায়ার কথা বলতেই গোসাঁই ফটো তুলতে সম্মত হন। ফটোগ্রাফার নীলমাধব দেব আসেন তাঁর ক্যামেরা নিয়ে। প্রভুকে দর্শন করেই নীলমাধববাবুর হয় ভাবান্তর। তিনি তাঁর পায়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলেন, 'প্রভুর

ছবি তুলে বহু অর্থলাভ হবে, এই আশায় আমি এসেছিলাম। হায়! আমি কত বড় নির্বোধ।' তাঁর কান্নায় যেন পাষাণ গলে! করুণায় বিগলিত হয়ে তখনই গোসাঁই তাঁকে সাধন দেন। তারপর নীলমাধববাবু গুরুর ফটো তোলেন। যোগমায়া গুহ-ঠাকুরতাকে একখানা ফটো দিয়ে ফটোগ্রাফার বলেন, 'যাঁর জন্য ঠাকুরের ছবি উঠাতে এসে এই অমূল্য জিনিস পেলাম, তাঁর কাছ থেকে কি করে মূল্য গ্রহণ করি? ঐদিন থেকে গোস্বামীপ্রভুর আসনে আসীন ছবিখানি সহজ লভ্য হল।[১]

বরিশালের অন্তর্গত লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী জাতিতে ব্রাহ্মণ। গোসাঁই যখন ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁরই প্রচারে মুগ্ধ হয়ে রাখালবাবু ব্রাহ্ম হলেন ও পৈতে ফেলেন। কয়েক বছর পর প্রভুর কাছে যোগসাধন নিয়ে আবার তিনি পুরোপুরি হিন্দু হন। তখন ফের উপবীত ধারণ করেন, তুলসীর মালাও পরেন।

হিন্দুধর্মের সঞ্জীবনের ইতিহাসে ব্রাহ্মধর্মের অবদান অসামান্য। ব্রাহ্মধর্ম বহু কুসংস্কার থেকেও হিন্দুধর্মকে মুক্ত করে উজ্জ্বল করেছে। পূর্বেও বলা হয়েছে, হিন্দুধর্মের সারকথা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। শিকাগো ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের যে ঐতিহ্যের সংবাদ স্বামীজী বহন করে নিয়েছিলেন, তাঁর মূল উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ থেকেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পেয়েছিলেন বেদান্তবাদের শিক্ষা।

বাংলার ধর্মজীবনের দুটি ধারা যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে—একটি শক্তি-সাধনার, অপরটি বৈষ্ণব-সাধনার। শক্তি-সাধনার শেষ কথা 'ব্রহ্মলয়' বা 'কৈবল্য' হলেও, ভক্তি এ-ক্ষেত্রে গোড়ার কথা। বৈষ্ণবসাধনায় ভগবৎ প্রেম-ভক্তিই সার কথা। বেদান্ত ভক্তির প্রশ্রয় দেয় না। এখানে দ্বৈতের স্থান নেই। কে কাকে ভক্তি করবে যখন সকলই ব্রহ্মে নিলয় হয়? শক্তি-সাধনায় রাজা রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস মাতৃপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেবকে বাংলার শক্তি-সাধনার আর বিজয়কৃষ্ণকে বৈষ্ণব-সাধনার প্রতীক বলা হলেও, উভয়েরই সাধনায় দেখা যায়, সর্বধর্ম-সমন্বয়। শ্যাম আর শ্যামা মূলত ব্রহ্মেরই স্বরূপ। ব্রাহ্ম, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই তিন ধারার মধ্যে যে গরমিল, তা বাহ্য। এই তিনের মধ্যেই আছে অন্তঃসংহতি। গোসাঁই বারবার বলেছেন, তাঁর ব্রাহ্মধর্ম সার্বভৌম। এই কথাটির মধ্যে অতিশয়োক্তির লেশমাত্র নেই। সদ্‌গুরু লাভের পরও ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে সমাজ-ত্যাগে বাধ্য না করলে, কলিকাতা ও ঢাকা-সমাজের আচার্য ও প্রচারকের পদ থেকে গোস্বামীপ্রভুর অবসর গ্রহণের প্রশ্ন উঠত না। তাঁর গৃহে শ্যামসুন্দরের নিত্য সেবাপূজা অদ্বৈতপ্রভুর পৌত্র দেবকীনন্দন গোস্বামী হতে শুরু হয়ে বার পুরুষ ধরে আজ অবধি চলেছে। গোস্বামী মহাশয় নামব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচলন ব্যতীত কোনও মূর্তি বা বিগ্রহের পূজা প্রচলন করেন নি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খৃীস্টান ছিলেন। তিনি কাউকে কখনও বংশের বা পরিবারের প্রচলিত উপাসনা বা পূজা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে বলেন নি। বরং অপরপক্ষে তাঁদের বংশের নিয়মাদি মেনে চলার নির্দেশই দিতেন। গোস্বামীপ্রভুর মধ্যে সামান্যতম গোঁড়ামিও ছিল না। আদর করে শিষ্য তাঁকে অর্ধভুক্ত পেয়ারা দিলে বা মুসলমান রমণী তাঁর মুখ থেকে স্নেহের আতিশয্যে আনন্দের উল্লাসে লালা-নিঃসৃত পাটালি গুড় দিলে, তিনি তা বিনাদ্বিধায় গলাধঃকরণ করেছিলেন।

---

[১] সত্যকুমার গুহঠাকুরতার স্ত্রী যোগমায়া গুহঠাকুরতার খাতা থেকে।

তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অতিথিকে কারণ শোধন করে দিতেও তিনি আপত্তি করেন নি। ঢাকা সমাজগৃহে, তাঁর আবাসকক্ষে হিন্দু দেব-দেবীর ছবি ছিল বলে গোঁড়া ব্রাহ্মেরা বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পরও ব্রহ্মোৎসবে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছেন। ব্রাহ্মদের মনেও এ নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়—তিনি ব্রাহ্ম না হিন্দু! তাই কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হতে তাঁকে অনুরোধ করা হয়। কুম্ভমেলায় নাম-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তিনি মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দপ্রভুর মৃন্ময় বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। এই নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে আবার ভুল বুঝেন। এরূপ সিদ্ধান্ত যে অমূলক, তা তৎকালীন ঘটনাবলী নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে।

রাখালবাবুর গৃহে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী শালগ্রাম পূজা করতেন আর গোসাঁই উৎসাহী হয়ে কাঁসর বাজাতেন। একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পিওন সৌকত আলির ইচ্ছা হয়, গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করে। সে রাখালবাবুর বাড়ীতে এলে, গোসাঁই তাঁকে তাঁর আসন-ঘরের মাদুরে সমাদর করে বসিয়েছিলেন। ঐ মাদুরের উপর এক পাশে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর শালগ্রামের আসন ছিল। সৌকত আলি চলে গেলে, প্রভু মৃদু হেসে বলেন, ‘সৌকত আলির সঙ্গে একই মাদুরে বসতে শালগ্রামের আপত্তি হয় নাই, যেমনটি করে শালগ্রামের পূজায় আমিও বাধা দেই নাই।’

গোসাঁইর জ্বরের সময় পাঁউরুটি টোস্ট করে খেতে ডাক্তার তাঁকে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। হিন্দু বেকারী ছিল বহু দূরে। ওখান থেকে পাঁউরুটি নিয়ে আসতে হবে কিনা তাঁকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেন, ‘কেন? গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে নিয়ে এস।’ দু-চারদিন আনার পর ঠনঠনিয়ার কাছে মেছুয়াবাজারে মুসলমানের বেকারী আছে জেনে, ওখান থেকেই তা আনতে বলেন।

একদিন প্রভু বলেন, ‘পরলোকবাসীগণ এবং দেবতারা প্রায়ই এসে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, যদিও আমি তোমাদের মধ্যে রয়েছি। এই তো এতক্ষণ রাখালবাবুর স্ত্রী ও দুই মেয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, তাঁরা এইমাত্র চলে গেলেন।’ এই কথা শুনে রাখালবাবুর চোখ সজল হয়ে উঠে।

একদিন চিরঞ্জীব শর্মা ওরফে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল এসে গোস্বামী মহাশয়কে মেছুয়াবাজারে নববিধান সমাজের মন্দিরে যেতে আমন্ত্রণ করেন। প্রভু তাঁকে বলেন. ‘আমার গুরুর অনুমতি বিনা সম্ভব নয়।’ চিরঞ্জীব শর্মা বলেন, ‘ব্রহ্মই গুরু।’ গোসাঁই বলেন, ‘গুরুই ব্রহ্ম।’ চিরঞ্জীব শর্মা যতই বলেন, ‘ব্রহ্মই গুরু,’ গোসাঁই ততবারই বলেন, ‘গুরুই ব্রহ্ম।’

গোস্বামীপ্রভু যেখানেই থাকুন না কেন, তা মহাতীর্থ মধুবৃন্দাবন হয়ে উঠে। রাখালবাবুর গৃহে, সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে ভক্তসমাবেশ। দিনভর তাঁদের আনাগোনা। কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ দীক্ষাপ্রার্থী। ব্রাহ্মদীক্ষার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পায়। যাঁরা ব্রাহ্ম-উপাসনা-মন্দির এতদিন জম-জমাট করেছেন, তাঁরা কেন এখন গোস্বামী মহাশয়ের কাছে দীক্ষাপ্রার্থী? ব্রাহ্ম পুরোধারা প্রমাদ গণেন। কি করে অন্যান্য ব্রাহ্মদের প্রতিনিবৃত্ত করা যায়? পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মেরা স্থির করেন, প্রতিটি রবিবার বিভিন্ন বাগানবাটীতে ব্রাহ্মেরা মিলে একত্র আহার ও ধর্মালোচনা করলে সুফল হবে। তিন-চারটি রবিবার পর্যন্ত এই উৎসাহ থাকে, তারপর আর ব্রাহ্মেরা বড় আসেন না।

রাখালবাবুর বাড়ীতে শান্তিসুধার ছেলে দাউজীর জ্বর হয়। 'হাম' উঠবে ভেবে গৃহস্বামী গুরুকে বলেন, 'একখানা ছোট বাড়ী ভাড়া করে দাউজী আর তার মা-বাবাকে ওখানে কয়েকদিন রাখলে কেমন হয়? দাউজী সেরে উঠলে আবার তাঁরা এখানে সব ফিরে আসবেন।' গোসাঁই রাখালবাবুকে বলেন, 'আপনি যখন ভয় পেয়েছেন, দাউজীকে আর এখানে রাখা ঠিক নয়। আর আমার পক্ষেও এ সময় ওদের ছেড়ে দূরে থাকা সমীচীন নয়।' ঐদিনই মণি মজুমদারকে দিয়ে বাড়ী ভাড়া করে তিনি কম্বলিটোলায় উঠে যান। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস (১৩০১)।

গোলদীঘির পাশের বড় রাস্তায় একটি লোক নেচে নেচে পথচারীদের আরতি করেন আর মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন, 'গৌরনাচাবাবা কাঁহা?' ভিড় জমে যায়। গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য বেণীমাধব দে আর ছোট জামাতা বাণীতোষ বাগচী ওদিকে যাচ্ছিলেন। ওঁরা দেখেন ভিড়ের মধ্যে কুম্ভমেলার সেই অর্জুনদাস ক্ষ্যাপাচাঁদকে। সাধুও বুঝেন, তিনি যাঁকে খুঁজছেন এঁরা তাঁরই লোক। তাঁরা নিয়ে যান তাঁকে কম্বলিটোলায় প্রভুর নতুন আস্তানায়। কুম্ভমেলা হতে ক্ষ্যাপাচাঁদ গিয়েছিলেন শ্রীবৃন্দাবন। ওখানে একদিন ছোলাভাজা খেয়ে তাঁর বড় ভাল লাগে। গোস্বামীপ্রভুর কথা তখন তাঁর মনে পড়ে। ছোলাভাজা কোমরে বেঁধে সারা ভারত জুড়ে গোসাঁইকে তিনি খুঁজে বেড়ান। নাম-ধাম জানা নেই। যাকে দেখেন, জিজ্ঞাসা করেন, 'গৌরনাচাবাবাকো মালুম হ্যায়?' নবদ্বীপে এসেও হদিস মিলে না। ওখান থেকে আসেন কলিকাতা। প্রভুকে দেখে আনন্দে বলে উঠেন, 'মিলা রে মিলা। ওহি মেরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু হ্যায়। বাবা, হম্‌কো তেহার কর লে। ম্যায় বঙ্গালী বন্‌ যায়গা হুঁ।' শান্তিসুধাকে বলেন, 'ম্যায় মছলি খাউঙ্গা।' শান্তিসুধা তাঁকে ইলিশ মাছ রেঁধে দেন। গোসাঁইর এক শিষ্য কাঁটা বেছে দেন। ক্ষ্যাপাচাঁদের ধারণা হয়, এতে তিনি গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

কম্বলিটোলায় গোসাঁইর এক প্রতিবেশী ছিলেন উৎকট ব্রাহ্ম। প্রভুর এই পাড়ায় আসা অবধি তাঁর আবাসে চলে নিত্য উৎসব। ভোর থেকে গভীর রাত্রি অবধি কত লোকের যে যাতায়াত! এ-সব দেখে ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটির অন্তর জ্বলে উঠে। দুষ্টা সরস্বতী তাঁর কাঁধে ভর করেন। ধর্মান্ধ আরও কয়েকজন ব্রাহ্মের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এক হীন চক্রান্তে লিপ্ত হন। গোসাঁই বেঁচে থাকলে ব্রাহ্মসমাজের আর চিহ্নটুকুও থাকবে না বলে ওঁরা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। যে সুযোগ আপনা হতে এসেছে, তা গ্রহণ না করা কাপুরুষতা। প্রতিবেশী ব্রাহ্মটি খোঁজ নিয়ে জানেন, তাঁরই গৃহের পরিচারিকা গোসাঁইর নিকট যাতায়াত করে। পরদিন দুখানা বড় সন্দেশে মারাত্মক বিষ মিশিয়ে ব্রাহ্মটি তাঁর পরিচারিকাকে দিয়ে সকালবেলা গোসাঁইর সেবার জন্য পাঠান। সন্দেশ গলাধঃকরণ করতেই প্রভু অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরিচারিকা গৃহে ফিরতে না ফিরতে হুলস্থুল পড়ে যায়। তাকে দিয়ে গর্হিত কাজ করান হয়েছে বুঝে, সে ক্ষিপ্ত হয়ে তার মনিবকে গিয়ে বলে, 'এই বুঝি তোমরা ধর্ম ধর্ম কর! ধর্মের নামে পৈশাচিক কার্য করতেও তোমাদের বাধে না। তুমি আমার ইহকাল, পরকাল দুই-ই খুইয়েছ! তুমি কসাই, তুমি নরঘাতক! তোমার গৃহে আমি আর এক মুহূর্তও থাকব না।' এই বলে সে চলে যায়। ক্ষ্যাপাচাঁদের যৌগিক চিকিৎসায় তের-চোদ্দ দিন ভুগে গোস্বামীপ্রভু সুস্থ হয়ে উঠেন।

আষাঢ় মাসে (১৩০১) গোস্বামীপ্রভু সকলকে নিয়ে পটলডাঙ্গায় ১৪/২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে উঠে যান। এই বাড়ীতে একদিন ভোরে ক্ষ্যাপাচাঁদ গোসাঁইকে

বলেন, 'হম্‌ তুমহরা হো গিয়া।' পূর্ব রজনীতে তিনি গোস্বামীপ্রভুর সাধন পেয়ে থাকবেন। তিনি গোসাঁইকে বলেন, তাঁর বায়ান্ন রকম কায়াকল্প জানা আছে; গোসাঁই অনুমতি করলে পরমাণু পরিবর্তন করে তাঁর দেহ তিনি নীরোগ করে দিতে পারেন। প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তাতে কি আমার প্রারব্ধ নষ্ট হবে?' ক্ষ্যাপাচাঁদ বলেন, 'মহারাজ সো বাৎ ম্যায় কহনে নেহি সেকতা হুঁ।' গোসাঁই বলেন, 'তাহলে আমার প্রয়োজন নাই।'

একদিন সকালে চা-পানের পর রেবতীমোহন সেন গান ধরেন—

ওরে আমার মন পাগলারে।
হরদম আল্লাজীর নাম লইও॥
হরদম গুরুজীর নাম লইও।
দমে দমে লইও নাম কামাই নাহি দিও॥

ক্ষ্যাপাচাঁদের মধ্যে হয় তখন মহাবীরের আবেশ। গোস্বামী মহাশয়ের দন্ড শূন্যে ঘুরাতে ঘুরাতে তিনি ঘর-বাহির করেন, আর তেজের সঙ্গে বলেন, 'বাঙ্গালী লোক মছলি খাতা হ্যায়, বাংলা মুল্লুক ভ্রষ্টচারী হো গিয়া।' 'মহাবীর, মহাবীর, স্থির হউন' বলে, গোসাঁই তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। রেবতীবাবু বলেন, '"আল্লাজীর" এই শব্দটি গানের পদে থাকায় বোধহয় তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।' প্রভু বলেন, 'তা নয়, দেখছ না, হাওয়ার সঙ্গে তিনি লড়াই করছেন।'

গোস্বামী মহাশয়ের একখানি বহির্বাস আর গলা থেকে একছড়া মালা নিয়ে তিনি বায়ুবেগে বের হয়ে যান। ভক্তেরা গোসাঁইকে প্রশ্ন করেন, 'ইনি কি রাগ করে গেলেন?' প্রভু বলেন, 'না, রাগ করবেন কেন? যাবার ইচ্ছা হয়েছে, তাই ওভাবে চলে গেলেন।'

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের আশ্রম-বাটীতে রেবতীমোহন সেন কীর্তন গান; বেণীমাধব দে, সরলনাথ গুহ, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার মিত্র দোহার দেন। অহোরাত্র এখানে ধর্মের একটি স্রোত চলে। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, ভজন গান, হোম, হরিকথা লেগেই আছে। গ্রাম্যকথা যাতে প্রশ্রয় না পায় আর শিষ্যদের মধ্যে বাদানুবাদ না হয়, তজ্জন্য গোস্বামী মহাশয় স্বহস্তে আশ্রমের নিয়মাবলী লিখে নীচের তলায় সাধারণের বসার ঘরে টানাবার নির্দেশ দেন—

শ্রীশ্রীহরিসহায়।

সবিনয় নিবেদনম্‌,

এই আশ্রমে যাঁহারা বাস করিবেন এবং দর্শনার্থী হইয়া উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট আমি বিনীত নিবেদন করিতেছি—এই আশ্রমে কেহ পরনিন্দা, বৃথা তর্ক-বিতর্ক এবং বিবাদ-বিসম্বাদ করিবেন না। অপিচ কাহারও সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে, তাহার সাক্ষাতে বলিবেন, নতুবা পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব হইতে পারে। মনুষ্যজীবন অতি অল্পকাল স্থায়ী, বৃথা আলাপে তা নষ্ট করা উচিত নয়। এইজন্য সকলের চরণে নিবেদন করিলাম।

নিবেদক—
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

আশ্রমে সন্ধ্যাকীর্তন একদিন এমনই জমে উঠে, ইট-পাথরেও যেন চৈতন্যের সঞ্চার হয়। দোতলা যেন কীর্তনের তালে তালে উঠা-নামা করে। বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোক পরদিন গোসাঁইর সঙ্গে দেখা করে সবিনয়ে বলেন, 'প্রভো, কীর্তনের ব্যবস্থা নীচের

তলায় হলে কেমন হয়? গতরাত্রে মনে হয়েছিল, দোতলা বুঝি ভেঙে পড়ে।' গোস্বামীপ্রভু সায় দেন। ঐদিন থেকে কীর্তন নীচে হয়। পাশের দালানটি একই বাড়ীওয়ালার। তখন ভাড়াটে ছিলেন এক ব্রাহ্মণ মদ্যপ। তিনি কীর্তন-বিরোধী। বাড়ীওয়ালাকে গিয়ে বলেন, 'কীর্তনের জ্বালায় এখানে থাকা দায়। এর একটা বিহিত করুন। নইলে আমি ওঁদের এ-বাড়ী ছেড়ে যেতে বাধ্য করব।' গৃহস্বামী তাঁকে বলেন, 'আপনি ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে এ-সব কথা কি করে মুখে আনেন? আপনার যদি এখানে না পোষায়, তাহলে অন্য বাড়ী দেখুন।' লোকটি তাঁর বার-তের বছরের কন্যাকে দিয়ে তার মুখের অমেধ্য জল কুলকুচি করে ছাদের উপর দিয়ে 'ধূম্রনির্গমণ নল' দিয়ে গোসাঁইর রান্নাঘরে ভোগ-সামগ্রীর উপর ফেলা হয়। এ-কথা পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে। মহদতিক্রমের ফল অচিরে মিলে। ঐ লোকটি কয়েক দিন বাদেই মফঃস্বলে গিয়ে মারা যায়। ওদের ঐ বাড়ী ছাড়তে হয়।

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটে। হরিনারায়ণ রায় এরাকি কোম্পানী নামে এক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। তাঁর এক সহকর্মী যখন-তখন হরিনারায়ণবাবুর সম্মুখে গোস্বামীপ্রভু সম্পর্কে আজগুবি সব অভিযোগ এনে তাঁকে হেয় করার চেষ্টা করতেন। লোকটি এই সময় একদিন কর্মচ্যুত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ১০।৪।৪৬

মহাজনদিগকে লঙ্ঘন করলে মানুষের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম, স্বর্গাদিলোক, আশীর্বাদ ও সব রকম শ্রয়ঃ বিনষ্ট হয়।

একদিন মোহিনী রায় গোসাঁইর মাথার জটা বাছতে বাছতে দেখেন, বেশ খানিকটা জায়গা স্ফীত হয়ে আছে। সবিস্ময়ে তিনি প্রভুকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার মাথায় লাগল কি করে?' গোসাঁই বলেন, 'রামতারকবাবু দেবেন্দ্রনাথকে মেরেছেন, তাঁরই আঘাতের চিহ্ন।' মোহিনীবাবু গুরুকে প্রশ্ন করেন, 'কে দেবেন্দ্র? রামতারকবাবুটিই বা কে? আর মারলেনই বা কেন?' গোসাঁই বলেন, 'দেবেন্দ্র চক্রবর্তী, আমাদের দেবপ্রসাদ-স্বামীজী। তাঁর বাবা রামতারকবাবু তাঁকে কাল সজোরে মাথায় আঘাত করেছেন। বি.এল. পাশ করে, উদাসীর ন্যায় তিনি ঘুরে বেড়ান; বাপের কথামত চলেন না, তাই তাঁর ক্রোধ। স্বামীজীর ক্ষতের চিহ্নই আমার মাথায়।'

পরদিন স্বামী দেবপ্রসাদ আসেন কানপুর থেকে। কথায় কথায় গোসাঁইকে বলেন, তাঁর বাবার সঙ্গে কয়েকদিন পূর্বে কথা কাটাকাটি হলে, তিনি খড়ম দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন। অথচ একটুও তাঁর লাগে নি। মাথায় চিহ্নটুকুও নেই। পরে মোহিনীবাবুর মুখে সে দিনের বৃত্তান্ত শুনে তিনি কেঁদে হন আকুল।

যথাসময়ে রাত্রে পরিমিত প্রসাদ পান প্রভু। রাত্রি দ্বিপ্রহরে সেবককে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'খাবার কিছু আছে?' বিস্মিত সেবক-শিষ্য ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ আনেন। তা পেয়ে প্রভু বলেন, 'একটি ছেলে ক্ষুধাতে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। আমি খেয়েছি বলে তার ক্ষুধা মিটেছে।' পরদিন একটি যুবক-শিষ্য মাদারিপুর থেকে কলিকাতা আসে। বেলা একটায় সে গুরুর প্রসাদ পায়। সতীর্থদের সে বলে, 'সংকল্প করেছিলাম, ঠাকুরের প্রসাদ না পেয়ে কিছু মুখে নেব না। কাল মধ্যরাত্রে ট্রেনে ক্ষুধায় বড় কাতর হয়ে পড়ি। হঠাৎ ক্ষুধা-তেষ্টা চলে গেল।'

একটি ব্রাহ্মণ যুবক হন গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধনপ্রার্থী। তিনি তাঁর সাধনের নির্ধারিত তারিখ ও সময় স্থির করে দেন। নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই ঘটে তাঁর

লোকান্তর। গোস্বামী মহাশয় ঐদিনও নির্দিষ্ট সময়ে শৌচে যান। সরলনাথ বাইরে থেকে শুনেন ঠাকুর কার সাথে কথা বলছেন। শৌচাগার থেকে বের হতেই সরলনাথ গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?' গোসাঁই বলেন, 'আজ ঐ ব্রাহ্মণ যুবকটির সাধন হল।' অবাক হয়ে সরলনাথ ফের প্রশ্ন করেন, 'পরলোকবাসীরাও কি এ সাধন পেতে পারেন?' গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'হ্যাঁ।'

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২) মহাশয়ের পিতা কৃষ্ণনাথবাবু ছিলেন অনীশ্বরবাদী। তিনি লক্ষ্য করেন তাঁরই ছেলে গোস্বামীপ্রভুর কথায় অসাধ্য সাধন করেন। এমন একগুঁয়ে ছেলেকে যিনি বাগ মানিয়েছেন, তাঁকে একবার দেখে আসতে হয়। একদিন কাউকে কিছু না বলে পটলডাঙগায় গোস্বামীপ্রভুর আশ্রম-বাড়ীতে এসে তিনি উপস্থিত হলেন। দোতলায় গোসাঁইর আসন-ঘরে স্বামী দেবপ্রসাদ বসেছিলেন; তাঁকে তিনি প্রশ্ন করেন, 'আপনিই কি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী?' স্বামীজী বলেন, 'আজ্ঞে না; তিনি আমার গুরু। গুরুদেব শৌচে গেছেন।' গোসাঁই শৌচান্তে ঘরে ফিরে, সতীশবাবুর পিতাকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে উঠে বলেন, 'আপনার পশ্চাতে ভরদ্বাজ ঋষিকে দেখে, তাঁকে প্রণাম করলাম।' ঐ ঘরে তখন যেই আসেন, তাঁকেই বলেন প্রভু, 'ইনি সতীশবাবুর পিতা, এঁকে প্রণাম কর।' গোস্বামীপ্রভুর বিনয় ও সৌজন্যে কৃষ্ণনাথবাবু অভিভূত হন। গৃহে ফিরে তিনি বলেন, 'আজ আমার ভগবদ্‌ দর্শন হয়েছে।' এর কয়েকদিন পর তিনি গোসাঁইর কাছে একদিন এসে বলেন, 'সতীশের বিয়ের অনুমতি যদি দেন, তাহলে বড় খুশি হই।' প্রভু বলেন, 'তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করব।' সতীশবাবুর সঙ্গে এরপর দেখা হতেই গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'আপনার বাবা এসেছিলেন। বিয়ে করতে আপনার কি আপত্তি?'

সতীশবাবু তাঁকে বিনীতভাবে বলেন, 'আমার পক্ষে কোন্‌টা শুভ, কোন্‌টাই বা অশুভ, তা আপনিই জানেন। আপনি যদি বলেন, একটি কেন, তিনটি বিয়ে করতে, তবে তাই করব। যদি বলেন বেশ্যাগমন করতে, তাই করব।' গোস্বামী মহাশয় তাঁর কথা শুনে মৃদু হাসেন। সতীশবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'না, তোমার বিবাহের প্রয়োজন নাই।'

সতীশচন্দ্র সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। একদিন এক সহযোগী অধ্যাপক তাঁকে মানিকতলায় একটি 'গুপ্ত সমিতি'তে নিয়ে গিয়ে বোমা-প্রস্তুত-প্রণালী দেখিয়ে তাতে যোগদানের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের কথা-প্রসঙ্গে প্রভু ঐদিনই সতীশবাবুকে বলেন, 'হিংসার পথে আমাদের স্বাধীনতা আসবে না। ভগবদ্‌ ইচ্ছায় এমনি এক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যাতে ইংরেজেরা একদিন স্বেচ্ছায় চলে যাবেন।' সতীশবাবু গুরুদেবকে বলেন, 'আপনার যদি অনুমোদন থাকে, তাহলে আমার ইচ্ছা. আমি নরেনের ন্যায় সন্ন্যাস নেই। নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ সহপাঠী।' গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'ঐ পথ তোমার নয়। শিক্ষা-বিস্তার ও ছাত্রদের চরিত্র-গঠনের কাজে তুমি আত্মনিয়োগ কর।' তখন থেকেই (আশ্বিন, ১৩০১) সতীশবাবু শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। কিরণচন্দ্র দে, আই-সি-এস, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আই-সি-এস, প্রফেসর বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র। ইডেন হিন্দু হোস্টেলে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে মিশেছেন তিনি বন্ধুর মতন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন

হিন্দু হোস্টেলে ছিলেন। তিনিও বিশেষভাবে সতীশবাবুর সংস্পর্শে আসেন। অনেক সময় ছেলেদের নিয়ে বাড়ী ভাড়া করে তিনি থাকতেন।

একদিন সত্যানুরাগী ব্রাহ্ম পার্বতীচরণ রায় মহাশয় সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ীতে এসে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গোসাঁইর প্রতি পার্বতীবাবুর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম। তিনি ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। কর্মজীবন হতে অবসর নিয়ে তিনি ইংলণ্ড যেয়ে বসবাস করেন; এবং ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন। ওখানে একদিন তাঁর শোবার ঘরে ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁকে দর্শন দেন। আর একদিন তিনজন মহাপুরুষ তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'ভারতে ফিরে এস।' এই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন গোস্বামীপ্রভু। ফিরে এসে গোসাঁইর সঙ্গে এখানে দেখা করে তিনি অপর দুজন সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করায়, প্রভু বলেন, 'ওঁরা এখন হরিদ্বারে আছেন।' তিনি অকপটে গোস্বামী মহাশয়কে বলেন, 'গোসাঁই, ভগবানের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নেই। যাঁরা বলেন, তিনি আছেন, তাঁদের কথায় আমার আস্থা হয় না। তুমি ঠিক করে বলত, তিনি আছেন কিনা!' প্রভু বলেন, 'হ্যাঁ, ভগবান নিশ্চয়ই আছেন।' পার্বতীবাবু বলেন, 'তাঁকে কি দেখা যায়?' গোসাঁই বলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখা যায়।' আবার তিনি গোস্বামী মহাশয়কে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি ভগবানকে দেখেছ?' প্রভু বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি তখন বলেন, 'তোমার মুখ থেকে একথা শুনে বড় আশ্বস্ত হলাম।' পার্বতীবাবু হরিদ্বারে গিয়ে অপর দুই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পান। কলিকাতা ফিরে এসে গোসাঁইর কাছে তিনি হরিদ্বারের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তারপর সখেদে বলেন, 'গোসাঁই এই অশুদ্ধ দেহে, আর কিছু হল না এবার। অনেক কদাচার করেছি, অখাদ্য খেয়েছি। দেহ ও মন দুই-ই অপবিত্র। দেবতা ও মহাপুরুষদের কৃপায় এবার যা হল, আমার মত ভ্রষ্টাচারী নিরীশ্বরবাদীর পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। আমি ইংলণ্ডেই ফিরে যাব স্থির করেছি।' তিনি গোস্বামী মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বিদায় নেন। বিলাতে ফিরে From Hinduism back to Hinduism নাম দিয়ে তিনি সুচিন্তিত একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থপাঠে নিতান্ত অবিশ্বাসীর অন্তরেও আস্তিকা-বুদ্ধির উদয় হয়।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে অবস্থান ও শ্রীবৃন্দাবন হয়ে প্রত্যাগমন

গোস্বামীপ্রভু পটলডাঙ্গায় ঐ বাড়ীতেই আছেন। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার শ-তিনেক টাকার বড় প্রয়োজন। তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থের স্বত্ত্বাধিকার বিক্রয় করে, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য বই-এর পাড়ায় তিনি ঘোরাঘুরি করেন। সন্ধ্যায় অবসন্ন দেহে মনোরঞ্জনবাবু গোসাঁইর কাছে গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করেন, 'ঠাকুর, তুমি একটা উপায় না করলে যে মান-সম্মান সব যায়!' ঠিক ঐ মুহূর্তে সরলনাথ ভাবের ঘোরে মনোরঞ্জনবাবুর পিঠের উপর উঠে নৃত্য করতে থাকেন। জ্ঞাতি সম্পর্কে মনোরঞ্জনবাবু সরলনাথের পিতৃব্য। স্বাভাবিক অবস্থায় সরলনাথের এমন অশোভন আচরণ অচিন্তনীয়। মনোরঞ্জনবাবু মনে মনে ভাবেন, 'সাধু ছেলেটির পাদস্পর্শে আমার দেহটি পবিত্র হচ্ছে।' তিনি উঠে বসেন। প্রভু তাঁকে বলেন, 'আপনার বই-এর "কপি রাইট" রাত্রি প্রভাত হলেই তিন শ টাকায়

'বিক্রয় হবে।' সতীশ মুখোপাধ্যায় (২) ওখানে তখন উপস্থিত ছিলেন, গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'যতদিন তোমার মা জীবিত আছেন, মাসে ষাট টাকা করে মাকে দেবে। মনোরঞ্জনবাবুর জন্য ভাবতে হবে না। তাঁর সব ভার ভগবান নিয়েছেন।' আশ্রম-গৃহের দেওয়ালে কয়েকজন শিষ্য যথেচ্ছা পেরেক পোতেন দেখে প্রভু বলেন, 'ভাড়াটে বাড়ী বলে অমন করতে নাই। এতে অধর্ম হয়।'

একদিন নীচে গোলমাল শুনে গোসাঁই বলেন, 'দেবপ্রসাদ, দেখে এস তো নীচে কি হচ্ছে?' স্বামীজী তখন নীচে যেয়ে বলেন, 'আপনারা হট্টগোল করবেন না, ঠাকুর বারণ করছেন।' উপরে এলে গোসাঁই স্বামীজীকে বলেন, 'আমি তো তোমাকে ওঁদের নিষেধ করতে বলি নাই। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম কিসের গোলমাল।'

এক সন্ধ্যায় রেবতীমোহন সেনের কথকতা ও কীর্তন গোস্বামীপ্রভুর বড় ভাল লাগে। তিনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে বলেন, 'রেবতী, তোমার কণ্ঠ মধুময় হউক।' আরও বলেন, 'বেহালার সঙ্গে কীর্তন বড় ভাল শোনায়।' রেবতীবাবু তখন কলিকাতায় শিক্ষকতা করতেন। প্রভুর মন্তব্য শুনে রেবতীবাবুর এক ভক্ত-বন্ধু একটি বেহালা তাঁকে উপহার দেন। রেবতীবাবু বেহালা হাতে পেয়েই গুরুর কাছে এনে ধরেন। গোসাঁইও বেহালাটির উপর দুবার ছড়ি চালিয়ে রেবতীবাবুর হাতে তুলে ধরেন। তখন থেকে এই বাদ্যযন্ত্রটি রেবতীবাবু কাছ ছাড়া করেন না।

ব্রাহ্ম এক ভদ্রলোক একদিন গোস্বামীপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আর কতদিন এখানে থাকবেন?' প্রভু তাঁকে বলেন, 'তা তো বলতে পারি না। গুরুদেব যখনই যেখানে যেতে আদেশ করবেন, তখনই সেখানে যেতে হবে।'

—আপনার গুরু তো ভগবান।

—আমার গুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংস।

—তিনি কোথায় থাকেন?

—মানস-সরোবরে।

—এতদূর থেকে কথাবার্তা বলা কি করে সম্ভব?

—এমন অবস্থা হতে পারে, যখন দূরত্ববোধ কিছু নয়। যেখান থেকেই বলেন না কেন, শুনতে পাই।[১]

এরপরও তিন-চার মাস প্রভু কলিকাতায় ঐ বাড়ীতেই ছিলেন।

ব্রাহ্ম জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের মা-ও ব্রাহ্মিকা ছিলেন। তিনি গোস্বামীপ্রভুর কাছে যোগসাধন পান। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় অশ্রু, কম্প, পুলকাদি। ভাবের আবেশে তিনি সম্বিত হারান। তাঁর কর্ণকুহরে বহু সময় ধরে 'হরি ওঁ' ধ্বনি উচ্চারণের পর তাঁর চৈতন্য ফিরে এলে তিনি বলেন, 'প্রভো, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে, আমার ভগবদ্ দর্শন হয়েছে।' গোস্বামীপ্রভু তাঁকে বলেন, 'হ্যাঁ, এ কথা ঠিক। সত্যই আপনি ভগবদ্ দর্শন লাভ করেছেন। আপনার দেহত্যাগও হয়েছিল।' জ্ঞানবাবুর মা বলেন, 'কেন তাহলে আমাকে আবার বাঁচালেন?' গোসাঁইজী বলেন, 'কি করি? পাহাড়ে জঙ্গলে হলে বাঁচাবার প্রয়োজন হত না। কিন্তু এ যে কলিকাতা শহর। না বাঁচালে রক্ষা ছিল? পুলিশ এসে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করে দিত।'[২]

---

১. 'মন্দির' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

২. যোগমায়া গুহঠাকুরতা মহাশয়ার খাতা থেকে।

পটলডাঙ্গার এই আশ্রমগৃহে বহু অভাজন গোস্বামীপ্রভুর কাছে যোগসাধন পান। ব্রাহ্মদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। গোসাঁইজীর কাছে সাধন নেবার মূলে দীক্ষার্থীর ঈশ্বরলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, গোস্বামী মহাশয়ের চরিত্রবল, ভক্তিপ্রাবল্য ও মধুর ব্যক্তিত্ব। চিন্তাশীল ব্রাহ্মেরা পরামর্শ করেন, কি করে এর প্রতিরোধ করা যায়? ফলে ব্রাহ্ম-সাধন-আশ্রমের উদ্ভব হয়। কিন্তু ত্যাগী ও আদর্শবান প্রচারক কোথায়? বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল হলেন এই ব্রাহ্ম-সাধন-আশ্রমের পথিকৃৎ। গোসাঁইর নিকট যে লোকসমাগম হয়, তা স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর ভাব-ভক্তি ও তাঁর ঈশ্বরীয় কথা শুনে স্বাভাবিকভাবে ওঁরা আকৃষ্ট হন। প্রচারকের প্রচেষ্টায় ঐ রকম কি করে সম্ভব হয়? মহা-বাগ্মী হলেও একজন প্রচারকের শুষ্ক কথায় তা হতে পারে না। ছাত্রাবস্থা থেকে বিপিনবাবুর সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের অন্তরঙ্গ পরিচয়। বিপিনবাবু গোস্বামীপ্রভুর সহধর্মিণীকে ‘দিদি’ বলে ডাকতেন। প্রভুর প্রতি বিপিনবাবুর বরাবরই অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি। গোসাঁইজীকে তিনি ধর্মের জীবন্ত-বিগ্রহ বলেই জানতেন। সদ্যদীক্ষিত ব্রাহ্মদের মুখেও বিপিনবাবু শোনেন, সাধনোপদেশে গোস্বামীপ্রভু ব্রাহ্ম-বিরোধী কোন নির্দেশ কখন দেন না। গুরুকরণেরও বাঁধাধরা কোন নিয়মও নেই। তাই অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও এই যোগ-দীক্ষা নিতে কোন অসুবিধা নেই।

একদিন সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাটীতে প্রভুর সঙ্গে সকালে সাক্ষাৎ করে বিপিনবাবু কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় এক সেবক গুরুর জন্য ওখানে চা ও হালুয়া নিয়ে আসেন। বিপিনবাবুকে দেখিয়ে গোসাঁইজী সেবককে বলেন, ‘ওঁকেও দাও।’ তিনি বিপিনবাবুকে তাঁর সঙ্গে কক্ষান্তরে যাবার অনুরোধ করতেই প্রভু বলেন, ‘না, এখানেই আন। আমরা একসঙ্গে পাব।’ ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু এতে বিপিনবাবুর অন্তরে করে গভীর রেখাপাত। তাঁর কাছে মনে হয় এটা অসামান্য। মনে মনে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখেন, গোসাঁইর চরিত্রে ‘সংস্কারে’র কোন বালাই নেই। ঈশ্বরীয় কথা ভিন্ন তাঁর মুখে আর অন্য কথা নেই। আর তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে কি অন্তর্গূঢ় শক্তি! প্রভু ঐদিন বলেন, ‘ধর্মের সারকথা ভগবান। ভগবানই ধর্ম।’ সাধু কি করে চেনা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে গোসাঁই বলেন, ‘যাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে, মন আপনা থেকে ভগবানের দিকে চলে যায়, তিনি সাধু। সাধু কখনও অপরের ধর্ম-বিশ্বাস নষ্ট করেন না।’ বিপিনবাবুর মনে হয় এসব অপূর্ব, অননুধ্যাত। বিচক্ষণ বিপিনবাবু মুগ্ধ হন। অভিভূত হয়ে তিনি ঐ মুহূর্তে গোস্বামীপ্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। গোসাঁই বিপিনবাবুকে ‘ব্রহ্মনাম’ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে তা কি করে জপ করতে হয়, দেখিয়ে দেন। প্রাণায়াম দেখান। বাধানিষেধ সম্বন্ধে প্রভু নীরব থাকেন। ব্রহ্মনাম পেয়ে বিপিনবাবু মেতে উঠেন। কয়েকদিন বাদে ঘুম ভাঙ্গতেই তিনি লক্ষ্য করেন শ্বাস-প্রশ্বাসে আপনা-আপনি নাম চলছে! দিন দিন তাঁর মন ‘নামে’র অধীন হয়ে যায়। বিপিনবাবুর মনে হয়, প্রভুর সাধনে শক্তিসঞ্চার প্রকৃতপক্ষে ‘সম্মোহন’ শক্তি, যা দুরন্ত রিপুদিগকে স্ববশে নিয়ে আসে—‘নাম’ যেন বিশ্বস্ত সহচর। তিনি আরও হৃদয়ঙ্গম করেন, প্রভুর কাছে যোগসাধন লাভ করেও ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্তই তিনি রয়েছেন। গোসাঁই-শিষ্যেরা নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী পূজা ধ্যান ধারণা করেন, তাতে কোন বিরোধ নেই, এ-কথা তাঁর কাছে বর্ণে বর্ণে সত্য মনে হল।

একদিন বিপিনবাবু গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, ‘ব্রহ্মোপাসনা কি

করে করব?' তিনি উত্তর দেন, 'যতদিন বহিরিন্দ্রিয় ও মনে নিবৃত্তি না আসে, ততদিন ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব নয়। ঐ অবস্থায় উপনীত হলে সত্যিকারের ব্রহ্মোপলব্ধি হয় এবং তখনই সম্ভব হয় কথায় ও কাজে ব্রহ্মোপসনা।' বিপিনবাবু আবার প্রশ্ন করেন, 'সমাধি-অবস্থায় কি করে পৌঁছা যায়?' প্রভু বলেন, 'মানসিক পূজা, শাস্ত্রগ্রন্থপাঠ, স্তোত্র-আবৃত্তি ও সাধুসঙ্গের মাধ্যমে। আশা-আকাঙ্ক্ষা ভগবানের চরণে আহুতি দিতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে নামসাধন, অন্তঃ ও বহিঃ পবিত্রতা এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সমাধিতে পৌঁছা সম্ভব।'

বিপিনবাবু নিরলস সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বেচ্ছায় তিনি স্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে তাঁর মন হয়ে ওঠে অহিংস। জীবপ্রকৃতির সঙ্গে ঘটে তাঁর আত্মীয়তাবোধ। গুরু থেকে বাহ্য ব্যবধান সত্ত্বেও তিনি তাঁর সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে শুরু করেন। একবার তিনি রংপুর গেছেন। শহরের বড় একটি হলঘরে একদিন অপরাহ্নে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন হয়। কিন্তু এমন জনসমাবেশ হল, যে হলঘরের অভ্যন্তরে স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন 'মাইকের' প্রচলন হয় নি। বিপিনবাবু বাইরে এসে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমাকে যদি আপনারা দেখতে এসে থাকেন তাহলে এই দেখুন আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি।' জনতা সমস্বরে বলে ওঠে, 'আপনাকে দেখব ও আপনার বক্তৃতা শুনব।' বিপিনবাবু বলেন, 'আপনারা শান্ত হন, তাই হবে।' তিনি সভার উদ্যোক্তাদের বলেন, 'বাইরে মুক্তপ্রাঙ্গণে চলুন।' উদাত্তকণ্ঠে তিনি ওখানে এক ঘণ্টার উপর বক্তৃতা করেন। তাঁর ভাষণ শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ। শ্রোতারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার সঙ্গে কোন পুস্তকাদি রাখেন না, কোন reference book বা চিরকুট নেই, তা সত্ত্বেও সারগর্ভ, অননুমেয় এই বক্তৃতা আপনি কি করে করেন?' বিপিনবাবু তাঁর জামার বুক-পকেট থেকে গোসাঁইর একটি ছোট ফটোগ্রাফ বের করে প্রণাম করে ডান হাতে তাঁদের সম্মুখে ধরে বলেন, 'এই যে আমার Reference Book বা চিরকুট।'

সিকাগো (Chicago) বিশ্বধর্মসভা অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় বিশ্বজুড়ে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে। স্বামীজীর আমেরিকায় প্রবাসকালে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উদ্দেশ্যে কলিকাতার নাগরিকেরা ২০ ভাদ্র, ১৩০১ (৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ) Town Hall-এ এক মহতী সভার আয়োজন করেন। উদ্যোক্তারা আলিপুরে সরকারী উকিল রায়বাহাদুর হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে গিয়ে ধরেন সভায় ভাষণ দেবার জন্য। হেমেনবাবু বিনীতভাবে তাঁদের বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমি অতি সামান্যই জানি, তাঁকে নিয়ে বক্তৃতা করার মত বিষয়বস্তু আমার জানা নেই। সুতরাং এই সভায় আমার কিছু বলা শোভন হবে না।'

ঐদিন মধ্যাহ্ন-আহারের পর তিনি গুরুদর্শনে যান পটলডাঙ্গায়। গিয়ে দেখেন, গোসাঁই ভক্তদের নিয়ে ভগবৎ-প্রসঙ্গ করছেন। হেমেনবাবুও গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে ওখানে বসে পড়েন। খানিকবাদে হেমেনবাবুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গোসাঁইজী বলেন, 'আজ Town Hall-এ যে সভা হচ্ছে, তাতে আমাদের মধ্যে কেউ যদি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে কিছু বলেন, তাহলে ভাল হয়।' হেমেনবাবুর মনে হল, ঠাকুর যেন চাইছেন, তিনিই ঐ সভায় গিয়ে ও বিষয়ে কিছু বলেন। হেমেনবাবু তখনই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠে পড়েন। Town Hall-এ যেতেই

তাঁকে সমাদর করে বক্তৃতামঞ্চে নিয়ে বসান হয়। বক্তারা একে একে স্বামীজীর জয়ধ্বনি করে চলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তেমন উল্লেখ নেই। হেমেনবাবুর নাম ঘোষণা করতেই তিনি গুরুকে স্মরণ করে উঠে দাঁড়ান। তাঁরই বক্তৃতার অংশবিশেষ বাংলায় তর্জমাসহ নীচে সন্নিবেশিত করা হল:—

In a meeting like this, one cannot but recall to his memory, the name of Swami Vivekananda's revered Guru, Sri Sri Ramkrishna Paramhansa Deva. To speak anything about Swami Vivekananda without speaking anything of Thakur Paramhansa Deva, is like the enactment of Hamlet with Hamlet's part left out.

Unlike the modern Scientists of the West, who seeking in vain to evolve the spiritual truths through material phenomenon, Sri Sri Ramkrishna Paramhansa Deva caught at once the true Aryan principle that spiritual knowledge can only be attained by the spirit and through the spirit, and therefore, he directed his whole heart of energy to acquire what is Brahmajnana in our Shastras till step after step, grade after grade, it was an accomplished fact to him and was then manifested in his bosom that world consuming fire, one spark of which has set ablaze a whole continent in the West.[১]

'এই ধরনের জনসমাবেশে স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা স্বভাবতঃই স্মৃতিপথে উদিত না হয়ে পারে না। স্বামীজীর কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর পরমহংসদেব সম্বন্ধে নীরব থাকা যেন হেমলেটের চরিত্র বাদ দিয়ে হেমলেট নাটকের অভিনয়ের মত।

জড় (বস্তু) জগতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রতিষ্ঠাকামী আধুনিক বিজ্ঞানবেত্তাদের ব্যতিক্রম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। অধ্যাত্ম জ্ঞান কেবলমাত্র আত্মিকশক্তিতে আত্মিকপ্রয়াসেই লভ্য। এই মৌলিক আর্য আদর্শ পরমহংসদেব অচিরেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই হেতু তিনি আমাদের শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে লাভ করে, তা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে তাঁর সর্বসত্তা দিয়ে বৈশ্বানরকে বুকে ধারণ করেছিলেন, যার মাত্র একটি জ্যোতির্ময় কণিকা পাশ্চাত্ত্য জগতের একটি গোটা মহাদেশকে প্রজ্জ্বলিত করেছে।'

এই সময় হরিদাসবাবু আসেন পটলডাঙ্গার আশ্রমগৃহে। তিনি প্রভুকে বলেন, 'আষাঢ় মাসে (১৩০১) একদিন সকালবেলা সেরেস্তায় মক্কেল নিয়ে বসে আছি! পথে জানালার ওদিকে এক ভিখারী এসে গানে টান দেয়, "নিতাই গৌর সীতানাথ, দয়া কর হে।" কানে এই কলিটুকু প্রবেশ করতেই আমি আর আমার মধ্যে রইলাম না। আপনা হতে অবিরাম প্রাণায়াম চলতে থাকে। আপনি আমার মধ্যে কি

---

১. হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট থেকে সংগৃহীত।

করেছেন? আমি নিতাই-গৌর রাধাকৃষ্ণ মানি না, অথচ এখন তাঁদের নাম শুনলে একেবারে বেসামাল হয়ে পড়ি।' গোসাঁইজী বলেন, 'আপনি মানুন আর নাই মানুন, ভগবানের ইচ্ছায় হাসবেন, কাঁদবেন, নাচবেন।' হরিদাসবাবু বলেন, আমার ইষ্টনামের সঙ্গে নিতাই-গৌর রাধাকৃষ্ণের কোন সংশ্রব নেই, তবে কেন তাঁদের নামে অমন হয়ে যাই?' গোসাঁই বলেন, 'আপনি মনে করেন ওঁরা আলাদা, কিন্তু তা নয়, সবই এক।' হরিদাসবাবু বলেন, 'আপনি কেন আমায় দীক্ষা দিলেন?' প্রভু বলেন, 'আমি নিজে ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ হয়েছি। আপনারাও ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলছেন। নিজের দুঃখের কথা ভেবেই আপনাদের দুঃখ নিবারণের জন্য যোগসাধন দিচ্ছি। নিজের রূপ-যৌবন-সম্পন্না স্ত্রীকে যেমন কেহ অন্যকে দিতে ইচ্ছা করে না, তদ্রূপ বহু সাধনের এই ধন কেহ অন্যকে দিতে চায় না, আপনাদের বড় ক্লেশ দেখেই দিয়েছি।' হরিদাসবাবু তদুত্তরে বলেন, 'ঠাকুর, আপনি কেন অমন কাজ করলেন? আপনি কি আর লোক পান নি? এই মহাপাষণ্ডকে কেন দীক্ষা দিয়েছেন? আপনি বেনাবনে মুক্তা ছড়িয়েছেন।' হরিদাসবাবু গুরুকে প্রশ্ন করেন এবার, 'গুরু বিনা কি ভগবানকে লাভ করা যায় না?' গোসাঁই বলেন, 'ভগবানকে লাভ করতে হলে সদ্গুরুর কৃপালাভ ভগবানের অব্যর্থ নিয়ম।' হরিদাসবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'সদ্গুরু কাকে বলে?' প্রভু বলেন, 'মনুষ্যদেহে ভগবানের আবেশ।' হরিদাসবাবু উকিল মানুষ। তিনি প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি সদ্গুরু?' গোস্বামী মহাশয় উত্তর দেন, 'হ্যাঁ।' এবার যেন নিশ্চিন্ত হয়ে হরিদাসবাবু জানতে চান, 'আপনি যে সাধন দিচ্ছেন, তাতে কি লাভ হয়?' প্রভু বলেন, 'এই পৃথিবীতে যত প্রকার সাধন-প্রণালী আছে, তাতে মানুষ যা কিছু লাভ করতে পারে, তৎসমুদয় লাভ হবে, তদতিরিক্ত প্রেম-ভক্তি লাভ হবে।'[১]

হরিদাসবাবু বোলপুরে ফিরে যান। তাঁর মনে হয়, পৃথিবীর সব লোক যদি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট সাধন পান, তাহলে জগতের প্রকৃত কল্যাণ হয়। পরলোকবাসী আত্মার নির্দেশে হরিদাসবাবুর সদ্গুরু লাভ হয়েছে। কিন্তু যোগাভ্যাস হল কোথায়? যোগের লক্ষণাদি অবশ্য যোগসাধন না করা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে!

এই আশ্রমে গোস্বামীপ্রভুর শিষ্যা ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী ক্ষীরোদাসুন্দরী দাসী গুরুকে প্রণাম করে মাথা তুলে দেখেন, প্রভুর আসনে ষড়ভুজরূপে মহাপ্রভু! বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে সম্বিত হারিয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। বহু চেষ্টায় তাঁর চৈতন্য সম্পাদন হয়।

গোসাঁইজীর মাতুল বেণীপ্রসাদ ওরফে বেণীমাধব বাগচী জোয়ারদার মহাশয় এই আশ্রমে এসে ওঠেন। ভাগ্নে মামাকে সাদর আপ্যায়ন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জোয়ারদার মহাশয় কিন্তু ভাগ্নের নিকট সাধনপ্রার্থী হন। তিনি গোসাঁইকে বলেন, 'বাবা, সময় তো আমার ফুরিয়ে এল! তুমি অগতির গতি! কত লোককেই তো উদ্ধার করছ। আমারও একটা বিহিত কর।' প্রভু তাঁকে অভয়-বাণী শোনান। তিনি তাঁকে বলেন, 'ভয় কি, মামা? আমি আপনার সব ভার নিলাম।' তাঁর নির্ভয় আশ্বাসবাক্য শুনে, জোয়ারদার মহাশয়ের অন্তর প্রশান্তিতে ভরে উঠে। তিনি

---

[১] হরিদাস বসু-প্রণীত 'মহাপাতকীর জীবনে সদ্গুরুর লীলা' গ্রন্থাবলম্বনে, ২য় সংস্করণ, পত্রাঙ্ক ১১২-১২২।

সবিনয়ে ভাগ্নের কাছে এবার আবেদন করেন, 'বাবা, আমার একটি অনুরোধ রাখবে? তুমি আর কখনও আমাকে প্রণাম কর না। তোমার প্রণামে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি।' গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'তা কি কখন হয়? আপনি আমার পূজনীয়। আপনার চরণে আমার শত প্রণাম।'

পটলডাঙ্গায় একদিন গোসাঁইজীর নিকট শ্যামসুন্দর প্রকাশিত হয়ে বলেন, তাঁর হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। ঐদিন শান্তিপুরে পাকশালে তাঁকে নিয়ে যাবার সময় পূজারীর অসাবধানতায় শ্যামসুন্দরের হাত ফেটে যায়। কিন্তু পূজারী তা গোপন করেন। গোসাঁইর কাছে প্রকট হয়ে শ্যামসুন্দর ঘটনাটি বিবৃত করেন। কালক্ষেপ না করে প্রভু তখনই কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে করে রাণাঘাট রওনা হন। রাণাঘাট থেকে হেঁটে মধ্যরাত্রে তিনি শান্তিপুর পেঁৗছেন। পরদিন ভোরে মন্দির খোলা হলে, পুরোহিত তাঁর ত্রুটি স্বীকার করে কাঁদতে থাকেন। প্রভুর নির্দেশে কলিকাতা থেকে কষ্টিপাথর সংগ্রহ করা হয়। তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কৃষ্ণনগরের ভাস্কর দিয়ে হৃদ্‌বিহারী শ্যামসুন্দরের মূর্তি গড়িয়ে আনেন। অগ্রহায়ণে (১৩০১) একটি শুভদিন দেখে যথাশাস্ত্র শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রভুর খুড়িমা রাঙাঠাকরুণের মনে কিছুতেই প্রবোধ মানে না। পূর্বের বিগ্রহ তো কেবল প্রস্তর মূর্তি ছিলেন না। কতভাবে তিনি তাঁদের কৃপা করেছেন। গোসাঁইজী তাঁকে মহাভিষেকের সময় মন্দিরে থাকতে অনুরোধ করেন। ভাবাবিষ্ট প্রভু শ্যামসুন্দরের নির্দিষ্ট স্থানে শ্রীমতী রাধারানীর ডান পাশে নূতন মূর্তি স্থাপন করলেন। শ্যামসুন্দর-রাধারানী অপরূপ শোভা ধারণ করলেন। রাঙাঠাকরুণ কেঁদে আকুল হয়ে চৈতন্য হারিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। সম্বিত ফিরে এলে গোসাঁইকে তিনি বলেন, 'হ্যাঁরে বিজয়, আমাদের সেই শ্যামসুন্দরকেই যে আমি প্রত্যক্ষ করলাম।' প্রভু বলেন, 'সেই শ্যামসুন্দরই তো আছেন। কেবল শাস্ত্রমত নবকলেবর করা হল।' অঙ্গহানির জন্য পূর্বের শ্যামসুন্দর মূর্তি শান্তিপুরের গঙ্গায় বিসর্জন করা হল। যে প্রস্তরখণ্ডের উপর শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হলেন, তাতে মর্যাদাপালক গোস্বামীপ্রভু স্বহস্তে অগ্রজ জ্ঞাতিদাদা কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নাম লিখে তার নীচে নিজের নাম লিখলেন যা এখনও রয়েছে।

নূতন শ্যামসুন্দর বিগ্রহ দেবকীনন্দন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীমতীর বিগ্রহের পাশে অভিনব ও অভূতপূর্ব মনে হয়। ভক্তদের প্রাণ-মন জুড়িয়ে যায়। বয়োবৃদ্ধরা যাঁদের সঙ্গে গোসাঁইর ঠাট্টার সম্পর্ক, কৌতুক করে মন্তব্য করেন, 'হবে না? বিজয় ব্রাহ্ম হয়েছিল কিনা, তাই রাধারানীর আবার বিয়ে দিয়েছে। শ্যামসুন্দর অমন না হলে রাধারানীর মন উঠবে কেন?'

হরিদাসবাবু মাঘ মাসে (১৩০১) সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাটীতে এসে শুনেন, নূতন মূর্তি গড়িয়ে এনে গোস্বামীপ্রভুর হাতে দিতেই শ্যামসুন্দর হেসে উঠেন। হরিদাসবাবুর বিশ্বাস হয় না। তিনি গোসাঁইজীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'শ্যামসুন্দরের আবার প্রতিষ্ঠা কি করে হল?' প্রভু উত্তর করেন, 'প্রতিষ্ঠা আবার কি? মূর্তি এলে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি হেসে উঠেন। তিনি সব ঘটেই রয়েছেন। তাঁর ইচ্ছায় কি না হয়? শ্রদ্ধায় তিনি জাগ্রত হয়ে উঠেন।'

যোগসাধনে অনীহা সত্ত্বেও সনাতন ধর্মের প্রতি হরিদাসবাবুর দিন দিন অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তথাপি ব্রহ্মোপাসনার প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল।

তজ্জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনে যেতেন আর ওখান থেকে ফিরে এলেই তাঁর জ্বর হত। এবার গুরুদর্শনে এসে (মাঘ মাস, ১৩০১) তিনি গোস্বামীপ্রভুকে অকপটে এসব খুলে বললেন। হরিদাসবাবুর গ্রন্থে তাঁদের কথোপকথন যেমন আছে তা আনুপূর্বিক নীচে বিবৃত হল—

আমি—এখন আমার শারীরিক অবস্থা মন্দ নহে; কিন্তু সময়ে সময়ে বিশেষ উপাসনায় আমি শান্তিনিকেতনে গিয়া থাকি। শান্তিনিকেতনে গেলেই আমার জ্বরভাব হয়। শান্তিনিকেতন কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর স্থান, অসুখের কোন কারণ নাই, কিন্তু আমার ঐ স্থান সহ্য হইতেছে না।

গোঁসাই—সেখানে কিছু খাও নাকি?

আমি—প্রাতঃকালে চেয়ারে বসিয়া টেবিলে একটু চা খাই।

গোঁসাই—ছি, ছি, ছি, উচ্ছিষ্ট খাওয়া তোমাদের নিষেধ, টেবিলে চা খাও, এ কেমন কথা?

আমি—চায়ের পেয়ালা ঠেকাঠেকি হয় না, পরের উচ্ছিষ্ট চা, বা কোন জিনিস খাই না।

গোঁসাই—উচ্ছিষ্ট আর কাহাকে বলে? ঠাকুরবাবুদের টেবিল উচ্ছিষ্ট, চেয়ার উচ্ছিষ্ট, উঁহাদের বিছানাপত্র আসবাব সমস্তই উচ্ছিষ্ট। উচ্ছিষ্ট চেয়ারে বসিয়া উচ্ছিষ্ট টেবিলে চা খাইলে উচ্ছিষ্ট খাওয়া হইল না? এই উচ্ছিষ্ট খাওয়াতেই তোমার জ্বর হয়।

আমি—পৃথিবীশুদ্ধ লোক তো উচ্ছিষ্ট খাইতেছে, আমিও তো কখন উচ্ছিষ্টের বাছ-বিচার করিয়া চলি নাই; উচ্ছিষ্ট খাওয়ার দরুণ কাহারও তো কখন জ্বর হইতে দেখি নাই বা শুনি নাই। উচ্ছিষ্ট খাইলে জ্বর হয়, এ আবার কেমন কথা?

গোঁসাই—সাধন পাইয়াছ, এখন আর উচ্ছিষ্ট খাওয়া সহ্য হইবে না, ভগবানের নামে গুরুশক্তির বলে প্রতিনিয়ত তোমাদের দেহের রক্ত ও দেহের প্রত্যেক পরমাণু বিশুদ্ধ হইতেছে; তোমাদের দেহের বিশুদ্ধ রক্তের সহিত অপবিত্র আহারজনিত দূষিত রক্ত আর মিশিবে না। উচ্ছিষ্ট আহার করিবামাত্র বমি হইয়া যাইবে, অথবা পেটের পীড়া উপস্থিত হইবে। যদি তাহা না হইয়া পরিপাক হইয়া আহার্য্য বস্তু রক্তে পরিণত হয়, তাহা হইলে জ্বর হইবে। যতদিন এই অপবিত্র রক্ত জ্বর দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া না যাইবে, ততদিন শরীর সুস্থ হইবে না।

আমি—গুরুভাইগণের মধ্যে কেহ কেহ উচ্ছিষ্টের বিচার করিয়া চলেন না, কেহ কেহ মাংস পর্যন্ত আহার করিয়া থাকেন; তাঁহাদের তো কোন অনিষ্ট হইতে দেখি না।

গোঁসাই—গুরুশক্তি বলে যাহাদের শরীরের রক্ত বিশুদ্ধ হয় নাই, তাহাদের উচ্ছিষ্ট আহার সহ্য পায়, কিন্তু তাহাতে গুরুশক্তি ম্লান হইয়া যায়। গুরুশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে পায় না; প্রাণে শুষ্কতা আইসে। কাহারও কাহারও খুব অনিষ্ট হয়, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। আমি এইজন্য পরিবারবর্গকে সর্ব্বদাই সাবধান করিতাম, তথাপি অভ্যাস-দোষে তাঁহারা সময়ে সময়ে আমাকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতেন; উচ্ছিষ্ট উদরস্থ হইবামাত্র আমার বমি হইত ও মুখ দিয়া রক্ত উঠিত। আমি ইহার জন্য পরিবারবর্গকে সময় সময় বড়ই তিরস্কার করিতাম।

হরিদাসবাবু তারপর লিখেছেন, 'গোস্বামী মহাশয়ের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অবধি আর আমি শান্তিনিকেতনে কোন বস্তু আহার করিতাম না। তথায়

খুব সাবধানে থাকিতাম। তথায় গেলে পূর্বে যেরূপ শরীরে জ্বরভাব হইত এখন হইতে আর সেরূপ জ্বরভাব হইত না।"[১]

হরিদাসবাবুর ইচ্ছা হয়, শান্তিপুরে যেয়ে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করে আসেন। গুরুর নিকট তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করতেই তিনি বলেন, 'বেশ তো, এস গিয়ে। নবদ্বীপেও তিন দিন তিনরাত্রি থেকে বিগ্রহাদি দর্শন করা ভাল।' হরিদাসবাবু পণ্ডিত মহাশয়কে নিয়ে শান্তিপুর রওনা হন। শান্তিপুরে এককালে গোস্বামীপ্রভু দোতলায় হলঘরে থাকতেন। ওঁরা দেখেন দালান জীর্ণশীর্ণ, আস্তর খসে পড়ছে। কিন্তু ঐ ঘরটিতে প্রবেশ করামাত্র উভয়েই বেসামাল হয়ে পড়েন। কবে কোন্‌কালে গোসাঁই ঐ ঘরে ছিলেন! অথচ সেই শক্তির খেলা তাঁরা দুজনেই সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করলেন।

আশাবতীর উপাখ্যানে আছে—

'যোগী।.........শ্রীচৈতন্যের ন্যায় অনেক মহাত্মা এই গয়াধামে ধর্মজীবন লাভ করিয়াছেন। ইহা সিদ্ধস্থান। সেই সিদ্ধপুরুষগণের শ্বাস-প্রশ্বাস এখনও গয়ায় বিশুদ্ধ পার্বতীয় সমীরণে প্রবাহিত হইতেছে।

আশাবতী। সে কি প্রভো! শ্বাস-প্রশ্বাস কি এক স্থানে বসিয়া থাকে? ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলাম না।

যোগী। মৃগনাভি কোন গৃহে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া কিছুদিন পরে তাহা স্থানান্তরিত করিলেও বিশ-পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত যখনই বাক্স খুলিবে, তখনই গন্ধ পাইবে ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? বিশ্বপতি জগদীশ্বরের কি যে মহিমা, কি যে কৌশল, তাহা কে বলিতে পারে?...মা আশাবতি! ভগবানের অনন্ত মহিমা, মনুষ্য ক্ষুদ্র কীট। ক্ষুদ্র পুঁটি মাছ কি মহাসমুদ্র সন্তরণ দিয়া সীমা করিতে পারে? না, কখনই না। মহাসমুদ্র অপেক্ষাও জগদীশ্বর অনন্ত। কে তাঁহার মহিমা জানিতে পারে? তিনি কৃপা করিয়া যতটুকু জানান, ততটুকু জানিতে পারে।

ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যেখানে কোন মহাত্মা তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সহস্র বৎসর পরেও যদি কেহ সেইরূপ তপস্যার ভাবে শুদ্ধ মনে সেই স্থানে উপবেশন করেন, সেই মুহূর্তেই সিদ্ধপুরুষের কুণ্ডলিনী শক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া অভিভূত করিবে, সন্দেহ নাই।'

গোস্বামীপ্রভুও বলেছেন, 'যে স্থানে কোন প্রবল শক্তিশালী মহাত্মা কিছুকাল সাধনভজন করেন, সেখানে তাঁর শক্তির ক্রিয়া বহুকাল থেকে যায়। কোন শ্রদ্ধাবান শক্তিশালী লোক তথায় উপস্থিত হলেই, সেই শক্তির ক্রিয়া তিনি উপলব্ধি করবেন।'

শান্তিপুরে মধ্যাহ্ন-ভোগের পূর্বে শ্যামসুন্দরকে পাকশালে নেবার সময়, তাঁর পরিধেয় পীতবসনের অংশ চোখে পড়তেই হরিদাসবাবুর প্রাণায়ামের গর্জন শুরু হয়। অশ্রু, কম্প পুলকাদি প্রকাশ পায় তাঁর মধ্যে। হরিদাসবাবুর নিজের লেখা বিবরণ সন্নিবেশিত করা হল, 'মধ্যাহ্নে ভোগ প্রস্তুত হইলে শ্যামসুন্দরকে শ্রীমন্দির হইতে বাহির করিয়া ভোগ-মন্দিরে (সেই কালীপড়া ঝুলপূর্ণ রান্নাঘরে) আনা হইল। মন্দির হইতে শ্যামসুন্দরকে বাহির করায় তাঁহার পরিধেয় পীতবসনের

---

১. হরিদাস বসু-প্রণীত 'মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা' গ্রন্থাবলম্বনে, ২য় সংস্করণ, পত্রাঙ্ক ১৫৮-১৬০।

একটু ফুঁপীমাত্র আমার নয়নগোচর হইল, শ্যামসুন্দর নয়নগোচর না হইতেই এই ফুঁপীটুকু দেখিয়াই আমি একেবারে অসামাল হইয়া পড়িলাম। গুরুশক্তির প্রবল ক্রিয়া আরম্ভ হইল, ভীষণ প্রাণায়াম উপস্থিত, সর্বাঙ্গ অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, বিবিধ অঙ্গচেষ্টা আরম্ভ হইল, প্রাণায়ামের গর্জন হইতে লাগিল, আমি আর আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। গোস্বামী মহাশয়ের জ্ঞাতিগণ, স্ত্রী-পুরুষ অনেকে সমবেত হইয়া এই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

'ইতিমধ্যে শ্যামসুন্দর আসিয়া ভোগে বসিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রাণের মধ্যে অমৃতের প্রবাহ বহিতে লাগিল। শরীর ও প্রাণের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়া হইতে লাগিল, তাহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। আমি কেবল দ্রষ্টাস্বরূপে দেখিতে ও প্রাণের মধ্যে ভোগ করিতে লাগিলাম। শ্যামসুন্দর প্রস্তরমূর্তি। ইহাতে যে ভগবত্তা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও আমি বিশ্বাস করিতাম না। ইহা তো একখন্ড প্রস্তরমাত্র, ইহাই আমার ধারণা ছিল; তথাপি এই মূর্তি দর্শন দূরে থাকুক, অঙ্গের বস্ত্রের একটু ফুঁপী দেখিয়া আমার এই অবস্থা হইল।'[1]

শান্তিপুরে তিন দিন থেকে পণ্ডিত মহাশয় ও হরিদাস বসু মহাশয় তিন দিন তিন রাত্রি বাস করার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়েছিলেন। গোসাঁইজী হরিদাসবাবুকে পূর্বে ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করতে বলেছিলেন। তিনিও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখে, হরিদাসবাবু তাঁর জন্মভূমি কুলীনগ্রামের বর্ণনা দেখে বিস্মিত হন। অথচ গৌরসুন্দর যে কুলীনগ্রামে কখন গিয়েছেন, তার কোথাও উল্লেখ নেই। হরিদাস-বাবু লিখেছেন, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই পাঠ দেখিয়া আমার মনে বড়ই একটা খট্‌কা বাধিল। যে ব্যক্তি কখন কুলীনগ্রামে গেলেন না, কুলীনগ্রামের লোকের চরিত্র দেখিলেন না, সঙ্গ করিলেন না, সেই ব্যক্তি কেমন করিয়া কুলীনগ্রাম সম্বন্ধে এত উচ্চ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন? এই খট্‌কা নিবারণ করার জন্য আমি একদিন গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—

আমি—মহাশয়! শ্রীমন্মহাপ্রভু কি কখনও কুলীনগ্রাম গিয়াছিলেন?

গোঁসাই—হ্যাঁ, তিনি গিয়াছিলেন।

আমি—কখন গিয়াছিলেন?

গোঁসাই—সন্ন্যাস গ্রহণের পর, রাঢ় দেশ ভ্রমণকালে।

আমি—কোন গ্রন্থে তো ইহার উল্লেখ দেখি না?

গোঁসাই—সব কথা গ্রন্থে থাকে না।[2]

হরিদাসবাবুর বিশ্বাস হল না। তিনি মনে করলেন, গোসাঁই কারও কাছে শুনে থাকবেন এবং তথ্য নির্ণয় না করেই ঐরূপ ধারণা করেছেন। কিন্তু এবার শ্রীধাম নবদ্বীপ গিয়ে ঘটনাচক্রে তাঁর মনের আমূল পরিবর্তন হল। একদিন নবদ্বীপের এক আখড়ায় শাস্ত্রপাঠ হচ্ছে জেনে, প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই উভয়ে শুনতে পান যে, পাঠক মহাশয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, 'কুলীনগ্রামে মহাপ্রভু এসেছেন, তাঁকে দর্শন করার জন্য গ্রামবাসীগণ ছুটে আসছেন।' হরিদাসবাবু লিখেছেন, 'আমি পাঠক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—

---

[1] হরিদাস বসু-প্রণীত 'মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা', ২য় সং, পৃ ১৭০-১৭১।

[2] ঐ ঐ ঐ ঐ পৃ ১৬৪।

আমি—গ্রন্থখানির নাম কি?

পাঠক—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

আমি—আমি শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়াছি, তাহাতে তো এরূপ পাঠ নাই!

পাঠক—শ্রীচৈতন্যভাগবতের অনেক অংশ লোপ পাইয়াছে। এ অতি প্রাচীন গ্রন্থ; ছাপার পুঁথিতে সমস্ত নাই।[১]

কলিকাতা ফিরে গুরুর কাছে অকপটে তাঁরা শান্তিপুর ও নবদ্বীপের সব অভিজ্ঞতা নিবেদন করলেন। ভক্তি দ্বারা ইট, কাঠ, পাথরেও যে ভগবত্তা সংস্থাপিত হয়, এবার বসু মহাশয়ের তা বিশ্বাস হল। আরও বিশ্বাস হল গোস্বামীপ্রভু ত্রিকালজ্ঞ। তিনি কখনও অনৃত বলেন না।' হরিদাসবাবু মাঘ মাসেই বোলপুর ফিরে যান। পণ্ডিত মহাশয় প্রভুর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন যাবেন ব'লে আশ্রমে থেকে যান।

৮ ফাল্গুন, ১৩০১; ভোরবেলা গোসাঁইজী যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়কে ডেকে বলেন, 'আজই আমরা শ্রীবৃন্দাবন রওনা হব। তোমরা সব গুছিয়ে নাও।' যোগজীবন পিতাকে সশ্রদ্ধভাবে বলেন, 'হাতে যে মোটেই টাকাকড়ি নেই, বাবা। আজ কি করে সম্ভব হবে?' প্রভু নিরুদ্বেগে তাঁকে আবার বলেন, 'গুরুজী আদেশ করেছেন আজই যেতে। এর উপর তো আর কোন কথা উঠে না। আজই যাব। টিকেটের ব্যবস্থা না হলে হেঁটে যাব। তোমরা সকলে প্রস্তুত হও।' প্রভুর আদেশ শুনে যোগজীবন গোসাঁই নিরবলম্ব চিত্তে তাঁর ঘরে গেলেন।

ঠিক ঐ সময় মেদিনীপুরের ডাঃ ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয় এলেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের আশ্রমবাটীতে। মিত্র মহাশয় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে গোস্বামী মহাশয়ের সতীর্থ ছিলেন। গোসাঁইজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই তিনি বলেন, 'তোমার আশ্রমের জন্য কিছু টাকা জমিয়েছিলাম। এবার কলিকাতা আসার সময় মনে পড়ায় টাকাগুলি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।' এই বলে পাঁচশত টাকার একটি তোড়া তিনি প্রভুর আসনের সম্মুখে রাখেন।[২] গোস্বামীপ্রভু উপস্থিত শিষ্যদের বলেন, 'একবার যোগজীবনকে দেখে যেতে বল।'

ঐদিনই গোসাঁইজী শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। সঙ্গে বহু শিষ্য-শিষ্যা। শান্তিসুধা দেবী পূর্বে আর কখন শ্রীবৃন্দাবন যান নি। তাঁর তৃতীয় পুত্রের বয়স তখন এক মাস। গোসাঁই তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন, 'ভয় নাই, শান্তি, শীতে তোর ছেলের অনিষ্ট হবে না।' মুক্তকেশী দেবী, যোগজীবন গোস্বামী, জগদ্বন্ধু মৈত্র, বিধু ঘোষ, সরলনাথ গুহ, শ্রীধর ঘোষ, পণ্ডিত মহাশয়, বেণীমাধব দে, সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে হন সহযাত্রী। কলিকাতার ভক্তেরা সব খবর পেয়ে এসেছেন প্রভুকে দর্শন করতে। যাত্রার পূর্বে গোসাঁই তাঁদের বলেন, 'আমাকে আপনারা আশীর্বাদ করুন, শ্রীমতীর কৃপা যেন লাভ করি!' সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে বাড়ীর মেথরকে দেখে, তাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'আমাকে আশীর্বাদ কর, আমি যেন রাধারানীর দর্শন পাই!' গোস্বামীপ্রভুর এই দৈন্য দেখে 'বড়ুয়া' জমাদার ও শিষ্যেরা কান্নায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেন। সকলেই প্রভুর ভাবী-বিরহে অভিভূত হয়ে পড়েন।

---

[১] হরিদাস বসু-প্রণীত 'মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা', ২য় সং, পৃ ১৭৪।

[২] 'মন্দির' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

কানপুরে মন্মথ মুখোপাধ্যায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে গোসাঁই তাঁর বাসায় কয়েকদিন থাকেন। মন্মথবাবুর সহধর্মিণী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সাধন হয়। শ্রীবৃন্দাবনের গাড়িতে উঠে প্রভু শিষ্যদের বলেন, ধামে পৌঁছে সকলেরই এই কয়েকটি কথা মেনে চললে ভাল হয়'—

১. অনিবেদিত বস্তু আহার না করে তুলসী দিয়ে নিবেদন করা;
২. কোন ব্রজবাসীকে হীন মনে না করা; তাঁদের কখনও কোন দোষ দর্শন না করা।
৩. ব্রজমায়ীদের প্রতি কটাক্ষ করে কোন কথা না বলা।
৪. প্রত্যহ মন্দিরে গিয়ে কোন না কোন বিগ্রহ দর্শন করা।

বিধুবাবু বলেন, 'গুরু সঙ্গে রয়েছেন, আবার মন্দিরে গিয়ে নিত্য বিগ্রহ দর্শনের কি সার্থকতা? কবীর বলেছেন, গুরু ও গোবিন্দ সম্মুখে উপস্থিত হলে, গুরুকেই প্রথম প্রণাম করতে হয়, কারণ তিনিই তো গোবিন্দজীকে চিনিয়েছেন।' গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'কবীর তো ঠিকই বলেছেন। তিনি তো বিগ্রহকে দর্শন করতে বারণ করেন নাই। বিধু, এ কথা জেন যে, ভগবৎ-তত্ত্ব গুরুতত্ত্বেরই অন্তর্গত। গুরুভক্তি লাভ হলে, ভগবান ও তাঁর বিগ্রহের প্রতি ভক্তি না হয়ে পারে না। কেউ যদি বলেন কখনও, তাঁর গুরুভক্তি লাভ হয়েছে, অথচ তিনি বিগ্রহাদি মানেন না, তাহলে এই বুঝা যাবে, তাঁর মোটেই গুরুভক্তি লাভ হয় নাই।'

গাড়ি মথুরা স্টেশনে পৌঁছলে মথুরার পাণ্ডা লুচিপুরী চৌবে গোস্বামী মহাশয়কে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। তিনি কয়েকটি টাঙ্গা ভাড়া করে দিলে শিষ্যদের নিয়ে প্রভু তাতে উঠে বসেন। মথুরা থেকে শ্রীবৃন্দাবনের ব্যবধান ছয় মাইল। শ্রীবৃন্দাবনের উপকণ্ঠে পৌঁছামাত্র গোসাঁই টাঙ্গা থেকে নেমে, রজে লুটিয়ে পড়েন। ভাবে বিভোর হয়ে তিনি টলতে টলতে চলতে থাকেন। মাসখানেক একে একে চারটি কুঞ্জে থেকে অবশেষে লুইবাজারে তীর্থমণিকুঞ্জে গোস্বামীপ্রভু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ছয় মাস ছিলেন। প্রথমে কালাবাবুর কুঞ্জে তিনি উঠেছিলেন, ওখানে অসুবিধা হওয়ায় কয়েকদিন পরই তাঁরা উমেদ সিংহের কুঞ্জে গিয়ে উঠেন। এখানেও বেশি দিন থাকা সম্ভব হয় নি। কারণ কুঞ্জের অধিকারী দীর্ঘদিনের জন্য কুঞ্জ ভাড়া দিতে অস্বীকৃত হলেন। এখান থেকে তাঁরা নাভাকুঞ্জে গিয়ে উঠেন। ওখানে গিয়ে জানতে পারেন, কুঞ্জের কামদার ডাকাত দলের সর্দার। বিধুবাবু একখানি বাঁশের লাঠি নিয়ে সারা রাত জাগা থাকেন। সকলেই বিনিদ্র-রজনী যাপন করেন। একরাত্রি ওখানে থেকে, পরদিন নরহরিদাস বাবাজীর কুঞ্জে তাঁরা চলে যান। এখানে কয়েকদিন থেকে পাশে তীর্থমণি কুঞ্জে তাঁরা উঠে যান। নবকুমার বিশ্বাস পূর্ব হতেই শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। পণ্ডিত ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাধাকুণ্ডে ছিলেন। তাঁরা উভয়ে এসে যোগ দেন। শিষ্য ভারত পণ্ডিত মহাশয়ের উপর গোস্বামীপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন-আশ্রম পরিচালনার ভার দেন। তিনি অতি পরিপাটিভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন। তাঁর বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার তারপাশায়। ঢাকা নর্মাল স্কুলে ত্রিশ বছর অধ্যাপনা করে তিনি পেন্সন নিয়ে রাধাকুণ্ডে বাস করতেন। তিনি অতিশয় নিরীহপ্রকৃতি, সংযমী ও নিরভিমান ভক্ত ছিলেন। অপ্রাকৃত লীলা দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। রাধাগোবিন্দের যুগলমাধুরী তিনি তদ্‌গতচিত্তে সম্ভোগ করতেন। বরিশালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল সতীর্থ গোরাচাঁদ দাশ পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁর দর্শন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঐ বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ

ঐরূপ ভাব প্রকাশ করেন। তখন বিচক্ষণ ব্যবহারজীবী, রাধারানীর রূপের বিকৃত বর্ণনা শুরু করেন। তা শুনে গোরাচাঁদবাবুর ভুল সংশোধনের জন্য পণ্ডিত মহাশয় শ্রীমতীর রূপ-বেশ-কেশ-হাস্য-লাস্যের বর্ণনা করতে থাকেন। হঠাৎ তাঁর হুঁশ হয়, গোরাচাঁদবাবু তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনের নিগূঢ় কথাসকল কৌশল করে জেনে নিচ্ছেন। তখন তিনি একেবারে নির্বাক হয়ে পড়েন।[১]

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই সময় প্রত্যহ দু-তিন শ টাকার মানি-অর্ডার আসত। তিনি মুক্তহস্তে তা দান করে দিতেন। একদিন খবর পাওয়া গেল, ডাকাতরা রাত্রিতে লুটপাট করতে তাঁর কুঞ্জে আসবে। গোসাঁই শিষ্যদের বলেন, 'ডাকাত এলে ওদের বাধা দিও না। এরা পোস্টাফিস থেকে মানি-অর্ডারের সন্ধান পায়।' ঐ রাত্রে ডাকাতেরা ভুল করে পাশের কুঞ্জে চড়াও করে। পরদিন মথুরা থেকে ফৌজ এসে শ্রীবৃন্দাবনের নিরাপত্তা আনে।

তীর্থমণির কুঞ্জে একদিন এক ব্রজবাসী প্রভুকে গোবিন্দজীর অন্নভোগের প্রসাদ এনে দেন। তখন মেথর-রমণী পায়খানা পরিষ্কার করতে এসেছিল। তার কাজ শেষ করে যখন সে ফিরে যাচ্ছিল, গোস্বামী মহাশয় তাকে ডাকিয়ে এনে বলেন, 'শৈশবে বিষ্ঠা পরিষ্কার করতেন মা, এখন সেই কাজ তুমি করছ। তোমাকে, মা, আমি আর কি দেব? আমার কাছে গোবিন্দজীর প্রসাদ আছে, তাই তুমি নাও।' গোস্বামীপ্রভুর এই দরদভরা কথা শুনে, সে কেঁদে বলে, 'বাবা, অমন করে কেউ তো আমাদের কখনও বলেন না।'

এবার শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামীপ্রভু প্রায়ই অপরাহ্নে কেশীঘাট, ধীরসমীর, জ্ঞান-গোধূলি প্রভৃতি স্থানে যেতেন। জ্ঞান-গোধূলিতে কোন কোন দিন ঘণ্টা দুই থাকতেন। তাঁর শ্রীমুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করার জন্য ওখানে ভক্ত-সমাবেশ হত।

একটি ষোল-সতের বছরের তরুণ (১৭ আষাঢ়, ১৩০২) সন্ধ্যায় তীর্থমণি-কুঞ্জে পোঁছে। প্রভুকে প্রণাম করতেই তিনি বলেন, 'সারদা, শীগ্‌গির একে খেতে দাও। পাঁচ-ছদিন ধরে সে অভুক্ত।' সূতিকাগারে এরই ষষ্ঠীব্রতের দিন তার মা স্বপ্নে দেখেন—লালপেড়ে শাড়িপরা, সিঁথিতে সিঁদুর একটি রমণী মার কোল থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মায়ের আর্তনাদে দেবাদিদেব মহাদেব প্রকাশিত হয়ে সেই শিষ্টাচারহীনা নারীকে দণ্ড দিয়ে প্রহার করতেই মায়ের বুকে ছেলেটিকে ফেলে সে পালিয়ে যায়। স্বপ্নটি মার অন্তরে দাগ কাটে। মার মনে প্রশ্ন জাগে, জটাজুটধারী সৌম্যমূর্তি শিবের হাতে ত্রিশূলের পরিবর্তে দণ্ড কেন?

ফরিদপুর জেলায় খালিয়ার জমিদার চাটুয্যেবাড়ীতে ১ ভাদ্র, ১২৮৫ বঙ্গাব্দে এই স্বপ্নটি এক প্রসূতি দেখেছিলেন। শিশুটির নাম রাখা হয় কিরণচাঁদ। বড় হয়ে বরিশাল স্কুলে সে পড়াশুনা করে। ঢাকার একটি ছেলে, নাম মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তার অন্তরঙ্গ সহপাঠী। মাখন রাখালবাবুর বাড়ীতে প্রভুর কাছ থেকে সাধন পেয়েছিল। কিরণ মাখনের কাছ থেকে গোসাঁইজীর একখানা ছবি একদিন বাড়ীতে নিয়ে আসে। ছবিখানা দেখে কিরণচাঁদের মা হন বিস্ময়াবিষ্ট। কিরণের মা আঁতুড়ে শিবকে যেরূপে দর্শন করেছিলেন, হুবহু সেই শিবের আলোকচিত্র! ইনিই কিরণের জীবনদাতা। মার সম্মতি পেয়ে মাখনের সঙ্গে গেণ্ডেরিয়া গিয়ে কিরণচাঁদ প্রভুর কাছে সাধন প্রার্থনা করেন। গোসাঁই তাঁকে বলেন,

---

[১] গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত।

'এখন সময় হয় নাই।' কয়েক বছর কেটে যায়। আষাঢ় (১৩০২) গোসাঁইজী সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে আছেন জেনে, কিরণ কলিকাতায় আসেন। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাসায় খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পান, তিন-চার মাস পূর্বে গোস্বামীপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন রওনা হয়ে গেছেন। কিরণচাঁদের মাথায় যেন বাজ পড়ে। তাঁর আর তর সয় না। মনে মনে তিনি ভাবেন, 'এ জীবন রেখে আর কি হবে? আমার ভাগ্যে আর গোসাঁইর সাধন নেই!' রাত্রির অন্ধকারে জগন্নাথ ঘাটে গিয়ে গঙ্গায় নামেন তিনি আত্মবিসর্জন করতে। গলাজলে নেমে তিনি শুনেন, 'কিরণ, তুমি এ কি করছ? এখন তোমার সময় হয়েছে। তুমি শ্রীবৃন্দাবনে এস, তোমার সাধন হবে।' গ্যাসের আলোয় কিরণ দেখতে পান, প্রভু তীরে দাঁড়িয়ে, হাতে দণ্ডকমণ্ডলু। উপরে উঠে তাঁকে না দেখে, শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে তিনি হাঁটতে থাকেন। পরদিন প্রভাতে বালীতে পরিবারের এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি মথুরার টিকেট কিনে তাঁকে ট্রেনে উঠিয়ে দেন। মথুরা নেমে খেয়াল হয়, গোস্বামীপ্রভুর ঠিকানা তো জানা নেই। কিন্তু গোসাঁই পূর্ব থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। প্রভুর মথুরার পান্ডা, লুচিপুরী চোবে স্টেশনে তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'গোসাঁইর কাছে যাবে, বুঝি!' এক্কা ঠিক করে, শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামীপ্রভুর ঠিকানা বলে, তিনি ভাড়া চুকিয়ে দেন। ঐদিনই (১৭ আষাঢ়, ১৩০২) রাত্রি একটায় কিরণচাঁদের সাধন হয়।

গোসাঁই মুক্তকেশী দেবীকে পরের দিন বলেন, 'গতরাত্রে যে ছেলেটির সাধন হল, তাকে নাম করার জন্য একটু নির্জন জায়গার ব্যবস্থা করে দিলে ভাল হয়।' খালি ঘর আর কোথায়? তিনি তাঁকে ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে একটা জায়গা খালি করে, বাইরে থেকে শিকল তুলে দেন। কিরণচাঁদ তন্ময় হয়ে নাম করেন। হঠাৎ শিকল খোলার আওয়াজ কানে আসতেই তিনি চেয়ে দেখেন, শ্রীধরবাবু ঘরে প্রবেশ করে, রসগোল্লার হাঁড়ি থেকে একটির পর একটি তাঁর নিজের মুখে ফেলছেন; কিরণচাঁদের মুখের ভিতরও কয়েকটি ফেলেন। তারপর বাইরে থেকে শিকল তুলে তিনি চলে যান। খানিকবাদে মুক্তকেশী দেবী ঘরে ঢুকে দেখেন, হাঁড়ি শূন্য। কিরণকে জিজ্ঞাসা করেন, 'রসগোল্লা গেল কোথায়?' কিরণ বলেন, 'কি জানি! আমি তো চোখ বুজে নাম করছিলাম।' বুড়াঠাকরুণ বলেন, 'আ, আমার কপাল! তুমিও ওঁদের সঙ্গে এক হয়ে গেলে!'[১]

নবকুমারবাবু কেশীঘাটের উৎকৃষ্ট খরমুজা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন প্রচুর পরিমাণে। গ্রীষ্মের সময় এ এক অপূর্ব খাদ্য—ভিতর যেন শীতল হয়ে যেত। খরমুজা গোস্বামীপ্রভুর খুব প্রিয় ছিল।

ঢাকা থেকে এক শিষ্যা পোস্টপার্শেলে গোস্বামীপ্রভুর জন্য কিছু আচার পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে বললেন, 'ছি! ছি! পূর্বে যা করেছি, এখন কি আর তা করতে পারি? ওরূপ করতে গেলে সদাচারভ্রষ্ট হয়ে পতিত হতে হয়। ইহা কাউকে দিও না। লিখে দাও, এভাবে যেন আর না পাঠান।'

একদিন সকালে গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'একটি পেরেক আছে?' শ্রীধর তাঁর ঘরে মশারীর ভিতর বসে নাম করছিলেন। সরলনাথ ছুটে গিয়ে শ্রীধরের মশারীর দড়ি-আঁটা একটি পেরেক তুলে গোসাঁইকে দিয়ে আসেন। সরলনাথ এর পর শ্রীধরের

---

১. সদানন্দ মিত্র-প্রণীত 'দরবেশজী প্রসঙ্গ' অবলম্বনে।

ঘরে গেলে, শ্রীধর তেড়ে উঠে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ঠাকুর কি বলেছিলেন, আমার মশারীর পেরেক খুলে নিতে?' এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়, তারপর হাতাহাতি। নবকুমারবাবু গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি না নিয়ে মৌনী হয়েছিলেন। এঁদের ছাড়াতে গিয়ে তাঁর শিখাগুচ্ছ ছিঁড়ে যায়। তা দেখে আর একজন সতীর্থ কোমরে দু-হাত রেখে নাচতে থাকেন। নবকুমারবাবু তাঁর পিঠে সজোরে মারেন। গোলমাল শুনে গোসাঁই সরলনাথ ও শ্রীধরকে ডেকে পাঠান। প্রভু শ্রীধরকে বলেন, 'তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও।' আর সরলনাথকে তিনি বলেন, 'সেবা-অভিমানে তুমি লোককে অনর্থক উদ্বেগ দাও। আমি আর তোমার সেবা নেব না। তোমার পক্ষে প্রত্যহ পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করা ভাল।' নবকুমারবাবু সম্পর্কে তিনি নীরব থাকেন। নবকুমারবাবুর মনে হয়, শ্রীধরের উপর সুবিচার হয় নি। তিনি ঘটনার যথাযথ বিবরণ একখানি কাগজে লিখে গোস্বামীপ্রভুর হাতে দিতে গেলে, তিনি বলেন, 'আমার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নাই।' এতে নবকুমারবাবুর অভিমানে আঘাত লাগে। তিনি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে নগ্নপদে একবস্ত্রে অভুক্ত ও কপর্দকহীন অবস্থায় বের হয়ে পড়েন। তাঁর পরিধানে ছিল গরদবস্ত্র। স্বামী দেবপ্রসাদ তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করে বিফল হন। শ্রীধর রাধাকুণ্ড পর্যন্ত গিয়ে ঐ দিনই সন্ধ্যায় ফিরে আসেন। প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি হে শ্রীধর, ফিরে এলে যে!' শ্রীধর বলেন, 'যেতে বলেছিলেন গিয়েছি, ফিরে আসতে তো বারণ করেন নি।' গোসাঁই তাঁর কথায় হেসে উঠেন। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যায়, নবকুমারবাবু আগ্রা হয়ে কানপুর গেছেন। চার-পাঁচ দিন কেটে যায়. সরলনাথের কোন খবর নেই। বুড়োঠাকরুণ একে-ওকে আশ্রমবাসী সকলকে বলেন, 'সরলনাথের একবারটি খোঁজ-খবর নাও। ছেলেটা কিই বা করছে; খাচ্ছেই বা কি?' কেউ গায় মাখেন না। তিনি তখন গোসাঁইকে গিয়ে ধরেন। প্রভু আশ্রমবাসীদের বলেন, 'সরলনাথকে আসতে বল।' খুঁজে খুঁজে যমুনার তীরে তাঁর সন্ধান মিলে। চারটি খুঁটির উপর হোগলার আবরণের নীচে ভিজে বালিতে তিনি পড়ে আছেন। সতীর্থদের বলেন, 'ঠাকুর যদি আমার সেবাই নিবেন না, তাহলে এই জীবন ধারণ করার কিই বা সার্থকতা? যমুনায় ডুবে মরব ভেবেছিলাম, কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ; তাই প্রত্যহ পঞ্চক্রোশী করি আর জল-কাদা খেয়ে বেঁচে আছি। প্রাণবায়ু বের হয়ে গেলেই হল।' গুরুভাইরা যখন বললেন, 'ঠাকুর তোমাকে ডেকেছেন,' তখন শরীরে যেন তাঁর বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায়। বসবার যার শক্তি নেই, তিনি সর্বাগ্রে ছুটতে ছুটতে গিয়ে কুঞ্জে পৌঁছেন। তাঁকে দেখেই গোসাঁই বলেন, 'সরলনাথ, কমণ্ডলু ভরে জল নিয়ে এস, বড় পিপাসা পেয়েছে।' সরলনাথ যেন হাতের কাছে চাঁদ পেলেন।[১]

রামদাস কাঠিয়াবাবা ও জগদীশবাবা এই সময় শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। তাঁরা প্রায়ই গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আলাদা-আলাদা আসতেন তীর্থমণিকুঞ্জে। গোসাঁইজীও মধ্যে মধ্যে যেতেন ওঁদের আশ্রমে।

আর একজন সাধু প্রায়ই তীর্থমণিকুঞ্জে আসতেন প্রভুকে দর্শন করতে। ব্রজমণ্ডলেই বর্ষাণে তাঁর জন্ম হয়েছিল। নয় বছর বয়সে, অজানার আকর্ষণে ঘর ছেড়ে হিমালয়ের পথে পথে তিনি তাঁকে খুঁজে বেড়ান। চার-পাঁচ বছর কাটে এক লামা সাধুর সঙ্গে। পনর বছর বয়সে অযোধ্যার এক রামায়েত সাধুর কাছে দীক্ষা পেয়ে,

---

[১] নবকুমার বাগচী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীবিজয়-কথামৃত', ১ম খণ্ড, পৃ ৫৫৫-৬।

হিমালয়ের গোফায় কঠোর সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অষ্টসিদ্ধি লভ করেন ও কৈলাসপতি তাঁকে দর্শন দেন। কিন্তু মন তাঁর ভরে না। মধ্যে মধ্যে তাঁর অন্তরে শ্রীবৃন্দাবনের মধুরলীলা স্ফূর্ত হয়ে চকিতে তা বিলীন হয়। এই লীলারসের আস্বাদন পেয়ে তিনি কৈলাসপতির শরণাপন্ন হলে, তিনি তাঁকে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে রাধারানীর কৃপাপ্রার্থী হবার নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী তিনি রাধাকুণ্ডে উপস্থিত হলে একদিন শ্রীমতী রাধারানী স্বপ্নে তাঁকে জানান, ‘শ্রীবৃন্দাবনে তীর্থমণিকুঞ্জে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রয়েছেন; তিনি সদ্‌গুরু। তাঁর কাছে সাধন পেলে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।’ তিনি তখন গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন করে শ্রীমতীর নির্দেশ তাঁকে জ্ঞাপন করেন। গোস্বামী মহাশয় শক্তিসঞ্চার করে তাঁকে সাধন দেন। ঐদিনই বাবাজী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন পান। দর্শন পেয়েই তিনি ভগবানের কাছে এই পুণ্য দর্শনের নিদর্শন প্রার্থনা করেন। ভক্তবৎসল ভগবান তখনই ময়ূর-রূপ ধারণ করে গা-ঝাড়া দিয়ে কতকগুলি পালক ফেলে অন্তর্হিত হন। ঐ পালকগুলি সংগ্রহ করে, বাবাজী একটি মুকুট প্রস্তুত করে তা পরিধান করেন। তখন থেকে তাঁর নাম হয় ‘ময়ূরমুকুটবাবা’। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি গোস্বামীপ্রভুর নিকট সাধন পান।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রচন্ড গ্রীষ্মের রাত্রে গোসাঁইর আসন যায় ছাদে। শিষ্যেরাও তাঁকে ঘিরে ছাদেই ঘুমাতেন। শেষরাত্রে কুঞ্জ গুহ গোস্বামীপ্রভুর আসন-ঘর ঝাড়-পোঁছ করে রাখতেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রভু আসন-ঘরে নেমে যেতেন। এক রাত্রে কুঞ্জবাবু আসন-ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখেন, ঘরটি ভিতর থেকে অর্গলবন্ধ। কুঞ্জবাবুর মনে হয়, ‘এ নিশ্চয়ই সরলনাথের কান্ড। সে ঘরটি পূর্ব থেকে পরিষ্কার করে, আমার এই সেবার অধিকারটুক ক্ষুণ্ন করছে।’ কুঞ্জবাবু সজোরে দরজায় নাড়া দিতে থাকেন। তখন দরজা একটু ফাঁক করে, মুখ বাড়িয়ে প্রভু বলেন, ‘এ কি করছ?’ কুঞ্জ গুহ অপ্রস্তুত হয়ে ভাবেন, ‘এ কি হল!’

বেশ বেলায় গোসাঁই দরজা খুললেন; যোগজীবন সানুনয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘মধ্যরাত্রে নীচে নেমে এলেন কেন, বাবা?’ গোস্বামীপ্রভু বলেন, ‘হিমালয় থেকে কয়েকজন মহাত্মা এসে নিভৃতে আলাপ করতে চাইলেন, তাই।’ যোগজীবন প্রশ্ন করেন, ‘কেন তাঁরা এসেছিলেন?’ প্রভু বলেন, ‘আমাকে তাঁদের সঙ্গে যেতে পীড়াপীড়ি করে বললেন, এখানকার কাজ তো শেষ হয়েছে, তবে আর কেন?’ যোগজীবন বলেন, এখানে কি কাজ শেষ হয়েছে?’ গোসাঁই বলেন, ‘ধর্ম সংস্থাপন; এইজন্যই ভগবান আমাকে পাঠিয়েছিলেন।’ যোগজীবন প্রশ্ন করেন, ‘আপনি ওঁদের কি বললেন?’ প্রভু বলেন, ‘আমি বললাম, আমার গুরুর আদেশ ছাড়া আমার কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।’

গোস্বামীপ্রভু একদিন নারায়ণ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কেশীঘাট যান। পূর্বে ইনিই প্রভুকে বিষ্ণুমূর্তি দেখাতে গিয়ে বিমূঢ় হয়েছিলেন। এবার তাঁর হাব-ভাব আলাদা। গোস্বামীপ্রভুকে কত যে সমাদর করেন! ফিরার পথে গোসাঁই বলেন, ওঁর মধ্যে মুমুক্ষুভাবের উদয় হয়েছে। শ্রীধামের মাহাত্ম্যেই এটি সম্ভব হয়েছে।’

উমাচরণ দাশ এই সময় ছুটি নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন এসেছিলেন। রোজই তিনি গুরু দর্শনে আসতেন। একদিন তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বলেন, ‘গতদিন এখান থেকে ফিরার পথে নগরকীর্তন শুনে সম্বিত হারিয়ে রজে গড়াগড়ি দিয়েছি।’

তাঁর এই কথা শুনে গোসাঁই বলেন, ‘শাস্ত্রে আছে, ভগবানের নাম শুনে ভাবে অবশ হয়ে ব্রজের রজে লুটিয়ে পড়লে আর জন্ম হয় না।’ উমাচরণবাবু উল্লসিত হয়ে বলেন, ‘তাহলে আমার কি আর জন্ম হবে না?’ প্রভু বলেন, ‘শাস্ত্রবাক্য কি আপনার জন্য একরকম, আর অন্যের জন্য আরেক রকম? আপনার আর জন্ম হবে না।’

জগদ্বন্ধু গোস্বামীও গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন এসেছিলেন। তিনি একদিন সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। প্রভু তাঁর দুই শিষ্যকে দিয়ে তাঁকে শান্তিপুর পাঠিয়ে দেন। তাঁদের বলেন, ‘ওঁর সমাধি আর ভাঙ্গবে না; সে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনেছে।’ তাড়াসের জমিদার রাজর্ষি বনমালী রায় আসেন মধ্যে মধ্যে তীর্থমণিকুঞ্জে, গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন করতে। ধনকুবের হয়েও তিনি সব ছেড়ে ব্রজবাস করছেন। রাধারানীর কৃপা হলে সবই সম্ভব। তাঁর গৃহবিগ্রহ বিনোদবিহারী ছিলেন একক মূর্তি। বনমালীবাবুর আদরিণী আত্মজা প্রাণেশ্বরীর হয় জ্বর। ভগবান বনমালীবাবুকে স্বপ্ন দেখান, প্রাণেশ্বরী আর বাঁচবে না। তাঁর শেষকৃত্য ভগবান নিজে করবেন। প্রাণেশ্বরীর মৃত্যু হয়। ঠাকুরঘরে তাঁকে রাখা হয়। পরদিন দেখা যায় প্রাণেশ্বরী নেই; তাঁর স্থানে অপরূপ রাধারানী-বিগ্রহ। আসনে তখন থেকে যুগল বিগ্রহ—জামাই বিনোদ ও প্রাণেশ্বরী। ভগবানের ইচ্ছায় কি না হয়!

গোস্বামী মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, আরও কিছুদিন ব্রজবাস করেন ও বনপরিক্রমায় যান। কিন্তু তা আর হয়ে উঠে না। তাঁর দেহে বাতের প্রকোপ বুঝে, ভাদ্র মাসে (১৩০২) শ্রীবৃন্দাবন থেকে তিনি বাঁকিপুর রওনা হন। কিরণচাঁদকে গোসাঁই বলেন, ‘তুমি কয়েকদিন কাশীতে থেকে বাঁকিপুর চলে এস।’

এদিকে মৌন ভেঙ্গে, ভিক্ষা করে, রেলের টিকেট যোগাড় করে, নবকুমারবাবু কয়েকদিন পর কানপুর পৌঁছেন। তিনি নিজের ভুল বুঝেন। মন্মথবাবু তাঁকে শ্রীবৃন্দাবনের পাথেয় দিয়ে দেন। মথুরা পৌঁছে সতীর্থ ডাঃ মনোমোহন দাশের গৃহে গিয়ে তিনি দেখেন, গোসাঁই সদলবলে কলিকাতার পথে ডাক্তারবাবুর গৃহে আছেন। গুরুকে প্রণাম করতেই তিনি নবকুমারবাবুর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। বাগচী মহাশয়ের মনে হয়, তাঁর মাথায় যেন সের পাঁচেক বরফ রয়েছে। তাঁর দেহ-মন শীতল হয়ে যায়। ঐদিন হরিমোহন চৌধুরী ও দুর্গা পণ্ডিত মথুরা পৌঁছে, গোস্বামীপ্রভুর অনুমতি নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হন। পরের দিন প্রভু বাঁকিপুরের ট্রেন ধরেন।

কিরণচাঁদ কাশী পৌঁছে দর্শনাদি করেন। ওখানে এক সাধুর কথা শুনে তাঁকে দর্শন করার কৌতূহল হয়। ঐ সাধুর নিয়ম, তিনি অপরাহ্নে অর্ধ ঘণ্টার জন্য দর্শন দেন। দর্শনার্থীদের কত রকম প্রার্থনা। সাধু ধুনির ভস্ম দিয়ে সকলকে বিদায় করেন। সব চলে গেলে কিরণচাঁদকে বসে থাকতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনার কি প্রয়োজন?’ কিরণচাঁদ সবিনয়ে বলেন, ‘কিছু না, আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।’ সাধু প্রশ্ন করেন, ‘কোথা থেকে এসেছেন?’ কিরণচাঁদ বলেন, ‘শ্রীবৃন্দাবন থেকে।’ তখন সেই সাধু তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, ‘আমার গুরুদেব এখন শ্রীবৃন্দাবনে আছেন।’ কিরণচাঁদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনার গুরুদেবের নাম?’ সাধু বলেন, ‘শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভু।’ কিরণচাঁদ উল্লসিত হয়ে এবার তাঁকে বলেন, ‘তিনি আমারও গুরু।’ উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করেন। তারপর কত সব অন্তরঙ্গ-কথা। সাধু বলেন, ‘আমার নাম দেবদাস। প্রয়াগে কুম্ভে আমি সাধন পেয়েছি। সেদিন একসঙ্গে একশ জন সাধু সাধন পেয়েছিলেন।’

কিরণচাঁদ তাঁকে বলেন, 'গুরুদেব এখন বাঁকিপুর আছেন। আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?' দেবদাসজী বলেন, 'এখন না; আমাকে চারধামে যেতে আদেশ করেছিলেন, তিন ধাম হয়ে গেছে, এখনও একটি হয় নি।' কিরণচাঁদ তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার ধুনির ভস্ম দেবার তাৎপর্য কি?' সাধু বলেন, 'লোকে ছাড়ে না; সাধন-ভজন করার জো নেই। তাই আধ ঘণ্টা নষ্ট করে, দিনের অবশিষ্ট সময় রেহাই পাই।' কিরণচাঁদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এতে কি লোকের উপকার হয়?' দেবদাসজী বলেন, 'তা আমার জানার প্রয়োজন নেই। যখন ওঁরা ফল পাবেন না, তখন আর কেউ আসবেন না।' পরে কিরণচাঁদের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে গোসাঁই হাসেন। আশ্বিন মাসে (১৩০২) প্রভু কলিকাতা পৌঁছে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ীতেই উঠেন।

শারদীয়া পূজা এসে পড়ে। গোসাঁইকে পেয়ে কলিকাতার ভক্তদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। অনড়ের মধ্যেও খেলে প্রাণের স্পন্দন। গোস্বামীপ্রভুকে কেন্দ্র করে চলে পূজার প্রস্তুতি। তাঁদের পূজায় দশভুজার কাঠাম নেই, পট নেই, পূজা-মণ্ডপ নেই, নহবৎ নেই, শানাই নেই, ঢাকী নেই; পূজার কোনও আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি নেই, বাহ্য কোনও আড়ম্বর নেই। অথচ কি যে এক অনাবিল আনন্দের রেশ। চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, রামায়ণপাঠ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাগবত পাঠ, হোম, কীর্তন চলে; আর থেকে থেকে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি। ভক্ত-সমাগম শুরু হয় ভোর না হতেই; প্রভুকে ঘিরে বসে আনন্দের হাট। 'দীয়তাম্, ভুজ্যতাম্' চলে অবিরাম। মা অন্নপূর্ণা যেন উৎসবে জুড়ে বসেছেন, তা সকলেই উপলব্ধি করেন; কাউকে কিছু বলতে হয় না। বিজয়ার দিন সূর্যোদয় হতে কীর্তনের আসর। সন্ধ্যায় প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে ভক্তেরা নিজেরা করেন কোলাকুলি। গুরু-ভাই-বোনেরা পরস্পরে ব্যবধান রেখে করেন ভূমিষ্ঠ প্রণাম। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ীতে গোস্বামীপ্রভু উপদেশ প্রসঙ্গে তিনটি কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন। কার্ত্তিক মাসে (১৩০২) এই গৃহে লোকের ভিড় হলে বুড়াঠাকরুণ হরিদাসবাবুর বৃদ্ধ কর্মচারী সাধনপ্রার্থী শ্রীনাথ সরকারের থাকার ব্যবস্থা মেয়েদের নীচের ঘরের এক কোণে করতে চাইলে, গোসাঁইর কানে একথা আসে। তিনি বলেন, 'সে কি! স্ত্রী-পুরুষ কি এক ঘরে থাকতে আছে? হলই বা বৃদ্ধ, পুরুষ তো বটে। স্ত্রী-পুরুষ কদাচ এক ঘরে থাকবে না। বার বছর বয়স হলে, ছেলেও মার নিকট শয়ন করবে না। যে ঘরে স্ত্রীলোক একা থাকবে, ঐ ঘরে কোন পুরুষের যাওয়া ঠিক নয়; আর যে ঘরে একা পুরুষ থাকবে, সে ঘরে কোন স্ত্রীলোকের যাওয়া সমীচীন নয়।'

তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ ৯।১৯।১৭

অর্থাৎ মা, বোন বা মেয়ের সঙ্গেও নির্জনে একাসনে উপবেশন করবে না, কারণ বলবান ইন্দ্রিয়সকল বিদ্বান ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে।

প্রভু তারপর বলেন, 'স্ত্রী-পুরুষ কখনও একত্র থাকবে না; শাস্ত্রের অনুগত হয়ে না চললে বিপদ হবেই। কাশীর দণ্ডীস্বামী এই শ্লোক পড়ে ভেবেছিলেন. ব্যাসদেব ভ্রান্ত; তিনি সঠিক লিখতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়সকল বলবান হলেও তারা তত্ত্বজ্ঞানীকে কখনও বিভ্রান্ত করতে পারে না। এই মনে করে তিনি "বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" পাঠ বদলিয়ে "বিদ্বাংসম্ নহি কর্ষতি" পাঠ লিখেন।

ভগবান ব্যাসদেব দণ্ডীস্বামীর এই ধৃষ্টতা দেখে তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য মায়া বিস্তার করেন। একদিন বেলা-অবসানে আকাশে মেঘের ঘটা দেখা গেল। দেখতে দেখতে আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হল এবং ঝড়-বৃষ্টি এল। ঐ দুর্যোগে একটি যুবতী এসে দণ্ডীস্বামীর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হল। তিনি মেয়েটিকে অভয় দিয়ে বললেন, "তোমার কোনও ভয় নেই; আমি দণ্ডীস্বামী, আমার নিকট স্ত্রী-পুরুষে কোনও প্রভেদ নেই, তুমি আমার আশ্রমে রাত্রিযাপন স্বচ্ছন্দে করতে পার।" মেয়েটি তাঁকে সসম্ভ্রমে বললে, "তথাপি আপনি পুরুষ; আপনার আশ্রমে একখানি মাত্র ঘর দেখতে পাচ্ছি। একই ঘরে কোনক্রমেই আমি থাকতে পারব না।" দণ্ডীস্বামী তাকে বলেন, "তুমি ঘরের ভিতরে থাকবে, আমি বাইরে থাকব।" এই সময় প্রবল বাতাসে যুবতীর পরিধেয় বস্ত্র স্থানভ্রষ্ট হয় এবং বিদ্যুতের ঝলকে তার গুহ্যাঙ্গ দণ্ডীস্বামীর চোখে পড়ে। যুবতী স্বামীজীর কথামত গৃহমধ্যে প্রবেশ করেই মুহূর্তে কপাট অর্গলবন্ধ করে দেয়। দণ্ডীস্বামী বাইরে রইলেন। রাত্রিতে ঝড়-জল থেমে গেল; জ্যোৎস্না উঠল। দণ্ডীস্বামী চঞ্চল হয়ে উঠেন। যুবতীর গুহ্যাঙ্গের দৃশ্য তাঁর অন্তর আন্দোলিত করে। তিনি বারবার যুবতীকে দ্বার উন্মোচন করতে অনুরোধ করেন। মেয়েটি বলে, "আমি নিরাশ্রয়া অবলা—বিশেষত আপনার অতিথি; কোথায় আপনি আমার ধর্ম রক্ষা করবেন, না আমার ধর্ম নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছেন।" দণ্ডীস্বামী তখন কন্দর্পপীড়িত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। তিনি দ্বার ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে গৃহে প্রবেশ করার জন্য পরচালে উঠে দেহের অর্ধেক ভিতরে দিয়ে ও অর্ধেক বাইরে রেখে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় অচিরে উপনীত হলেন। প্রভাতে দণ্ডীস্বামীর শিষ্যেরা এসে তাঁকে নামাল। দণ্ডীস্বামী মহাজ্ঞানী; তখন তাঁর চৈতন্যের উদয় হয়েছে। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন, ব্যাসদেবকে অবজ্ঞা করায়ই তাঁর এই দুর্দশা হয়েছে। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত খুলে সেই শ্লোকে একবারের স্থানে তিনবার লিখলেন, "বিদ্বাংসমপি কর্ষতি, বিদ্বাংসমপি কর্ষতি, বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।"'

প্রভু এই আখ্যায়িকাটি বলে নানা উপদেশ দিয়ে বললেন, 'স্ত্রী-পুরুষে কখনও মেশামেশি করবে না। সাবধানে আলাদা থাকবে। এর ব্যতিক্রম হলে বিপথগামী হতে হয়।' শিষ্যগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কোন স্ত্রীলোককে আপনার আসন-ঘরে প্রবেশ করতে দিতেন না। এমন কি বুড়াঠাকরুণ পর্যন্ত তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে পারতেন না।

এই গৃহেই মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে দিয়ে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর গোস্বামীপ্রভুকে জানান, তিনি তাঁকে মাসে দু-শ' টাকা সাহায্য করতে চান। প্রভু মনোরঞ্জনবাবুকে বলেন, 'ঠাকুর মহাশয়কে বলবেন, আমার সকল ব্যবস্থাই ভগবান করছেন; সাহায্য নেবার আমার কোন প্রয়োজন নাই।'

এই প্রসঙ্গে গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'ধনী বা বিষয়ীর সংশ্রবে কোন সাধুরই থাকা ঠিক নয়। বিষয়ীর সংশ্রবে এসে অনেক সিদ্ধ-পুরুষেরও পতন হয়েছে।' তিনি মীননাথ ও গোরক্ষনাথের আখ্যায়িকাটি বলেন। মীননাথ ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য গোরক্ষনাথের সঙ্গে পথ চলতে চলতে এক রাজবাটীর সম্মুখে উপস্থিত হন। গোরক্ষনাথ মীননাথকে রাজবাড়ীতে প্রবেশোদ্যত দেখে বলেন, 'প্রভো, আপনি কোথায় চলেছেন? এ যে রাজবাটী!' মীননাথ বলেন, 'তাতে দোষের কি? রাজা প্রজা পালন করেন, রাজ্যে শান্তি, সমৃদ্ধি আনেন। রাজা ভাল

হলে প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল। তদুপরি রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজার সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে ক্ষতি কি?' গোরক্ষনাথ বলেন, 'গুরুদেব, রাজপ্রাসাদ মায়াময় স্থান। বিষয়ীর সংস্পর্শ হতে আমাদের দূরে থাকাই উচিত, নতুবা পতনের সম্ভাবনা থাকে।' মীননাথ বলেন, 'আমরা সিদ্ধপুরুষ, আমাদের কি আবার পতনের ভয়?' শিষ্যের কথা গুরু কানেই নেন না। তখন গোরক্ষনাথ নিরুপায় হয়ে বলেন, 'আপনি যখন রাজবাড়ীতে যাবেনই স্থির করেছেন, দয়া করে আমাকে আর আপনার সঙ্গে যেতে আদেশ করবেন না।' এই বলে তিনি তাঁর গন্তব্য পথে অগ্রসর হলেন, আর মীননাথ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। রাজা সুদর্শন সন্ন্যাসীকে দেখে মুগ্ধ হন। তিনি সমাদর করে মীননাথকে সিংহাসনে তাঁর পাশে বসালেন। রাজার আদর-যত্নে মীননাথ প্রীত হয়ে রাজ্যশাসনে রাজাকে সুপরামর্শ দিতে থাকেন; রাজাও আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত সন্ন্যাসীর আদেশে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। প্রজাপুঞ্জের আনন্দের সীমা নেই। রাজা ছিলেন অপুত্রক; তাঁর একমাত্র সুন্দরী লাবণ্যময়ী কন্যাকে মীননাথের নিকট সম্প্রদান করতে রাজা ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অর্ধেক রাজত্বও তাঁকে অঙ্গীকার করেন। মীননাথ মনে মনে ভাবেন, তিনি সিদ্ধপুরুষ, রাজকন্যাকে বিবাহ করলে তাঁর যে সন্তান হবে, সে নিশ্চয়ই মহাপুরুষ হবে, তারপর পুত্র-সন্তান লাভের পর তিনি আবার পথে বের হয়ে পড়বেন। মীননাথ রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। যথাসময়ে রাজকন্যা সুকুমার এক পুত্র প্রসব করেন। দিন দিন দাম্পত্যপ্রেমে ও সন্তান-বাৎসল্যে মুগ্ধ হয়ে ঐশ্বর্যের মধ্যে কাল যাপন করতে করতে মীননাথ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন।

কয়েক বছর পর গোরক্ষনাথ মীননাথের সন্ধানে এই রাজ্যে এসে সব সংবাদ শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি মীননাথের কাছে খবর দেন, 'সিংহদ্বারে গোরক্ষনাথ অপেক্ষা করছেন।' মীননাথ নিজে যেয়ে গোরক্ষনাথকে সসম্মানে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। গোরক্ষনাথ দেখেন তাঁর গুরু বিষয়ে একেবারে ডুবে আছেন; রাজ্য-ঐশ্বর্য, স্ত্রী-পুত্র ছাড়া তাঁর মুখে অন্য কোনও কথা নেই। তিনি লক্ষ্য করেন, মীননাথ সারাদিনের মধ্যে ভুলেও একবার ভগবানের নাম নেন না। গোরক্ষনাথ বুঝলেন, গুরুজী সংসার-মোহে এমনই মত্ত হয়েছেন যে, তাঁর সাধন-ভজন, শক্তি-সামর্থ্য সকলই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গুরুকে আবার কি করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, তিনি নানারূপ উপায় চিন্তা করতে থাকেন। একদিন গোরক্ষনাথ সুকুমার শিশুটির পা ধরে এমন আছাড় মারেন যে, তার প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়। তিনি কুমারের মৃতদেহ নিয়ে মীননাথের নিকট উপস্থিত হন। সন্তানের মৃতদেহ দেখে মীননাথ হাহাকার করে উঠেন। গোরক্ষনাথ তখন যোগবলে কুমারকে বাঁচিয়ে তুলেন। পুত্রের জীবন লাভ হলে মীননাথ প্রকৃতিস্থ হলেন। তাঁর অনুশোচনা শুরু হল। সময় অনুকূল বুঝে গোরক্ষনাথ বলেন, 'প্রভো, আপনার পূর্বাবস্থা স্মরণ করুন।' মীননাথ বলেন, 'গোরক্ষ, তোমার কথা আমি শুনি নি। বাস্তবিকই আমার সর্বনাশ হয়েছে। আমি সংসারের মায়া-মোহে একেবারে ডুবে আছি। আমার সমস্ত শক্তি ও সাধন-ভজন নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এখন আমার উপায় কি বল?' গোরক্ষনাথ তাঁকে বলেন, 'প্রভো, আর একদিনও এখানে থাকবেন না। আমি এখনই নগরপ্রান্তে বৃক্ষতলে চলে যাচ্ছি। আপনি আজ রাত্রেই ওখানে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবেন।' শেষরাত্রে গোরক্ষনাথ দেখেন, মীননাথ একটি গাঁটরী মাথায় নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলেন। তিনি গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার মাথায়

ওটা কি?' মীননাথ বলেন, 'কিছু মণি-মুক্তা, হীরা-জহরৎ সঙ্গে নিয়ে এসেছি।' গোরক্ষনাথ বুঝেন, গুরু সংসার-মোহে এমনই মোহিত যে তাঁর হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই লোপ পেয়েছে। তিনি রাজপ্রাসাদ, রাজ্য, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে এসেছেন; অথচ তুচ্ছ মণি-মাণিক্যগুলি রেখে আসতে পারেন নি। তিনি গুরুকে বলেন, 'আমি সঙ্গে থাকতে আপনি কেন এই বোঝা বইবেন? দিন আমার মাথায় দিন।' মীননাথ গোরক্ষনাথের মাথায় মোটটি দিয়ে বনপথে অগ্রে অগ্রে চলতে থাকেন। গোরক্ষনাথ মুঠা মুঠা রত্নরাজি গুরুর অলক্ষিতে পথের দুধারে নিক্ষেপ করতে করতে চলতে থাকেন। বহুদূর এভাবে অগ্রসর হবার পর মীননাথ পিছনে তাকিয়ে দেখেন, গোরক্ষনাথের মাথার উপর কোন বোঝা নেই। মীননাথের মাথা ঘুরে যায়। তিনি সভয়ে শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মণিরত্নগুলি কোথায়?' গোরক্ষনাথ নিরুদ্বেগে বলেন, 'পথে আসতে আসতে সব ফেলে দিয়েছি।' মীননাথের কাছে এই দুঃসংবাদ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত। রত্নরাজির শোকে তিনি রোদন করতে থাকেন। গুরুর এই শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে গোরক্ষনাথ বিষণ্ণচিত্তে বলেন, 'প্রভো, এই তুচ্ছ জিনিসের জন্য আপনি কেন এত বিচলিত হয়ে পড়েছেন? এ-সব মণি-মাণিক্য মূত্রত্যাগের সঙ্গেও নির্গত হয়।' এই বলে তিনি যথার্থই মূত্র ত্যাগ করেন, আর বহুমূল্য রত্নরাজি তাঁর মূত্রের সঙ্গে নির্গত দেখে মীননাথের মোহ কাটে। তিনি তাঁর অধঃপতন বুঝে, গোরক্ষনাথকে বলেন, 'এখন আমার উপায় কি?' মীননাথ তাঁর 'নাম' পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন। গোরক্ষনাথ মীননাথ থেকে যে 'নাম' পেয়েছিলেন, তাই গুরুকে শোনান। গোরক্ষনাথ তাঁকে বলেন, 'এবার সাবধান হোন, আর কখন বিষয়ীর সংস্পর্শে যাবেন না।' মীননাথ সাধন-ভজন করে পুনরায় সিদ্ধাবস্থা লাভ করেন।

এই তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনীটি বলে, গোস্বামীপ্রভু মন্তব্য করেন, 'বিষয়ীর সঙ্গ হলাহল-বিশেষ। সাধুদের তাঁদের থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। আমার পাহাড়-পর্বতের গুহায় বা জঙ্গলেই থাকা সমীচীন হত, কিন্তু গুরু-আজ্ঞায় কেবল কয়েকজন লোককে সাধন দেবার জন্য লোকালয়ে পড়ে আছি।' হরিদাসবাবু গুরুকে এখানে একদিন জিজ্ঞাসা করেন, 'ভগবান তো সর্বভূতে রয়েছেন; যদি কেউ একটি বৃক্ষকে ভগবান জ্ঞানে ভক্তি করে, পূজা করে, তবে কি তাঁর ভগবৎ-প্রাপ্তি হবে?' গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'হ্যাঁ, তাঁর ভগবৎ-প্রাপ্তি হবে। ভগবান প্রথমে বৃক্ষরূপে তাঁর নিকট প্রকাশিত হবেন, পরে তাঁর স্বীয় রূপে দর্শন দিবেন।' এ-সব কথা-বার্তার পর গোসাঁই বলেন, 'হরিদাস, এক জায়গায় প্রাণ ঢালতে পারলেই হল; প্রাণেরই দরকার। একটা ঘটনা বলি, শোন। কলিকাতা তালতলায় একটি বাড়ীতে একটি মুসলমান যুবক বাস করত। পাশেই একটি খ্রীস্টান পরিবারের একটি যুবতী মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান যুবকটি সুযোগ পেলেই তার দিকে তাকিয়ে থাকত। মধ্যে মধ্যে খ্রীস্টান পরিবারের বাড়ীর ফটকের সম্মুখে যুবকটি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। মেয়েটির পরিবারের কেহ এ-সব পছন্দ করত না। মেয়েটির দিক থেকেও কোন সাড়া ছিল না। ছেলেটি যখন নির্লজ্জের মত ফটকে দাঁড়িয়ে মেয়েটির দিকে তাকাত, তখন মেয়েটির অভিভাবকের প্ররোচনায় ভৃত্যেরা কয়েকদিনই যুবকটিকে প্রহার করে। তথাপি সে নাছোড়বান্দা। তার লজ্জা নাই, সরম নাই, জীবনের প্রতিও দৃষ্টি নাই। অনন্যোপায় হয়ে ঐ পাড়ার এক ফকিরের শরণাপন্ন হয়ে যুবকটি তাঁকে তার অভিলাষ ব্যক্ত করে এবং যুবতীকে না পেলে

তার জীবন অর্থহীন হবে, তাঁকে বলে। ফকির বলেন, "তুমি যুবতীর বাড়ীর কাছে পথে কম্বল দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে তিন দিন তিন রাত্রি একাগ্রচিত্তে ঐ যুবতীকে ধ্যান কর, অন্য কোন চিন্তা যাতে মনে না আসে।" যুবক ফকির সাহেবকে বলে, "আমার পক্ষে ইহা আর বেশী কি? আমি তো দিবারাত্র তারই চিন্তা করছি।" যুবকটি তখনই পথের পাশে একটি গাছের নীচে গিয়ে ঐ অবস্থায় রইল। ঘটনাটি চারদিকে জানাজানি হয়। যুবতীটির কানে ঐ সংবাদ যেতেই তার প্রাণ বিগলিত হল। সে মনে মনে ভাবে. "আমার জন্য একটি লোক এত নিগৃহীত হয়েও, মৃত্যু পর্যন্ত পণ করে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে এভাবে রয়েছে। হোক্ সে মূর্খ, দরিদ্র, মুসলমান, আমি তাকেই বিবাহ করব।" সে তার পিতাকে গিয়েও তার সংকল্প জানায়। যুবতীর পিতা নানারূপ যুক্তির অবতারণা করে তাকে বিরত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু মেয়েটি বলে, সে মনঃস্থির করে ফেলেছে। অগত্যা তার পিতা তাকে সম্মতি দেন। যুবতী যুবকটির কাছে গিয়ে বলে, "উঠ, আমি তোমাকে বিবাহ করব; তুমি অনশন ভাঙ্গ।" যুবকটি তাকে বলে, "খোদার সঙ্গে আমার সাদী হয়েছে, আর আমার বিবাহের প্রয়োজন নেই।" লোকটি চট্টগ্রামে গিয়ে একজন ফকির হলেন।'

এই সময় ভাগবত-শাস্ত্রাদি ও ভারতীয় দর্শন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিদ্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (২) গঠনমূলক পদক্ষেপ—'ভাগবতী চতুষ্পাঠী' প্রতিষ্ঠা। এই বিদ্যাপীঠ ছিল অবৈতনিক ও আবাসিক। এতে গোস্বামী-প্রভুর ছিল অকুণ্ঠ অনুমোদন। সতীশবাবু এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করলেন আর্যঋষি-প্রবর্তিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে। শিক্ষার সূচনায়ই বীর্য ধারণ, সত্যপালন ও আনুগত্য অনুশীলনে থাকে প্রখর দৃষ্টি।

কার্ত্তিক মাসে (১৩০২) কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন আসেন গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন করতে। কথাবার্তার ফাঁকে তিনি গোসাঁইজীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কাশীতে সতীশের এত দেরী হচ্ছে কেন?' প্রভু তাঁকে বলেন, 'চিন্তার কোনও কারণ নাই, শীগ্‌গির তিনি এসে যাবেন।' কৃষ্ণনাথবাবু বিদায় নিলে উপস্থিত এক শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ঠাকুর, সতীশদা'র আসতে দেরী হচ্ছে কেন, ও-বিষয়ে তো আপনি কিছু বললেন না!' গোসাঁইজী মৃদু হেসে বলেন, 'কাশী গিয়ে তাঁর জন্মান্তরের স্মৃতি জেগেছে, তাই।' শিষ্যটি প্রভুকে এবার বলেন, 'পরস্পর শুনেছি সতীশদা গৌরলীলায় ছিলেন, মায়াবাদী সন্ন্যাসী স্বামী প্রকাশানন্দ।[১] এ-কথা কি সত্য?' শুচিস্মিত গোসাঁই নীরব থাকেন।

পটলডাঙ্গা আশ্রমে কার্ত্তিক মাসের প্রতি সন্ধ্যায় আকাশ-প্রদীপ দিতে গোসাঁইজী নবকুমারবাবুকে বলেছিলেন। একদিন রাত আড়াইটার সময় প্রভু বেণীমাধব দে-কে ডেকে উঠান। তাঁকে তিনি বলেন, 'বেণী, "রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ" আকাশ-বাণী শুনতে পাচ্ছ না? উঠ, গান ধর।' একতারা হাতে নিয়ে বেণীবাবু গান ধরেন—

আর কি সময় নাই, রসময়, বাজাতে মোহনবাঁশী?
তোমারই জন্যে অরণ্যে আসিতে সতত অভিলাষী।
সদা গুরুজনের নিকট রই, বাঁশী শুনে আকুল হই;

---

[১] গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকারের কাছে শোনা।

এ কথা ফুটিয়া কাহারে বা কই, প্রতিকূল প্রতিবাসী?
কে বলে সরল বাঁশরি তোমারই, তবে কেন লয় প্রাণ-মন হরি?
ছাড় ছলনা কপট শ্রীহরি, শ্রীমতী তোমারই দাসী।

গোস্বামীপ্রভু ভাবে মগ্ন হয়ে দুলেন আর হাত দিয়ে আপন হাঁটু চাপড়ান।

অগ্রহায়ণ মাসে (১৩০২) একদিন কথায় কথায় গোসাঁইজী বলেন, 'নবকুমারবাবু, চলুন গেন্ডেরিয়া গিয়ে "শেষ ধুলট" করে আসি।' সকলেই মহোৎসাহে বলে উঠেন, 'বেশ তো চলুন।' 'শেষ' এই কথাটি কেউ লক্ষ্য করেন না বা এর উপর গুরুত্ব দেন না। গোসাঁই বলেন, 'গোয়ালন্দ থেকে নৌকায় ঢাকা যাব।' ঢাকায় ঐদিনই পত্র যায়। ঢাকা থেকে তিন দিনের মধ্যে উত্তর আসে যে, কামিনীমোহন বসু ঠাকুরের জন্য বজরা নিয়ে গোয়ালন্দ রওনা হয়েছেন।

ঢাকায় গোস্বামীপ্রভুর তৃতীয় ধুলট-উৎসব

সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু ট্রেনে গোয়ালন্দ পৌঁছেন। গোয়ালন্দ স্টেশনে একটি হোটেলে ধোয়া-মোছা করে নতুন মাটির হাঁড়িতে ব্রাহ্মণ-পাচক নবকুমারবাবুর তত্ত্বাবধানে শুচিসম্মত ভাবে রান্না করেন। এতে প্রভুর সম্মতি থাকে। আহারের পর বেলা দশটায় বজরা ছাড়া হয়। শ্রীধরের সঙ্গে হয় কামিনীবাবুর কথা-কাটাকাটি। গোসাঁইজীর কানে যেতেই তিনি বলেন, 'শ্রীধর, দোষ তোমার।' শ্রীধরের মাথা গরম হয়ে উঠে। তিনি আবোল-তাবোল বকেন। গোস্বামী মহাশয় শ্রীধরকে দেখিয়ে মাঝিদের বলেন, 'ওকে পদ্মার চড়ায় নামিয়ে দাও।' নবকুমারবাবু সানুনয়ে গুরুকে বলেন, 'ঠাকুর তাহলে ধুলট উৎসবই মাটি হবে। আপনিই বলবেন, "শ্রীধরের খোঁজ কর, তারপর উৎসব।"' গোসাঁই তখন বলেন, 'শ্রীধর, তোমার পিতার আত্মা এসে, তোমার হয়ে ক্ষমা চাইলেন। লঘুগুরু মেনে চলতে হয়।' শ্রীধর গুরুকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে গুরুপ্রণাম-মন্ত্র আবৃত্তি করেন। 'আরে রাম রাম' বলে গোসাঁই নিজেও সাষ্টাঙ্গ দেন। শ্রীধর কামিনীবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পদ্মানদীর বুক বেয়ে ক্ষিপ্রগতিতে বজরা চলে। মাঝিরা কখন বা দাঁড় ফেলে, কখন বা পাল তোলে। হেমন্তের আকাশ। ওখানেও চলে রাশি রাশি সাদা মেঘের ভেলা। রৌদ্র-মেঘে চলে যেন লুকোচুরি খেলা। কত রকম নাম-না-জানা পাখি ঝাঁকে-ঝাঁকে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়। জলের তোড় ও বাতাসের সোঁ-সোঁ মিলে বিচিত্র সুর বাজে। পদ্মায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত যে কি মনোরম! এখানে প্রকৃতি যেন সোহাগে আপনহারা, দিশেহারা—চারদিকে আনন্দের মেলা! গোসাঁইকে নিয়েও আনন্দের হাট বসে বজরার ভিতর। অবশেষে বজরা ঢাকায় এসে ভিড়ে বুড়ীগঙ্গার ঘাটে।

গেন্ডেরিয়ার কি ছিরি! প্রকৃতির যেন আলুথালু বেশ। সারা আশ্রম জঙ্গলে ভরে গেছে। ঘরগুলির বেড়া বেদুরুস্ত। অগ্রহায়ণের শেষ। শিশির-ভেজা-রাতে ঐসব ঘরে রাত্রিবাস করা দায়। 'সাজ, সাজ' রব পড়ে যায়। নবকুমারবাবু ও কুঞ্জবাবু ছাত্রদের নিয়ে বেড়া বাঁধতে লেগে যান। দু-তিন দিনের মধ্যেই আশ্রমের চেহারা ফিরে যায়। অন্দরে-বাইরে টানান হয় সামিয়ানা চাঁদোয়া। ভক্তেরা মন্তব্য করেন, 'আশ্রমের কি যে হাল হয়েছিল।' একদিন দ্বিপ্রহরে কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে

গোসাঁই নিভৃতে আলোচনারত। বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয়ের উপর নির্দেশ ছিল, তখন যেন কেউ ভিতরে না যান। এমন সময় প্রভুকে দর্শন-মানসে জ্ঞান গুহরায়ের পিতা আসেন। জ্ঞানবাবু, হেমেনবাবু ওঁরা পাঁচ ভাই-ই গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন পেয়েছিলেন। তাঁদের মাতাপিতা সাধন না পেলেও উভয়েই ছিলেন প্রভুর ভক্ত ও অনুরক্ত। বিধুবাবু তাঁর পথরোধ করেন। অন্তর্যামী প্রভু তখনই কুঞ্জবাবুকে পাঠান আগন্তুককে ভিতরে নিয়ে যেতে। তাঁকে বিধুবাবু যেতে দেন নি বলে গোসাঁই বারবার তাঁর কাছে ক্ষমা চান। জ্ঞানবাবুর পিতা প্রভুকে সবিনয়ে বলেন, 'আপনার এতে ক্ষমা চাইবার কি আছে? মহাদেব দর্শন করতে গেলে নন্দীভৃঙ্গিগণ পথরোধ করবে, এ তো জানা কথা।'[১] বিধুবাবু সম্পর্কে এই মন্তব্য শুনে শান্তিসুধা দেবী বলেছিলেন, 'বিধুভূষণ ঘোষ, সত্যেন ঘোষ ও সরলনাথের ন্যায়, বাবাকে এমন প্রাণ ঢেলে সেবা করতে আর কেউ পারেন না। তাঁরা প্রত্যেকে বাবার জন্য অনায়াসে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন।' আর বিধু ঘোষ তদুত্তরে বলেন, 'কুঞ্জবিহারী ঘোষ, রাধারমণ গুহ, সত্যেন ঘোষ, সরলনাথ, ওঁদের সঙ্গ পেলে তো কথা নেই, ওঁদের গায়ের বাতাস লাগলেও দেহ পবিত্র হয়।'

প্রভুর শুভ-আগমনে গেণ্ডেরিয়া আশ্রমের কুটীর, তরুলতা, পশুপক্ষী সকলেই মহোৎসবের সূচনায়ই অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে। দেখতে দেখতে মাঘ মাস এসে যায়। নবকুমারবাবুকে গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'এবার ধুলটে কিন্তু খুব লোক-সমাগম হবে। হাজার-বার শত লোক বাইরে থেকেই আসবেন। ঢাকা শহর ও উপকণ্ঠ থেকেও শত-শত লোক প্রত্যহ আসবেন। আশ্রমের আশে-পাশে বাড়ীগুলিতে বেড়ার ব্যবস্থা না হলে, মেয়েদের বড় অসুবিধা হবে। আর আশ্রম-পল্লীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সুন্দর সুন্দর জামা বানিয়ে দিলে কেমন হয়?' কুঞ্জবাবুকে ডেকে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে প্রভু বলেন, 'ও বড় কষ্টে আছে। ওর বাড়ীতে এক মণ চাল পাঠান যায় কি? রানীর ঘরের (গোয়ালের) বেড়া মেরামত না হলে, শীতে ওর কষ্ট হবে। একখানি কম্বলও ওকে কিনে দিতে হয়।' সকলের উপরই গোসাঁইর সজাগ সহৃদয় দৃষ্টি। উৎসবের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কারও কথা তিনি ভুলেন নি। গোস্বামীপ্রভু যখন যাঁকে যে কাজের ভার দেন, সেবাব্রতীর মনোবৃত্তি নিয়ে তা তিনি তামিল করেন।

উৎসব শুরু হতে তখনও দুদিন রয়েছে। চাঁদোয়ায় চাঁদোয়ায় আশ্রম ভরে যায়। আশ্রমের পাশে ভক্তদের গৃহের প্রাঙ্গণেও তাঁবুর পর তাঁবু আর নীচে চাটাই, হোগলা পাতা হয়েছে। রান্নাঘরে ও আশ্রমের উঠানে মিলে কুঁড়িটি বড় চুল্লী বানান হয়। অধিবাসের দিন থেকে দশ দিনের জন্য দশ জন ব্রাহ্মণ-পাচক নিযুক্ত হন। ডাল, চাল, ঘি, তেল, লবণ, মসলা, তরি-তরকারী, বাসন, মেটে হাঁড়ি ও মেটে গ্লাসে ভাঁড়ার ঘর স্তূপীকৃত হয়ে উঠে। ভাঁড়ারের বাইরে লাকড়ির গাদা। কোথা থেকে যে কি হয়, বুঝা ভার। প্রভুর যখন যেমন ইচ্ছা, তা-ই হয়। এক আনন্দ-মেলার যেন প্রস্তুতি।

অধিবাসের দিন কালজাম গাছের নীচে মঙ্গলঘট ও তিন প্রভুর চিত্রপট স্থাপন করা হয়। জনৈক ভক্ত-মহিলা কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে মহাপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর অভিনব পট নির্মাণ করেন। ভক্তিবিগলিত হৃদয়ের শিল্প-নৈপুণ্যেই

---

[১] শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছে শোনা।

ঐরূপ সম্ভব হয়েছে। ফ্রেমে বাঁধান হয়ে এলে পট তিনটি পাশাপাশি বসান হয়। দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট, কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব। নবপুষ্পপল্লব দ্বারা মণ্ডপ সাজান হয়েছে।

রাত্রি প্রভাত হতেই ভক্তসমাগম শুরু হয়। তাঁদের আগমনে আশ্রমের আকাশে-বাতাসে আনন্দহিল্লোল। সকলবেলা গোসাঁইজী কুটীরে নিয়মিত পাঠ করছেন, আর শ্রোতাগণ নিবিষ্টমনে তাঁর শ্রীমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পাঠ শুনছেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বর ভাবরসে মধুবর্ষণ করছে। এমন সময় বুড়ীগঙ্গার দিক থেকে মধুর সংকীর্তন-ধ্বনি স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে থাকে। কীর্তন আশ্রমের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বুঝে অনেকেই আশ্রমের দক্ষিণপ্রান্তে গিয়ে উন্মুখ হয়ে কীর্তনের প্রতীক্ষা করেন। গোস্বামীপ্রভুর উচ্চারণ গদগদ হয়ে উঠে। অবশেষে তিনি পাঠ বন্ধ করে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। আশ্রমপল্লীর চতুর্দিকের নরনারী সকলে সংকীর্তনের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে আশ্রমে ছুটে আসেন। কীর্তনীয়ারা বরিশালের ভক্তবৃন্দ। তাঁরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন। দুখানা বড় পানসী নৌকায় ঢাকা পৌঁছে কীর্তন করতে করতে আশ্রমে আসছেন। খোল-করতাল সংযোগে তাঁদেরই কীর্তন, হুঙ্কার ও আনন্দধ্বনি দিগ্‌বিদিক প্রকম্পিত করে আশ্রম-পরিবেশকে ভাবরসে আপ্লুত করেছিল। বানাড়িপাড়ার প্রধানশিক্ষক প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভক্ত শ্রীধর ঘোষ তাঁর পিঠে উঠে নাচতে থাকেন। একবার তিনি মাথার দিকে অগ্রসর হন, আবার চকিতে ঘুরে পা পর্যন্ত ছুটেন। বাইসারের বিপিনবাবু গোসাঁইকে প্রণাম করতে গিয়ে তাঁর বাঁ হাত ও বাঁ পা মাটি স্পর্শ করে অথচ ডান হাত আর ডান পা শূন্যে থাকে। সরলনাথ গুহের হাত-পা ওঁকার আকৃতি ধারণ করে এবং তিনি পিণ্ডাকার হয়ে যান। প্রসন্ন গুহঠাকুরতার হাত-পা অবশ হয়ে যায়—চেষ্টা করেও তিনি মৃদঙ্গে চাটি দিতে পারেন না! কীর্তনের রসভঙ্গ হলে গোসাঁইর আনন্দের ব্যাঘাত হবে ভেবে, বিধু ঘোষ মহাশয়ের প্রাণে সহ্য হয় না। তিনি ঘুষি মেরে প্রসন্নবাবুর খোলটি ভেঙ্গে ফেলেন। শশী সাহা তখন আশ্রমের খোল এনে বাজাতে থাকেন। বিধুবাবু তাঁর নিজের বুক চাপড়ান আর হুঙ্কার দিয়ে একবার ছুটে যান গোসাঁইর ঘরের সম্মুখে, আবার ছুটে আসেন কীর্তনে। প্রভু তখনও সমাধিমগ্ন। সঞ্চারীভাবে কতজন যে সম্বিতহারা হয়ে ধরাশায়ী হলেন! প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে গোসাঁইজীর সমাধি ভাঙ্গে। কীর্তনও থামে। গোস্বামীপ্রভু বরিশাল থেকে আগত ভক্তদিগকে অমৃতদৃষ্টিতে দেখেন।[১]

মণি মজুমদার মহাশয় কলিকাতা থেকে মুকুন্দ ঘোষের কীর্তনের দল নিয়ে আশ্রমে পৌঁছেছেন। ঘোষ মহাশয় বেছে বেছে গায়ক ও বায়েন নিয়ে এসেছেন। রসিক দাশের দলের নামজাদা খুলি গোষ্ঠকেও তিনি সঙ্গে এনেছেন। মনোহরদাস বাবাজী এবং আরও দুজন বৈষ্ণব এসেছেন। তাঁদের অভিপ্রায়, তাঁরা ভোগ-আরতির গান করবেন। ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে আশ্রমে প্রায় তিন শ ভক্ত এসেছেন।

পটমণ্ডপে সজ্জিত তিন প্রভুর চিত্রপটের নীচে ভোগের জন্য তিনখানি আসন পাতা আছে। অধিবাসের দিন থেকেই পূজা, আরতি, ভোগরাগ কীর্তন শুরু হয়। তিন প্রভুর সম্মুখে মালসাভোগ লাগে। পাতক্ষীর, দই, মিষ্টি, সন্দেশ,

---

১. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য দ্বারিকানাথ রায় মহাশয়ের বর্ণনা অবলম্বনে।

ফলফলাদি পড়ে কাতারে কাতারে। ভক্তেরা এসব প্রত্যহ নিয়ে আসেন। সবই ভোগে নিবেদন করা হয়। ভোগরাগের পর যাঁরা উপস্থিত থাকেন, তাঁরাই প্রসাদ পান। গোসাঁই পূবের ঘরের বারান্দায় বসে ভক্তদের প্রেমানন্দে প্রসাদ গ্রহণ দর্শন করেন। তৃপ্তির সঙ্গে সকলে প্রসাদ পান। বড় বড় পিতলের হাঁড়িতে বাল্যভোগের পর চা হয়। দু-তিন হাজার লোক রোজ প্রসাদ পান। বিধু ঘোষ, কুঞ্জ ঘোষ ও নবকুমার বাগচী সকলের সেবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। গুরুপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তাঁরা অবিরাম খেটে যান। কি এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে তাঁদের না আছে ক্লান্তি, শ্রান্তি, অবসাদ-বোধ বা উৎসাহের অভাব! হাজার-হাজার লোকের পরিচর্যার ভার তাঁদের উপর অথচ নিজেদের আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের অবকাশ নেই।

ভক্তদের তাঁবুতে চলে দিনভর সৎপ্রসঙ্গ, পাঠ, কীর্তন। গ্রাম্যকথা বা পরনিন্দা নেই। ভক্তেরা অনাবিল ভগবদ্-আনন্দে মাতোয়ারা। ঢাকার প্রখ্যাত সঙ্গীতযন্ত্রশিল্পী ভগবান সেতারী কীর্তনের বিরাম সময়ে গোস্বামীপ্রভুকে সেতারের ধুন, গৎ ও তান শোনান। কখন বা ক্ষেত্রবাবু রাগ-রাগিণীর আলাপ করতেন আর শোভান মিঞা তবলা বাজাতেন। অষ্টাহ ধরে এই উৎসব চলে। প্রেমবন্যায় আশ্রম ভাসে।

কুটীরে নিত্যপাঠের পর মনোহরদাস বাবাজীর গান হত। বানাড়িপাড়ার দুর্গামোহন পণ্ডিত মহাশয় একদিন আপনমনে কুটীরের পেছনে তাঁবুতে বসে একতারা বাজিয়ে গুন-গুন করে গান ধরেন—

অপরূপ আহা মরি মরি, হরি হরি বলছে বদনে, অমন রূপ
দেখি নাই নয়নে।
অমন রূপে ডোর কৌপীন পরা, দেখে যায় কি ধৈর্যধরা,
করে দণ্ড করঙ্গ ধরা।
অমন যোগীর বেশে কে সাজাল রে, বুঝি বা তারা
নাই তার নয়নে।

কীর্তনের আকর্ষণে ভক্তবৃন্দ খোল-করতাল নিয়ে এসে পণ্ডিত মহাশয়ের একক কীর্তনে যোগ দেন এবং তা জমজমাট হয়ে উঠে। গোস্বামীপ্রভুও 'হরিবোল, হরিবোল' বলতে বলতে ঐখানে এসে দাঁড়ান। পণ্ডিত মহাশয়ের গানটি তখন মূর্ত হয়ে উঠে। অনেকেই আত্মহারা হন।

একদিন বাল্যভোগের প্রসাদ পাবার পর কীর্তনীয়া গানে যেই টান দিলেন, 'ধাওল নদীয়া-লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে,' প্রভু ভাবাবেশে ছুটে এসে "নবদ্বীপ, নবদ্বীপ" বলে হুঙ্কার দিতে থাকেন। ভাব-রস-মুগ্ধ নরনারী উল্লসিত হয়ে ঐখানে ছুটে এসে প্রেমবিহ্বল হয়ে রোদন করতে থাকেন। গোসাঁই 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলে প্রেম-হুঙ্কার দিয়ে বলেন, 'দেখ দেখ, ঐ যে মহাপ্রভু।' অপূর্ব ছন্দে প্রভু নাচতে নাচতে ভাবরস-প্রবাহে বিহ্বল হয়ে উঠেন। তাঁর চরণযুগল যেন ভূমি স্পর্শ করে না। চারদিকে ক্রন্দনের রোল উঠে। সংকীর্তন প্রেমরসে শ্রোতাদের ভাসিয়ে নিয়ে অবশেষে সমাপ্ত হল। অনেকে সম্বিতহারা হয়ে ভূমিশায়ী হয়ে আছেন। 'হরিওঁ' কানের কাছে বলতে বলতে একে একে সকলে উঠে বসেন, কিন্তু শ্রীশ মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞান ফিরে এল না। গোস্বামীপ্রভু আপন আসন ছেড়ে শ্রীশবাবুর কাছে এলেন। ভাবনিধিপ্রভু ভাবের মর্যাদা দিতে শিষ্য শ্রীশবাবুর পা দুখানা আপন মস্তকে ধারণ করে পদধূলি নেন। উপস্থিত সকলে এ দৃশ্য দেখে বিস্ময়-

বিহ্বল। প্রভুর এই ভাবগর্ভ উচ্ছ্বাস অনির্বচনীয়। তথাপি শ্রীশবাবুর জ্ঞান ফিরে এল না। গোসাঁইজী স্বীয় আসনে গিয়ে উপবেশন করেন। এমন সময় শ্রীশবাবুর দাদা সতীশবাবু (পাগলা সতীশ) ছুটে এসে তাঁর ডান পা-র বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে শ্রীশবাবুর নাক চেপে ধরতেই, তিনি উঠে বসেন।[১] ভাবের অমর্যাদায় ভাব ছুটে গেল।

মাঘী-সপ্তমী সন্ধ্যায় খোল-করতালের সঙ্গে ভুবনমঙ্গল হরিনাম-ধ্বনি উঠতেই গোস্বামীপ্রভু কীর্তনের আসরে এসে, সমবেত ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে, তাঁর আসনে বসেন। মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি হতে থাকে। কীর্তন অগোণে জমে উঠে। ভাববিহ্বল কণ্ঠে মুকুন্দ ঘোষ গান ধরেন। অপূর্ব সেই সুরলহরী ও ভাবব্যঞ্জনা। জানুর উপর ন্যস্ত প্রভুর উভয় হস্ত অঞ্জলিবন্ধ। দু-হাতেরই মণিবন্ধ হতে একটির পর আরেকটি কদম্ব যেন অবিরাম বাহুর উপর দিয়ে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করে লয় পায়। গোসাঁইর সর্বাঙ্গে ভাবতরঙ্গ। শত শত ভক্ত, দর্শক, শ্রোতা অপলক নেত্রে এই অনন্যসাধারণ ব্যাপার দেখে মুগ্ধ হন। ধীরে ধীরে গোস্বামী মহাশয় সমাধিমগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর শিরোদেশ বাঁ কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে। বাঁ বাহুর উপর দিয়ে জটা আসনে লুটিয়ে পড়ে। নয়নে দিব্য আভা। চতুর্দিকে সঞ্চারী ভাবের জোয়ার বয়। খানিক বাদে মাথা তুলে গোসাঁই ডান হাত ছুঁড়ে, 'শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীবৃন্দাবন' বলে উঠে দাঁড়ান ও প্রেমবিগলিত কণ্ঠে বলেন 'জয় শ্রীরাধে, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী।' গোস্বামীপ্রভুর সর্বাঙ্গে অনিন্দ্যসুন্দর পুলক-কম্পন, নয়নে বিগলিত অশ্রুধারা। তাঁর হাতের আঙুলগুলি এত ঘন ঘন বিকম্পিত হয় যে, স্পষ্ট দেখা যায় না। দাঁতগুলি মাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম। দীর্ঘ জটাজুট মাথার উপর খাড়া হয়ে উঠে। জটারও চলে অপরূপ নৃত্য! কখন বা মনে হয়, শিরোপরি একটি সাপ হেলেদুলে খেলে! আবার মনে হয়, একটি নয়, তিন-তিনটি। পর মুহূর্তেই কিন্তু মনে হয় গোস্বামীপ্রভুর মাথায় যেন মুকুট শোভা পায়। গায়ক, বাদক, শ্রোতা, দর্শক সকলের মধ্যেই প্রভুর মহাভাবের ছোঁয়াচ লাগে। সকলেই আনন্দে মশগুল। গোসাঁই তাঁর জটা দুহাতে ধরে, ডাইনে-বাঁয়ে হেলে-দুলে আরতি করেন। তাঁর সর্বাঙ্গ প্রেমে জর-জর। গোস্বামী মহাশয়, কত বিচিত্র ঢঙে, ডাইনে ও বামে মুখ ঘুরাতে থাকেন। উদরদেশে তাঁর কদম্বগুচ্ছের ন্যায় বীচিমালা যেন নেচে-নেচে চলে। গোসাঁই তাঁর গা থেকে আলখিল্লাটি খুলে, নিজের মস্তকোপর ঘোমটার মত রেখে, খিল-খিল করে হেসে উঠেন। গলা থেকে পুষ্পমাল্যটি খুলে হাতে নিয়ে যেন অদৃশ্য কারও গলায় পরানর ভঙ্গিতে ধরেন। গোস্বামীপ্রভুর সর্বাঙ্গ দিয়ে অমৃতবর্ষণ হয়। হঠাৎ তাঁর শরীর যেন শক্ত কাঠ হয়ে যায়। ধরাধরি করে তাঁকে আসনে শোয়ান হয়। 'হরিঃ ওম্' ধ্বনি কানে উচ্চারিত হয়। 'কি হল, কি হল?' বলে আসর চঞ্চল হয়ে উঠে। তবে কি প্রভু দেহ ছেড়ে যাচ্ছেন? হায়! এ কি হল? হরিষে বিষাদ! ধীরে ধীরে কীর্তন চলে। এ-সব দেখে মুকুন্দ ঘোষও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি কি ভেবে, হঠাৎ গোস্বামীপ্রভুর কাছে ছুটে গিয়ে, তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে গান ধরেন—

এল কৃষ্ণ, এল ঐ, বাজিল বাঁশরি।
সুখে শুকসারী মুখোমুখী করি,

---

১. গোস্বমীপ্রভুর শিষ্য দ্বারিকানাথ রায় মহাশয়ের বর্ণনা অবলম্বনে।

হের নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী॥
পিক-ভৃঙ্গ গায়, সব রসে ভেসে যায়।
প্রাণবন্ধু দাঁড়ায়ে, ঐ উঠিল কিশোরী॥

গোসাঁইর শ্রীঅঙ্গে যেন প্রাণসঞ্চার হল। আনন্দঘন মহাভাব শিথিল হল। ধীরে ধীরে প্রভু উঠে বসেন। আকাশ-বাতাস ভুবনমঙ্গল হরিনামে মেতে উঠে। কি কি আনন্দ! কি আনন্দ!! মধুরং, মধুরং, মধুরং, মধু, মধু।

ধুলটের এই কয়েকদিনই গোস্বামীপ্রভু অবিচারে সাধন দেন। সকাল নটায় হত মেয়েদের সাধন আর রাত্রি একটায় ছেলেদের। যিনি এসে ঐ সময় বসতেন, তাঁরই সাধন হত। অনুমতির কোন অপেক্ষা নেই। প্রভুর সাধনে এমনটি আর কখনও হয় নি। কিরণচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচিত একটি যুবক গোস্বামী মহাশয়ের কাছে পূর্বে সাধনপ্রার্থী হয়ে বিফল মনোরথ হয়েছিলেন। কিরণচাঁদ তাঁকে ধুলটের সাধন শুরু হতেই দেশে চিঠি দেন, 'সাধন লাভের মহাসুযোগ উপস্থিত হয়েছে, পত্রপ্রাপ্তিমাত্র এখানে চলে এস।' যেদিন তিনি আশ্রমে এসে পোঁছেন, তখনও এই সুযোগ, আরও দু রাত্রি। প্রথম রাত্রে তাঁর শরীর এত ক্লান্ত যে ঘুম আর ভাঙল না। কিরণচাঁদেরও না। পরদিন সকালে কি আফ্‌শোষ! বানাড়িপাড়ার লোকেরা সাধনের শেষ রজনীতে তাঁদের ক্যাম্পে ওঁকে রাখেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, দীক্ষার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কেউ জাগলেন না।[১]

হেমেন্দ্রনাথ গুহরায় নামে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি ছেলে এই সময় গোস্বামীপ্রভুর কাছে সাধন পায়। উৎসবের পর বরিশাল ফিরে, অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে, তার দীক্ষালাভের কথা তাঁকে বলতেই অশ্বিনীবাবু তাকে আদর করে বলেন, 'উচ্ছিষ্ট বিচার করে চলবি, তা না হলে প্রত্যবায়-ভাগী হবি। তোদের যা বলে দিয়েছেন, তা-ই করবি। আমার জন্য তিনি আলাদা ব্যবস্থা করেছেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, নানাস্থানে আমায় যেতে হয়, কেউ আমায় আহার্য কিছু দিলে, প্রত্যাখ্যান করতে পারি না—তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "নাম করে খাবেন, নামে শুদ্ধ হয়ে যাবে।" তোদের কিন্তু ও-রকম করলে হবে না।'[২]

এই ধুলট উৎসবে একদিন গোস্বামীপ্রভু উপদেশে বলেন, 'রাত্রে ঘুমাবার পূর্বে ও ভোরে শয্যাত্যাগের পূর্বে প্রণাম করে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করলে ভগবানের চরণে এই প্রণাম গিয়ে পোঁছবে'—

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

ধুলট মহোৎসব অষ্টম দিন নগর-কীর্তনের পর শেষ হল। পূর্বের দু ধুলট উৎসবের নগর-কীর্তনে গোস্বামীপ্রভু নিজেই ছিলেন পুরোধা। তাঁর 'জয় শচীনন্দন' বলে হুঙ্কার, মনোরম নর্তনবিলাস, ধুলিমুঠির মাধ্যমে শক্তিসঞ্চারণ ছিল মর্মস্পর্শী এক বিচিত্র লীলা। এবারও মঙ্গলারতির পর নগর-কীর্তনের তোড়জোড় চলে। কিন্তু হায়, হায়! এ কি হল? বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! সবই বুঝি পন্ড হয়! কম্প দিয়ে গোস্বামীপ্রভুর জ্বর আসে। ভক্তদের মুখ শুকিয়ে যায়।

---

[১] 'মন্দির' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

[২] ঐ ঐ

নগর-সংকীর্তনের আর কি আকর্ষণ? এ যেন রামকে বাদ দিয়ে রামলীলা! কিন্তু উপায় কি?

প্রভুর আদেশে বিধু ঘোষ সকলকে ডেকে আনেন। তাঁরই ইঙ্গিতে বিধুবাবু গান ধরেন—

দয়াল নিতাই ডাকে আয়, আয়।
প্রেমধন বিলায় গোরা রায়॥
ও প্রেম কলসে কলসে বিলায়।
তবু না ফুরায়॥

আসনে আসীন কম্পমান গোসাঁই তাঁর ডান হাত তুলে, 'অভয়' মুদ্রা দেখিয়ে বলেন, 'মাভৈঃ! এবার তোমরা এগোও।' মুহূর্তে এক প্রবল শক্তিপ্রবাহ জনসমাবেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কারও কারও চোখে পড়ে, তিন প্রভু পট থেকে বের হয়ে, আসনের উপর নৃত্য করে আবার পটে প্রবেশ করেন। আসনে তাঁদের চরণ-চিহ্নের স্পষ্ট ছাপ পড়ে। অদম্য উৎসাহ আর প্রেরণা আসে কীর্তনীয়াদের প্রাণে। গগনভেদী কণ্ঠস্বর! বৃদ্ধদের মধ্যেও যুবকসুলভ চাঞ্চল্য। কীর্তনের কি কর্ণ-রসায়ন মাধুর্য! অভূতপূর্ব তাল-লয়-তানে গানের পদ বিলীন হয়ে যায়! নৃত্যে-গীতে-বাদ্যে শুধু ধুয়া-রব উঠে, 'আয়, আয়, আয়।' কীর্তন আশ্রমের বাইরে আসতেই আর এক ভাব যেন রূপ নেয়। এক শক্তির ফোয়ারা খেলে। বাদ্যে-লম্ফে-ঝম্ফে, হুঙ্কারে কেবল শোনা যায়, 'হোঃ-হোঃ-আঃ-উঃ'। শব্দব্রহ্মের যেন অমোঘ ও প্রাণবন্ত প্রকাশ! গেণ্ডেরিয়া, ফরিদাবাদ, সূত্রাপুর দিয়ে ঝড়বেগে ছুটে প্রেমোন্মত্ত কীর্তনীয়া দল। প্রতি পদক্ষেপে স্ফীত হয় সংকীর্তন-দলের কলেবর। প্রভুর শিষ্য-পাচক শত্রুঘ্ন ঠাকুর সম্বিত হারিয়ে সূত্রাপুরের পুলের উপর পড়ে যান। শরীর যেন তাঁর কাঠ। একজন তাঁর মাথা আপন কাঁধে তুলে নেন, আর একজন তাঁর পদদ্বয়। দেহের যেন ওজন নেই। বাহকদের ভ্রূক্ষেপও নেই। ওঁকে কাঁধে করেই চলে ওঁদের সাবলীল নৃত্যগীত। অবলীলাক্রমে সকলের সঙ্গে তাঁরা ফরাসগঞ্জে এসে পৌঁছেন।

প্রেমাবিষ্ট রায়সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার ও কুঞ্জ গুহঠাকুরতা মিছিলের দু পাশ থেকে চলতে চলতে, 'আয়রে আমার নিতাই ডাকে' বলে, যিনি-ই সম্মুখে পড়েন তাঁকেই জড়িয়ে ধরেন। জনতার মধ্যে আনন্দস্রোত বয়। পথের বাঁকে বাঁকে আরও যে কত কীর্তনের দল এসে যোগ দেয়! শত শত মাদল, অগণিত করতাল ও ভক্ত-কীর্তনীয়াদের প্রাণ-মাতান হরি-ধ্বনিতে ঢাকা শহর কেঁপে উঠে। এই মহা-সংকীর্তনের উভয়পার্শ্ব থেকে খৈ, নকুলদানা, বাতাসা ও সন্দেশের লুঠ হয়। আর উভয়সারির বাড়ী থেকে মেয়েরা অবিরাম করেন উলুধ্বনি। আনন্দ যেন উথলে উঠে। মুহুর্মুহু হরিলুঠ ও জয়ধ্বনি। ফরাসগঞ্জ এসে আনাচে-কানাচে সর্বত্র কীর্তন ছড়িয়ে পড়ে। প্রেমানন্দে এই অভূতপূর্ব সংকীর্তন ডাইলবাজার, বাংলাবাজার, পটুয়াটুলি, ইসলামপুর, তাঁতিবাজার, মালিটোলা, নবাবপুর, ভৈসুণ্ডী, নারেন্দা হয়ে একরামপুরে পৌঁছে। ডাক্তার প্রসন্ন মজুমদার ও কুঞ্জ গুহঠাকুরতা প্রেমবিহ্বল চিত্তে হামাগুড়ি দিতে দিতে অগ্রসর হন। তাঁরা যাঁকেই সম্মুখে দেখেন, দু হাত দিয়ে আরতি করেন ও প্রণাম করেন। শ্রীধর গাড়ির ঘোড়াকে 'আয় আয়' বলে জড়িয়ে ধরেন। কেউ হাসেন, কেউ কাঁদেন। কীর্তনের ধুলি তাঁরা গায়-মাথায় মাখেন। শত-শত নরনারী কীর্তনের উদ্দেশ্যে পথে সাষ্টাঙ্গ দেন। প্রবীণ ভক্ত

বিধু ঘোষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে বেসামাল হয়ে উঠেন। তিনি হুঙ্কার দিয়ে কীর্তনীয়া শশী সাহার কাঁধে উঠে বসেন। কাঁধে বসে তিনি করতাল বাজান ও হুঙ্কার দিতে থাকেন। শশীবাবুরও ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনিও আত্মবিহ্বল। বিধুবাবুকে কাঁধে নিয়েই তিনি স্বচ্ছন্দে নাচেন। এই মহাসংকীর্তনের অতিক্রমপথে অসংখ্য নরনারী প্রেমোল্লাসে গড়াগড়ি দিয়ে নিজ অঙ্গে ধূলি মাখছিলেন। কীর্তন ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে উপনীত হলে, সমাজগৃহের দোতলা থেকে মহিলারা উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করে কীর্তনে যোগদানের অভিপ্রায়ে সবেগে ফটকের দিকে ছুটে যান। সমাজ-কর্তৃপক্ষ অনন্যোপায় হয়ে তখনই বহির্দ্বারে তালা দেন। ভাবোন্মাদিনী মহিলারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সমাজপ্রাঙ্গণে ভূমিতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে থাকেন।

শ্রীধর কখন বা ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, 'ঐ দেখ, ক্ষীরোদসাগর! ক্ষীরোদসাগরে আজ ঢেউ উঠেছে। সমস্ত সংসার ভেসে যাবে।' যে যে অবস্থায় ছিলেন আত্মগত হয়ে সংকীর্তনে যোগ দেন। এক কর্মকার হাতের যন্ত্রপাতিসহ কীর্তনে এসে নাচতে থাকে। এক মুচি জুতা সেলাই করতে করতে ঐখানেই দাঁড়িয়ে নাচতে থাকে। যেদিক দিয়ে কীর্তন যায়, সেইদিকেই লোকসকল আত্মবিস্মৃত হয়ে উন্মত্তবৎ ছুটে।

এদিকে ঢাকার ধনকুবের রূপলাল দাশের পুত্র প্রভুর শিষ্য রাধাবল্লভবাবু জুড়ি-গাড়ি করে গুরুকে দর্শন করতে আশ্রমে আসেন। গোসাঁইকে প্রণাম করতেই তিনি দুঃখ করে বলেন, 'আমার কি দুর্ভাগ্য! এই পুণ্যতিথিতে নগর-সংকীর্তনে যোগ দিতে পারলাম না।' এই কথা বলে তিনি অশ্রু বিসর্জন করেন। রাধাবল্লভবাবু তাঁকে বলেন, 'ঠাকুর, চলুন না, গাড়ি করে আমরা কীর্তনের অনুসরণ করি।' উভয়ে গাড়িতে উঠে বসেন। গাড়ি একরামপুর এলে একদল শিখ সৈন্য বন্দুক নীচু করে প্রভুকে অভিবাদন করে। এক মাইল দীর্ঘ কীর্তনের পশ্চাতে গোস্বামীপ্রভুর গাড়ি পৌঁছতেই কীর্তনীয়ারা গোসাঁইকে দেখে নূতন উদ্দীপনায় মেতে উঠেন। আর কীর্তনের পুরোভাগ পাঁচ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আশ্রমে ফিরে শোনেন, ঠাকুর বের হয়েছেন। তখনই তাঁরা আবার বের হন। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। তাঁরা গিয়ে দেখেন সূত্রাপুরে বাজারের কাছে প্রভুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভক্তেরা গাড়ির পথ করে দেন। শ্রীধর একটি গাড়ির ছাদে উঠে নাচতে থাকেন। গোসাঁই আশ্রমে এসে পৌঁছেন। পেছনে জনসমুদ্র। আশ্রমের মহিলা-ভক্তেরা বরণডালা সাজিয়ে আরতি করে গোস্বামীপ্রভুকে বরণ করেন। কীর্তনীয়ারা তখন গান ধরেন—

নগর ভ্রমণ করে গৌর এল ঘরে।
গৌরমুখ হেরি শচী, মঙ্গল আচরে॥

প্রভু আসনে গিয়ে বসেন। পাশে বিরাট ধামায় স্তূপীকৃত লাড্ডু। দু-হাত ভরে গোসাঁই সকলকে লাড্ডু দেন। এই অগণিত লোককে কি করে অঞ্জলিভরে লাড্ডু দেন তা বিচার-বুদ্ধির অনধিগম্য। আট দিন ধরে নির্বিচারে সাধন বিলিয়ে, কত লোকের সন্তাপ হরণ করে গোসাঁই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। নগর-কীর্তন থেকে ফিরে এসে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন।

গোস্বামীপ্রভু বাবাজী ও কীর্তনীয়াদের বিদায় দেন। তাঁদের তিনি অর্থ ও পাথেয় দেন। তদুপরি কেউ পান পশমী বস্ত্র, কেউ বা রেশমী বস্ত্র। মুকুন্দ ঘোষ

অর্ঘ নেন না। গোস্বামী মহাশয়ের দেওয়া পশমী ও রেশমী বস্ত্র তিনি মাথায় তুলে নেন। প্রভু কাঙ্গালীদের কাপড় ও কম্বল দেন।

ধুলটের পর একদিন প্রভাতে মহেন্দ্র মিত্র ভাবাবিষ্ট হয়ে রাধারমণবাবুর মালির ছেলেকে সাষ্টাঙ্গ দিতেই, সে মহেন্দ্রবাবুর মাথায় তার পা তুলে ধরে। ছেলেটিরও চৈতন্য লোপ পায়। গোসাঁই এসে ছেলেটির সম্মুখে কাপড়, টাকা, খাবার রেখে প্রণাম করেন। এক ঘণ্টা পর তার সম্বিত ফিরে আসে। প্রভু বলেন, 'ছেলেটির মধ্যে ভগবানের আবেশ হয়েছিল। সর্বভূতে যে তিনি রয়েছেন, তা-ই বুঝিয়ে দিলেন।' একদিন আশ্রমে কীর্তন হচ্ছে, এমন সময় গোস্বামী মহাশয় বিধু ঘোষ মহাশয়কে বলেন, 'বিধু, আজ এখানে কীর্তন হচ্ছে, কিন্তু একদিন এখানেই রক্তারক্তি হবে। এখানে মুসলমান রাজত্ব হবে।'

আশ্রমে ধুলট শেষ হলেও নিত্য-উৎসব চলেছে। পঙ্গত পড়েছে। আকণ্ঠ সকলে প্রসাদ পেয়েছেন, এমন সময় বিধু ঘোষ মহাশয় রসগোল্লা পরিবেশন শুরু করেন। বরিশালের নরোত্তমপুরের সতীশচন্দ্র রায়ও এই পঙ্গতে বসেছিলেন। সতীশবাবু বিধুবাবুর ছাত্র ছিলেন। ভরাপেটে তিনি আর খেতে পারবেন না ভেবে সতীশবাবুকে রসগোল্লা না দিয়ে, বিধুবাবু চলে যাচ্ছিলেন। প্রভুর দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি বলেন, 'বিধু, সতীশকে দাও।' সতীশবাবু একটির পর আর একটি করে বত্রিশটি রসগোল্লা গলাধঃকরণ করেন। ঐদিন থেকে সতীশবাবুর নাম পড়ে 'রসগোল্লা সতীশ'। তিনি ছিলেন অকৃতদার আর বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল। মুর্শিদাবাদের ডাঃ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই ধুলটে গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে এসেছিলেন। তাঁর প্রতি সতীশবাবু ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাবান। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও সতীশবাবু অন্তরঙ্গভাবে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করতেন। রামবাবুর প্রতি সতীশবাবুর আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি ও অনুরাগ লক্ষ্য করে, রেবতীমোহন সেন মহাশয় একদিন কৌতুক করে রামবাবুকে বলেন, 'সতীশ গোসাঁইকে ধ্যান করার সময় আপনাকেও ধ্যান করে।'

গোস্বামীপ্রভু তাঁর বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সাধন দেন নি, যদিও সাধনপ্রদানের সময় গোসাঁইর অভিপ্রায় অনুসারে দু-একদিন তিনি উপস্থিত ছিলেন। একবার তিনি দীক্ষাকালে পরমহংসজীকে দর্শন পর্যন্ত করেছিলেন। নগেনবাবু দীক্ষাপ্রার্থী হলে, প্রভু তাঁকে বলেন, 'আপনার প্রয়োজন নাই।' গোসাঁইর আর একজন বাল্যবন্ধু তাঁর কাছে দীক্ষা যাচ্ঞা করলে, তিনি ভোলানন্দগিরি মহারাজের নিকট তাঁকে সাধন নিতে বলেন। তিনিও ওখানে গিয়ে সাধন নেন। কিন্তু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যতিক্রম। সতীশবাবু রামবাবুর মুখে তাঁর দীক্ষা-প্রসঙ্গ যা শুনেছেন তা এইরূপ[১]—'সেই ১২৯২ সালে সাধন দিতে আরম্ভ করলে গোসাঁইর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই তিনি আমাকে বলেন, "রাম, তুমি আমার কাছে সাধন নাও।" আমি মনে করি তিনি বুঝি বা কৌতুক কচ্ছেন। তাঁকে তখন সখ্যভাবে বলি, "তুমি এমন কী হয়েছ যে, তোমার কাছে দীক্ষা নিতে বলছ?" উত্তরে গোসাঁই বলেন, "রাম, তোমাকে বড় ভালবাসি। আমার কাছে সাধন নিলে তোমার মঙ্গল হবে। তাই বলছি।" গোসাঁইর সত্যনিষ্ঠা ও সততার কথা আমার অজানা নয়। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে আমরা সহপাঠী ছিলাম। আমি

---

[১] শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্রের মুখে শোনা। সতীশচন্দ্র রায় তাঁকে নিজে বলেছিলেন।

গম্ভীরভাবে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, “গোসাঁই, তুমি যথার্থ বলছ, আমার মঙ্গল হবে?” তিনিও দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, “হ্যাঁ, হবেই।” আমি ফের জিজ্ঞাসা করি, “খাঁটি জিনিস পাব তো? বাজালে বাজবে তো!” গোসাঁই বলেন, “হ্যাঁ বাজবে; একবার নয়, তিন-তিনবার বাজিয়ে নিও, দশ ইন্দ্রিয় দিয়ে বাজিয়ে নিও। দেখবে বাজবে।” আমি তখন বলি, “তাহলে সাধন দাও।”’

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে গোস্বামীপ্রভুর এই অন্তরঙ্গতা ছিল মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা থেকে। গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে রামবাবুর কাছে লেখা গোসাঁইর একখানি চিঠি থেকেও তাঁদের এই অন্তরঙ্গতার আঁচ মিলে—

২৯শে বৈশাখ, ১৮০২ শক
ঢাকা

ভ্রাতৃবরেষু,

প্রিয় ভ্রাতা রাম! অনেকদিন পর তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। রাম, তুমি আমার বাল্যসহচর। তুমি যেখানে থাক, যে ভাবে থাক তোমার নাম শুনিলেই আমার মনে আনন্দ হয়।

মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আমি সম্মত হইলাম। অতএব পত্রপাঠমাত্র পাথেয় পাঠাইয়া দিবে। ১২ই জ্যৈষ্ঠ ঢাকা হইতে গমন না করিলে নিয়মিত সময়ে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইতে পারিব না। অতএব ১০ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যে যাহাতে পাথেয় পাইতে পারি তাহা করিবে। এখন ঢাকা হইতে কলিকাতা যাইতে ৯৷৹ ব্যয় লাগিয়া থাকে। কারণ নারায়ণগঞ্জে গিয়া স্টীমারে উঠিতে হয়। ইহা ভিন্ন কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে যাইতে যে ব্যয় লাগিবে তাহা হিসাব করিয়া সমস্ত টাকা প্রেরণ করিবে। মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইলে শীঘ্র পাইব।

নৈহাটিতে নামিয়া গেলেও হয়, কিন্তু তাহা যাইব না। কারণ স্টীমার ও রেলওয়ে অধিকক্ষণ বাস করিয়া কলিকাতা বিশ্রাম না করিলে চলিবে না।

ঈশ্বরপ্রসাদে আমরা একপ্রকার কুশলে আছি।

ভ্রাতৃবর সৌহার্দ্দার্থী—
শ্রীযুক্তবাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
মহাশয় সমীপে— ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ।
মুর্শিদাবাদ নিউ মেডিকেল হল্‌। মুর্শিদাবাদ

ধূলটের পর একদিন সকালে প্রভু কুটীরে বসে আছেন। কয়েকটি ইঁদুর এসে তাঁর সম্মুখে কিচিরমিচির করে। একটি দু পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে প্রভুর পানে তাকিয়ে তাঁকে কি যেন বলে! গোসাঁই বিধু ঘোষকে ডেকে ইঁদুর দেখিয়ে বলেন, ‘এদের আজ খেতে দেওয়া হয় নাই, শীগ্‌গির খাবার দাও। আমাকে কী বলছিল, জান? খাবার না দিলে আমার জটা কেটে ফেলবে।’ বিধুবাবু তৎক্ষণাৎ খাবার এনে দেন।[1]

একদিন গোসাঁই আমতলায় বসে আছেন। দুটি কাক ঐ গাছের উপর তারস্বরে ঝগড়া শুরু করে। প্রভুর শান্তির ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় ওদের তাড়িয়ে দিতে নানাপ্রকার চেষ্টা করেন। কখনও লাঠি তুলে ধরেন, কখন বা

---

১. শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখাৎ শ্রুত।

ঢিল ছোঁড়ার ভঙ্গি করেন। কিন্তু ওতে ওদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রভু তখন উপরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠেন, 'থাকো, থাকো, উভয়েই থাকো।' কাক দুটি তখনই শান্ত হয়ে যায়। কুঞ্জবাবু তখন গুরুকে বলেন, 'ওদের তাড়াতে কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওরা গেলও না, নীরবও হল না। অথচ আপনার আদেশ শুনেই একেবারে চুপ হয়ে গেল। এর ভিতর কোন রহস্য আছে না কি?' গোসাঁইজী বলেন, 'আমগাছে একটি কাকের বাসা আছে। সে খাদ্যান্বেষণে অন্যত্র গিয়েছিল। ঐ অবসরে অপর একটি ওখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। যার বাসা সে ফিরে এসে বহিরাগত কাকটিকে চলে যেতে বলে, কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। আগন্তুক কাকটি বলে, "তুমি তো কদিন ধরেই সঙ্গ করছ। এবার আমাকে একটু সঙ্গ করতে দাও।" এই নিয়েই ওদের কলহ-বচসা। আমার কথা শুনে চুপ করে গেল।'[১]

ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, গোসাঁইর প্রেমসুধা শুধু মনুষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবজগতে, এমন কি উদ্ভিদজগতেও তাঁর প্রেমের বিস্তার পরিব্যাপ্ত।

ধুলট উৎসবের পর তিন-চার মাস প্রভুর গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে থাকার কথা। কিন্তু তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না বলে ফাল্গুন মাসেই (১৩০২) সদলবলে কলিকাতা রওনা হবার প্রস্তুতি হয়। ঢাকার ভক্তেরা হন মনমরা। দুখানি বজরা ও রান্নার জন্য একখানি নৌকা ঠিক হয়। গোসাঁইজী গোয়ালন্দ যাত্রা করেন।

পদ্মার প্রতি গোসাঁইর এক নিগূঢ় আকর্ষণ। যখনই সুযোগ হয়, পদ্মাবিহার যেন তাঁর এক বিলাস। পদ্মার উচ্ছল উদ্দাম তরঙ্গের সঙ্গে যেন গোস্বামী মহাশয়ের নাড়ীর যোগ। পদ্মার ভ্রূকুটি, পদ্মার সংহার মূর্তি, পদ্মার ভয়াল রূপ সবই তাঁর গা-সহা। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সময় কতবার যে তিনি পদ্মার ঝড়ে পড়েছেন, তরী নিমজ্জিত হয়ে নীচে তলিয়ে গেছেন। আবার পদ্মার সঞ্জীবনী অমৃতস্পর্শে, দেহ-মনে ফিরে পেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় জীবন। তাই শরীর অসুস্থ হলে, পদ্মা যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে! আস্তে-ধীরে মরাল-মরালীর ন্যায় পদ্মার বুকের উপর দিয়ে গোস্বামীপ্রভুর বজরা চলে। অচিরে তিনি সুস্থবোধ করেন। গোয়ালন্দে পৌঁছে কলিকাতাগামী ট্রেন ধরেন। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের ঐ বাড়ীটিতেই উঠেন। এই বাড়ীতে আষাঢ়, ১৩০৩ পর্যন্ত এবার পাঁচ মাসের উপর থাকেন। এখানে এই সময়ে বহুলোকের সাধন হয়। হরকান্তবাবুর ভগ্নীপতি মথুরবাবুও তখন সাধন পান। ২৫ আষাঢ় (১৩০৩) প্রভুর সম্মতি নিয়ে কিরণচাঁদ সতীর্থ মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহোদরা সরোজবালার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

কলিকাতায় হ্যারিসন রোডে অবস্থান

শ্রাবণ মাসে (১৩০৩) ৪৫, হ্যারিসন রোডের সম্পূর্ণ তেতলা বাড়ীটি মাসে একশ টাকায় ভাড়া হলে গোস্বামী মহাশয় সকলকে নিয়ে ওখানে উঠে যান। এই বাড়ীটি বেশ খোলামেলা। প্রচুর আলো-বাতাস। সকাল-সন্ধ্যায় কীর্তন, অপরাহ্নে গ্রন্থপাঠ, দীক্ষার্থীদিগকে সাধনপ্রদান; এখানে নিত্য উৎসব লেগে থাকে। ছাদে প্রত্যহ সকালে চাল ছড়িয়ে দেওয়া হয়, মাটির গামলায় পানীয় জল থাকে, পাখির তৃষ্ণা নিবারণের

---

১. শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখাৎ শ্রুত।

জন্য। ভোর না হ'তে কলকণ্ঠ কত রকম পাখির মেলা বসে। প্রতিদিন সূর্যাস্তে গোস্বামীপ্রভু ছাদে উঠে পায়চারি করেন, তারপর ওখানেই আসনে বসে বিশ্রাম করেন। ভক্তদের তখন থেকে আনাগোনা শুরু হয়। তাঁদের অন্তরে কত রকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন থাকে। এত লোকের সম্মুখে ঐসব প্রশ্ন করতে তাঁরা সঙ্কোচ বোধ করেন। কিন্তু তাঁদের প্রশ্ন করতে হয় না। অন্তর্যামী গোসাঁই তাঁদের নীরব প্রশ্নগুলির সমাধান বলে যান।

বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় ও যোগজীবন গোস্বামীর উপর এই আশ্রমের সকল ভার পড়ে—বিধুবাবুর উপর ব্যবস্থাপনার আর যোগজীবন গোসাঁইর উপর পরিচালনার। যোগজীবনের বয়স তখন মাত্র সাতাশ। গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'মহাপুরুষদের ইচ্ছায় এই ব্যবস্থা।' প্রভুর কাছে আপন-পর নেই। যোগজীবনের উপরই তখন থেকে গোসাঁইর চিঠিপত্রের উত্তর দেবার ভার পড়ে। দীক্ষার্থীদের পত্রের জবাব দিতে পিতার মতামত জানতে চাইলে, প্রভু বলেন, 'দেখ, যোগজীবন, এ নিয়ে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিস না, তুই যাঁকে অনুমতি দিবি, তিনিই সাধন পাবেন।' যোগজীবন সম্পর্কে গোস্বামীপ্রভু মন্তব্য করেন, 'ও যখন "নাম" করে, তার প্রতিটি "নাম" আমার পায়ে পদ্ম হয়ে এসে পড়ে।'[১]

বীরভূমের আলিগ্রামনিবাসী সূর্যনারায়ণ রায়ের সাধন হয় এখানে। কীর্তনের আসরে প্রথম দিন তিনি গান ধরেন—

রসের নাগর গোরানাগর, এল নদীয়ায়।

গানের প্রথম কলি শুনেই গোসাঁইর উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু হয়। সূর্যনারায়ণবাবু বিমুগ্ধচিত্তে বিস্ফারিত নেত্রে প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর গান বন্ধ হবার উপক্রম। বিধু ঘোষ সূর্যবাবুর মুখের কাছে ঘুষি বাগিয়ে তাঁকে ইসারা করেন। সাবধান করে দেন, 'খবরদার! গান যেন বন্ধ না হয়! ঠাকুরের ভাব নষ্ট হবে। দ্বারিকানাথ রায় মহাশয় করতাল বাজাচ্ছিলেন। তাঁকে ধীরে ধীরে বিধুবাবু বলেন, 'তুমি তোমার ভাব সংবরণ কর। ঠাকুরের যেন ভাবের ব্যাঘাত না হয়!' খোল বাজাতে বাজাতে বিধুবাবুর নিজের যখন ভাবের বন্যায় ভেসে যাবার উপক্রম হয়, তখন তিনি আপন শরীরে আঘাত করেন। সূর্যবাবু সুকণ্ঠ ছিলেন; কিন্তু রেবতীবাবুর গান গোস্বামী মহাশয়ের ভাব-বৈচিত্র্যের অনুগ হয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। একদিন সূর্যবাবু যখন কৃষ্ণলীলার গান গাইতে ছিলেন, গোসাঁই তাঁকে সানুনয়ে বলেন, 'দয়া করে একটি শ্যামাসঙ্গীত করুন।' সূর্যবাবু তখন গান ধরেন—

জান না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা তো শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
কভু পরে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়।
(শ্যামা) কখনো পার্বতী, কখনো শ্রীমতী, কখনো রামের জানকী হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজদলে করে সভয়।
(আবার) ব্রজপুরে আসি, বাজিয়ে বাঁশি ব্রজবাসীর মন হরে লয়॥
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, করে সৃজন-পালন-লয়।
(কভু) আপন মায়ায়, আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব-যাতনা সয়॥

---

[১] শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মুখে শোনা।

যেভাবে যেজন, করয়ে ভজন, সেরূপ তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে, কমলে কামিনী হয় উদয়॥

গান শেষ করে সূর্যবাবু গুরুকে বলেন, 'আমাকে আদেশ করলেই তো যথেষ্ট। আপনি ওভাবে বললে বড় অস্বস্তি বোধ করি।' গোসাঁই বলেন, 'তা না হলে, ভাব থেকে ভাবান্তরে যেতে ভাবের কাছে অপরাধ হয়।' রেবতীবাবু বেহালাসংযোগে গান—

কেনরে আমার শ্যামা-মাকে বল কালো।
যদি কাল বটে, তবে কেন ত্রিভুবন করে আলো॥
মা (আমার) কখন শ্বেত, কখন পীত, কখন নীল লোহিত রে।
আমি বুঝিতে নারি, জননী কেমন, আমার ভাবিতে জনম গেল॥
মা কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ, কখন শূন্য মহাকাশ রে।
কহে কমলাকান্ত ওভাব ভাবিয়ে, মহেশ পাগল হল॥

রেবতীবাবুর গান শুনে, গোস্বামীপ্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন, 'তোমার গান শুনে বহুলোক তৃপ্তি পাবে।' কলিকাতার অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এই সময় গোস্বামীপ্রভুর নিকট উপস্থিত হয়ে অন্তঃসারশূন্য ধর্মকথা বলতেন যাতে তাঁদের ধন, উচ্চপদ, বিদ্যাভিমান প্রকাশ হয়ে পড়ত। প্রভু নির্বিকারভাবে তাঁদের কথা শুনতেন। তথাপি তাঁরা নিবৃত্ত না হলে, তিনি রেবতীবাবু বা সূর্যবাবুকে কীর্তন গাইতে বলতেন। একদিন এক ভদ্রলোক দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসরের উপক্রম করতেই গোসাঁই সূর্যবাবুকে কীর্তন গাইতে বলেন। তিনি রামপ্রসাদী ধরলে ভদ্রলোক নীরব হন।

দিবারাত্র গোস্বামীপ্রভু আসনে বসে থাকেন। ভোররাত্রে অচিন্ত্যবাবু, বেণীমাধববাবু ও প্রিয়নাথ ঘোষ কীর্তন করে গঙ্গাস্নানে যেতেন। সারদাকান্তও স্নান করে বড় কলসে গঙ্গাজল ভরে, কলসটি আপন মাথায় করে গুরুর জন্য প্রত্যহ বয়ে নিয়ে আসতেন।

ভাদ্র মাসে (১৩০৩) জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সপরিবারে হরিদাসবাবু আসেন গুরুদর্শনে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে 'ভক্তমাল' গ্রন্থের কথা উঠে। হরিদাসবাবু মন্তব্য করেন, 'মহাবীরের ন্যায় ভক্তের তুলনা হয় না। তিনি আপন বুক চিরে তাঁর ইষ্ট রাম-সীতাকে দেখিয়েছিলেন।' শুচিস্মিত গোসাঁই বলেন, 'বুক কি আবার চিরতে হয়? এমনি দেখা যায়।' ঐ মুহূর্তে গোস্বামীপ্রভুর আসনের উপর চোখ পড়তেই হরিদাসবাবু দেখেন, ওখানে রাধাকৃষ্ণের অনিন্দ্যসুন্দর যুগলমূর্তি ফুটে উঠেছে। কোন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীর সাধ্য নেই এমন নিখুঁত ছবি আঁকেন। তারপর প্রভুর ডান উরুদেশে রাধাকৃষ্ণের অভিনব আর একটি আলেখ্য ফুটে উঠে। অতঃপর আসনের উপর গৌর-নিতাইর ছবি প্রকাশ পায়। মুগ্ধ হয়ে হরিদাসবাবু গুরুকে প্রশ্ন করেন, 'কি করে এসব সম্ভব?' গোসাঁই বলেন, 'ভগবানের নামের মহিমায়। ভক্তের রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জা, সবই নামময় হয়ে উঠে। এমন কি ভক্ত যে বস্ত্র ব্যবহার করেন, তাও নামাঙ্কিত হয়। যেখানে বসে ভক্ত নাম করেন, চতুর্দিকে নামের প্রভাব ফুটে উঠে। আসন, বৃক্ষশাখায়, পাতায় নামের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।'

গোঁসাই আসন ছেড়ে শৌচে গেলে হরিদাসবাবু আর যাঁরা ওখানে ছিলেন, তাঁরা সকলেই দেখতে পান, আসনে শিব-মন্দিরের ছবি ফুটে উঠেছে। মন্দিরের ভিতর শিবলিঙ্গ, তার উপর রাশি-রাশি বেলপাতা; মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূল। কাঁধে ঢাক

নিয়ে ঢাকী তা বাজায়। ভক্তেরা এসেছেন অর্ঘ্য হাতে—হয়েছে আরও অনেক দর্শকের সমাবেশ। আধঘণ্টা পর এই অপূর্ব চিত্রটি মিলিয়ে যায়। আর একদিন দেখা যায়, গোস্বামীপ্রভুর আসনের উপর জোড়া পদচিহ্ন। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত ভগবানের পাদপদ্ম। তাঁর কাছে ভক্তিগ্রন্থ পাঠের সময় পঠিত বিষয়ের যথাযথ চিত্র ভেসে উঠে তাঁর আসনের উপর, যেন আধুনিক কালের সবাক ছায়াচিত্র!

হরিদাসবাবু লিখেছেন, 'এই সময় হইতে আরও আশ্চর্যজনক অনেক ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম। প্রত্যহ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ভগবদ্গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত-আদি ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ হইত। যখন ভগবদ্গীতা পাঠ হইত, তখন অর্জুনের রথোপরি শ্রীকৃষ্ণ রজ্জু ধরিয়া উপবিষ্ট আছেন, এই চিত্র আসনোপরি পড়িত। যখন মহাভারতের কোন যুদ্ধের বিবরণ পাঠ হইত, তখন কুরু ও পাণ্ডব-সেনার যুদ্ধবিষয়ক চিত্র আসনোপরি পতিত হইত। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যখন যুদ্ধের বর্ণনায় সেনাপতির মস্তকছেদন পাঠ শেষ হইত, সেই সময় হইতে চিত্রস্থ সেনাপতির মস্তক আর দেখা যাইত না। কখন কখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে ভক্তগণের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্তন ও নৃত্য আসনোপরি অঙ্কিত হইত, এই সমস্ত প্রহেলিকার মধ্যে আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধি কিছুতেই প্রবেশ করিত না, আমি অবাক হইয়া দেখিতাম আর ভাবিতাম, এসব কি!'[১]

হরিদাসবাবু এই সময় একদিন গোস্বামীপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার দেহান্তে এই সাধন দিবার অধিকারী কে হইবে?' গোসাঁই উত্তর করেন, 'যে ব্যক্তি আমার ন্যায় অনন্যকর্মা হইয়া অবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিবে।'[২] প্রভু গুরু-পরম্পরার কোন উল্লেখ করেন নি। 'জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তং সাক্ষাদ্ভগবদোদিতম্'—যাহা সাক্ষাৎ নারায়ণ হতে উদিত হয়েছিল। ভগবানের করুণাই উহা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তিনি কাকে কিভাবে কৃপা করেন, তিনিই জানেন। সদ্গুরুর মহিমা অপার।

যথাহি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তৎস্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৪।২৯।৩৩

পুরুষকার থাকতে গুরুকৃপা বুঝা যায় না। মানুষ পুরুষকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে যখন সাধনে অগ্রসর হতে পারে না, ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আত্মশক্তিতে আর কুলায় না, তখনই গুরুকৃপার মর্ম বুঝে ও উপলব্ধি করে গুরুকৃপা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

গোস্বামীপ্রভুর পায়ে বাতের ব্যথা। দু পায়ের উপর ভর করে শৌচে যেতে কষ্ট হয়। একখানি পুরু তক্তার মধ্যে বড় ছিদ্র করে, দুপাশে খুরা লাগান কয়েকজন শিষ্য মিলে। শৌচের পর তা ধুয়ে-মুছে তুলে রাখেন। কয়েক বছর ব্যবহারের পর, ক্ষয় হয়ে যায় খুরা। ঐ রকম আর একখানা শৌচাসন বানান ভক্তেরা। নূতন আসনে বসে প্রভু যেদিন প্রথম শৌচে যান, ঐদিনই পরিত্যক্ত আসনখানি গোসাঁইর কাছে এসে বিলাপ করে বলে, 'প্রভো, কি অপরাধে আমি আপনার সেবাসুখ থেকে বিমুখ হলাম?' পুরান আসনের খেদোক্তি শুনে, তাতেই নূতন খুরা লাগাতে তিনি

---

১. হরিদাস বসু-প্রণীত 'মাহপাতকীর জীবনে সদ্গুরুর লীলা', ২য় সং, পৃ ২২৮।
২. ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃ ২৩৩।

নির্দেশ দেন। প্রেমের স্পর্শে অব্যক্ত চেতনাও ব্যক্ত হয়ে উঠে। সত্য ও ঋত কাল্পনিক কাহিনী থেকেও বিস্ময়কর!

পুজার ছুটিতে হবিগঞ্জের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, গুরুদর্শনে এসে হ্যারিসন রোডের আশ্রমগৃহে উঠেন। সহোদরকে মাথায় করে গঙ্গাজলের ভারী কলস প্রত্যহ বয়ে আনতে দেখে বেদনাবোধ করেন তিনি; কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলেন না। গোসাঁইজী একদিন বরদাকান্তকে বলেন, 'সারদা মাথার যন্ত্রণায় মধ্যে মধ্যে বড় কষ্ট পায়, একজন ভাল ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করালে কেমন হয়?' প্রখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকার ও কার্তিক বসু তাঁকে দেখে বলেন, 'ইনি যদি পঁচিশ-ত্রিশ সেরের মত বোঝা ৩০/৪০ মিনিট রোজ মাথায় নিয়ে চলেন, এবং প্রফুল্ল থাকেন তাহলে ওঁর বড় উপকার হবে।' বরদাকান্ত হৃদয়ঙ্গম করেন, দয়াল গোসাঁই কেন সারদাকে দিয়ে গঙ্গাজল আনান।[১] বরদাকান্ত হবিগঞ্জে ফিরে যেতে অনুমতি চাইলে প্রভু তাঁকে বলেন, 'এখন হবিগঞ্জের পাট তুলে, গয়ায় গিয়ে ওকালতি করা ভাল।' হবিগঞ্জের পসার তুচ্ছ করে বরদাকান্ত বিনা দ্বিধায় গয়া যাত্রা করেন এবং ওখানের আদালতে নূতন করে ওকালতি শুরু করেন। গয়াতে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে কিছুদিন থাকার পর তাঁর ইচ্ছা হয়, তাঁর গুরুর দীক্ষালাভ-স্থানে স্থায়ী নিদর্শন রাখা। গোস্বামীপ্রভুর অনুমতি নিয়ে তিনি আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ঐ স্থানটিতে একটি প্রস্তর-ফলক বসান। তাতে খোদাই করা হয়—"ওঁ। এই স্থানে মানস-সরোবরের পরমহংস শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দীক্ষা প্রদান করেন। জয় গুরু, ওঁ ১২৯০।"

কোকিলকণ্ঠ কীর্তনীয়া গণেশ দাস কলিকাতা এলে গোস্বামীপ্রভুকে কীর্তন শোনাতেন। তিনি গোসাঁইকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। গণেশ দাসের সঙ্গে একবার শ্রীবৃন্দাবনের সিদ্ধ-প্রেমিক-ভক্ত বলরামদাস বাবাজী গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন করতে আসেন। শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর সঙ্গে পূর্বে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এই বাবাজীর লোমকূপ দিয়ে তখন রক্তোদ্গম হয়েছিল। গোসাঁইজী এবং আরও কয়েকজন মহাত্মা তখন তাঁর বুকে কান রেখে "সুখময় শ্রীবৃন্দাবন" গানের এই দুটি কলি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন। হ্যারিসন রোডের আশ্রম-গৃহে গোস্বামীপ্রভু তাঁকে খুব আদর-আপ্যায়ন করেন।

গণেশ বলতেন, 'হরির লুটের বাতাসার ভিতর দিয়ে প্রভু শক্তিসঞ্চার করেন।' বাতাসার পরতে পরতে তিনি স্বচক্ষে বিদ্যুৎকণা দেখেছেন বলে বলতেন। পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গোসাঁই কাউকে সহজে অনুমতি দিতেন না। কিন্তু একদিন এখানে এই কীর্তনীয়ার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে প্রভু বলেন, 'গণেশ, তোমাকে আমার কি বা দেবার আছে? নাও পায়ের ধূলি নাও।' গণেশ তখন প্রভুর পায়ে লুটোপুটি খান।[২] হ্যারিসন রোড-আশ্রমে গান গাওয়ার জন্য গণেশ কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। কিন্তু শ্রোতারা এখানে তাঁর কীর্তন শুনে তাঁদের বাড়ীতে গান গাওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে চুক্তি করতেন—'প্রতি রাত্রি একশ টাকা হারে' এবং বায়না দিয়ে দিতেন। এক রাত্রে গোস্বামী মহাশয় তাঁকে বলেন, 'গণেশ, তুমি অবিলম্বে বাড়ী যাও।' কি আর করেন তিনি?—পরাহ্ণে বায়না ফেরৎ দিয়ে দলবল নিয়ে নৌকায় তিনি দেশে

---

১. শ্রীমদ্ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখাৎ শ্রুত।

২. শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত।

রওনা হন। দলের একজন ছাড়া আর সকলে কলেরায় আক্রান্ত হয়। প্রভুর নির্দেশ পেয়েই যাত্রা করলে পথে এই বিপত্তি হত না।

একদিন নীলকণ্ঠ আসেন গোস্বামীপ্রভুকে যাত্রা শোনাতে। তাঁর মাথুর-পালা অভিনয় শুনে গোসাঁই মুগ্ধ হয়ে তাঁর পদধূলি নেন। এতে তিনি অপ্রতিভ হয়ে প্রভুর পায়ে পড়ে বারবার অপরাধ মোচনের প্রার্থনা জানান। গোস্বামী মহাশয় অভয় বাক্যে তাঁকে শান্ত করেন।

কাঙ্গালীদের ভিক্ষা দেবার ভার ছিল দারোয়ানের উপর। একদিন শৌচে গিয়ে কাঙ্গালীদের চীৎকার শুনে, প্রভু খোঁজ নিয়ে জানেন, দারোয়ানকে তামাক কিনে আনতে জগদ্বন্ধুবাবু বাইরে পাঠিয়েছেন। যোগজীবনকে ডেকে দারোয়ানের হিসাব চুকিয়ে দিতে বলেন, সে তার কর্তব্যে অবহেলা করছে বলে। যোগজীবনও জগদ্বন্ধুবাবুর মধ্যে এই ঘটনা নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। জগদ্বন্ধুবাবু শান্তিসুধা দেবীকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান। দুদিন পরে ফিরে আসেন নিজের ত্রুটি বুঝে।[১]

নৃত্যগোপাল গোস্বামী একদিন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ঋষিগণ আর গৌর-পরিকর, রূপ-সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীপাদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা?' প্রভু বলেন, 'তাঁদের সাধনলব্ধ ধন ঋষিগণ জীবের কল্যাণের জন্য গ্রন্থাকারে রেখে গেছেন, আর গোস্বামীগণ তা নিয়ে আলোচনা করেছেন, ঋষিদের কথাই প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃতি করেছেন এবং গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।'

একদিন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গোস্বামী মহাশয়ের কাছে এসে কথাপ্রসঙ্গে বলেন, 'মানুষের মুখের দিকে চেয়ে, লোক-লজ্জা করে জীবন বৃথা গেল। এখন লোকে বড়লোক বলে, সেই অভিমানে গেলাম। যথার্থ ধর্ম হল না।' প্রভু তাঁকে বলেন, 'আপনি যদি গীতা ও ভাগবত পাঠ করেন, তাহলে ভাল হয়। কেবল ইংরেজ-ভাবাপন্ন হয়ে থাকবেন না। যাঁরা অর্থ দিয়ে অপরকে তুষ্ট করতে চান, তাঁরা বরাবরই ধর্মজগতে নিন্দিত। ভগবান তাঁদের দোষ তাঁদের অন্তরে মেখে, অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন। এতে তাঁরা প্রকৃত মঙ্গল থেকে বিচ্যুত হন। ভগবদ্ভক্তেরা তাঁদের গৃহে পদার্পণ করেন না।'

একদিন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম সাব-জজ চণ্ডীচরণ সেন এসে গোস্বামী মহাশয়কে প্রশ্ন করেন, 'ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ কল্যাণ কিসে হয়?' প্রভু বলেন, 'ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র অবলম্বনে।' চণ্ডীবাবু এ-কথা শুনে বলেন, 'ব্রাহ্মসমাজ তো তাই করে থাকেন।' গোসাঁই বলেন, 'না, তা তাঁরা করেন না। শাস্ত্রের যে অংশটুকু তাঁদের মতের সঙ্গে মিলে, শুধু তাহা-ই তাঁরা গ্রহণ করে থাকেন। তাতে হবে না। শাস্ত্র মানতে হলে, আগা-গোড়াই মানতে হবে। শাস্ত্র কাগজ নয়, কালি নয়, অক্ষর নয়; শাস্ত্র জীবন্ত ও স্বপ্রকাশ। পাখির ঝাঁকের ন্যায় শাস্ত্র স্বর্ণাক্ষরে সাধকের নিকট প্রকাশ পায়।'[২]

চণ্ডীবাবু বিদায় নিলে, মণীন্দ্রনাথ মজুমদার গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ব্রাহ্মসমাজের কি হবে?' গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। খ্রীস্ট ধর্মান্তর থেকে ভারতবাসীকে রক্ষা করার জন্য ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল।

---

১. নবকুমার বাগচী-প্রণীত 'শ্রীশ্রীবিজয়কথামৃত', পত্রাঙ্ক ৫৮২।

২. অমৃতলাল সেনগুপ্ত-প্রণীত 'আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', ৪র্থ সং, পৃ ৪৫৭-৮।

নীতিধর্ম-প্রচার ও দুর্নীতি-পরিহারও ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য ছিল। কোনও কিছুর প্রয়োজন শেষ হলে, তার আর কোনও গুরুত্ব থাকে না। ধনুর্ধর অর্জুনের কি হল? শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর আহীরদিগের নিকট তিনি পরাস্ত হলেন। তাঁর সাধের গাণ্ডীব পর্যন্ত তিনি তুলতে পারলেন না। বহু চেষ্টায় যদি বা উঠালেন, শর-যোজনার সামর্থ্য নেই। অপমানিত ও দুঃখিত হয়ে অর্জুন বদরিকাআশ্রমে ব্যাসদেবের নিকট উপস্থিত হলে, মহামতি ব্যাস তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে দুর্জয় ছিলে। তোমার গাণ্ডীব এখন নিষ্প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এখন গিয়ে তপস্যায় বৃত হও, এতে পরলোকে তোমার মঙ্গল হবে।" ঐরূপ ব্রাহ্মসমাজেরও প্রয়োজন মিটেছে। বক্তৃতা করে এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়। এখন আপন-আপন মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মদের তপস্যায় বৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।'[১]

এক শিষ্য তখন বলেন, 'এতদিন সাধন পেলাম কিন্তু এখনও কিছু হল না। অথচ জগাই-মাধাই সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার পেলেন!' প্রভু বলেন, 'বটে! পূর্বে সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে কি করতে আর এখন কি কর?' শিষ্যটি বলেন, 'আগে কিছুই করতাম না, এখন প্রণাম করি।' গোসাঁই বলেন, 'এও কি কম? আর জগাই-মাধাইর সঙ্গে তুলনা! ওঁরা ছিলেন সরলতার বিগ্রহ। ওঁরা কখনও কিছু গোপন করেন নাই, প্রতিষ্ঠা বা সম্মানের ধার ধারেন নাই। তাঁরা কারও আদর-অনাদরের অপেক্ষা করেন নাই। ওঁদের পাপবোধই ছিল না। মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁদের চৈতন্যের উদয় হয়, তখন পাপবোধ আসে। সংসারের লোক ইন্দ্রিয়াসক্ত, বিষয়াসক্ত; তারা প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের জন্য কত কি গোপন করে! তারা বুঝে না, যাঁরা অন্তর্যামী, তাঁদের কাছে কি কিছু গোপন করা যায়?'

একদিন আর্য মিশন কলেজের অধ্যক্ষ রামদয়াল মজুমদার ঐ কলেজের অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ রায়ের সঙ্গে গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন করতে আসেন। গোস্বামী মহাশয় ঐ সময় গুরুবাদ নিয়ে বলছিলেন। রামদয়ালবাবু এই গুরু-গম্ভীর পরিবেশে প্রশ্ন করেন, 'গুরু যদি মূর্খ হন, তাহলেও কি তাঁকে ভক্তি করতে হবে?' প্রশ্ন শুনে গোসাঁই মর্মাহত হন। তিনি বিরক্ত হয়ে রুক্ষভাবে বলেন, 'আপনি এখান থেকে চলে যান, আপনার মুখ দেখতে নাই।' ঐদিন গৃহে ফিরেই, রামদয়ালবাবুর মধ্যে আসে আত্মজিজ্ঞাসা। মহতের কৃপায় তাঁর দৃষ্টি হয় অন্তর্মুখী। পরদিন গুরুকে একান্তে পেয়ে, সূর্যবাবু সভয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাকে তো কখনও কাউকে কটুকথা বলতে শুনি নি। কিন্তু রামদয়ালবাবুর প্রতি অমন কঠোর কেন হলেন!' প্রভু তাঁকে বলেন, 'ইঁনি বড় ভাল লোক। কিন্তু ওঁর অন্তরে "অভিমানের" প্রকাণ্ড একটি ব্রণ হয়েছিল। তাঁর কল্যাণের জন্যই ব্রণটি চিরে দিলাম।'

সকালের দিকে মোহিনীমোহন রায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করে শোনান; যাঁকে উদ্দেশ্য করে এই পাঠ, তাঁরই একদিন দেখা নেই। কখন যে শৌচে গেছেন! এত বিলম্ব তো কখনও হয় না! এদিকে মোহিনীবাবুর অফিস যাবার তাড়া। 'উঠি উঠি' করছেন, এমন সময় প্রভু এসে বলেন, 'আজ গ্রন্থকে প্রণাম করে রেখে দিন।' বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় গোসাঁই বলেন, 'বেয়াড়া কাণ্ড! শৌচে গিয়ে

---

[১] অমৃতলাল সেনগুপ্ত-প্রণীত 'আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', ৪র্থ সং, পৃ ৪৫৮।

ফাঁপড়ে পড়ি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর-প্রমুখ দেবতারা আর নারদ ব্যাসাদি ঋষিরা এসে উপস্থিত। তাঁদের আলাপ শেষ হয় না। কত স্তব-স্তুতি করি, তারপর ওঁরা যান। ওখান থেকে বের হতে না হতে শ্রীবৃন্দাবনলীলা প্রকাশ পায়। তাই এত দেরী।'

আর একদিন এই আশ্রম-গৃহে অবেলায় আসেন তিনজন আগন্তুক। গোসাঁই তখন শৌচে। তাঁরা অভুক্ত ফিরে যান। শৌচাগার থেকেই ওঁদের ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন; কিন্তু ওঁদের দেখা মিলে না। শৌচান্তে আসনে এসে গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব শান্তিপুর গিয়েছিলেন, শ্যামসুন্দরের প্রসাদ পেতে। না পেয়ে আমাকে বলতে এসেছিলেন।' খবর নিয়ে জানা গেল, ঐদিন শান্তিপুরে তিনজন অতিথি প্রসাদ চেয়ে পান নি। পরদিন থেকে শান্তিপুরেও আশ্রমে প্রত্যহ তিনজন অতিথি সেবার ব্যবস্থা হয়।

মাঘ মাসে (১৩০৩) কিরণচাঁদ নবপরিণীতাকে নিয়ে আসেন গুরুসন্নিধানে। সরোজবালা তখন সাধন পান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাপাত্র সাধু দুর্গাচরণ নাগ প্রায়ই গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন করতে আসতেন। তিনি প্রভুকে বলেন, তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়ে তাঁকে গোস্বামী মহাশয়ের অনুগত হয়ে চলার নির্দেশ দেন। নাগ মহাশয় গোসাঁইর নিকট এসে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে তাঁর প্রসাদ যাচ্ঞা করতেন। সদালাপের পর বিদায় নেবার সময় আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, প্রভুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পশ্চাতে পদক্ষেপ ফেলে, ঘর থেকে তিনি বের হতেন।[১]

মাঘোৎসবের দিন (১৩০৩) ব্রাহ্মেরা কীর্তন করে গোস্বামী মহাশয়ের আসন-ঘরে উপস্থিত হন। প্রভু কীর্তনের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন ও ভাবাবেশে নৃত্য করেন। কীর্তনান্তে ব্রাহ্মেরা গোস্বামীপ্রভুকে প্রশ্ন করেন, 'এখন ব্রাহ্মদের কর্তব্য কি?' গোসাঁই বলেন, 'যে কার্যের জন্য ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হয়েছিল, তা শেষ হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজ এখন মৃত। মরা আগলিয়ে বসে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'[২] তাঁর এই মন্তব্য ব্রাহ্মদের মনঃপূত হল না। উমেশচন্দ্র দত্ত জিজ্ঞাসা করেন, 'ভগবানকে কি করে লাভ করা যায়?' প্রভু উত্তর করেন, 'ভক্তের শরণাপন্ন হলে ভগবানকে পাওয়া যায়। দেখেন নাই, বাছুরকে কোলে নিয়ে এগোলে, গোমাতা পশ্চাতে যায়?'

ফাল্গুনের প্রথম দিকে (১৩০৩) স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে কলিকাতা ফিরেন। চার-ঘোড়ার গাড়ি করে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে মিছিল করে, হ্যারিসন রোডের পথ ধরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। উৎসাহে ঘোড়া খুলে দিয়ে, ছাত্রেরা নিজেরাই তাঁর গাড়ি টানেন। গোস্বামী মহাশয় দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিছিলটি দেখেন। স্বামীজীর দৃষ্টি প্রভুর উপর পড়তেই, তিনি গাড়িতে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করেন। গোসাঁইও দু হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। চার-পাঁচ দিন পর স্বামী বিবেকানন্দ গোস্বামীপ্রভুর নিকট এসে বিনীতভাবে বলেন, 'আমি যখন সিকাগো (Chicago) ছিলাম, তখন একদিন ঠাকুর প্রকাশিত হয়ে আমাকে আদেশ করেন, "তুমি দেশে ফিরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সেবা করবে আর

---

[১] অমৃতলাল সেনগুপ্ত-প্রণীত 'আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', ৪র্থ সং, পৃ ১৬১।

[২] জগদ্বন্ধু মৈত্র-প্রণীত 'প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী' পৃ ৫২৬।

তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর কথামত চলবে।"' তাঁর কথা শুনে প্রভু বলেন, 'তুমি যা করছ, তাই আমার কাজ।'[১]

প্রভু যবে বাস করে কলিকাতা মাঝে।
শ্রীবিবেকানন্দ স্বামী আসে তাঁর কাছে॥
প্রভুয়ে প্রণতি করি কহিতে লাগিল।
আপনার সেবা হেতু ঠাকুরে প্রেরিল॥
আমেরিকা মহাদেশে বাস করি যবে।
প্রকাশিত হইলেন গুরুদেব তবে॥
আমারে আদেশ দেন আপনা ভেটিতে।
ভকতি করিয়া কহে বিশেষ সেবিতে॥
পরম আদর প্রভু করিলেন তাঁরে।
ইষ্টমন্ত্র বলিলেন সদা জপিবারে॥
আপন সাধনপথে সর্বদা রহিবে।
বুঝিব সর্বোচ্চ সেবা তবেই করিবে॥
অন্য সেবা তোমা স্থানে বাঞ্ছা নাহি করি।
তোমার বিজয় ইচ্ছা হৃদি মাঝে ধরি॥[২]

ফেরার পথে স্বামীজীর সঙ্গে সিদ্ধবাবার সাক্ষাৎ হয় (সিদ্ধবাবার আশ্রম, সুরসেনা, বেহালা, কলিকাতা)। সিদ্ধবাবাকে স্বামীজী বলেন, 'গোস্বামীপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! দেখি, তিনি আর আমার ঠাকুর অভিন্ন।' সাধুবাবা স্বামীজীকে আলিঙ্গন করে বলেন, 'আপনার সার্থক দর্শন হয়েছে।'[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গৃহীভক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়, প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের ভাষ্যকার মাস্টার মহাশয় মহেন্দ্র গুপ্তের কার্যাবলী যেন একই সূত্রে গাঁথা। তিনের মধ্যেই বিচিত্র এক সুর এবং স্বতঃস্ফূর্ত সংহতি।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি (১৩০৩) শিবরাত্রি উপলক্ষে হরিদাসবাবু মেয়েদের নিয়ে কলিকাতা এসে গুরুস্থানে না উঠে, ধনী সুশিক্ষিত অকৃপণ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী—এক আত্মীয়-গৃহে উঠেন। ইনি ইংরেজ-ভাবাপন্ন; ধর্মের ধার ধারেন না। বড়লোক ইয়ার-বন্ধু নিয়ে অবসর সময় কাটান। হরিদাসবাবুকে মেয়েদের নিয়ে গোস্বামীপ্রভুর নিকট যেতে দেখে গৃহস্বামী ও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বিরূপ সমালোচনা চলে। অতিথি সবই বুঝেন। তাঁর অবস্থা করুণ। এই পরিস্থিতিতে অন্যত্র উঠে যাওয়াও দৃষ্টিকটু। নিরুপায় হয়ে হরিদাসবাবু লজ্জায় নীরব থাকেন। সাধনপ্রার্থী তাঁর একটি কন্যার বয়স সাত, কিন্তু দেখতে মনে হয় পাঁচ। গৃহস্বামীর বন্ধুদের মধ্যে একজন, ঐ মেয়েটিকে দেখিয়ে গায়ে পড়ে বসু মহাশয়কে বলেন, 'আপনার এই শিশু-কন্যাটিরও নাকি দীক্ষা হবে?' হরিদাসবাবুও সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি বললেন, 'সন্তানকে সৎশিক্ষা দান, তার নৈতিক জীবনগঠন

---

১. অমৃতলাল সেনগুপ্ত-প্রণীত 'আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', পৃ ১৬১।
২. অমিয়কুমার সান্যাল-প্রণীত 'শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণলীলামৃত', পৃ ২৭২।
৩. ডাঃ খগেন্দ্রমোহন দাশ-সংকলিত 'শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবার অমৃতবাণী', পৃ ২৮।

মাতা-পিতার কর্তব্য। যে পিতা মনে করেন, সন্তানের জন্য অর্থ-সঞ্চয় করে গেলেই তাঁর দায়িত্ব পালন করা হয়, তিনি ভ্রান্ত। ধন বিষম কালকূট। ধন-উপার্জনে কষ্ট, সংরক্ষণে কষ্ট আর বিনাশেও কষ্ট। অভিমানে-অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে, ধনী ধরাকে সরা জ্ঞান করেন; মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করেন না। দরিদ্রের দুঃখ-কষ্ট তাঁদের মনে রেখাপাত করে না। আবার অর্থাসক্তি অধিক হলে মানুষ কৃপণ হয়ে পড়ে। কৃপণ ব্যক্তি প্রিয়জনের অসুখ হলেও অর্থব্যয়ের ভয়ে সুচিকিৎসা করান না। অর্থই তাঁর সর্বস্ব। পরোপকার আর কি করবেন? ধনীর আর এক দুর্ভাগ্য, সজ্জন তাঁর কাছে বড় যান না। চাটুকার ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি তাঁকে ঘিরে থাকে। সংসারে অর্থের প্রয়োজন, সন্দেহ নেই; তবে সংসারের ব্যয় চলে গেলেই হল। অধিক ধন ভাল নয়। দারিদ্র্যও কাম্য নয়। ভগবানের অন্নছত্রে বিশ্বসংসার প্রতিপালিত হচ্ছে। যিনি তাঁর শরণ নেন, ইহ-সংসারে তাঁর অভাব হয় না।

'যে পিতা সন্তানের জন্য প্রচুর অর্থ রেখে যান, অনেক সময় তিনি তার কল্যাণ না করে অনিষ্টই করেন। ধনীর সন্তান প্রায়ই স্বার্থপর ও চরিত্রহীন লোকদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। এইসব লোক তাকে বিপথে নিতে চায়।

'যে পিতা সন্তানকে ধর্মশিক্ষা দেন, তিনিই সন্তানের যথার্থ কল্যাণ করেন। জীব অনাদিকাল থেকে কত যে যোনি ভ্রমণ করে চলেছে! জন্ম-মরণের হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই। মনুষ্য-জন্ম সুদুর্লভ। মনুষ্য-জন্মেই ভগবদ্ উপাসনা সম্ভব। মনুষ্য-জন্ম লাভ করে যে ভগবদ্ আরাধনা করে না, তার মত আত্মঘাতী কে?

'লোকে মনে করে, ধন ও উচ্চপদ লাভের যোগ্য হলেই, সন্তান সুখী হবে। কিন্তু এতে কি ঠিক ঠিক সুখ হয়? আপনাদের ধনও আছে, উচ্চপদও আছে; আপনারা কি সুখী? মানুষ ত্রিতাপ-জ্বালায় অহরহ জ্বলছে। আজ পুত্র-বিয়োগ, কাল পত্নী-বিয়োগ, পরশু যুবতী কন্যার বৈধব্য, প্রিয়জনের উৎকট ব্যাধি, ভয়, দুর্ভাবনা, এসব তো সকল পরিবারেই লেগে আছে। তথাপি আত্ম-জিজ্ঞাসা নেই; আহার-নিদ্রা, ইন্দ্রিয়-ভোগ, তারপরই নীরব শ্মশানযাত্রা!

'মানুষ সুখের জন্য লালায়িত, কিন্তু সে এমনই ভ্রান্ত যে, আনন্দের উৎস ভগবানকে ছেড়ে, সংসার-দাবানলে অহরহ দগ্ধ হচ্ছে। এই ভয়াবহ সংসার-যাতনা যাতে ভোগ করতে না হয়, তাই কন্যাদের ভবরোগবৈদ্য সদ্‌গুরুর কাছে সাধনলাভের জন্য নিয়ে এসেছি।'

হরিদাসবাবুর কথাগুলি শুনে তাঁরা মুগ্ধ হন, তথাপি তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার ছোট কন্যাটি নিতান্ত শিশু; এত অল্প বয়সে দীক্ষার কি প্রয়োজন? এর তো ভালমন্দ বোধই হয় নি।' হরিদাসবাবু বলেন, 'সদ্‌গুরু সব সময় আসেন না। দীক্ষাকার্যে কালবিলম্ব করতে নেই। গোস্বামীপ্রভু সদ্‌গুরু। ধর্মের গ্লানি হলে, সদ্‌গুরু আবির্ভূত হন। সদ্‌গুরু আত্মায় শক্তিসঞ্চার করেন। এই শক্তি আত্মার উপর কাজ করে। নারদ শুকদেবকে গর্ভাবস্থায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। পঞ্চম-বর্ষীয় বালক ধ্রুবও নারদের কাছে দীক্ষা পেয়েছিলেন। আমার এই কন্যাটি যখন বড় হবে, তখন এই শক্তি আপনা থেকে ক্রিয়া করবে। নামের অর্থ জানারও আবশ্যকতা নেই। নাম শক্তি। বস্তু-শক্তির গুণ কোথায় যাবে? জেনেই হোক, আর না জেনেই হোক, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই, শক্তি তার কাজ করবে।

সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা নিতে মূর্খ, জ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র সকলেরই সমান অধিকার।'

বাবুগণ বলেন, 'আমরাও তো কুলগুরুর নিকট দীক্ষা পেয়েছি। কিন্তু গুরুদত্ত নামের শক্তি তো বুঝি না। শক্তি-সঞ্চার কাকে বলে?' হরিদাসবাবু বলেন, 'আপনারা যে নাম পেয়েছেন, তা সাধন করলে ফল নিশ্চয়ই পাবেন। ঈশ্বরের শক্তি সকলের মধ্যেই নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। কোনও মহাপুরুষের প্রবল শক্তির আকর্ষণে সে শক্তিকে জাগ্রত করে দেওয়াকে শক্তি-সঞ্চার বা কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ বলে।' বাবুরা বলেন, 'গুরুদেবদের দুরবস্থা দেখেই ধর্মের প্রতি আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়েছি। নিজেরা দুর্দশাগ্রস্ত ও চরিত্রহীন হয়ে, তাঁরা আবার শিষ্যের কি হিতসাধন করবেন? অন্ধ হয়ে কি করে পথ দেখাবেন? উপযুক্ত আচার্যের অভাবেই লোক এত ধর্মহীন।'[১]

শ্রীধরের উঠে বসন্ত। বুড়াঠাকরুণ আর শান্তিসুধা গিয়ে যোগজীবন গোস্বামীকে বলেন, 'ছোঁয়াচে রোগ! ছেলেপিলে সব রয়েছে। ওঁকে হাসপাতালে পাঠালে হয় না?' পিতার আসন-ঘরের সম্মুখে যোগজীবন করেন আনাগোনা। প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'যোগজীবন, কিছু বলবি?' যোগজীবন বলেন, 'শ্রীধরকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই?' হুঙ্কার দিয়ে উঠেন গোস্বামীপ্রভু; ছিঃ! ছিঃ!! ছিঃ!!! কি করে তুই এমন কথা মুখে আনতে পারলি! শান্তির ছেলেদের হলে কি করতিস?' ক্লেশে, দুঃখে হয় প্রভুর বাগ্‌রোধ। সজল চোখে তিনি যোগজীবনকে বলেন, 'তেতলার ঘরে শ্রীধরকে পাঠিয়ে দে।' যোগজীবন বলেন, 'দেখাশোনা কি তেমন হবে?' প্রভু ধীরকণ্ঠে বলেন, 'আমি করব।' শেষ পর্যন্ত সারদাকান্ত স্বেচ্ছায় শ্রীধরের সেবার ভার নেন।

কাশীধামনিবাসী কৃষ্ণানন্দ স্বামীর পরস্ত্রীগমনের অভিযোগে, কারারুদ্ধ হবার সংবাদ শুনে গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'চক্রান্ত করে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে।' প্রভু শিষ্যদের দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করান এবং উকিল এক শিষ্যকে নির্দেশ দেন, এই অর্থ যেন আপীলে ব্যয় হয় এবং কৃষ্ণানন্দ স্বামীর মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। ইনিই ১৩০০ সালে, প্রয়াগের কুম্ভমেলায় গোস্বামীপ্রভুকে মেলা থেকে অপসারণের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণ শোনামাত্র, গোস্বামী মহাশয় তাঁর আসন-ঘরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ করে দেন; এবং দরজার বাইরে লিখে রাখা হয়, **'স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশ নিষেধ।'**

গোস্বামীপ্রভু একদিন প্রাতর্ভ্রমণে বের হয়েছেন, সংগে কয়েকজন শিষ্য। পথের দুধারে ইমারত নির্মাণ হচ্ছে। ঐসব দেখে প্রভু মন্তব্য করেন, 'অচিরে এক খন্ড-প্রলয়ে কলিকাতা মাঠ হয়ে যাবে।' শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাদের কি হবে, ঠাকুর?' গোসাঁই বলেন, 'যাঁরা নামের আশ্রয়ে থাকবেন, তাঁরা শুধু রক্ষা পাবেন।[২]

আর একদিন পথে চলতে চলতে গোস্বামী মহাশয়ের উপর পাশের বাড়ীর উপরতলা থেকে কয়েক ফোঁটা জল পড়ে। শিষ্যেরা বিব্রত হয়ে বলেন, 'মূত্রের ফোঁটা

---

১. হরিদাস বসু-প্রণীত 'মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা', ২য় সং, পৃ ২৬৮-২৭৮ অবলম্বনে।

২. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত।

না হলেই রক্ষা।' প্রভু তখন মন্তব্য করেন, 'মূত্র বরং ভাল, উচ্ছিষ্ট জল না হলেই হল।'[১]

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা আসেন দেওঘর থেকে। টেলিগ্রাম আসে তাঁর কাছে, তাঁর মেয়ে দুটির ভেদ-বমি হচ্ছে। মনোরঞ্জনবাবু ঐদিনই ট্রেনে রওনা হন দেওঘর। ওখানে পোঁছে দেখেন মেয়েরা ভালর দিকে, আর কাল-ব্যাধির সব উপসর্গগুলি মনোরমা দেবীর দেহে প্রকাশ পেয়েছে।

ঐদিন রাত্রে হ্যারিসন রোডের আশ্রম-গৃহে গোস্বামীপ্রভু মোহিনীবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন, ঘরে আর কেউ নেই। প্রভু বলেন, 'মনোরমা এসেছেন।' মোহিনীবাবু বলেন, 'কোথায়? আমি দেখতে পাচ্ছি না।' গোসাঁই বলেন, 'চেয়ে দেখুন, এই যে।'

শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্য চক্ষু অর্জুনেরে।
অর্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে॥

তখন আলোর ঝলক দেখেন মোহিনী রায়। ধীরে ধীরে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠে ছায়াচিত্রের পর্দায়—সাদা শাড়ি পরে, মনোরমা দেবী! প্রশান্ত মূর্তি! মোহিনীবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাদের বাড়ী যাবেন না?' মনোরমা দেবী উত্তর দেন, 'এখন বড় তাড়া। শান্তির সঙ্গে দেখা করব; সময় পেলে যাব।' প্রভু তখন বলেন, 'মনোরমা কারণ-দেহে এসেছিলেন।' মোহিনীবাবু তখন বুঝেন, মনোরমা দেবী বেঁচে নেই। আশ্রমেই হয় শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা। মনোরমা গুরুকে গিয়ে বলেন, 'ভেজাল ঘি আনা হয়েছে।' মনোরঞ্জনবাবু তা বদলিয়ে ভাল ঘি আনেন। গঙ্গার ঘাটে শ্রাদ্ধ হয়। আশ্রমে ফিরে মনোরঞ্জনবাবু গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, 'মনোরমা কি এসেছিলেন?' প্রভু বলেন, 'হ্যাঁ, মনোরমা নিজে উপস্থিত থেকেই তো সব করলেন। খানিক পূর্বেও সম্মুখের বারান্দায় ছিলেন। আমার ঘরে মেয়েদের আসতে বারণ। সেই নিষেধ এখনও মেনে চলেন। কি অদ্ভুত নিষ্ঠা!'

গুরু যে নাম দিয়েছিলেন, তার প্রতি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (২) এমন অনুরাগ হল যে প্রত্যহ দশ ঘণ্টা করে তিনি নাম-সাধন করেন। কিন্তু সেদিন গোস্বামীপ্রভু বলেন তাঁকে, 'সকাল-সন্ধ্যায় তোমার আধঘণ্টা নাম করলেই হবে।' মাসখানেক পর ফের তিনি বলেন, 'এখন তোমার প্রাতে পাঁচ মিনিট আর সন্ধ্যায় পাঁচ মিনিট—দিনে মোট দশ মিনিট নাম করলেই হবে।' কয়েকদিন পর সতীশবাবু গুরুকে গিয়ে অনুনয় করে বলেন, 'নামের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করছি। সকাল-বিকাল আধঘণ্টা করে নাম করার অনুমতি দিন। সাধনের সময় তো বলে দিয়েছিলেন, প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে যেন নাম করি।' গোস্বামীপ্রভু তদুত্তরে সতীশবাবুকে বলেন, 'হ্যাঁ, তখন যেমন বলেছিলাম নাম করতে, এখন আবার বারণ করছি। তোমার আর নাম করার প্রয়োজন নাই। তোমার হয়ে আমি নাম করব। তোমার প্রারব্ধ তোমাকেই ভোগ করতে হবে। ওইটি আমি পারব না।'

সতীশবাবু গুরুর কাছে তাঁর জীবনের গুহ্য কথা বলতে শুরু করতেই প্রভু বলেন, 'তোমার কিছুই বলতে হবে না। তোমার ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সবই আমার জানা আছে; শুধু তোমার পূর্ব-পূর্ব জন্মের নয়, পরজন্মের কথাও আমি জানি। আর কেবল তোমার কথাই নয়, সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে যেসব প্রাণী আছে, তাদের কথাও আমি জানি।'

---

[১] প্রভুপাদ শান্তিসখা গোস্বামী মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত।

গোস্বামীপ্রভুর নির্দেশে, ভাগবতী চতুষ্পাঠীর মুখপাত্র রূপে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২) ১৩০৪ সালে “ডন” কাগজ প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন। সতীশচন্দ্রের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল—এই কাগজের আয় থেকে ভাগবতী-চতুষ্পাঠীর সুষ্ঠু পরিচালনা। ১৩০৪ সালে “ডন” কাগজের প্রথম সংখ্যা বের হলে সতীশবাবু কাগজ নিয়ে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। “ডন” মস্তকে ধারণ করে গোসাঁই প্রায় দশ মিনিট সমাধিস্থ থাকেন। তারপর সতীশবাবুকে আশীর্বাদ করে বলেন, ‘ভগবান তোমার উপর এ কাজের ভার দিয়েছেন।’ একবার সতীশবাবুর অসুখ হয়। তিনি চেঞ্জে যাবেন স্থির করে, “ডন” পরিচালনা করার ভার তাঁর সহকর্মীর উপর দিতে, গুরুর অনুমতি চাইলে, তিনি বলেন, ‘ভগবান তোমার উপরই এই কাগজের ভার দিয়েছেন, আর কারও উপর তো দেন নাই। তুমি যতদিন বাইরে থাকবে, “ডন” বন্ধ থাকবে। কাজেও তাই হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর আলাদা আলাদা এই আশ্রমে প্রভুকে দর্শন করেন। ধর্ম-বিষয়ে গোস্বামী মহাশয়কে তাঁরা নানা প্রশ্ন করে তাঁর উত্তরে বড় আনন্দ পান। সংকীর্তনে গোসাঁইর নৃত্য দেখে গুরুদাসবাবু মুগ্ধ হন। আশ্রমে গোস্বামীপ্রভু এঁদের যথোচিত সম্মান করেন। পরে একদিন তিনি বলেন, ‘ভগবান এঁদের উচ্চপদ ও সম্মান দিয়েছেন। এঁদের মর্যাদা না দিলে অপরাধ হয়।’

আশ্রমে উৎকল-দেশীয় পাচক শত্রুঘ্ন ঠাকুর ছিলেন প্রভুর শিষ্য। কুসঙ্গে পড়ে তাঁর চাল-চলন হয় এলোপাতাড়ি। আশ্রমের জিনিসপত্রের তিনি অপচয় করতেন। একদিন গোস্বামী মহাশয় তাঁকে সাবধান করে বলেন, ‘ভগবানের দানের বস্তু নিয়ে ছিনিমিনি খেল না।’ কিন্তু এ-সব কথা তাঁর কানে যায় না। একদিন তাঁর শরীরে এমন দহন-জ্বালা হয়, শরীর যেন পুড়ে যায়। ঘরের মেঝেতে তিনি আর্তনাদ করে গড়াগড়ি দেন। তখন হতে তাঁর শুভবুদ্ধির উদয় হয়।

কিরণচাঁদ তাঁর গরম জামাটি তোরঙ্গ থেকে বের করে দেখেন, এমন জায়গা নেই, পোকায় কাটে নি। কি আর করেন? শান্তিসুধার তিনি শরণাপন্ন হন। তাঁকে গিয়ে বলেন, ‘শান্তিদি, আমার জামাটা ঠিক করে দিন।’ টুকরা কাপড়ের গাঁঠরী থেকে নানা রঙের কাপড় দিয়ে তিনি জামায় তালি দিয়ে দেন। ঐ জামাটি পরে গোসাঁইর কাছে গিয়ে বসতেই তিনি কৌতুক করে বলেন, ‘কিরণচাঁদ দরবেশ।’

বড়বাজারে ভোলাগিরিবাবাকে দর্শন করতে গিয়েছেন মনোরঞ্জনবাবু—একদিন যখন তিনি গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করে ফিরছিলেন। তাঁকে সমাদর করে বসিয়ে গিরিমহারাজ বলেন, ‘বড় ভাল হয়েছে, তুমি এসেছ। উদ্বেগ ও অস্বস্তির ভিতর গতকাল আমার সারাটা দিন-রাত কেটেছে। কথাপ্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম, “আশুতোষের কাছে বড় লোকসমাগম হয়, এত লোকসংঘট্ট ভাল নয়।” এই মন্তব্য করার পর থেকে বারবার মনে হয়েছে, আমি ভুল করেছি। যাঁরা আচার্য হয়ে আসেন, তাঁদের নিকট তো লোকসমাগম হবেই। তুমি আশুতোষকে বল—আমি তাঁর বালক। তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।’

ব্যবধান এক সরু গলি অথচ হ্যারিসন রোডের উপরই বাড়ী দুখানা। ঘর দুখানি মুখোমুখি আর জানালায় জানালায়ও যেন মিতালি। গোসাঁই আছেন এরই একখানা বাড়ীতে আর কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী থাকেন ওই রকম ঘরে। আর

পাশের বাড়ীর বিপরীত ঘরে থাকেন পার্শি ধনকুবেরের রূপসী কন্যা। সারা দেহে তার রূপের ডালি। ধীরে ধীরে মদন তাঁর শর যোজনা করেন। যুবতী একদিন মৌন ভাঙ্গে। ব্রহ্মচারীকে ইসারায় আহ্বান করে বলে, 'কেন আপনার এই কঠোরতা? আপনাকে পতিরূপে পেলে আমার জীবন সার্থক হয়। অর্থ যা আছে, তাতে কয়েক পুরুষ স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।' দেড় মাস ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, ব্রহ্মচারীর মনে চলে অন্তর্দ্বন্দ্ব; জিজ্ঞাসা আসে—এই কি তাঁর সাধক-জীবনের পরিণতি? যাঁকে আশ্রয় করে সব ছেড়েছুড়ে এসেছেন, তাঁর কি কোন শক্তি নেই? তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। গোস্বামী মহাশয় তখন শৌচে। কুলদানন্দ লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়ান শৌচাগারের বাইরে। বের হওয়া মাত্র গুরুর মাথাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন!

প্রভু খিল-খিল করে হেসে উঠেন। বের হতে হতে তিনি কুলদানন্দকে লক্ষ্য করে বলেন, 'স্থির হও, স্থির হও। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্তের প্রতি ঘটনাটি আমি জানি।' তারপর একটি একটি করে সব বলে যান। ব্রহ্মচারী কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়েন গুরুর শ্রীপদে। গোস্বামীপ্রভু সস্নেহে তাঁর মাথার উপর হাত রাখেন। কুলদানন্দ বলেছেন, 'এই পবিত্র স্পর্শ আমাকে নবজীবন দিল।'[১] শিক্ষাবিদ্ কুমুদবন্ধু সেন ছাত্রাবস্থায় গোস্বামী মহাশয়ের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'ছাত্রদের কি করা কর্তব্য?' প্রভু বলেন, 'কেন? মহাপ্রভু যা বলেছেন, তাই। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" নাম করবে।' কুমুদবাবু বলেন, 'কিন্তু সকলেই তো বলে থাকেন, "বড় হয়ে নাম করবে।"' গোসাঁই বলেন, 'না, ওঁরা জানেন না. নামসাধনের পক্ষে যৌবনই প্রকৃষ্ট সময়। ওঁদের কথা শুনো না। যাঁরা বলেন, "সমুদ্র শান্ত হলে, স্নান করব," তাঁদের আর সমুদ্রস্নান হয়ে উঠে না।'

প্রভুর কাছে যোগসাধন পাবার পূর্বে মোহিনীমোহন রায় ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। দীক্ষালাভের পরও তিনি প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজে যেতেন। এমনই ছিল তাঁর সমাজের প্রতি আকর্ষণ! মাঘোৎসবের সারাদিন সমাজেই তাঁর কাটত। কিন্তু ১৩০৪ সনের মাঘোৎসবে, তিনি একবারও যান নি শুনে, গোস্বামী মহাশয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি যে সমাজে গেলেন না?' মোহিনীবাবু উত্তরে বলেন, 'যেতে আর ভাল লাগে না; অন্তর থেকে কোন সাড়া পাই না।' তাঁর কথা শুনে গোসাঁই বলেন, 'ওখানে গিয়ে আর কি হবে?' মোহিনীবাবু তখন আবার বিনীতভাবে মন্তব্য করেন, 'সাধন পাবার পর কি যে হল! যাঁরা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, সহকর্মী ছিলেন, একসঙ্গে বসে দিনের পর দিন যাঁদের সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনায় মেতে ছিলাম, তাঁদের সংস্পর্শে এলে নাম বন্ধ হয়ে যায় কেন? আর এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, যারা সমাজে পতিতা তাদের অনেকের কাছে এলেও নাম ঠিকই চলতে থাকে। এরূপ কেন হয়?' গোস্বামীপ্রভু তাঁকে বলেন, 'ঐরূপ হওয়াই তো স্বাভাবিক। যারা ভগবদ্বিদ্বেষী, তাদের সংস্পর্শে এলে নাম বন্ধ হবে না কেন? নাস্তিকের কাছে এলে নাম তো বন্ধ হবেই।' মোহিনীবাবু বলেন, 'এ কেমন কথা? যাঁদের নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র ব্রাহ্ম বলে জানি, তাঁরা কি করে নাস্তিক আর ভগবদ্‌দ্বেষীই বা ওঁরা কি করে?' প্রভু তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, 'শাস্ত্র হল ভগবদ্বাক্য

---

১. শ্রীমদ্ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী-কথিত 'ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ প্রসঙ্গ' থেকে।

ও ভগবদ্বিধান। যাঁরা শাস্ত্র-সদাচার মানেন না, আর ভগবদ্‌ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের বিরোধিতা করেন, তাঁরা কি ভগবদ্‌দ্বেষী, নাস্তিক নন? বারবনিতারা চরিত্রহীন বটে; কিন্তু শাস্ত্রে, সাধু-সন্ন্যাসীতে তাদের অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস। ওরা সব সময় নিজেদের বড়ই দীনহীন মনে করে। ওরা কাছে এলে নাম বন্ধ হবে কেন? তারা ভগবদ্‌দ্বেষী ব্রাহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'[১]

বেনামী চিঠি যায় কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে: ৪৫, হ্যারিসন রোডের আস্ত ত্রিতল-বাড়ীটি ভাড়া করে রয়েছেন কয়েকজন শিক্ষিত বেকার। রোজই ওখানে উৎসব; শত শত লোক চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন করে। মাসের পর মাস কি করে এই গুরু ব্যয়ভার নির্বাহ হয়, ইহা এক রহস্য! আবগারি এবং পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তারাই বা এ ব্যাপারে এত উদাসীন কেন? গোস্বামী মহাশয়ের এক শিষ্য এই উড়ো-চিঠির বিষয় জানতে পেরে গোসাঁইকে তা জ্ঞাপন করেন। প্রভু তাতে নির্বিকার। তিনি অনন্যশরণ, তাঁর কিসের ভাবনা?

ভূতনাথ গোপ নামে এক যুবক সোদপুর হতে ট্রেনে করে দুধ বেচতে আসত কলিকাতায়। প্রভু তার দুধের সুখ্যাতি করেন। ভূতনাথ এ-কথা শুনে গোসাঁইর আসন-ঘরে যেয়ে তাঁকে প্রণাম করতে চান। তিনি তখনই তাকে সাধন দিয়ে দেন।[২] ভূতনাথ একদিন হ্যারিসন রোডে একখানি 'বেয়ারার চেক' কুড়িয়ে পেয়ে গুরুর কাছে জমা দেন। গোস্বামী মহাশয় পুলিশ কমিশনারের কাছে চেকখানা জমা করায়ে 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন।

একদিন সাধুবেশধারী একটি লোক এসে ত্রৈলঙ্গস্বামীর শিষ্য বলে আত্মপরিচয় দেন। যোগজীবনের ঘরে তাঁকে বসান হয়। তিনি দেখতে পান, যোগজীবনের হাত-বাক্সে তিনখানি একশ টাকার নোট। লোকটি তখন গোস্বামীপ্রভুর কাছে গিয়ে ঐ টাকা যাচ্‌ঞা করেন। যোগজীবনকে প্রভু ডেকে পাঠান। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—

—তোর বাক্সে কি টাকা আছে?

—হ্যাঁ, বাড়ীভাড়ার জন্য তিনশ টাকা ধার করে এনেছি। আজই টাকা নিতে বাড়ীওয়ালার লোক আসবে।

—এঁকে টাকাগুলি দিয়ে দে।

টাকা নিয়ে তিনি চলে গেলে, শিষ্যেরা গিয়ে গোসাঁইকে বলেন, 'লোকটি কাশীর প্রখ্যাত গুণ্ডা।' প্রভু বলেন, 'আমি জেনেশুনেই ত্রৈলঙ্গস্বামীকে মর্যাদা দেবার জন্য এই টাকা ওকে দিয়েছি।'

১৩০৪ সালে শিবরাত্রি উপলক্ষে গুরুদর্শনে কলিকাতা যাবার ইচ্ছা হলে, হরিদাস বসুর মনে হয়, তাঁর গ্রামবাসীগণ যদি গোস্বামী মহাশয়ের কৃপা লাভ করে, তাহলে একটি কাজের মত কাজ হয়। কে গোসাঁইর কৃপাপাত্র আর কে না, বুঝে উঠা দায়। তিনি তাঁর দাদাকে দেশে চিঠি লিখেন, 'আমি ৮ ফাল্গুন, ১৩০৪, ল্যুপ মেলে কলিকাতা যাচ্ছি। কুলীনগ্রামবাসী, যাঁরা গোস্বামীপ্রভুর কাছে দীক্ষা পেতে চান, তাঁদের পাঠিয়ে দিন, আমি তাঁদের সব ব্যয়ভার বহন করব।'

বেলা নয়টায় হরিদাসবাবু মেমারী স্টেশনে পৌঁছে দেখেন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উগ্র-

---

[১] জগদ্বন্ধু মৈত্র-প্রণীত 'প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', পৃ ৫২৬-৫২৭।

[২] গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য ভূতনাথ গোপ মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত।

ক্ষত্রিয়, তাঁতি, যোগী, সদ্‌গোপ, কামার, ছুতার, বোষ্টম, নাপিত, গোয়ালা, ময়রা, হাড়ি, ডোম, দুলে সব রকম লোক এসেছে। ভদ্রঘরের কুলবধূও আছেন। আবার ষণ্ডা, গুণ্ডা, চোর, ছ্যাঁচোর, লম্পটও আছে। সতীসাধ্বী সধবাও আছেন, আবার ব্যভিচারিণী বিধবাও আছেন। উপপতি ও উপপত্নীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। হরিদাসবাবুর কি লজ্জা! কিন্তু কি আর করবেন? তাঁরই আমন্ত্রণে ওঁরা এসেছেন।

সারদাকান্ত তখন গোস্বামী মহাশয়ের প্রধান সেবক। কুলীনগ্রামবাসীদিগের কথা তাঁকে বলায়, তিনি হরিদাসবাবুকে বলেন, 'ঠাকুর যাকে-তাকে সাধন দেন না। দূর-দূরান্ত থেকে কত লোক এসে সাধন না পেয়ে ফিরে যায়। আপনি ঠাকুরকে এঁদের কথা খুলে বলুন। তাঁর যা অভিপ্রায়, তাই হবে।'

সারদাবাবুর মন্তব্য শুনে পণ্ডিত মহাশয় বলেন, 'যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কে কোন্ প্রকৃতির তা কি গোসাঁইর অজানা? কোন কিছু তাঁকে বলার প্রয়োজন নেই। তাঁর আকর্ষণেই এঁরা সব এসেছেন।'

পরের দিন ত্রয়োদশী। ঐদিন সকালে গোস্বামীপ্রভুর আসন-ঘরে গিয়ে ভক্তেরা বসতেই, তিনি শিবচতুর্দশীর উপাখ্যান বিবৃত করেন। তাঁর কথা শেষ হতেই, সময় বুঝে হরিদাসবাবু বলেন, দেবাদিদেব মহাদেব শুধু একটি মাত্র ব্যাধকে উদ্ধার করেছেন। আজ শত শত ব্যাধ কুলীনগ্রাম থেকে আপনার শরণাপন্ন হয়ে এখানে এসেছে। আমার ভোলানাথ কি এঁদের উদ্ধার করবেন না?' গোস্বামী মহাশয় তাঁকে বলেন, 'আগামী দিন বেলা আটটায় এদের বসিয়ে দিও।' পরদিন ভোরে গঙ্গাস্নান করে স্ত্রীলোকেরা এক ঘরে বসেন আর পুরুষেরা আর এক ঘরে। প্রভু যেমন 'নাম' দিলেন, অমনি বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। কেউ হাসেন, কেউ কাঁদেন, কেউ নাচেন, কেউ গান, কেউ মাথা খোঁড়েন, কেউ চীৎকার করেন। কারও প্রাণায়াম চলে; হুলুস্থুল কাণ্ড। গোস্বামী মহাশয় 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলতে থাকেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে সকলে শান্ত হন। ওঁদের প্রসাদ পাবার পর, হরিদাসবাবু সকলকে কুলীনগ্রামে পাঠিয়ে দেন। গোসাঁই হরিদাসবাবুকে বলেন, 'আবার তোমাদের সেই সাবেক কুলীনগ্রাম হল।'[১]

রাখাল রায়চৌধুরী শ্রীক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে গোস্বামীপ্রভুকে জগন্নাথদেবের প্রসাদ দেন। এর কয়েকদিন পর এক বন্ধু এসে নবকুমার বাগচীকে বলেন, 'জগন্নাথ দর্শনে যাবেন? যদি যান, তাহলে পাশ দিতে পারি।' নবকুমারবাবু গোস্বামীপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, 'শুভস্য শীঘ্রম্। জগন্নাথদেবই এই ব্যবস্থা করেছেন।' অমৃতলাল সেনও গুরুর অনুমতি নিয়ে টিকেট সংগ্রহ করে নবকুমারবাবুর সহযাত্রী হন। শ্রীধর ঘোষও গিয়ে ধরেন গোসাঁইকে। হরিনারায়ণ রায় শ্রীধরের পাশের ব্যবস্থা করেন। জাহাজে একসঙ্গে তাঁরা পুরীধাম যাত্রা করেন। পাঁচদিন শ্রীক্ষেত্রে থেকে তাঁরা ফিরে আসেন। তাঁদের কাছে জগন্নাথধামের বিবরণ শুনে প্রভু জগদ্বন্ধু দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। এমন কি পঞ্জিকা দেখে, শ্রীক্ষেত্র যাত্রার দিনটি পর্যন্ত স্থির করে ফেলেন। যোগজীবন বলেন, 'বাবা, হাতে টাকা তো মোটেই নেই।' গোসাঁই বলেন, 'ও-সব জানা-না-জানার আমার প্রয়োজন নাই। ঐদিন যাবার জন্য ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন। টাকা যদি জুটে ভাল, নয়ত হেঁটে যাব।' তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানাজানি হলে, ভক্তেরা টাকা পাঠান। সাড়ে

---

[১] হরিদাস বসু-প্রণীত 'মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা', ২য় সং, পৃ ৩৩০-২।

তিন হাজার টাকা আসে। প্রভু বলেন, 'এবার আপনারা সব ব্যবস্থা করুন।' বাদ সাধতে চান মুক্তকেশী দেবী। তিনি বলেন, 'আপনার পুরী যাবার ব্যাপারে বেয়ান-ঠাকরুণের নিষেধ ছিল।' গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'মার মাথার ঠিক ছিল না।' ভক্তেরাও আপত্তি তুলেন। প্রভু গম্ভীরভাবে বলেন, 'আমায় যেতেই হবে।' দেড় বছরের উপর হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে থেকে গোস্বামীপ্রভু পুরী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। যাত্রার পূর্বদিন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে (২) গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'তোমাকে দিয়ে গেলাম, আকাশবৃত্তি। উপার্জন করার চেষ্টা করবে না; কারও কাছে ধার চাইবে না। কাউকে অভাব জানাবে না, ভিক্ষা করবে না, যে কাজের ভার দিয়েছি, তা করে যাও, তোমার সব ভার ভগবান নিয়েছেন। দোতলা বাড়ী ভাড়া করে পাচক ও পরিচারক নিয়ে থাকবে।'

শ্রীক্ষেত্রে গমন

কলিকাতা থেকে পুরী পর্যন্ত তখনও রেলপথ হয় নি। কটকের নয় মাইল দূরে বারং স্টেশন থেকে পুরীর ট্রেন ছাড়ত। শ্রীক্ষেত্র যাবার তখন দুটি পথ—একটি সমুদ্রপথে জাহাজে, অপরটি ক্যানেল দিয়ে জলপথে ও স্থলপথে। সমুদ্রপথে সুবিধা হলেও, খাড়া দড়ির সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠতে হত বলে গোস্বামীপ্রভুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই, ক্যানেল দিয়ে কটক যাবার জন্য পাঁচশত টাকা ভাড়ায় দুখানা বজরা সমেত একটি স্টীমলঞ্চ 'চার্টার' করা হয়।

২৪ ফাল্গুন, ১৩০৪, যাত্রার দিন পূর্বেই স্থির ছিল। প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্ত-শিষ্য-শিষ্যা গোস্বামীপ্রভুর সহযাত্রী। বেলা দুটায় প্রভু দলবল নিয়ে চাঁদপাল ঘাট পৌঁছেন। পথে বড় কাঁকর। গোসাঁইর পায়ে লাগবে বলে, ভক্তেরা গাড়ি থেকে জেটি পর্যন্ত যার যার গায়ের চাদর বিছিয়ে দেন। কথাবার্তায় এক ঘণ্টার উপর কেটে যায়। চারু দত্ত বলেন, 'ঠাকুরকে নিয়ে আমরা কি আনন্দে ছিলাম! এখন কি নিয়েই বা থাকব?' প্রভু বলেন, 'কেন? ঘরে ঘরে কর নাম সংকীর্তন, শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবন।'—মহাপ্রভু যা বলেছিলেন, সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচল যাবার সময়। গোসাঁই মনোরঞ্জনবাবুকে বলেন, 'আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন।' মনোরঞ্জনবাবু সজল চোখে বলেন, 'আপনাকে আমরা আবার কি আশীর্বাদ করব?' গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'এই আশীর্বাদ করুন, যেন জগন্নাথদেব আমাকে গ্রহণ করেন।' তাঁর এই কথা শোনামাত্র ভক্তদের মধ্যে কান্নার রোল উঠে। ভূতনাথ গোপ মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে থাকেন। গুরুর নির্দেশে, মণিবাবু ও জগদ্বন্ধুবাবু মেয়েদের নিয়ে একটি বজরায় উঠেন। অন্যটিতে গোস্বামীপ্রভু উঠেন শিষ্যদের নিয়ে। অপরাহ্ন চারটার সময় জগন্নাথদেবের ধ্বনি দিয়ে লঞ্চ ছাড়ে। যতক্ষণ দেখা যায় ভক্তেরা সুরধুনীর তীরে দাঁড়িয়ে বজরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। জোড়া বজরা নিয়ে লঞ্চ চলে গঙ্গার উপর দিয়ে। মৃদুমন্দ সমীরণ, উভয় তীরে চোখে পড়ে বনানী, গাছপালা আর ফাঁকে ফাঁকে ঘর-বাড়ী। রাজপথের চাঞ্চল্য আর নেই। কোলাহলপূর্ণ মহানগরীর উপকণ্ঠে যেন প্রকৃতির খাসমহল। সূর্যাস্তের পর আঁধার নামতে না নামতে জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যায়। বজরার ভিতর প্রভুকে নিয়ে আর আনন্দ ধরে না। মধ্যরাত্রে লঞ্চ এসে ক্যানেলের মুখে নোঙর করে।

২৫ ফাল্গুন, বেলা আটটা নাগাদ ক্যানেলের লোকেরা 'টোল' আদায় করে লঞ্চকে ক্যানেলে প্রবেশের অনুমতি দেয়। দুপাশে ছায়া-সুনিবিড় গ্রাম। ক্যানেলের ভিতর দিয়ে বজরা নিয়ে লঞ্চ অগ্রসর হয়। বেলা দুপুরে গেঁয়োখালিতে, ক্যানেলের গায় পাকা ডাকবাংলা দেখে লঞ্চ থামে। মাজা-ঘষা করে ওখানে রান্নার ব্যবস্থা হয়। ঐদিন দোল-পূর্ণিমা। ভক্তেরা কেউ কেউ সঙ্গে করে আবির নিয়ে এসেছেন। গুরুর চরণে আবির দিয়ে তাঁরা স্নান করেন। বিধুবাবুর কাঁধে হাত রেখে গোসাঁই ডাক-বাংলায় যান। মেয়েরা বসেন ভিতরে, আর বারান্দায় প্রভুর সঙ্গে একসারিতে বসে সকলে প্রসাদ পান। সরলনাথের পাতায় কার উচ্ছিষ্ট পড়েছে বলে তিনি উঠে দাঁড়ান। গোস্বামী মহাশয় বিরক্ত হয়ে বলেন, 'এতে তুমি সকলকে তোমার উচ্ছিষ্ট খাওয়ালে; যাঁরা এরূপ করেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে না বসাই ভাল।' আহারের পর লঞ্চ ছাড়ে। মেদিনীপুরের পল্লী-অঞ্চল দিয়ে ক্যানেল গিয়ে উৎকল দেশে পড়েছে। রাতভোর লঞ্চ চলে। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। পরদিন বেলা নয়টা নাগাদ লঞ্চ থামিয়ে, চা-হালুয়ার ব্যবস্থা হয়। বিধুবাবু সরলনাথকে সঙ্গে নিয়ে যান পাশের গ্রামে, দুধের খোঁজে। বেলা বারটা নাগাদ এক দোকানের পাশে লঞ্চ থামিয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়। ঐদিনও সারারাত লঞ্চ চলে।

২৭ ফাল্গুন, ১৩০৪, বংলার সীমা পার হয়ে উৎকল দেশের অভ্যন্তরে ওঁরা প্রবেশ করেন। ঐদিনও বেলা এগারটায় একটি পুরান পাকা ডাক-বাংলা পেয়ে লঞ্চ থামে। মধ্যাহ্ন-আহার শেষ হলে আবার যাত্রা হয় শুরু। অপরাহ্ণে ক্যানেলের পার ধরে, লেংটিপরা একটি ছেলে—'পয়সা দাও, পয়সা দাও' বলে পাল্লা দিয়ে ছুটে। বজরার আরোহীরা ওদের পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু অনেকগুলি পয়সা জলে পড়ে যায়। একটি কুব্জা মেয়ে পয়সা পেল না বলে গোসাঁই দুঃখ করেন। বিধুবাবু একটি টাকা ও কিছু পয়সা গাঁটে বেঁধে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মেয়েটিকে টাকাটা ও ছেলেদের পয়সা দিয়ে, তিনি সাঁতার কেটে বজরার দিকে এলে লঞ্চের গতি কমিয়ে তাঁকে উঠান হয়। এভাবে আরও দুদিন ক্যানেলে কাটিয়ে, ২৯ ফাল্গুন সন্ধ্যার পূর্বে লঞ্চ কটকে পৌঁছে।

প্রভুর বহু শিষ্য বজরায় স্থানাভাব দেখে সমুদ্রপথে কটক যাত্রা করেছিলেন। দুর্গামোহন পণ্ডিত, কৈলাস বসু, শশী গুহ, রামকৃষ্ণ গুহঠাকুরতা, বাণীকণ্ঠ ঘোষ, ললিত গুহ এবং আরও অনেকে ওঁদের মধ্যে ছিলেন। ওঁরা কটক পৌঁছে গোস্বামীপ্রভুর প্রতীক্ষা করছিলেন। এখন তাঁরা ঘাটে এসে, 'জয় গুরু, জয় জগন্নাথ' ধ্বনি করে গুরুর সঙ্গে মিলেন। ঠিক হয় পরদিন ভোরে, ঘোড়ার গাড়ি করে সকলে বারং যাবেন। যে যেখানে রয়েছেন ঐদিন রাত্রিবাস ওখানে করার জন্য গোঁসাই নির্দেশ দেন। এদিকে কলিকাতায় প্লেগ দেখা দেয় মহামারী আকারে। গোসাঁইগণ নিজেরা আলাপ-আলোচনা করেন, 'প্রভুর শহর থেকে সরতে না সরতে এ কি বিড়ম্বনা!' তাঁরা প্রার্থনা করেন, 'ঠাকুর, দয়া কর, কলিকাতাকে বাঁচাও।' গোসাঁই-শিষ্যেরা গুরুর শরণ নিয়ে নির্ভয়ে চলাফেরা করেন। মহানগরীর লোক প্লেগের নামে শিউরে উঠে। কয়েকদিনের মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে এর প্রকোপ কমে।

৩০ ফাল্গুন, ১৩০৪ সূর্যোদয়ের সময় বজরা থেকে নামার সময় গোস্বামী মহাশয় মাঝি-মাল্লা ও নাবিকদের হাতে দুখানা দশ টাকার নোট দিয়ে বলেন, 'তোমরা এ-পথে কত রাজা, মহারাজাকে নিয়ে এসেছ, তাঁদের কাছে কত না অর্থ

পেয়েছ! আমার আকাশবৃত্তি, আমি আর কি দেব? এই সামান্য অর্থ গ্রহণ করে তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর যেন জগন্নাথস্বামীর দর্শন পাই।'

বজরা থেকে বের হবার পূর্ব মুহূর্তে গঙ্গাধর পাণ্ডা এসে দেখা করেছিলেন। তিনি গোবর্ধন খুঁটিয়ার ভাই, অথচ গোস্বামীপ্রভুর কাছে নিজের পরিচয় দেন গোবর্ধনের ছেলে হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া বলে; যদিও গঙ্গাধর পোষ্যপুত্ররূপে অন্য পরিবারভুক্ত হয়েছিলেন। প্রভু তাঁকে কুড়ি টাকা প্রণামী দিয়ে, প্রণাম করে পদধূলি নেন।

গোস্বামী মহাশয় ঘোড়ার গাড়িতে উঠেন। কেউ কেউ যান গোযানে। বারং স্টেশনে পৌঁছে, মণিবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েকখানা টিকেট কিনেন। তিনি প্রভুর সঙ্গে যোগজীবন, শান্তিসুধা ও বুড়াঠাকরুণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়ে দেন। আর সকলে যান তৃতীয় শ্রেণীতে। বেলা ঠিক বারটায় ট্রেন ছাড়ে। খুরদা থেকে ছাড়ার পর গোসাঁই শান্তিসুধাকে বলেন, 'শান্তি, তোর মেয়ের নাম বিমলা রাখলাম; বিমলা শ্রীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি এখানে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।'[১]

ঐদিন ফাল্গুন-সংক্রান্তি; অপরাহ্ন চারটার সময়, গোস্বামীপ্রভু সদলবলে পুরুষোত্তমধামে (শ্রীক্ষেত্রে) পৌঁছেন। শ্রীক্ষেত্রের সাধারণে প্রচলিত নাম—পুরী। গঙ্গাধর খুঁটিয়া মন্দিরের অনতিদূরে বড় রাস্তার উপর একটি দোতলা বাড়ী ঠিক করেছিলেন। একটি ঘোড়ার গাড়িও স্টেশনে জুটে। বিধু ঘোষ ও আর একজন শিষ্যের কাঁধে হাত রেখে গোসাঁই স্টেশনের বাইরে আসেন। তখন স্টেশন ছিল আরও অনেক দূরে। ভক্তেরা প্রভুকে বলেন, 'ঠাকুর, চার মাইল পথ হেঁটে যাওয়া আপনার পক্ষে বড় পীড়াদায়ক; আপনি ঘোড়ার গাড়িতে গেলে আমরা স্বস্তি পাই।' গোস্বামী মহাশয় ওঁদের বলেন, 'তা কি কখনও হয়? শ্রীমন্দিরের পাঁচ মাইলের ভিতর যান আরোহণ করতে নাই। আমার জন্য তোমরা ভেব না। যিনি মূকের মুখে ভাষা দিয়ে তাকে বাক্‌চতুর করেন; খঞ্জকে দিয়ে যিনি পর্বত লঙ্ঘন করান; এখান পর্যন্ত যিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন, তিনিই আর সব ব্যবস্থাও করবেন।'

আঠারনালা থেকে গঙ্গাধর খুঁটিয়া শ্রীমন্দিরের চূড়া ও ধ্বজা দেখান। গোসাঁই ভক্তদের বলেন, 'আমাকে একশ টাকা দাও তো; কে কত দাও, খেয়াল রেখ, বাসায় গিয়ে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিও।' এই টাকাটা প্রভু গঙ্গাধর খুঁটিয়াকে দেন। আর খানিকটা এগোতেই একটি বালককে নিয়ে একজন পাণ্ডা গোস্বামীপ্রভুর কাছে এসে বলেন, 'এই ছেলেটির নাম হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া। আপনার কাছে নাম ভাঁড়ায়ে যিনি হরেকৃষ্ণ বলে পরিচয় দিয়েছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে ওর কাকা, গঙ্গাধর।' এ-সব শুনে প্রভু অবাক। তিনি বালকের চরণধূলি নেন ও দশ টাকা প্রণামী দেন। পথের পাশে একটি বাড়ীর রোয়াকে গোসাঁই বিশ্রামের জন্য বসেন। দুজন পাণ্ডা এসে তাঁর কাছে হাত পাতেন। তিনি উভয়কে দুটাকা করে দিয়ে ওঁদের চরণ ধূলি নেন। তাঁরা আশীর্বাদ করে চলে যান।

কীর্তন করেন ভক্তেরা। খোল-করতাল সঙ্গে রয়েছে। প্রভু হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। কোথায় গেল তাঁর পায়ের ব্যথা? সাবলীল ভঙ্গিতে নেচে নেচে অগ্রসর হন

---

[১] জগদ্বন্ধু মৈত্র-প্রণীত 'প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', পৃ ৫৩৮।

গোসাঁই। দেহে যেন মত্ত-হস্তীর বল! বিধুবাবু গান ধরেন। সংকীর্তন এগিয়ে যায়। বিধুবাবু ভাবে বিভোর। কোথায় যায় তাঁর বহির্বাস? নরেন্দ্র-সরোবরের পূর্ব পাড়ে এসে সব বেসামাল। এই যে সেই নরেন্দ্র-সরোবর, যেখানে মহাপ্রভু অন্তরঙ্গদের নিয়ে কত জলকেলি করেছেন; কত না রঙ্গ করেছেন ভক্তসঙ্গে! গোস্বামী মহাশয় গণ্ডূষে গণ্ডূষে জলপান করেন। আর ভক্তদের গায় ছিটিয়ে দেন। অমৃতলাল সেন ছুটে গিয়ে জগন্নাথ বল্লভমঠ থেকে একটি মৃদঙ্গ এনে সত্যেন্দ্রকে বাজাতে দেন। কীর্তন শুনে উৎকলবাসীরা মুগ্ধ হয়ে, মহাপ্রভুর সংকীর্তনের সঙ্গে তুলনা করেন। বিধুবাবুর নেশা থাকে তিন দিন। যিনি যষ্ঠিবিহীন বা অপরের কাঁধে হাত না দিয়ে দুপা এগোতে পারেন না, তিনি এই দীর্ঘপথ নাচতে নাচতে কি করে এলেন, সে এক বিস্ময়।

জিনিসপত্র গরুর গাড়িতে আসে। গাড়ির পিছনে থাকেন মণি মজুমদার, সতীশ মুখোপাধ্যায় (১) ও কুঞ্জ গুহ। আঠারনালায় মন্দিরের ধ্বজা দেখে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে উঠে কুঞ্জবাবু দেখতে পান, লাবণ্যময়ী এক দেবীমূর্তি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন, চোখে-মুখে প্রসন্নতার ছাপ। চকিতে প্রকাশিত হয়েই বিলীন হন। এই কথা শুনে প্রভু কুঞ্জবাবুকে বলেন, 'বিমলা দেবী তোমাকে কৃপা করেছেন।' নির্দিষ্ট বাড়ীতে পৌঁছেই গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'জগদ্বন্ধু দর্শন করে আসি।' সকলেই ক্ষুধার্ত। গরম গরম মহাপ্রসাদ এসেছে। গঙ্গাধর বলেন, 'মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেণ, প্রসাদ পেয়ে দর্শনে যাবেন।' তিনি আরও বলেন, 'আসনে বসে মহাপ্রসাদ পেতে নেই; ভূমি-আসনই বিধি।' গোসাঁই বলেন, 'এখানের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। আপনারা দয়া করে বলে দেবেন।'

সারি বেঁধে সকলে প্রসাদ পেতে বসেন। মণিবাবু কোথায় গেছেন। প্রভু তাঁর পাতার পাশে মণিবাবুর পাতা রেখে তাঁকে ডাকেন। তিনি এলে, বলেন, 'মণি, সকলের পাতা থেকে একটু একটু মহাপ্রসাদ তুলে নিয়ে আমার পাতায় দাও। মহাপ্রসাদে উচ্ছিষ্ট বিচার নাই, জাতি-বর্ণ বিচার নাই।' আদেশ পালন করে মণিবাবু গুরুর পাতা থেকে উপাদেয় প্রসাদ আপন পাতায় তুলে নেন। মণিবাবুর পাতা নিয়ে তখন সতীর্থদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে। নিমেষে তিরোহিত হয় তাঁদের উচ্ছিষ্ট-সংস্কার। প্রসাদ পাবার পর পাণ্ডারা বলেন, 'আজ আর দর্শনে না যেয়ে আগামী দিন যাওয়াই ভাল।' গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'জীবনের কথা নিশ্চিত বলা যায় না; শুভকর্মে বিলম্ব করা ঠিক নয়। এখনই দর্শনে যাব।'

সাড়ে সাতটা নাগাদ দুজন শিষ্যকে দুহাতে ধরে গোসাঁই শ্রীমন্দিরে যান। পতিত-পাবন দর্শন করে সিঁড়ি অতিক্রম করে সদলবলে গোস্বামীপ্রভু জগমোহনে প্রবেশ করেন। ওখান থেকে শ্রীশ্রীস্বামী জগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীবলরাম ও শ্রীশ্রীসুভদ্রা দেবীর ভাবময় বিগ্রহ দর্শন করে, প্রভু ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েন। দীর্ঘকাল পরে যেন প্রেমাস্পদের সঙ্গে পুনর্মিলন। দু নয়নে অবিরল বয় প্রেমাশ্রু। ভাব সংবরণ করে, প্রার্থীদিগকে তাদের আশাতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে গোসাঁই ফিরে আসেন। এই বাড়ীটিতে নানা অসুবিধা।

পরদিন ১ চৈত্র, (১৩০৪) রাধাবল্লভ-মঠের সন্নিকটে, বড়দাণ্ডের (বড় রাস্তার) উপর অবস্থিত নীলমণি বর্মণের বাড়ীটির বিবরণ শুনে প্রভুর পছন্দ হয়। নবকুমারবাবু সাড়ে পাঁচশত টাকা বার্ষিক ভাড়া স্থির করে, ঐদিনই সন্ধ্যায় ঐ বাড়ীতে উঠে যাবেন বলে, চুনকামের টাকা দিয়ে আসেন। সকালে হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া

এলে গোস্বামী মহাশয় সচন্দন-পুষ্প দিয়ে তাঁর চরণপূজা করেন এবং প্রণামী দেন। শিষ্যেরাও একে একে তাঁর চরণপূজা করেন, এক এক টাকা প্রণামী দেন। হরেকৃষ্ণ মহাপ্রভুর পাণ্ডা কানাই খুঁটিয়ার বংশধর আর হরেকৃষ্ণের পিতা গোবর্ধন খুঁটিয়া ছিলেন প্রভুর পিতার পাণ্ডা। ঐদিন আর গোসাঁই বের হলেন না। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত গুরুকে বলেন, 'সাধু-সন্ন্যাসী-মহান্তদের সঙ্গে উদাসীন সাধুরা থাকেন, অথচ আপনার সঙ্গে আমরা রয়েছি কয়েকজন বিষয়ী লোক। আর কোনও সাধুর কাছে আমাদের স্থান হত না।' তাঁর কথা শুনে গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'আপনাদের মত লোকের স্থান কেবল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবই দিতে পারেন।' সরলনাথ তখন নরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রার্থনা পড়ছিলেন। গুরুর কথা তাঁর কানে যেতেই তিনি সতীর্থদের আলিঙ্গন করে রোদন করতে থাকেন।

বেলা একটায় সকলে মহাপ্রসাদ পান। প্রসাদ পাবার পর, বারান্দায় বসে কুঞ্জ গুহঠাকুরতা দেখেন, নালায় ফেলা মহাপ্রসাদের পাতা কয়েকটি কুকুর চেটে খাচ্ছে। কুঞ্জবাবুর কি এক ভাব হল! তিনি কুকুরের মুখ থেকে মহাপ্রসাদ নিয়ে খান; তখন তিনি কেমন হয়ে যান! তাঁর মধ্যে এক ভাববৈচিত্র্য প্রকাশ পায়। তাঁর মনে হয় তিনি বহু পূর্বে ঐস্থানে ছিলেন আর তাঁর সঙ্গে আপনজনও বহু ছিলেন। বারবার তাঁর মনে হয়, সেই সব সঙ্গীদের কথা। আত্মসংবরণ না করতে পেরে তিনি রোদন করে বলতে থাকেন, 'আমি কোথায়, আর আমার প্রিয়জনেরাই বা কোথায়?' প্রভু বলেন, 'কুঞ্জ, স্থির হও।' তিনি শান্ত হলে, গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'কুঞ্জকে মহাপ্রসাদ কৃপা করেছেন। যদি সে স্থির হয়ে থাকত, তাহলে পূর্বজন্মের অনেক কথা জানতে পারত। ঐদিনই গোসাঁই সকলকে নিয়ে নীলমণি বর্মণের বাড়ীতে উঠে যান। নবকুমারবাবু, অমৃতলাল সেন ও তাঁদের আর কয়েকজন সতীর্থকে রাধাবল্লভ-মঠের একজন বাবাজী বলেন, 'আপনারা সব গুরুগত-প্রাণ। গ্রন্থে মহাপ্রভু ও তাঁর ভক্তদের যে বিবরণ পড়েছি, আপনাদের দেখে তা স্মরণ হয়। আপনারা কয়েকজন আমাদের এখানে থাকতে পারেন।' প্রভুর অনুমতি নিয়ে নবকুমারবাবু, অমৃতবাবু এবং আরও কেউ কেউ ওখানে গিয়ে আস্তানা করেন।

স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ডে আছে, শ্বেতবরাহকল্পের স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রথম সত্যযুগে, অবন্তীদেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এক পরিব্রাজকের মুখে শুনেন যে, সুবর্ণরেখা ও মহানদীর অন্তর্বর্তী অঞ্চল পুরুষোত্তমের অন্তর্গত নীলগিরি পর্বতের রোহিণীকুণ্ড সরোবরের পূর্ব পাড়ে নীলকান্ত মণি দিয়ে গড়া নীলমাধব-বাসুদেবের এক অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি, শবর বিশ্বাবসু নিত্যপূজা করেন। যিনি-ই ঐ সরোবরে স্নান করে নীলমাধব দর্শন করেন, তাঁর সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, বিদ্যাপতি নামক এক ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে এর সত্যতা নির্ণয় করেন। তিনি নীলমাধবের নির্মাল্য ও প্রসাদ রাজাকে এনে দেন। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর রাজধানী উৎকলে স্থানান্তর করার সময় শুনতে পান যে, নীলমাধব অপ্রকট হয়েছেন। ব্যথিত হয়ে রাজা উপবাসের সঙ্কল্প করেন; তখন দেবর্ষি নারদ এসে তাঁকে নিবৃত্ত করেন। তিনি রাজাকে বলেন, 'যমরাজের প্রার্থনায় নীলমাধব সুবর্ণবালুকায় বিলীন হয়েছেন। এই মূর্তিতে তিনি আর প্রকট হবেন না। আপনি নৃসিংহমূর্তি স্থাপন করে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন। যজ্ঞ শেষ হলে, তিনি দারুব্রহ্মরূপে প্রকট হয়ে পাতকী উদ্ধার করবেন।' যথাক্রমে যজ্ঞ অনুষ্ঠানান্তে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চিহ্নিত এক অপরূপ দারুখণ্ড সমুদ্রে ভেসে

আসে। মহাসমারোহে রাজা এই দারু এনে বেদীতে রাখেন। ঐ সময় আকাশবাণী হয়, 'হে রাজন্, স্বয়ং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে, পনের দিনের মধ্যে দারুরূপী ব্রহ্মের মূর্তি নির্মাণ করবেন। আবদ্ধ আচ্ছাদনীর মধ্যে দারুখণ্ড রেখ।' এক বৃদ্ধ কারিগর এসে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জগদ্বন্ধু, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্রের বিগ্রহ নির্মাণ করেন। বিশ্বকর্মা যথাসময়ে মন্দিরও গড়েন। দেবর্ষি নারদ তখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে নিয়ে স্বর্গে ব্রহ্মাকে মন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্য আমন্ত্রণ করতে গিয়ে দেখেন, সেখানে সামগান চলছে। গান শেষ হলে দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মাকে তাঁদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে তিনি বলেন, 'তোমরা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এখানে এসেছিলে; কিন্তু এখন স্বারোচিষ মন্বন্তরের প্রথম সত্যযুগ।' রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে ব্রহ্মা বলেন, 'তোমার বংশের আর কেউ বেঁচে নেই।' গাল নামে এক নৃপতি মূর্তিসব রেখে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা মর্ত্যে এসে দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই বলে বর দেন, 'আমি ব্রহ্মার পঞ্চাশ বছর এখানে থাকব।'

ব্রহ্মের রূপ নেই, আকার নেই, হাত-পা নেই। তাঁর ইচ্ছামাত্রই সব হয়। কিন্তু তাঁকে সীমিত করে তাঁর রূপের এ কি বিড়ম্বনা! বিশ্বকর্মার সুনিপুণ কলা-কৌশলের এ কি শ্রী? এই কি তাঁর দেবশিল্প মাধুর্যের পরিণতি!

কিংবদন্তী—শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা আছেন দ্বারকায়। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গেছেন দরবারে; অন্তঃপুরবাসিনীরা নিজেদের মধ্যে গল্পসল্প করেন। তাঁরা সব মিলে বলরাম-জননী রোহিণীকে সানুনয় অনুরোধ করেন, 'আমরা আপনার কাছে শ্রীবৃন্দাবনলীলা-কথা শুনব।' রোহিণী দেবী জিভ কেটে হেসে বলেন, 'ছেলেদের ওই সব কীর্তিকলাপ কি আমার বলা শোভন? সুভদ্রা, তুই বল না, মা!' সুভদ্রা বলেন, 'না, মা। আমি গুছিয়ে বলতে পারব না।' মেয়েরা হন ধৈর্যহারা। তাঁরা রোহিণী দেবীকে বলেন, 'আপনি না বললে আমাদের আর শোনা হবে না।' তিনি উত্তর দেন, 'মা হয়ে ছেলেদের রসের কথা কোন্ মুখে বলি? ওরা আবার কখন এসে পড়ে, বলা যায় না! ওদের কানে গেলে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।' সুভদ্রা বলেন, 'এই কথা মা? তার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। ওঁরা যদি হঠাৎ এসেই পড়েন, আমি ইসারা করব আর বাধা দেব।' জননী রোহিণী বলতে থাকেন শ্রীবৃন্দাবনলীলা-অভিরাম কথা। বক্তা, শ্রোতা সকলেই তন্ময়। সুভদ্রাও ভাবে বিভোর। এদিকে অন্দরমহলে প্রবেশ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম শোনেন—মার মুখে তাঁদেরই গুহ্য লীলাকথা। ওঁরাও তখন ভাবে গদ্‌গদ। সুভদ্রা ছুটে গিয়ে দুহাত দিয়ে দু দাদাকে ধরে ফেলেন। ওঁদের আর এগুতে দেন না। মহাভাবে ভাই-বোন তিন জনের অবস্থাই অনুরূপ; হাত-পা ভিতরে ঢুকে গেছে। চোখ-মুখের আর এক রূপ! মহাভাবের বিচিত্র লক্ষণ ও প্রভাব! পরবর্তীকালে মহাপ্রভুবও মহাভাবের সময় কতবার যে তাঁর হাত-পা অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল!

> পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্মের আকার।
> মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার॥
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।১৭।১৫

আবার কখনও অস্থি-সন্ধি শিথিল হয়ে তাঁর দেহ আরও দীর্ঘ হয়েছিল।

শরীর দীঘল তাঁর হাত পাঁচ-সাত।
এক এক হস্তপদ তাঁর তিন তিন হাত॥
অস্থি-সন্ধি ছাড়ি চর্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি, প্রাণ কারো নাহি রহে ধড়ে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।১৮।৪৯-৫০

আবার গৌরসুন্দরের লোমকূপ দিয়ে রক্তবিন্দুও বের হয়েছিল।

লোমকূপে রক্তোদ্‌গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফোলে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২।৫

মহাভাবে কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রার হয় অপ্রাকৃত কলেবর। দেবর্ষি নারদ ভগবদ্‌ ইচ্ছায় তখন ওখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানের এই ভুবনমঙ্গল রূপ দর্শন করে আনন্দে হয়েছিলেন উদ্বেলিত। তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, ‘প্রভো, তোমার এই ভাবময় রূপ দর্শন করে জগতের কল্যাণ হোক।’ বিশ্বকর্মার অন্তরে তখন এই অভিনব রূপ ফুটে উঠে। দারুব্রহ্মে তিনি ভগবানের এই কৃপাসাপেক্ষ রূপটিই ফুটিয়ে তুলেন। শ্রীকৃষ্ণের অস্থিও তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অভ্যন্তরে রেখেছিলেন। তাই দারুব্রহ্মের এই অমোঘ আকর্ষণ।

১ চৈত্র, ১৩০৪ গোস্বামীপ্রভুর শরীর ভাল ছিল না। তাছাড়া বাড়ী বদলের জন্যও সকলে ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্যযুক্ত স্থানগুলি দর্শন করতে সবার আগ্রহ। তারপর থেকে প্রায় দেড় মাসকাল প্রভু প্রায় প্রত্যহই বের হন। কটকের উকিল হরিবল্লভ বসু অনুরোধ করে পাঠান, গোস্বামীপ্রভু যেন নিত্য সমুদ্রস্নান করেন; এতে বাতের প্রকোপ কমবে। গোসাঁই সকালে সমুদ্রস্নানে যাবার পথে একটি করে বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক স্থান দেখেন। যেদিন সমুদ্রে যান না, ঐদিন দু বালতি সমুদ্রের জলে স্নান করতেন।

২ চৈত্র প্রভু গম্ভীরা দর্শনে যান। এটি কাশী মিশ্রের বাড়ীর একটি ছোট নির্জন কুটীর। উৎকল ভাষায় ‘গম্ভীরা’ বলতে বুঝায় ছোট ঘর। এখানে মহাপ্রভু ছিলেন আঠার বছর। সেই কুটীর আর নেই; এখন দালানের পাকা কোঠা। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শচীনন্দন এখানে ঘরের মেঝেতে মুখ ঘষে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন।

বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরার ভিতে মুখ ঘষিতে লাগিলা॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।১৯।৫৫

দিব্য-উন্মাদ অবস্থায় এক জ্যোৎস্না-রাত্রে সমুদ্রের তীরে গিয়েছিলেন তিনি সকলের অলক্ষ্যে। যমুনা-জ্ঞানে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর এই লীলাস্থলীতে প্রবেশ করে গোস্বামীপ্রভু বাইরে প্রণাম করতেই ভাবে ডগমগ হয়ে ত্বরিত পদক্ষেপে ‘গম্ভীরা’ কুঠরীতে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ দেন; তাঁর তখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তিনি বিশেষভাবে মহাপ্রভুর বিরহে অভিভূত হয়ে পড়েন। ভাব-সংবরণ করে, গৌরসুন্দরের ‘ছিন্ন কন্থা’ ও ‘পাদুকা’ স্পর্শ করে, বাইরে এসে গোস্বামী মহাশয় বলেন, ‘সেবকেরা এই স্থানের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করেছে। এইটি আমাদের মহাতীর্থ। বাঙালীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য সব কিছুরই মূলে নদীয়াবিহারীর প্রভাব। আজ বাঙালী তা ভুলতে বসেছে। তারপর স্বর্গদ্বারে গিয়ে বিধু ঘোষ ও সত্যেন ঘোষের সাহায্যে প্রভু সমুদ্রস্নান করে আশ্রমে ফেরেন।

স্নানের সময় তিনি বলেন, 'স্বর্গদ্বার স্নানের বড় উপযোগী।' পথে বলেন, 'পাকাল (পান্তা) প্রসাদ শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন; সমুদ্রস্নান করে পাকাল না খেলে, শরীর অসুস্থ হয়। এখানের রোদ বিষ।' বেলা দশটার পর ঘরের বাইরে থাকতে সকলকে তিনি নিষেধ করেন।

মহাপ্রভুর স্মৃতিজড়িত স্থানগুলি গোস্বামী মহাশয় একটি একটি করে ভক্তদিগকে সঙ্গে নিয়ে দেখেন। গম্ভীরার কাছেই 'সিদ্ধবকুল'। রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্র তাঁর উদ্যানসমেত বাসগৃহ মহাপ্রভু ও তাঁর ভক্তদের সেবার জন্য অঙ্গীকার করেছিলেন। উদ্যানের কুটীরটিতে মহাপ্রভু কাশী মিশ্রকে বলে হরিদাসের থাকার ব্যবস্থা করেন। তিনি ভক্ত হরিদাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—

> এই স্থানে রহি কর নামসংকীর্তন।
> প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।১১।১৭৮

হরিদাস কোথাও যান না। ঐ স্থানেই নামানন্দে থাকেন ও শ্রীমন্দিরের নীলচক্র দর্শন করে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন। একদিন সকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী 'বকুলের দাঁতন' দিয়ে দাঁতন করতে করতে হরিদাসকে মহাপ্রভু দেখতে গিয়েছেন। গিয়ে দেখেন, রৌদ্রে বসে হরিদাস নামসাধন করছেন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর দন্তকাষ্ঠ তখনই ভূমিতে রোপণ করেন। দেখতে দেখতে ঐদিনই ওখানে এক মহীরুহের উদ্ভব হয়। এরই ছায়ায় বসে ভক্ত হরিদাস সাধন-ভজন করতেন। তাঁর দেহরক্ষার পর, তাঁর কুটীরের স্থানে কোঠাঘর উঠে। নাম হয় 'মুদ্রামঠ'। বহু বছর কেটে যায়; রাজা প্রতাপরুদ্র ও তাঁর ছেলেরা গত হয়েছেন। জগন্নাথদাস নামে এক ভক্তবাবাজী মুদ্রামঠে থাকতেন। রথের চাকা নির্মাণের জন্য ঐ বকুলগাছটি কাটার সিদ্ধান্ত হয়। জগন্নাথদাসের কোন ওজর-আপত্তি টিকল না। তিনি কেঁদে বিনিদ্র রজনী যাপন করে প্রার্থনা করেন, 'ভগবন্, তোমার ভক্তস্নেহ-নিদর্শনের এই কি পরিণতি? তুমি একে রক্ষা কর।' পরদিন রাজার সূত্রধর কর্মচারীরা গাছটিতে কুঠার মেরে দেখেন, গাছটি রাতারাতি ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেছে। ভক্তের আকুল প্রার্থনায়, মহাপ্রভু অভিনব উপায়ে ঐ গাছটি রক্ষা করেন। তখন থেকে গাছটির নাম হয় 'সিদ্ধবকুল।' পাঁচ-শ বছরের উপর হয়েছে, এই অবস্থায়ও পাতা হয়, ফুল হয়, ফল হয়।

গোস্বামী মহাশয় সিদ্ধবকুলে সাষ্টাঙ্গ দেন। অমৃতলাল সেন গাছের নীচ থেকে একটি সুপক্ক বকুল ফল কুড়িয়ে এনে প্রভুর হাতে দেন। হাতে পেয়েই তিনি মুখে দেন। গোসাঁইর যেন আনন্দ আর ধরে না। তিনি বলেন, 'দেখ, হরিদাস ঠাকুরের তপঃপ্রভাবে সিদ্ধবকুল বৃক্ষটি ওঁকারের আকার নিয়েছে।' ভক্তেরা বলেন, 'গাছটির গায় অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি।'[১]

---

[১] সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাইরী হতে সম্পাদিত 'আচার্য প্রসঙ্গ', দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫০), পৃ ৭৮-৭৯।

শ্রীক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্থানাদি দর্শন ও বানর-নিধন-রদ

সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু যান বাসুদেব সার্বভৌমের গৃহে। গম্ভীরার পশ্চিমে বড় রাস্তায় পড়ে শ্রীমন্দিরের পথ ধরে সামান্য পথ অতিক্রম করে বাঁদিকে অল্প দূরে যেতেই সার্বভৌমের বাটী।

মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে পৌঁছে ভক্তদল থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে, শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করে মহাভাবে জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করতে ছুটলে সম্বিত হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। রাজার সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম তখন মন্দিরে ছিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব এই ভাব দেখে তিনি মুগ্ধ হন। ভোগের সময় 'পড়িছা'র সাহায্যে তাঁকে তিনি তাঁর বাসগৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে তিনি তাঁর মেসো-মহাশয় কাশী মিশ্রের গৃহে তাঁর নির্জন বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন।

বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলাবিজয়ী। তখন মিথিলা ছিল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। মিথিলার গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে ভেবে, ছাত্রদের শিক্ষা শেষ করে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় পুস্তক বা খাতাপত্র সঙ্গে আনা নিষেধ ছিল। এই বাসুদেব সার্বভৌমই মিথিলার বিদ্যাচর্চার সময় ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং নবদ্বীপে ফিরে এসে নব্যন্যায়শাস্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর টোলে রঘুনাথ শিরোমণি ও নিমাই উভয়েই ছাত্র ছিলেন। সার্বভৌম মহাশয়ের গভীর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁকে সভাপণ্ডিত করেছিলেন।

তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যাতে সন্ন্যাসের নিয়ম যথারীতি পালন করতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁকে সার্বভৌম মহাশয় বেদান্ত পড়াতে শুরু করলেন। সাত দিন কেটে যায়; আট দিনের দিন তিনি সন্ন্যাসীকে বলেন, 'এই কয়দিন তো আপনি শুনলেন, কিন্তু বেদান্ত আপনার বোধগম্য হয়েছে কিনা তা তো বুঝা গেল না।'

মহাপ্রভু বিনীতভাবে তাঁকে বলেন, 'মূল গ্রন্থ যখন আপনি পাঠ করেন, তখন তো সবই বুঝি, কিন্তু যখন আপনি ব্যাখ্যা করেন, তখনই আমার বিভ্রান্তি হয়।' সার্বভৌম মহাশয়ের মুখ কাল হয়ে যায়। তিনি মহাপ্রভুকে 'আত্মারাম' শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন। তাঁর মুখে আঠার রকম অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনে, বাসুদেব সার্বভৌম মহাশয় স্তম্ভিত হয়ে মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে বলেন, 'প্রভো, আপনি মানুষ নন, কৃপা করে আপনার পরিচয় আমাকে দিন।' মহাপ্রভু তখন তাঁকে 'ষড়ভুজ রূপে' দর্শন দেন।

> দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
> পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।৬।১৮৩

বাসুদেব সার্বভৌম মহাশয়ের গৃহের প্রাচীরে সেই ষড়ভুজ মূর্তি বিচিত্র বর্ণে এখনও চিত্রিত আছে।

গৌরহরির পুরুষোত্তম-লীলার এ স্থানটি লুপ্ত হলে, রাজসাহীর রাজা নরেশনারায়ণ রায়ের কন্যা উদাসীন কুমারী শচী দেবী জগদ্বন্ধুর ইচ্ছায় এই স্থানে বসবাস করতেন। তিনি ভাগবত পাঠে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বারুণীস্নান উপলক্ষে নিকটবর্তী দীঘি শ্বেতগঙ্গায় স্নান করতে গেলে, স্রোতের টানে তিনি জগন্নাথ-মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়ে উঠেন। তাঁকে চোর বলে অপবাদ দিলে, জগন্নাথ-

দেব স্বপ্নে রাজাকে বলেন, 'আমি তাঁর স্নানের জন্য আমার চরণ থেকে গঙ্গা নিসৃত করেছিলাম; তাঁর যেন কোন অসম্মান না হয়। আর তুমি তাঁকে গুরুবরণ কর।' তখন থেকে শচী দেবীর নাম হয় গঙ্গামাতা আর কালক্রমে সার্বভৌম মহাশয়ের গৃহের নাম হয় 'গঙ্গামাতার মঠ'।

গোস্বামীপ্রভু একদিন ভোরে টোটা-গোপীনাথ দর্শনের অভিপ্রায়ে বের হন। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের পথে অগ্রসর হয়ে প্রাচীন রাজবাটীর পথ ধরে তিনি টোটা-গোপীনাথ গিয়ে পৌঁছেন। উৎকলী ভাষায় বাগানকে 'টোটা' বলে। পাশেই জগন্নাথদেবের দ্বারপাল পঞ্চশিবের অন্যতম শ্রীযমেশ্বরদেবের মন্দির ও উদ্যান। এই স্থানেই মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতের বাসস্থান ঠিক করে দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু প্রত্যহ পাঠ শ্রবণের জন্য গদাধরের কাছে যেতেন। তিনি একদিন ভাবাবেশে যমেশ্বর টোটায় বালি খুঁড়তে খুঁড়তে বলেন, 'নীচে প্রাণনাথের বিগ্রহ আছেন।'

গদাধর গোপীনাথের অপরূপ মূর্তি মাটি খুঁড়ে বের করেন। বংশীবটের কাছে এই মূর্তি স্থাপন করে, মহাপ্রভুর আদেশে গদাধর তাঁর নিত্যসেবা করতেন। জনশ্রুতি রয়েছে—এই বিগ্রহ দাঁড়ান অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে এক ভক্ত পূজারীর বৃদ্ধ অবস্থায় দেহ ন্যুব্জ হওয়ায়, তাঁর পূজার সুবিধার জন্য তিনি উপবিষ্ট হন। কিংবদন্তী আছে যে, মহাপ্রভু এই গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। গোস্বামীপ্রভু সেবককে জিজ্ঞাসা করেন, 'গোপীনাথদেবের কটিদেশে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের সোনার রেখাটি দেখাতে পার?' তিনি বলেন, 'পাঁচসিকা দর্শনী দিলে পারি।' গোস্বামী মহাশয় বিরক্ত হয়ে বলেন, 'লোকে কি দর্শন করবে? এরা "দর্শনী, দর্শনী" বলে দর্শনার্থীদের অস্থির করে।'[১]

ঐদিনই ওখান থেকে হরিদাসের সমাধির দিকে গোসাঁই অগ্রসর হন। হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গ চলে। গৌরভক্তেরা তাঁর মরদেহ সমুদ্রতীরে নিয়ে, বালি খুঁড়ে, সমাধি দিয়েছিলেন।

"হরিবোল, হরিবোল" বলে গৌর রায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।১১।৬৭

মহাপ্রভু নিজে ভক্তের জন্য আঁচল পেতে ভিক্ষা করেছিলেন।

হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩।১১।৭৩

সমুদ্রতীরের পাঁচ-শ বছরের সমাধি-স্থানটি এখনও অটুট। জগন্নাথদেবের দক্ষিণ-দ্বার থেকে, পবননন্দন সমুদ্র শাসন করেছেন, সমুদ্র তাই পুরীর তটরেখা অতিক্রম করে স্থলভূমির দিকে অগ্রসর হতে পারে না।

সমুদ্রের কিনারা ধরে 'বিদুরের খুদ' নামক মঠে গোসাঁই উপস্থিত হলেন। পূজারী কিছু প্রসাদী খুদের পিঠা ও তুলসীপত্রের শাক দিলেন। প্রভুর সঙ্গে সকলে তা আনন্দ করে পান।

পরের দিন গোস্বামী মহাশয় একই পথে চটক পর্বত দর্শনে বের হন। যমেশ্বর-টোটার নিকটে গেলে স্বরূপদামোদর গোসাঁইর কাছে প্রকাশিত হন।

---

১. 'আচার্য-প্রসঙ্গ' অবলম্বনে, পৃ ৭৫।

প্রভু ভক্তদের পরে বলেন, 'তিনি শ্যামবর্ণ, স্থূলাকৃতি, শরীর শিথিল, চলার সময় থল-থল করে।' গোসাঁই আবার বলেন, 'গভীর রাত্রে মহাপ্রভু টোটা-গোপীনাথ হতে সমুদ্র পর্যন্ত সৈকতে বিচরণ করেন।'[১]

চটক-পর্বত বলতে বুঝায় বালির পাহাড়। বালি স্তূপীকৃত হয়ে ও-রকম হয়। ভাবোন্মাদ অবস্থায় মহাপ্রভু এই বালিস্তূপকে গোবর্ধন ভ্রম করে, আর সমুদ্রকে যমুনা মনে করে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কোনারকের দিকে ভেসে যাবার সময় জেলের জালে তিনি আটকেছিলেন।

হরিদাসের সমাধি থেকে সমুদ্রতট দিয়ে স্বর্গদ্বারের দিকে হেঁটে যাবার সময় গোস্বামী মহাশয় শিষ্যদের বলেন, 'তোমরা খুব সাবধানে সমুদ্রস্নান কর। আমার চোখের সম্মুখে দেখতে পেলাম, সমুদ্র তোমাদের দু-একজনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'[২] কথাটির গুরুত্ব তখন কেউ দেন না।

সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু একদিন জগন্নাথবল্লভ-মঠ দর্শনে যান। এরই সংলগ্ন উদ্যানে সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে মহাপ্রভু কতদিন যে কীর্তন করেছিলেন; রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভু কতবার যে এখানে মিলে তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা করেছেন; মঠের প্রাচীন সাধু ভূতানন্দ স্বামী গোস্বামীপ্রভুকে স্বাগত জানিয়ে, তাঁকে সব ঘুরে ঘুরে দেখান। বাগানে একটি স্থান দেখিয়ে তিনি প্রভুকে বলেন, 'স্বচক্ষে দেখেছি একবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাত দিন ধরে ওখানে একাসনে সমাধিস্থ হয়েছিলেন।' তাঁর কত বয়স হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, 'চারশ-র উপর।' মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার প্রত্যক্ষদর্শী শুনে অবাক হয়ে ভক্তেরা তাঁকে কত কি প্রশ্ন করেন!

গোসাঁই পরে শিষ্যদের বলেন, 'ভূতানন্দ স্বামী এই মঠের মহান্ত, তিনি তেজস্বী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। চক্রান্ত করে এক খুনের মামলায় তাঁকে জড়ান হয়েছিল। হাইকোর্টের রায়ে প্রমাণ হয় তিনি নির্দোষ। লোকের সন্দেহ তাতে যায় না। তাঁকে মহান্তের গদি ছাড়তে হয়। পরে আবার তিনি মহান্ত হন।' শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছে গোস্বামী মহাশয় সাধুসমাজে তাঁর মহত্ত্বের কথা প্রচার করেন। কথায় কথায় তিনি একদিন বলেন, স্বামীজীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্যও তিনি পুরী এসেছেন।

প্রভুর কাছে স্বামী ভূতানন্দ এলে, তিনি নিজের হাতে আসন পেতে দিতেন। কিন্তু আসনে না বসে তিনি জানালার উপর বসতেন। এর তাৎপর্য কি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে. স্বামীজী বলেছিলেন, 'ঋষির ভগবদ্ দর্শন-বিধি উচ্চাসনে উপবেশন করে। আমি ঋষি, আর গোসাঁই স্বয়ং ভগবান। তাই অমন করে বসি।' গোস্বামী মহাশয়ের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বামীজী একদিন ভাবাবেশে বলেন, 'শ্রীসূর্য, শ্রীমহাদেব, শ্রীনারায়ণ—সাক্ষাৎ ভগবান।' মহান্ত সভা ভাঙবার পূর্বে সভা ত্যাগ করতে চাইলে অন্যান্য মহান্তেরা এর কারণ জানতে চান।

তিঁহ কহে, যাই আমি তাঁহারে হেরিতে।
বিজয়কৃষ্ণরূপে যিঁহ অবনীতে॥

---

[১] 'আচার্য-প্রসঙ্গ' অবলম্বনে, পৃ. ৭৬।

[২] ঐ ঐ ঐ

আবির্ভূত হইয়াছেন সুমোহন ঠাম।
যাঁহারে হেরিয়া হই পূর্ণ মনস্কাম॥[১]

এই কথা শুনে মহান্তেরা মন্তব্য করেন, 'এমন ভক্তিমানকে দর্শন করা খুবই সমীচীন।'

তাদের বচনে স্বামী করেন উত্তর।
ভক্তিদাতা প্রভু, তিঁহ নহে ভক্তবর॥[২]

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারপাল পঞ্চশিব। তাঁরা হলেন—যমেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, লোকনাথ, কপালমোচন ও মার্কণ্ডেয়েশ্বর। যমেশ্বর গোপীনাথ-টোটার কাছে, লোকনাথ শ্রীমন্দির হতে দেড় মাইল পশ্চিমে। কপালমোচন দক্ষিণদ্বারের নিকটে। শ্রীমন্দিরের পশ্চিমে মার্কেণ্ডেয় সরোবর-তীরে মার্কণ্ডেয়েশ্বর। গুণ্ডিচা-মন্দিরের উত্তরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবারের তীরে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির।

শ্রীক্ষেত্রে মৃত্যু হলে, মৃতের উপর যমের বিধি-নিষেধ প্রয়োজ্য হয় না। এই হেতু এক ক্ষেত্রপাল যমেশ্বরশিব। গোসাঁই সুযোগ-সুবিধামত পঞ্চশিব দর্শন করেন। প্রভু বলেছেন, 'শাস্ত্রে আছে, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করেন আর শিব মানেন না, তিনি নরকে গমন করেন, আবার যিনি শিবকে পূজা করেন অথচ শ্রীকৃষ্ণকে মানেন না, তিনিও নরকে গমন করেন।'

'লোকনাথ' জলের নীচে থাকেন। বিপদে পড়লে উড়িষ্যাবাসী 'লোকনাথের' দোহাই দিয়ে থাকেন।

ব্রহ্মার পঞ্চমুখের একটি মুখ কেটে ফেলে, শিব জগন্নাথদেবের আশ্রয়ে থেকে 'কপালমোচন' নামে অভিহিত। গোস্বামীপ্রভু একদিন ভোরে শিষ্যদের নিয়ে গুণ্ডিচাবাটী ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দর্শন করতে গিয়েছিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রানীর নাম সম্ভবত গুণ্ডিচা ছিল। গুণ্ডিচাবাটীতে যজ্ঞবেদী হয়েছিল, যেখানে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নীলমাধবের প্রসন্নতা লাভ করেছিলেন। যজ্ঞসময়ে দানের গরুর খুর দ্বারা ভূমি অপসৃত হয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের উৎপত্তি হয়েছিল। সরোবরের এক তীরে যজ্ঞসময়ের সেই নৃসিংহমূর্তি রয়েছেন। গুণ্ডিচাবাটীর পূর্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাসির বাড়ী। ইনি অষ্টশক্তির অন্যতমা।

মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে গুণ্ডিচাবাটী মার্জন করতেন। সরোবরের ঘাটের কিছু উপরে নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দির। প্রভু তাঁর দৌহিত্র দাউজীকে সেদিন বলেছিলেন, 'মহাদেবের কাছে প্রার্থনা কর তোমায় যেন বিয়ে করতে না হয়।'

একদিন ভোরে সমুদ্রের তটরেখা ধরে বালির উপর দিয়ে হেঁটে সশিষ্য গোস্বামী মহাশয় চক্রতীর্থে যান। কিংবদন্তী আছে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের হাতিকে এখানে কুমীরে ধরেছিল। অনন্যোপায় হয়ে হাতি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে স্মরণ করতেই চক্রনারায়ণ এসে কুমীরকে খণ্ডবিচ্ছিন্ন করে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় হাতিটি রক্ষা পায়। তখন থেকে এই স্থানের নাম হয় চক্রতীর্থ। এখানে চক্রনারায়ণ বিগ্রহ আছেন। জলের গভীরতা বড় কম। গোসাঁই এবং তাঁর শিষ্যেরা বসে ও শুয়ে ঐদিন সমুদ্র-স্নান করেন। এই স্থানেই ব্রহ্মদারুখণ্ড ভেসে এসে লেগেছিল।

প্রভুর নির্দেশে কুঞ্জ গুহঠাকুরতা স্বামী দেবপ্রসাদকে কলিকাতা অভয়নারায়ণ

---

১. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য অমিয়কুমার সান্যাল-প্রণীত 'শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত', পৃ ২৯৮।

২. ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃ ২৯৮।

রায়ের ঠিকানায় ও কানপুরে মন্মথ মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানায় চিঠি লিখে অবিলম্বে শ্রীক্ষেত্রে আসতে বলেন। স্বামীজীর নিকট কোন চিঠিই পৌঁছে না। তিনি বোম্বে, পুণা ও বদরিকা ঘুরে অবিলম্বে পুরী এসে পৌঁছেন। স্বামী দেবপ্রসাদ পৌঁছা-মাত্র, প্রভু মুক্তকেশী দেবীর পাশের ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। বুড়াঠাকরুণ আপত্তি তুলেন—ঐ ঘরে কয়েকজন গুরুভগ্নিকে তিনি রেখেছেন। গোসাঁই বলে পাঠান, 'ঐ ঘরেই স্বামীজী থাকবেন। মেয়েদের জন্য এ বাড়ী নেওয়া হয় নাই। তাঁরা অপর বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারেন।' নীলমণি বর্মণের বাড়ীর দক্ষিণের বাড়ীটিও ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

১২ বৈশাখ (১৩০৫) ছিল অক্ষয়-তৃতীয়া। ঐদিন অনেকের সাধন হয়। কিশোরী সেন মহাশয়ের পরিবারের লোকদের ও ছ-বছরের দৌহিত্র শ্রীজগদানন্দ মৈত্রের সাধন হয়। প্রভু ভোরে সমুদ্রস্নানে গেলেন। অপরাহ্নে শিষ্যদের নিয়ে নরেন্দ্র-সরোবরে তিনি চন্দনযাত্রা মহোৎসব দর্শন করতে গিয়েছিলেন।

জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা উৎসব অক্ষয়-তৃতীয়াতে শুরু হয়, ও একুশ দিন ধরে চলে। ঐদিনটি থেকে অপরাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি মদনমোহনকে সুগন্ধি মেখে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি অবধি প্রত্যহ দোলায় করে নরেন্দ্রসরোবর-তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে থাকেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী। দ্বিতীয় দোলায় যান রামকৃষ্ণ এবং আরও পাঁচটি দোলায় পঞ্চমহাদেবের বিজয়মূর্তি। একটি সুসজ্জিত নৌকায় মদনমোহন ও লক্ষ্মী-সরস্বতীকে সরোবর-মধ্যস্থ বড় মন্দিরটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। অপর একটি নৌকায় নিয়ে যাওয়া হয় রামকৃষ্ণ ও পঞ্চমহাদেবকে। দ্বিতীয় মন্দিরে রামকৃষ্ণের ব্যবস্থা থাকে এবং তৃতীয়টিতে পঞ্চমহাদেবের। সকলেরই ওখানে পূজা ও ভোগ হয়। উৎসব শেষ হলে আবার সাতটি দোলায় করে প্রত্যহ মধ্যরাত্রে তাঁরা ফিরে আসেন যাঁর যাঁর স্থানে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রামহোৎসব হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীবলরাম ও শ্রীশ্রীসুভদ্রাকে একশ-আট কলস সুবাসিত জল দিয়ে স্নান করান হয়। এই মহাস্নানের পর পনের দিন শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। তখন বিগ্রহের অঙ্গরাগ হয়। এই সময় দর্শন নিষেধ। তারপর আসে পুরীর সর্বপ্রধান মহোৎসব রথযাত্রা। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে হয় রথযাত্রা। শাস্ত্রে আছে, দ্বিতীয়ায় পুষ্যা নক্ষত্রে রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। রথযাত্রার কথা স্কন্দ-পুরাণের উৎকলখণ্ডে আছে; জগন্নাথদেব রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলেছেন, 'আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে আমাদের তিন বিগ্রহকে রথে করে শ্রীমন্দির থেকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাবেদীতে এক সপ্তাহের জন্য নিয়ে যাবে।' ছ-মাস পূর্ব থেকে চলে রথযাত্রার প্রস্তুতি। মাঘ মাসে বসন্ত শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রথের কাষ্ঠ সংগ্রহ শুরু হয়; অক্ষয়-তৃতীয়া থেকে নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। বংশ-পরম্পরায় এসব কাজের জন্য বৃত্তিভোগী কর্মী নিযুক্ত আছেন। তাঁরা রাত-দিন খেটে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রথ প্রস্তুত করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম, শ্রীশ্রীসুভদ্রা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রথ। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের নাম 'নন্দিঘোষ' বা 'চক্রধ্বজ'; এই রথ তেইশ হাত উঁচু এবং এতে আঠারটি চাকা থাকে। চাকাগুলি অষ্টাদশ সিদ্ধির প্রতীক। শ্রীশ্রীবলরামের রথের নাম 'তালধ্বজ'; ইহা বাইশ হাত উঁচু এবং এতে ষোলটি চাকা। আর শ্রীশ্রীসুভদ্রা দেবীর রথের নাম 'পদ্মধ্বজ', ইহা একুশ হাত উঁচু এবং এতে থাকে চৌদ্দটি চাকা। প্রতিটি রথে

তিনটি করে মোটা কাছি লাগান থাকে। দড়িগুলি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রতীক।

স্বর্গদ্বারে অবস্থিত নানকমঠে বৈশাখ মাসেই (১৩০৫) একদিন গোস্বামী মহাশয় শিষ্যদের নিয়ে যান। এই মঠে সুমিষ্ট জলের এক গভীর কূপ আছে। কূপ থেকে দড়ি দিয়ে বালতি বেঁধে যেমন জল উঠান যায়, এখানেও ও-রকম ব্যবস্থা আছে; তদুপরি আর এক অভিনব উপায় রয়েছে। মাটির ভিতর দিয়ে পাকা সিঁড়ি ধরে নেমে হাত দিয়ে পাত্রভরে জল তোলা যায়।

একবার নানকজী আসেন শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনের অভিপ্রায়ে। তাঁর গোঁফ-দাড়ি দেখে, তাঁকে বিজাতীয় ভেবে, দ্বারপালেরা তাঁকে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। নানকজী আর কি করেন? শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন না করতে পেরে তিনি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হন। একটি গাছের ছায়ায় বসে তিনি মনে মনে ভাবেন, 'আমার মধ্যে নিশ্চয়ই ত্রুটি আছে, তাই পুরুষোত্তমে এসেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পেলাম না।' এদিকে তিনি ক্ষুধার্ত। তখনই শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু তাঁর সোনার থালায় ভোগ নিয়ে নানকজীর কাছে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এভাবে দর্শন পেয়ে নানকজীর আনন্দ আর ধরে না। পরিতৃপ্তির সঙ্গে তিনি মহাপ্রসাদ পান। এদিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে খুঁজে খুঁজে শ্রীশ্রীবলরাম এসে উপস্থিত; লক্ষ্মীদেবীও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীমন্দিরে না পেয়ে তাঁর সন্ধানে বের হন। ভোজনের পর নানকজীর পেয়েছে জলপিপাসা। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর ইচ্ছামাত্র সৃষ্ট হয় ওখানে সুপেয় জলের এক গভীর কূপ। লক্ষ্মীদেবী এসেই জল আনতে চান। কিন্তু ভাসুরের সম্মুখে জল উঠাবেন কি করে? তিনি বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করেন। বিশ্বকর্মা এসেই ভূগর্ভ-পথে নিমেষে জলে পৌঁছার সিঁড়ি করে দেন। লক্ষ্মীদেবী তখন স্বহস্তে কূপ থেকে জল এনে দেন। উৎকলী ভাষায় বলা হয় একে, 'ভাদ-বউর কুআ'।

গোসাঁই একদিন নীলমণি বর্মণের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীমন্দিরের দিক থেকে বড়দাণ্ডার পথ ধরে একজন সাধু এসে প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দেন। তারপর পথে দাঁড়িয়ে গোস্বামী মহাশয়ের উদ্দেশ্যে আরতির ভঙ্গিমায় উৎকলী ভাষায় ভজন-গান করেন। প্রভু বলেন, 'এঁকে একটি কম্বল দাও।' সতীশবাবু (১) কম্বল ও চার আনা পয়সা দেন। ও-সব না নিয়ে তিনি গান করতে করতে চলে যান। মণি মজুমদার বলেন, 'গানের কথা তো কিছুই বুঝা গেল না।' গোসাঁই বুঝিয়ে দেন প্রথম গানের অর্থ—'হে রাম, কত কাল ধরে তোমায় খুঁজে খুঁজে ফিরছি। আজ তোমার দর্শন পেয়ে ধন্য হলাম।' দ্বিতীয়টির অর্থ, 'হে প্রভো, হে রাম, আবার ঐশ্বর্য দিয়ে ছলনা কর কেন? কম্বলই বা দিচ্ছ কেন? আর টাকা-পয়সারই বা কি প্রয়োজন? হাত দিয়েই তো শীত নিবারণ করি। প্রসাদের ব্যবস্থা তো করেই রেখেছ।'

সমুদ্রস্নান করে একদিন সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু ফিরছিলেন। পথে এক সাধু তাঁকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে, তাঁকে উদ্দেশ্য করে গান ধরেন—

নীলচক্র জগন্নাথ মন ভজনারে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মন ভজনারে॥
আমি গিয়েছিলাম মধুবৃন্দাবনে।
শূন্য সিংহাসন দেখে এলাম সেখানে॥

সদণ্ড কমণ্ডলু লয়ে বিরাজিছ এখানে।
এ হেন মোহনরূপ না হেরি ভুবনে॥[1]

প্রভু তাঁর নিজের উত্তরীয় ও একটি টাকা তাঁকে দেন। টাকা তিনি নেন না।

বার-তের বছরের একটি ছেলে উলঙ্গ হয়ে পথে পথে ঘুরে। কখন বা ঢিল ছুঁড়ে। কিন্তু কারও গায়ে লাগে না। পায়খানা করে মল মাখে সর্বাঙ্গে। গোসাঁই ওঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'ইনি একজন মহাপুরুষ, জাতিস্মর, জড়ভরতের অবস্থা।' গোস্বামী মহাশয়কে দেখে তাঁর খুব আনন্দ। প্রভু পথে বের হলে তিনি তাঁর পেছনে পেছনে চলেন। কখন বা পথের উপর দেওয়া ফুটো লোহার চাদরের নীচ থেকে আঙুল বের করে গোসাঁইর পদস্পর্শ করেন।

একদিন সমুদ্রস্নান করে ফিরার পথে এক কাঙালিনীকে দেখে গোস্বামী মহাশয় অনুগামীদের বলেন, 'তোমাদের কাছে যা আছে, এঁকে দাও। এমন সুযোগ আর নাও হতে পারে।' সতীশবাবু তাঁর ভিজা ধুতিখানাও দিয়ে দেন। আশ্রমে ফিরে প্রভু বলেন, 'আজ বিমলা মা কাঙালিনী বেশে দর্শন দিয়েছেন।' তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আর তাঁর দর্শন মিলল না। বৈশাখের (১৩০৫) বার-তের তারিখের মধ্যে শ্রীক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থানগুলি সব দেখা হল। ভক্তেরা পুরীর বাইরে সাক্ষীগোপাল, কোণারক, ভুবনেশ্বর এবং আশে-পাশের মন্দিরগুলি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোসাঁই তাঁদের বলেন, 'যেতে পার, কিন্তু ঐদিনই ফিরে আসতে হবে। শ্রীক্ষেত্রের বাইরে তোমাদের রাত্রিবাস মহাপ্রভুর বারণ। শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে এক বছরের মধ্যে কোথাও যেতে শচীনন্দন আমাকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং, তোমাদের সঙ্গে আমার যাবার কোন প্রশ্ন উঠে না।'

বৈশাখে (১৩০৫) একদিন গোস্বামী মহাশয় সারদাকান্তকে দিয়ে কাঠের ছোট মন্দির-সমেত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্বামী, শ্রীশ্রীবলভদ্রদেব ও শ্রীশ্রীসুভদ্রা দেবীর দারুমূর্তি কিনিয়ে এনে আসন-ঘরে বসান। প্রভু সচন্দন-তুলসী দেন বিগ্রহচরণে; 'অয়রা' ও কুন্দফুল দিয়ে বিগ্রহ সাজান। চা, জলখাবার, যাই গ্রহণ করেন, বিগ্রহকে ভোগ দিয়ে নেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও প্রসাদী ফুলগুলি ম্লান হয়ে শুকিয়ে যায় না। এ বিষয়ে গোসাঁইকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'জগন্নাথ যা ব্যবহার করেন, তা-ই নির্গুণ চিৎ পদার্থ হয়ে যায়। তিনি যে অন্ন গ্রহণ করেন, তা অন্নব্রহ্ম। তা বিগ্রহের ন্যায় আসনে রেখে পূজা করা যায়। তিনি যে পদার্থ, তাঁর প্রসাদ অন্নাদিও সেই পদার্থ।'[2] কখন কখন হাত-পাখা দিয়ে গোস্বামী মহাশয় আসনের বিগ্রহকে বাতাস করতেন। কখন কখন তিনি বলতেন, 'যে ঠাকুর আমার সঙ্গে কথা বলেন না, তাঁকে আমি পূজা করি না। আমি যা খাই, আমার ঠাকুরও তা খান।' আসনের বিগ্রহের পূজা শেষ হলে তিনি চা ও মহাপ্রসাদ দিয়ে জলযোগ করতেন।[3]

প্রসাদ পাবার পর অমৃতলাল সেন বা জগদ্বন্ধু মৈত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, নরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রার্থনা এবং বাংলা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন। তারপর প্রভু নিজে গ্রন্থসাহেব, সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ পাঠ করতেন। প্রত্যহ বারান্দায় পাখিদের

---

১. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য অমিয়কুমার সান্ন্যাল-প্রণীত 'শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত', পৃ ২৯৮।

২. 'আচার্য-প্রসঙ্গ' (১৩৫০), পৃ ১১৮।

৩. 'আচার্য-প্রসঙ্গ' পৃ ১১৮।

জন্য চাল ও জল দেওয়া হত। বেলা সাড়ে এগারটায় গোসাঁই শৌচে যেতেন; শৌচান্তে চন্দন দিয়ে তিলক করতেন এবং পাকাল প্রসাদ (পান্তা অন্ন মহাপ্রসাদ) মুড়কি দিয়ে সামান্য জলযোগ করতেন। বেলা দুটায় পান্নালাল ঘোষ বাংলা মহাভারত পাঠ করতেন; সাড়ে তিনটা পর্যন্ত পাঠ হত। এই সময় বানরেরা আসত। তাদের নানারূপ খাবার জিনিস দেওয়া হত। তারপর মহাপ্রসাদ এলে কাঙ্গালীদের দিয়ে প্রভু নিজে নিতেন। আশ্রিত ও অনুগতদের সঙ্গে প্রভু কথাবার্তা বলেন। প্রায়ই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসঙ্গ উঠে। গোসাঁই বলেন, 'বাল্যভোগের পর জগন্নাথদেব প্রায়ই এখানে আসেন।' আমাকে বলেন, "আমি-ই তো এখানে আসি, তোর আবার মন্দিরে যাবার কি প্রয়োজন?" তিনি কখন আসেন আচারী বৈষ্ণবের বেশে, তিলক পরে, মালা ধারণ করে, কখন বা অন্য বেশে; কখন বা তিনি পাঠের সময় আসেন, পাঠ আর শোনা হয় না। কত রকম ঠাট্টা-তামাসা করেন। সেদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শ্রীবৃন্দাবনে মাড়োয়ারীদের ঐ মূর্তি দেখেছিস? সেই তীর্থমণিকুঞ্জের পথে?" আমি বলি, দেখেছি, কেন? তিনি বলেন, "আয়নায় তোর মুখ দেখেছিস? আমি ওখানে তুই হয়ে বসে আছি। মাড়োয়ারীরা কত চেষ্টা করল, বিগ্রহের মুখ আর বদ্‌লে না।"'

আত্মজাকে একদিন প্রভু বলেন, 'শান্তি, আজ তোর রাঁধা ফুলকপির ডালনা খেয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ভারী খুশি! আজই প্রথম খেলেন কি না আলু-কপি! তাঁর ভোগে তো এসব কখন লাগে না।' গুরুর কথা শুনে, কৌতুক করে এক ভক্ত বলেন, 'এমন সুস্বাদু রান্না, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বোধকরি কখন খান নি! লক্ষ্মীদেবীর রান্নার যা ছিরি! খুশি হবেন না?' গোসাঁই হেসে বলেন, 'ঠিকই বলেছ; এমন রান্না পাবেন কোথায়? ভায়া বড় ভুল করেছেন! এখানে না এসে, বাংলাদেশে থাকলে তেল-ঘির মুখরোচক খাবার খেতে পারতেন। বিনা মশলায় জলে সিদ্ধ ডাল-তরকারী আর কত রুচবে?' একদিন বুড়াঠাকরুণকে প্রভু বলেন, 'আপনার রাঁধা সুক্তোর ঝোল, শ্রীশ্রীজগন্নাথ সবটুকুই খেয়ে ফেলেছেন। আমার জন্য একটুও রাখেন নাই। রান্না ভাল হলে, কাড়াকাড়ি করে সবটা-ই তিনি নিঃশেষ করেন।'[১]

জগন্নাথদেব যেদিন তাঁর সঙ্গে আহার করেন, গোস্বামীপ্রভু সকলকে প্রসাদ দেন। একদিন প্রভু ডাব পান করতে করতে, ডাব ধরেই দাঁড়িয়ে থাকেন। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের মনে হয়, গোসাঁই বুঝি আর ডাব নেবেন না। তিনি হাত বাড়ান। প্রভু তখন ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'কর কি, কর কি? জগন্নাথদেব ডাব খাচ্ছেন যে। ব্রহ্মচারী অপ্রস্তুত হয়ে দেখেন, প্রভু আবার নিচ্ছেন।'

গোস্বামী মহাশয় খালি পায়ে হাঁটেন; যান আরোহণ করেন না। পথে বড় পাথর-কাঁকর। প্রভুর পায়ে বড় লাগে; তাই আর মন্দিরে যান না। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব একদিন তাঁকে বলেন, 'মন্দিরে যদি একান্তই আসতে চাও, এস, পায়ে লাগবে না। আটকে ভাঙ্গা খোলা বা চড়ার উপর দিয়ে যা; পায়ে বিঁধলে আমায় দুই চড় দিস।' তারপর থেকে গোসাঁইজীর হাঁটতে আর কষ্ট হয় না।[২]

এক জ্যোৎস্না রাত্রে গোসাঁই সমুদ্রতীরে গিয়ে বসেন। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-

---

[১] জগদ্বন্ধু মৈত্র-প্রণীত 'প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', পৃ ৫৭৫।

[২] 'আচার্য-প্রসঙ্গ', পৃ ৯১।

মহানদী-গোদাবরী-কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা তাঁকে এসে অভিবাদন করেন।

অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন অপরাহ্ণে সশিষ্য গোস্বামী মহাশয় নরেন্দ্র-সরোবরে চন্দন-যাত্রা-উৎসব দেখতে গেলে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীবাবু, জগতবাবু আর মুন্সেফ কিশোরীবাবু তাঁকে দর্শন করতে আসেন। নীলমণি বর্মণের বাড়ীতে প্রভুকে না পেয়ে ওঁরাও যান 'নরেন্দ্রে'। সরোবরের একপাশে চড়ার উপর ছবির মত মন্দির। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই তাঁরা তাঁকে প্রণাম করেন। তিনি বাধা দিয়ে ওঁদের বলেন, 'বিগ্রহের সম্মুখে কাউকে প্রণাম করতে নাই।' গোসাঁই তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। তারপর প্রশ্ন করেন, 'শ্রীক্ষেত্র আপনাদের কেমন লাগে?' কালীবাবু বলেন, 'স্থান তো অপূর্ব! কিন্তু আমরা মর্যাদা দিতে পারি কৈ? জহুরীর কাছে মণির কদর; আর সকলে ভাবে রকমারি কাঁচ। মণির তাতে কি আসে যায়? জগমোহন, গম্ভীরা, সিদ্ধবকুল, সার্বভৌমের বাটী, শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ, টোটা-গোপীনাথ, হরিদাসের সমাধি, গুণ্ডিচা, চক্রতীর্থ, এখানের পথ-ঘাট, বালি-কণা ঐসবের কোন মূল্যই আমরা দেই না। অথচ ভক্তবৈষ্ণবের কাছে এসব অমূল্য সম্পদ। আঠার বছর ধরে মহাপ্রভু এখানে লীলা করেছেন—দিনের পর দিন গরুড়-স্তম্ভ ধরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করেছেন, তাঁর প্রেমের ছোঁয়ায় পাথর গলেছে, প্রেমাশ্রু-ধারায় নালা হয়েছে, আর পাথরের উপর পড়েছে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ছাপ, যেন কোন প্রখ্যাত ভাস্কর খোদাই করে রেখেছেন! পিচ্‌কারী-ধারায় অশ্রুপাতের কথা শুনে দিল্লীর বাদশা শিল্পী পাঠান সসম্ভ্রমে, চিত্রপট এঁকে নিতে। প্রেমোন্মাদে দিব্যভাবে গম্ভীরার মেঝে ঘষে ঘষে মহাপ্রভু মুখ জখম করেছেন; প্রেমরসে বিভোর হয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন সমুদ্রে—যমুনা-জ্ঞানে। এ-সব ভাবলেও হৃদয় পবিত্র হয়। গম্ভীরায় মহাপ্রভুর কাঁথা, কমণ্ডলু ও পাদুকাস্পর্শে জীবন ধন্য হয়। সিদ্ধ-বকুল অন্তঃসার শূন্য হয়েও ওঁকার রূপ ধারণ করে মহাপ্রভুর জয়ধ্বনি করছে। এ অবস্থায়ও গাছে পাতা হয়, ফুল-ফল ধরে!'

গোস্বামীপ্রভু তাঁর কথা শুনে খুশি হন। তিনি বলেন, 'সমুদ্রস্নান, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন ও মহাপ্রসাদ ভক্ষণ—এই তিনটি হলে পুনর্জন্ম হয় না। এখানে একাদশীতেও মহাপ্রসাদ অন্ন আহারে দোষ নাই।'

'নরেন্দ্র'র উত্তর পাড়ে বনানীর উপর গোস্বামীপ্রভুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তিনি বলে উঠেন, 'ওখানে সুন্দর একটি মন্দির দেখতে পাচ্ছি!' সবুজ ঘন বন ছাড়া, আর কিছু কারও চোখে পড়ে না।[১]

জগতবাবু বলেন, 'এ দেশের লোক বড় গরীব। কিন্তু এদের নিষ্ঠুরতার কথা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। এই তো কয়েকদিন ধরে এখানে বানর-বধ চলেছে। পৌরসভা কয়েকজন শিকারী রেখেছে; ওদের কাজ মর্কট-নিধন। স্বভাব-চঞ্চল এই প্রাণিগুলি লোককে নানাভাবে জ্বালাতন করে, এ কথা ঠিক; কিন্তু বিষ্ণুক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ জাতির প্রতিনিধি-পরিষৎ কি করে এই জঘন্য কার্যে প্রবৃত্ত হন?' জগত-বাবুর কথা শুনে গোস্বামী মহাশয়ের স্বভাবসুন্দর হাসি মিলিয়ে যায়। কান্নায় তাঁর বুক ভাসে। শান্ত হয়ে তিনি আশ্রম-গৃহের পথ ধরেন। পথে চলতে চলতে ওঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেন—কি করে এই নিষ্ঠুর কার্য বন্ধ করা যায়! স্থির

---

১. 'আচার্য-প্রসঙ্গ', পৃ. ৯৭।

হয়, উকিল হরিশবাবুকে দিয়ে বানর-বধ অশাস্ত্রীয় বলে পৌরসভার উদ্দেশ্যে একখানি আবেদন পত্র লিখাতে হবে। এতে করদাতাদের স্বাক্ষর নিয়ে চেয়ারম্যান মিঃ গিলমেনের কাছে পাঠাতে হবে। আর, 'মিরর', 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রিকায় বানর-বধের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালাতে হবে। পরদিন গোস্বামী মহাশয় নিজে হরিশবাবুর গৃহে যান। 'মিরর' আর 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' তার যায়। বানর-বধের বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ হতে থাকে সব পত্রিকায়।

গোস্বামীপ্রভুর আন্দোলনে গিলম্যান সাহেব এক মাসের জন্য বানর-বধ স্থগিত রাখেন। মর্কট-নিধন ধর্মবিরুদ্ধ কিনা এই সময়ের মধ্যে তা নিরূপণ করতে হবে। স্বামী দেবপ্রসাদ ও সতীশ মুখোপাধ্যায় (১) এই পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রালোচনায় উঠে-পড়ে লাগেন। স্বামীজী একখানা প্রামাণ্য পাঁতি প্রস্তুত করে, পুরুষোত্তমের মঠাধ্যক্ষদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। এদিকে পৌরসংসদের কয়েকজন উৎসাহী সভ্যও কম যান না। তাঁরা সমান তালে চলেন; তাঁরা জেলা-স্কুলের হেড-পণ্ডিতকে গিয়ে ধরেন, বানর-বধের স্বপক্ষে একখানা পাঁতি প্রস্তুত করে পণ্ডিতদের দিয়ে সই করিয়ে দিতে হবে। ঐ পণ্ডিতই মাত্র কয়েকদিন পূর্বে প্রভুর কাছে এসে বলেছিলেন, 'এদেশে একটি আরশুলা মারলেও প্রায়শ্চিত্ত করা বিধি, বানরের বেলায় তো কথাই উঠে না।' অথচ তিনি-ই 'বানর-বধ অশাস্ত্রীয় নয়' এইরূপ পাঁতি লিখে, স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে সই করিয়ে, ওঁদের হাতে তা তুলে দেন।

পৌরসভা করদাতাদের আবেদন নাকচ করে। বানরেরা কি বুঝে! তারা গোস্বামীপ্রভুর কাছে এসে কান্নাকাটি করে। ওদের স্বভাবসিদ্ধ চপলতা নেই। হাত-মুখ নেড়ে কিচির-মিচির করে প্রভুকে কি যেন বলে! শুনে তিনি কাঁদেন। ওদের খাবার দিলে খায় না। গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না; শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব নিশ্চয়ই এসব বন্ধ করাবেন। কয়েকটা দিন সাবধানে থেক।' ওরা তখন শান্ত হয়ে চলে যায়।

পূর্ণোদ্যমে শুরু হয় আবার বানর-বধ। ভক্তেরা এসে জানান বানরের রক্তে তাঁদেরই ছাদ ভাসে। মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে গোসাঁই রোদন করেন অসহায়ভাবে। বানরগুলি দলে দলে এসে প্রভুর আশ্রমে সমবেত হয়; তাঁর আস্তানাই তাদের নিরাপদ আশ্রয়—এই সত্যটুকু তারা বুঝেছে। কত বানরমাতা এখানে আসার পথে, রক্তাপ্লুত নিথর দেহে পড়ে রয়েছে। একদিন এক শিকারী এসে ছাদে নিশানা করে। কেঁদে কেঁদে প্রভু বলেন, 'হরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করে এস, বাড়ীর উপর গুলি করা আইনসঙ্গত কিনা। ডেলভিঞ্জ সাহেবকেও জানাতে পার।' মিঃ ডেলভিঞ্জ তখন পুরীর (শ্রীক্ষেত্রের) ম্যাজিস্ট্রেট।

গোস্বামী মহাশয় সমুদ্রস্নানে গেছেন। ফিরার পথে দেখেন সদ্য নিহত বানরের তাজা রক্তে পথ রাঙা; তিনি আর্তনাদ করে উঠেন। পথচারীরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায়; তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। তারা অবাক হয়ে ভাবে, তুচ্ছ বানরের জন্য মানুষ কি করে অমন করে কাঁদে! মহাবীরের মন্দিরে গিয়ে প্রভু পূজা দিয়ে বলেন, 'শক্তিধর, এই নিষ্ঠুর কাজ বন্ধ কর।' 'অমৃতবাজার', 'মিরর', 'বেঙ্গলী', 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় টেলিগ্রাম যায়। সারা ভারতে এই নিয়ে তীব্র আন্দোলনের ঢেউ উঠে। নানা জায়গায় সভা হয়। বানর-বধ নীতি বিগর্হিত ও অশাস্ত্রীয়, এই মর্মে ছোটলাটের কাছে প্রত্যহ বহু আবেদন আসে। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী সভা করে ছোটলাটকে অনুরোধ করেন, এই অশাস্ত্রীয় নিষ্ঠুর কার্যে যেন তিনি হস্ত-

ক্ষেপ করেন। 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২) ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিতদের স্বাক্ষরযুক্ত অভিমত পাঠান। তাতে ছিল, 'বনর-বধ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নিষ্ঠুর কার্য।'

পৌরসভার বাড়াবাড়ি দেখে মিঃ ডেলভিঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ গিলম্যানকে এই বলে অনুরোধ করেন, যেন বানর-বধ বন্ধ রাখা হয় এবং তাঁকে জানান যে, তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেবার জন্য লিখেছেন; উত্তর না আসা পর্যন্ত বানর-বধ যেন মুলতুবী রাখা হয়। এই অনুরোধ উপেক্ষা করে পৌরপিতারা বানর-নিধনের জন্য আরও শিকারী নিয়োগ করেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জেলার শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তখন ঘোষণা করেন, প্রতিটি বানর-বধের জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে পাঁচ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। তখন থেকে বানর-বধে ভাঁটা পড়ে।

২২ জ্যৈষ্ঠ (১৩০৫) সশিষ্য গোস্বামীপ্রভু গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দর্শনে। শবর পাণ্ডারা প্রভুকে ঘিরে দাঁড়ান। রূঢ়ভাবে তাঁদের একজন প্রভুকে বলেন, 'টাকা না দিলে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেব না।' অন্য পাণ্ডারাও সায় দেন। গোস্বামী মহাশয় হুঙ্কার দিয়ে উঠেন। তিনি বলেন, 'বিধু চল।' তখন এক অভিনব ব্যাপার ঘটে। প্রভুর হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কলেবর কাঁপতে থাকে। ছুটে যান তখন পাণ্ডারা গোস্বামী মহাশয়ের কাছে। তাঁকে বিনীত হয়ে বলেন, 'আপনাকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব হুঙ্কার দিয়ে কম্পমান; আপনি না এলে আমাদের রক্ষা নেই।' এই অঘটনের কথা শুনে, প্রভু স্নান-দর্শনে যান। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব মূর্তির কম্পন বন্ধ হয়। পরদিন পাণ্ডাদের মধ্যে বিবাদ লাগে; শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাকশালে আগুন ধরে। সেবা বন্ধ থাকে। তৃতীয় দিনে, যে পাণ্ডা গোস্বামীপ্রভুকে অসম্মান করেছিল, তাঁর স্ত্রী ও তিন ছেলে নিয়ে পরিবারের আটজন একই দিনে কলেরায় মারা যায়। পাণ্ডা মন্দিরে গিয়ে হত্যা দেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথংদেব তাঁকে স্বপ্নে বলেন, 'গোসাঁই আমার দ্বিতীয় কলেবর; তাঁকে অপমান করে আমারই অপমান করেছিস। তোদের সকলকে আমি নির্বংশ করব। যদি গোসাঁই তোদের ক্ষমা করেন, তবেই রক্ষা পাবি।' স্বপ্নাদেশ শুনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শবর-পাণ্ডারা দল বেঁধে যান গোস্বামী মহাশয়ের কাছে। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। প্রভু তাঁদের বলেন, 'তোমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবক। তোমাদের সকল ব্যবস্থাই তিনি করেন। অর্থের জন্য যাত্রীদের উপর তোমরা কখন জোর-জুলুম কর না।'[১]

কুঞ্জ গুহঠাকুরতার ছুটি ফুরিয়ে আসে। গোসাঁই একদিন তাঁকে বলেন, 'কুঞ্জ, তুমি বার্লি খেও।' সতীর্থরা বলাবলি করেন, 'কুঞ্জের নিশ্চয়ই জ্বর আসবে, তাই পূর্ব থেকে এই ব্যবস্থা।' দুদিন বাদে সত্যি সত্যি কুঞ্জের জ্বর হয় ১০৩°। প্রভু বলেন, 'ডাক্তারী চিকিৎসায় কোন সুবিধা হবে না।' পাকাল, মুড়কি, ক্ষীর সবই কুঞ্জ পান। রামকৃষ্ণ গুহঠাকুরতা মন্তব্য করেন, 'কুঞ্জ বিনা চিকিৎসায় মরবে।' গোস্বামী মহাশয়ের কানে এ-কথা উঠতেই তিনি বলেন, 'ডাক্তারী চিকিৎসাই করাও; সত্যকুমারের সময়ও তোমাদের গ্রামে কথা উঠেছিল, "সত্যকুমার বিনা

---

[১] প্রাচীন 'মন্দির' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমদ্‌ কিরণচাঁদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐ সময় লেখা চিঠি থেকে।

চিকিৎসায় মারা গেছেন।"' প্রভুর শিষ্য ডাঃ বাণীকণ্ঠ ঘোষের প্রেসক্রিপশন মত কুঞ্জ গুহকে ঔষধ-পথ্য দেওয়া হয়। কিন্তু জ্বর বিরামের লক্ষণ নেই। একদিন রাত্রে ১০৪° জ্বর উঠে। কুঞ্জ সতীশকে দিয়ে গুরুর কাছে অনুরোধ করে পাঠান, 'ঠাকুরই যেন চিকিৎসা করেন।' রাত্রি এগারটায় প্রভু কুঞ্জ গুহের জন্য পাকাল-প্রসাদের ব্যবস্থা করেন। তিন-চার দিন পর কুঞ্জবাবু নিরাময় হন। গোসাঁই বলেন, 'কুঞ্জের বাঁচা এক অদ্ভুত কাণ্ড। তার পুনর্জীবন হয়েছে।'

ভালো হয়ে কুঞ্জবাবু একদিন গুরুকে বলেন, 'একদিন স্বপ্নে দেখি, মাঠাকরুণ শ্রীকৃষ্ণের বামে সিংহাসনে বসে আছেন, আর আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়িতে। আমার বড় খারাপ লাগল; ইচ্ছা হল, শ্রীকৃষ্ণ নেবে আসুন আর আপনি গিয়ে মার পাশে বসুন।' প্রভু হেসে বলেন, 'তাতে দোষ কি?' যাবার দিন কুঞ্জের সঙ্গে গোসাঁই বড় মধুর ব্যবহার করেছিলেন।

৬ আষাঢ় (১৩০৫) রথযাত্রা। দ্বিতীয়া বয়ে যায়; শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে যথা-সময়ে রথস্থ করা হয় না। গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'দ্বিতীয়া উত্তীর্ণ হলে, রথে বামন-দর্শন আর মন্দিরে দর্শন—এই দু-এর মধ্যে কোন তফাৎ নাই।' প্রভুর শিষ্যেরা মিলে দ্বিতীয়ায় পুষ্যানক্ষত্রে গোসাঁইকে দোলায় তুলে জয়ধ্বনি করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীবলরাম ও শ্রীশ্রীসুভদ্রা রথে উঠেন তৃতীয়ায়। মাসির বাড়ী একরাত্রি যাপন করে পরদিন তাঁরা গুণ্ডিচা যান।

১৮ শ্রাবণ (১৩০৫) ঝুলন পূর্ণিমা; গোস্বামীপ্রভুর ৫৮তম আবির্ভাব-তিথি। সকালবেলা ভক্তেরা প্রভুর চরণে সচন্দন পুষ্প দিয়ে প্রণাম করেন ও লুটো-পুটি খান; তাঁদের সাধ ঐদিনটি সার্থকভাবে উদ্‌যাপন করেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনে গোসাঁই বলেন, 'কাঙ্গালীরা পেটভরে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পেলে আমি খুশি হব।' যোগজীবন গোসাঁই চান দিনটাকে সার্থক করতে, কিন্তু ভেবে কূল পান না, কি করে এ সম্ভব! বিধু ঘোষ বলে উঠেন, 'দাদা গোসাঁই, দু-এ দু-এ চার—এই হিসাবে কূলকিনারা পাবে না। ঠাকুরই তো বলেছেন, "আমরা সব রাজার বেটা! আমাদের আবার ভাবনা-চিন্তা কি?" তাঁর ইচ্ছা কাঙ্গালীরা পেট ভরে খায়। তাঁরই কৃপা ভরসা করে, আমি এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করব। তোমরা সব যোগাড় কর।' পাঁচ-শ টাকার কণিকা (মহাপ্রসাদী ঘৃতান্ন) আর সব উপাদেয় মহাপ্রসাদ আসে। আমও প্রচুর আনা হয়। আকণ্ঠ ভোজন করেন ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালীরা। জটীয়াবাবার জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠে। তারা বলাবলি করে, 'কত রাজা-মহারাজা এলেন আর গেলেন। কত জম্বুর মহারাজা আসেন। এমন আদর করে সেরা মহাপ্রসাদ দিয়ে আর কেউ কখনও আমাদের পরিতৃপ্ত করেন নি। জয় জটীয়াবাবার জয়।' একদিন সকালে মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্‌স-দারোগা এসে গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করে বলেন, 'আর চাকুরি করা সম্ভব নয়। এতদিন ওরা 'মাকর মার' (বানর মার) বলে ক্ষেপেছিল। আপনার আন্দোলনে তা প্রায় বন্ধ হয়েছে। শ্রীমন্দিরের প্রাচীরে এখন পায়খানা উঠেছে। এদের ধর্মভয় বলে কিছু নেই; বেয়াদবিরও শেষ নেই।' প্রভু শুনে অবাক হয়ে বলেন, 'শ্রীমন্দির ভগবানের অঙ্গ। শ্রীমন্দিরের গায়ে পায়খানা আর ভগবানের গায়ে পায়খানা, একই কথা। মন্দির-প্রদক্ষিণের সময় পায়খানাও পরিক্রমা করতে হবে। এঁদের কি বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে?' শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে গোসাঁই বলেন, 'যদি এই অনাচার বন্ধ না কর, তাহলে আর শ্রীমন্দিরে যাব না।' ঐদিনই এ-ব্যাপারে টেলিগ্রাম যায়,

'অমৃতবাজার পত্রিকায়'। পুরী পৌরসংস্থার বিরুদ্ধে পত্রিকায় আবার নূতন করে সমালোচনা শুরু হয়। বেগতিক দেখে, পৌরসভা পায়খানা অবিলম্বে ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। ভাদ্র মাসের (১৩০৫) মাঝামাঝি একদিন ভাইস্-চেয়ারম্যান জগদ্বন্ধু পট্টনায়ক এসে গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, 'আমরা দু-এক দিনের মধ্যেই পায়খানা ভেঙ্গে ফেলছি। আপনারা আন্দোলন থামান।'

২১ ভাদ্র (১৩০৫) সকালবেলা যোগজীবন, ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ, অশ্বিনী মিত্র (বৈরাগী), স্বামী দেবপ্রসাদ এবং আরও কয়েকজন সতীর্থ সমুদ্রস্নানে যান। সমুদ্র-সৈকতে স্বামীজী সটান হয়ে শুয়ে পড়েন। তিনি অশ্বিনীকে বলেন, 'রঙ্গমঞ্চের কনসার্টের মত সঙ্গীতের সুরলহরী আমার কানে ভেসে আসছে।' খানিক পরে তিনি সমুদ্রে নামেন। আচমকা একটি উত্তাল তরঙ্গ এসে স্বামীজী ও ব্রহ্মচারীকে বিপরীত দিকে ভাসিয়ে নেয়—স্বামীজীকে চক্রতীর্থের দিকে ও ব্রহ্মচারীকে হরিদাসের সমাধির দিকে। হাত-পা ছেড়ে দিলে, ঢেউই ব্রহ্মচারীকে তীরে নিয়ে আসে। স্বামীজী আপ্রাণ চেষ্টা করে, তিনবার 'জয় গুরু' বলে ভেসে উঠেন। নোলিয়ারা এই বিপদ দেখেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে যায় না। তারা চড়া পারিশ্রমিক হাঁকে। পাঁচ-সাত মিনিট পরে স্বামীজীকে যখন ওরা পাড়ে নিয়ে আসে—তখনও তাঁর সৌম্য-শান্ত মুখশ্রী, কোনও বিকৃতি নেই। কিন্তু ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন, 'জীবনের কোন লক্ষণ নেই।' গোসাঁইর কাছে এই দুঃসংবাদ পৌঁছতেই তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলেন, 'একজন ধর্মবন্ধু হারালাম।' তিনি জগদ্বন্ধু মৈত্রকে ভূতানন্দ স্বামীর নিকট পাঠান। স্বামীজী জগদ্বন্ধুবাবুকে বলেন, 'স্বামীজীর সমাধি দিতে হবে। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ যেন স্বামীজীর শবদেহ স্পর্শ না করেন। তবে গোস্বামীপ্রভুর শিষ্যেরা সকলেই ব্রাহ্মণ। ওঁরা ছুঁতে পারেন।' পুলিশ এসে লাশ ছেড়ে দিয়ে, মঙ্গলঘাটে সমাধির অনুমতি দেয়। স্বামীজীর মৃত্যুসংবাদ শুনে বিধু ঘোষ 'হায়, হায়' করে উঠেন; তিনি বলেন, 'পাগল না হয়ে যাই!' সরলনাথ অজ্ঞান হয়ে পড়েন, স্বামী ভূতানন্দজী গোস্বামীপ্রভুর কাছে এসে স্বামীজীর কথা বলে চোখের জল ফেলেন। তিনি বলেন, 'একদিন শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে তিনি সাষ্টাঙ্গ দিচ্ছেন দেখে তাঁকে পরীক্ষাচ্ছলে বলি, "স্বামীজী আপনি সন্ন্যাসী, সাষ্টাঙ্গ দিচ্ছেন কেন?"' তিনি জোড়হাতে বলেন, 'আপনারা উচ্চাধিকারী, আপনাদের কথা আলাদা, আমাদের তো সবে হাতেখড়ি।' গঙ্গামাতা মঠের পণ্ডিত প্রভুকে বলেন, 'আপনার প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনুগত্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।'

বাস্তবিকই গোসাঁই যেন তাঁর প্রাণ ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর সর্বস্ব। স্বামীজী সব সময় বলতেন, 'গুরুই পরব্রহ্ম।' মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে অশ্বিনী বৈরাগীর মুখে সঙ্গীত শ্রবণের কথা শুনে গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'স্বামীজীর মৃত্যু আকস্মিক ঘটনা নয়। যথার্থ সাধুরা যখন মরদেহ ছাড়েন, তখন স্বর্গে বিদ্যাধরীরা আনন্দে সঙ্গীত ও নৃত্য করেন। স্বামীজীর কর্ম শেষ হয়েছে; তিনি মুক্ত হয়েছেন। তাঁর আর গর্ভবাস নাই।' বানর-বধের বিরুদ্ধে পাঁতি সংকলনের সময়, কতদিন যে তিনি বানরের প্রতি সহানুভূতিতে কেঁদেছেন। বানর-নিধন ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী ছিলেন, তাঁরা স্বামীজীর মৃত্যুতে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন।

স্বামী দেবপ্রসাদের দূরদর্শন হত। রিপুর তাড়নায় তাঁকে বিচলিত হতে কেউ কখন দেখে নি। তাঁর আত্মা নির্মল হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলেকে

নিয়ে ও তাঁর স্ত্রীর টিয়া-পাখিকে নিয়ে তিনি ঘুরতেন। তাঁর এই আসক্তির কথা নিয়ে কেউ কেউ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসত। ছেলের মৃত্যুতে তাঁর একটি বন্ধন ছিন্ন হয়। কুম্ভমেলায় গেলেন, টিয়াটি তখনও সঙ্গে। চড়ায় যাবার পূর্বে তিনি প্রেমসখীর নিকট টিয়াটিকে গচ্ছিত রেখেছিলেন। পাখিটি মধ্যে মধ্যে মানুষের মত বলে উঠত, 'কালী কল্পতরু, শিব জগদ্‌গুরু, শিব শিব।' তাঁর টিয়া-পাখির কথা-প্রসঙ্গে প্রভু বলেছিলেন, 'আশ্রিতকে রক্ষা করা ধর্ম।' জিনিসের মধ্যে একটি সিঁদুরের কৌটা ছিল দেখে গোসাঁই বলেন, 'এটি বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ।' কৌটার ভিতরে ভাঁজ করা অবস্থায় তিনখানা চিঠি বের হল। তিনখানাই প্রভুর স্বহস্তে লিখা, কুশল-মঙ্গলের কথা। এই ছিল তাঁর অমূল্য সম্পদ। স্বামীজী নানাস্থানে নানা অবস্থায় কত দরদের সঙ্গে পত্রগুলি নিত্যসঙ্গী করে রাখতেন। পত্র তিনখানা ছিল এইরূপ—

(১)

ওঁ হরিঃ

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনার পরিবার ইচ্ছা করিলেই সাধন পাইবেন। যতদিন অর্থের প্রয়োজন আছে, অর্থোপার্জ্জন করিবেন। কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম কাটিয়া যাইবে। সাধনে অধিক সময় দিলে শীঘ্র শীঘ্র ফল পাইবেন। যেখানেই থাকুন না কেন, সময়ে সময়ে সাহায্য করিতে বাধ্য হইতে হয়। প্রাণের যোগ দূরে নাই, নিকটে। আপনার তপস্যার কুশল হউক।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

(২)

ওঁ হরিঃ

সবিনয় নিবেদন,

অনেকদিন পর আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। অর্থোপার্জ্জন করিতেই হইবে, স্কুলের কার্য্য সুবিধা না হইলে অন্য কার্য্য গ্রহণ করিলে হয়। সকল বিষয়েরই সময় আছে। সময় হইলে ঘরে বসিয়া হইবেক। সময় না হইলে সহস্র চেষ্টাতেও কিছু হয় না। তথাপি করিতে হয়, কারণ ইহারই নাম কর্ম্মভোগ॥ কর্ম্মভোগ না করিলে শুভ আসে না। সাধনে অগ্রসর হইতেছেন, ইহাই প্রকৃত লাভের কথা। আত্মহারা হইয়া নির্ভর যত করিবেন, সাধনে ততই উন্নতি।

যেখানেই থাকুন, আমরা সর্ব্বদা নিকটেই আছি। গুরু-কৃপাতে আপনি সপরিবারে সুখে থাকিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করুন।

নিবেদক—
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

(৩)

ওঁ হরিঃ

সবিনয় নিবেদন,

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার, আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পূর্ব্ব পত্র আমার হস্তগত হয় নাই। নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন করিলে নিশ্চয়ই ফললাভ হয়। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। ধর্ম্ম আর কথার ব্যাপার থাকে না। কোন

বিষয় অনুমান করিয়া লইতে হয় না, সকলই প্রত্যক্ষ।

পত্র লিখুন বা নাই লিখুন ক্ষতি নাই; যাঁহারা সাধন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিকটে। সম্প্রতি ঢাকাতেই আছি, শীঘ্র কোন স্থানে যাওয়া হইবে বোধ হয় না।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

৫ কার্ত্তিক (১৩০৫) দুর্গাপূজা। পূজার ছুটিতে ভক্তেরা গুরু-দর্শনে আসেন। বরিশাল থেকে গোরাচাঁদ দাশ ও লক্ষ্মীচরণ সেন আসেন। কলিকাতা থেকেও আসেন ভোলানাথ দে, ভূতনাথ গোপ এবং আরও অনেকে। বরিশাল থেকে কচুর মিঠাই এসেছিল। গোস্বামী মহাশয়ের আসনের পাশে কয়েকটি বানর বসে ছিল। সারদাকান্তকে প্রভু বলেন, 'এদের এই মিষ্টি কিছু দাও।' ওরা কাড়াকাড়ি করে খায়। একটি বানর কটমট করে তাকায় আর কিচির-মিচির করে কি বলে! গোসাঁই বলেন, 'কচুর মিঠাই খেয়ে ওর গলা ধরেছে। তেঁতুল আর গুড় দিয়ে একটু সরবৎ করে দাও।' সরবৎ খেয়ে সে সুস্থবোধ করে।

প্রভু একদিন ভক্তদের বলেন, 'চাষী যেমন ক্ষেতে হাল দেয়, মই দেয়, বীজ বপন করে, তারপর জলের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, ঐরূপ তোমাদেরও সাধন-ভজন করে প্রস্তুত হয়ে, ভগবানের কৃপার জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।' লক্ষ্মীবাবু বলেন, 'সাধন-ভজন সম্পর্কে এক প্রশ্ন করব বলে ভেবে এসেছিলাম, আর প্রয়োজন হল না।'

বেলা না হতে, রোদের তাপে বালি যায় তেতে। পিপাসায় পথের গরু-ঘোড়া ছট্ফট করে। গোস্বামী মহাশয় শিষ্যদের বলেন, 'একটি বড় গামলা কিনে বাড়ীর ছায়ায় পথে রেখে জল ভরে দিও।' সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল হয়। খবর যায় তখনই পৌরসংস্থায়। তর সয় না জগদ্বন্ধু পট্টনায়কের। তখনই ছুটে এসে রিপোর্ট পাঠান চেয়ারম্যানের কাছে, 'গামলাটি পথ-চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে—অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত।' রিপোর্ট পড়ে গিলম্যান সাহেব নিজে আসেন দেখতে। গরু-ঘোড়ার জলপান স্বচক্ষে দেখে তিনি অভিভূত হন। তিনি গোস্বামী-প্রভুর অনুগামীদের বলেন, 'প্রয়োজন বোধ করলে আরও বড় গামলা আপনারা স্বচ্ছন্দে পথে রাখতে পারেন।'

ছোটলাট স্যার জন উড্বার্ণ এই সময় কটকের কমিশনারের কাছে বানর-বধ অবিলম্বে রদ করার জন্য টেলিগ্রামে আদেশ পাঠান। পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট ঐ তার-বার্তা পেয়েই—১৯ কার্ত্তিক (১৩০৫), মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখে জানান, 'লেফটেনাণ্ট গভর্নর এক হুকুমনামা জারি করে বানর-বধ বন্ধ করেছেন।'

গিলম্যান সাহেব পুরীর সিভিলসার্জনও ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি তিনি দিন দিন শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে উঠেন। গোসাঁই ঘড়ি ধরে চলতেন। সাহেব একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, তিনি সময় স্থির করে দেন। যথাসময়ে তাঁর আগমনের জন্য প্রভু প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ইত্যবসরে তিনি তাঁর নিত্যকার্যে বসেন। তারপর সাহেব এসে খবর দিলে, গোসাঁই সবিনয়ে তাঁকে বলতে বলেন, 'ঐদিন তাঁর পক্ষে আর সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবে না। গিলম্যান সাহেব লজ্জিত হয়ে নিজের ত্রুটির কথা স্বীকার করে চলে যান।

প্রভু ধ্যানমগ্ন হয়ে তাঁর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। পাঠের সময় যার

যার নির্দিষ্ট স্থানে বসে ভক্ত ও শিষ্যেরা পাঠ শুনেন। স্বামী দেবপ্রসাদের স্থান ছিল গুরুর ডান পাশে। ঐ স্থান স্বামীজীর মৃত্যুর পর শূন্য পড়ে থাকত। মহাভারত পাঠের সময় ঐদিন ওখানে একজন বসতে গিয়েছেন, প্রভু তখন ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'কর কি, কর কি? স্বামীজী যে ওখানে বসে পাঠ শুনছেন।'

একদিন গভীর রাত্রে দুটি প্রেত এসে কাকুতি-মিনতি করে গোস্বামীপ্রভুকে বলে, 'আমরা পরলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে শুনেছি, আপনার উপর এখন জীব-উদ্ধারের ভার। এ ব্যাপারে আপনি ছাড়া আর কারও কোন হাত নেই।' জীবিতকালে এঁরা ছিলেন পিতা-পুত্র। নৈহাটীর কাছে, গরিফায় ছিল তাঁদের বাড়ী। এঁদের বৈদ্যকুলে জন্ম হয়েছিল। পিতা কুলগুরুর কাছে সাধন পেয়েছিলেন আর পুত্র ছিলেন নাস্তিক। প্রভু ওঁদের বলেন, 'তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।' পিতা হতাশ হয়ে নীরব হন। কিন্তু পুত্র কুতর্ক শুরু করেন। গোস্বামী মহাশয় বিরক্ত হয়ে তাঁকে বলেন, 'এখান থেকে যাও; যদি বাড়াবাড়ি কর, তাহলে অনন্তকাল তোমার নরকবাসের ব্যবস্থা করব।' ভয়ে তখন ওঁরা চলে যান।

সারদাকান্তের দশ বছরের ছেলেটির মৃত্যু-সংবাদ আসে। একদিন সারদাকান্ত গুরুর আসনের কাছে বসে নাম করছেন, তখন তিনি দেখেন তাঁর মৃত পুত্রকে। সারদাকান্ত ভাবেন, 'নাম করছি, ওর কথা তো মনেও হয় নি; ও এল কেন?' আবার তিনি নামের আশ্রয় নেন। ছেলেটিকে তিনি এবার শূন্যে দেখেন; একেবারে উলঙ্গ। প্রভুকে তিনি বলেন, 'ছেলেটিকে দেখলাম।' গোসাঁই বলেন, 'হ্যাঁ, সে এসেছিল; তোমায় বলে গেল—"সঙ্গে কিছু যায় না, নেংটা এসেছিলাম, নেংটাই যাচ্ছি।"'

অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় এসে গোস্বামীপ্রভুর তৃপ্তির জন্য বহু কাপড়-চোপড় কাঙ্গালীদের বিলিয়ে দেন। একদিন তিনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কি কোন গ্রন্থ পাঠ করব?' গোসাঁই বলেন, 'হ্যাঁ, তুমি উপনিষদ পাঠ কর।' জগদ্বন্ধু মৈত্র বলেন, 'ইনি অব্রাহ্মণ হয়ে কি করে উপনিষদ পাঠ করবেন?' প্রভু বলেন, 'ওঁর সেই অধিকার হয়েছে। ব্রাহ্মণেতর গৃহে জন্মেও ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করা যায়।' গোস্বামী মহাশয় একদিন সতীশ মুখোপাধ্যায়কে (১) বলেন, 'সতীশ, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন।' সতীশের মুখ তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠে। সতীর্থরা তাঁকে ধরে বসেন, 'বল, কি প্রার্থনা করেছ?' সতীশ মুখোপাধ্যায় এড়িয়ে যান।

গুরুকে একদিন পুরীতে সতীশবাবু বলেন, 'আপনার দেহের অবস্থা দেখে বড় ভয় হয়। চাঁদপালঘাটে আপনার কথা শুনে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজীর পরম সৌভাগ্য, তিনি এই ধামের কৃপালাভ করেছেন। আমারও সাধ হয়, আপনার কোন কিছু ঘটার পূর্বে যেন এই ধামের রজের সঙ্গে মিশে যাই।'

জগন্নাথবল্লভ মঠের পণ্ডিতজী বলেন, 'তিনি একদিন দেখেছেন, সতীশ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করে বলছেন, "প্রভো, এই ধামে যেন আমার রজঃপ্রাপ্তি ঘটে।"' শাস্ত্রে সতীশের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। নবকুমারবাবু ও সারদাকান্তকে একদিন তিনি বলেন, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুনলে আমার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাই চরিতামৃত পাঠের সময় যেখানেই থাকি না, এসে হাজির হই।'

মহাপ্রসাদের উপর ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাঁর কাছে সব সময় পাকাল থাকত। পোকা হলে বেছে খেতেন। নিয়ত মহাপ্রসাদ পেয়ে তাঁর দেহে এক স্নিগ্ধ আভা হয়েছিল। একদিন তিনি বলেন, 'শ্রীশ্রীসুভদ্রামাইর এমনই কৃপা, তিনি আজ নিজে আমাকে প্রসাদ খাইয়ে দিলেন।' সতীশ ছিলেন গুরুগতপ্রাণ। প্রভু-দর্শনে বের হলে, কম্বল, গামছা, কমন্ডলু নিয়ে তিনি পেছনে ছুটতেন। গোসাঁই একদিন জিজ্ঞাসা করেন, 'সতীশ, কেমন আছ।?' তিনি বলেন, 'কেমন আর থাকব? গুরু কৃপণ হলে যেমনটি হয়, ও-রকম।' প্রভু হাসেন। সতীশ ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। পিতার ন্যায় যত্ন করে আর মাতার ন্যায় ধৈর্য ধরে তিনি ছাত্র পড়াতেন। মুন্সেফ কিশোরীবাবুর ছেলেরা বলত, 'আমরা এমন ভাল ও দরদী মাস্টার মহাশয়ের কাছে আর কখন পড়ি নি।'

৮ অগ্রহায়ণ (১৩০৫), সমুদ্রস্নান হতে ফিরে সতীশের জ্বর হয়। ৯ অগ্রহায়ণ রাত দুটায় গোস্বামীপ্রভু সরলনাথ ও ব্রহ্মচারীকে বলেন, 'এখনই সতীশকে বের কর, সে দেহ ছেড়ে আমার কাছে এসেছে।' জননী যোগমায়া দেবী সতীশকে একটি কোট দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে গুরুপত্নীর সেই স্নেহের নিদর্শনটি পরে তিনি শুয়ে পড়েন। বুড়াঠাকরুণ স্বপ্নে দেখেন, 'বিমলা দেবী সতীশকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছেন।' যোগজীবন গোসাঁই বলেন, 'মৃত্যুর পূর্বে সতীশ আমার কাছে এসে বলে, "দাদা গোসাঁই, ঠাকুর আমাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শুদ্ধ করেছেন।"' শবদাহের সময় চিতাধূমের সুগন্ধে চারদিক ভরে উঠে। প্রভু বলেন, 'যাদের দেহ ভগবান স্পর্শ করেন, তাঁদের শবদাহের সময় ঐরূপ হয়।' অশ্বিনী বৈরাগী শবদাহ করে এসে স্বপ্নে দেখেন, সতীশ গোসাঁইর আসনের সম্মুখে প্রভুর দিকে মুখ রেখে বসে আছে আর ঠাকুর রাধাকুণ্ডের মৃত্তিকা দিয়ে তাঁর কপালে তিলক কেটে দিচ্ছেন। অশ্বিনীর মুখে স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে, গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'সতীশ দেহ থেকে মুক্ত হয়ে আমার কাছে এসে বলে, "রাধাকুণ্ডের রজঃ দিয়ে আমাকে তিলক করে দিন।" তাঁকে পাশের ঘর থেকে তিলকের ঝোলা আনতে বলি। সে তা নিয়ে এলে, তাঁকে তিলক করে দিলাম। গোলোকে যেয়ে তাঁকে রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত নিত্যলীলা দর্শন ও সম্ভোগ করতে বলি। এই অধিকার পেয়ে সে গোলোকধামে চলে যায়।'

সতীশ সকলেরই অন্তরঙ্গ ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর অকালমৃত্যুতে শোকের ছায়া পড়ল না, অথচ স্বামীজীর মৃত্যুতে কি এক বিষাদের স্পর্শ ছিল। সতীশ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল, এ-কথা আশ্রমের কারও কাছে অজানা ছিল না। আর স্বামীজীর মৃত্যু অস্বাভাবিক বলেই তা এমন বেদনাব্যঞ্জক ছিল।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে গোস্বামীপ্রভুর দানলীলা

১৩০৫ সালের পৌষ মাসে, ছোটলাট উডবার্ণ সাহেব পুরী এলে, বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। ছোটলাট সাহেব কথা-প্রসঙ্গে বলেন, 'অযোধ্যায় যখন তিনি কালেক্টর ছিলেন, তখন গুলি করে একটি বানর মেরেছিলেন। মৃত্যুকালীন সেই বানরের যন্ত্রণার কথা ভুলতে তাঁর তিন বছর লেগেছিল। তিনি তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর কখনও বানর মারবেন না।'

ছোটলাট সাহেব কালেক্‌টরের বাংলায় উঠেছিলেন। তিনি পরদিন হাতির উপর উঠে শ্রীমন্দিরের চারদিকে ঘুরেন। পশ্চিমদ্বারে একজন ওড়িয়া ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কেমন? বানর মারা উচিত?’ ভদ্রলোকটি বলেন, ‘কখনও না।’ ছোটলাট তাঁকে বলেন, ‘আপনি সাচ্চা বলেছেন।’

ঐদিনই কয়েকজন পাণ্ডা এসে গোস্বামীপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁদের বলেন, ‘উডবার্ণ সাহেব সৎলোক; তিনি বানর-বধ রদ করেছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মিষ্টি-মহাপ্রসাদ ও প্রসাদী মালা তাঁর প্রাপ্য।’ ঐদিনই কালেক্‌টরের বাংলায় ওঁরা তা নিয়ে যান। সাহেব মালা ও মহাপ্রসাদ নিজের মাথায় ঠেকিয়ে সমাদরে গ্রহণ করেন।

গোস্বামী মহাশয় তাঁর শিষ্যদের বলেন, ‘উডবার্ণ সাহেব তাঁর পুণ্যবলে ভারতে জন্মিবার অধিকার পেলেন।’ কিছুদিন পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় বঙ্গোপসাগরে জাহাজে আমাশয় রোগে তাঁর জীবনাবসান হয়।

সমুদ্রস্নানের সময় পায়ে চোট লাগায়, প্রভু বহুদিন পথে বের হন নি। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁকে অনুমতি দিলে, ২১ পৌষ, ১৩০৫ তিনি বের হন। দক্ষিণ-দ্বারে মহাবীরের মন্দিরে গিয়ে পূজা ও ভোগ দেন। মহাবীরের অন্যান্য মন্দিরেও তিনি পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করেন।

বড়ছাতার মহান্ত জগন্নাথদাস বাবাজীর পুরীতে কোন এক সময় খুব প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি ছিল। রাজ-কর্মচারীরা তাঁর আস্তানা সরগরম রাখতেন। কিন্তু গোস্বামীপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীর আসরে ভাঁটা পড়ে। সন্ধ্যা না হতে এক বিচিত্র আকর্ষণে প্রভুর আশ্রমে ভিড় জমে। আগন্তুকদের অনেকেই জগন্নাথদাস বাবাজীর ভক্ত ছিলেন। বাবাজী ওঁদের কাছে লোক পাঠান। কিন্তু তাঁরা আর ও-পথ মাড়ান না। বাবাজীর সব রাগ গিয়ে পড়ে গোস্বামী মহাশয়ের উপর। তিনি ছল-চাতুরী করে, প্রভুর নিকট হতে টাকা বের করতে চান। তাঁর ছলনাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। একদিন বাবাজী গোসাঁইর কাছে আট হাজার টাকা দাবী করেন, মন্দির বানাবেন—এই অভিপ্রায়ে। প্রভু তাঁকে বিনীতভাবে বলেন, ‘আমি ভিখারী মানুষ, টাকা দেব কোথা থেকে?’ জগন্নাথদাস বাবাজী ফিকির খুঁজেন, কি করে গোস্বামী মহাশয়কে শায়েস্তা করা যায়।

কুলীনগ্রামের রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর আদেশে রথযাত্রার সময় পট্টডুরী যোগাবার অধিকার পেয়েছিলেন। ঐ সময় থেকে রামানন্দ বসুর বংশধরেরা শত শত বছর ধরে, পুরুষানুক্রমে তা যুগিয়ে আসছেন। কিন্তু কয়েক বছর তা বন্ধ থাকে। পুরীর রাজকোষ থেকে মঞ্জুর হয় পট্টডুরীর ব্যয়ভার; কুলীনগ্রামের বসুরা অপারগ হলেও তাঁরাই যোগাবেন এই পট্টডুরী। মহাপ্রভু-প্রদত্ত অধিকার তাঁদেরই থাকবে বংশপরম্পরায়। হরিদাস বসুর সাধনলাভের পর গোস্বামীপ্রভু তাঁকে পট্টডুরী যোগাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৩০৩ সাল থেকে হরিদাসবাবু নিজে খরচ করে, তা সংগ্রহ করে দিতে থাকেন। কিন্তু সিংগারী পাণ্ডা ভুবনমোহন মিশ্র হরিদাসবাবু থেকে বিনামূল্যে পট্টডুরী সংগ্রহ করে, রাজকোষ থেকে মঞ্জুরী করা অর্থ নিয়ে তা আত্মসাৎ করতেন। কথা-প্রসঙ্গে ভুবন মিশ্রের এই প্রবঞ্চনার কথা প্রভুর নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। অনুসন্ধান করিয়ে গোস্বামীপ্রভু জানতে পারেন সংবাদটি যথার্থ। শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় হরিদাসবাবুকে আদ্যন্ত সব জ্ঞাপন করেন। হরিদাসবাবু তখন রাজার ম্যানেজার প্রাইস সাহেবকে সব খুলে লিখেন।

মিঃ প্রাইস ভুবন পাণ্ডা থেকে দু বছরের পট্টডুরীর মূল্য আদায় করে, তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। গোস্বামীপ্রভুর নির্দেশে হরিদাসবাবু ভুবনমিশ্রের অব্যাহতি লাভের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মিশ্রের যত ক্রোধ গিয়ে পড়ে প্রভুর উপর।

নাবালক পাণ্ডা হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়ার অর্থ ও যজমান আত্মসাৎ করার ফিকির করেছিলেন তাঁর পিতৃব্য গঙ্গাধর খুঁটিয়া। কিন্তু গোসাঁইজী গঙ্গাধরের চক্রান্ত বানচাল করে দিয়েছিলেন। তিনি গঙ্গাধরকে বলেছিলেন, 'তুমি শনি, তুমি আমার কাছে আর এস না। তোমাকে দেখলে আমার বুক শুকিয়ে যায়।' ঐদিন থেকে গঙ্গাধর সুযোগ খুঁজেন। জগন্নাথদাস বাবাজী, ভুবন মিশ্র আর গঙ্গাধর খুঁটিয়া —এই তিনজন মিলান হাত।

পৌষ মাসে (১৩০৫) মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়ে দেশে ফিরার পথে, অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় খুরদা জংশনে গাড়ি বদল করে, পুরী যান গুরুদর্শনে। গোসাঁই তাঁকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে পাঠান। শ্রীমন্দিরে তিনি এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব উপলব্ধি করে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে, সঙ্গী সতীর্থকে বরিশালের প্রচলিত ভাষায় বলেন, 'দ্যাখ্ রে একটা কথা নি কইথে পারিস? শ্রীশ্রীজগন্নাথ্‌দেবের যে চেয়ারার চটক; এই দেইখ্যা যে কি ভক্তি হয়, হেয়া তুইও বোঝস, আমিও বুঝি। কিন্তু মন্দিরের মধ্যে ফ্যাইল্লা, আমারে যে তিন-চাইরটা ঘেডীঘুল্লা মাল্লো, হেইডা কি, তুইনি কইতে পারিস?'

গুরুভাইটি অশ্বিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি হয়েছে?' অশ্বিনীবাবু তখন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চলতি ছবি যেমন, বিগ্রহও দেখি একই ধরনের। তাই ভাবি, দেখার মত আর কি আছে? এই ভেবে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। দু-চার পা চলে মনে হয়, এসেছি যখন, একটু ভাল করেই দেখে নি-ই না কেন? পর মুহূর্তেই মনে হয়, সেই তো চেহারা, আর কত দেখব? ফিরে দু-চার পা এগুতেই মনে হয়, আবার জানি কবে আসা হয়, আর একটু দেখি না কেন? এইভাবে ভূতে পাওয়ার মত আমাকে তিন-চার বার ঘাড়ে ধাক্কা মেরে ছেড়ে দেন। এর কারণ কি, বলতে পারিস্?' আশ্রমে ফিরে অন্তরঙ্গদের কাছে অশ্বিনীবাবু তাঁর উপলব্ধির কথা বলেন।

এই সময় একদিন বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের একখানি টেলিগ্রাম আসে গোস্বামী মহাশয়ের কাছে। নাগপুর স্টেশন থেকে বিপিনবাবু টেলিগ্রাম করেছেন, তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেছেন; বোম্বে গিয়ে জাহাজে উঠবেন। জাহাজের নামটিও উল্লেখ করেন। প্রভু যেন তাঁকে আশীর্বাদ করেন। গোসাঁই যোগজীবনকে বলেন, 'এখনই জাহাজের কেয়ারে বোম্বেতে জরুরী টেলিগ্রাম করে দাও—"ভগবান আপনার সহায় হউন" এই বলে।' বিপিনবাবু জবাবের প্রত্যাশা করেন নি, কিন্তু জাহাজের ক্যাবিনে প্রবেশ করেই গুরুর আশিসবাণী পেয়ে তাঁর মন উৎসাহে ও আনন্দে ভরে উঠে। পুরীতে টেলিগ্রাম পৌঁছার পর গুরুভ্রাতারা বলাবলি করেন, 'বিদেশে উচ্ছিষ্ট বিচার করে তো চলাফেরা সম্ভব নয়, সাধনের বিধি-নিষেধগুলি তিনি কি করে মানবেন?' তাঁদের কথাবার্তা প্রভুর কানে যেতেই তিনি বলেন, 'বিপিনবাবুর এ-সবের প্রয়োজন নাই।'

একদিন সমুদ্রস্নানে যাবার পথে প্রভুর চোখে পড়ে, একজন ব্রাহ্মণ সোয়ার (শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সূপকার) পিঁয়াজ শাক নিয়ে যাচ্ছেন। গোসাঁই বলেন, 'দেখ,

দেখ, ব্রাহ্মণ কিরূপ ভ্রষ্ট হয়েছে! পিঁয়াজ গোমাংসতুল্য।' গোস্বামীপ্রভু একদিন জগমোহনে ভাবাবেশে ভগবানের রূপমাধুরী বর্ণনা করতে করতে বলেন, 'বিশ্বব্রহ্মান্ড জুড়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বিরাজ করছেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিতে দ্যুলোক-ভূলোক উদ্ভাসিত। গ্রহচন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডল, ঐ জ্যোতির কাছে নিষ্প্রভ। দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, পর্বত, সাগর, নদ-নদী, স্থাবর-জঙ্গম সবই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অঙ্গীভূত; লক্ষ শালগ্রাম শিলার উপর অবস্থিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সিংহাসন, তেত্রিশ কোটি দেবতা মস্তকে ধারণ করে আছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর করজোড়ে তাঁর স্তবস্তুতি করেন। মণিকোঠায় একটি পরমাণুও জড়ীয় নয়, সবই চৈতন্যময়। ওখানে যেতে নাই।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব জীবকে চুম্বকের ন্যায় অকর্ষণ করছেন। নির্মল আত্মা এই বিগ্রহের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। লোহা যদি খাঁটি না হয়, তাহলে এর উপর চুম্বকের আকর্ষণ তেমন বুঝা যায় না। ঐরূপ পাপ-মলিনতায় আচ্ছন্ন জীবাত্মা, পরমাত্মার আকর্ষণ টের পান না। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা সহজেই তাঁর কৃপা উপলব্ধি করেন।' শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আকৃতির কথা বলতে গিয়ে প্রভু বলেন, 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ওঁকার বিগ্রহ। মাথা প্রণবের বিন্দু। হাত দুখানা বিন্দুর নীচের অর্ধচন্দ্র রেখা। উদরের উপর "ও" অঙ্কিত। কালক্রমে প্রণবমূর্তি এই বিগ্রহে রূপান্তরিত হয়েছেন। ইনিই আদি নামব্রহ্ম।' শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অশ্লীল মূর্তিপ্রসঙ্গে প্রভু বলেন, 'শাস্ত্রকারগণ কিছুই বাদ দেন নাই। জীবপ্রকৃতির নিম্নস্তরে যে কুৎসিৎ ভাব আছে, ও-সবই দেখান হয়েছে। আবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় ঐ স্তর অতিক্রম করে, জীব কেমন সুন্দর হয়, রূপকভাবে, তা-ই আঁকা হয়েছে। এর কিছু উপরে নানা দেবদেবীর মূর্তি। তার উপর বিভিন্ন অবতার ও লীলাব্যঞ্জক মূর্তি। সর্বোপরি রয়েছেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব।'

১ ফাল্গুন, ১৩০৫ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পদ্মবেশ ছিল। ব্যয়ভার নিয়েছিলেন গোস্বামীপ্রভু। সকাল সাড়ে সাতটায় প্রভু শ্রীমন্দিরের দিকে চলেন, সঙ্গে বিধু ঘোষ, সত্যেন ঘোষ, বেণীমাধব ব্রজবাসী, সরলনাথ, জগৎবাবু, কিশোরীবাবু ও যোগজীবন গোসাঁই। ওঁদের পেছনে ছিলেন—মুক্তকেশী দেবী, শান্তিসুধা দেবী, আর কয়েকজন স্ত্রী-ভক্ত। পথে বড়ছাতার মহান্তের সঙ্গে দেখা। প্রভু ভাবে বিভোর। শ্রীমন্দির লোকে গিজ্‌গিজ করে; ভক্তেরা তাঁকে আগলে থাকেন। চন্দনকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে গোস্বামী মহাশয় বিগ্রহ দর্শন করেন। পান্ডারা তাঁকে মণিকোঠায় নিয়ে যেতে চান। তিনি বলেন, 'না, মণিকোঠায় যাব না।' ওঁরা কান দেন না। মিট্‌মিটে আলোর ভিতর দিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে যান তাঁরা বেদীর সম্মুখে। প্রভুর ঢুলুঢুলু ছলছল আঁখি। তিনি আবেগে করেন জয়ধ্বনি, 'জয় জগদ্বন্ধু, জয় সঙ্কর্ষণ, জয় সুভদ্রামাই, জয় চক্রসুদর্শন, জয় পতিতপাবন, জয় সেবকবৃন্দ, তাঁদের চরণে কোটি কোটি প্রণতি।' একজন ছড়িদারকে আলিঙ্গন করে গোসাঁই বলেন, 'সোনার ছড়ি হাতে নিয়ে তোমাকে পাহারা দিতে দেখেছি।' দুলতে দুলতে উত্তর দিকের দরজা দিয়ে বের হয়ে প্রভু মুক্তিমন্ডপে নামেন। পান্ডা, পন্ডিত, প্রতিহারী, ছড়িদার, তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ান। তীর্থের কাক—ঝোপ বুঝে, কোপ মারা ওঁদের কাজ। কাপড়ের গিঁঠ খুলে সরলনাথ প্রভুর হাত ভরে দেন—আনি, দু-আনি, সিকি, আধুলি। ফুৎকারে তা উবে যায়! মুখ চুন করে হাল ছেড়ে দেয়, আর সব প্রার্থীরা। গোস্বামীপ্রভু ওঁদের জিজ্ঞসা করেন,

‘আপনাদের কার কি চাই?’ ওঁরা মনে করেন কথার কথা; সিকিটা, আধুলিটা গোটা তঙ্কাটা (টাকাটা)—ঐ অবধি ওঁদের দৌড়। কয়েকজন চান—পাঁচ, দশ, পঁচিশ তঙ্কা। প্রভু তাঁদের কথা দেন—‘তা-ই পাবেন, আপনারা যে যা চেয়েছেন।’ গোসাঁই বলেন, ‘সরলনাথ, পাঁচশ টাকা নিয়ে এস।’ ‘আচ্ছা, ঠাকুর,’ বলে খানিক দূর এগোতে না এগোতে ফের তাঁর ডাক পড়ে। তাঁকে তিনি বলে দেন, ‘সিকি, আধুলি, টাকা, নোট কোন্‌টি কয়টা করে আনতে হবে।

ছিপছিপে দোহারা চেহারা; শন্‌শন করে সরলনাথ ছুটেন। গুরু তাঁকে একদিন বলেছিলেন, ‘একটা কাজে দশটা ভুল কর, তুমি নিয়েছ পোস্টাফিসে চাকরী! কোন্ দিন যে ফ্যাসাদে পড়!’ তখন থেকে কাজ ছেড়ে গুরুসেবায় লেগে যান। সাধন-ভজনের ধার ধারেন না, তিনি বলতেন, ‘ঠাকুর যখন নাম করান, তখন আপনা হতে হয়।’

সরলনাথ নেবে যান সিঁড়ি দিয়ে যেদিকে পতিতপাবন। তন্ময় হয়ে ভাবেন, ‘তেমন যদি কঠিন হত তাহলে বিচক্ষণ সতীর্থদের উপর এ ভার পড়ত। যেখানেই চাই না কেন, টাকাটা পাবই।’ বিশ্বাসের যাদুকাঠিতে দিশেহারা হয়ে তিনি নাবেন।

পাগড়ীমাথায়, থলে হাতে এক বৃদ্ধ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে চেপে ধরেন সরলনাথের হাত—মরবারও তখন তাঁর ফুরসৎ নেই; ব্যস্ত হয়ে সরলনাথ তাঁকে বলেন, ‘টেঁকে আমার কাণা কড়িটি নেই; আমার গুরু রয়েছেন মুক্তিমন্ডপে, ওখানে যাও।’ বুড়া হেসে বলেন, ‘আমি তোমায় টাকা দেব।’ চমক-লাগান ভঙ্গীতে সরলনাথ জিজ্ঞাসা করেন তাঁকে, ‘পাঁচশ টাকা পারবে দিতে?’ অচেনা, অজানা লোকটি তুলে ধরেন তাঁর হাতের থলে। তিনি সরলনাথকে বলেন, ‘পাঁচশ-ই এতে আছে।’ বলে কি? থলেটি আপন মুঠিতে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকান সরলনাথ বিচিত্র এই লোকটির পানে। মুখ ফুটে বলেন, ‘ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আসি; টাকা, আধুলি, সিকি নির্দেশমত আনতে হবে।’ বৃদ্ধ বলেন, ‘মিল করাই আছে, তোমার যেমনটি চাই।’[1] সরলনাথ আত্মহারা হয়ে গুরুর কাছে ছুটেন। কে তাঁকে টাকা দেন আর কেন-ই বা দেন, এ-সব প্রশ্নই জাগে না তাঁর মনে। কৃতজ্ঞতা জানাবারও অবকাশ হয় না। কি করে টাকা যোগাড় হল, প্রভুও একটিবার জিজ্ঞাসা করেন না। সরলনাথ ফের ছুটেন ঐ আজব লোকটির খোঁজে; জিজ্ঞাসা করেন তিনি, একে-ওকে। কেউ জানে না তাঁর পরিচয়। তারা বলে, ‘সারি-সারি লোক চলেছে! কে কার খোঁজ রাখে?’ যে যা চেয়েছিলেন, তা দিয়ে প্রভু আশ্রমে ফিরে আসেন। শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘ঠাকুর, আজ নাকি শত শত টাকা দান করেছেন?’ গোস্বামী-প্রভু বলেন, ‘হ্যাঁ, আজ যদি ওঁরা পাঁচ লক্ষ টাকা চাইতেন, তা-ই দিয়ে আসতাম। যা চাইলেন, তা-ই দিয়ে এলাম। কি আর আমি করি!’

ভক্তেরা বলেন, ‘কি রকম?’ প্রভু বলেন, ‘দেখি, শ্রীশ্রীজগন্নাথজী গোবিন্দজী হয়ে রাখালিয়াদের সঙ্গে গোঠে গোঠে যান, আবার রাজরাজেশ্বর হয়ে যে যা চায়, দুহাতে তা বিলান। আমাকে বলেন, “যে যা চায়, তাই দাও।” আমি তখন তাঁর হুকুম তামিল করলাম।’ দানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐদিন থেকেই হয় দানযজ্ঞ শুরু।

৫ ফাল্গুন, ১৩০৫—মাঘী শুক্লা-সপ্তমী, অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব তিথি।

---

[1] শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখাৎ শ্রুত। সরলনাথবাবুর মুখে তিনি শুনেছেন।

উষা-কীর্তন শেষ হতে না হতে, জগন্নাথবল্লভ মঠের বাবাজীরা এসে যোগ দেন। গোস্বামী মহাশয়ের নির্দেশে বিধুবাবু 'পদ-কল্পতরু' থেকে অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাবের দুটি পদ গেয়ে অন্য গান ধরেন। একজন গৈরিকধারী বাবাজী খোল বাজান; ভাবে বিভোর হয়ে গোস্বামীপ্রভু কিছু সময় নৃত্য করে আসনে বসেন। প্রবল একটি ভাবের স্রোত বয়। কীর্তন খুব জমে উঠে। ঐ সময় রুদ্রাক্ষ-বিভূষিত একজন সুদর্শন ব্রহ্মচারী ডমরু বাজাতে বাজাতে ওখানে এসে কীর্তনের তালে তালে মধুর ভংগীতে নৃত্য করেন; খানিক বাদে তিনি প্রভুর কাছে এসে সাষ্টাংগ দিয়ে, বারবার তাঁর পদধূলি নেন। কখন বা গোসাঁইর পা টিপে দেন; কখন বা তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরে আদর করেন, আবার কখন বা নিজের বাঁ চোখে সন্তর্পণে প্রভুর পায়ের আংগুল স্পর্শ করেন। মনে হয়, উভয়ের মধ্যে বহুকালের অন্তরংগ স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক। আগন্তুক ব্রহ্মচারীর গোসাঁইর সংগে এরূপ ব্যবহার ভক্তদিগের হৃদয় স্পর্শ করে। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ব্রহ্মচারীর পদধূলি নেন। দরজা দিয়ে বের হতেই তাঁকে আর দেখা যায় না; অথচ অনেকেরই দৃষ্টি তাঁর উপর নিবন্ধ ছিল। তাঁরা গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইনি কে? ওঁকে তো আর কখন দেখি নি।' প্রভু বলেন, 'ইনি ভুবনেশ্বরের মহাদেব, ঐ বেশে এসেছিলেন।'[1]

চা-পান ও প্রাতঃরাশের পর গোস্বামী মহাশয় শ্রীমন্দিরের দিকে যান। পূর্ব হতেই জানাজানি হয়েছিল, ঐদিন কাপড় বিলি হবে। আশ্রম থেকে পূর্বদ্বার পর্যন্ত প্রার্থীদের ভিড়। মংগুর মঠের পাশে একটি কাপড়ের দোকানের বারান্দায় গোসাঁইকে ঘিরে বসেন পান্না, মহেন্দ্রবাবু ও বিধুবাবু। সরলনাথ দোকানের ভিতর কাপড় বাছেন। জগদ্বন্ধুবাবু ও অশ্বিনী বৈরাগীর উপর বিলির ভার। সারদাকান্ত আর দোকানের দুজন কর্মচারী ওঁদের কাছে কাপড় পৌঁছিয়ে দেন। যোগজীবন গোসাঁই, নবকুমার বিশ্বাস, অমৃতলাল সেন আর কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী নজর রাখেন যাতে কাপড় বেহাত না হয়। সাতজন পুলিশ ও বারজন ছড়িদারের উপর শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব ছিল; উচ্ছৃংখল প্রার্থীরা দোকানই বুঝি লুঠ করে, এমন ভাব। পুলিশ, ছড়িদার এরাও ধুতি পায়। ধুতি বিলির পর জগন্নাথবল্লভ মঠের বাবাজীদের জন্য মহাপ্রসাদ পাঠিয়ে সশিষ্য প্রভু আশ্রমে ফিরেন।

সন্ধ্যার পর কীর্তনে আবার ভাবের স্রোত বয়। একজন সন্ন্যাসী এসে গোস্বামীপ্রভু ও শ্রীধরের হাত ধরে নাচেন। কীর্তনের পর ভক্তেরা তাঁর সংগে আলাপ করেন। তাঁকে প্রসাদ পেতে বলেন। তিনি তাঁদের বলেন, 'আমি লোকনাথে থাকি। ওখানে গেলে আমার সংগে দেখা হবে। আমি কেবল দুধ খাই।' সন্ন্যাসী চলে গেলে প্রভু বলেন, 'তাঁর বলা সত্ত্বেও তোমরা তাঁকে চিনতে পার নাই। তিনি স্বয়ং লোকনাথ।'[2]

একখানা রেকাবীতে মহাপ্রসাদী নাড়ু ও খাজা নিয়ে প্রভুকে দিতে যান ব্রহ্মচারী। খাজাখানা ছুটে গিয়ে তিন-চার হাত দূরে পড়ে। ব্রহ্মচারী হতভম্ব। গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'সতীশ খাজাখানা তুলে নিয়েছিল। মহাপ্রসাদের জন্য কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব লালায়িত। আগামী দিন সমুদ্রে ঐ খাজাখানা সতীশের নাম-গোত্র বলে দিয়ে দিও। স্বামীজীর নাম করেও একখানা দিও।'

---

১. 'আচার্য-প্রসংগ', ২য় সং, পৃ ৩০২-৩০৩।

২. 'আচার্য-প্রসংগ', ২য় সং, পৃ ৩০৪।

ঐদিন অদ্বৈতপ্রভুর অবির্ভাব তিথিতে ছ-শ টাকার কাপড় বিলি হয়েছিল—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর কাঙ্গালীদের মধ্যে। লাখ টাকার উপর ব্যয় হয়, তিন মাসে। প্রভুর নামে টেলিগ্রাম মানি-অর্ডারই এসেছিল পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর। কি করে যে এই দানলীলা সম্ভব হল, তা বিষয়বুদ্ধির অগোচর। গোস্বামী মহাশয়ের পুঁজির মধ্যে কৌপীন, বহির্বাস ও উত্তরীয়। অর্থের ভান্ডার শূন্য; অথচ দিন নেই, রাত নেই, চলে এই দানসত্র। না আছে বাচ-বিচার, পাত্রাপাত্র-ভেদাভেদ। সাধু, অসাধু, ত্যাগী, বিষয়ী, দীন-দুঃখী, চোর, বাটপাড়, যে যা অভাব জানায়, তাই দূর করেন। কেউ বলে, 'ঘর মেরামত করতে পারি না, পঞ্চাশটি টাকা মিলে তো হাত দিতে পারি।' কেউ বলে, 'ছেলেটার উপনয়নের কাজ আটকে আছে, কুড়িটি টাকার অভাব।' কেউ বলে, 'সব ঠিকঠাক, শ-খানেক টাকা জুটলে সোমত্ত মেয়েটার শাঁখা-সিঁদুরের বিহিত হয়।' আরও কত রকম সব আরজি! প্রভু অন্তরঙ্গদের বলেন, 'দেখত ওদের দিতে পার কিনা যে যা চায়।'

আশ্রম-গৃহের বাইরে যেতেই গোস্বামী মহাশয়কে ঘিরে ফেলে তিন-চার শত প্রার্থী—পথ চলা হয় দায়। অনুগামীদের ঘটে ধৈর্যচ্যুতি। রোজ-রোজ কত আর এসব সহ্য হয়! তাঁরা গায়ের জোরে পথ করেন। প্রভু তাঁদের বলেন, 'আহা! অমন কর না। এদের গায়ে যেন আঁচড়টি না লাগে।' তারপর তিনি বলেন, 'শ্রীরামের অশ্বমেধে হনুমান ছিলেন ভান্ডারী। তিনি প্রাণভরে দান করেন, কিন্তু খামখা মুখ ভেঙচি দেন; প্রার্থীরা ভয়ে ভয়ে বিদায় নেয়। সর্বদর্শী ভগবান তাঁকে হিমালয়ে পাঠান নীলপদ্ম আহরণে। হনুমান দেখেন ওখানে এক সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ, কিন্তু শুয়োরের মত মুখটি তাঁর কদাকার। পবনতনয় এই বৈষম্যের কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন—

নানা দানং ময়া দত্তম্, রত্নানি বিবিধানিচ।
ন দত্তং মধুরং বাক্যম্, তেনাহং শূকরমুখঃ॥

ধন-রত্ন কত কি যে দান করেছি, কিন্তু মিষ্টি কথা বলি নি; এর ফলে আমার মুখ শূকরের মত।

অবসন্ন দেহে গোসাঁই দিনান্তে একদিন আশ্রমে ফিরছেন। পথ আগলে দাঁড়ায় এক ব্রাহ্মণ বালক। সে বলে, 'বাবা, ধুতি একখানা পাব?' প্রভু বলেন, 'আমাদের সঙ্গে এস।' যোগজীবন গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'আগামী দিন ভোরে এসে নিয়ে যেও।' আশ্রমের সম্মুখে এসেই গোস্বামী মহাশয় বালকটির খোঁজ করেন। তাঁকে ধুতি না দিয়ে তিনি আসনে যাবেন না। সব কাকুতি-মিনতি হয় অর্থহীন। চার-পাঁচজন তখনই ছুটে ছেলেটির খোঁজে। সে এলে, প্রভু তাঁর চরণসেবা করেন; তারপর তাঁকে ধুতি ও টাকা দিয়ে তিনি আশ্রমে প্রবেশ করেন। আসনে বসে তিনি শিষ্যদের বলেন, 'যোগজীবন ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রুষ্ট হতেন; এখন তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।'

এই কল্পতরু-অনুষ্ঠান চলে দিনের পর দিন। আশ্রম ও সিংহদ্বারে জুটে কত বস্ত্রহীনের পরিধেয়। ইমার মঠে হাজার হাজার ব্রাহ্মণের মিলে ওড়না আর কাপড়। দানের পূর্বে টিকেট বিলি হয়। টিকেটে "ঐং" লেখা থাকত। জাল টিকেট দেখিয়ে কেউ কেউ ফাঁকি দেয়। পাঁচ-শ টিকেটধারী বাকী থাকতেই চাদর হয় নিঃশেষ। দোকানী বলেন, 'ঐ দরের ওড়না আর বাজারে নেই; দামী চাদর দিতে পারি।' প্রভু বলেন, 'তা-ই দাও।' ওই চাদর দেখে জগতবাবু বলেন, 'এ যে সৌখীন

উত্তরীয়।' কিশোরীবাবু বলেন, 'এত ভাল চাদর এখানে পাওয়া যায় বলে আমার ধারণা ছিল না।'

বড় আখড়ায় পাঁচ হাজার সাধুর পঙ্গত পড়ে। চার-শ আটিকা কণিকা আর বাইহাণ্ডি, দশ হাজার মালপোয়া, চল্লিশ মণ দই, দশ মণ কন্দ, হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল, বেসর, মোহর, রাশি রাশি কাপড়ের গাঁট, আব ঘটির বস্তা এসে জমা হয় ভাণ্ডারঘরে। উৎকলী ভাষায় বড় হাঁড়িকে বলে আটিকা, মিঠা পোলাওকে বলে কণিকা, বাইহাণ্ডি মহাপ্রসাদের ভাঁড়, বেসর সুক্তো আর মোহর হল ঝাল-ডালনা। ছাদে বসেন আলাদা তিনশ আচারী সাধু; মশাল জ্বলে যোলটি—তেল পুড়ে তিন টিন। মাটির মুছিতে তেল-সলতের প্রদীপ জ্বলে শত শত। দীপমালায় সাধুদের পংক্তিভোজন দেখে মনে আসে, কুম্ভমেলার চত্বরের কথা। মহাপ্রসাদ পরিবেশন শুরু হয়; জগতবাবু দেন একটি করে ঘটি আর কিশোরীবাবু একখানা করে ধুতি। সাধুদের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু জগন্নাথদাশ বাবাজী বলেন, 'ঘি-টা ভাল না।' সায় দেন না কেউ। রাধাকান্ত মঠের সেবায়েতের এই বেহায়াপনা সহ্য হয় না। তিনি বলেন উঠেন, 'মাতব্বরি, বলিহারি!' বাবাজী গোল বাধাবার ফিকির খুঁজছিলেন। তিনি হয়ে উঠেন মারমুখ। গোসাঁই হাতে-পায়ে ধরে তাঁকে শান্ত করেন। মুহুর্মুহু 'হরিবোল, জয় জগদ্বন্ধু, জটিয়াবাবা কি জয়, মহাপ্রসাদ কি জয়', এই সব স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনির মধ্যে সাধুরা আকণ্ঠ ভোজন করে উঠেন। সুপকার বলেন, 'এমন সাধুসেবার কথা জীবনে আর কখন শুনি নি।' উদ্বৃত্ত প্রসাদ, কাপড়, লোটা, বিতরণের ভার মহান্তকে দিয়ে রাত আড়াইটায় গোস্বামীপ্রভু আশ্রমে ফিরে আসেন।

পঙ্গত পড়ার পূর্বে এক আটিকা কণিকা, এক মুটে সরিয়ে ফেলে। প্রভুর কাছে এই খবর গেলে তিনি তাকে ডেকে পাঠান। ওর তখন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। ভয়ে ভয়ে হাত জোড় করে, মিন-মিন স্বরে সে বলে, 'বহুত লোক ঘরে আছন্তি। মুই একুটিয়া খাইপারিবি নাহি; অপরাধ ক্ষেমা করিবে।' তার কথা শুনে গোসাঁই বলেন, 'ঠিক-ই তো, আরও চার আটিকা নিয়ে যাও; ঘরে গিয়ে সকলে মিলে আনন্দ করে খাও।' উৎসব লেগেই থাকে। কত অনাথা, লক্ষ্মীছাড়া, বুভুক্ষু কাঙ্গাল তৃপ্ত হয় প্রসাদ পেয়ে—তার উপর তারা পায় পরিধেয়! পাণ্ডারা আর আখড়ার মহান্তরা প্রসাদ তো পান-ই, তার উপর পান গরদ ও বিগ্রহের পট্টবাস। মন্দিরের সেবক, পুলিশ, পেয়াদা, চাপরাশি, মেথর, ডোম, কুলি-মজুর কেউ বাদ পড়ে না—তীর্থযাত্রীরাও না। প্রার্থীরা কেউ কেউ বারবার হাত পাতে। ধরা পড়লে প্রভু ওদের আরও বেশি করে দেন। একদিন শ্রীমন্দির থেকে ফিরার পথে গোস্বামী মহাশয় কাঙ্গালীদের টাকা দিচ্ছিলেন। 'মু পাই নি' বলে একটি লোক কয়েক বার পেয়েও হাত বাড়ায়; তার কারসাজি দেখে একজন গুরুকে বলেন, 'সে তিনবারে ছয়টি টাকা পেয়েছে; আবার দেখুন হাত পাতে।' তার হাতে আরও পাঁচটি টাকা দিয়ে প্রভু বলেন, 'আমি জানি: তবে দান করছেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, তুমি কেন কথা কও?' আশ্রমে ফিরে এসে ঐ প্রসঙ্গে আবার বলেন, 'গঙ্গা স্রোত বয়ে চলে, আমরা তাতে হাত ধুয়ে পবিত্র হচ্ছি মাত্র।' শ্রীমন্দিরে একদিন দেবদাসীরা গোস্বামীপ্রভুকে প্রণাম করে বলেন, 'কত লোককেই তো দিলেন, আমরাই শুধু বাদ পড়লাম!' প্রভু ওঁদের বলেন, 'আমি আর তোমাদের কি দিব? তোমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবিকা; তোমাদের আবার অভাব কি?' গোসাঁই তখনই তাঁদের প্রত্যেকের

জন্য গরদ আর একখানা করে গীতগোবিন্দ আনিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমি ভিখারী, সকলের দাসানুদাস।'

লোকের মুখে জটীয়াবাবার জয়ধ্বনি লেগে থাকে। তারা বলাবলি করে, 'অমন দরদ দিয়ে আর কেউ কখনও দান করেছে? ঢের ঢের রাজা-মহারাজা দেখেছি, দান করেছেন না হাতি! নাম সটকানোর ফিকির-ফন্দি! কেউ খেল কি না-খেল, কারও উপকার হল কি হল-না, সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। আর জটীয়াবাবার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, লোকের মুখে কি করে হাসি ফুটে, কি করে ওদের দুঃখ-কষ্ট ঘোচে, সেদিকেই ওঁর দৃষ্টি। নিন্দা-প্রশংসার তিনি ধারও ধারেন না।'

এই অপূর্ব দানের মাধ্যমে গোস্বামীপ্রভু শিখান, কলিকালে দানের চেয়ে বড় ধর্ম নেই। 'দানমেকম্ কলৌ'। যারা পথে বাট্টা নিয়ে টাকার ভাঙানি দেয়, পুঁজি-পাটি যাদের কুড়িয়ে-কাড়িয়ে, দোকান-পাট যাদের নামেই সার, তাদের কাছ থেকেই সরলনাথ যোগালেন দানপর্বের হাজার হাজার টাকা। সতীর্থদের মধ্যে কৌতুক করে কেউ কেউ সরলনাথকে বলেন, 'তুমি যে ভাই দেখছি ঢাকাই-জালা।' সরলনাথ গায়ে মাখেন না। দিন নেই, রাত নেই, গুরু যখনই যেমন আদেশ করেন, তাই করেন। প্রভু প্রাণভরে তাঁর সুখ্যাতি করেন। সতীর্থরা সায় দেন। একজন বলেন, চট্‌পট ও কাজ সেরে আসে। হেসে গোসাঁই বলেন, 'শ্রীরামের অশ্বমেধের ঘোড়া ছিল; সরলনাথ আমার অশ্বমেধের ঘোড়া।'

ঘটি বিলি হবে হাজার হাজার। সরলনাথ গুরুর দিকে তাকান। প্রভু বলেন, 'না, তুমি না।' এগিয়ে আসেন কয়েকজন, যাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে পাকা। কিন্তু তাঁরা ধোপে টিকেন না। রোদে, বালিতে ঘুরে ঘুরে হন নাস্তানাবুদ। দোকানদাররা বলেন, 'জটীয়াবাবা সাচ্চা সাধু, কিন্তু কি করি, আমরা সব ছা-পোষা লোক। যাঁর নির্দিষ্ট আয় নেই, তাঁকে কি করে বা ধারে জিনিস দেই? তবে এক কাজ করুন না, হাকিমবাবু ও ডেপুটিবাবুকে জামিন করে ঘটি নিয়ে যান।' কিশোরীবাবু ও জগতবাবুকে গিয়ে ওঁরা ধরেন, তখন ঘটি আসে।

ধারে জিনিসপত্র যুগিয়েছিলেন তিন ব্যক্তি; কাপুড়িয়া দীনবন্ধু সাহু, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সোয়ার—মাধব মহাপাত্র, তার মুদি—গোবিন্দ গুঁড়িয়া। ঋণের টাকা শোধ হয় কিনা, ওই দিকে ওঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ওঁরা ধারে দেন, যখন যা প্রয়োজন। দীনবন্ধু ও গোবিন্দ নিজেদের কাছে না থাকে তো, আর আর দোকান থেকে বা আড়ৎদার থেকে এনে দেন। আপনজনেরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলে, 'হাঁবা গঙ্গারামের দল।'

আপন ধন পরকে বিলিয়ে।
আমি মরবো ডুগডুগি বাজিয়ে॥

কিন্তু ওঁরা কানে গুঁজেছে তুলা। প্রভুর কোন সংস্থান নেই; তাঁর কাছে টাকা পাবার সম্ভাবনা নেই! যাদের বিষয়বুদ্ধি রয়েছে, ওরা ওঁদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেও, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগারের শেষ সম্বলটুক দিয়ে ওঁরা ছিনিমিনি খেলে। আর শুধু কি তাই? দোকানপাট, জোতজমা, বাস্তুভিটা পর্যন্ত বন্ধক দিয়ে, রাশি রাশি টাকা তাঁরা তুলে ধরেন হাসিমুখে, ভিন্ মুল্লুকের এই সাধুর হাতে! ঋণ করে ঋণ দেয়! ক্ষ্যাপা আর কি!

দীনবন্ধুর পাওনা টাকার অঙ্ক উঠে কুড়ি হাজারে! কিরণচাঁদ চট্টোপাধ্যায়কে তিনি এসে ধরেন, 'টাকা যখন হয় দেবেন, দোকানে কি একবার জটীয়াবাবার পদ-

ধূলি পড়বে না?' দরজা বন্ধ হয় হয়! তখনও তিনি এসে বলেন, 'আরও যদি কাপড় লাগে, তাও দিতে পারব; পাইকারদের হাতে ছিটেফোঁটা দিলেই হবে।' দীনবন্ধুর একবার মাথার ব্যামো হয়েছিল কয়েক বছর পূর্বে। গোমস্তারা বলাবলি করে, 'ঋণের দায়ে মালিক পাগল না হন ফের।' দীনবন্ধু শ্রীধরকে বলেন, 'ছিল না কিছু, সবই জগদ্বন্ধু দিলেন। তিনিই যদি আবার ফিরিয়ে নেন, তা নিবেন। হাতের ময়লা ঘুচবে, মনের ময়লা কাটবে।'

মাধী সোয়ার তাঁর বসতবাটী আর বাপ-দাদার আমলের বিষয়-আশয় বাঁধা দেন। তথাপি তাঁর চোখ খুলে না। প্রভুর কাছে গিয়ে সেদিন বড় গলায় বলেন, 'প্রয়োজন হলে কোঠাবাড়ী বেচব; বাবার কাজ চলুক।' সেদিন বার শ টাকা পেয়ে তিনি বলেন, 'আর ছয় মাসের মধ্যে কিছু না জুটলেও আসে যায় না।' শতপতি আড়ৎদারের কথায় তাঁর বড় লেগেছিল ওই দিন। সে বলে কিনা, 'গোসাঁই তোমার টাকা দিলেন না?' রাগের মাথায় তখন তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, 'যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? আজ থেকে পনর দিনের মধ্যে, তোমার পাওনা হাজার টাকা মিলে কিনা দেখ, তারপর পাকাম কর।' ঐদিনই চোদ্দ দিনের অন্তে টাকা পেয়ে ও-সব কথা তিনি মন খুলে বলেন। একটু থেমে তিনি বলেন, 'বাবা তো স্বয়ং জগদ্বন্ধু; তাঁকে আবার মুখ ফুটে বলতে হয় নাকি? সবই তো এখন দেখতে পেলে!'

পাওনাদার-দোকানদারের কান ভারী করে তিন ব্যক্তি—জগন্নাথদাস বাবাজী, ভুবনমোহন মিশ্র আর গঙ্গাধর খুঁটিয়া। ও'রা বলেন, 'ঋণ দেবার কি আর লোক পেলে না? অতি লোভে তাঁতি নষ্ট! বলি, জটীয়াবাবার আছে কি? পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গার অমন সাধু ঢের পাবে। বাবা, ডাকের চোটে গগন ফাটে! কোন্ দিন সট্‌কে পড়বে, টেরও পাবে না।'

কথা-কাটাকাটি হয় শরিকে-শরিকে। বিলাত-বাকী সব চাপিয়ে দেয় বিক্রেতা ভাগীর অংশে, আর কারবার করে আলাদা। বেঁকে বসে দীনবন্ধুর সহোদর হরি সাহু। সহধর্মিণীর সঙ্গেও মন-কষাকষি চলে দীনবন্ধুর। তেজের সঙ্গে দীনবন্ধু বলেন, 'একটু ধৈর্য ধরে থাকই না; টাকা যদি উশুল না হয়, তাহলে বুঝব জগদ্বন্ধু মিথ্যা।' পাওনাদারেরা ছুটেন প্রভুর কাছে। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'একটু অপেক্ষা কর। ধার-বাকী সব কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দেব।' গুজব রটে সারা শহরে, জটীয়াবাবা শ্রীক্ষেত্রে নেই। সাক্ষীও জুটে যায়; হলফ করে বলে, 'নিজের চোখে দেখলাম, রাতের আঁধারে দলবল নিয়ে জটীয়াবাবা চলেছেন, আঠারনালার পথ ধরে।' মাথায় ও'রা হাত দিয়ে বসে। শহর ভেঙ্গে পড়ে নীলমণি বর্মণের বড়দাণ্ডার গৃহে। গোস্বামীপ্রভুকে আসনে উপবিষ্ট দেখে, তাঁদের বুক ফুলে উঠে। যারা সব আজগুবি খবর দিয়েছিল, তাদের গালাগালি দিয়ে ও'রা বলেন, 'শরা অন্ধা, হিংসুটের দল।' প্রভুর শিষ্যদের মধ্যে জানাজানি হয় এই দানযজ্ঞের কথা। বড়-লোকের অভাব ছিল না; বড় মনেরও না। কিন্তু ধন আছে যার, তার মন নেই, আর যার মন আছে, তার ধন নেই। টেলিগ্রাম পাঠান গোস্বামী মহাশয় সচ্ছল শিষ্যদের কাছে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আদেশের কথা উল্লেখ করে। তাঁর এমন সব শিষ্য ছিলেন, যাঁরা ঋণের সম্পূর্ণ টাকাটা একা-ই দিতে পারতেন।

কিন্তু মহামায়ার এমনই খেলা, ক্ষুধার্তের আহার-সংস্থানে, বিবস্ত্রের লজ্জা-নিবারণে আর বিপন্নের বিপদভঞ্জনে সচরাচর ধনীর অর্থ ব্যয় হয় না। ও'রা মন্তব্য

পর্যন্ত করেন, 'যাঁর নিজের টাকা-পয়সার সংস্থান নেই, তাঁর কেন এই নামকেনার উদ্‌যোগ! জগন্নাথ যখন আদেশ দিয়েছেন, জগন্নাথই ঋণ শোধের ব্যবস্থা করুন!' ধরাকে ওঁরা সরা জ্ঞান করেন। দশচক্রে ভগবান ভূত। লঘু-গুরু ভেদ নেই। কি করে বুঝবেন তাঁরা এই দানের মর্ম? আবার সমালোচনা করতেও তাঁদের বাধে না! তাঁরা বলেন, 'পরিকল্পনা ছাড়া এতগুলি টাকা জলে ফেলে দেবার সামিল। কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে দিলেও দেশের কাজে, দশের কাজে লাগত।'

গোস্বামীপ্রভু মায়াতীত পুরুষ। তাঁর মধ্যে বাসনার, কামনার লেশমাত্র নেই। 'আপনি আচরি' শিষ্যদের শিক্ষা দেন। তিনি বলেন, 'না চাইতে যে দেওয়া, তা ইষ্টপূজা, আর চাইলে পরে যে দেওয়া, একে বলে দান। দেবে প্রাণ খুলে, যখনই সুযোগ পাবে; এতে হৃদয় খুলবে, শুষ্কতা যাবে। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করতেন জনক ঋষি। দেহান্তে স্বর্গে চলেছেন; মধ্যপথে পাপীদের আর্তনাদ শুনে তিনি নরক দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সহানুভূতিতে ভরে উঠে তাঁর মন। তিনি ধর্মরাজকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি হলে এদের মুক্তি হয়?" তিনি উত্তরে বলেন, "শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামের পুণ্যফল কেউ যদি এদের দেন!" জনক ঋষি বলেন, "আমার সারা-জীবনের নাম-সাধনের পুণ্যফল এদের দিলাম।" ধর্মরাজ তাঁকে বলেন, "আপনার একদিনের নামের ফল দিলেই হবে। সারা জীবনের প্রয়োজন হবে না" ওখান হতে ওদের মুক্তি হয়। কিন্তু স্বর্গে গিয়ে তারা আবার চেঁচামেচি শুরু করে। ইন্দ্র জনক ঋষিকে বলেন, "ক্ষুধার জ্বালায় ওরা কষ্ট পাচ্ছে; পৃথিবীতে ওরা তো কখনও কিছু দান করে নি। মর্ত্যে যা দান করা যায়, তার সুফল এখানে পাওয়া যায়।" ওদের উদ্ধারের জন্য, করুণার বশে জনক ঋষি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, নানকজী রূপে।'[১]

প্রভু বলেন, 'টাকা-পয়সা না থাকলে, মিষ্টি কথায়ও তো প্রার্থীকে তৃপ্তি দিতে পার; এও দান। মনু বলেছেন, যে দিনটায় কিছু দান করা যায় না, ঐ দিনটা বন্ধ্যা। শাস্ত্রে দানের বিধি-নিষেধ আছে। প্রতিদানের আশায়, লোক দেখাতে, অপ্রসন্ন মনে বা অশ্রদ্ধায় যে দান, বা যাতে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে বা অনুশোচনা হয়, তা ইহকাল বা পরকালে কোন কাজে লাগে না। নিষ্ঠাসহ যে দান, তা যথার্থ দান। অনুপকারীকে স্থান-কাল-পাত্র (পুণ্যস্থান, শুভ সময়, উপযুক্ত পাত্র) বিচার করে, অবিকৃত মনে আর কর্তব্য বুদ্ধিতে যে দান, তাই শ্রেষ্ঠ দান।"'

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানম্ সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৭।২০

দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর একদিন প্রভুকে বলেছিলেন, 'আমার অভাব নেই, অথচ প্রাণে এত জ্বালা কেন?' গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'ভগবান আপনাকে পর্যাপ্ত ধন-দৌলত দিয়েছেন; আপনার দানেরও অন্ত নাই। কিন্তু দান করেই আপনি সংবাদ-পত্রের দিকে চেয়ে থাকেন, খবরটি কখন বের হয়। ও-রকম দানে কখনও শান্তি পাবেন না।' ঠাকুরবাবু বলেন, 'দান করলে তো জানাজানি হবেই; খাজাঞ্চি জানবে, দান-গ্রহীতা জানবে। ডাকে যদি পাঠাই, কুপনে-রসিদে লিখা থাকবে, তাতেও তো জানা-জানি হবে।' প্রভু বলেন, 'এমনি চিঠির ভিতর আপনার নাম-ঠিকানা না দিয়ে পাঠান;

---

[১] 'আচার্য-প্রসঙ্গ', ২য় সং, পৃ ৩৬১-৩৬২।

আপনি ছাড়া আর কেউ জানবে না, গ্রহীতা পর্যন্ত না।' ঠাকুর মহাশয় বলেন, 'ও-রকম পাঠান অর্থ তো পোস্টাফিসে বেহাত হতে পারে, যথাস্থানে না পৌঁছারই সম্ভাবনা।' গোস্বামী মহাশয় তেজের সঙ্গে বলেন, 'স্বয়ং ভগবান ঐ অর্থ পৌঁছিয়ে দেন।'

দান-ধর্মের মূলে রয়েছে, দাতা আর গ্রহীতা উভয়েরই কল্যাণ। দু-এর মধ্যে থাকে শুভ, মধুময়, নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ; ইষ্টদেবতার স্থান নেন গ্রহীতা। সর্বঘটে, সর্বভূতে থেকে, তিনি অহরহ বলছেন, 'সকলকে দিলেই আমি পাই।' আমাদের সেই দৃষ্টি নেই, তাই দেখি না। দাতার ঘটে চিত্তশুদ্ধি, আর গ্রহীতা উপলব্ধি করে ভগবানের মঙ্গলময় হাত। তাতে তার প্রাণ সরস হয়, হৃদয় পবিত্র হয়। বাইবেলে আছে—

And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries, all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing.

—Corinthian 1-XIII-2

'যদিও আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়, ভবিষ্যতের পর্দা খসে পড়ে, রহস্যের জাল হয় ছিন্ন; আর বিশ্বাসের অমোঘ শক্তিতে গিরির মধ্যেও আনতে পারি আলোড়ন, তা সত্ত্বেও যদি আমার কোন দান না থাকে, তাহলে আমি অসার নগণ্য।'

দান-ধর্মের জীবন্ত আদর্শ গোস্বামী মহাশয় তুলে ধরেন অনুগামীদের কাছে। তাঁদের শিক্ষা দেন, দাতাকে গ্রহীতার কাছে নতজানু হয়ে কি করে দান-কার্য সার্থক করতে হয়। বাইবেলে আরও রয়েছে—

Charity suffereth long and is kind; charity envieth not, charity vaunteth not itself, is not puffed up; rejoiceth not in inequity but rejoiceth in the truth.

—Corinthian 1-XIII-4|6

'সত্যিকারের যে দান, তার মধ্যে থাকে ত্যাগ ও দীর্ঘ দুঃখ-তাপ, কিন্তু থাকে না অনুশোচনা, বেদনাবোধ, ঈর্ষা, অভিমান। দানের মধ্যে তারতম্যে কোন আনন্দ নেই। আছে এতে সত্তা বিলিয়ে সত্য প্রকাশ ও সমাজসেবার আদর্শ।'

দানের এই যে মহান আদর্শ, তা হয়ে উঠে বিপরীত মুখী 'ত্যাগ' আর 'ভোগের' বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে। অনিত্য দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে, দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের প্রতি নিছক কর্তব্যবোধে, পাশ্চাত্য দেশে বিত্তবানদের অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠে 'জনকল্যাণ সংস্থা।' যাঁদের অর্থে হয় এ-সবের গোড়াপত্তন, দশের কাছে, দেশের কাছে হয়ে উঠেন তাঁরা মহান ও প্রণম্য; আর যাঁদের উদ্দেশে এসব হয়, তাঁরা অনুকম্পা ও করুণার পাত্র। এতে আসে দাতার অভিমান, আর গ্রহীতাকে পদে পদে স্মরণ করায়ে দেয়—তাঁরা হীন, তুচ্ছ, কৃপার পাত্র।

দেশে ফিরে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়তে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মনেও এ প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বলুন দেখি, এ-সব মঠ, সেবাশ্রম কি ঠাকুরের আদর্শমত হচ্ছে?' স্বামীজী মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন, 'যত্র জীব, তত্র শিব'। তিনি মরমে মরমে জেনেছিলেন, মঠ আর সেবালয়গুলিকে 'নরনারায়ণ সেবার বেদী' বলে। একদিন তিনি সাঁওতালি

কুলিদের খেতে দেন বেলুড়মঠে। তাদের পরিতৃপ্তি দেখে সতীর্থদের বলেন, 'ইচ্ছে হয় মঠ-ফট সব বিক্রী করে বিলিয়ে দেই সব গরীব, দুঃখী, দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে।' স্বামীজীর দরদী মন নিয়ে সেবা করা কি সকলের পক্ষে সম্ভব? তাই, সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে তাকালেই পদে পদে হৃদয়হীনতা ধরা পড়ে। না আছে স্নেহ-প্রীতির লেশ; কথায় কথায় ভ্রূকুটি! কোথায় সেই হৃদয়জয়ী অমৃত স্পর্শ? আর্তকে পদে পদে এখানে স্মরণ করায়—তাঁরা অমানুষ, হেয়, তুচ্ছ, কৃপার পাত্র। কি করেই বা মধুর হবে দাতা-গ্রহীতার এই পরোক্ষ সম্পর্ক? সেবাধর্মের পবিত্র আদর্শের তাই সমাধি ঘটে। দান-ধর্মের মাপ-কাঠিতে এ-সব জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বিচার করতে গেলে, সর্বত্র ব্যর্থতাই মূর্ত হয়ে উঠে।

শ্রীক্ষেত্রে দানসাগর করে গোস্বামীপ্রভু হয়ত শিষ্যদের সুযোগ দিলেন; তাঁদের কর্মক্ষয়ের ব্যবস্থা করলেন! নতুবা জীবনে অভাব, অনটন ও অনাহারের মধ্যেও যিনি গিরিরাজের মত অটল, অবিচল, তিনি কেন আজ অর্থ যাচ্ঞা করেন শিষ্য ও ভক্তদের কাছে?

'মন বিনা ধন'—অভিমানের বাহন, মোসাহেবের আকর্ষণ, ছেলে-পিলের বিপথে যাবার কারণ, লাগে না সৎ কাজে। আর 'ধন বিনা মন'—মন্ত্রের সাধন কি শরীর পাতন! গায়ে আগুন জ্বর, তবু টাকা সংগ্রহ করতে বের হলেন বিধুভূষণ ঘোষ। গোসাঁই তখন বলেন, 'এমন যার আবেগ, সে কি কখন ঠেকে?' গোষ্ঠবাবুর মাসে কুড়ি টাকা আয়। সংসার চলে অতিকষ্টে, জোড়াতালি দিয়ে; তার উপর স্ত্রী উন্মাদ। হালকা হাসি হেসে তিনি তুলে ধরেন পাঁচটি টাকা। প্রভু শুনে বলেন. 'এ পাঁচ টাকা নয়, পাঁচ লক্ষ; এর মূল্য নাই, তুলনা নাই।' জ্ঞানেন্দ্র হাজরা পঁয়ত্রিশ টাকার বেশি দিতে না পেরে কেঁদেকেটে আকুল হন। ঢাকার ধনকুবের রূপলাল দাশের ছেলে রাধাবল্লভবাবুকে গোস্বামী মহাশয় টেলিগ্রাম করে দু হাজার টাকা পাঠাতে লিখেছিলেন, কিন্তু তিনি পাঠালেন মাত্র দুই শ। বরিশাল থেকে গোরাচাঁদ-বাবু পাঠান শুধু পঞ্চাশ। যোগজীবনবাবুকে তিনি চিঠি লিখে জানান, 'মনের অবস্থা এমন নয়, দুই হাজার পাঠাই।' চিঠি পেয়ে যোগজীবন হন মনমরা। প্রভু তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যেমন ইচ্ছা, তা-ই হবে। এই ঋণ তো তাঁরই। তাঁর হুকুমই ওঁদের জানিয়েছি।' গোসাঁইর কথা শুনে ভক্তদের দেহ-মন শীতল হয়।

ডাঃ হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠান এক-শ আর সারদাকান্তও কুলদানন্দকে লিখেন, 'জোতজমি, বাস্তুভিটা বিলি-বিক্রি করে যা পাও, ঠাকুরের শ্রীচরণে এনে দাও; অবিলম্বে বাড়ী গিয়ে এ-সব ব্যবস্থা কর।' মহেন্দ্রবাবুর মুখে এ-সব কথা শুনে প্রভু বলেন, 'হরকান্তের মন-মুখ এক; তাঁর অন্তরে যে কি হচ্ছে, তা অপরে কি করে বুঝবে?' সারদাকান্তকে ডেকে তিনি বলেন, 'তোমাদের বড়দাকে তুমি লিখে দাও, "ঘর-বাড়ী বেচার প্রয়োজন হবে না। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ঋণ শোধের ব্যবস্থা করেছেন।"'

সহায়হীন, সম্বলহীন শিষ্যেরা তাঁদের যথাসর্বস্ব অংগীকার করেন গুরুর ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে। কেউ পরিবারের গয়না বেচেন। কেউ বাস্তুভিটা বাঁধা দেন; কেউ কেউ ঋণ করে টাকা পাঠান গোস্বামী মহাশয়ের কাছে। মানি-অর্ডার বা ইনসিওর করে পাঠালে টাকা পেতে দেরী হবে; তাই টাকা যায় টেলিগ্রাম মানি-অর্ডারে। প্রত্যহ কত যে মানি-অর্ডার আসে। পোস্টাফিসে হুলস্থূল পড়ে। জটীয়া-

বাবার টাকা বিলির স্পেশাল ব্যবস্থা হয়। পোস্টাফিসে টাকার টান পড়ে। ট্রেজারি থেকে টাকা এনে পুরোপুরি বিলি হয়। ভক্তদের মুখে হাসি ধরে না।

ছেলের জন্য এই টাকা থেকে ছোট একখানা রেশমী ধুতি জগদ্বন্ধু মৈত্র কিনে নিয়ে আসেন। বিরক্ত হয়ে প্রভু তাঁকে বলেন, 'কি করে তুমি এই টাকা থেকে নিজের জন্য ব্যয় কর? জগন্নাথদেব এই অর্থের মালিক; এই দানযজ্ঞ তাঁরই। আমি শুধু উপলক্ষ্য।' মুক্তকেশী দেবী প্রতিবাদ করেন। গোসাঁই বলেন, 'যাঁরা অবিশ্বাসী, তাঁদের এখানে থাকতে নাই। ভগবান দান করছেন আর মানুষ করে স্বেচ্ছাচার।'

ঋণ শোধের ভার পড়ে সরলনাথের উপর। না আছে তাঁর হিসাব-কেতাব, না আছে তাঁর ধারচোতা। তিনি গুরুর পানে হাঁ করে তাকান। প্রভু তাঁকে বলেন, 'লক্ষ্মীবাজারে গিয়ে পাওনাদারদের ডেক; যে যা পাবে বলে, তাই দিও।' খবর পেয়ে খাতাপত্র নিয়ে উপস্থিত হন প্রাপকেরা। সরলনাথ তাঁদের বলেন, 'ভাইরা, তোমরা কে কত পাবে?' যে যা বলেন, তিনি তা-ই দেন। একটিবার বলেন না দেখাতে, কি আছে লিখা ওঁদের খাতার পাতায়। আজব হিসাব-নিকাশের সুযোগ নিয়ে পাওনাদারেরা কেউ কেউ আদায় করে নেন দেড়গুণ, দ্বিগুণ। সরলনাথের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই; বারবার জিজ্ঞাসা করে, তিনি তাঁদেরই কথামত দেনা-পাওনা চুকিয়ে দেন।

ঘটির মহাজন আনাগোনা করে জামিনদারদের বাড়ী বাড়ী। জিনিস বেচে সে চোর বনেছে, হাঁটাহাঁটি সার। জামিনদারের একজনের দেখা মিলে তো আর একজনের না। ছুটির দিন ছাড়া ওঁদের হিসাব নিয়ে বসার ফুরসুৎ নেই। তাঁদের সম্মুখে গিয়ে মুখচোরা হয়ে থাকে, আর পথে-ঘাটে ঝাড়ে মনের ঝাল। সকলের প্রাপ্য মিলে যায়, আর ঘটিওয়ালার পাওনা মিটে না। অবশেষে হিসাবপত্র, নথিপত্র, চোতা-চালান মিলিয়ে জামিনদারেরা কেনা দাম কষেন। নামমাত্র মুনাফায় হিসাব মিটে। আসল পেয়ে হাঁফ ছেড়ে সে বাঁচে। ভক্তেরা বলাবলি করেন, 'সরলনাথ বুদ্ধির ঢেঁকি! যে যা চাইল, সরলনাথ দ্বিরুক্তি না করে তাই দিল; আর বেচারী ঘটিওয়ালার ঘোড়দৌড়ই হল সার।'

প্রভুর কাছে এই কথা উঠতেই তিনি বলেন, 'যাঁরা শুধু আমাদের কথার উপর নির্ভর করে জিনিসপত্র যুগিয়েছেন, তাঁদের তো একটা পুরস্কারও প্রাপ্য। ঘটিওয়ালা তো আমাদের বিশ্বাস করে নাই; বিষয়-বুদ্ধিতে জামিনদার চাইল। জামিনদাররা যা উপযুক্ত মনে করেছেন, তাই দিয়েছেন।'

উমাচরণ দাশ পাঠালেন তিন হাজার টাকা; যোগজীবনবাবুকে তিনি চিঠি লিখেন, 'সাধুসেবায় ঠাকুর খরচ করেছেন; এই সামান্য অর্থ তাঁর কাজে লাগছে, এই আমার পরম সৌভাগ্য।' তাঁর ইচ্ছা হয় আরও আট-দশ হাজার টাকা পাঠান, কিন্তু লোকের মুখে বিরূপ সমালোচনা শুনে তিনি আর মাত্র এক হাজার টাকা পাঠালেন। পরে উমাচরণবাবু দুঃখ করে বলেছিলেন, 'টাকাগুলি পাঠিয়ে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, জীবনে তা আর কখন পাই নি।' গোস্বামীপ্রভু এ-কথা শুনে বলেন, 'লোকের কথায় কি আসে যায়? ভগবান দেখেন তাঁকে কে কতখানি চায়।'

ঢাকা থেকে ভক্তরা দুঃখ করে চিঠি লিখেন, 'রূপবাবুর বাড়ীতে দানের কথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টার অন্ত নেই।' রূপবাবু ব্রাহ্মভাবাপন্ন; বড়ছেলে রাধাবল্লভবাবু প্রভুর কাছে সস্ত্রীক সাধন পেয়েছেন। অছিলা পেয়ে রূপবাবু প্রকাশ করেন মনের ক্ষোভ। ছেলেকে শুনিয়ে বলেন, 'টুন্ডা জগন্নাথকে নিয়ে কেন টানাটানি?'

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে।
কাল হল, এঁড়ে গরু কিনে॥

টেলিগ্রাম আসে রাধাবল্লভবাবুর, 'স্ত্রীর গর্ভকাল উত্তীর্ণ অথচ প্রসবের লক্ষণ নেই। ডাক্তার বলেন, গর্ভে মৃত সন্তান। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আপনার নির্দেশ জানান।' তারে প্রভুর উত্তর যায়, 'ডাক্তার যা বলেন, তাই কর।' দুদিন পর আবার রাধাবল্লভবাবুর টেলিগ্রাম আসে, 'অজ্ঞানের অপরাধ মার্জনা করুন। প্রসূতির অবস্থা সঙ্কটজনক। যন্ত্রণা অসহ্য। জ্বর বেশি। সীজারিয়ানে মতদ্বৈধ।' রাত দশটায় এই তারবার্তা পেয়ে গোস্বামী মহাশয় তখনই জরুরী টেলিগ্রাম করান—'সূর্যোদয়ের পূর্বে হাজার ব্রাহ্মণের পাদোদক সেবন করাও। জীবিত ছেলে হবে, স্বাভাবিক প্রসবে হবে। প্রসূতিও সুস্থ হবে।' তিনি শিষ্যদের বলেন, 'রাধাবল্লভের ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথদেব এই আদেশ করেছেন। যদি কথামত চলে, তাহলে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম হবে; ওদের পরিবার ও সমাজের তো কথাই নাই, সারা ভারতের কল্যাণ হবে।' কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করেন, 'রাতারাতি হাজার সদ্‌ব্রাহ্মণ পাবেন কোথায়?' 'যাঁদের গলায় উপবীত, ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে তাঁদেরই পা-ধোয়া জল আনতে হবে। ওঁরা বড়লোক, কত ব্রাহ্মণ কর্মচারী রয়েছেন। ঢাকার ছাত্রাবাসগুলিতেও ব্রাহ্মণের ছেলের সংখ্যা কম নয়।' টেলিগ্রামে 'ফুট ওয়াটার' হয়ে যায় 'হট ওয়াটার'। আবার তার বিনিময় করে ঢাকায় নির্ভুল নির্দেশ পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর। মৃত ছেলে স্বাভাবিক ভাবে প্রসব হয়। প্রসূতি সুস্থ হন।

গোসাঁই ঐ সময় একদিন কিরণচাঁদকে আদেশ করেন, 'প্রত্যহ সকালে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করে জগন্নাথ দর্শন করবে, তারপর আশ্রমে ফিরবে।' যেমন আদেশ, কিরণচাঁদ পরদিন থেকে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। আশ্রমে ফিরে এসে ক্ষুধায় তাঁর মাথা ঝিম-ঝিম করে। বাল্যভোগের প্রসাদকণাও তখন থাকে না; চায়ের তো কথাই নেই। কি আর তিনি করেন?

একদিন শ্রীমন্দিরে চরণদাস বাবাজীর সঙ্গে কিরণচাঁদের সাক্ষাৎ হয়। বড়বাবাজী তাঁকে বলেন, 'কিরণ, তোমাকে বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে; মুখখানিও বড় মলিন দেখাচ্ছে।' কিরণচাঁদ তাঁকে সব খুলে বলেন। চরণদাস বাবাজী তাঁকে তাঁর মঠে নিয়ে গিয়ে জলখাবারের ব্যবস্থা করেন; আরও বলেন তাঁকে, 'জগন্নাথ দর্শনের পর রোজই আমার এখানে চলে এস; এখানে চা ও জলখাবার খেয়ে তুমি আশ্রমে ফিরবে।' ওই রূপ বহুদিন চলে। বড়বাবাজী কিরণচাঁদকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। কিরণচাঁদ একদিন চা ও হালুয়া খাচ্ছেন, এমন সময় গোসাঁই সম্পর্কে বড়বাবাজীর একটি মন্তব্যে কিরণচাঁদ ক্ষেপে উঠে তাঁর উচ্ছিষ্ট হাতে সজোরে বড়বাবাজীর মুখে এক প্রচণ্ড ঘুষি মারেন। তাঁর দুটি দাঁত ভেঙ্গে যায়, মুখ রক্তাক্ত। বাবাজীর শিষ্যেরা মারমুখ হয়ে ছুটে আসেন। বড়বাবাজী এক হাতে মুখ চেপে ধরেন, অপর হাতে ওঁদের নিষেধ করেন।

বাবাজী মহাশয় প্রত্যহই অপরাহ্নে গোস্বামীপ্রভুর কাছে আসতেন। তিন-চার দিন তিনি আসেন না। তারপর এলে গোসাঁই তাঁকে এ কয়দিন না আসার হেতু কি জিজ্ঞাসা করেন। বাবাজী গোস্বামী মহাশয়কে মুখ খুলে দেখিয়ে ধীরে ধীরে বলেন, 'আপনার একটি ছেলেকে একটু বাজিয়ে দেখছিলাম, এটি তারই কীর্তি।' গোসাঁই হুঙ্কার দিয়ে উঠেন, 'কিরণ বুঝি!' গোস্বামীপ্রভু বড়বাবাজীর নিকট ক্ষমা চান। তিনি তখনই কিরণচাঁদকে ডেকে পাঠান। কিরণ গিয়ে যোগজীবন

গোসাঁইর শরণ নেন। সারদাকান্ত এসে প্রভুকে বলেন, 'দাদা-গোসাঁই বললেন, কিরণ তাঁর ঘরে নেই।' সেদিন বিদায় নিয়ে বড়বাবাজী বড়দাণ্ডায় পা বাড়াতেই কিরণ গিয়ে গোস্বামীপ্রভুর পায়ে পড়েন। প্রভু বলেন, 'কিরণ, তুমি করেছ কি?' কিরণ বলেন, 'তিনি কেন আমার গুরুর প্রতি কটাক্ষ করলেন?' প্রভু বলেন, 'তুমি বৈষ্ণব-অপরাধ করেছ, এখনই গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে এস।' কিরণ চুপ করে থাকেন। প্রভু তাঁকে বলেন, 'তুমি যাবে না? তাহলে আমারই যেতে হয়। সারদা, আমার লাঠিটা আন তো।' কিরণচাঁদ তখনই 'যাচ্ছি' বলে ছুটতে থাকেন। থপ্ থপ্ শব্দ পেছনে শুনে বড়বাবাজী মুখ ঘুরিয়ে দেখেন, কিরণ ছুটে আসছে। কাছে আসতেই ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি জোরে জোরে বলেন, 'আমি কিন্তু নিজ থেকে গোসাঁইকে কিছু বলি নি।' কিরণচাঁদ পথের মধ্যেই লুটিয়ে পড়ে বারবার ক্ষমা চান। বড়বাবাজী তাঁকে আলিঙ্গন করেন।[১]

ডন-সম্পাদক সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (২) কাছে গোস্বামীপ্রভুর টেলিগ্রাম আসে, 'জগন্নাথদেবের আদেশ, চার দিনের মধ্যে এক হাজার টাকা পাঠাও।' চোখে তিনি সরষে ফুল দেখেন। সতীর্থ সুহৃদ আলিপুরের সরকারী উকিল, হেমেন মিত্রের গৃহে তিনি যান। ওঁর হাতও খালি জেনে তাঁর মন খাঁ-খাঁ করে। হেমেনবাবুকে তিনি বলেন, 'আমি তো ভাই পপার; কে আমাকে ধার দেবে? কারও কাছ থেকে ধার নিয়ে যদি ঠেকা কাজটা চলে যায়, যেমন করে পারি আমি শোধ করব।' দুজনে মিলে দুদিন ঘোরাঘুরি করেন। সতীশবাবু ভাবেন, 'চেষ্টার তো কোন ত্রুটি হচ্ছে না। ঠাকুরের হুকুম তো ব্যর্থ হতে পারে না। তিনিই উপায় করে দেবেন। আঁধারে ঢিল ছুঁড়ে কি হবে? ওয়াইল্ড গুজ চেজিং!' সতীশবাবুবাবু প্রার্থনা করেন, 'ঠাকুর তুমি না জোটালে আমার কি সাধ্য! তুমিই ব্যবস্থা করে দাও।' চার দিনের দিন বেলা দশটায় হেমেনবাবুর শালা আসেন, হাতে তাঁর একটি পুঁটুলি। সতীশবাবুকে তিনি বলেন, 'দিদিমণি কত দুঃখ করলেন, ঠাকুর তাঁদের কাছে কিছুই চাইলেন না, আর আপনাকে টাকা পাঠাতে "তার" করেছেন। আরও তাঁর আফশোস, এমন সময়ই তিনি আপনাকে টেলিগ্রাম করেছেন, যখন ওঁদের হাতও শূন্য। এই গয়না দিয়ে বলেছেন যেন বন্ধক রেখে এখনই আপনাকে এক হাজার টাকা দিয়ে যাই; আরও বলেছেন, এই টাকা আপনাকে শোধ করতে হবে না।' আধঘণ্টার মধ্যেই টাকা আসে। সতীশবাবু তখনই পোস্টাফিসে ছুটেন। টাকা যায় টেলিগ্রাম মানি-অর্ডারে। ঐদিন সন্ধ্যায়ই সতীশবাবু হেমেনবাবুর সেরেস্তায় গিয়ে 'প্রোনোট' লিখে দেন। মিত্র মহাশয় ওজর-আপত্তি করেন: তথাপি তিন মাসের মেয়াদে লিখে সই করেন স্ট্যাম্প-এর উপর। হ্যাণ্ডনোটখানা হাতে নিয়ে হেমেনবাবু ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। কয়েকদিন যায়, কেদারবাবু এসে সতীশবাবুকে ধরেন, তাঁর লিখা ইংরেজী ব্যাকরণখানার রিপ্রিণ্ট হওয়া প্রয়োজন। সতীশবাবুর খেয়ালই ছিল না। তিনি প্রকাশককে বলেন, 'আপনি যদি রিপ্রিণ্ট করতে চান, তাহলে হাজার টাকা দিতে হবে, তাও আগাম।' কেদারবাবু তাঁকে বলেন, 'আজই দিতে আমি রাজী, যদি কপি-রাইট আমাকে বেচে দেন।' সতীশবাবু ভাবেন, 'এই চটি বইখানা লিখে ছ হাজার টাকা পেয়েছি, আর কত?' মুখ ফুটে তিনি কেদারবাবুকে বলেন, 'তাই হবে।' টাকা পেয়েই আঠার দিনের

---

[১] গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত।

দিন হেমেনবাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁর হাতে হাজার টাকা দিয়ে বন্ধকী অলঙ্কার ছুটাতে অনুরোধ করেন।[১]

২৭ ফাল্গুন, ১৩০৫ তারিখে শিবচতুর্দশী। এই পুণ্য তিথি উপলক্ষ্য করে কলিকাতা থেকে মহেন্দ্র মিত্র, অভয় রায় ও বেণীবাবু গুরুদর্শনে পুরী যাত্রা করেন। ঐদিন সকালে খুরদা স্টেশনে প্লেগ কোয়ারানটাইনে তাঁদের আটক করে রাখা হয়। এক সহযাত্রীকে দিয়ে তাঁরা এই সংবাদটি গোস্বামীপ্রভুর কাছে পাঠান। অসুস্থ দেহে প্রভু পঞ্চাশ জন শিষ্যসহ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে লোকনাথ দর্শনে চলেন। সরলনাথ ও বিধুবাবু তাঁকে ধরে থাকেন। হাঁড়িতে হাঁড়িতে খাজা, মালপোয়া, ভোগের জন্য প্রভু সঙ্গে নিয়ে যান। ভিড় থাকা সত্ত্বেও ভক্তেরা গোসাঁইকে মন্দিরের ভিতর নিয়ে যান। অর্ধ-পরিক্রমার সময় ভগবতীর দর্শন পেয়ে গোস্বামীপ্রভু ভাবাবেশে অপূর্ব নৃত্য করে বলতে থাকেন, 'হরি, হর, জয় লোকনাথ, ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।' পরে তিনি কথায় কথায় বলেন, 'এই নাম জপ করে দ্বারকানাথ সিদ্ধি লাভ করেছেন।' এই ডামাডোলের মধ্যেও ভক্তবৎসল গোসাঁই প্লেগ ক্যাম্পে আটক তাঁর তিনজন শিষ্যের কথা ভুলেন নি। তিনি লোকনাথদেবের নিকট প্রার্থনা করেন, 'হে দেবাদিদেব, তুমি আজই ওঁদের এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর।' আশ্রমে ফিরে এসে প্রভু বলেন, 'লোকনাথের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে দেখি, দিঙ্‌মণ্ডল জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে, পুরীর আকাশ-বাতাস জুড়ে লোকনাথ বিরাজ করছেন। মনে নাই? সেদিন তিনি এখানে সন্ন্যাসীর বেশে এসে বলেছিলেন, "লোকনাথ গেলেই আমার দেখা পাবে।" তা যথার্থ।'

প্লেগ ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়ে মহেন্দ্রবাবুরা সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেন। অভয়বাবু বলেন, 'হঠাৎ ক্যাম্পের ডাক্তারের কি খেয়াল হল তিনি এসে বলেন, "আপনারা লোকনাথ দর্শন করতে যাচ্ছেন, কি করে আপনাদের আটকাই? এখনই আপনারা চলে যান।" আমরা বুঝেছি এ শুধু আপনার কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে।' গোস্বামী মহাশয় 'জয় লোকনাথ' ধ্বনি করে তাঁদের বলেন, 'আপনারা এখনই মহাপ্রসাদ পেয়ে লোকনাথ দর্শন করে আসুন। বিধু, তুমি ওঁদের দেখিয়ে নিয়ে এস।'[২]

২ চৈত্র (১৩০৫), জেলা স্কুলের হেডপণ্ডিত গোস্বামীপ্রভুর কাছে এসে কান্নাকাটি করেন। তাঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হঠাৎ মারা গেছে। প্রভু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'সন্তান-শোকে হৃৎপিণ্ড যেন ঝাঁঝরা হয়ে যায়। জগদ্বন্ধু আপনাকে সান্ত্বনা দিন।' পণ্ডিত মহাশয় বলেন, তাঁর ভাইটিও মৃত্যুশয্যায়। তিনি প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করেন। ইনিই বানর-বধের পক্ষে পাঁতি করে ছেলেদের দিয়ে সই করিয়েছিলেন।

৮ চৈত্র (১৩০৫), গঙ্গাধর খুঁটিয়া আসেন। তাঁকে দেখেই প্রভু বলেন, 'মুস্কিল হয়েছে, ভগবান আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। তোমাকে দেখলেই আমার আত্মা শুকিয়ে যায়; আজ তোমাকে কালপুরুষ বলে মনে হচ্ছে।'

১১ চৈত্র (১৩০৫), জগন্নাথদাস বাবাজী খবর পাঠান যে তাঁর আশ্রমে ছয়-সাত হাজার সাধু আসছেন, গোসাঁইজী যেন সাধুসেবার অর্থের ব্যবস্থা করেন। দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। প্রভু বলেন, 'আমার কানাকড়ি দেবার সামর্থ্য নাই।

---

১. 'আচার্য-প্রসঙ্গ', ২য় সং, পৃ ৩৭৩-৩৭৫।

২. 'আচার্য-প্রসঙ্গ', ২য় সং, পৃ ৩২৩-৩২৫।

আমাদের আকাশবৃত্তি।'

২০ চৈত্র (১৩০৫), শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আদেশে গোস্বামীপ্রভু চার সম্প্রদায়ের সাধুদের প্রসাদ পাবার নেমন্তন্ন করেন। জগন্নাথদাস বাবাজী বলেন, 'যথোচিত মর্যাদা না দিলে সাধুরা আসবেন না।' সাধুরা বলে পাঠান, 'জটীয়াবাবার সাধুসেবার আমন্ত্রণে আমরা এমনিই যাব। আমাদের কোন দাবি-দাওয়া নেই। জগন্নাথদাস বাবাজীর কেবল টাকা মারার ফন্দি। অমাদের ও কিছুই দিত না।'

গোসাঁই একদিন কথায় কথায় বলেন, 'মনে কর না, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কাঠের বিগ্রহ। ভগবান স্বয়ং এই রূপ ধারণ করেছেন। যেমন বাষ্প জমাট হয়ে বরফ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ঘনীভূত হয়ে অমন হয়েছেন।' আবার তিনি বলেন, 'এ স্থানের রজঃ এক-একটি মহাবিষ্ণু। জগন্নাথদেব, মহাপ্রসাদ ও রজঃ এই তিনই এক।' প্রভু আরও বলেন, 'মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলে পুনর্জন্ম হয় না। উহা দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে পিতৃপুরুষদের উদ্ধার হয়।' আরও এক সময় তিনি বলেন, 'শাস্ত্র ও সদাচার সর্বদা মেনে চলতে হয়। আমি তো ব্রাহ্ম ছিলাম। কিছুই মানতাম না। কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে চলে শারীরিক ও মানসিক উপকার উপলব্ধি করেছি।' একদিন কথাপ্রসঙ্গে গোস্বামীপ্রভু শিষ্যদের বলেন, 'রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে রুদ্ধকক্ষে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল, তার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ অধিকার নাই।' ভক্তেরা জিজ্ঞাসা করেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কি আপনাকে চিনতে পেরেছিলেন?' প্রভু মৃদু হেসে বলেন, 'প্রথমে পারেন নাই, পরে পেরেছিলেন—তখন কত কথা!' ঢাকার কুঞ্জলাল নাগ লিখেন, 'দেনার দায়ে ডুবে আছি, তথাপি চেষ্টা করছি।' কুঞ্জবাবুকে আবার টেলিগ্রাম করেন, 'ভগবানের আশীর্বাদ জেন।' বিধু ঘোষ গোসাঁইকে বলেন, 'চিঠিপত্র টেলিগ্রামে সব খুলে লেখা যায় না। সতীর্থদের বাড়ী বাড়ী গেলে কেমন হয়?' গোস্বামী মহাশয় তাঁকে বলেন, 'তা ইচ্ছা হলে যেতে পার।' একটু পরেই বিধুবাবুকে বলেন, 'জগন্নাথদেব তোমাকে যেতে আদেশ করেছেন; "এস গিয়ে।"'

২ বৈশাখ, ১৩০৬ সালে গোসাঁই শিষ্যদের উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখেন—

শ্রীশ্রীহরিশরণম্।

আমি জগন্নাথদেবের আদেশমত সাধুসেবা করিয়াছি। এখানে কিছু দেনা হওয়াতে অর্থের প্রয়োজন। যিনি যাহা দেবেন জগন্নাথদেবের আদেশমত ৬ মাসের মধ্যে তাহা পরিশোধ হইবে। অন্ততঃ দশ হাজার টাকা প্রয়োজন। যিনি যাহা দিবেন—আমি তাহা পরিশোধ করিব। ইতি

জগন্নাথস্বামীর আজ্ঞাকারী
দাসানুদাস—
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বিধুবাবু ঐদিনই বের হন। কলিকাতা অবধি পান্না ঘোষ তাঁর সঙ্গে যান। হরিদাস বসুর বিষয়-আশয় লাটে উঠে ঋণের দায়ে। এদিকে মেয়ের বিয়ে। তথাপি তিনি ছ-শত টাকা পাঠান তাঁর নামে, আর চারশত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নামে। কুঞ্জ ঘোষ পাঠান দেড় হাজার। কুঞ্জলাল নাগ বাড়ী বাঁধা রেখে তিন কিস্তিতে পাঠান পাঁচ হাজারের উপর। যাঁদের কাছে চিঠিপত্র যায় নি, বিধুবাবুর সঙ্গেও যোগাযোগ হয় নি, তাঁদের কাছ থেকেও টাকা আসে দফে-দফে। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা পাঠান, বরদাকান্ত পাঠান তিনশত। নবদ্বীপ দাশ পাঠান এক হাজার আর শশীবাবু সাত শত। এ-সব বিধুবাবুর ঘোরাঘুরির ফল। টাকা পেয়েই বিধুবাবু টেলিগ্রামে পাঠান

আর দাতার অভিপ্রায় গুরুকে চিঠিতে লিখে জানান, 'আমাদের এই ভক্তি-অর্ঘ্য আপনার কাজে লাগে তো ধন্য হই, কৃতার্থ হই; যদিও তা তুচ্ছ নগণ্য, সমুদ্র-বন্ধনে কাঠবিড়ালীর প্রয়াস।'

গাঁয়ে গাঁয়ে, জিলায় জিলায় সতীর্থদের গৃহের খোঁজে হন্ হন্ করে ছুটেন বিধুবাবু। দিন নেই, রাত নেই, দিগ্‌-বিদিক জ্ঞান নেই। পথের ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে তিনি চলেন। দিগন্তজোড়া, জ্বলে পুড়া, ফুটি ফাটা, ধু-ধু মাঠের আল ধরে তিনি যান। অগ্নিবানে স্তব্ধ হয়ে খাঁ খাঁ করে চারদিক। দিনের শেষেও পথের নেই শেষ। বিধুবাবু চলেন, কাল-বৈশাখীর তাথৈ নাচ আর আকাশ-ছেঁড়া কড়-কড়ানির মধ্যে। চোখ-ঝলসান আলো আর ঘুটঘুটে আঁধারের লুকোচুরি খেলায় হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলান বিধবাবু। গুরুপ্রেমে তিনি মাতোয়ারা। দেহের বিকার পায় না তাঁর মনের নাগাল। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, নেই গ্লানিবোধ।

ইদিলপুরের জমিদার যোগেশ রায়ের বাড়ী। গুমোট—কেমন এক থমথমে ভাব! বিধুবাবু গৃহস্বামীর খোঁজ করেন। বার্তাবহ উসখুস করে কি বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, তারপর ভিতর-বাড়ী চলে যায়। ভেসে আসে খোল-করতালের আওয়াজ। যোগেশবাবুর অন্তঃপুরে চলে হাহাকার! ছেলেকে তুলসীতলায় নিয়ে কীর্তন চলে। কে একজন এসেছেন শুনে তিনি বাইরে যান। সতীর্থ বিধু ঘোষকে দেখে ভুলে যান তিনি পুত্রশোক। শ্রীক্ষেত্র থেকে তিনি আসছেন জেনে, যোগেশবাবু ঠাকুরের শ্রীদেহ মোটামুটি ভাল জেনে খুশি হন। হঠাৎ আসার কারণ তিনি শুধান। তখনই যোগেশবাবু হাজার টাকা এনে বিধুবাবুর হাতে দেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে বলেন, 'বিধুদা, কিছু মনে কর না। অশৌচের মধ্যে তোমাকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা হল না। শ্মশানে ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছি।' বিধুবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে! কান্নায় তাঁর বুক ফাটে। যোগেশবাবুকে আলিঙ্গন করে বিধুবাবু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন; ভাবাবেগে তাঁর সারা দেহ কাঁপে। তাঁর মনে হয় গৌরলীলায় শ্রীবাসের আঙিনায় যেন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রীবাস পুত্রের তাহা হইল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।১৭।২২১

১৬ বৈশাখ (১৩০৬), বহু টাকা আসে। এ-সব বিধুবাবুর চেষ্টার ফল। ২২ বৈশাখ, গোস্বামী মহাশয় বড় অবসন্ন। কয়দিন ধরে বড় গরম পড়েছে। সমুদ্রেও হাওয়া নেই। কেমন এক গুমোট ভাব। এতে প্রভু আরও অসুস্থ বোধ করেন। তিনি পুরান তেঁতুলের সরবৎ পেয়ে কিছু স্বস্তি পান। কখন বা তিনি পাকালের জল নেন। আবার মধ্যে মধ্যে কাঁচা আম পুড়িয়ে ভাজা জিরা চূর্ণের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি পানা করে পান। এতে বেশ উপকার হয়। রোজই টেলিগ্রাম মানি-অর্ডারে টাকা আসে। ২৩ বৈশাখ, নরেন্দ্রের গোসাঁই এসে জানান, তাঁর ঘর দিয়ে জল পড়ে; তখনই মেরামত না হলে বর্ষায় থাকা দায়, কুড়ি টাকা প্রয়োজন। টাকা পেয়েই তিনি চলে যান। ইনিও অদ্বৈতবংশ-সম্ভূত গোস্বামী-সন্তান। শ্রীক্ষেত্রে আসার পর থেকে, গোস্বামীপ্রভু শিষ্যদের দিয়ে নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে তাঁর আস্তানায় প্রত্যহ তাঁকে প্রসাদ পাঠান। যখনই কোন অভাব তিনি জানান, প্রভু তা যথাসম্ভব দূর করেন। তথাপি তাঁর মধ্যে কৃতজ্ঞতার লেশ নেই; এমন একটা ভাব তাঁর মধ্যে, প্রভু যেন পদে পদে তাঁর ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করছেন।

ঐদিনই রাত্রি সাড়ে বারটায় গোস্বামীপ্রভু শিষ্যদের বলেন, 'তোমাদের আজ প্রহ্লাদ-চরিত শোনাই।' সাড়ে তিনটা বাজলে ব্রহ্মচারী বলেন, 'এখন আপনার শৌচে যাবার সময়।' প্রভু বলেন, 'বিষ প্রয়োগ এখনও বাকী। তা শুনে রাখ।' কুলদানন্দজী শুধান, 'ও রকম বলছেন কেন?' 'কেন বলছি, সময়ে বুঝবে। স্মরণ রেখ ভগবান যাঁকে রক্ষা করেন, তাঁকে কেউ বিনাশ করতে পারে না; আর ভগবান যাঁকে গ্রহণ করেন, তাঁকে কেউ ধরে রাখতে পারে না। এই ভাবটি তোমাদের অন্তরে বদ্ধমূল হলে, কখন কিছুতে উদ্বেগ হবে না।' আবার তিনি বলেন, 'তিন-তিনবার পেটে বিষ গিয়েছিল। আঁতুড়-ঘরে আফিমের মালিশ মা ভুল করে খাইয়ে দিলেন; খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেন গেণ্ডেরিয়ায় এক বাউল আর কম্বলীটোলার বাসায় এক ব্রাহ্ম সহকর্মী। আরও কত সব ঘটনা রয়েছে আমারই জীবনে, কত আর বলব? তাই বলছি, জেনে রেখ, ভগবান যখন রাখেন, তখন কিছুতেই বিনাশ হয় না।'[1]

২৪ বৈশাখ, কৃষ্ণা দ্বাদশী, শনিবার, ১৩০৬ সাল। রেবতীমোহন সেনের চিঠি আসে কলিকাতা থেকে। বিধুবাবু তাঁকে ঢাকা যেতে লিখেছেন দুজনে মিলে নোয়াখালি যাবেন বলে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা তিনি পুরী আসেন। প্রভু যোগজীবন গোসাঁইকে বলেন, 'রেবতীকে পত্রপাঠ এখানে আসতে লিখে দাও। বিধুকেও চলে আসতে লিখ। ভগবানের যা ইচ্ছা, তাই হবে; আমাদের এত ভাববার কি আছে? আমার অবশ্য এখানের কাজ শেষ হয়েছে।'

দোকানদার আর ঋণদাতারা তাঁদের হিসাব বুঝে পায়। ঋণ পরিশোধের পর হাতে থাকে আরও সাড়ে তিন হাজার টাকা। গোস্বামী মহাশয় নবকুমারবাবু আর সরলনাথকে দোকানে দোকানে পাঠান, কারও কোন পাওনা রয়ে গেল কিনা। পাওনাদারদের লোকসানের কথাই উঠে না; উপরন্তু লাভের অঙ্কে তাঁরা ফেঁপে উঠেন। তাঁদের ব্যবসার চেহারা ফিরে; আর তাঁরা অকপটে বলাবলি করেন, জটীয়াবাবার কৃপাই তাঁদের সৌভাগ্যের মূলে। যারা দূরে সরেছিল সেয়ানা ভেবে, তারা এখন কপাল ঠুকে।

জগতের নাথ—রাজ-রাজেশ্বর, তাঁর ঋণ-পরিশোধ! ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী বলেন, 'এতে যাঁরা অর্থ দিয়েছেন বা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দিতে পারেন নি, তাঁদের সকলেরই কল্যাণ হবে কি?' প্রভু বলেন, 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কল্যাণের জন্যই সব করেন। অনেকের এতে হৃদয় খুলেছে, যাঁরা সকাম দিয়েছেন, তাঁদের ধন-দৌলত হবে, তার উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আশীর্বাদ পাবে। আর যাঁরা নিষ্কামভাবে দিয়েছেন, তাঁদের পরমার্থ লাভ হবে; জাগতিক অসুবিধাও ঘুচবে।'

জড়কলি! লোকে পরমবস্তুর মর্যাদা দেয় না। ভোগকে আঁকড়ে থাকে। ত্যাগের মহিমা জানে না। তাই জড়বস্তুর মাধ্যমেই গোস্বামীপ্রভু পরমবস্তু আস্বাদন করান। ঘটি, ধুতি, টাকা ও কম্বল বিলালেন অকৃপণ হস্তে। আর উপাদেয় মহাপ্রসাদ ভোজন করালেন আকণ্ঠ।

---

১. 'আচার্য-প্রসঙ্গ', ২য় সং, পৃ ৩৮৬-৭

মহাপ্রয়াণ না মহামিলন

২৪ বৈশাখ, ১৩০৬ শনিবারে কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথিতে বেলা এগারটা নাগাদ প্রভুর শিষ্যেরা সকলে মিলে প্রসাদ পেতে গিয়েছিলেন। আসন-ঘরে গোসাঁইজীর কাছে কেউ ছিলেন না। ঐ সময় অচেনা এক বাবাজী ঘরে ঢুকে গোস্বামীপ্রভুকে অভিবাদন করে কম্পিত কণ্ঠে বলেন, 'আপনার জন্য মহাপ্রসাদ এনেছি, নিন।' প্রভু হাত পেতে একটি লাড্ডু নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে রাখতে চান। তখন আগন্তুক বলেন, 'মহাপ্রসাদ পেয়েই গ্রহণ করতে হয়।[1] বাসুদেব সার্বভৌম তো বাসিমুখে মহাপ্রভু-প্রদত্ত মহাপ্রসাদ পেয়েছিলেন।' গোসাঁইজী দো-মনা হয়ে কি ভাবেন! মহাপ্রসাদের অমর্যাদা তিনি কি করে করেন? অজ্ঞাত কুলশীলের দেওয়া, তা হোক্, রক্ষাকর্তা ভগবান। প্রহ্লাদও তো জেনে-শুনেই বিষের নাড়ু খেয়েছিলেন! আর এ যে মহাপ্রসাদ বলে তাঁকে দিয়েছেন। বাবাজী ইতস্তত করেন। প্রভু নাড়ুটি গলাধঃকরণ করেন। বাবাজীও ক্ষিপ্রপদে বের হয়ে যান।

বারটার সময় ভক্তেরা এসে দেখেন, গোসাঁইর বিষম জ্বর। জ্বরে তিনি সংজ্ঞাহীন অথচ আসনে উপবিষ্ট। ডাকাডাকি করেও তাঁর সাড়া মিলে না। শিষ্যেরা বলাবলি করেন, 'এমনটি তো আর কখনও হয় নি।' কি আর তাঁরা করেন? নামের কাছে ধর্না দেন। সংকীর্তন করতে করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। ক্রমে ক্রমে প্রভুর জ্ঞান ফিরে আসে। কেন আজ শরীর হঠাৎ এমন খারাপ হল, এ নিয়ে নিজে একটি কথাও বলেন না। তেঁতুলের সরবত আর পাকালের জল তিনি নেন। রাত্রে আম ও মহাপ্রসাদী চিড়া নেন।

২৮ বৈশাখ, গোসাঁইর শরীর একই রকম। তা সত্ত্বেও দৈনন্দিন কার্যের কোন ব্যতিক্রম নেই। ঊষা-কীর্তন, গ্রন্থপাঠ সবই চলে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। আর প্রভু আছেন এক ঠায় আসনে বসে। পাঠের পর তিনি ব্রহ্মচারীকে বলেন, 'তোমাদের মাথা নীচের দিকে আর পা উপরের দিকে রাখলে কেমন হয়?' তাঁর প্রশ্ন শুনে ভক্তেরা বিচলিত হন। তিনি তখন খুলে বলেন, '"রামায়ণ" গ্রন্থখানা আমাকে এইমাত্র জানিয়ে গেলেন, তাঁকে উপর-নীচু করে রাখা হয়েছে।' ব্রহ্মচারী কক্ষান্তরে গ্রন্থাধারের নিকটে গিয়ে দেখেন, যথার্থই তাই। তিনি গ্রন্থখানি যথাযথভাবে রেখে আসেন।[2]

ফরিদপুরের অন্তর্গত পলিতা গ্রামের ব্রজনাথ অধিকারী ঐ সময় গুরু-দর্শনে শ্রীক্ষেত্রে আসেন। নমঃশূদ্রাদি লোকদিগকে দীক্ষাপ্রদান করা ইঁহাদের পুরুষানুক্রমিক প্রথা যদিও তাঁরা অব্রাহ্মণ। জগবন্ধু মৈত্র ব্রজনাথ অধিকারীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলেন, 'তিনি কি করে দীক্ষাপ্রদান করেন?' তিনি হীন-বর্ণকে দীক্ষা দিয়ে পতিত হয়েছেন। তাঁর স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি উচ্চবর্ণের আহার করা

---

[1] শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপ্যানীতং বা দূর-দেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণাঃ॥

—পদ্মপুরাণ

অর্থাৎ শুষ্কই হোক, পর্য্যুষিত হোক আর দূরদেশ থেকে আনীত হোক, মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করবে। এতে কাল বিচার নেই।

[2] গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত।

সমীচীন নয়।' এই সকল মন্তব্য গোসাঁইজীর কর্ণগোচর হলে তিনি জগদ্বন্ধুবাবুকে বলেন, 'কাহার কি অধিকার আছে না আছে, তাহা তুমি কি জান? ধর্মের পোষাক পরে বুঝি অভিমান হয়েছে?' প্রভু শিষ্যদের বলেন, 'নিত্যানন্দপ্রভু হীনবর্ণজনের উদ্ধারের জন্য উৎকল দেশ হতে কয়েকজন কায়স্থকে বিশেষ শক্তিসঞ্চার করে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন, ব্রজনাথ তাঁদেরই বংশধর। দীক্ষাদানে তাঁদের অধিকার রয়েছে বলেই তাঁদের পদবী "অধিকারী।"' এই বলে তিনি তাঁর কোন কোন আহার্য-বস্তু ব্রজনাথকে রান্না করে দিতে আদেশ করেন। প্রভু তখন আরও বলেছিলেন, 'ধর্ম ও সমাজ আলাদা। গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে একে অন্যের স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি খেলে ধর্মের কোনও হানি হয় না। তবে সামাজিক অনুষ্ঠানে ঐরূপ না করাই ভাল।' কোনও আচরণ দ্বারা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হয়, ইহা প্রভুর অভিপ্রায় নয়। সুতরাং যিনি যে সমাজে আছেন, তিনি সেই সমাজের বিধি-নিষেধ পালন করে স্বীয় ধর্ম পালন করবেন। তবে গুরুগৃহে পংক্তি-বিচারের কোন আবশ্যকতা নেই। ইহা সদাচারসম্মত।[১]

শান্তিসুধা দেবী জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবা আমাদের যাঁরা আছেন, তাঁরা সকলে কি অপরের মনের কথা বুঝেন? আমার সম্মুখে কেউ এসে দাঁড়ালে, আমি তাঁর অভিপ্রায় বুঝি।' প্রভু হেসে বলেন, 'সকলে কি আর টের পায়? তোর মত বোকা হলে পায়। আনুগত্য না এলে এসব হয় না।'

ঐদিন সন্ধ্যায় রেবতীমোহন সেন শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছেন। মহাপ্রসাদ পেয়ে একটু বিশ্রাম করে তিনি কীর্তনের আসরে এসে বসেন। গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'রেবতী, গাও।' রেবতীবাবু গাইলেন—

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক-শরীর,
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর।
আর কবে নিতাইচাঁদে করুণা করিবে,
সংসার বাসনা মোর, কবে তুচ্ছ হবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন,
কবে হাম হেরব সো শ্রীবৃন্দাবন।
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি,
কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি।
রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ,
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।

'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক-শরীর' এই পদটি গাইবা মাত্র গোসাঁইর শ্রীঅঙ্গে শুরু হয় মুহুর্মুহু পুলক-কম্পন-শিহরণ। 'হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর', এই পদ যখন গায়ক গাইলেন, বিগলিত ধারায় প্রভুর বুক ভেসে যায়। 'আর কবে নিতাইচাঁদে করুণা করিবে' গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান আর উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু করেন, অথচ অপরের সাহায্য ছাড়া তিনি চলাফেরাই করতে পারতেন না। নাচতে নাচতে গোসাঁইজী ভাবে বিভোর হয়ে নিজের বহির্বাস খুলতে চাইলেন। খুলতে না পেরে ছিঁড়ে ফেলে রেবতীবাবুর দিকে ছুঁড়ে দেন। জটা বাঁধার দড়িগাছিও তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারেন। রেবতীবাবু সশ্রদ্ধচিত্তে তা তাঁর মাথায়

---

১. অমৃতলাল সেনগুপ্ত-প্রণীত 'আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', পৃ ৫০০-১।

জড়িয়ে নেন। প্রভু তারপর আঙুল দিয়ে ইসারা করে বলেন, 'ঐ দেখ, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কীর্তন শুনতে এসেছেন।' একটু পরে নাচ বন্ধ করে বসে পড়ে বলেন, 'বসে বসে গাও, মধুর করে গাও।' রেবতীবাবুর সেদিন অপূর্ব ভাব, আর কণ্ঠে যেন মধু ঝরে। গান শেষ হতেই গোসাঁই বলেন, 'সরলনাথ, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বলেছেন, যিনি গান গাইলেন, তাঁকে এক জোড়া লুই এনে দাও।' কীর্তনের পর সরলনাথ লুই এনে দিলে গোসাঁই নিজের হাতে রেবতীবাবুকে তা দেন। তারপর গোস্বামীপ্রভু যোগজীবন গোসাঁইকে বলেন, 'রেবতী আমাকে কত কীর্তন শুনিয়েছেন; কীর্তনীয়া বিদায় দিতে হয়। তাঁকে একখানা ভাল পশমী কাপড় এনে দাও।' গুরুর শ্রীমুখে এই কথা শুনে সমবেত শিষ্যেরা চমকে উঠেন। 'কীর্তনীয়া বিদায়' বলার তাৎপর্য কি? তবে কি ঠাকুর সংকীর্তন রূপ মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিলেন?' বস্তুত তিরোভাবের পূর্বে প্রভুর এটি শেষ নৃত্য।[১]

কিরণচাঁদজী বলেছেন, 'মহাপ্রভু যে আমাদের সাধ্য, তা-ই ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন।'

৩০ বৈশাখ, ১৩০৬ অক্ষয় তৃতীয়া। ধামায় করে আম ও তালশাঁস আসে। প্রভুর কাছে এনে রাখা মাত্র তিনি সব নিবেদন করে, দুটি আম ও একটি তালশাঁস গ্রহণ করেন। শিষ্যদের তিনি বলেন, 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সব গ্রহণ করেছেন।' রেবতীবাবু সুললিত কণ্ঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করলেন। গোসাঁইর শরীর বড় দুর্বল ও অবসন্ন। প্রয়াগের কুম্ভমেলা থেকে বিশ্রামের জন্যও হাত-পা মেলে গা-টানাও দেন না। এই কঠোর নিয়ম পালন করে চলেছেন দেখে মুক্তকেশী দেবী বলেন, 'এখন আপনার শরীর ভাল নয়। একটু শয়ন করলে দেহের অবসন্নতা কমবে। আবার দুর্বলতা কাটলে, নিয়ম মেনে চলবেন।' গোসাঁইজী তদুত্তরে বলেন, 'যেদিন আসান ছাড়ব বা শয়ন করব, সেদিন আর এই দেহে থাকব না।'

গোস্বামীপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানের সময় রাখাল রায়চৌধুরী পরলোক গমন করেন। এক রজনীতে তিনি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে প্রভুর কাছে উপস্থিত হন। জীবিতকালে তিনি এক প্রতিবেশীর জমি চক্রান্ত করে আত্মসাৎ করেছিলেন। গোসাঁই তাঁকে বলেন, তাঁর কর্মফল তাঁকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তাঁর (গোসাঁইর) কিছু করার নেই।

৩১ বৈশাখ, ১৩০৬। এক সপ্তাহ কেটে যায়। শনিবার আবার ঘুরে আসে। প্রভুর শরীর বড় অবসন্ন। সকালে চা পান করতে করতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। চায়ের বাটি আসনের পাশে গড়িয়ে পড়ে। খানিকবাদে জ্ঞান ফিরে। দুপুরে আবার তিনি শৌচে গিয়ে গোঙান। তা সত্ত্বেও কথকঠাকুরকে কি দিতে হবে, তা তিনি বলে দেন। চারটায় সময় আবার শৌচে গিয়ে প্রলাপ বকেন, 'কুকুর দেখে ব্রহ্মচারী লাঠি ছুঁড়ে মারে কেন? এমনি তো তাড়িয়ে দেওয়া যায়। দারোয়ান দরজা ছেড়ে ভিতরে গিয়েছে বলে অনুযোগ করার কি আছে? কতক্ষণ সে একঠায় বসে থাকবে? ওরাও তো আরাম করবে। সারাদিন কি একভাবে বসে থাকতে পারে? জীবে দয়া করবে। দয়ার সমান ধর্ম নাই।'

শৌচে বসেই প্রভু ঔষধ খেলেন। বিষম জ্বর। প্রস্রাব হয় নি। শিষ্যেরা সকলে শঙ্কিত। এই সাত-আট দিনে ঠাকুরের শ্রীদেহ এত খারাপ হল কেন? ঐদিন রাত্রে

---

[১] 'আচার্য-প্রসঙ্গ', ২য় সং, পৃ, ৩৮৯-৯০।

দাদাগোসাঁই পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবা, হঠাৎ আপনার শরীর এত খারাপ হল কেন? সেদিন বসে বসে নাম করছি, দেখি একটি লোক আপনাকে বিষ দিচ্ছে। তাকে আরও আমি দেখেছি। ভাবলাম এসব হয়ত কল্পনা।' গোস্বামীপ্রভু সুস্মিত বদনে তাঁকে বলেন, 'ঠিকই দেখেছিস। কারও নাম বলবি না। জানলেও চেপে যাবি। জঙ্গম বিষ দিয়েছিল। ঐ বিষ এক রতি খেলে সঙ্গে সঙ্গে হাতিও মরে যায়। সাত-আট দিন হল—ঐদিন ছিল শনিবার, এক বাবাজী এসে মহাপ্রসাদের নাম করে আমাকে একটি নাড়ু দিয়ে বলেন, "মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যম্।" তখন তোমরা কেউ কাছে ছিলে না। আমি তখন ভাবি, প্রহ্লাদকেও তো বিষ খাইয়েছিল। তাঁর তো তাতে মৃত্যু হয় নাই। প্রসাদ বলে যখন আমাকে দিয়েছে তা গ্রহণ করি, যা হয় হবে। মহাপ্রসাদের অমর্যাদা করি কি করে? এই ভেবে প্রণাম করে অর্ধেক খেয়ে দেখি, এর অভ্যন্তরে কাঁচা পাতা রয়েছে। ভাবি পুদিনার মত কিছু হবে। এক ঘণ্টা পর আমার উপর এর ক্রিয়া শুরু হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এসে আমাকে বলেন, "জেনে-শুনে কেন বিষের নাড়ু খেলে?" আমি তখন তাঁকে প্রণাম করে বলি, "আমি কোন অপরাধ করি নাই। আপনার কৃপা থাকতে এতে কি করবে? মহাপ্রসাদের মর্যাদা না দিয়ে আমি কি করি?" তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ভিতরে জ্ঞান থাকে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব লোকনাথদেবকে আহ্বান করলেন। তিনি এসে তিন ঘণ্টার চেষ্টায় চোদ্দ আনা বিষ পান করলেন। সেই সমুদ্র-মন্থনের সময় যেমনটি করেছিলেন। তারপর মনসা দেবী এসে শান্তিবারি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন, তাতে জ্বালা-যন্ত্রণা সামান্যই রইল।' যোগজীবন জিজ্ঞাসা করেন, 'লোকনাথ আবার দু-আনা রেখে গেলেন কেন?' প্রভু বলেন, 'তা তিনিই জানেন। লোকনাথ বলে যান, "যারা বিষ দিয়েছে, তারা এবার বুঝবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!"' গোসাঁইজী করজোড়ে তাঁকে বলেন, 'আমার যা হবার হয়েছে। এবারটি ও'দের ক্ষমা করুন।' লোকনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন, 'ও-সব তোমার ভেবে কি হবে? যা করার প্রয়োজন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবই করবেন।' তখনই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'পাষণ্ডদের সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে।'

১ জ্যৈষ্ঠ হতে ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। যারা বিষ দিয়েছিল, তাদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এই মারাত্মক বিষ হজম করে কি ভাবে গোসাঁই এখনও বেঁচে আছেন! আশ্রমের লোকের সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখা হলেই তারা নানা ফিকির করে প্রভুর খোঁজ-খবর নেয়। 'ভাল আছেন' শুনে ওদের মুখ কাল হয়ে যায়। তারা অধৈর্য হয়ে উঠে। রাত্রি দশটায় একজন পরিচিত সাধু সরাতে করে তিন-চারটি আম নিয়ে এসে বলে, 'আমি গোসাঁইকে দর্শন করে এই আম মহাপ্রসাদ তাঁকে দিব।' সারদাকান্ত বলেন, 'এত রাত্রে কেন? আজ দেখা হবে না।' লোকটি আম নিয়ে চলে যায়। সারদাকান্ত গুরুকে গিয়ে বলেন, 'আমার সন্দেহ হল, তাই তাকে সাক্ষাৎ করতে দেই নি।' প্রভু তাঁকে বলেন, 'আমি এখানে থাকায় এক শ্রেণীর লোকের মর্যাদা ও সম্মানের হানি হচ্ছে তাই ইহারা "জঙ্গম" বিষ খাইয়েছে।' অপরিচিতের দেওয়া জিনিস আর নেওয়া হয় না। নরেন্দ্রের অধিবাসী গোস্বামীপ্রভুর জ্ঞাতি-খুড়াও একদিন মহাপ্রসাদের নাম করে গোসাঁইজীকে আম পাঠিয়েছিলেন। তা-ও ফেরত দেওয়া হয়। প্রভুর আশ্রম থেকে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে তাঁর জন্য মহাপ্রসাদ পাঠান হত। অমৃতলাল সেন মহাশয় পরদিন তাঁর কাছে মহাপ্রসাদ নিয়ে গেলে, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর পাঠান আম মহাপ্রসাদ কেন রাখা হল না এর জন্যে কৈফিয়ৎ চান। বিনীত

হয়ে অমৃতবাবু নরেন্দ্রের গোসাঁইকে বলেন, 'মহাপ্রসাদের নাম করে এক বাবাজী দশ-বার দিন পূর্বে ঠাকুরকে বিষের নাড়ু দিয়েছিলেন। তাই এখন বাইরে থেকে "মহাপ্রসাদ" বলে কেউ কিছু নিয়ে এলে, তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়।' এ-কথা শুনে প্রভুর সেই জ্ঞাতি-খুড়া বলেন, 'বিষ আবার কে দিবে? বিষ খেলে কি কেউ এতদিন বেঁচে থাকে? এ-সবই তোমাদের মনগড়া কথা।' অমৃতবাবুর মুখে নরেন্দ্রের গোসাঁইর এই উক্তি শুনে ব্রহ্মচারী ও সরলনাথ তখনই তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, 'আপনি আমাদের ঠাকুরের জ্ঞাতি-খুড়া। কোথায় আপনি ঘটনাটি শুনে দুঃখ করবেন, তা না করে চক্রান্তকারীদের হয়ে সাফাই গাইছেন। আপনিও যে ওদের সংগে আছেন, তা আমাদের বুঝতে বাকী নেই। ঠাকুর আমাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছেন। এই ষড়যন্ত্রের ভিতর কারা কারা রয়েছেন, আমাদের অজানা নেই। আগামী দিন থেকে মহাপ্রসাদ নিয়ে আপনার কাছে আমাদের আশ্রম থেকে আর কেউ আসবেন না।'

সরলনাথ বেপরোয়া। জগন্নাথদাস বাবাজীর আস্তানায় গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'গোপালদাস বাবাজী আছেন?' তিনি উত্তর পান, 'না।' সরলনাথ ভিতরে ঢুকে দেখেন, গোপালদাস বসে আছেন। সরলনাথ তাঁর দিকে এমনভাবে কটমট করে তাকান যে কেউ তাঁকে একটি কথা বলতে সাহস করে না। বের হবার মুখে পূজারী বলরামদাসকে দেখে, সরলনাথ তাঁকে ধমক দিয়ে বলেন, 'তুমি কি উদ্দেশ্যে ঐদিন দুপুরে মহাপ্রসাদের নাম করে আমাদের আশ্রমে গিয়েছিলে? বল্‌ ব্যাটা। তোর সংগে আর কে ছিল?' লোকটি ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলে ফেলে, 'আমি তো লাড্ডু দেই নি। নরসিংদাস দিয়েছে। আমি পান-প্রসাদ দিতে গিয়েছিলাম।' কয়েকজন পরিচিত লোক এই স্বীকার-উক্তির সময় উপস্থিত ছিলেন। পান্না ঘোষের পরিচিত দুজন গুণ্ডা স্বীকার করে, জগন্নাথদাস বাবাজী কলিকাতা থেকে ওদের ভাড়া করে এনে বাবাজীর ছদ্মবেশে 'জগন্নাথ-বল্লভ' মঠে রেখেছেন।

প্রভুর শিষ্যেরা একদিন গংগাধর খুঁটিয়াকে জেরা করতেই সে কেঁদে ফেলে বলে, 'আমার সর্বনাশ কর না। আমি এতে নেই।' ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জগতবাবু বলেন, 'চোদ্দ বছর শ্রীঘর বাস কে আটকায়?' দারোগা নারায়ণবাবু গোস্বামীপ্রভুকে বারবার অনুরোধ করেন, দুরাশয়দের নাম বলতে। কিন্তু তিনি বলেন না। জগতবাবু, কিশোরীবাবু, যোগজীবন, সরলনাথ ও অন্যান্য ভক্তদের গোস্বামীপ্রভু বলেন, 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আমাকে দেখিয়েছেন, কারা কারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। প্রায় পঁচিশ জন সাধু এর মধ্যে রয়েছেন। ধর্মজগতে প্রতিষ্ঠা এক বিষম ব্যাপার। প্রতিষ্ঠার জন্য লোক না করতে পারে এমন কর্ম নাই। সাধুদের মধ্যে অনেকেই কত না কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিষ্ঠার যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দেন। তাঁদের ইহকাল-পরকাল যায়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবই যা করার করবেন। আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করব, ওঁদের যাতে কল্যাণ হয়।'

প্রভুর শিষ্য মেদিনীপুরের ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে গোসাঁই বলেন, 'মাতা-পিতা বর্তমান থাকলেও শ্রীক্ষেত্রে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করতে হয়, কারণ পিতৃপুরুষগণ মহাপ্রসাদের পিণ্ডের জন্য সর্বদা হাত পেতে আছেন। সুতরাং অন্যান্য পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করতে হয়।' মস্তকমুণ্ডন করে পরদিন ক্ষেত্রবাবু যথাবিধি শ্রাদ্ধ করেন। প্রভু তাঁকে আরও বলেন, 'প্রত্যেক দেবমন্দিরে প্রণাম করার সময় যথাসাধ্য প্রণামী দিতে হয়। রাজা, সাধু ও দেবস্থানে রিক্তহস্তে যেতে নাই।'

গোসাঁইর শরীরে বড় জ্বালা। কালজাম আর বেদানা শরীরে চায়। জগন্নাথবল্লভের বাগানে খোঁজা-খুঁজি করে অমৃতবাবু মাত্র ছটি কালজাম সংগ্রহ করেন। কিশোরীবাবুর পরিচিত এক ব্যক্তি ঐ সময় এক ঠোঙা কালজাম পাঠান। বহু চেষ্টা করেও আর পাওয়া যায় না। বেদানা মিলে না। পুরীর উইলসন হোটেলে বেদানার রস বোতলে কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রভু অনুমতি দেন না। তিনি বলেন, 'আমি শাস্ত্র-সদাচার প্রতিষ্ঠা করতে চাই আর আমিই তা লঙ্ঘন করব? তা হয় না।' ব্রহ্মচারী বলেন, 'কয়েক বছর পূর্বে গ্রেট ইস্টার্নের পাঁউরুটিও তো নিয়েছেন।' প্রভু বলেন, 'তখন তা নিয়েছি, এখন হয় না।'

গোসাঁই বলেন, 'ভিতরটা পচে গেছে। এই যে কাশ বের হয়, তাও মারাত্মক বিষ। এতে মাছি বসার পর যদি খাদ্যে বসে, তাতেও প্রাণহানি ঘটতে পারে। কফ তোমরা পুড়িয়ে ফেল।' কয়েকদিন বাদে প্রভু আবার বলেন, 'পনর আনা বিষই বের হয়ে গেছে।' সরলনাথ গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ঠাকুর আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি আপনার দেহনাশ হতে পারে?' প্রভু তাঁকে বলেন, 'না, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও পারেন না।'

১৬ ও ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। গোস্বামীপ্রভু চিরদিনের বসবাসের জন্য শ্রীক্ষেত্রে আসেন নি। অথচ কয়েকজন সাধু তাঁদের প্রতিষ্ঠানাশের ভয়ে তাঁকে বিষ দিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনলেন। যোগজীবন বলেন, 'বাবা, ওরা এখনও কি করে তার ঠিক নেই। আমাদের কলিকাতা ফিরে যাওয়া ভাল।' প্রভু তাঁকে বলেন, 'তোরা এত ভাবছিস কেন? স্বয়ং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দিনে তিনবার করে আমার খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। আমার ভয় কি? অন্যত্র গেলে কি রক্ষা পাব? একটি কাঁটা ফুটেও তো মৃত্যু ঘটতে পারে। এখানে হাজার চেষ্টা করেও, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারবে না। তোরা যাবার জন্য প্রস্তুত হ। ঋণ পরিশোধের পূর্বে আমার কোথাও যাবার তো কথাই উঠে না।' কিশেরীবাবু বলেন, 'যে সামান্য ঋণ রয়েছে, তা পরিশোধের জন্য আমরা গ্যারাণ্টার থাকব।' প্রভু বলেন, 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছা ছাড়া এক পা-ও এগোতে পারব না।'

এই পরিস্থিতিতেও চলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রঙ্গরস। গাঁদাল পাতার ঝোল রক্ত শোধনের অনুকূল। মুক্তকেশী দেবী সযত্নে তা রাঁধেন। গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'আপনার গাঁদালের ঝোল সবটাই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছেন। এভাবে তিনি দয়া না করলে কি আর বাঁচি!'[১]

প্রভু সারদাকান্তকে বলেন, 'শরীরটা দিন দিন বড় দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তোমার ইষ্টমন্ত্র জপ করে, তুমিই এখন থেকে পূজা কর আর লুঠ দিও।' যোগজীবনকে বলেন, 'বিষ শরীরের মাংসপেশী বিনষ্ট করে শিরা ও ধমনীসকল আক্রমণ করে যদি অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করে তবে আর শরীর থাকবে না।' এর মাঝেও বলেন, 'গণেশ ছড়িদারের মেয়ের বিয়ে, তাকে এক-শ টাকা দিস।' প্রভু আরও বলেন, 'সামান্য যা বিষ রয়েছে, তা রক্তে মিশে গেছে।' রাত্রে একটি শিষ্য গোস্বামীপ্রভুর পাশে বসে বাতাস করছিলেন। প্রভু অর্ধবাহ্যাবস্থায় বলেন, 'এ কে? মনে হয় যেন যমের কিঙ্কর! তোমরা যাকে-তাকে দিয়ে বাতাস করাও কেন?'

রাত্রি দশটায় (১৭ জ্যৈষ্ঠ) প্রভু উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেন, 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম,

---

[১] 'আচার্য প্রসঙ্গ', পৃ. ৪১৮।

ওঁ রামঃ।' পরদিন কিশোরীবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'ঐ কথার তাৎপর্য কি?' গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'গঙ্গার বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ইচ্ছা হয়। তখনই দেখি দেবতারা মিলে হীরা-মাণিক্য-খচিত একখানা খাট নিয়ে আসেন। আমাকে বলেন, "এটির উপর উঠে শুয়ে পড়ুন, বসে যাওয়া সম্ভব হবে না।" আমি তাই করি। গঙ্গাতীরে পৌঁছে ওঁদের বলি, "আমাকে অন্তর্জলী করুন।" খাটসুদ্ধ আমাকে গঙ্গায় নামাতেই, আমি ও-রকম বলে উঠি। আমার শরীর শীতল হয়ে গেল।'[১]

২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। ঋণের টাকা আজ কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ হল। অনেক টাকা উদ্বৃত্ত রইল। আজই মণি মজুমদারের কাছে জাহাজের ভাড়া বাবদ ১৮০০্ টাকা টেলিগ্রাম মানি-অর্ডারে পাঠান হয়। প্রভু নরেন্দ্র-সরোবরের পার থেকে টবে করে একটি তুলসীগাছ আনালেন। আশ্রমে টবটি আনতেই গোসাঁই বলেন, 'আমার মাথার কাছে রেখ।' ভক্তেরা কেউ কেউ বলেন, 'বাইরে রাখলে ভাল থাকবে।' তদুত্তরে প্রভু বলেন, 'এখানেই থাক, নরেন্দ্রের তুলসী নরেন্দ্রেই যাবেন।'

জটীয়াবাবা চলে যাবেন শুনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মালী ও সোয়ার আসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বলেন, 'মালী, তুমি আমার চিরদিনের মালাকার। তুমি আমাকে চিরদিন ফুল যোগাবে।' মালী বলে, 'প্রভো, আমি নিঃসন্তান।' গোসাঁই তাঁকে বলেন, 'এবারই তোমার ছেলে হবে।' সূপকারকে প্রভু বলেন, 'সোয়ার, তুমি আমার চিরদিনের সূপকার। তুমি আমাকে চিরদিন মহাপ্রসাদ যোগাবে। তোমার ছেলে বড় সোয়ার হবে।' গোস্বামী মহাশয়ের এই কয়দিনের কথার খেই খুঁজে পান না ভক্তেরা। প্রভুর খাটে শুয়ে পড়া তো শুভ সূচনা নয়! অন্তর্জলীর কথা-ই বা উঠে কেন? তুলসী গাছ সম্পর্কে-ই বা এ কি রকম উক্তি? মালাকার ও সূপকারকে যা আদেশ করলেন, তার-ই বা সামঞ্জস্য কোথায়? এ-সব কি স্বেচ্ছায় দেহরক্ষার পূর্বাভাস!

রাত এগারটায় জগদ্বন্ধু মৈত্র ও অশ্বিনী মিত্রকে গোস্বামী মহাশয় ডেকে পাঠান। দুপুরে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দুজনের মধ্যে হয় কথা-কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতির উপক্রম। প্রভু তাঁদের বলেন, 'এইমাত্র শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রকাশিত হয়ে বললেন, "রাগ বড় চণ্ডাল, তুমি ওদের কাছে ক্ষমা চাও।"' তিনি উভয়কে প্রণাম করে বলেন, 'তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।' জগদ্বন্ধুবাবু বলেন, 'আমি অশ্বিনীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি।' অশ্বিনীবাবু জগদ্বন্ধুবাবুর পায়ের ধূলি নেন। পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। প্রভু তখন বলেন, 'তোমাদের সকলের ভার আমি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উপর দিলাম। তিনিও তা অঙ্গীকার করলেন।' জগদ্বন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাদের চিত্তের এরূপ দুর্দশা কি যাবে না?' গোসাঁই বলেন, 'নিশ্চয়ই যাবে। সকলেই শান্তি পাবে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম অভ্যাস করতে হয়।' গোস্বামীপ্রভুর চাল-চলন সব বিচিত্র, বিস্ময়কর। যাত্রার পূর্বে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এ কি যাত্রা না মহাযাত্রা?

প্রভু বলেন, 'আমার কয়েকটি কাজ এখনও বাকী রয়েছে; তা অবশ্য এই দেহে হয়ে উঠবে না। যথাসময়ে তা হবে। প্রেম-ভক্তি লাভই জীবের একমাত্র লক্ষ্য।'

প্রভু কথায় কথায় বলেন, 'নামব্রহ্ম ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হক।' শ্রীধর বলেন, 'ঠাকুর, আমার ফরিদপুরকে আশীর্বাদ করুন।' প্রভু বলেন, 'শ্রীহট্ট-ফরিদপুর

---

১. 'আচার্য প্রসঙ্গ', পৃ ৪১৮।

সকলের আগে জাগবে।'

২২ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথি—১৩০৬। ভোরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শশীবাবু আসেন। প্রভু তাঁকে বলেন, 'আপনি সরল বিশ্বাসী; বিচার করে চলবেন।' তাঁকে সাধুসঙ্গ করতে বলেন এবং সাধু চিনবার উপায় বলে দেন। শশীবাবুর কাঁধে গোস্বামী মহাশয় তাঁর হাত রাখতেই, তিনি কেঁদে আকুল হন। শ্রীমন্দিরে গিয়ে তিনি দেখেন গোসাঁই যেন স্বয়ং শ্রীশ্রীজগন্নাথ!

দুপুরে প্রভু শৌচে গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এলে, অজ্ঞান হয়ে তিনি আসনে শুয়ে পড়েন। কীর্তন চলে। কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান ফিরে আসে। রাত্রি আটটায় পুরোপুরি জ্ঞান হয়। কটা বেজেছে জানতে চান। জগদ্বন্ধুবাবু ও সরলনাথ তাঁকে শৌচাগারে নিয়ে যান। দাঁড়ান অবস্থায় পায়খানা হয়। ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে ঘরে নিয়ে আসতেই প্রভু বলেন, 'সারদা, আসনের বাইরে একখানা চাদর বিছিয়ে দাও।' ব্রহ্মচারী তাঁকে বলেন, 'আসনে এসে বসুন।' তেজের সঙ্গে গোসাঁই বলেন, 'যা বলি, তা-ই কর।' সারদাকান্ত চাদর বিছিয়ে দিতেই ওখানে তিনি শুয়ে পড়েন। জগদ্বন্ধুবাবু বলেন, 'সারাদিন তো আজ কিছুই পান নি। ঠান্ডা কিছু নিবেন? ডাব, ছানা, পাকাল?' প্রভু বলেন, 'না।' 'পাতলা করে একটু চা?' 'দাও।' কিশোরীবাবু বলেন, 'আমি বানিয়ে আনছি।' তাঁর অনেক দিনের সাধ গোসাঁইকে চা বানিয়ে দেন। দু-চুমুক খেয়েই দুই হাত তুলে কাকে প্রণাম করেন। তারপর সটান শুয়ে পড়েন। রাত্রি তখন নটা বিশ মিনিট—রেবতী নক্ষত্র। মারাত্মক বিষ উদরসাতের ঠিক এক চান্দ্র-মাস পর গোস্বামীপ্রভু অনন্তলীলায় প্রবেশ করেন।

যে দিব্যজ্যোতি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে সার্ধ-আটান্ন বছর পূর্বে আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছিল ও বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছায় তাঁর মধ্যেই আজ আবার সেই সত্তা মিশে গেল। একি মহাপ্রয়াণ না মহামিলন!

মহাপ্রভুর ও গোস্বামীপ্রভুর মহাজীবন অনুধাবন করে উভয়ের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের আবির্ভাব, সাধনলাভ ও প্রকট-লীলা সংবরণের মধ্যেও বিস্ময়কর এক সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। তাঁরা দুজনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন নদীয়ায়, দীক্ষালাভ করেন গয়ায়, আর অপ্রকট হলেন শ্রীক্ষেত্রে।

পুরীর প্রখ্যাত চিকিৎসক এসে পরীক্ষা করে বলেন, 'জীবনের কোনও লক্ষণই পাচ্ছি না, তবে শুনেছি মহাপুরুষ ও মহাত্মাদের সমাধি অবস্থায়ও জীবনের স্পন্দন—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কলাকৌশলে ধরা পড়ে না। আমার অনুরোধ—তাড়াহুড়া করে কিছু না করে অন্তত আঠার ঘণ্টা অপেক্ষা করে, প্রয়োজনবোধে যা করতে হয় করবেন।'

শিষ্যদের বুকে উঠে হাহাকার। একাধারে গুরু, মাতা, পিতা, বন্ধু, সুহৃদ, পতি আজ তাঁদের সর্বহারা করে অপ্রকট হয়েছেন। রাতভোর কীর্তন চলে। গীতা, ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। বাইরে ঘুটঘুটে আঁধার। বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দ আর বারিবর্ষণ। প্রভুর বিরহ-ব্যথায় প্রকৃতি যেন গুমরিয়ে গুমরিয়ে কাঁদে।

যোগজীবন গোসাঁইকে আসন-ঘরে না দেখে নবকুমারবাবু যান তাঁর খোঁজে। তাঁর ঘরে গিয়ে বাগচী মহাশয় দেখেন, শোকের জ্বালায় যোগজীবন নিজের

লেঙ্গুট কড়িকাঠের সঙ্গে বাঁধছেন—উদ্বন্ধনে জীবন নাশের চেষ্টায়। নবকুমারবাবু তাঁকে প্রবোধ দেন ও তাঁকে নিয়ে আসেন আসন-ঘরে। যোগজীবন পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে থাকেন। নবকুমারবাবু সতীর্থদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কি পরিমাণ গব্যঘৃত ও চন্দনকাঠ প্রয়োজন, এ নিয়ে ফর্দ ধরেন। এ-সব আলাপ কিশোরীবাবুর কানে যেতেই তিনি চমকে উঠেন! শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পবিত্র দেহাবশেষ অজ্ঞতাবশত দাহ করে স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তী জীবনে যে কি আফশোষ করেছেন, কিশোরীবাবুর তা জানা ছিল। তিনি তখনই দাদা-গোসাঁইকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ঠাকুর তাঁর অন্ত্যেষ্টি ব্যাপারে আপনাকে কখন কি কোনও নির্দেশ দিয়েছেন?' দাদা-গোসাঁই বলেন, 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, আপনার কথায় এখন মনে পড়ল—কয়েক বছর পূর্বে গেণ্ডারিয়ায় বাবা আমাকে একদিন বলেছিলেন, "আমি সন্ন্যাসী। আমার দেহের সমাধি দিস্। এই কথা এখন গোপন রাখিস।"'

শান্তিসুধার অবস্থা বড় করুণ। হৃদয়-বিদারক সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায় তাঁর বাহ্যজ্ঞান। জ্ঞান ফিরে আসতে বিলাপ করেন, 'আমার আর বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? বাবা, আপনি তো কাউকে কখন ফাঁকি দেন নি! তাহলে আমাকে না জানিয়ে কেমন করে চলে গেলেন?' গুরুর বিয়োগব্যথা সহ্য করতে পারবেন না ভেবে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ বিষ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। প্রভুর এমনই খেলা, তাঁর লীলায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ কয়েকজন শিষ্যের মধ্যে শোকের জ্বালা প্রশমিত হয়। প্রভুর দেহরক্ষার পরই কুলদানন্দ সংগৃহীত বিষ ছুঁড়ে ফেলে দেন। কিন্তু অশ্বিনী মিত্র শোকে অভিভূত হয়ে বিলাপ করে বলেন, 'ঠাকুর, বিষ খেয়ে তোমার জীবন-অবসান ঘটল! তোমাকে যদি আমি একটুও ভালবেসে থাকি, তাহলে মরণ আমার কাছেও যেন এইভাবেই আসে!'

স্বভাব-চঞ্চল বানরেরা এসে প্রভুর শ্রীদেহ ঘিরে ভিড় করে। স্থির, শান্তভাবে তারা গোস্বামীপ্রভুর পানে তাকিয়ে থাকে। তাদের দেওয়া খাবার তারা স্পর্শও করে না।

ভূতানন্দ স্বামী এসে দাদা-গোসাঁইকে প্রবোধ দিয়ে বলেন, 'গোস্বামীপ্রভু মানুষ নন। তিনি সদ্‌গুরু-অবতার। তিনি জন্ম-মৃত্যুর অতীত। তাঁর ইচ্ছায়ই সব হয়। পুরুষোত্তমে যে তিনি দেহ রাখবেন, তা তিনি নিজে ও আপনার ঠাকুরমা জানতেন এবং আমিও জানতাম। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সঙ্গে মিশে গেছেন যেমন মহাপ্রভু মিশেছেন গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।'

২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬—ভোরে জমির খোঁজে চারদিকে লোক ছোটে। নরেন্দ্রের উত্তরপাড়ের জঙ্গল সাড়ে তিন-শ টাকা প্রতি একর হিসাবে চোদ্দ শত টাকা মূল্যে চার একর জমি কেনা হয় এবং বেলা দশটায় বায়নাপত্র সই হয়। টাকার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই যেন গোস্বামীপ্রভু করে রেখেছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান দীনবন্ধু পট্টনায়ক, যিনি বরাবর প্রভুর বিরোধিতা করেছিলেন, তিনিই এখন অগ্রণী হয়ে সমাধির ব্যবস্থা করেন। হরিশবাবু এই সময় পুরী পৌরসংস্থার অস্থায়ী চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি পৌর এলাকার মধ্যে গোস্বামীপ্রভুর সমাধির অনুমতিপত্র ঐদিনই সঙ্গে সঙ্গে সই করে দেন।

অপরাহ্নে নরেন্দ্রের সেই তুলসী টব-সহ প্রভুকে মিছিল করে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কত যে কীর্তনের দল এসে যোগ দেয় এবং সমাধিক্ষেত্রে

আশ্রমের কীর্তনের সঙ্গে যায়। পথে তিল ধারণের স্থান থাকে না। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময়ই কেবল এমন লোক-সমাবেশ দেখা যায়।

জমির বিক্রেতাই সমাধিস্থান দেখিয়ে দেন। বসা অবস্থায় সমাধি দেওয়ার বিধি। কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে সমাধি দিতে সমবেত শিষ্যদের আপত্তি উঠে। মাথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাগড়ী বেঁধে, লেংগুট ও বহির্বাস পরিধানে রেখে, উত্থানভাবে গোস্বামীপ্রভুর 'শয়ান' সমাধি হল। তিন মণ লবণের সঙ্গে বালি ও মাটি মিশিয়ে ছয় ফুট × সাড়ে চার ফুট×পাঁচ ফুট সমাধি তখনই রাজমিস্ত্রিগণ ইঁট, চুন, সুরকি দিয়ে গেঁথে দেয়। রাতারাতি সমাধির উপর তালপাতার ছাউনি দিয়ে কুটীর নির্মাণ হয়। তিনজন চৌকিদার নিযুক্ত হয় সমাধি-স্থান পাহারার উদ্দেশ্যে। তারা পর পর দিন-রাত পাহারা দেয়। অদল-বদল করে রাত্রেও তিনজনরেই জেগে থাকতে হয়।

শিষ্যদের কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রভু স্টীমার চার্টারের ব্যবস্থা করেছিলেন। মণি মজুমদারের কাছে টেলিগ্রাম করে দাদা-গোসাঁই স্টীমার-পাঠান ক্যান্সেল করান ও চার্টারের টাকা ফেরৎ পাঠাবার নির্দেশ দেন। সতীর্থদেরও চিঠি ও টেলিগ্রাম করে তিনি জানান ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ মহোৎসব হবে। উৎসবে ব্যয় করার জন্য ভক্ত ও শিষ্যেরা চার হাজার টাকা মানি-অর্ডারে দাদা-গোসাঁইর নিকট পাঠান।

পুরুষোত্তমের ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করা হয় এবং ঢোল পিটিয়ে কাঙ্গালীদের মহোৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয়। সুষ্ঠুভাবে উপাদেয় মহাপ্রসাদ দিয়ে মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত চিঠির মধ্যে তিনখানা এখানে সন্নিবেশিত হল—

১. তিরোভাবের সংবাদ পেয়ে যোগজীবন গোস্বামীর নিকট কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীর পত্র—

কাকিনীয়া, রংগপুর।
প্রাণাধিকেষু, ৮ই আষাঢ়, ১৩০৬ বাং।

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু। ত্বদীয় কুশলং ভগবৎ সমীপে সততং যাচে তত্র মমানন্দঃ পরঃ।

তোমার পত্র গতকল্য পাইয়াছি। তোমার পত্র পাওয়ার কয়েকদিন পূর্বেই সেই অপ্রাকৃত ভ্রাতৃবরের প্রাকৃত দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। প্রায় দেড় বৎসর গত হইল ভ্রাতৃবরের সহিত বিচ্ছেদ হয়। আশা ছিল, শীঘ্রই তাঁহার স্বদেশ-আগমন হইবে এবং তাঁহার সঙ্গলাভে সুখী হইব। তাহা আর হইয়া উঠিল না। ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমিই সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিলাম, আমারই সর্ব্বাগ্রে পরলোকে যাওয়া উচিত ছিল।

গত ২০শে কি ২২শে জ্যৈষ্ঠ রংগপুর মাইগঞ্জে রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিতেছি, তেজস্বী. জটাজুটধারী শুভ্র বসন ও শুভ্র পুষ্পমাল্যশোভিত এক মহাপুরুষ আমার পদতলে বসিয়া আমার নিকট ইহলোক হইতে চিরবিদায় প্রার্থনা করিতেছেন। মহাপুরুষকে তাদৃশভাবে পদতলে উপবিষ্ট দেখিয়া "আপনি আমার পদতলে বসিয়া আমাকে অপরাধী করিতেছেন কেন?" বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যাইতেছি, অমনি চৌকিদারের চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হইল। এখন মনে হয়, প্রাণাধিক ভ্রাতা সূক্ষ্মদেহে আমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন।

ভ্রাতার কাশীধামে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের কথা আমি জানি। সুতরাং তাঁহার

পবিত্র দেহ সমাধিস্থ করা শাস্ত্রবিহিত কার্য্যই হইয়াছে। আশা করি, ভক্তগণ সমাধির উপর একটি স্থায়ী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

পিতৃভক্ত পুত্র তুমি। পিতার পাদমূলে থাকিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। ভগবানের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। সংপ্রতি মন বড় ব্যাকুল। আর কিছু লিখিতে পারিলাম না। পরম পূজনীয়া মাঐমাতাঠাকুরানীকে আমার প্রণাম জানাইবে। ইতি।

নিত্য আশীর্ব্বাদক
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

২. অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের চিঠি—

গেণ্ডেরিয়া, ঢাকা
৮ই আষাঢ়, ১৩০৬

প্রিয় যোগজীবন,

কি লিখিব? জগৎ শূন্য হইয়াছে, প্রাণ শূন্য হইয়াছে। ঠাকুরকে দেখিয়া মরিব এই আশা পূর্ণ হইল না। দারুণ রোগের সময় মৃত্যু প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাহাতে বলিলেন, 'না এখন হইবে না।' অবশেষে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন। জীবনের আলোক নিবিয়া গিয়াছে, এখন কেবল জীবন-ভার, দেহ-ভার বহন করিয়া যাওয়া। জীবন আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা অবিশ্বাসের কথা, কিন্তু কি করিব? তাঁহার সঙ্গে আমার স্থূলভাবে পরিচয়। এখন হইতে তিনি সূক্ষ্মভাবে যাহা করিবেন, তাহা ত আমি আর দেখিতে পাইব না। সে মূর্তি আর দেখিব না, সে বাক্য আর শুনিব না, সে চরণপ্রান্তে ছুটিয়া গিয়া আর ত আরাম লাভ ভাগ্যে ঘটিবে না।

ঠাকুর ইতিমধ্যে কাহাকেও দর্শন দিয়াছেন কিনা বা কোনরূপ আদেশ করিয়াছেন কিনা জানি না। আমি একদিন স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্মৃতি যেন মুছিয়া গেল। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির অভাবে বিরোধ-বিসংবাদে ঠাকুর বিষ-জ্বালায় জ্বলিয়াছেন। এখন যেন ঝগড়া-বিবাদ করিয়া তাঁহার নামে আমরা কলঙ্ক না আনি। তিনি ক্ষমা চাহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা আমরা পালন করিতে পারি না। সেখানকার সকলকে আমার প্রণাম দিও।

আমি অনিশ্চিতভাবে অদৃষ্টের দিকে চাহিয়া আছি। গুরুদেবের এইরূপই আদেশ। ভবিষ্যতে আর আদেশ পাইবার আশা নাই। ইতি।

তোমার—কুঞ্জলাল।

৩. ডাক্তার নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চিঠি—

শ্রীশ্রীগুরুচরণ ভরসা।

বাশুণ্ডী। টাকী পোঃ
চব্বিশ পরগণা।
১০ই আষাঢ়, ১৩০৬

ভক্তিভাজন দাদাবাবু!

আমি বঙ্গবাসীতে হৃদয়ভেদী সংবাদ পাঠ করিয়া ব্যাকুল হইয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত মণিবাবু বলিলেন, সমাধি-মন্দিরের জন্য জায়গা খরিদ হইয়াছে। মন্দির প্রস্তুত করিয়া বোধহয় আসিবেন। অগত্যা আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি কিন্তু কোথাও আর আমার

শান্তি নাই। যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া পুত্রশোক পর্য্যন্ত নিবারণ করিয়াছি আজ তাঁহার অভাবে কিরূপে দিনপাত করিব, জানি না। মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন “পরমারাধ্য ঠাকুরের শরীর বড় খারাপ, শীঘ্রই আমরা কলিকাতা যাইব।” ইহা যে ঘটিবে বুঝিতে পারি নাই। কলিকাতায় আসার কথা না লিখিলে তথায় যাওয়ার সম্ভব হইত এবং শেষ দেখাও হইতে পারিত। কিন্তু পোড়া কপালে তাহা ঘটে নাই, মনকে প্রবোধ দিবার আমার কিছুই নাই। যাহা হউক, আপনারা সকলে শারীরিক কেমন আছেন? কতদিন তথায় অবস্থিতি করার সম্ভব লিখিতে আজ্ঞা হইবে; আপনাদিগকে দেখিতে প্রাণ সতত চাহিতেছে। আর আমার মাথা-মুণ্ডু কি লিখিব। ধন্য সতীশচন্দ্র যে, তাঁহাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। আমি অদ্যাপি ঔষধ সেবন করিতেছি। কি জন্য এ দেহরক্ষার যত্ন করি তাহাও বুঝিতে পারি না। আপনাদিগের সকলের চরণে বারবার প্রণাম করি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

আপনাদিগের কৃপাপাত্র
নরাধম নবীন।

গোস্বামীপ্রভুর অপ্রকট কৃপালীলা

৩ এপ্রিল, শুক্রবার, অপরাহ্ণ চারটার সময় ভগবান যীশুখ্রীস্ট ক্রুশবিদ্ধ হলেন। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়, তাঁর দুই য়িহুদি ভক্ত—যোসেফ ও নিকোডিমাস, রোমান গভর্ণর পণ্টিয়াস পাইলেট থেকে যীশুখ্রীস্টের দেহের ছাড়পত্র নিয়ে রক্তাক্ত দেহটি ক্রুশমুক্ত করে অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে রক্তের দাগ মুছান, গন্ধদ্রব্য লেপন করেন এবং শুভ্র বস্ত্র দিয়ে ঢেকে রাখেন। সমাধি ক্ষেত্র বহুদূরে। সেই রাত্রে সমাধি দেওয়া সম্ভব ছিল না। শনিবার আবার য়িহুদিদের ছুটির দিন। রবিবার সমাধি হবে স্থির করে, ভক্তেরা মিলে পর্বতের গায়ে এক গুহা দেখে, তার ভিতর যীশুদেবের পবিত্র দেহ রেখে পাথর চাপা দিয়ে চলে যান। রবিবার প্রত্যুষে মেরী ম্যাগডেলেন আর একটি মেয়েকে নিয়ে ঐ পর্বত-গুহায় গিয়ে দেখেন, ওখানে যীশুদেবের দেহ নেই। বিস্মিত হয়ে ক্ষোভে ও দুঃখে এই বিচিত্র বার্তা ওঁরা ভক্তদের জানাতে রওনা হলে, যীশু তাঁদের কাছে প্রকাশিত হয়ে ওঁদের গ্যালিলিতে ফিরে যেতে আদেশ করেন।

ঐ রবিবারের সন্ধ্যায় ভগবান যীশুখ্রীস্টের দশ জন শিষ্য একটি ঘরে বসে চাপা-গলায় প্রভুর কথা আলাপ করছেন এমন সময় তিনি প্রকট হয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘তোমাদের শান্তি হউক।’ তাঁর দুহাতে এবং পাঁজরে ক্ষতচিহ্ন। জুডাস পূর্বেই আত্মহত্যা করেছিলেন। শুধু টমাস অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু টমাস তাঁর সতীর্থদের কাছে এই দর্শনের কথা শুনে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ‘আমি নিজের চোখে না দেখে এবং নিজের হাত দিয়ে ক্ষতস্থান স্পর্শ না করে ও-সব আজগুবি কথার গুরুত্ব দিতে পারি না।’ আট দিন পর জেরুজালেমে এগার জন শিষ্যের কাছে আবার যীশুদেব প্রকট হয়ে, টমাসের দিকে এগিয়ে বলেন, ‘চেয়ে দেখ দেখি, হাত দিয়ে ধরে দেখ দেখি আমার ক্ষতচিহ্নগুলি।’ টমাস বলে উঠেন, ‘মাই লর্ড, মাই গড।’ এ যেন শিষ্যের কাছে গুরুর পরীক্ষা!

অবতার পুরুষদের মৃত্যু নেই; লীলারও শেষ নেই। প্রয়োজনবোধে তাঁরা

ভক্তের প্রয়োজনেও কাতর আহ্বানে অপ্রকট কালেও প্রকট হন, লীলা করেন ও দর্শন দেন। তাই বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলেছেন—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

সেই ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লীলা করে গেছেন, আজও কত ভক্তকে কত ভাবে তাঁরা কৃপা করে থাকেন। তাঁদের লীলা চিরন্তন।

মহাপ্রভু নীলাচলে চলেছেন। একদিন প্রসাদ পাবার পর, গৌরসুন্দর বলেন, 'গোবিন্দ, একটু মুখশুদ্ধি দিতে পার?' ভিক্ষায় বের হয়ে বেশ কিছু সময় পরে গোবিন্দ একটি হরীতকী এনে এরই এক খণ্ড মহাপ্রভুকে দেন। পরদিন আবার মুখশুদ্ধি চাইতেই, গোবিন্দ তা সঙ্গে সঙ্গে এনে দেন। শচীনন্দন তাঁকে বলেন, 'গতদিন এত সময় নিলে, আর আজ চাইবামাত্র দেখি নিয়ে এলে!' গোবিন্দ তাঁকে বলেন, তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। মহাপ্রভু তা শুনে বলেন, 'গোবিন্দ, তোমার সংসার-বুদ্ধি হয়েছে; তুমি দেশে গিয়ে সংসার কর।' গোবিন্দ কান্নাকাটি করেন। নদীয়া-বিহারী বলেন তাঁকে, 'তুমি আমার পরম ভক্ত; বিবাহে তোমার কল্যাণই হবে। সংসার বাসনা থাকতে, সংসার ছাড়তে নেই।' অগ্রদ্বীপে গিয়ে গোবিন্দ ঘোষ বিয়ে করে গোপীনাথের সেবা-পূজায় আত্মনিয়োগ করেন। গোবিন্দের একটি ছেলে হয়। ছেলেটি যখন চার বছরের, তখন গোবিন্দের স্ত্রীবিয়োগ হয়। সহধর্মিণীর শোকে গোবিন্দ বড় কাতর হয়ে পড়েন। আরও পাঁচ বছর কেটে যায়, গোবিন্দের একটি মাত্র ছেলেও মারা যায়। শোকের জ্বালায় গোবিন্দ মন্দিরে পড়ে থাকেন; খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। তিন দিনের দিন গোপীনাথ তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেন, 'গোবিন্দ উঠ, তিনদিন ধরে আমি অনাহারী। আমাকে খেতে দাও, তুমিও খাও।' গোবিন্দ বলেন তাঁকে, 'কেনই বা ঠাকুর আমাকে সংসারে প্রবেশ করালে? স্ত্রী-পুত্র দিয়ে কেড়ে নিলে! আমার জল-পিণ্ডের সংস্থান করেও সব বানচাল করে দিলে!' গোপীনাথ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'দুঃখ কর না গোবিন্দ, আমিই তোমার পিণ্ডদান করব। তোমার আর মানুষ-পুত্রের প্রয়োজন নেই।' অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ এখনও ছিপ-কোষা হাতে নিয়ে গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও পিণ্ডদান করেন।

প্রভুর তিরোভাবের পরেই যোগজীবন গোসাঁইকে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে দেখে গোস্বামীপ্রভু প্রকাশিত হয়ে তাঁকে বলেন, 'যোগজীবন, এত কাতর হয়েছিস কেন? আমার দেহ যেরূপ জীর্ণ হয়েছিল, তা নিয়ে আর কয়দিন থাকা যায়?'

প্রভুর দেহরক্ষার পর কয়েকদিন যায়, তীব্র মনোবেদনায়, জ্বর ও রক্তামাশয়ে শান্তিসুধার দেহ অচল হয়ে পড়ে। ঔষধ ও পথ্য তিনি নেন না। ক্ষোভে, দুঃখে তিনি ভাবেন, 'জীবনটা বের হয়ে গেলেই বাঁচি।' পিতার বিরহ-জ্বালায় বুকের ভিতর তাঁর দুঃসহ বেদনা, উত্তাপ। এই সময় একদিন গোস্বামীপ্রভু তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'শান্তি, তুই দুঃখ করিস না। আমি তো তোর কাছেই রয়েছি; তোর যখনই ইচ্ছা হবে, আমাকে দেখতে পাবি। কাশী গিয়ে তুই বিশ্বনাথ দর্শন কর, শরীর সেরে যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে শান্তি হন শান্ত, স্বাভাবিক।

সমাধিক্ষেত্রে চৌকিদার তিনজনেরই চোখে পড়ে, জটীয়াবাবা রাত্রে প্রায়ই লাঠি হাতে পায়চারি করেন; কখন কখন তিনি ওদের সঙ্গে কথাও বলেন। তারা পাহারা দিতে ভয় পেয়ে কাজ ছেড়ে দেয়। তখন সমাধির পাশে একটি কুটীর উঠে। অমৃতলাল সেন দু-তিন জন সতীর্থকে নিয়ে ওখানে থাকেন। চৌকিদারের

আর প্রয়োজন হয় না। শুরু থেকেই সমাধিতে পূজা, আরতি ও ভোগের ব্যবস্থা হয়। নীলমণি বর্মণের বাড়ীটি ছাড়া হয় না। ওখানেই গোস্বামীপ্রভুর আসন থাকে। সমাধিতে যাঁরা থাকেন, তাঁরাও অবসর বুঝে আশ্রমে গিয়ে প্রসাদ পান। সমাধির ভোগ আশ্রম থেকে আসে। একদিন ভূতানন্দ স্বামী অমৃতলাল সেনকে বলেন, 'সমাধি-সংলগ্ন নরেন্দ্রে সরোবরের ঘাটটি পবিত্র রাখবেন। গোস্বামীপ্রভু প্রত্যুষে ওখানে স্নান করেন।'

দাদা-গোসাঁই, সারদাকান্ত, নবকুমারবাবু, শ্রীধর, কিরণচাঁদ, সরলনাথ, মুক্তকেশী দেবী, আরও অনেকে শ্রীক্ষেত্রের আশ্রম-বাটীতে থেকে যান। পণ্ডিত মহাশয় গোবিন্দকুণ্ডে গিয়ে সাধন-ভজন করেন। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী যান আকাশ-গঙ্গায়। জগদ্বন্ধুবাবু ও শান্তিসুধা কলিকাতা গিয়ে ঝামাপুকুরে বাড়ী ভাড়া করে থাকেন।

নবকুমারবাবু সমাধির উপর ইঁট-সিমেণ্ট দিয়ে প্রায় এক ফুট উঁচু বেদী প্রস্তুত করান এবং তালপাতার কুটীরের পরিবর্তে চৌচালা ঘর করান। সমাধি-বেদীর ছ-ফুট নীচে গোস্বামীপ্রভুর দেহ চিৎ করে সমাহিত করা হয়েছিল। বেদী নির্মাণের পাঁচ মাস পরে বেদীর উপর প্রভুর আকৃতি ভেসে উঠে। সমাহিত করার সময় তাঁর কোন্ অঙ্গ কিভাবে ছিল, ওই সুস্পষ্ট ছাপ থেকে তা অনায়াসে বুঝা যেত। মাথা, জটা, মুখ, হাত দুখানা, বুক, পেট, কোমর ও পদযুগলের যেন নিখুঁত আলোক-চিত্র। চারুশিল্পীর নিপুণ হস্তের তুলিকায় প্রভুর যেন জীবন্ত রূপ ফুটে উঠেছিল। দেওয়ালে শ্যামল শেওলা হলে যেমন কালচে সবুজ নক্সা হয়, গোস্বামীপ্রভুর এই বিচিত্র চিত্রপটও অনুরূপ। প্রত্যহ নরেন্দ্রের জল দিয়ে সমাধি-বেদী ধুয়ে-মুছে, ধূপ-ধুনা সমেত ফুলচন্দনে পূজা করা হয়। এই সম্পর্কে একদিন আবেগভরে দাদা-গোসাঁই মন্তব্য করেন, 'যে বস্তু, মাটি, চুন, বালি, ইঁট, সুরকি, সিমেণ্টের পুরু আস্তর ভেদ করে বেদীর উপর ফুটে উঠে, তা কি আমাদের হৃদয়ে ফুটবে না?'

এই অপার্থিব ছাপ বহুদিন বেদীর উপর ছিল। যাঁরাই সমাধি-বেদী দর্শনে ঐ সময় গিয়েছেন, তাঁরা এই আপ্রাকৃত কলা-সৃষ্টি স্বচক্ষে দর্শন করে ধন্য হয়েছেন। একখানি গৈরিক চাদর দিয়ে বেদী তখন ঢেকে রাখা হত। এই চাদরের উপরও প্রায়ই ভগবানের পদচিহ্ন ও নানা রকম মূর্তি কখন কখন বা ফুটে উঠত। একবার স্বর্ণোজ্জ্বল দেবনাগরী হরফে প্রকাশ পেলেন নামব্রহ্ম। সমাধি-গৃহের মেঝে শ্বেত-পাথর বসান হয়। তখন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় বেদীর এই পবিত্র পটচিত্রের উপর কি করে শ্বেতপাথর বসান যায়! তাই বেদী ঐ অবস্থায়ই থাকে।

অগ্রহায়ণ মাসে (১৩০৬) নবকুমারবাবু কলিকাতা হয়ে কাশী গিয়ে শান্তি-সুধার ওখানে উঠেন। এখানে অবসর যাপনের সময় সমাধি-আশ্রমকে তপোবনে পরিণত করার প্রেরণা তিনি পান এবং এ নিয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন।

শান্তিসুধা বিশ্বনাথকে রোজই দর্শন করতেন। তাঁর শরীর সুস্থ হয়ে উঠে। অপরাহ্ণে তিনি ছাদে পায়চারি করে মাদুরে শুয়ে পড়তেন। গোস্বামীপ্রভু প্রত্যহই তাঁকে দর্শন দিতেন এবং তাঁর মাথার কাছে বসে সান্ত্বনা দিতেন।

কলিকাতা পৌঁছে নবকুমারবাবু নার্শারী থেকে ফল ও ফুলের চারা ও কলম সংগ্রহ করেন। অন্তিমঅবস্থায় গোস্বামী মহাশয় ফল চেয়ে ফল পান নি, এই ছিল তাঁর দুঃখ ও ক্ষোভ। সতীর্থরা তাঁর এই পরিকল্পনায় নানাভাবে সাহায্য করেন।

এমন কি বরিশাল থেকে ভক্তেরা নারকেলের চারা পাঠান। নবকুমারবাবু নিজে এ-সব শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে আশ্রমের জমিতে লাগান।

পণ্ডিত মহাশয় কয়েক মাস পরেই পুরীতে ফিরে আসেন। তিনি সমাধির পাশের কুটীরে থেকে ওখানের সেবা-পূজার ভার নেন। নীলমণি বর্মণের বাড়ীতে প্রভুর আসনের ও দেবমূর্তির সেবা-পূজার ভার গোস্বামী মহাশয়ই অসুস্থতার সময় সারাদাকান্তের উপর দিয়েছিলেন।

সমাধির উপর গোস্বামীপ্রভুর বিচিত্র কৃপাপটের কথা তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে জানাজানি হয়। ১৩০৭ সনের জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা-দ্বাদশীতে নীলমণি বর্মণের সেই গৃহেই প্রথম বার্ষিক তিরোভাব তিথি উদ্‌যাপিত হয়। কুঞ্জলাল নাগ, হরিদাসবাবু এবং আরও অনেকে এখানে এসে উঠেন। যথারীতি কীর্তন ও ভোগ হয়। ভোগ সরাবার পর ভক্তেরা সবিস্ময়ে দেখেন, আসনের উপর প্রভুর পায়ের স্পষ্ট ছাপ। ওখান থেকে সংকীর্তনের দল সমাধিক্ষেত্রে যায়। ওখানেও ভোগারতি হয়। ঐ সময় স্থির হয়, পরবর্তী তিরোভাব তিথি-উৎসব সমাধি-আশ্রমেই হবে এবং তখন নীলমণি বর্মণের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে, সমাধিতেই প্রভুর আসন ও বিগ্রহ স্থানান্তরিত হবে। সকলেই সাধ্যমত অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

চার-পাঁচখানা কুটীর, পুরুষ ও মেয়েদের আলাদা পায়খানা কয়েক মাসের মধ্যেই উঠে। শশীবাবু ও জগতবাবুর চেষ্টায় দুটি পাকা কোঠা-দালান বানান হয়। একটিতে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হয়, অপরটিতে পুরুষদের। মন্দিরের প্রাচীর মাটিরই থাকে। ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮—ঐ দিনই দ্বিতীয় বার্ষিক তিরোভাব তিথি। গোস্বামীপ্রভুর প্রায় দেড় শত শিষ্য বাইরে থেকে আসেন। নীলমণি বর্মণের বাড়ীটি রথযাত্রা পর্যন্ত তাঁদের জন্য রাখা হয়। সমাধি-ক্ষেত্রেও তাঁবু টানিয়ে অনেকের থাকার ব্যবস্থা হয়। গোস্বামীপ্রভুর আসন সংকীর্তন করে সমাধি-মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। মহেন্দ্র মিত্র প্রভুর তিরোধানের পর থেকে মৌনী ছিলেন। তিনিও সংকীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন। সমাধি-মন্দিরে পৌঁছে ভাবের আবেগে তিনি বলে উঠেন, 'গোসাঁই, আমি এতদিন আপনার ওই কথা গোপন রেখেছিলাম। অপনি যখন অপ্রকটই হয়েছেন, এখন আর বলতে কি বাধা?' তারপর তিনি সতীর্থদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা সকলে শোন এক ঘটনা। হ্যারিসন রোডের আশ্রম-গৃহে একদিন ঠাকুরের ঘরে ঢুকতেই গিয়ে থমকে দাঁড়াই! আমি দেখি, অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলা ঠাকুরের জটা সযত্নে বেছে দিচ্ছেন। আমি চুপি চুপি বেরিয়ে আসি। পরে তাঁকে ঘরে না দেখে আমি গিয়ে প্রভুকে প্রশ্ন করি, "ঠাকুর ইনি কে?" তিনি বলেন, "তুমি দেখেছ নাকি? ইনি কালীঘাটের কালী। যা দেখেছ, কারও কাছে প্রকাশ কর না। জানাজানি হলে আমি আর দেহে থাকব না।"'[১] সারাদিন উৎসব চলে। কীর্তন সূর্যাস্ত অবধি চলে। প্রায় দুই হাজার লোক উৎসবে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ভূতানন্দ স্বামী তাঞ্জামে চড়ে, লোকজন নিয়ে জগদ্‌গুরু বেশে সমাধি-আশ্রমে আসেন। তাঁর পায়ে রূপার খড়ম, হাতে হাতির দাঁতের লাঠি। সঙ্গে ঝাড়-লণ্ঠন ও রূপার একখানি চেয়ার। ঐ চেয়ারে বসে তিনি গোস্বামীপ্রভুর শিষ্যদের বলেন, 'নরেন্দ্র পূর্বেই তীর্থ ছিল, এখন উত্তর পাড়ে

---

[১] 'মন্দিরে' প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে।

গোসাঁইজীর সমাধি ধারণ করে মহাতীর্থ হল। এই স্থান শ্রীবৃন্দাবনের মর্যাদা পাবে। গোসাঁই শিষ্যেরা সব সাধু। গোসাঁই শ্রীশ্রীজগন্নাথের দ্বিতীয় কলেবর। শ্রীশ্রীজগন্নাথ যতদিন আছেন, গোসাঁইও ততদিন আছেন।' উমাচরণবাবুকে তিনি বলেন, 'আপনিও ব্রাহ্মণ।' রথযাত্রার পর বেদীর সেই অপ্রাকৃত শিল্পসৃষ্টি মিলিয়ে যায়। এবার উৎসবে পুরীর এই আশ্রমের নাম হয়—**"জটীয়াবাবার সমাধি-আশ্রম।"** যোগজীবন গোস্বামীকে গুরুভ্রাতারা গেণ্ডেরিয়া ও পুরী আশ্রমের সেবায়েত বলে মেনে নেন। সমাধির জমি তাঁর নামেই কেনা হয়েছিল।

সমাধি-ক্ষেত্রে কয়েকটি পানের বোরোজ ছিল। এ-সব এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বোরোজ তুলে না নিলে মন্দিরের কাজে হাত দেওয়া যায় না। যোগজীবন গোসাঁই ভেবে কূল পান না। একদিন সন্ধ্যারতির সময় গোস্বামীপ্রভু তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেন, 'যোগজীবন, দুই-শ টাকা দিলেই পানওয়ালারা উঠে যাবে।' যোগজীবন-বাবুর মুখে এই দর্শনের কথা শুনে জগতবাবু তখনই বোরোজের মালিকদের ডেকে পাঠান। যোগজীবনবাবু তাঁদের বলেন, 'আপনাদের লোকসান হয় তা আমরা চাই না, আবার বোরোজ উঠিয়ে না নিলে মন্দিরের কাজে আমরা অগ্রসর হতে পাচ্ছি না। দয়া করে বলুন, কি হলে আপনারা প্রফুল্ল মনে বোরোজ উঠিয়ে নেবেন?' তাঁরা বলেন, 'দুইশত টাকা দেবেন।' জগতবাবু তখনই টাকার ব্যবস্থা করেন। পরদিনই তাঁরা বোরোজ উঠিয়ে নেন। অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। যোগজীবন সরলনাথকে বলেন, 'তুমি বাবার জন্য কত টাকা যোগাড় করে এনেছ। লোকে তোমাকে বিশ্বাস করে। আশ্রমের জন্য এবার তোমাকে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে হবে।' সরলনাথ বলেন, 'দাদা-গোসাঁই, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। লোকে আমাকে টাকা দেবে কেন? ঠাকুর তখন শক্তি যুগিয়েছিলেন, তাই সম্ভব হয়েছিল। আমাকে তো কেউ এক কানাকড়িও দেয় নি। তাছাড়া আমার অন্তরেও কোনও সাড়া পাচ্ছি না।' যোগজীবন সরলনাথকে ভুল বুঝেন। তাঁর বিরক্তি বুঝে সরলনাথ শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান।

একদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে দাদা-গোসাঁই গিয়ে দেখেন, জন-পঁচিশ শিষ্য নিয়ে বাবা গম্ভীরনাথজী দর্শনে এসেছেন। তাঁরা এক পাণ্ডার বাড়ীতে আছেন জেনে যোগজীবন তাঁদের সমাধি-আশ্রমে এসে থাকতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁরা এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যোগজীবন তখন মন্দিরের কাজে হাত দিয়েছেন, কিন্তু অর্থাভাবে অগ্রসর হতে পাচ্ছেন না। ত্রিকালজ্ঞ এই মহাত্মাকে মন্দিরের ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা হয়। তাঁর কাছে যেতেই তিনি বলেন, 'বাবার মন্দির সুন্দর ভাবে হবে।'

একদিন যোগজীবন গোসাঁই গম্ভীরনাথজীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইচ্ছা মাত্র বাবার দর্শন পাই না কেন?' গম্ভীরনাথজী উত্তর দেন, 'বাবা বলছেন, তাঁর প্রতি যখন তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হবে, তখন দেখতে পাবে।' যোগজীবন মর্মাহত হয়ে বলেন, 'বাবা, কবে আমার বিশ্বাস হবে?' তখনই তিনি দেখেন, গম্ভীরনাথজীর সম্মুখে গোস্বামীপ্রভু বসে আছেন।

যোগজীবন গোসাঁই গেছেন ফরিদপুরে সতীর্থ গৃহে। ঐ বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা তাঁর কাছে সাধন চায়। তিনি বলেন, 'আমার সাধন দেবার অধিকার নেই।' পরদিন তিনি আর এক গ্রামে অপর একজন গুরুভ্রাতার বাড়ী যান। ওখান থেকে একদিন পর ফিরে এসে সাধন-প্রার্থীদের তিনি সাধন দেন। তিনি তখন ওদের

বলেন, 'গতরাত্রে বাবা প্রকাশিত হয়ে বলেন, "তুই ওদের সাধন দিয়ে আয়।"' তারপর থেকে যোগজীবন গোসাঁইর নিকট অনেকেই সাধন পান।[১]

১৩০৮ সালেই সমাধি-আশ্রমে যোগজীবন গোসাঁই 'নামব্রহ্ম' প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু অর্থ হাতে আসায়, গর্ভমন্দিরে মাটির দেওয়ালের পরিবর্তে পাকা দেওয়াল উঠে। বেদীতে মর্মর পাথর বসান হয়। মূল মন্দিরে নক্‌সা অনুমোদিত হলেও অর্থাভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। প্রতি বছরই তিরোভাব তিথিতে গোস্বামীপ্রভুর শিষ্যেরা শ্রীক্ষেত্রে যেতে সচেষ্ট হন। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ প্রতি বছরই আসতেন আকাশগঙ্গা থেকে। ১৩০৯ সালের উৎসবে একটি পরিবারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ঐ পরিবারের একটি ছেলে পৌষ মাসে তাঁর কাছে আকাশগঙ্গা গিয়ে সাধনপ্রার্থী হয়। তাঁর তখন সাধন দেবার অধিকার নেই। ঐ রাত্রেই গোস্বামীপ্রভু তাঁকে সাধন দিবার নির্দেশ দেন।[২]

দাদা-গোসাঁইর উপর শ্রীক্ষেত্র ও গেণ্ডেরিয়া আশ্রমের ভার পড়ায় তাঁকে ছুটাছুটি করতে হত। অর্থাভাবে তাঁর মন ও স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। শ্রীক্ষেত্র আশ্রমে ভোগের সময় প্রায়ই আসনে গোস্বামীপ্রভুর চরণচিহ্ন পড়ে; পায়ের ছাপ বেশ বড়। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে মহাপ্রভুর যে পদচিহ্ন রয়েছে, এবং গির্নার পাহাড়ে সদ্‌গুরু দত্তাত্রয়ের যে পদচিহ্ন আছে, এই তিনের মধ্যে বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

গেণ্ডেরিয়ার চন্দ্রকুমারবাবুর পরিবার গোস্বামীপ্রভুর আশ্রিত। চন্দ্রকুমারবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুতে চন্দ্রকুমারবাবুর স্ত্রী একদিন দুপুরবেলা কান্নাকাটি করেন। এই সময় তিনি প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠেন। তিনি শুনতে পান, 'কেঁদ না মা, আশ্রমে এসে দেখ।' পাগলিনীর মত গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে গিয়ে তিনি দেখেন, গোস্বামীপ্রভুর পাশে তাঁর সদ্যমৃত ছেলেটি বসে আছে। তাঁর শোকের জ্বালা কেটে যায়।[৩]

অপ্রকট হবার পর গোস্বামীপ্রভু নবদ্বীপে একটি ব্রাহ্মণ ছেলেকে সাধন দিয়ে অমৃতলাল সেনের কাছে প্রকাশিত হয়ে ছেলেটির পরিচয় ও ঠিকানা দিয়ে বলেন, 'ওকে আমি সাধন দিয়েছি; তোমার কাছে প্রাণায়াম দেখে নিতে বলেছি।' ছেলেটি তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁকে প্রাণায়াম দেখিয়ে দেন। গুরুভ্রাতা মহেশচন্দ্র দে-কে একদিন অমৃতবাবু ছেলেটির কাছে নিয়ে যান।[৪]

ফকির পাণ্ডার শরীর ভেঙ্গে পড়ে। কলিকাতা থেকে গুরুভাইরা মিলে সব তিরোভাব উৎসবে শ্রীক্ষেত্র যাচ্ছেন শুনে তিনি তাঁদের ধরেন, 'আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যান।' গায়ে মাখেন না কেউ। তাঁর এখন-তখন অবস্থা; কে দায়িত্ব নিবে? সতীর্থরা রওনা হয়ে যান। খুরদা স্টেশনে ট্রেন বদল করে তাঁরা দেখেন, ফকির পাণ্ডা বসে আছেন আগে-ভাগে পুরীর গাড়িতে উঠে। বিস্মিত হয়ে তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি করে এলে ভাই?' ফকির পাণ্ডা বলেন, 'আপনারা আমাকে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন না দেখে ঠাকুরজীকে স্মরণ করে খুব কান্নাকাটি করতে থাকি। তিনি প্রকাশিত হয়ে আমাকে ট্রেনে করে নিয়ে এলেন। সারাক্ষণ

---

১. ও ৩. 'মন্দির' পত্রিকা থেকে সংকলিত।

[২] শ্রীমদ্ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখাৎ শ্রুত।

[৪] গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত।

আমার পাশে বসে, এইমাত্র তিনি আমাকে এই গাড়িতে তুলে দিয়ে চলে গেলেন।' সতীর্থরা তাঁকে একে একে আলিঙ্গন করে বলেন, 'তোমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে ভাই?' তাঁরা তাঁকে সঙ্গে করে আশ্রমে নিয়ে যান। উৎসবের দুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়।[১]

কুলীনগ্রামের গোসাঁইদাস বসুর বিধবা স্ত্রী কুসুমও হ্যারিসন রোডের আশ্রম-গৃহে কুলীনগ্রামবাসীদের সঙ্গে সাধন পেয়েছিলেন। কুসুমের একটি মাত্র ছোট ছেলে, নাম সুরেন্দ্র। তাই কুসুমকে গ্রামের লোক 'সুরর মা' বলে ডাকে। কুসুমের সংসারে আর কেউ নেই। দারিদ্র্যের পীড়নে কুসুম পাশের গ্রামে পিতৃগৃহে চলে যান। ওখানে পিতার সেবা করেন আর 'নাম' নিয়ে পড়ে থাকেন। তাঁর বাবা এসব পছন্দ করেন না। তিনি কুসুমকে স্পষ্ট বলে দেন, 'আমার এখানে নাম-টাম চলবে না।' কুসুম স্থির করেন মনে মনে, শ্বশুরের ভিটেতে ফিরে যাওয়াই ভাল। ঐদিন রাত্রে গোস্বামীপ্রভু কুসুমের কাছে প্রকাশিত হয়ে বলেন, 'মা, তোমার গৃহে চলে যাও; ওখানে মোটা কাপড়, মোটা ভাত তোমার জুটবে।' পরদিনই বিনীতভাবে পিতার কাছে বিদায় নিয়ে কুসুম কুলীনগ্রামে ফিরে যান। তিরোভাব উৎসবে গ্রামের অনেকে শ্রীক্ষেত্রে যাচ্ছেন শুনে কুসুমেরও ইচ্ছা হয়। প্রভুর অন্ত্যলীলার স্থান ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনও হয়! কিন্তু টাকা কোথায়? গভীর রাত্রে কুসুমের ঘুম ভাঙ্গতেই তিনি দেখেন, ঘর আলো করে গোস্বামীপ্রভু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এক হাতে টাকার তোড়া। তিনি কুসুমকে বলেন, 'মা, তুমি শ্রীক্ষেত্রে যেতে চাও? এই নাও টাকা।' প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে সুরর মা বলেন, 'না বাবা, আমার টাকার প্রয়োজন নেই। আমার শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীক্ষেত্র দর্শন—দুই-ই হয়ে গেছে।[২]

পঞ্চম তিরোভাব তিথি উৎসব ভক্তসমাগমে যথারীতি সম্পন্ন হয়। ঐ বছরই ১৩১১ সনের ভাদ্র মাসে যোগজীবন গোস্বামী পুরীর আশ্রম ও সম্পত্তির সর্বস্বত্ব অর্পণনামা করে শ্রীশ্রীনামব্রহ্মের নামে তিনি লিখে দেন এবং তিনিই প্রথম সেবায়েত হন। ১৮ আশ্বিন, ১৩১২, যোগজীবন গোসাঁই পরলোক গমন করেন।

১৩১৩ সালের তিরোভাব তিথি-উৎসব শেষ হলে, ট্রাস্ট-ডীডের সর্তানুযায়ী গোস্বামীপ্রভুর শিষ্যদের মধ্যে সেবায়েত নিয়োগের জন্য সভা হয়। হরিদাস বসু এই সভার সভাপতি ছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সেবায়েত নির্বাচিত হন এবং গেণ্ডেরিয়ার ভার শান্তিসুধা দেবীর উপর পড়ে। এ নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হয়। লোকবরেণ্য নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর পিতা, কটকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু মহাশয়ের সালিশীতে মিটমাট হয় এবং সারদাকান্তই সেবায়েত থাকেন।

গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য বর্ধমান জিলার রোকড়া গ্রামের হরিশচন্দ্র সামন্তের পুত্র এঞ্জিনীয়ার নগেন্দ্রনাথ সামন্ত ১৩১৬-১৩১৭ বাংলায় শ্রীক্ষেত্রে থেকে সমাধি-মন্দির নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন করেন।

গুরু যতদিন দেহে ছিলেন, কিরণচাঁদ গুরুসঙ্গ করেছেন। মধ্যে মধ্যে মাকে দেখতে দেশে যেতেন। যোগজীবনের মৃত্যুর পর তিনি দেশে ফিরে 'চ্যাটার্জি ব্রাদার্স' নাম দিয়ে ফটোগ্রাফের ব্যবসা শুরু করেন। দিন দিন ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি

---

[১] হরিদাস বসু-প্রণীত 'সদ্গুরু ও সাধনতত্ত্ব', ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃ ১৩৯-৪০।

[২] হরিদাস বসু-প্রণীত 'সদ্গুরু ও সাধনতত্ত্ব', ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃ ১১৭-১১৮।

হয়। বছরে প্রচুর অর্থাগম হয়। একদিন ছুটির পর কিরণচাঁদ একা বসে আছেন। টেবিলের উপর টোকা দিয়ে একটি গানের টান দিতেই তিনি দেখেন, গোসাঁই তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আপন চক্ষুকে তাঁর বিশ্বাস হয় না। সাষ্টাঙ্গ দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। গোস্বামীপ্রভু তাঁকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'আর নয় কিরণ, তোমার এখানের যে কর্মটুকু বাকী ছিল তা শেষ হয়েছে। এবার তীর্থ পর্যটনে বের হতে হবে। তোমার সন্ন্যাস নেবার সময় হয়েছে।' কিরণচাঁদ বিনীত হয়ে বলেন, 'এখনই কি বের হয়ে পড়ব?' প্রভু বলেন, 'সাত দিন পর। এর মধ্যে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা কর; কেউ যদি ব্যবসা কিনে নিতে চান, ভাল, নইলে এমনি ফেলে যাবে।' এই বলে প্রভু অদৃশ্য হন। 'চ্যাটার্জি ব্রাদার্স' বিক্রয় করে মালিক চলে যাচ্ছেন শুনে এক ভদ্রলোক আট হাজার টাকা 'অফার' দেন। কিরণচাঁদ তাঁকে বলেন, 'আপনি টাকা নিয়ে আসুন, এখনই দোকানের দখল নিন।' আট দিনের দিন কিরণচাঁদ বের হয়ে পড়েন। এক বছর হিমালয় ও উত্তর ভারতে পরিব্রাজন করে ১৩১৯ সালে কিরণচাঁদ প্রয়াগে আসেন। এখানে গোস্বামীপ্রভু প্রকাশিত হয়ে জনৈক সন্ন্যাসী থেকে তাঁকে সন্ন্যাস নিতে আদেশ করেন। কিরণচাঁদকে তিন দিনের ব্রহ্মচর্য দিয়ে যথাশাস্ত্র তিনি তাঁকে সন্ন্যাস দেন। তাঁর সন্ন্যাসের নাম হয় স্বামী কৈশোরানন্দ সরস্বতী। কিন্তু গোসাঁই তাঁকে যে নামে ডাকতেন, তাছাড়া অন্য নাম নিতে তাঁর মনে সাড়া পান না। অধিকন্তু গৈরিক ধারণ করতে তাঁর অন্তর সায় দেয় না। প্রভুর ডাকা নাম 'কিরণ'ই থেকে যায়।

আগ্রাতে টিকেট কেনার সময় এংলো ইণ্ডিয়ান টিকেট ক্লার্ক তাঁকে বলে উঠেন, 'টিকেট লিজিয়ে, দরবেশজী।' প্রভু হ্যারিসন রোডের আশ্রমে একদিন তাঁর তালি দেওয়া জামা দেখে তাঁকে 'দরবেশ' বলে কৌতুক করেছিলেন। 'দরবেশ' নামে তাঁর আপত্তি থাকে না।

সন্ন্যাস নিয়ে দরবেশজী যখন খালিয়া যান, ঐ গ্রামের যদুনাথ বিশ্বাস নামে একটি লোক তাঁর কাছে সাধন চায়। তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দেন। ঐদিনই গোস্বামীপ্রভু প্রকাশিত হয়ে তাঁকে আদেশ করেন, 'কিরণ, যে লোকটি সাধন নিতে এসেছিল, তাকে ডেকে এনে সাধন দিও। প্রাণায়ামও দেখিয়ে দিও; যেমনটি তোমরা পেয়েছ, ওভাবে দিও।' তারপরই তিনি সাধন দিতে থাকেন।[১]

গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য বানাড়িপাড়ার রাইচরণ চক্রবর্তী বিদ্যাভূষণ ছিলেন শ্রীহট্ট গভর্নমেণ্ট স্কুলের হেডপণ্ডিত। তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন ভোলাগিরিবাবার আশ্রিতা। ১৩৩১ সালে গিরিমহারাজ শ্রীহট্ট গিয়ে পুলিশসাহেব যতীন বসুর বাংলোয় উঠেন। পণ্ডিত মহাশয়ের পত্নী গুরুকে ধরেন, তাঁর কুটীরে এসে একদিন প্রসাদ পেতে। ভোলাগিরিবাবা তাঁদের বাড়ী যেতে সম্মত হন, কিন্তু প্রসাদ পাবেন না বলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐদিনই ভোলাগিরিবাবাকে বলেন, 'বাবা, আমার গুরু দেহে নেই, আমরা অনাথ।' তিনি বলেন, 'ক্যায়া বোল্ রাহা? উনকা সাথ হরবখত হমারা সাক্ষাৎ হোতা হ্যায়। আজ সবেরি ভি হুয়া।' গৃহে ফিরে পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রী স্বামীকে অনুরোধ করেন, 'আপনি একবার ঠাকুরঘরে গিয়ে গোসাঁইজীকে বলুন, তিনি যেন আমার গুরুদেবকে আমাদের বাড়ীতে প্রসাদ পেতে আমন্ত্রণ করেন।' স্কুল থেকে ফেরার পথে ঐদিনই চক্রবর্তী মহাশয় যতীন-

---

[১] সদানন্দ মিত্র-প্রণীত 'শ্রীশ্রীদরবেশজী-প্রসঙ্গ', পৃ ৪৭।

বাবুর গৃহে যেতেই গিরিমহারাজ বলেন, 'পণ্ডিতজী ইধর আও। একটু বাত হ্যায়। বাবা আশুতোষনে কহা, তোমহরা ঘরমে হমকো যানে হোগা। কাল হম ঔর গীতিজী (বাবার পাচক) দু মূর্তি যায়গে।' মহানন্দে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, 'শুধু দুজন কেন? সকল শিষ্যকে নিয়ে আসুন।' গিরিবাবা বলেন, 'তুম দরিদ্র হ্যায়, তুম্‌হরা তক্‌লিব হোগা।' রাইচরণবাবু বলেন, 'বাবা, আমি ঠিকই দরিদ্র কিন্তু আমি যাঁর বেটা, তিনি তো দরিদ্র নন।' ভোলাগিরিবাবা সন্তুষ্ট হয়ে সকলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তখন সস্ত্রীক যতীনবাবু এসে গুরুকে বলেন, 'বাবা, কাল যে ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন; সব আয়োজন হয়ে গেছে, নিমন্ত্রণও করা হয়েছে।' গিরিমহারাজ যতীনবাবুকে নির্দেশ দেন, উৎসবের সব জিনিসপত্র রাইচরণ পণ্ডিতের গৃহে পাঠাতে; ওখানেই অন্নপ্রাশন হবে এবং নিমন্ত্রিতরা ওখানেই যাবেন।[১]

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৩৩৭ সালে বারাণসী পৌঁছে তেড়েনীমের বাড়ীতে জীবনের শেষ দিন অবধি ছিলেন। এই বাড়ীতে রাত্রিতে ঠাকুর-চাকর পর্যন্ত কেউ থাকতে পারতেন না। গোস্বামীপ্রভু সতীশবাবুকে নিত্য দর্শন দিতেন। তাঁর ছাত্রেরা কখন কখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে টাকা পাঠাতেন। কামনা বা অভিমানের লেশমাত্র থাকলে তা ফেরৎ যেত। এক ভদ্রলোক তাঁর নিজের বাপ-দাদার পরিচয় দিয়ে দশ টাকা সতীশবাবুকে (বড়বাবুকে) মানি-অর্ডারে পাঠিয়ে কুপনে লিখেন, 'আমি মহাপাতকী, টাকাটা আপনি গ্রহণ করলে ধন্য হব।' তিনি অর্থ-প্রেরককে লিখেন, 'এটি তোমার অন্তরের কথা নয়, যে প্রকৃত বিনয়ী, তার ভাব অন্য রকম।' সমাধি আশ্রমে দরিদ্রনারায়ণ সেবার জন্য তিনি টাকা কয়টি পাঠিয়ে দেন। ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে এবার একশত টাকা বড়বাবুকে পাঠান। টাকা ফেরৎ আসে। একখানা টেলিগ্রামও প্রেরকের নিকট আসে। 'রিলিজিয়ন ক্যাননট বী পারচেজড উইথ মানি'—অর্থ দিয়ে ধর্ম সওদা করা যায় না। গান্ধীজীর ইচ্ছা হয় বড়বাবুকে মাসে একশত করে টাকা পাঠান। সতীশবাবু তাঁকে লিখেন, 'তাহলে ভগবানের উপর নির্ভর করা হল কোথায়?' সতীশবাবু গান্ধীজীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র জন্য লিখা প্রবন্ধে কখনও নাম দিতেন না। মহাত্মাজী যুক্তি দিয়ে লিখেন, 'প্রবন্ধে নাম থাকলে জোর হয় বেশী।' কিন্তু বড়বাবু রাজী হন না। তাঁর বহু প্রবন্ধ নানা কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বের হত। তার জন্য কখন তিনি পারিশ্রমিক নিতেন না। প্রতিষ্ঠার পথ তিনি বরাবর এড়িয়ে চলতেন।

হেমেন্দ্র গুহরায় প্রচার করে বেড়ান, বড়বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একজন মহাপুরুষ। কাশীতে বড়বাবুর কানে এই কথা যেতেই তিনি হেমেনবাবুকে লিখেন, 'ভাই, গোসাঁইর কৃপা-রজ্জুতে ঝুলে আছি; আমার সর্বনাশটি কর না।' সরকারী উকিল কুমিল্লার অক্ষয় দত্ত মহাশয় কাশীতে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'আপনি তো বেশ আনন্দে আছেন।' বড়বাবু উত্তর দেন, 'এখনও আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব, অনেকের কথা ভাবি। যেদিন গোসাঁই ছাড়া আর কারও কথা মনে আসবে না, ঐদিনই ঠিক ঠিক আনন্দে থাকব।'

১৩৪৩ সালে দরবেশজীর শিষ্যদের চেষ্টায় কাশীতে 'বিজয়মঠ' স্থাপিত হয়। ময়ুরমুকুটবাবার এক শিষ্য মঠে গোস্বামীপ্রভুর মর্মর-মূর্তি স্থাপনের

---

১. 'মন্দির' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হয়ে দরবেশজীর শরণাপন্ন হন। কুমারটুলির প্রখ্যাত ভাস্কর গোপেশ্বর পালকে মূর্তি নির্মাণ করতে দেওয়া হয়। প্রভুর মুখ কিছুতেই হয় না। দরবেশজী প্রত্যহ সকালে ভাস্কর গোপেশ্বর পালের স্টুডিওতে যান। মাসের পর মাস এভাবে কাটে। দরবেশজী হতাশ হয়ে পড়েন। এক রাত্রে তাঁর কান্না থামে না। গোসাঁই বুঝি দয়া করলেন না। কেঁদে কেঁদে তিনি বলেন, ‘হল না, হল না, গোসাঁই দয়া কর, গোসাঁই দয়া কর।’ ঐ রাত্রেই অঘটন ঘটে। এদিকে গোপেশ্বরবাবু তাঁর স্টুডিওতে চিন্তামগ্ন। তাঁর যশ, শিল্পচাতুর্য, প্রতিভা সবই অর্থহীন হয়ে উঠে। গোস্বামীপ্রভু তাঁর কাছে প্রকাশিত হন। গোপেশ্বরবাবু তাঁর পায়ে পড়ে বলেন, ‘প্রভো, কৃপা করে একটু বসুন।’ গোপেশ্বরবাবু তখন তন্ময় হয়ে ছেনী ও হাতুড়ি চালান। প্রভু পিছন ফিরে বলেন, ‘পিঠটা ভাল করে দেখে নাও।’ পরদিন কিরণচাঁদ ভোরে স্টুডিওতে গিয়ে দেখেন, যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন, সেই মূর্তি। সাষ্টাঙ্গ দিয়ে তিনি বলেন, ‘জয় হোক, গোসাঁই।’ মণি মজুমদার ঐ মূর্তি দেখে বলেন, ‘এবার বললেই হয়—মণি, কেমন আছ?’ ১৩৪৫ সালে কাশীর মঠে ঐ মূর্তি স্থাপন করা হয়।[১]

কত লোককে যে গোসাঁই অকৃপণভাবে আজ অবধি কৃপা করছেন। যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি শ্যামবাজারে থাকতেন। জীবন-সায়াহ্নে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ নিয়ে তিনি বিব্রত হয়ে পড়েন। টাকা-পয়সা নেই; গুরুকরণও হয় নি। গোস্বামীপ্রভু এবং সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। মনে মনে তিনি প্রত্যহই গোসাঁইর কাছে প্রার্থনা জানান, ‘প্রভো, আমার ব্যবস্থা কর।’

এক রবিবার বেলা দশটা নাগাদ দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘এখানে যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় থাকেন কি?’ যোগীনবাবু বসে ছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমার নাম যোগীন। কেন বলুন তো? আপনাদের তো চিনতে পারছি না।’ ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বলেন, ‘আমাদের বাড়ী মেদিনীপুর। আমার পিতার নাম শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর ইনি আমার বন্ধু। আপনার কি বিবাহযোগ্যা একটি কন্যা আছে?’ পাত্র আমারই ছোট ভাই, সুশিক্ষিত। মেয়েটিকে একবার ডেকে পাঠাবেন?’ মেয়ে দেখে তাঁরা বলেন, ‘আপনার মেয়েকে অপছন্দ করার কিছু নেই। আমরা আগামী রবিবার আবার এসে কথাবার্তা বলব।’ কিন্তু পরদিনই তাঁরা এসে উপস্থিত। তাঁরা যোগীনবাবুকে বলেন, ‘মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে; এবার এই যে পাত্রকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি, আপনারা দেখুন। এই মাসেই একটি শুভদিন দেখে বিয়ে হয়, আমাদের ইচ্ছা।’ যোগীনবাবু বিনীতভাবে বলেন, ‘আমার তো প্রস্তুত হতে কিছু সময় লাগবে।’ পাত্রপক্ষ বলেন, ‘আপনি শাঁখা-সিঁদুরের ব্যবস্থা রাখবেন, মেয়ে আমরা তুলে নিয়ে যাব।’ দিন স্থির হয়। যোগীনবাবু বলেন, ‘একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনারা এক সপ্তাহ পরে আসবেন বলেছিলেন, কিন্তু আজই যে এলেন!’ ক্ষেত্রবাবুর বড় ছেলে বলেন, ‘আমার ভাইটির সুপাত্রীর জন্য ব্যস্ত হয়ে চারদিকে খোঁজা-খুঁজি করছিলাম; কোথাও মনোমত পাত্রী না পেয়ে বাবা বলেন, ‘গোসাঁই যেদিন ব্যবস্থা করবেন ঐদিনই হবে।’ ঐ রাত্রে গোসাঁই স্বপ্নে আপনার নাম-ঠিকানা বলে দিয়ে পাত্রীর ফটো আমাকে দেখান। মেয়েটিকে দেখে দ্বিধা হয়েছিল, ফটোতে ওকেই দেখেছিলাম কিনা!

---

[১] সদানন্দ মিত্র-প্রণীত ‘শ্রীশ্রীদরবেশজী-প্রসঙ্গ’, পৃ ১০০-১০১।

গতরাত্রে গোসাঁই স্বপ্নে আবার আমাকে বলেন, 'যে মেয়েটি দেখে এসেছ, সে-ই চিহ্নিত পাত্রী।' বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে যায়। ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য। সজ্জন গৃহী-সন্ন্যাসী। প্রভু তাঁকে সাধন দেবার অনুমতি দিয়েছেন। একদিন রাত্রে গোসাঁইজী যোগীনবাবুকে স্বপ্নে নির্দেশ দেন, 'ক্ষেত্রনাথের কাছে গিয়ে সাধন নাও।' যোগীনবাবুর আর তর সয় না। রাত্রি-প্রভাতেই তিনি মেদিনীপুর ছুটেন বৈবাহিকের কাছে। অবিলম্বে তাঁর সাধন হয়।[১]

মহেশচন্দ্র দে সরকার মহাশয় তখন নারায়ণগঞ্জে ওকালতি করেন। শহরের উত্তরাংশে থাকেন। একদিন কোর্টে যাবার সময় গোলমাল শুনে বাড়ীর বাইরে এসে সরকার মহাশয় দেখেন, তাঁর ছ-সাত বছরের ছেলেকে কয়েকজন ভদ্রলোক অক্ষত অবস্থায় ধরে নিয়ে এসেছেন। তাঁরা বলেন, 'একটি লোক-বোঝাই ঘোড়ার-গাড়ির একটি চাকা খোকার পেটের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে, অথচ ওর কিছুই হয় নি।' সরকার মহাশয় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি হয়েছিল রে?' ছেলেটি বলে, 'গাড়ির নীচে পড়েই দেখি, গোসাঁই আমার উপর আলগা হয়ে উবুড় হয়ে আছেন। আমার গায় একটুও লাগে নি।' সরকার মহাশয় সকৃতজ্ঞচিত্তে গুরুকে প্রণতি জানান।[২]

গোসাঁইর শিষ্য ও জামাতা জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের শিষ্যা সরোজিনী মিত্র 'মা-মণি' নামে শ্রীক্ষেত্রে ভক্তসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে গোস্বামীপ্রভুর অশেষ কৃপাতে তিনি 'নিত্যলীলা' দর্শনের অধিকার লাভ করেন। 'মা-মণি' সেকেলে মানুষ ছিলেন। লেখা-পড়া বেশি কিছু শিখেন নি। তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন, 'বাংলা ভাষাতে বর্ণজ্ঞান নেই বললেই হয়।' কিন্তু তাঁর কাছে কত সুধীজন দিনের পর দিন জ্ঞান লাভ করেছেন। পুরীতে কুণ্ডাইবেণ্টশাহিতে 'ব্রজধামে'র একটি ঘরে তিনি থাকতেন। তাঁর ওখানে ভক্তসমাগম লেগেই থাকত। গোস্বামীপ্রভুর আদেশে মা-মণি প্রভুর অপ্রকট অবস্থার বহু উপদেশ জনসমাজের কল্যাণের জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। এই পুস্তকগুলির মধ্যে আছে—১. শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু উপদেশামৃত (১ম ও ২য় খণ্ড), ২. শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু উপদেশামৃত—পরিশিষ্ট, ৩. শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা, ৪. শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমলীলা, ৫. ঋষিবাণী, ৬. ত্রিবেণী ও ৭. সারসংগ্রহ মাধুরিমা। তাছাড়া 'জীবন-গাথা' নাম দিয়ে তিনি একখানি আত্মজীবনী লিখেছেন।

মা-মণির কাছে দীক্ষার্থীর ভিড় হত। কিন্তু তিনি দীক্ষা কাউকে দিতেন না। তবে তাঁদের কথা তিনি গোস্বামীপ্রভুকে জানাতেন। কোন নির্দেশ পেলে তিনি দীক্ষাপ্রার্থীকে তা জানিয়ে দিতেন। মা-মণি লিখেছেন, 'শ্রীমন্দিরে যাঁরা এইসব উপদেশ ও লীলা শ্রবণ করতেন, তাঁদের মধ্যে নবদ্বীপের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় পরিবারের গিন্নী শ্রদ্ধেয়া প্রভাতনলিনী দেবীও ছিলেন। ইনি লীলাকথা ও উপদেশ শুনে সদ্‌গুরু-দত্ত সাধনলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তিনি শ্রীশ্রীগোসাঁইজীর আদেশে শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী মহারাজের কাছে সাধনপ্রাপ্ত হন।'[৩]

মা-মণি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'শ্রীশ্রীগোসাঁইজীর প্রিয় ভক্ত শ্রীমৎ স্বামী

---

[১] যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত।

[২] মহেশচন্দ্র সরকার মহাশয় প্রমুখাৎ শ্রুত।

[৩] মা-মণি-প্রণীত 'জীবনগাথা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত, পৃ ৮০।

পরমানন্দ সরস্বতী মহারাজের সঙ্গে পরিচয় এবং যোগাযোগ অলৌকিকভাবে ঘটে।...............৬ই চৈত্র, ১৩৭২ সালে, শ্রীশ্রীগোসাঁইজীর নির্দেশানুযায়ী আমি স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তখন তিনি শ্রীক্ষেত্রে স্বর্গদ্বারের "নানকমঠে" ছিলেন। সেদিনের কথা "ত্রিবেণী"তে প্রকাশিত হয়েছে। তখন গোসাঁইজী জানান, "মা, আমি ওর মধ্যে বাস করি, আমার প্রিয় ভক্ত; আমার অসম্পূর্ণ কার্য্য ওর দ্বারা সম্পূর্ণ হবে।" পরে জানিতে পারি, ইনি গোসাঁইজীর আদেশে সত্যধর্ম প্রচার ও দীক্ষাদান করছেন। ইনি অধুনা আসামে কামাখ্যাধামে ও কলিকাতায় বিজয়কৃষ্ণপুরে আশ্রম-প্রতিষ্ঠা করেছেন।'[১]

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে চার পুরোধা ছিলেন—গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য। তাঁরা হলেন—১. মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ২. অশ্বিনীকুমার দত্ত, ৩. সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বড়বাবু) ও ৪. বিপিনচন্দ্র পাল। অহিংসা আন্দোলনে অপ্রকট অবস্থায় গোসাঁই-ই তাঁদের প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করায় পুলিশের নির্মম অত্যাচারে বরিশালে মনোরঞ্জনবাবুর বড়ছেলে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। অজ্ঞান হবার সময়ও তার মুখে ছিল—'বন্দেমাতরম্'। ঐদিন সন্ধ্যায় বক্তৃতা-মঞ্চে উঠে মনোরঞ্জনবাবু বলেছিলেন, 'আজিকার ঘটনায় যদি খোকার মৃত্যুও হত, তাতে আমি আনন্দিত হতাম। সে যে মারের ভয়ে মুখ বন্ধ করে নি, এটি আমাদের আশা, প্রেরণা ও গৌরবের কথা।'

অশ্বিনীবাবু বলেছিলেন, 'স্বার্থ ও সংকীর্ণতার যে গাঢ় অন্ধকার আমাদের হৃদয়ে ঘনীভূত হয়ে আছে, তা ভগবৎ প্রেমের আলোকে বিদূরিত করে, ঐ আলোকের বর্তিকা হাতে নিয়ে আমরা এই সংগ্রামে অগ্রসর হব।...আমরা ঋষিবাক্য অবহেলা করে যেন কোন হিংসার কাজে ব্রতী না হই। আমরা বুক পেতে গুলির আঘাত নিতে প্রস্তুত হব, কিন্তু কায়মনোবাক্যে প্রতিহিংসার চেষ্টা করব না, অথচ সঙ্কল্প অটুট রাখব।'

"ডন" ম্যাগাজিনে সতীশচন্দ্র লিখেন, 'জাতির অভিমত উপেক্ষার উত্তরে, জাতি সরকারের বিরুদ্ধে ধারণ করেছে—"বয়কট" নামক অস্ত্র। পরের ধাপ—স্বদেশী, যা দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ।' ভারতীয় ছাত্রসমাজের স্বদেশ-প্রীতি-বর্ধন ছিল "ডনে"র মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের মাত্রা বাড়িয়ে ভারতীয়দের অন্তরে দেশজ শিল্পসম্ভারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা ও জাতীয় শিক্ষা-প্রসারের সহায়তায় "ডনে"র তুলনা হয় না। সতীশচন্দ্র (বড়বাবু) ছিলেন তখন জাতীয় শিক্ষান্দোলনের পথিকৃৎ। তিনি ছিলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের (যার পরিণতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক।

বিপিনবাবু ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় তখন তিনি বলেন, 'পড়াশুনা কিসের? যখন বাড়ীতে ডাকাত পড়ে, তখন কি তোমরা বই খুলে পড়? গ্রামে যখন মড়ক লাগে, তখন কি কেউ পরীক্ষার ভাবনা ভাবে? বরিশালের সংবাদে আমরা যে বুড়া হয়েছি, আমাদেরই রক্ত গরম হয়ে উঠে। মুখে ভাত যায় না, রাত্রে ঘুম হয় না। আর তোমরা কি অমানুষ হয়েছ? তোমরা আজ এগজামিন নিয়ে ব্যস্ত! তোমাদের যৌবনের সেই উদারতা কোথায়? দেবভাব-ই বা কোথায়? তোমাদের বিশ্বপ্রেম-ই বা আজ কোথায়? পড়া-

---

[১] মা-মণি-প্রণীত 'জীবনগাথা' গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত, পৃ ৯০।

শুনা ছেড়ে দল বাঁধ। মুখে বল ‘বন্দেমাতরম্’, আর প্রাণে মায়ের ‘অভয়’ নিয়ে যাও বরিশালে, যাও মাদারিপুর, যাও ফরিদপুর; যাও যেখানে গুর্খা গিয়েছে। সেখানেও যাও, যেখানে গুর্খা যায় নাই। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ‘বন্দেমাতরম্’ রব তুলে দাও।’

গোসাঁইর শিষ্যেরা শেষ বয়সে সকলেই গুরুকে কেন্দ্র করে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের গানে বুঝা যায় গুরুপ্রেমে তিনি কেমন মেতেছিলেন—

ইনি যখন দয়া করেন, কি যে তখন হয়ে যাই,
কারে কব সে-সব কথা?
শুনলে পাগল বলবে ভাই।

গোসাঁইকে উদ্দেশ্য করে অশ্বিনীবাবু গান লিখেছেন—

তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু মধু মধু!
তুমি মধুর সায়র, মধুর নিঝর, (তুমি) আমার পরাণ বঁধু॥
আমার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সকলি তুমি হে,
আমার সাধন তুমি, ভজন তুমি, সকলি তুমি হে;
আমার তন্ত্র তুমি, মন্ত্র তুমি, যন্ত্র তুমি হে॥
কিবা মধুর রূপের মধুর কাহিনী, মধুর কণ্ঠে গায়,
আর শুনিতে শুনিতে, গলিতে গলিতে, প্রাণ মধু হয়ে যায়।
বিশ্ব হয় মধুময়, তোমার রূপে নয়ন দিয়ে, বিশ্ব হয় মধুময়,
তখন সকলি মধু; তখন বাক্য মধু, শ্রুতি মধু, দৃষ্টি মধু,
তখন তুমিও মধুর, আমিও মধুর, বিশ্ব মধুময় হয়ে যায়।
তখন অনল-অনিল-জলে মধু-প্রবাহিনী চলে, মেদিনী হয় মধুময়;
মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, তখন মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
তখন প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে, মধুর মধুর ধ্বনি হয়;
বাজে মধুরং মধুরং, অনাহত ধ্বনি বাজে—মধুরং মধুরং,
বাজে সত্যং শিবং সুন্দরম্॥
যেরূপ ভাতে যেখানে, যে কথা পশে গো কানে,
স্তুতি-নিন্দা সকলি মধুর॥
তখন কটু কথাও মিঠা লাগে, তখন গালিও যে সুধা ঢালে,
তখন বজ্রনাদ, কুহুধ্বনি, গুরু সোম, রাহু শনি,
মধু রসে সকলি ভরপুর॥
তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু মধু মধু!

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

সংযোজন

১. জটীয়াবাবার সমাধি-আশ্রম

অনাত্ম জড়শিক্ষা ও তামসিক অন্ধকার সমাজ-মানসকে আজ বড় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তথাপি সমাধি-আশ্রমে প্রবেশমাত্রই এই অনুভূতি হয় যে ভারতাত্মা এখনও লোপ পায় নি।

আশ্রমটি তপোবন-সদৃশ শান্তির নীড়। শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষের পত্ররাজি নিম্ন-মুখী। তরু-লতা-উদ্ভিদ ব্রজের রজঃ পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। এই আশ্রমটির পরিবেশও অনুরূপ। পত্রাদি সব অধোমুখী। পূর্বদ্বার দিয়ে আশ্রমে প্রবেশ মাত্রই চোখে পড়ে, একটি প্রাচীন বকুলবৃক্ষের প্রকান্ড একটি ডাল—শাখা-প্রশাখা, ফল-ফুল-পাতা নিয়ে শ্রীমন্দিরে (সমাধি-মন্দিরের) দিকে প্রাঙ্গণ-ভূমির উপর লুটিয়ে পড়েছে। দেখে স্বতঃই মনে হয় প্রকৃতি যেন গোস্বামীপ্রভুকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করছে। কাছে গেলে বুঝা যায় বৃক্ষটির স্বভাবতঃই ও রকম ভঙ্গি। সিমেন্ট-বাঁধান জমির উপর গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত সারা বছর ধরেই পাতা-গুলি চির-সবুজ। আতপ-উত্তপ্ত ভূমি তাদের ম্লান করতে পারে না। অথচ গ্রীষ্মের প্রচন্ড প্রখর রৌদ্রে ওখানে দু-মিনিট দাঁড়ান এক অসাধ্য ব্যাপার।

আর একটি বিচিত্র দৃশ্য—আশ্রমের বৃক্ষগুলি চারদিক থেকে শ্রীমন্দিরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। প্রণতি জানাবার জন্য যেন তাদের মধ্যে রেষারেষি। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে বলে, গাছপালা আলোর দিকে হেলে। কিন্তু প্রকৃতি দেবী এই ক্ষেত্রে গোস্বামীপ্রভুর চরণ-ধূলি পাবার জন্য যেন নিয়মের ব্যতিক্রম করছেন!

সময়োপযোগী ফল-ফুলে আশ্রম ভরে থাকে। প্রভুর সেবায় লাগার জন্য উদ্ভিদ-জগতও তৎপর। কে কত ফল-ফুল ধারণ করতে পারে, এই নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা! নাগলিঙ্গ ফুলের কয়েকটি বড় গাছ ঋজু হয়ে উঠেছে। ফুল যখন ফোটে, সৌরভে ও রঙে আশ্রমের শোভাবর্ধন করে।

সমাধি-আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তটি শান্ত সমাহিত হয়ে আসে। পুরী শহরের কোলাহলের মধ্যে আশ্রমটি অবস্থিত হলেও এখানে বিরাজ করে এক অপার্থিব নিস্তব্ধতা—এমনই স্থান-মাহাত্ম্য। আশ্রমের কোন বৃক্ষ থেকে অকারণ একটি পাতা ছেঁড়ার নিয়ম নেই। বৃক্ষ-সেবা, জলদান আশ্রমের নিত্য কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে। এখানে হিংসা নেই। আশ্রমের পুকুরটিতে মাছ নির্ভয়ে চলা-ফেরা করে।

চন্দন-যাত্রার সময় একদিন নরেন্দ্র-সরোবরে অবস্থিত মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে নরেন্দ্রের উত্তর পাড়ে গভীর বনানীর মধ্যে যে মন্দিরের সোনালী শীর্ষদেশ গোস্বামীপ্রভুর দৃষ্টিপথে পড়েছিল, তা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই এই সমাধি-মন্দিরের। দিব্যদৃষ্টিতে তাঁর কাছেই তখন তা প্রকাশ পেয়েছিল। ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে কিছুই অজ্ঞাত ছিল না।

সমাধি-আশ্রমের দক্ষিণে নরেন্দ্র-সরোবর। আশ্রমের পশ্চিমাংশে একটি অতি-প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে। নরেন্দ্রে ভক্তসঙ্গে জলকেলি করে সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই বৃক্ষটির সুশীতল ছায়ায় বসে গদাধরের শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ

শুনতেন। আশ্রমটি যথার্থই মহাতীর্থ। আশ্রমের আকাশবৃত্তি। কিন্তু দৈনন্দিন কর্মসূচী দেখে বিস্মিত হতে হয়। পঁচিশ-ত্রিশ জন ভক্ত প্রতি বেলায় উপাদেয় প্রসাদ পেয়ে থাকেন। আশ্রম-প্রতিষ্ঠা থেকে রাত্রে মহাপ্রসাদ দিয়ে প্রত্যহ কাঙ্গালী সেবা হয়। ১৩০৬ থেকে ১৩৪০ সাল পর্যন্ত আশ্রমে রান্নার পাট ছিল না। মহাপ্রসাদ দিয়ে ভোগ হত। ১৩৪১ সাল থেকে পাচক ও পরিচারক নিয়োগ করে ভোগ রান্নার প্রচলন হয়। প্রভু শ্রীদেহে থাকাকালীন (যখন যেখানে থাকতেন) সেবা-পূজার কাজ যেমনটি ঘড়ি ধরে রুটিন মত হত, এখনও ওরকম হয়। মঙ্গল-আরতি, ঊষাকীর্তন, বাল্যভোগ, পাঠ, পূজা, মধ্যাহ্ন-ভোগ, পাখির আহার, জলদান, মহাভারত পাঠ, সন্ধ্যারতি, কীর্তন, ভোগ, শয়ান, সবই ঘড়ি ধরে চলে। ঘড়ির সময় কিন্তু প্রচলিত ভারতীয় সময় (ইন্ডিয়ান টাইম) নয়। প্রভু প্রকট থাকাকালীন যে সময়ের প্রচলন ছিল, তাই।

সমাধি-মন্দিরে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে তিরোভাব বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সহস্রাধিক ভক্ত তিন দিন ধরে প্রসাদ পান, বহিরাগতেরা অনেকে রথযাত্রা পর্যন্ত আশ্রমে থেকে যান।

আশ্রমের বর্তমান সেবায়েত প্রভুর শিষ্য ও দৌহিত্র শ্রীযুক্ত জগদানন্দ মৈত্র। তিনি শান্তিসুধা দেবী ও জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের আত্মজ। সমাধি-আশ্রমের সেবায়েত পর্যায়ক্রমে হলেন—**১. যোগজীবন গোস্বামী, ২. সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩. রায় বাহাদুর মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ৪. হারাণচন্দ্র চাকলাদার ও ৫. শ্রীযুক্ত জগদানন্দ** মৈত্র। বর্তমান কমিটিতে আছেন :—১. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য শ্রীযুক্ত প্রিয়ব্রত সেন, চেয়ারম্যান; ২. গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়, ৩. যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত পীযূষকিরণ চক্রবর্তী, ৪. জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ৫. জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত শীতলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

সমাধি-আশ্রমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি হয়, এক বিরাট সত্তা। অন্তর স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলে উঠে—'জয় গোস্বামীপ্রভু কি জয়! জয় গোস্বামীপ্রভু কি জয়!! জয় গোস্বামীপ্রভু কি জয়!!! জয়তু সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ।'

ওঁ হরিঃ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

২. মৌন অবস্থায় লিখা খাতা হতে গোস্বামীপ্রভুর কতিপয় বাণী-সংকলন

১. বেদ ও উপনিষদে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে হিন্দুশাস্ত্র বুঝিতে পারা সুকঠিন। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে ধর্মের জটিল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে পারে না। আদিপর্বে একটি বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা শান্তিপর্বে রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে একটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহার সমগ্র অংশ মার্কেণ্ডয় পুরাণে; মনুসংহিতায় এক বিষয়, তাহার ব্যবস্থা বৃদ্ধ গৌতম সংহিতায়; নির্বাণতন্ত্রে এক বিষয় উল্লেখ হইয়াছে, তাহার সমগ্র ভাগ রুদ্রযামলে, যজুর্বেদ সংহিতায়; সামবেদ সংহিতায় একটি আখ্যায়িকা, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে, বিষ্ণু-পুরাণে ইত্যাদি। সুতরাং সমগ্র শাস্ত্র না পড়িলে শাস্ত্রের

মত বলা বিড়ম্বনা ও অজ্ঞানতা মাত্র।

সাধারণ লোকের দোষ নাই, তাহারা শিক্ষা পায় না। দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সকলেই ব্যবসায়ী। কেবল অর্থোপর্জনের জন্য যতটুকু অধ্যয়নের প্রয়োজন, তাহাই পড়েন। নিজের ধর্মলাভের জন্য শাস্ত্রালোচনা করেন না। তাহা হইলে এদেশে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, মনু, অত্রি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ সমস্ত এবং আগম-নিগম-তন্ত্র বিশেষরূপে প্রচলিত থাকিত।

২. ঋক্‌ যজুঃ সাম অথর্ব-বেদ এক; তাহার শিক্ষার জন্য তাহাকে চারি ভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত চারি বেদ শিখিতে ছত্রিশ বৎসর সময় আবশ্যক। সুতরাং সকলে সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে না। এক ভাগ কি দুই ভাগ অধ্যয়ন করে। সুতরাং যিনি যে অংশ অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহারই আচার্য হন। এজন্য বেদাঃ বিভিন্নাঃ। বেদ যে ভিন্ন তাহা নহে। যেমন হাতের সঙ্গে পা ভিন্ন। বস্তুত এক শরীর মাত্র। যিনি সামবেদের আচার্য, তিনি যজুর্বেদের শিক্ষা দেন না। অথবা যজুর্বেদের মধ্যে সামবেদের বিষয় নাই। যদি যজুর্বেদ শিক্ষা কর, তবে যজুর্বেদীয়ের নিকট যাইতে হইবে। যদি সম্পূর্ণ বেদবেত্তা পাওয়া যায়, সেখানে বেদ বিভিন্না নহে।

ব্যাস লিখিয়াছেন—বকরূপী ধর্ম। অর্থ বুঝে না। ধর্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত। গুহা শব্দের অর্থ মনুষ্যের হৃদয়। এই শ্লোক উপনিষদের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা। ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ, জ্যোতিষ—এসব অপরা-বিদ্যা।

৩. যাহা দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাই পরাবিদ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা; তাহা মনুষ্যের অন্তরে নিহিত আছে। এক এক ঋষি এক এক বেদের বিষয় শিক্ষা দিবেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিক্ষা করিতে হইবে। মানবাত্মার মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে পার, তবে সমস্ত লাভ হইবে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। বেদ শব্দে ব্রহ্ম, পরমাত্মা পরব্রহ্ম।

৪. শাস্ত্রের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে হয়। শাস্ত্র নিজে পড়িলে বুঝা যায় না। অধ্যাপকের নিকট পড়িলে শাস্ত্রের সামঞ্জস্য বুঝা যায়।

৫. দেবতা ও অসুর উভয়েই এক পিতার সন্তান। দেবতা যিনি তিনিও অসুর হইতে পারেন। অসুরও দেবতা হইতে পারেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ—দেবা অসুরাঃ প্রজাপত্যাঃ। যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া চলেন, তাঁহারা দেবতা। যাঁহারা নিজের বুদ্ধিতে চলেন, তাঁহারা অসুর।

৬. ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবত এই দুইখানি গ্রন্থ উপনিষদের ভাষ্যস্বরূপ। গীতা ও ভাগবতের প্রণালীতে সাধন করিলে ঋষিদিগের প্রাণের কথা, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭. ব্রহ্মের দুইটি ভাব—নিত্য এবং লীলা। 'নিত্য' সাধন গীতা দ্বারা হয়। 'লীলা' সাধন ভাগবত দ্বারা হয়।

৮. এখন শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা স্মৃতি ও ন্যায়ের সংগ্রহ মাত্র পড়েন, মূলশাস্ত্র পড়েন না। ঋগ্বেদ প্রভৃতি উপনিষদ, ধর্মসংহিতা, পুরাণতন্ত্র, আয়ুর্বেদ,

ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, স্থপতি বিদ্যা এই সমস্ত ছত্রিশ বৎসর পাঠের ফল।

৯. শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা বেদব্যাস প্রকাশ করেন। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র সমস্তের সার এক স্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন।

১০. কোন একখানা গ্রন্থ পড়িলে উপকার হইবে না। প্রথমে বাছিয়া বাছিয়া পড়া উচিত। যেমন মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ ভাগবত, গীতা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ভক্তমাল, অধ্যাত্মরামায়ণ। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্য হইতে নিজের রুচি অনুসারে পাঠ করিতে হইবে। যখন শাস্ত্রে একটু রুচি জন্মিবে—বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ পাঠ করিলে উপকার হইবে। হিন্দি ভক্তমাল আরও ভাল। তাহাতে অনেক সন্দেহজনক কথা নাই।

১১. ধর্মের নূতন কথা বলিতে সেই ঋষিদিগেরই শক্তি ছিল। তাঁহারা দয়া করিয়া যে সকল ধর্মমত শাস্ত্ররূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের নাই, তবে তাঁহাদের উপদেশ যথার্থরূপে পালন করিতে ইচ্ছা হয়। এখন শারীরিক, সামাজিক এবং অন্য অনেক কারণে প্রকৃত শাস্ত্র ও সদাচারের অনুগত হওয়ায় কঠিন বোধ হইতেছে।

১২. শাস্ত্র ঋষিবাক্য, সদাচার মহাজনদিগের আচরণ; ইহা ভিন্ন আর সকলই অসার। ইহার সঙ্গে মিলিলে গ্রহণ করা কর্তব্য নতুবা বিষবৎ ত্যাজ্য।

১৩. শাস্ত্র ও সদাচার ধরিয়া থাকিলে ঠকিতে হয় না। পুরাতন লইয়া বসিয়া থাকিলে লাভ আছে।

১৪. শাস্ত্র ও সদাচারের সঙ্গে যোগ থাকিলে ঠিক হইবে। নতুবা কৃত্রিম।

১৫. শাস্ত্রে বিশ্বাস হইলেই শুভবুদ্ধির উদয় হয়। ঋষিদিগের আশীর্বাদে শাস্ত্রে বিশ্বাস হয়।

১৬. শাস্ত্র বিশ্বাস করিলে আর ভয় থাকে না।

১৭. শাস্ত্র অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজন। ঋষিদিগের পদানুসরণ ভিন্ন গতি নাই।

১৮. ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র এবং ঋষিগণ যেরূপ সদাচার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলে নিশ্চয়ই উপকার হয়।

১৯. আমরা ঋষিবাক্য ও সদাচারের দাসানুদাস।

২০. শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন অন্য পথে যদি ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, তাহাও যাইবে না। কারণ দৈবাৎ দুই-এক ব্যক্তি পূর্বজন্মের সুকৃতির বলে অন্য পথে সদ্গতি পাইতে পারেন। কিন্তু যাহাদের প্রথম আরম্ভ, তাহারা মহাঘোর অন্ধ তামসে ঘুরিয়া বেড়াইবে। ইহা ঋষিবাক্য।

২১. নিজের আত্মাতে নিষ্ঠা না জন্মান পর্যন্ত কোন শাস্ত্রপাঠ বা কোন সাধুসঙ্গ ঠিক নয়। সাধুদের সকলের পথ এক নয়। তাই বিশেষ নিষ্ঠা না জন্মিলে ভিন্ন পথাবলম্বী সাধুসঙ্গ হইতে ক্ষতি হয়।

২২. শাস্ত্রকর্তাগণ কলির দুরবস্থা জানিয়া কেবল 'হরিনাম' এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। 'হরি' যে নামে উদ্ধার হওয়া যায়, তাহাই 'হরিনাম'। হরি, দুর্গা, বিষ্ণু, রাম, কালী, শিব, গায়ত্রী সমস্তই 'হরিনাম'।

২৩. 'হরি' এ শব্দমাত্র হরি শব্দ নহে। যে নামে যাঁহার পাপ হরণ হয়, তাহাই 'হরিনাম'। দুর্গা, কালী, রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, আল্লা, খোদা, যীশু, যিনি যে নামে বিশ্বাসী, তাঁর তাই হরিনাম।

২৪. গুরু নানক পুনঃ পুনঃ মনোমুখ অর্থাৎ শাস্ত্রহীন পথের অপকারিতা দেখাইয়াছেন।

২৫. গুরু নানক কথায় কথায় বেদ, পুরাণ, স্মৃতি এ সকল মান্য করিয়া তদনুসারে উপদেশ দিতেন।

২৬. শাস্ত্রপাঠে প্রতারণা হতে রক্ষা পাওয়া যায়। শাস্ত্র না জানিলে সমস্তই অবিশ্বাস হয়। যদি জানা থাকে তবে সত্য অসত্য প্রভেদ করা যায়।

২৭. বর্তমানকালে শাস্ত্রমতে দীক্ষা হয় না। কারণ শাস্ত্রে আছে, শিষ্য এক বৎসর গুরুকে পরীক্ষা করিবেন। গুরুও শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন। যদি শাস্ত্রমতে উভয়ে লক্ষণযুক্ত হন, তবে দীক্ষা হইবে। নতুবা অপাত্রে দীক্ষা হইলে অথবা প্রদান করিলে, তাহার ফল ভাল হয় না।

২৮. কেবল সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লইতে কোন বিচার নাই। দিন-ক্ষণ কিছুই দেখিতে হয় না। তবে সদ্‌গুরু কিরূপে চিনিবে? কোন লক্ষণ দ্বারা সদ্‌গুরু চিনিতে পারা যায় না। অনেক জন্ম সাধন-ভজন করিলে, উপযুক্ত সময়ে ভগবৎ কৃপায় সদ্‌গুরু চিনিতে পারা যায়।

২৯. 'পৈতৃক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে,' শাস্ত্রে এরূপ কথা নাই। কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইবে। 'কুলগুরুর' অর্থ, যাঁহার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়াছে, তিনি 'কুলগুরু'।

৩০. 'হরিভক্তিবিলাস' মতে গুরু করিতে হইলে, পৈতৃক গুরু হয় না। বেদবেত্তা ও ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মেতে শান্তি লাভ করিয়াছেন, এইরূপ গুরুকে অবলম্বন করিবে। যে ব্রাহ্মণ বাসনাহীন, রিপুসমস্ত নষ্ট হইয়াছে, সমস্ত শরীর নির্মল অর্থাৎ অঙ্গহীন নহে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে গরিষ্ঠাভক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন, এমন গুরুকে আশ্রয় করিবে।

৩১. গুরুতে বিশ্বাস হওয়া অতি কঠিন। বিশ্বাস হইলেই কার্যসিদ্ধি হয়। আশ্চর্য কার্য দেখিলে বিশ্বাস হইবে মনে হইল। আশ্চর্য দেখিলাম, তখন মনে হইল ইহা আশ্চর্য কি? যদি বিশেষ কিছু আশ্চর্য দেখিলাম, মনে হইল এ লোকটা ভেল্‌কি জানে। আমাকে ভেল্‌কি দেখাইতেছে। এইরূপ উপায়ে বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হইবার একমাত্র পথ এই যে, গুরু যাহা উপদেশ দেন, তাহা আচরণ করা। আচরণ করিতে করিতে হৃদয়ের বিকাশ হইলেই বিশ্বাস হইবে।

৩২. যতদিন প্রকৃত শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন পৈতৃক গুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া পূজা অর্চনা করিতে হইবে।

৩৩. শাস্ত্রের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ঋষিবাক্যের বিরুদ্ধে উপদেশ যিনি দেন, তিনি আর্যঋষি শাস্ত্রমতে গুরু নহেন। শাস্ত্র ও মহাজনদিগের সঙ্গে যাহা মিলিবে না, তাহা বিষবৎ ত্যাগ করিবে।

৩৪. দীক্ষা সম্বন্ধে দুই প্রকার ব্যবস্থা। বৈদিক নিয়মে বেদবেদান্তবেত্তা আশ্রমী অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের কোন আশ্রমে যিনি নিয়মিত আচার প্রতিপালন করেন, এমন বেদজ্ঞ সদাচারী আশ্রমী ব্রাহ্মণ সদ্‌গুরু শব্দবাচ্য। বৈদিক সদ্‌গুরুর নিকট কেবল ব্রাহ্মণ ওঁকার মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন। অন্য জাতির অধিকার নাই।

দ্বিতীয় তান্ত্রিক। কলিতে যে সকল দুর্বল ব্রাহ্মণ বৈদিক আশ্রম ও

সদাচার প্রতিপালনে অক্ষম, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের জন্য মহাদেব দয়া করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিবর্ণ এবং সমস্ত বর্ণ-সঙ্কর মনুষ্যের অধিকার আছে।

তন্ত্রসাধনের তিনটি সোপান—পশু, বীর, দিব্য। এই ত্রিবিধ সাধনে কৃতকার্য হইয়া যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থের সহিত মন্ত্রচৈতন্য করিয়াছেন, তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। এই সিদ্ধমন্ত্রের সহিত ওঁকার যুক্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধমন্ত্রে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সদ্‌গুরু। এই সদ্‌গুরু মহাদেবের আজ্ঞানুসারে সর্ববর্ণকে ওঁকারযুক্ত মন্ত্রপ্রদান করেন। তাহা সাধন করিলে নিতান্ত শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিও তিন জন্মে মুক্তিলাভ করেন। সত্য সত্য সত্য শিববাক্য।

৩৫. শাস্ত্রে আছে যাদের শ্রদ্ধা বিকাশ হয় নাই, তাহারা ধর্মের জন্য নানা গুরুর আশ্রয় লইবে। যেমন মধুকর এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যায় সেইরূপ। কিন্তু ইহাতে ধর্মলাভ হয় না। উপযুক্ত সময় হইলে, শ্রদ্ধা বিকাশ হইতে থাকে। তখন একস্থানেই মনঃস্থির হয়। উপনিষদের মত যে, যতদিন শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন গুরুকরণ করিবে না।

৩৬ শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম-জপ করাই পরম সাধন। নামই শ্রেষ্ঠ মাদক। হরিনাম, ইষ্টনাম করিতে করিতে যে নেশা হয়, তাহার কাছে ভাঙ্গ, গাঁজা, আফিং, সুরা প্রভৃতি যত প্রকার মাদক আছে, তাহা কিছুই নহে। নামের নেশা ছোটে না, সর্বদা স্থায়ী।

৩৭. নাম করে, পাপ করে, তাহাদিগকে ভয়ানক অপরাধী বলিয়াছেন। নাম অপরাধ—এমন পাপ আর নাই।

তৃণের মত নীচ হয়ে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে, মান্য ব্যক্তির মান্য করে, নিজের অভিমান ত্যাগ করে, নাম করিলে নামের ফল তৎক্ষণাৎই পাওয়া যায়। তবে ঐসব অবস্থা সৎসঙ্গ, ধর্মগ্রন্থ-পাঠ, গুরু আজ্ঞা-পালন, পিতা-মাতার, গুরুজনদিগের এবং ভগবদ্-ভক্তদিগের সেবা দ্বারা লাভ হয়।

৩৮. যিনি জিহ্বা এবং উপস্থ জয় করিয়াছেন, সর্বদা রসের স্বাদ দূরীভূত হইয়াছে এবং সর্বদা অন্তর্মুখে ভগবানের নাম জপ করেন, তাঁহাকে কিছুতেই বাধা দিতে পারে না।

৩৯. শরীর রক্ষা হয়, অথচ অহিত না হয়, এরূপ আহার করা উচিত। মাত্রা স্থির ও সময় স্থির থাকা চাই। যে কোন বস্তু আহার করুন, মাত্রা ঠিক রাখা ও সময় ঠিক রাখা প্রয়োজন।

৪০. আহারের সঙ্গে ধর্মের যোগ আছে। কারণ শরীর ও আত্মা একত্র আছে। এই আহার অতি সাবধানে না করিলে ধর্ম নষ্ট হয়। এক ব্যক্তি লঙ্কা খায় না। তাহাকে লঙ্কা দিলে সমস্ত দিন শরীরে জ্বালা হইবে। ধর্মসাধন রহিত হইবে। যদি তাহার ধর্ম বিশ্বাসে নিষেধ করে তাহা হইলে দোষী, নতুবা নহে।

৪১. প্রতি গ্রাসে নাম করিয়া ভোজন করা কর্তব্য। কত গ্রাসে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, এই গ্রাসই ঠিক রাখিতে হয়।

৪২. আহার সম্বন্ধে সময় আর পরিমাণ ঠিক রাখাই নিতান্ত প্রয়োজন। পরিমাণ ও সময় প্রতিদিন ঠিক থাকিলে, শরীর সম্বন্ধে আর কোন ক্লেশ

থাকে না। নিমন্ত্রণ খাওয়া ভাল নয়। ঐ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, ক্রমে কমিতে কমিতে অভ্যাস অধীন হইবে।

৪৩. আহার প্রভৃতি আপনা হইতে ঠিক হইয়া আইসে। আমি ঝাল, টক, মিষ্টি এই তিনই অধিক খাইতাম। এখন ঝাল মাত্রও সহ্য হয় না। একটু অধিক টক হইলে আর সহ্য হয় না। মিষ্টিও ঐরূপ।

৪৪. যাহার যে অভাব, তাহা সেই জানে, অন্যে বুঝে না। নিজের শরীরে কি চায়, তাহা অনেক বিজ্ঞও জানে না। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইহার কোন্ পদার্থের কোন্ কার্য তাহা না জানিলে, প্রকৃত আহার কি তাহা না জানিয়া লোকে আহার করে। বালক শৈশবে নিজে মলত্যাগ করিয়া নিজে ভক্ষণ করে এবং অতি আনন্দে হাস্য করে। কিন্তু পিতা-মাতা ঘৃণায় নাকে হাত দেন।

ক্রোধী যদি লঙ্কা, সর্ষপ প্রভৃতি পিত্তবৃদ্ধিকর উত্তেজক বস্তু ভোজন করে, কামুক যদি মৎস্য, মাংস, ঘৃত, মধু এবং মিঠাই ইত্যাদি খায়, লোভী যদি অধিক তিক্ত খায়, অহঙ্কারী যদি মসুরের ডাইল খায়, সংসার-মোহে আসক্ত ব্যক্তি যদি অম্বল খায়, অভিমানী যদি অধিক লবণ খায়, তাহা হইলে ঐ শিশুর ন্যায় আহার করা হয়। জ্ঞানীপুরুষগণ অবাক হইয়া থাকেন।

সাংখ্যযোগে কপিলদেব পঞ্চতত্ত্বকে বিভাগ করিয়া এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া প্রত্যেক তত্ত্বের সহিত শরীর ও মনের কি সম্বন্ধ তাহা ঠিক করিয়া আহার-বিহার সকল ঠিক ঠিক রূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ, মার্কেণ্ডয়পুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারত, শান্তিপর্ব, পাতঞ্জল দর্শন, মৈত্রোপনিষদ, শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা, তন্ত্র, রুদ্রযামল ইত্যাদি গ্রন্থে এই বিষয়ে অনেক লিখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে আহার বিহার অভ্যাস করা কর্তব্য।

৪৫. ধর্মসাধন দুই প্রকার। যাহারা প্রবৃত্তির অধীন, তাহাদিগকে প্রবৃত্তি ধর্ম—শক্তিধর্ম নাম দিয়াছেন। নিবৃত্তি ধর্মকে বৈষ্ণব ধর্ম নাম দিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে।

৪৬. উপযুক্ত ব্যবহার ধর্ম, অপব্যবহার পাপ। সকল বিষয়ে অপব্যাহার পাপ। টাকা, শরীর ধর্ম।

৪৭. কীর্তনে একটু নৃত্য করিল, একটু ভাব হইল, ইহাকেই এখন ধর্ম বলে। ইহা ধর্ম, সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্মের প্রধান অঙ্গ সত্য, ন্যায়, জীবে দয়া, পিতা-মাতা, গুরুজনে ভক্তি, সৎসঙ্গে স্পৃহা, পরস্ত্রী দর্শনে সাবধান, পরধনে অ-লোভ। এইগুলি প্রথম অঙ্গ। হরিনামের ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে ঐ ফলগুলি প্রথমে দেখা যায়। উহা না হইলে জীবনে ধর্মের আরম্ভ হইল না।

৪৮. যখন মনুষ্য অধর্ম করে, প্রথমে নারায়ণ তাহাকে নিবারণ করেন। যখন কিছুতেই শুনে না, তখন নারায়ণ পলায়ন করেন। নারায়ণের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ লক্ষ্মীঠাকুরানীও ধীরে ধীরে চলিয়া যান। থাকে কেবল পূর্ব গৌরব। পুরাতন গৌরব বহন করিতে করিতে মস্তকে ক্ষত হয়। ক্ষতের দুর্গন্ধে লোকে নিকটে যাইতে দেয় না। তাহাতে হয় বিবাদ। লোকেরা দূর দূর

করিয়া তাড়াইয়া দেয়। ঘরে এসে গৃহিণীকে প্রহার করে।

৪৯. ধর্মের জন্য যাহা ভাল লাগিবে, তখনই তাহা করিবে। কোন মানুষের দিকে চাহিবে না।

৫০. যাহারা টাকা-কড়ি দিয়া তুষ্ট করিতে চায়, তাহারা চিরদিনই ধর্মরাজ্যে নিন্দিত। ভগবান্ তাহাদের দোষ অন্তরে মাখাইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন। তাহাতে তাহারা ঐহিক পারত্রিক ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহা অপেক্ষা আর শাস্তি কি হইবে? যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা একটু জানিতে পারিলে আর তাহাদের গৃহে পদার্পণ করেন না। ইহাও অল্প শাস্তি নহে।

৫১. ধর্ম এক এবং মত অন্য। মতের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধর্মের কখনও পরিবর্তন হয় না।

৫২. ধর্মজীবন না হইলে অনুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। গঙ্গাস্নান করিতেছে, মালাজপ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিতছে, অথচ প্রাণে নিষ্ঠা আসিতেছে না, তাহাতে ফল কি? ধর্ম বাহিরের বস্তু নহে।

৫৩. অস্বাভাবিক যাহা তাহা ধর্ম নহে। ধর্ম শব্দের যথার্থ অর্থ স্বভাব। যাহার যাহা স্বভাব তাহা ধর্ম। জলের স্বভাব শৈত্য, অগ্নির স্বভাব দাহিকা।

৫৪. ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ধর্মের দৃষ্টান্ত হইয়াছেন। রামচন্দ্র সত্য-নিষ্ঠার আদর্শ। পিতৃ-সত্য পালনের জন্য ১৪ বৎসর বনে বাস করিলেন। রাজধর্ম প্রজারঞ্জনের জন্য সীতা ত্যাগ করিলেন। সত্যরক্ষার জন্য লক্ষ্মণকেও বর্জন করিলেন। এ কি মানুষের সাধ্য? সীতাতে সম্পূর্ণ অনুরাগ। তখনকার রাজারা হাজার হাজার বিবাহ করিতেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এক-পত্নীক। যজ্ঞস্থানে স্বর্ণসীতা। সীতা যে সতী তাহাতে রামের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; সমস্ত দেবতা তাহার সাক্ষী দিয়াছিলেন। এই সত্য যখন জাতীয় ধর্ম হয়, তখন ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ গৃহে গৃহে বিরাজ করে।

৫৫. পরাধর্ম কেবল ঋষিদের মধ্যে ছিল। এজন্য উপনিষদে, পুরাণে, তন্ত্রে, ধর্ম-সংহিতায় পরাধর্মের উল্লেখ আছে, তাহার অধিকারী সকলে নহে। এজন্য সাধারণভাবে উল্লেখ করেন নাই। শাস্ত্রজ্ঞান বিশেষরূপে থাকিলে তবে পরাধর্ম কি তাহা বুঝা যায়।

জড়, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, নির্গুণ, এ সমস্ত উপাসনা জন্ম-জন্মান্তর করিতে করিতে পরাধর্মে অধিকার হয়, কিন্তু পরাধর্ম লাভ হইলেও পূর্বের ঐ উপাসনা-চতুষ্টয় নষ্ট হইবে না। প্রত্যেক উপাসনাতে সে পরাধর্ম দেখিতে পায়। মুক্তির পরে যে অবস্থা হয়, তাহাকে পরাধর্ম বলে।

৫৬. মানুষের মনুষ্যত্বকেই মানবীয় ধর্ম কহে। যেমন জলের ধর্ম শৈত্য, অগ্নির উষ্ণত্ব ইত্যাদি। প্রত্যেক মনুষ্য সাধনা করিলে এই মানবীয় ধর্ম অতিক্রম করিয়া দেবত্ব লাভ করে, তাহাতে কৃপা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি অর্থাৎ মনুষ্যত্ব যদি নষ্ট হয়, তাহা সাধু উপায় দ্বারা পুনঃ লাভ হয়। এজন্য তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত কহে। শরীরের মধ্যে চক্ষু একটি ইন্দ্রিয়; চক্ষুর ধর্ম দর্শন যদি দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়, তবে ঔষধাদি দ্বারা আরোগ্য লাভ করিবে। এইরূপ মনুষ্যত্ব মধ্যে অনেক গুণ আছে, তন্মধ্যে দয়া প্রধান

গুণ। এই দয়া যথার্থ পরিচালিত হইলে, অহিংসা মনুষ্যের স্বাভাবিক কার্য হইবে।

এই মনুষ্যত্ব হইতে উন্নতি হইলে দেবত্ব। দেবত্ব হইতে উন্নত হইলে জীবাত্মা পরব্রহ্মের অসীম সত্তায় প্রবেশ করিয়া লীলারস সম্ভোগ করেন।

৫৭. ধর্ম আংশিক কোন অবস্থা নহে। বৃক্ষ যদি পরিবর্ধিত হয়, তাহা হইলে তাহার কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব সমস্তই বাড়িবে। নতুবা যদি একটি শাখা বাড়ে আর সমস্ত ছোট থাকে, তাহা বৃক্ষের স্বাভাবিক অবস্থা নহে।

অমনোযোগ স্বাভাবিক অবস্থা নহে। চারিদিকে দৃষ্টি থাকিলে তবে ধর্ম হয়।

৫৮. সকল দেশে সকল সম্প্রদায়ে ধর্মের বহির্ভাগ অর্থাৎ কর্মকাণ্ড লইয়া দলাদলি। ধর্মই ধার্মিকের পরিচয়। এই অবস্থা ভেদ করিয়া প্রকৃত ধর্ম, যাহা জীবনে-মরণে সহায়। তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, ধর্মের মতামত লইয়া বিবাদ অনেক পরিমাণে চলিয়া যাইবে।

৫৯. ধর্মলাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণ ভগবানের অধীন হইয়া সত্যকে অকপটে গ্রহণ করিতে হয়। সংসারে যাহা ধর্মপথের অন্তরায়, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। লোক-নিন্দা, লোক-প্রশংসা অগ্রাহ্য করিতে হয়।

৬০. পিতা-মাতা প্রসন্ন না হইলে মায়া কাটে না।

৬১. সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন-ই মায়া হইতে উৎপন্ন। মায়া কি? কামনা। যতদিন ত্রিগুণ থাকিবে, কাম তাহার উপর আধিপত্য করিবে। এজন্য ত্রিগুণাত্মক ত্রিদেব হইতে সিদ্ধ যোগীগণ অনায়াসে কামকে নষ্ট করেন।

৬২. বাস্তবিক মায়া কি? যদি বল সংসারে পরম সুখে আছি, ইহা ছাড়িয়া কোথায় যাইব? সংসারে কে তোমাকে ভালবাসে? একটু বিচার করিয়া দেখ। অধিকাংশ স্থানে ভয়ানক প্রতারণা। কোন স্থানে স্ত্রী স্বামীকে কৃত্রিম প্রণয় দেখাইয়া অন্যকে ভালবাসিতেছে। কোন স্থানে স্বামী স্ত্রীকে প্রতারণা করিয়া অন্য নারীতে আসক্ত। কোন স্থানে পুত্র পিতাকে বধ করিয়া বিষয় লইতেছে। কোন স্থানে পিতা পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া অন্যকে সুখী করিতেছেন। তবে সংসারে মধ্যবিত্ত লোকদিগের মধ্যে, কৃষকদিগের মধ্যে কিছু কিছু ভালবাসা ও ভক্তি দেখা যায়। যেখানে অর্থের সম্বন্ধ, সেখানে যথার্থ ভালবাসা দুর্লভ। বস্তুত ধনীদিগের ন্যায় যথার্থ বন্ধুহীন লোক অতি বিরল। সকলেই টাকার জন্য ভালবাসিতেছে, হাসিতেছে, মুখপানে চাহিয়া আছে। রোগে শুশ্রূষা অর্থের জন্য। এইরূপ সংসারে ভ্রমণ করিয়া দেখিলে সংসারে যথার্থ সুখী কে? ইহা বাহির করা সুকঠিন। তবে যে ভালবাসার মধ্যে কোন প্রকার স্বার্থ নাই, এরপ লোক যদি সংসারে থাকেন, তাঁহারাই সুখী। ইঁহাদের সংসার সংসার নহে, স্বর্গ। আর সকলই অসার, অসারের অসার। এক হরিনাম ভিন্ন সহজ সুখের বস্তু আর কিছুই নাই। যথার্থ ভালবাসা হইলে মায়া হয়। সে ভালবাসা কোথায়? বরং বিচার করিয়া সংসার দেখিলে অসারই বোধ হইবে। প্রকৃত মায়া হরিনামে। সংসারের কোন্ সুখের জন্য মায়া হইবে?

৬৩. সত্যবাক্য ১৩ প্রকার। সত্য হইলে তাহাতে পরনিন্দা থাকিবে না। আত্মপ্রশংসা থাকিবে না। ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, জীবে দয়া সেই বাক্যের

অন্তর্ভূত হইবে। পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ, প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম. স্বদেশবাসীর প্রতি প্রেম, ছলনা-রহিত। মহাভারতে এই উপদেশ আছে।

৬৪. জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই প্রয়োজন। জ্ঞান না হইলে ভক্তি প্রকাশিত হয়েন না। কারণ যাহাকে ভক্তি করিব, তাঁহার বিষয় না জানিলে কাহাকে ভক্তি করিব? জ্ঞান ভ্রাতা ও ভক্তি ভগিনী। উভয়ের সমান মর্যাদা। তবে যে সাধক কেবল মোক্ষপ্রার্থী, তিনি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া সন্তুষ্ট হন। যে সাধক ভগবানের দাস, সখা প্রভৃতি সম্বন্ধ করিয়া সেবা করিতে চান, তাঁহারা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাধুসঙ্গ সর্বদা নিত্য-অনিত্য বিচার অর্থাৎ সংসারের অসারতা চিন্তা এবং মনে মনে সর্বক্ষণ ভগবৎ নাম জপ করা এই সকল উপায় গ্রহণ করিলে ক্রমে ক্রমে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়।

৬৫. ডাকিনী-যোগিনী সিদ্ধি হইলে সাত জন্ম ভগবৎ ভজন হইবে না।

৬৬. পতির প্রতি অসদ্ব্যহার করিলে, পতিকে সর্বদাই কটুবাক্য বলিলে নারীর যন্ত্রণাদায়ক পীড়া ভোগ করিতে হয়। ইহা শাস্ত্রকর্তারা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। এ রোগের একমাত্র ঔষধ পতির পদানত হওয়া এবং কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া। পতি দেবতা, পতি অত্যন্ত দুঃখ-দরিদ্রতায় পতিত হইলেও নারীর পূজনীয়। পতিও নারীকে ভগবৎ শক্তি জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করিবেন।

৬৭. গৃহী যাঁরা যাঁদের স্ত্রী আছেন, মাসে একদিন ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস করিবেন। বৈদ্যশাস্ত্রে আছে যখন স্ত্রী-পুরুষের মন অত্যন্ত প্রসন্ন থাকে, সে সময়ের সন্তান সুন্দর হয়।

৬৮. তমোগুণে নিদ্রা অধিক, রজোগুণে নিদ্রা বিলাস, সত্ত্বগুণে নিদ্রা থাকে না।

৬৯. সত্ত্বগুণী অবতার শ্বেতবর্ণ, রজঃগুণী অবতার রক্তবর্ণ, সত্ত্ব-রজঃ মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ। গুণাতীত পীতবর্ণ।

৭০. স্বপাকে ভোজনের নিয়ম এই যে যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারা মুষ্টিভিক্ষা করিয়া স্বপাক আহার করিবেন। একস্থানে স্থূলভিক্ষা করিবেন না।

৭১. প্রদীপ যদি প্রজ্জ্বলিত থাকে তাহা হইতে সহস্র সহস্র প্রদীপ জ্বালান যায়। কেবল তৈল, সলিতা, তৈলাধার এ সমস্ত আছে, কিন্তু অগ্নি না জ্বলিলে একটি প্রদীপও জ্বলে না। যে উপায় দ্বারা অগ্নি জ্বলে, তাহা না করিলে কিছুতেই দীপ জ্বলে না। মানবীয় শক্তিও সেইরূপ।

৭২. কীর্তনে ভাব তিন প্রকার হয়। সত্ত্বভাবে উপস্থিত লোকে উপকৃত হয়। রজঃভাবে অন্য লোকে কখনও উপকার কখনও অপকার পায়। এজন্য সম্বরণ করিবে। তমঃভাবে উপস্থিত লোকদিগের উৎপাত বোধ হয়। কারণ তমঃগুণের নৃত্য অধিকাংশ বেতালা হইয়া লম্ফ-ঝম্ফ হয়। নৃত্যকালে পা লাগিয়া অনেক খোঁড়া হয়। ঘরের দ্রব্যাদি নষ্ট হয়। বালকগণ ভয় পাইয়া চীৎকার করে।

৭৩. রামপ্রসাদের ন্যায় বৈষ্ণব কে? কালী, দুর্গা, এ-নামে শাক্ত নহে; শাক্ত ঐশ্বর্যে।

৭৪. কবীর ও গুরুনানকের ধর্মে প্রভেদ নাই। কবীর জোলা ছিলেন। এজন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মধ্যে তাঁহার মত গৃহীত হয় নাই। উত্তর-পশ্চিমে মেথর, ডোম, চামার এই সমস্ত জাতি কবীরপন্থী। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে, তাঁহাদের পদধূলি না লইয়া থাকা যায় না। গুরুনানক ক্ষত্রিয়

ছিলেন, এজন্য সকলের মধ্যে তাঁহার মত অবাধে গৃহীত হইয়াছে।

৭৫. যাহার যাহা শাস্ত্র তাহা অবলম্বন করিয়া রামমোহন রায় মহাশয় ধর্মপ্রচার করিতেন।

৭৬. রামমোহন রায় ধর্ম দুই ভাগ করিয়া বিচার করিতেন। ব্যক্তিগত ধর্ম ও সামাজিক ধর্ম। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যক্তিগত ধর্ম। খৃস্টান মুসলমান মধ্যে সামাজিক ধর্ম।

৭৭. রামমোহন রায় মহাশয় ঋষিদিগের পন্থা অনুসরণ করেন। সেই পথহারা হওয়াতে নানাদিকে গতি।

৭৮. শরীরের প্রধান যন্ত্র জিহ্বা। জিহ্বাকে বশে রাখিলে সমস্তই বশ হয়। বিশেষতঃ জিহ্বা বশে, অজপা স্বাধীনভাবে সর্বদা সহস্রার স্পর্শ করিয়া অমৃত পান করান। এই অমৃত আপনা হইতে ক্ষরিত হইলে আর বাক্য বন্ধ করিতে হয় না।

৭৯. সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমে গিয়া দেখা যায় কোন স্থানে তাস, কোন স্থানে বিবাদ, কোন স্থানে গল্প, দুই -একজন ধ্যানে-জপে মগ্ন।

৮০. গীতার উপদেশ অতি সুন্দর। প্রথম কর্ম। প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম করিতে করিতে বিবেক বৈরাগ্য সময়ে সময়ে উদিত হয়। তখন নিষ্কাম কর্ম করিতে ইচ্ছা হয়। নিষ্কাম কর্ম করিলে কর্ম শেষ হয়, কিন্তু বাসনা থাকে। কর্ম শেষ হইলে বিষয়-কর্ম করিতে লোকের প্রবৃত্তি হয় না। তখন ভগবৎ শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি সাধন-ভজনে মতি হয়। করিতে করিতে ভক্তির প্রকাশ হয়। ভক্তিতে হৃদয় ব্যাকুল হইলে বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ অবস্থা, পরে দর্শন। পরে 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ' ইত্যাদি।

কর্মের সময় বিচার, স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ ও দান এই চারিটি চাই। বিশ্বাস কি ভক্তি ইহা ক্রমে ক্রমে হয় না। যখন তখন ইহার কার্য আরম্ভ হয়, এজন্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় যে উপদেশ আছে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত—প্রথম কর্ম, কর্ম করিবার সময় প্রথমে কেহ ধর্ম বিশ্বাসে কর্ম করে না। প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া করিয়া থাকে, কর্ম করিতে করিতে বিবেক বৈরাগ্য সময় সময় প্রকাশ হয়; সেই সময়ে নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে ইচ্ছা হইতে থাকে। নিষ্কাম কর্ম করিলে কর্ম শেষ হয়। তখন বিশ্বাসের রাজ্য।

সকাম নিষ্কামের এক পরীক্ষা যে যখন সকাম অবস্থা তখন মন অজ্ঞাতসারে অনেক বৃথা চিন্তা করে। বাড়ী, ঘর, বাগান, হাতি, ঘোড়া, রাজত্ব এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া সুখী হয়। নিষ্কাম হইলে মন সেই অভ্যস্ত দোষে অজ্ঞাতসারে বৃথা চিন্তা করিতে পারে না; যাহা চিন্তা করে তাহাই ঘৃণা হয়। যেমন গু দেখিয়া স্নানের পর লাফাইয়া যায় সেইরূপ। যেমন চিন্তা করে অমনি থু থু করিয়া পলাইয়া যায়। এইরূপ দুই-একদিন করিয়া করিয়া লজ্জিত হইয়া বোকার মত বসিয়া থাকে।

৮১. মৃত্যু ইচ্ছা না হইলে কখনই মরে না।

৮২. যেখানে সঙ্কোচ সেখানে ভগবান বাস করেন না। বৈকুণ্ঠ যেখানে কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নাই।

৮৩. সহস্র বৎসরের অন্ধকার একটি সামান্য মৃৎ-প্রদীপে নষ্ট করে।

৮৪. যেখানে ভগবানের রাজত্ব, সেখানেই স্বার্থত্যাগ।

৮৫. যে স্থানে পরনিন্দা, পরগ্লানি, মন্দ আলাপ হয়, সেই স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে।

৮৬. ভগবানের রাজ্যে সমস্ত কার্যের মধ্যেই নিয়ম আছে। অনিয়ম বিশৃঙ্খলায় কোন কার্য হয় না। ধর্মরাজ্যের ঘটনা কি জড়রাজ্যের ঘটনা সমস্তই নিয়মে বাঁধা। মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম যে প্রণালীতে হয়, আমি হাজার কান্দিলেও তাহার অন্যথা করিবেন না। তিনি নিয়ন্তা এবং দয়াময়। একদিকে পাপীকে কঠোর শাস্তি দিতেছেন, সেই সময় আবার তার রোগের সেবা করিতেছেন।

৮৭. সাধন করিয়া যদি বীর্য ধারণ করিতে পার, তবে সামান্য আহারেও শরীর স্থূল ও বলবান হইবে।

৮৮. সনাতন গোস্বামী সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ছয় বৎসর থাকিলেন। একদিন হস্তমৈথুন। মনে ঘৃণা হইল; মনে হইল, দেহত্যাগ করি। যমুনায় প্রাণত্যাগ করিতে গেলেন। একটি ব্রজমায়ী কুম্ভে জল পূর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন। 'মায়ী, এ ক্যা হুতা হ্যায়?' 'তুম য্যাছা শরীরছে ধাতু নিকালতা হ্যায়।' যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তি না হয়, তবে ধাতু রাখিলেই বা কি, ফেলিলেই বা কি? 'মাৎ শরীর ছোড়, ভজন কর, ভোজন ছাড়।'

৮৯. নিমপাতায় উত্তেজনা কমে। রোজ তিনটি কোমল নিমপাতা চর্বণ করিয়া খাইয়া অল্প জল পান করিতে হয়।

৯০. সমস্ত জীব-জন্তু নিজের নিজের কার্যে তাহারা শ্রেষ্ঠ। আমি মাকড়সার মত জাল বুনিতে পারি না, বাবুইপাখীর মত বাসা প্রস্তুত করিতে পারি না। চিনি ও ধুনা মিশাইয়া পৃথক করিতে আমার ক্ষমতা নাই, কিন্তু পিপীলিকার আছে।

৯১. একদিকের কথা শুনিয়া কোন কথা বিশ্বাস করিও না।

৯২. জাতি, কুল, অভিমান থাকিতে ধর্ম লাভ হয় না।

৯৩. সংসারে যাদের আসক্তি তাদের মৃত্যু ভয়।

৯৪. মালা হাতে রাখিয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না, স্ত্রীসঙ্গ করিবে না।

৯৫ নেপোলিয়নের শেষ অবস্থা বড় শোচনীয়। অত দুঃখেও মহত্ত্ব যায় নাই। নেপোলিয়ন দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। উহার ও অর্জুনের শেষ অবস্থা প্রায় এক প্রকার।

৯৬. পূরক, কুম্ভক, রেচক প্রাণায়ামের তিন অঙ্গ। তন্মধ্যে কুম্ভক শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রতিদিন নিয়মিত সময় কুম্ভক করিলে দীর্ঘজীবী হয়। সর্বপ্রকার শারীরিক বেদনা নষ্ট হয়। কুম্ভক প্রতিদিন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যদি বীর্যরোধ অভ্যাস হয়, তবে শরীর যথার্থ দেবমন্দির হয়। রোগ-শোক দূর হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ অভ্যাস করিলে সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম জপ ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়াম প্রভৃতি সাধন করিতে হয়। শ্বাসে শ্বাসে সাধন প্রথমে কঠিন। নাসিকার শ্বাসে শ্বাসে নাম বহে। মেরুদণ্ড দিয়া যে বাতাস বহে তাহার সঙ্গে জপ করিলে আশা পূর্ণ হয়। প্রাণায়ামের অনেক উপকার। এতে শরীর মনের একাগ্রতা প্রভৃতি লাভ হয়। কেবল স্ত্রীলোকের ঋতুকালে তিন দিন প্রাণায়াম নিষেধ। প্রাণায়াম দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে; মনঃ স্থির হয়। ইহা ধর্ম সাধনের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারা

অন্য স্ত্রীলোককে, যিনি সাধন করেন তাঁহাকে দূরে বসিয়া প্রাণায়াম দেখাইয়া দিতে পারেন। স্ত্রীলোক ও পুরুষ একাসনে বসিবেন না। স্ত্রীলোক ও পুরুষ দুজনে সাধন না করিয়া তিন-চার জন একত্র হইয়া সাধন করিবেন। কারণ ইন্দ্রিয় বড় প্রবল। সর্বদা সাবধান প্রয়োজন।

কেবল প্রাণায়ামে শরীর সুস্থ থাকে ও মনের একাগ্রতা হয়। এইরূপ একাগ্র মনে থাকিতে থাকিতে, মন নিরোধ হইলে সমাধি হয়। ইহাকে শূন্য সমাধি কহে। এরূপ শূন্য সমাধিতে সহস্র বৎসর থাকিলেও কোন উপকার হয় না। এ বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে এক বাজিকর কন্যার বিবরণ দ্বারা সুন্দর বুঝাইয়াছেন। অধ্যাত্ম যোগে অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হইলে যে সমাধি হয় তাহাতেই ব্রহ্মলাভ হয়। ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন এরূপ সমাধি হয় না।

৯৭. স্ত্রীলোকের ও পুরুষের সর্বদা সাবধান থাকা কর্তব্য। কখনই ঘনিষ্ঠতা করা উচিত নহে। স্ত্রীজাতিকে যত সম্মান করিবে, তত নিজে পবিত্র থাকিবে। যাকে সম্মান করি, তাকে কুৎসিত ও দূষিতভাবে দৃষ্টি করা যায় না। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতিকে সম্মান করা যেন একটি উপহাসের বিষয়। উত্তর-পশ্চিমে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান আছে। বম্বে মহারাস্ট্রীদিগের মধ্যে নারী-জাতির সম্মান অধিক, তাতে সব বীর জন্মগ্রহণ করে। ইংরেজ জাতি কেবল নারী-জাতিকে সম্মান করিয়া জগতের মধ্যে প্রধান জাতি হইল।

পুরাণে আছে, যেখানে নারী জাতির সম্ভ্রম, সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ বর্তমান। ইংরেজ জাতির মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন। যদি বাবুদের বল যে, নারীজাতিকে সম্মান কর, তখনই তাহারা হাহা করিয়া হাসিবে। স্কুল-কলেজে শিক্ষা হইতেছে কেবল চাকরী করিবার জন্য। চরিত্র-গঠন করিবার জন্য কে শিক্ষা করে? নারীজাতিকে সম্মান না করিলে স্বীয় চরিত্র পবিত্র রাখা কঠিন। মনে মনে কুচিন্তা করিলেও চিত্ত অপবিত্র হইবে।

৯৮. তপস্যা দ্বারা আত্মা যত নির্মল হইবে, ততই নিজকে নিকৃষ্ট মনে হইবে। শরীর হইতে আপনাকে ভিন্ন দেখিয়া আত্মদৃষ্টি প্রবল হইবে। তপস্যা দ্বারা আমাকে নিকৃষ্ট মনে করিলেও শরীর ও মনকে শাসন করিতে করিতে একপ্রকার অহঙ্কার জন্মে। তাহাতে মনে হয় আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত মনুষ্য। এই ভাব প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে আছে। তপস্যা দ্বারা ইহা প্রবল হয়। এ সময়ে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারি না। মনে করিয়া গেলাম, আমার সমস্ত অর্পণ করিয়া আসিব। কিন্তু ভিতর হইতে যেন রোদন আসে। কে যেন নিষেধ করে যে, পারিবে না। এখন যদি বলে মর, তখন কি করিবে? যদি বলে স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিধান করিয়া বনে যাও, তখন কি করিবে? এই মানসিক সংগ্রাম প্রত্যেক সাধকের অন্তরকে আন্দোলিত করে। এজন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিবে। ডাক্তার যেমন পচা ঘা কাটিতে কাটিতে অস্থি ভেদ করিয়া মজ্জার মধ্যে যে বিষম রোগ তাহা ধরিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ শোনা কথায় অথবা গ্রন্থের উপদেশে হঠাৎ কিছু স্থির করিব না। আপনাকে বিচার করিয়া যাহা যথার্থ আমার অবস্থা তাহার

প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিব। যদি আমার আত্মার ভাব হয়, অবস্থা হয়, তবে চুপ করিয়া তাহার গতি দেখিলে পরমানন্দ লাভ করিব।

ধর্মভাব পাপ হইতে মুক্ত করিয়া আমাকে দেবতা করিল। আমি সেই পতিত, এরূপ হইলাম কিরূপে, অতি আশ্চর্য। আর যদি ভিতরে পাপ চোরের মত লুকাইয়া থাকে, তবে সমস্ত দিন সাধন-ভজন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাকে নরকে আনিল কিরূপে? ইহা দেখিয়াও আশ্চর্য হইব।

শ্রেয় ও প্রেয় দুইটি ক্রিয়া মানুষের অভ্যন্তরে কার্য করে। তপস্যা দ্বারা, সৎসঙ্গ দ্বারা ধর্মবল প্রবল হয়। তখন পাপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ভগবদ্-আশ্রয় লাভ হইয়া থাকে।

৯৯. যোগের একটি অবস্থা প্রত্যাহার। প্রত্যাহারের অর্থ এই যে, অন্যদিকে মন গেলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। নাম করিতে করিতে যে অবস্থা হয়, অথবা যে দর্শন হয়, তাহা ধরিয়া রাখার নাম ধারণা।

১০০. চিররোগী ঔষধ খাইতে খাইতে ঔষধে শ্রদ্ধা থাকে না। যন্ত্রণায় ছটফট করে, তথাপি ঔষধ খাইতে হয়। কারণ অন্য উপায় নাই। পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সকল কর্ম করা হয়, তাহার ফল ভোগ করিয়া মুক্তি পাইতে হইলে অনেক জন্ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা শেষ করিতে হয়। ভগবদ্ নামের বলে মুক্তি সহজ হয়। কিন্তু এই বিঘ্ন শীঘ্র নামে রুচি আসিতে দেয় না। দুঃখ-কষ্ট সমস্ত চারিদিকে। প্রহ্লাদ-চরিত্র ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সংসার—পাপ, শয়তান—হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ—সাধক। তাঁহার আহারের বস্তু বিষ, অগ্নিকুণ্ডে বাস। হস্তিপদে, অস্ত্রাঘাতে, সংসার সমুদ্রজলে নিক্ষেপ। চারিদিকে বিপক্ষ, সহায় কেবল 'হরিনাম'। অবশেষে প্রহ্লাদ জয়লাভ করিলেন। শ্রীহরি নরসিংহ হইলেন। প্রহ্লাদ বর চাহিলেন—হিরণ্যকশিপুর মঙ্গল হউক। অতএব সাধন-পথের এ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে।

খৃীস্টান সাধক যে 'যাত্রিকের গতি' (পিলগ্রিম'স প্রোগ্রেস) পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতেও এই বিবরণ। মুসলমান ফকিরদিগের বিবরণে এই ঘটনা, এই যন্ত্রণা, অগ্নি-পরীক্ষা। ইহাতে যত পোড় খাইবে, তত বিশুদ্ধি লাভ হইবে। এই যন্ত্রণা নানারূপে প্রত্যেক সাধকের হৃদয়কে দগ্ধ করে। শ্রীশ্রীহরিনাম—তারকব্রহ্মনাম—এই ঔষধ। এই যন্ত্রণায় আমি দুইবার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম। পরমহংসজী রক্ষা করিলেন। অগ্নি জ্বলিত।

কত জন্ম-জন্মান্তরের পাপ, তাহাকে দগ্ধ করিতে অনেক অগ্নির প্রয়োজন। এই যন্ত্রণাই যথার্থ মুক্তির হেতু। ইহা যাহার হয় সে কৃত্রিম ধর্মের ভান করিতে পারে না। যাতে জ্বালা নিবারণ হয়, তাহা ভিন্ন তাঁহার তৃপ্তি হয় না।

অসময়ে পাপ সত্ত্বেও যদি ধর্মের আনন্দ হয় তাহা বিড়ম্বনা। যেমন রোগী কুপথ্য লইয়া সুখী হয়। প্রথমে যন্ত্রণায় শুকাইয়া নীরস হইবে। বিষয়-রস একবিন্দু থাকিতে ব্রহ্মানন্দ আসে না। এই যন্ত্রণার মধ্যে অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। সময়ে সমস্তই প্রকাশ পাইবে।

হরিওঁ ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ॥ ওঁ শান্তিঃ॥।

আকর গ্রন্থ, যা থেকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য নিয়েছি :—

১. বালক বিজয়কৃষ্ণ—প্রভুপাদ সীতানাথ গোস্বামী।
২. মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন-বৃত্তান্ত—বঙ্কুবিহারী কর।
৩. শ্রীশ্রীবিজয়কথামৃত (১ম ও ২য় খণ্ড)—নবকুমার বাগচী।
৪. শ্রীমদাচার্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—অমৃতলাল সেনগুপ্ত।
৫. শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ (৫ খণ্ড)—শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।
৬. শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত—অমিয়কুমার সান্যাল।
৭. শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু লীলানুস্মৃতি—দ্বারিকানাথ রায়।
৮. প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—জগদ্বন্ধু মৈত্র।
৯. মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা—হরিদাস বসু।
১০. বিজয় ভাগবত (১ম খণ্ড)—মহেশচন্দ্র দে সরকার।
১১. আশাবতীর উপাখ্যান—শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
১২. ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয় —শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
১৩. যোগসাধন গ্রন্থ ঐ ঐ
১৪. বক্তৃতা ও উপদেশ ঐ ঐ
১৫ মনোরমার জীবনচিত্র (১ম ও ২য় খণ্ড)—মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।
১৬. আচার্য-প্রসঙ্গ—সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৭. শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবী—অমৃতলাল সেন।
১৮. ঐ ঐ —শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৯. অক্ষর—শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী। ১ম সং—১৩৭২।
২০. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।
২১. মহানির্বাণতন্ত্র—
২২. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (৪র্থ সংস্করণ)—বিশ্বভারতী।
২৩. গোবিন্দদাসের করচা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৪. অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি—দ্বারিকানাথ রায়।
২৫. ঐ ঐ —যোগমায়া গুহঠাকুরতা।
২৬. ঐ ঐ —মহেশচন্দ্র দে সরকার।
২৭. ভারতের সাধক—শঙ্করনাথ রায়।
২৮. বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত সাধুসন্ত ভক্তদের জীবনের টুকরো কথা।
২৯. আমার জীবনী—নবীনচন্দ্র সেন।
৩০. শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৩১. শান্তিনিকেতন (১ম ও ২য় খণ্ড)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩২. সদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্ব (২ খণ্ড)—হরিদাস বসু।
৩৩. অদ্বৈত প্রকাশ—ঈশান নাগর।
৩৪. শ্রীমৎ কিরণচাঁদ দরবেশজী প্রতিষ্ঠিত 'মন্দির পত্রিকা'—প্রাচীন সংখ্যাগুলি!
৩৫. শ্রীশ্রীদরবেশজীপ্রসঙ্গ—সদানন্দ মিত্র।
৩৬. শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবার অমৃতবাণী—ডাঃ খগেন্দ্রমোহন দাশ-সংকলিত।
৩৭. শ্রীমদ্‌ভাগবত।
৩৮. শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা।
৩৯. তুলসীদাসের দোঁহাবলী।
৪০. করুণা-কণা—জগদ্বন্ধু মৈত্র।

to any Govern-
nt are charged
ences, but whose
ension is not
ce s or warrant
owgh the local
ent may be

king state of affairs. It appears that the rats have a happy hunting ground in the children's ward. How can even a corpse be eaten by rats in a hospital.—Yours, etc.,

J. N. SINGHI.

Calcutta, January 21.

charged for the supply since a meeting has already been convened in Delhi by the Union Food Minister, Mr Jagjivan Ram, in this connexion. The meeting will be attended by Mr Ray and counterpart in Bihar, Mr Ab Ghafoor.

reason why the publica-
f the picture in Pravda and
other Soviet papers is
cant is that it signalled
pin's supporters in the bur-
acy that he is on the make
. Shelepin has many such
porters. As head of the Kom-
somol, the Communist youth orga-
nization, he was instrumental in

consistent
the proposed Co
A more signifi
wind is the dec
Congress (O) to
"Tamil Nadu p
conference" whi
Tiruchi on Febr
support of the
and would be addre

Sadat Wants

n—as soon in
circle, whose
to be the most
for the succes-
re of his illness.
way, the strug-
ession to Brezh-
been in pro-
time, and the
on a number of
policy, discerni-
lines of the So-
t have been un-
t.

es. particularly
the SALT neg-
ev's view ulti-
l, as is evident
stok agreement,
he managed to
ber of challeng-

HAND
P

ith all facilities
is experiments.
le one stipula-
should be left
five years and
ave India until
t period. That
not forthcoming
nment and the
d.—Yours, etc.,

uary 18.

the Govern-
prevent Israel
in the World
Championship?
re told, is not
. But even on
rations, where
nt to be the

tesman

RS AGO

rial)

that, as educa-
printing-press
ridge over the
h now divides
world; if Gov-
y use it. and
its measures
to the people,
f a journal, or
rous but subs-
method of a
ntelligence De-
ted by the

viet leaders, in their climbs from small beginnings to the politburo or party secretariat, leave behind them a trail of supporters and beneficiaries who have reason to be grateful for the help given them in advancing their own careers. When Shelepin last appeared to be making a bid for power some years ago, members of this "Komsomol faction" suddenly became visible in a number of key jobs—from which they were dismissed when Shelepin's star began to fade But they are still about, and so are many others who would be more than happy to see him climb to the top again.—All India copyright reserved.

(To be continued)

Letters To The Editor

motivating factor, this decision is inexplicable.

What has Israel done to merit this insult? It was Israel which repeatedly offered us help at times of crisis, both in 1965 and during the Bangladesh war, which was unceremoniously turned down by our Government.

The Indian press and the public must dissociate themselves from this decision. Let the Israelis know that we are embarrassed by our Government's attitude.—Yours etc., MIHIR SEN.

Calcutta, January 21.

Sir,—It was reported that the contingent from South Africa would not be all-white. Not to play South Africa in the last Davis Cup final in protest against apartheid is one think. But, as the host country given the honour of staging a world championship, we should have behaved in a more mature manner —Yours, etc., S M. BANERJEE.

Chittaranjan, January 18.

DEATH IN HAMELYN

Sir,—It was shocking to read the news item under the heading "Child dies in hospital : Face and hand found eaten away by rats," (January 21-22) A hospital is supposed to be a thoroughly clean place : instead we find a large number of sewer rats Is this a civilized country?—Yours, etc., V. SUBRAMANIAN.

PARIS, Jan 22.—The Egyptian President, Mr Anwar Sadat, said in an interview here yesterday he was ready to conclude and respect a peace treaty with Israel, though it is still too early to speak of diplomatic relations and open borders, reports AFP

Mr Sadat told Le Monde, amplifying a warning he gave earlier this month, that he would accept nothing less than an Israeli withdrawal within three months on the Egyptian, Syrian and Jordanian fronts.

He was "disposed to accept, if need be, successive retreats" he told the newspaper.

"It is essential for us to maintain the dynamics of peace", Mr Sadat said. "The situation in the Middle East is explosive. We must set to work. Otherwise the irreparable will occur"

Mr Sadat said his immediate demands were for Israeli withdrawal in the Sinai desert from the key Mitla and Gidi passes east of the Suez Canal, and from the Abu Rudeis oilfields in the Western Sinai on the Gulf of Suez

Reuter adds. Mr Sadat told Le Monde that the Arab guerrillas' attack at Orly airport on Sunday was aimed at sabotaging his impending visit to France

"They are harming the interests of the Palestinian resistance The Orly attack was aimed at me Within a few days of my visit to France they sought to sabotage the good relations between Paris and the Arab world" he told the newspaper

President Sadat said he refus-

Ray To Attend Ranchi Zonal Council Meeting

THE West Bengal Chief Minister, Mr Siddhartha Ray, the Finarke Minister, Mr Sankar Ghose, and the Agriculture Minister, Mr Abdus Sattar, will attend the Eastern Zonal Council's meeting scheduled to be held at Ranchi on February 3 The Union Home Minister, Mr Brahmananda Reddy, will preside over the meeting which was last held in Delhi in 1973 under the stewardship of the Prime Minister, who was holding charge of the Home portfolio at that time.

The other two States to be represented at the meeting are Bihar and Orissa. Though the agenda of the meeting has not been formally communicated to the State Government it is understood that problems like providing greater banking facilities in the eastern region, better coordination between the States on questions of law and order, health and maintenance of inter-State

ed to a
Egypt
Egypt.
ed asyl
groups,
do not
criminal
Mr S
Kissinge
honest
Secretar
Mr Sa
State h
could no
ed al, h
true tha
internal
his peac
tain he
the Egy

$1.5
So

NEW
eli reque
military
ration of
ports PT
The Is
Yigal A
at Wash
sident F
State, D
a $2 billi
tary har
$1.5 bil
purchases
Mr All
Governm
on this
years am
all.
Meanw
dent For
ence ves
tinuing to
dle East.
newed w
military
efforts we
He said
a maximu
Israel as
nations

Move
Of Li

The Un
sidering a
foreign d
India tem
life-saving
be carried
cipation
ed and a
The Unio
Petroleum
R. Genes
to Calcut
posal with
authorities
It is st
about Rs
medicine
every yea
50% of th
saved if
drugs ar
manufac